যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড



সতীশচন্দ্র মিত্র

যশোহর-খুলনার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

সতীশচন্দ্র মিত্র

শিবশঙ্কর মিত্র -সম্পাদিত

পরিবেশক

দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের জন্য এই পুস্তকের সুলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

শিবশঙ্কর মিত্র

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯২২
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৬৫

প্রকাশক : শিবশঙ্কর মিত্র
৭/এ যুগীপাড়া বাই লেন, কলিকাতা ৬

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

উৎসর্গ-পত্র

আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

আচার্য্যদেব !

আমার 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের' প্রথম খণ্ডের মত এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশেরও সকল ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন, আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার মত ভক্তিভরে ইহা আপনারই করপল্লবে সমর্পণ করিতেছি। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে আপনি আমাকে যে উৎসাহ-বাণীদ্বারা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে ; আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে কোন প্রকার প্রাণপাতী পরিশ্রমে বা প্রাণ হাতে লইয়া দুর্গম স্থানে তথ্যানুসন্ধানে কাতর হই নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত সফলতা লাভের শক্তি আমার ছিল কিনা জানি না ; আপনার কথার সার্থকতা আপনিই বিচার করিবেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আমার গ্রন্থে আর যাহা কিছুরই অভাব থাকুক, ইহাতে প্রাণের অভাব নাই, দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তির অভাব নাই, কঠোর ন্যায়পরতার সঙ্গে সমদর্শিতার অভাব নাই। আপনি সর্ব্বজাতিতে সর্ব্বভূতে সমদর্শী ; ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আমিও সে নীতির অনুসরণ করিতে ক্রটি করি নাই। আমি কোন স্থলে বোধ হয় অনাবশ্যক আবেগ বা উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় দেই নাই, ভাষাকে সরস করিতে গিয়াও সতর্কতা বা সত্যানুবর্ত্তিতা হারাই নাই। আমি সর্ব্বত্র সংক্ষেপ ও সংকোচের জন্যই চেষ্টিত থাকিয়া অনর্থক অতিরঞ্জন পরিহার করিয়াছি। তবুও পুস্তক বড় হইয়াছে ; হইয়াছেও আপনার কৃপায় ; আপনি অনেক ছোটকেই বড় করিয়াছেন।

আপনি যশোহর-খুল্‌নার গৌরব-স্তম্ভ। খুল্‌না আপনার জন্মগৌরবে পবিত্র, যশোহর আপনার বংশ-গৌরবে সুরভিত ; সমগ্র বঙ্গ আপনার কর্ম্ম-গৌরবে সমুন্নত, ভারতবর্ষ আপনার কীর্ত্তি-কথায় মুখরিত ; আর বিশ্বমানব আপনার জ্ঞান-গৌরবে উদ্ভাসিত। সকলেই আপনার নিকট ঋণগ্রস্ত, কিন্তু কেহই অঋণী হইতে চাহে না। আমার কথাও তাহাই। আপনি অর্থ আয় করেন ত্যাগের জন্য, ভোগের জন্য নহে, সে অর্থ নিত্য বঙ্গীয় যুবকের শিক্ষাদীক্ষায় এবং বিদ্যাপীঠের সাহায্য-কল্পে অবিরত ব্যয়িত হয়। শুধু তাহাই নহে, বঙ্গের

অঙ্গ যেখানে ক্ষতবিক্ষত, যেখানে রোগগ্রস্ত, সেই স্থানে তাহার চিকিৎসার জন্য এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার চিরপরিচিত 'ডাক্তার রায়' অবতীর্ণ, আজ্ দুর্ভিক্ষে, কা'ল প্লাবনে, আজ্ নৈতিক সংস্কারে, কা'ল অন্ন বা বস্ত্র-সমস্যার সমাধানে, এখানে বিদ্যামন্দিরের সংগঠনে, সেখানে শিল্পশালার উদ্বোধনে, যেখানে যখন দুর্দ্দৈব, যেখানে যখন প্রয়োজন, সেইখানে আপনি কাণ্ডারী। আপনি দীনবাসপরিহিত জীর্ণ-তনু লইয়া চির-কুমার তাপস-মূর্ত্তিতে বুক পাতিয়া দাঁড়াইলে, সমগ্র ভারতের ভক্তিবিশ্বাসের চাক্ষুষ নিদর্শনস্বরূপ আপনার নামে অজস্র অর্থবৃষ্টি হয় এবং আপনার আরব্ধ কার্য্যকে লক্ষ্মীযুক্ত জয়যুক্ত করিয়া দেয়।

পরোপচিকীর্ষাই আপনার ধর্ম্ম, উহাই আপনার যাবতীয় মতামত ও কর্ম্মকাণ্ডের ভিত্তি। আপনি কোন পক্ষ, সংঘ বা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। দীনার্ত্তসেবানিষ্ঠার কষ্টিপাথরে আপনার সকল কর্ম্ম পরীক্ষিত। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে নিত্য দুর্দ্দৈবের পার নাই, আপনারও কর্ম্মের শেষ নাই। সেই বিপুল কর্ম্মময়তার মধ্যেও আপনি একনিষ্ঠ সাধকের মত কিরূপে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাহা লোকে শুনিয়া বিশ্বাস না করিলেও দেখিয়া বিস্মিত হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিরাট কর্ম্মাড়ম্বরের মধ্যেও আপনি নিজ দেশের কথা, নিজ জন্মপল্লীর কথা শুনিতে সর্ব্বদা উৎকর্ণ। সেই জেলা বা সেই পল্লীর নাম করিয়া যে কেহ আপনার দ্বারস্থ হয়, সেই আশ্বস্ত হইয়া আশ্রয় পায়। আজ্ আমি আপনার সেই জন্মভূমির নূতন পুরাতন নানা কাহিনীর পুষ্পস্তবক লইয়া আপনার সমীপস্থ হইতেছি, আমার সাগ্রহ সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় এ পুস্তক রচনাকালে কাহারও তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখি নাই, কিন্তু ইহা পাঠ করিলে যদি আপনি কিছুমাত্র তুষ্টি অনুভব করেন, তাহা হইলেই আমার সকল শ্রম, সকল চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

দৌলতপুর, খুলনা
রাস-পূর্ণিমা, ১৩২১

প্রণত দীনগ্রন্থকার
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার আট বৎসর পরে উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীভগবানের অপার করুণা এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দানশীলতাই এ পুস্তক প্রকাশের একমাত্র সহায়। ইষ্টকৃপা ব্যতীত আমার জীবনের আশা ছিল না; আচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত পুস্তক ছাপিয়া বাহির করিবার ভরসা ছিল না। এই কথার সরল অভিব্যক্তি ব্যতীত আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের আর কি ভাষা থাকিতে পারে, আমি তাহা জানি না। ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম খণ্ড সাধারণের হস্তে দিবার কয়েক মাস পরে, আমি সাতক্ষীরায় গিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য ভ্রমণফলে সাংঘাতিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া দৌলতপুরে ফিরিয়া আসি। তেমন ভীষণ আক্রমণ আমার আত্মীয় বন্ধুরা কেহ কখনও দেখেন নাই; আমার জীবনের কিছুমাত্র আশা ছিল না, মৃত্যু-সংবাদও রটিয়াছিল। অবশেষে ৺কৃপায় এবং শত শত পরিচিত বা অজ্ঞাত আত্মীয় বন্ধু ও দেশবাসীর অযাচিত আশীর্ব্বাদের ফলে আমি বাঁচিয়া উঠি। এমন বাঁচা কদাচিৎ লোকে বাঁচে; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তিনিই জানেন। রোগযন্ত্রণায় চৈতন্য-লোপের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চিন্তা ছিল, এই ইতিহাস সম্বন্ধীয় আমার দায়িত্ব বুঝি অপূর্ণ রহিয়া গেল। দৈব-কৃপায় রোগমুক্তির পর পূর্ণ ভক্তিবিশ্বাসে ও দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আরব্ধ কার্য্যে নিরত হইলাম। তবুও কত বাধা বিপত্তি ও ভাগ্যবিড়ম্বনা যে আমার পথের অন্তরায় হইয়াছে, ১৩২৫ সালে দারুণ ভ্রাতৃশোকে জর্জ্জরিত হইয়া, পরবৎসর আকস্মিক ঝটিকাবর্ত্তে বিপন্ন ও আবাসশূন্য হইয়া যে কত অশান্তির মধ্যে কার্য্য করিয়া চলিয়াছি, তাহা বলিবার নহে। সে কার্য্যের ফলাফল আজ সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত হইল, উহার বিচারক আমি নহি।

প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ হইবার কথা ছিল, তাহা হয় নাই। বিলম্বের কারণ কতক পূর্ব্বে দিয়াছি; প্রথমতঃ আমি বৎসরাধিক কাল একপ্রকার অকর্ম্মণ্যই ছিলাম; দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয় মহাসমরের ফলে কাগজ প্রভৃতির অগ্নিমূল্য হইয়াছিল; তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান পুস্তকের উপাদান যাহা সংগৃহীত ছিল, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; আরও ভ্রমণ, অনুসন্ধান ও তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন। একাগ্রভাবে তাহা করিয়াছি, শেষ

পর্য্যন্ত সে কার্য্য চলিয়াছে। পুস্তক ছাপা হইতে হইতেও কত নূতন কথা সংযোজিত হইয়াছে। দুই বৎসরের অধিক কাল পুস্তকখানি মুদ্রাযন্ত্রের কবলে ছিল। সমস্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শেষ করিয়া মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিতে পারি নাই, কতকাংশ যন্ত্রস্থ করিয়া আমার হস্ত অবিরত লেখনী চালনায় ব্যস্ত ছিল। সুবৃহৎ পুস্তকের আদ্যোপান্ত ঘটনাবলী ও চিন্তাপ্রণালীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে মস্তিষ্ককে যে কিরূপ প্রপীড়িত করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। মফস্বলে বসিয়া সমগ্র পুস্তকের প্রুফ আমিই দেখিয়াছি, সমস্ত কাপি আমিই লিখিয়াছি, সহায়ক কাহাকেও পাই নাই। দ্বিতীয় প্রুফের ভুল সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের অর্ডার দিতে হইয়াছে, সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইল কিনা তাহা পরীক্ষার সুযোগ হয় নাই। তাই মুদ্রাযন্ত্রের চিরাচরিত প্রকৃতিবশে ভ্রমপ্রমাদ যে কিছু কিছু না রহিয়াছে, তাহা নহে। তজ্জন্য অবশ্য পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ উদরান্নের সংস্থান জন্য যথোপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু অবসর ঘটিয়াছে, বা শরীরের দিকে না চাহিয়া সে অবসর কালকে বিনিদ্র রজনীতে যতটুকু দীর্ঘ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাকে এই ইতিহাসের জন্য নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। এমনই আমার দুর্ভাগ্য, অন্য দেশে হয়ত যে কার্য্যের উৎসাহ জন্য বৃত্তিসহ দীর্ঘ অবকাশ জুটে, আমার বেলায় সে ত দূরের কথা, বরং যে দুই বৎসর কাল এই পুস্তকের রচনা ও মুদ্রাঙ্কণ লইয়া আমি একান্ত বিব্রত, সে সময়ে আমার স্কন্ধে নূতন কর্ত্তব্যের গুরুভার চাপিয়া আমাকে একপ্রকার অনবসর করিয়া তুলিয়াছিল। সে দুঃখের কথা ইষ্ট-চরণে নিবেদন করা এবং অবস্থাকে ভাগ্যফলরূপে গ্রহণ করা ভিন্ন আমার মত দারিদ্র্যপীড়িত দায়গ্রস্ত ব্যক্তির গত্যন্তর ছিল না। আরব্ধ কার্য্যে আমার একাগ্রতার ফল ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, আমার নিজের যাহা সম্বল ছিল, সেই শরীরকে স্বাস্থ্যহীন ও জরাজীর্ণ করিয়া এই পুস্তক শেষ করিলাম, জীবনাবশেষের আর কয় দিন হাতে রহিল তাহা বলিতে পারি না। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট হইতে সমবেদনা পাইব কিনা, জানি না; তবে আমার অনিবার্য্য অসংখ্য ভ্রমত্রুটির জন্য আমি সকলের নিকটেই করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এ গ্রন্থের জন্য আমি অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছি ; *কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করি নাই, বিপদে বিচলিত হই নাই, কোন চেষ্টা,* যত্ন বা অর্থ ব্যয়ের ত্রুটি করি

নাই। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছি, দীর্ঘপথ অতি কষ্টে পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছি, প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া পরমোৎসাহে দুর্গম স্থানে বা গহন বনে ভ্রমণ করিয়াছি ; আর সন্ধানমত সকল স্থান দেখিয়া সকলের কথা শুনিয়া, তাহা হইতে সকল তথ্যের সমন্বয় করিয়া সত্যের উদ্‌ঘাটন ও সমস্যার সমাধান জন্য চিন্তা লইয়া দিনের পর দিনপাত করিয়াছি ; কত শত শত পত্র দ্বারা অনুরক্তকে বিরক্ত করিয়াছি, বিরক্তকে অনুরাগী করিয়া লইয়াছি,—দেশমাতৃকার প্রতি পদরেণুর সহিত পরিচিত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রার্থনা করিয়াছি। আশা করি, নিবিষ্টচিত্ত পাঠক প্রতিপত্রে আমার গুরুশ্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। কার্য্যের অধিকার মাত্র নিজের ধরিয়া লইয়া ফলের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের অনুদ্বৃত্ত অর্থ ভ্রমণাদির জন্য ব্যয়িত করিয়া অভাবগ্রস্ত হইয়াছি, তবুও অর্থোপায়ের যাবতীয় অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এ পুস্তক রচনায় বিরত হই নাই। অর্থের প্রত্যাশায় এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যে (১) প্রাকৃতিক এবং (২) ঐতিহাসিক অংশের প্রথম ভাগ অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ ও পাঠান আমলের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি। ঐতিহাসিক অংশের অপর ভাগ অর্থাৎ বৃহত্তর এবং সমগ্র পুস্তকের সর্ব্বপ্রধান অংশ এই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছি। এক্ষণে খণ্ড-বিবরণী (Statistics) এবং আভিধানিক (Gazetteer) অংশ তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ডের জন্য অবশিষ্ট রহিল। উহাতে জনসংখ্যা (Census Report) সম্বন্ধীয় সারতত্ত্ব, শাসনবিষয়ক তথ্যাবলী, প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবন-কথা এবং অবশিষ্ট কতকগুলি স্থান ও বংশের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল। সে খণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। জীবনে কুলাইবে কিনা এবং সুযোগ জুটিবে কিনা, তাহা শ্রীভগবানই জানেন। বিশেষতঃ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়ের যে আভাস দিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যকালে খাটে নাই, এবার সময় সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই সঙ্গত মনে করিতেছি। তবে তৃতীয় খণ্ডে যে কয়েকজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক এবং কৃতী পুরুষের জীবনবৃত্ত প্রধান বিষয় হইবে, তাহার অধিকাংশ উপাদানই আমার হস্তগত আছে ; আর অবশিষ্ট যাহা সরকারী রিপোর্টের সারাংশ তাহা আমি প্রকাশিত না করিলেও ক্ষতি নাই। বংশবিবরণী সংগ্রহ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা আমি পদে পদে

অনুভব করিয়াছি। রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্কে যে সব বংশের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীয়, তাহা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি; প্রধান প্রধান বংশের ও খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখ 'সমাজ ও আভিজাত্য' শীর্ষক দীর্ঘ পরিচ্ছেদে (৮০৮-৫০ পৃ) দিয়াছি। উহার আর যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, তাহা তৃতীয় খণ্ডে দিবার ইচ্ছা রহিল। বংশবিবরণ পাইবার জন্য আমি বারংবার প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সামাজিকবর্গের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ সাহায্য বা সদুত্তর পাই নাই। আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহার সারাংশ স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে আমার অনিবার্য্য ভুলভ্রান্তির জন্য বারংবার ক্ষমা চাহিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিয়াছি, নিজ নিজ বংশেতিহাসে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞ বা উদাসীন; দুই চারিজন ভুল ধরিতেই ভালবাসেন, ভুল সংশোধন করিতে কিছুমাত্র উদ্যোগী নন; কেহ কেহ বা আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া পরের অখ্যাতি কীর্ত্তনে অধিক সমুৎসুক; যাঁহাদের নিকট পৈতৃক ঘটককারিকাদি পুঁথিপত্র আছে, তাঁহারা কেহ কেহ উহা আমার হস্তে দিতে চান নাই, পাছে আমাদ্বারা তাঁহাদের ব্যবসায় নষ্ট হয়; কিন্তু আমার ভুল যে ভুলই থাকিয়া বহাল রহিবে, লুক্কায়িত পুঁথিতে সে ভুল সারিবার সুযোগ হইবে না, উহা তাঁহারা কখনও মনে করেন নাই। বোধ হয় যে রীতিতে বংশেতিহাস লিখিলে সামাজিকের রুচিকর হয়, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। আশা করি, পরবর্ত্তী খণ্ডের জন্য এ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহলাভে বঞ্চিত হইব না।

বর্ত্তমান খণ্ডে প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের ইতিহাসই প্রধান বিষয়। যাঁহারা দূরে বসিয়া না দেখিয়া ইতিহাস বা উপন্যাস রচনা করেন, এরূপ শ্রমবিমুখ লেখকদিগের হস্তে উভয় বীরপুরুষের কাহিনী নানাভাবে বিকৃত এবং তাঁহাদের চরিত্র অযথা কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই চিত্র এমন ভাবে সাধারণের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছে যে উহা নিরসন করিতে না পারিলে অন্য মত মাথা তুলিতে পারিবে না। এজন্য আমি যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছি, সে প্রমাণ সংগ্রহে কোন প্রকার চেষ্টা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেকালের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' প্রতাপের গৌরবকাহিনী প্রচারের জন্য যেমন সময়োচিত গবেষণার পরিচয় ছিল, তেমনই কতকগুলি ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্যের অবতারণা এবং অমূলক কলঙ্কারোপ দ্বারা বীরচরিত্র কলঙ্কিত করা হইয়াছে;

আধুনিক 'রায়নন্দিনী' নামক উপন্যাসে তাঁহার বা তদ্বংশীয়দিগের চরিত্র অখ্যাত করিবার জন্য সত্যই যেন কেমন অসূয়া এবং কুরুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সে সকল ভ্রান্তি বা সে জাতীয় চেষ্টার অসারতা, আমি যে সত্যোৎঘাটন করিয়াছি, তদ্দ্বারা নিরাকৃত হইবে, আশা করি। ঔপন্যাসিক হইলেই যে নিরঙ্কুশ হইয়া সত্যের অপলাপ করা যায়, এমন কোন কথা নাই।

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস যতই নগণ্য হউক, তাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য আমি সর্ব্বত্রই বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া সময় ও তথ্যের সমন্বয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। জেলার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কোথায়ও দেশের ইতিহাসকে দৃষ্টিছাড়া করি নাই, পুস্তকের আকারবৃদ্ধির ইহাই অন্যতম কারণ। বঙ্গের দুইটি প্রধান্ জেলা আমার গণ্ডীভুক্ত, বঙ্গের বীরপুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দুইজনেরই জীবনকথা আমার গ্রন্থের বিষয়ীভূত। তৎসম্পর্কে যশোহর-খুল্‌নার ইতিবৃত্ত বঙ্গের, এমন কি, ভারতের ইতিহাসের অঙ্গাধীন। সেই সম্বন্ধ-সূত্র স্থাপনের জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গিয়া বিষয়-বিস্তারের হাতে নিস্তার পাই নাই। ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফলে যে সত্য অবিসংবাদিতরূপে স্বতঃই প্রতিভাত হইয়াছে, আমি ঐকান্তিকতার সহিত তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছি। 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ' এ কথা মানিয়া লইয়া চাক্ষুষ পরীক্ষার সঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ বা লিখিত প্রমাণের একত্র সামঞ্জস্য করিয়া বহু গবেষণার পর নিজ মত স্থিতীকৃত করিয়া লইয়াছি। সে মতে যে ভুল থাকিতে পারে না, তাহা আমি বলিতেছি না। যাহা ভুল আছে, তজ্জন্য আমিই অপরাধী। সুধীবর্গ বলবত্তর প্রমাণে উহা প্রদর্শন করিয়া দিলে, অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, না দেখিয়া, না বুঝিয়া বা ভাবিয়া, সত্য পরীক্ষা না করিয়া কোন কথা লিখি নাই। পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থার একত্র সমাহার করিবার সুবিধা পাঠকবর্গের হইবে না, তাহা জানি ; এজন্য নিজের অভিজ্ঞতার ফল ও বিবেকবুদ্ধির স্থির ধারণা তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছি। প্রতাপাদিত্য-অংশ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু তাঁহার কাহিনী বঙ্গেতিহাসের একটি প্রধান অংশ এবং ভারতীয় ইতিহাসের সহিতও উহা দৃঢ় সম্পর্কিত। সুতরাং ভিত্তি পত্তনের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনা

মত থাকিলেই পরিবর্ত্তন হয়, মত পরিবর্ত্তনের জন্য আমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। একমাত্র প্রার্থনা, কেহ দয়া করিয়া ভ্রম দেখাইয়া দিলে তাহা আমি নতশির হইয়া মানিয়া লইব; আমার ভিতর জাতিবিদ্বেষ বা পক্ষপাতিতার অনর্থক কল্পনা করিয়া অযথা গালিবর্ষণ করিলে, তাহাতে শুধু শ্রমক্লান্ত অকিঞ্চন সেবককে মনোকষ্টই দেওয়া হইবে।

যেখানেই কোন গ্রন্থকারের মতামত গ্রহণ বা বিচার করিয়াছি, পাদ-টীকায় স্পষ্টতঃ উহার উল্লেখ আছে। আমি প্রত্যেক্যের নিকট চিরঋণী। এ গ্রন্থ সঙ্কলনে আমি যে কাহার নিকট ঋণী নহি, তাহা বলিতে পারি না। কেহ বিবরণী লিখিয়া পাঠাইয়া, কেহ তথ্যানুসন্ধানে পথ দেখাইয়া, কেহ আমাদিগকে সবান্ধবে রাজোপচারে আতিথ্যসৎকারে আপ্যায়িত করিয়া, কেহ বা আশীর্ব্বাদে ও উৎসাহবাণী দ্বারা মহাপ্রাণতা জানাইয়া, আমাকে সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন কত স্থানে আমার কত প্রিয়তম ছাত্র আমাকে কত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আর কত বলিব? সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ এখানে অসম্ভব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আর যাঁহাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদের কতকের কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন এ খণ্ডের সঙ্গে যাঁহাদের নাম বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যাঁহাদের কথা বাকী আছে বা স্মরণ করিতে পারি, তাঁহাদের কথা বলিয়া এখানে বক্তব্যের উপসংহার করিব। সর্ব্বাগ্রে আমার ঐতিহাসিক গুরুদেব, বিশ্ব-বিশ্রুত প্রত্নতাত্ত্বিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয়ের চরণে প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাকে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্যদান করিয়াছেন; বিশেষতঃ 'বহারিস্তান' প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সন্ধান দিয়া, লুপ্ততথ্যের সমর্থন জন্য আমার সহিত আলোচনা করিয়া, আমাকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন; ভাষায় সে ঋণের পরিশোধও হয় না, করিতেও চাহি না। তিনিই উদ্যোগ করিয়া 'বহারিস্তানে'র একটি প্রামাণিক পৃষ্ঠার ব্লক প্রস্তুত করাইয়া দেন। প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে অগ্রজকল্প রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়, ৺যশোরেশ্বরী দেবীর সেবায়ৎ পরমোৎসাহী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী, বন্ধুবর রাজা গিরীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার সেনগুপ্ত, এবং সীতারাম-প্রসঙ্গে স্বর্গগত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য এবং বিনোদপুর স্কুলের খ্যাতনামা হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার

মজুমদার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সত্যেন্দ্রনাথ দাস, পাবনার উকীল রায় সাহেব তারকনাথ মৈত্রেয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ভূষণা ভ্রমণকালে প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা আমার পথপ্রদর্শক হইয়া ও নানাস্থান হইতে গোসাঁই গোরাচাঁদের 'সংকীর্ত্তন বন্দনা'র প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং বড়গাতি নিবাসী পূজ্যপাদ ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যশোহর-কাহিনী ও নিরক্ষর কবি সম্বন্ধীয় কিছু কিছু তথ্যের সাহায্য করিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্ব বিভাগীয় আর্কিওলজিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুপণ্ডিত ও সহৃদয় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ, মহোদয় আমার সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরিয়া, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা কতকগুলি জটিল তত্ত্বে আলোকপাত করিয়াছেন, এবং আমাকে কয়েকটি রিপোর্ট, ফটো ও মুদ্রার ছাঁচ তুলিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার একান্ত সৌভাগ্যের ফলে বৈদেশিক মনীষিগণও আমার যথেষ্ট উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন ; ইংলণ্ডের ঐতিহাসিককুলগৌরব, 'আকবর নামা' প্রভৃতির খ্যাতনামা অনুবাদক নবতিবর্ষদেশীয় মহামতি হেন্‌রী বিভারিজ্‌ আমাকে যে কি স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহা বলিতে পারি না ; এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড তাঁহার হস্তগত হইবামাত্র তিনি উহা তন্ন তন্ন করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, বারংবার কত সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপিদ্বারা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাকে নানা-ভাবে উপদিষ্ট, উদ্বোধিত ও অনুগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার ঋণ একেবারেই অপরিশোধ্য। তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায় এই খণ্ড তাঁহার হস্তার্পিত করিবার জন্য আমি একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি। অধুনা পরলোকগত আর দুইজন মহাপণ্ডিতের কথাও আমি বলিতে বাধ্য, জগদ্বরেণ্য ঐতিহাসিক ডক্টর ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এবং অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডার্‌সন আমাকে সময় সময় সারগর্ভ মন্তব্য ও অনুগ্রহ লিপি দ্বারা আরব্ধ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। খুল্‌নার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর সদাশয় শ্রীযুক্ত জে, সি, ফ্রেন্স এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি, লিও, ফক্‌নার উভয়ই প্রত্নতত্ত্বরসিক ছিলেন ; উভয়ই আমার পুস্তক ও আমার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়া খুল্‌নার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন এবং সময় সময় উহার ফল আমাকে জানাইয়াছেন ; বিশেষতঃ মহাপ্রাণ ফক্‌নার প্রতাপাদিত্য বিষয়ে 'ক্যালকাটা-রিভিউ' প্রভৃতি পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে প্রকৃষ্ট-ভাবে আমার মতের সমালোচনা ও কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে

গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক, মদীয় ছাত্র ও একান্ত স্নেহের পাত্র, সেনহাটি-নিবাসী শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার সেন, এবং দৌলতপুর-কলেজ লাইব্রেরীতে আমার সহকারী শ্রীমান্ দাশুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে যখন তখন নানাভাবে আমার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উভয়ের কল্যাণ কামনা করিব। আজ এই পুস্তক সমাপন কালে দুইজন যুবকের আকস্মিক অকালমৃত্যুর জন্য মর্ম্মবেদনায় আমার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছে; উভয়েই আমার কর্ম্মের সহায়ক এবং ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন; একজনের কথা প্রথম খণ্ডের পাঠকবৃন্দ জানেন, তিনি স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র যামিনীকান্ত রায় চৌধুরী, অন্যজনও সেই একই বংশীয়, নওয়াপাড়া নিবাসী আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কালীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী; আমি শ্রীভগবানের চরণে উভয়ের পরলোকগত আত্মার শান্তি ও সদ্গতি কামনা করিতেছি।

উপসংহারে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার মর্ম্মে আমি বলিতে চাই, আমি কুলি মজুরের মত দুর্গম সুন্দরবনপ্রদেশের লুপ্ত ইতিহাসের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। আমার সে মজুরদারির ফল আজ প্রকাশিত হইল; কোন প্রত্নতত্ত্ববীর কি সসৈন্যে এ প্রদেশে পাদচারণা করিবেন না?

বেলফুলিয়া, খুলনা
৺লক্ষ্মীপূর্ণিমা
১৮ই আশ্বিন, ১৩২৯ সাল

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস

"বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক্ না কেন,
—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিদ্র, সে সোনারূপা জুটাইতে
পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না ?"

—বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
কবিরঞ্জন, বি এ, এম আর্ এ'এস্,-প্রণীত

২য় খণ্ড

ঐতিহাসিক অংশ,—মোগল ও ইংরাজ-আমল।

[প্রথম সংস্করণ]

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১৩২৯

[মূল্য ৬৲ ছয় টাকা মাত্র

[প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি]

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাঙলার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ড অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমান খণ্ডে আলোচিত বিষয়ের ব্যাপ্তিকাল মোগল ও ইংরাজ আমল। এই পর্ব্বদ্বয়ে যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে বঙ্গদেশ এমন কি ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। অধিকন্তু, যে ইতিহাস-দর্শনে প্রবুদ্ধ হইয়া ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র এই সীমিত অঞ্চলের ইতিবৃত্তকে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে অনাগত কালের নবতর ইতিহাস-চেতনাসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের নিকট অন্যতম মূল উপাদান হিসাবে এই গ্রন্থ গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা অসমীচীন নহে।

'রাজার ইতিহাস শুধু দেশ-শাসনের ইতিহাস—দেশের বাহ্যাবরণের ইতিহাস। প্রজাই দেশের প্রাণ; সে প্রাণের স্পন্দন ও অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস।' (৫২ পৃ)—ইতিহাসের এই প্রকৃত ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিয়া যেমন সতীশচন্দ্র এই বিরাট গ্রন্থের সূচনা করেন, তেমনি যশোহর-খুল্‌নার প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে মিশিয়া যেন মাটির উপর কান পাতিয়া সে-স্পন্দনের রূপ-রেখা এই রচনার প্রতি পরিচ্ছেদে বিধৃত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অতএব, যুগে যুগে প্রজার 'প্রাণের স্পন্দন' আগামী দিনে যে-ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্যভুক্ত হইবে, তাঁহার নিকট এই প্রত্যন্ত সমতট অঞ্চলে দুর্গম সুন্দরবনপ্রদেশের মানবেতিহাসের বহু উপাদান এই অমূল্য গ্রন্থে সহজলভ্য হইয়া থাকিল।

প্রজার প্রাণের স্পন্দনের অভিব্যক্তি ছাড়াও বর্ত্তমান গ্রন্থ কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরার উপর অবিসম্বাদীরূপে আলোকপাত করিয়াছে। প্রথমতঃ, বঙ্গদেশের রাজবৃত্তে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও রাজা সীতারাম রায় অগ্রগণ্য নায়কদ্বয়; ইঁহাদের সম্পর্কে কিম্বদন্তীর গুরুভার হইতে অগণিত তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে সত্যোদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে তাঁহাদের চরিত্রের সবলতা ও দুর্ব্বলতা সহ প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই তথ্য ও প্রমাণের ব্যাপকতা ও অকাট্যতায় মুগ্ধ হইয়াই স্যর যদুনাথ সরকার 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (মার্চ্চ, ১৯২৩) এই রচনার দীর্ঘ সমালোচনায় বলেন, 'যশোহরের ইতিহাস চিরকালের মত লিখিত হইল।'

দ্বিতীয়তঃ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ-ফিরিঙ্গির আনাগোনা সমগ্র সমতট অঞ্চলে এক মহা উৎপাতরূপে দেখা দেয়। এই উৎপাত কেবলমাত্র লুঠ, অত্যাচার ও যুদ্ধ-বিগ্রহে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহাদের প্রভাব সমতটবাসী-সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে কতদূর বিসর্পিত হইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তারে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের প্রভাবের মন্দের পাল্লা ভারি হইলেও, ভাল দিকগুলিও গ্রন্থকারের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, প্রতাপোত্তর কালে যশোহর-খুল্‌নায় 'প্রতাপময়তা' দৃষ্টির মধ্যে না আনিলে এদেশের মানুষের বা সামাজিক ইতিহাসের অনেক সূত্রই ছিন্ন থাকিয়া যায়। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, বাক্‌লা-সমাজের আশগুহ-বংশীয় সপ্তগ্রামে অবস্থিত সামান্য দরিদ্র মুহুরী রামচন্দ্র গুহ যশোর-রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁহারই পৌত্র বিক্রমাদিত্য যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য বিস্তীর্ণ এলাকা আয়ত্বে আনিয়া মধুমতী হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিশাল রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মগ-ফিরিঙ্গি দস্যুদের পর্যু্যদস্ত করিয়া মোগল বাদশাহের সহিত সম্মুখরণে প্রবৃত্ত হন। পাঠান-মোগল সংঘর্ষ ও তাহার আবর্ত্তে গৌড়ের যে অপরিমিত ধন-সম্পদ বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়, তাহারই বলে যে এমন শক্তিশালী যশোর-রাজ্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থবলে শক্তিশালী রাজ্য গঠন সম্ভব নহে। যশোর-রাজ্যের স্থিতিকাল মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর। সেইজন্য অল্পদিনের মধ্যে এবং অতিদ্রুত বিশাল সৈন্য-বাহিনী ও নৌ-বাহিনী, শক্তিশালী শাসন বিভাগ, ব্যাপক যশোহর-সমাজ, নানাবিধ কর্ম্মযজ্ঞ ও বৃত্তি সংগঠনের উদ্যোগ ও আয়োজন করিতে হইয়াছিল। এই বহুবিস্তৃত কর্ম্মোদ্যমের আওতায় পড়িয়া দক্ষিণবঙ্গের হাজার হাজার মানুষের জীবনে বৃত্তি, পেশা, ও মনোভাবের এক দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। ইহার পরিমাপ করাও গ্রন্থকারের অন্যতম প্রচেষ্টা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, ইতিহাসে দেখা যায়, যে-পর্ব্বে জমি ও লাঙল সমাজের জীবিকা-আহরণের প্রধান উপায় হিসাবে ধীরে ধীরে দেখা দিল, অর্থাৎ উন্নত প্রণালীর কৃষি ও কুটিরশিল্প প্রধান উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইল, সেই পর্ব্বে রাজা ও প্রজা সম্পর্ক অর্থাৎ রাজতন্ত্রের আবির্ভাব। রাজতন্ত্র অবশ্য ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে সর্ব্বত্র একই সঙ্গে অথবা একই রূপে দেখা দেয় নাই। অদ্যাবধি ইতিহাসে যতটুকু

সাক্ষ্য-প্রমাণ বা ইঙ্গিত মিলিয়াছে, তাহাতে মৌর্য্য আমলের কিছু পূর্ব্ব হইতে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে এই প্রক্রিয়ার শুরু বলিয়া অনুমিত হয়। একদিকে কৌমতন্ত্র ও কৌম চেতনা বা সত্তা, অন্যদিকে রাজতন্ত্র ও তাহার অনুগামী সামন্ততন্ত্র—এই দুইয়ের সংঘর্ষ এবং আদান-প্রদান প্রত্যন্ত বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল ব্যাপী চলিতে থাকে। এমন অনুমান অসিদ্ধ হইবে না যে, এই দুইয়ের সংঘর্ষে ও মিলনে, গ্রহণ ও বর্জ্জনে বঙ্গদেশে অগুণতি ছোট ছোট রাজা এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতের সহবাস ঘটে।

রাজতন্ত্রের ভিত্তি উন্নততর অর্থনীতি বা উন্নততর কৃষি ও শিল্পপদ্ধতি হইলেও জনপদের কৌম-সত্তাকে তাহা সহজে গ্রাস করিতে পারে নাই। ইহাদের সংঘর্ষ-মিলন কাল এমন ভাবে দীর্ঘায়ত হইবার মূলতঃ দ্বিবিধ কারণ নির্দ্দিষ্ট করা যায়। (১) পূর্ব্বাঞ্চলের জনপদগুলিতে তদানীন্তন লোকসংখ্যার তুলনায় ছিল অপরিমিত প্রান্তর, অনাবাদী জমি ও বন। (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেও নামমাত্র পেশ্‌কশে সীতারাম যে সনদ পান তাহার নাম ছিল, 'আবাদী সনদ') জমির প্রাচুর্য্যের ব্যাপারে প্রধান সহায়ক হইয়াছিল বঙ্গদেশের নদনদীর অসাধারণ দ্রুত ভূমি-গঠন ক্ষমতা। রাজতন্ত্র বিশেষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইলেই কৌমগোষ্টির সহজতর পথ ও পন্থা ছিল দূরদূরান্তে অপসরণ করিয়া নূতন আবাদ ও জনপদ সৃষ্টি করা। (২) অগুণতি নদী-নালার দেশে সহসা বন্যা, প্লাবন ও অনাবৃষ্টির ফলে, বরাবরই কৃষিকার্য্য ছিল মূলতঃ যৌথ প্রচেষ্টার উপর একান্ত নির্ভরশীল। খাল কাটাও যেমন এককভাবে সম্ভব নহে, নদীর বাঁধ রচনা বা রক্ষা করাও একজনের পক্ষে সম্ভব হইত না। অসংখ্য বন্যজন্তুর বিরুদ্ধে সংগ্রামও একই পর্য্যায়ভুক্ত। এমন পরিপ্রেক্ষিতে জনপদের কৌম-সত্তাকে নির্ম্মূল করা যে দুরূহ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি! এমন কি, আধুনিক যুগেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে খুল্‌না জেলার দক্ষিণে দুরধিগম্য আবাদ অঞ্চলে এই কৌম-চেতনা কি প্রবল ভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। যৌথ-চাষ প্রথা না থাকিলেও সুন্দরবনের নৈকট্য এবং নদীর বাঁধের যৌথ-দায়িত্ব এই সত্তাকে এই অঞ্চলে এমন দীর্ঘজীবী করিয়াছে।

প্রধানতঃ এই কারণগুলির জন্যই বঙ্গদেশে ছোট ছোট এলাকায় কৌম-চেতনা সম্পন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েতের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া অসংখ্য ছোট ছোট রাজার আবির্ভাব ঘটে। 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসে' প্রতি ধাপে বা আমলে

ইহাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং হিসাব দিবার চেষ্টা হইয়াছে। 'তুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এইরূপ এক এক রাজচক্রবর্ত্তী জাগিয়া উঠিত। রাজবাড়ী ও রাজপাটে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল ' (১ম খণ্ড, ২০৪ পৃ)। মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের আধিপত্য যে হয় নাই, তাহা নহে। সাধারণ লোকের কিন্তু আনুগত্য ছিল এই ছোট ছোট রাজার প্রতি। অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়—'দেশের বা প্রান্তের রাজা বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরাগত ধ্বনি মাত্র' (বাঙালীর ইতিহাস, ৮৩২ পৃ)। এই সকল ক্ষুদ্র রাজাদের নিজস্ব দুর্গ, শাসন ও সৈন্য থাকিত। গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিব উপর নির্ভর করিয়াই ইহাদের শাসন চলিত। ইহার সহিত ইয়োরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভেদ লক্ষণীয় এবং অনুসন্ধিৎসার বিষয়। মোগল আমলের প্রাক্কালে যে বার-ভুঞার আবির্ভাব, তাহারও সূত্রপাত দেশের এই পটভূমিতে। নামে বারভুঞা কিন্তু 'এইরূপ কত ভুঞা যে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার খোঁজ রাখিত না' (২য় খণ্ড, ২২ পৃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা সীতারাম রায়ের আবির্ভাবও একই কারণপ্রসূত। মহাশক্তিধর মোগল বাদশাহরাও 'ফৌজদারী' শাসনের মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষদিকে দূর দূর প্রান্তে তাহাও শ্লথ হইয়া আসে। কৌম-চেতনায় আবদ্ধ ছোট ছোট রাজা ও গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই সামান্য ইতর-বিশেষ পরিবর্ত্তনে বঙ্গদেশে বাঁচিয়া ছিল একটানা প্রায় তুই হাজার বৎসর। অবশেষে ইংরাজ আসিয়া উন্নততর অর্থনীতি বা উন্নততর পণ্যোৎপাদন ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এই দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থায় ভাঙন ধরাইল। ইংরাজ আসিয়া কেমন করিয়া ছোট ছোট রাজাদের পুতুল-রাজা বানাইল এবং নব্য জমিদারকুলের আবির্ভাব ঘটাইল, তাহার ইতিবৃত্ত অদ্যাবধি পূর্ণ উদ্ধার হয় নাই। 'যশোহর খুল্‌নার ইতিহাস' এই ইতিবৃত্তের যে অন্যতম এবং প্রধান উপাদানগ্রন্থ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। ইহা স্মরণীয় যে, যশোহরই ইংরাজ-শাসনের সর্ব্বপ্রথম জেলা এবং খুল্‌নাই সর্ব্বপ্রথম মহকুমা।

পঞ্চমতঃ, নীল-বিদ্রোহ আধুনিককালের ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। এই খণ্ডের নীলচাষ ও নীল-বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। নীল-বিদ্রোহের নেতা ও পরিচালকদের জীবনী এবং দ্বিতীয় নীল-বিদ্রোহের কাহিনীর বহু নূতন উপাদান ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, সর্ব্বস্তরের উন্নত ও অনুন্নত সমাজের বিস্তৃত আলোচনা যেন অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গে জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। যশোহর-খুল্না নদীমাতৃক দেশ, 'নদীই এদেশের উন্নতির মূলীভূত'। সমাজ বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, যমুনা-ইচ্ছামতী, কপোতাক্ষী, ভৈরব, নবগঙ্গা-চিত্রা এবং মধুমতী—এই পাঁচটি নদীর ধারাই এই অঞ্চলের প্রতিভার বিকাশপথ। বঙ্গদেশে সভ্যতা বিকাশের ধারা নদীর ধারার সঙ্গে কতদূর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেদিকে ইহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে।

সপ্তমতঃ, কোন অঞ্চলের নিরক্ষর কবিদের প্রসঙ্গে এমন সুদীর্ঘ আলোচনা কদাচিৎ দেখা যায়। 'প্রজার প্রাণের স্পন্দনে' যে ঐতিহাসিক অণুপ্রাণিত, তাঁহারই উপযুক্ত অভিব্যক্তিতে এই শেষ পরিচ্ছদের মুখবন্ধ—'মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি যাঁহারা আমার দেশের মুখোজ্জ্বলকারী, তাঁহাদের গুণগ্রামের কথা স্থগিত রাখিয়াও আমি এই সকল স্বল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর কবির নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী চিরস্থায়িনী করিতে প্রয়াসী। আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক ইতিহাসের সঙ্কলয়িতা ইহাদের নাম বিস্মৃত হইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে পারেন।' ভবিষ্যতে মানবপ্রেমিক প্রাদেশিক ইতিহাস রচয়িতার নিকট এই উক্তি আলোকবর্ত্তিকা হইয়া থাকিবে।

আরেকটি দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই ক্ষুদ্র ভূমিকা শেষ করা যাইতে পারে। সমতটের ইতিহাসের উপরোক্ত প্রধান বিষয়গুলি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে অধিবাসীগণের প্রাত্যহিক জীবন ও সমাজ বিষয়ক এত অসংখ্য প্রশ্নের ঐতিহাসিক আলোচনা আছে যে এই রচনাকে জ্ঞান-কোষ বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদেশের ইতিহাস-সাহিত্যে 'যশোহর-খুল্নার ইতিহাস' একখানি মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে সর্ব্বজন সমাদৃত। অতএব অপরিবর্ত্তিতরূপেই ইহা উত্তরসূরীদের নিকট উপস্থিত করিবার গুরু-দায়িত্ব আছে। এই কথা স্মরণে রাখিয়া মূলগ্রন্থের কোথাও কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। যাহা কিছু নূতন বিষয় বা তথ্য সন্নিবেশের আবশ্যক হইয়াছে, তাহা মাত্র পাদটীকায় তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সম্পাদকের নামাঙ্কিত করিয়া উপস্থিত করা হইল।

প্রথম সংস্করণে বহু উল্লেখিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' বা 'শ্রীযুক্ত' শব্দের অধিক প্রয়োগ ছিল। আধুনিক রীতি অনুযায়ী ইতিহাসে উল্লেখিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য এইরূপ সম্মান জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার বাহুল্য বলিয়াই স্বীকৃত। অতএব বর্ত্তমান সংস্করণে সম্ভাব্য স্থানগুলিতে উহা বর্জ্জন করা হইয়াছে। তবে কতকগুলি স্থানে অন্যভাবে সন-তারিখের নির্দ্দেশ না থাকাতে 'শ্রী' বা '৺' চিহ্ন কতক পরিমাণে জীবিতকাল ইঙ্গিত করে বলিয়া উহা রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, গ্রন্থকারের ব্যক্ত ইচ্ছানুযায়ী প্রথম খণ্ডের মত বর্ত্তমান খণ্ডেও কয়েকটি ক্রিয়াপদের সম্মানসূচক রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

পরিচ্ছেদের সংখ্যায় বর্ত্তমান সংস্করণে কিছু তারতম্য দৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ, প্রথম সংস্করণে প্রতাপাদিত্য এবং সীতারামের ইতিবৃত্তের পর পুস্তকের মধ্যস্থলে উক্ত বিষয়দ্বয়ের 'পরিশিষ্ট' নামে একটি করিয়া অংশ সন্নিবিষ্ট ছিল। পূর্ব্বোক্ত মত মূলে কোনও পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবলমাত্র তিনটি পরিচ্ছেদ আখ্যা দিয়া যথাস্থানেই উক্ত পরিশিষ্টদ্বয় সংস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের শেষাংশে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাকে যথাস্থানে রাখিয়াই কেবলমাত্র ভিন্ন একটি পরিচ্ছেদের আকারে উপস্থিত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের সম্পাদনা সম্পর্কে পরমশ্রদ্ধেয় স্যর যদুনাথ সরকার মহোদয়ের উপদেশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী প্রতাপাদিত্য বিষয়ক আলোচনায় প্রয়োজনীয় তথ্য পাদটীকায় সংযোজিত হইল এবং এই বিষয়ে তাঁহারই রচিত তিনটি প্রবন্ধ পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। এই প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতির জন্য 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট চির বাধিত রহিলাম।

বর্ত্তমান গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠের পর ঐতিহাসিক মহামতি বিভারিজ সাহেব একটি মাত্র ত্রুটির কথা গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহাতে উইলিয়াম কেরীর বিষয় উল্লেখিত হওয়া উচিৎ ছিল। খুলনার সহিত সামান্য কিছুদিনের জন্য হইলেও কেরী সাহেবের যোগাযোগ ঘটে বলিয়াই বিষয়টি বিভারিজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান সংস্করণের শেষ পরিচ্ছেদে পাদটীকায় কেরী সাহেবের খুলনার সহিত সংশ্লিষ্ট বৃত্তান্তটি সংযোজিত হইল।

প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডে যাহা কিছু প্রমাণস্বরূপ উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদয়ই পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা হইয়াছে; এবং উদ্ধৃত অংশের

পত্র-সংখ্যার মুদ্রণ-প্রমাদগুলিও সংস্কার করা হইয়াছে। একমাত্র পুরাতন কারিকা এবং আদি দানপত্রগুলির দুষ্প্রাপ্যতা হেতু পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

চিত্রগুলি সম্পর্কে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। মূল ছবি বা ব্লকগুলি না থাকায় পুস্তকের পূর্ব সংস্করণে মুদ্রিত চিত্র হইতেই পুনরায় ব্লক করিতে হইয়াছে। ফলে বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও কিছু ছবি আশানুরূপ হয় নাই। তেমন ছবিগুলির সাহায্যে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অসুবিধা হইলেও সাধারণ পাঠকের সামনে ইহা অস্পষ্ট আভাষে অতীতের অবয়ব তুলিয়া ধরিতে কতক পরিমাণে সাহায্য করে। তাহারও মূল্য কম নহে মনে করিয়া সেগুলি বর্জ্জন করা হয় নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নূতন ছবিও সংযুক্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্টে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার রচনাপঞ্জী সংযোজিত হইল। গ্রন্থকার 'মিত্রবংশ মঙ্গল' নামক পাণ্ডুলিপিতে আপন বংশের কারিকা ও ঘটনা পরম্পরা সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নানা বিপর্য্যয় ও দেশ-বিভাগ-জনিত ঘূর্ণাবর্ত্তেও এই পাণ্ডুলিপিখানি রক্ষা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রধানতঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই সতীশচন্দ্রের জীবনী রচিত। সতীশচন্দ্রের হস্তাক্ষরের নিদর্শনস্বরূপ এই পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপিও প্রদত্ত হইল।

প্রথম সংস্করণের সূচীপত্রে এক-একটি পরিচ্ছেদের সহিত উহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমিক আলোচনার একটি সুদীর্ঘ তালিকা সন্নিবিষ্ট ছিল। পরিচ্ছেদগুলির মোট পত্রাঙ্কের নির্দ্দেশ থাকিলেও অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের তালিকা-গুলিতে পৃথক পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ ছিল না। তাহা দিতে গেলে সূচীপত্র অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সেইজন্য এই দীর্ঘ তালিকার বিষয়গুলি সূচীপত্রে না রাখিয়া এইবার নির্ঘণ্টে পৃষ্ঠাঙ্কসহ সংযুক্ত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে নির্ঘণ্ট বহু বিস্তারিত করা হইয়াছে। শুধু ব্যক্তি ও স্থানের নাম নহে, বিষয়ের নামও নির্ঘণ্টে যথাবশ্যক সংযোজিত হইয়াছে। কোন নাম বা বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য নাম, স্থান বা বিষয়ের অবতারণা করিয়া পত্রাঙ্ক উল্লেখিত আছে। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে এত অসংখ্য ব্যক্তি ও স্থানের নাম ভিড় করিয়াছে যে, শুধুমাত্র তাহার তালিকাই একখানি পুস্তকে পরিণত হইতে পারে। এতৎসত্ত্বেও আশা করি, কোন প্রধান ব্যক্তি, স্থান ও বিষয়ের নাম প্রদত্ত নির্ঘণ্টে বাদ পড়ে নাই এবং কোন বিষয়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোচনাও এইবার নির্ঘণ্টের সাহায্যে সহজলভ্য হইবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনের কাজে কতজনে যে কতভাবে আমাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পুণ্যশ্লোক সতীশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ সুধীজনের সংখ্যা আজও অসংখ্য। তাঁহাদের সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ পুনরায় সকলের নিকট উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। তাহা না হইলে আমার পক্ষে ইহা প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হইত না।

প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্য প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণকালে যাঁহাদের কাছে অপরিশোধ্যভাবে ঋণী হইয়াছিলাম, এইবারও তাঁহাদের কাছে আমার ঋণের বোঝা দ্বিগুণতব হইয়া রহিল।

সম্পাদনা কেন, সর্ব্বব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায় আমাকে যে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। অগণিত বৃক্ষের মেলায় বনানীকে দেখিবার এমন দৃষ্টি অতি কম শিক্ষকের নিকট পাওয়া যায়। সেইজন্যই হয়ত তাঁহার নিকট এমনভাবে ঋণী হইয়া পড়িয়াছি।

সম্পাদনার কাজে আমার কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গত দুই বৎসর অনুরোধ ও উপরোধের পাল্লা ক্রমেই ভারাক্রান্ত করিয়া আমার সহকর্ম্মীদের যে কিরূপ বিব্রত করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চির-বাধিত হইয়া রহিলাম। বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় এবং অনুজোপম সহকর্ম্মী শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্য্যের নিকট আমার ঋণ অপরিসীম।

নাভানা প্রকাশনের অন্যতম কর্ণধার কবি বিরাম মুখোপাধ্যায় এই ইতিহাস মুদ্রণের কাজে হাত দিয়া ইহার প্রতি পরিচ্ছেদের সঙ্গে যে-ভাবে একাত্ম হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বারম্বার মনে হইয়াছে—কবিমনের অন্তরালে মানব-প্রীতির ধারা না থাকিলে মানবেতিহাসের স্বাক্ষরকে এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত করিবার অনুপ্রেরণা তাঁহার আসিত না। ইহার ফলে তিনি আমার দায়িত্ব যে কতভাবে লাঘব করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। এবং তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
১৪ এপ্রিল, ১৯৬৫
১ বৈশাখ, ১৩৭২

শিবশঙ্কর মিত্র

সূচীপত্র

প্রথম অংশ

ঐতিহাসিক

১. মোগল আমল

পরিচ্ছেদ		পৃষ্ঠাঙ্ক
১	উপক্রমণিকা	৩
২	পাঠান রাজত্বের শেষ	১০
৩	বঙ্গে বারভুঞা	১৯
৪	প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের উপাদান	৪৮
৫	পিতৃ-পরিচয়	৫৯
৬	পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয়	৬৫
৭	যশোর-রাজ্য	৭৩
৮	বসন্ত রায়	৮২
৯	যশোহর-সমাজ	৯৩
১০	গোবিন্দদাস	১০২
১১	বংশ-কথা	১০৭
১২	প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন	১১৬
১৩	আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র	১২৩
১৪	প্রতাপের রাজ্যলাভ	১২৯
১৫	যশোরেশ্বরী	১৩৫
১৬	প্রতাপাদিত্যের রাজধানী	১৪৮
১৭	প্রতাপের আয়োজন	১৬৬
১৮	মগ ও ফিরিঙ্গি	১৭২
১৯	প্রতাপের দুর্গ-সংস্থান	১৯২
২০	নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা	২১২
২১	লোক-নির্ব্বাচন	২২৪
২২	সৈন্যগঠন	২৩৩

পরিচ্ছেদ		পৃষ্ঠাঙ্ক
২৩	প্রতাপের রাজত্ব	২৪১
২৪	উড়িষ্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	২৫৩
২৫	বসন্ত রায়ের হত্যা	২৭৪
২৬	সন্ধি-বিগ্রহ	২৮২
২৭	খৃষ্টান পাদ্রীগণ	২৯৩
২৮	কার্ভালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম	৩০৩
২৯	রামচন্দ্রের বিবাহ	৩২১
৩০	প্রথম মোগল সংঘর্ষ : মানসিংহ	৩৩২
৩১	মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি	৩৫৫
৩২	দ্বিতীয় মোগল সংঘর্ষ : ইস্‌লাম খাঁ	৩৭১
৩৩	শেষ যুদ্ধ ও পতন প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত সময়ের নির্ঘণ্ট ৪০৮	৩৮১
৩৪	প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি বংশ কৃষ্ণনগর রাজবংশ ৪১০, বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীবংশ ৪১৩, শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বংশ ৪১৭, কালিদাস রায় চৌধুরী ৪১৯, বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী ৪২৫, রঘুনাথ রায় ৪২৮; সবাই ঢালি ও সুন্দর মল্ল ৪৩১	৪১০
৩৫	যশোহর-রাজবংশ	৪৩৫
৩৬	যশোহরের ফৌজদারগণ	৪৫৪
৩৭	নলডাঙ্গা রাজবংশ	৪৭০
৩৮	চাঁচড়া রাজবংশ	৪৮৭
৩৯	সৈদপুর জমিদারী	৫১২
৪০	রাজা সীতারাম রায়	৫২১
৪১	সীতারাম : বাল্যজীবন ও জমিদারী	৫৩৪
৪২	সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী	৫৪৮
৪৩	সীতারাম : রাজত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণতা	৫৭৩
৪৪	সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন	৫৮৭
৪৫	সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীর্ত্তির পরিণাম সীতারামের পরিবারবর্গ ৬১০; নাটোর রাজবংশ ও সীতারামের রাজ্য ৬১৬, সীতারামের কীর্ত্তিলোপ ৬২২	৬১০

পরিচ্ছেদ		পৃষ্ঠাঙ্ক
৪৬	সীতারাম সম্পর্কিত কয়েকটি বংশ	৬২৬
	সীতারামের গুরুবংশ ৬২৬ ; সেনাপতি মেনাহাতী ৬৩১ ; উকিল মুনিরাম রায় ৬৩৩ , দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার ৬৩৬ , মুন্সী বলরাম দাস ৬৩৭	
৪৭	প্রাক্-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ	৬৪০
	সত্রাজিৎপুরের সিংহবংশ ৬৪০ , ইত্না‌র রায়বংশ ৬৪৪ ; রায়ের-কাটির রাজবংশ ৬৪৬ , কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরী বংশ ৬৫৬ , মূলঘরের বৈদ্যচৌধুরী জমিদার বংশ ৬৬২ ; বোধখানার চৌধুরী বংশ ৬৬৮ (ক. বোধখানার শাখা ৬৭৮ , খ. গঙ্গানন্দপুরের শাখা ৬৮০ , গ. নওয়াপাড়ার শাখা ৬৮১ , ঘ. রাড়লী শাখা ৬৮৪)	

দ্বি তী য় অং শ

ঐতিহাসিক

২. ইংরাজ আমল

১	বৃটিশ-শাসন ও হেঙ্কেলের কীর্ত্তি	৬৯৩
২	যশোহর-খুলনা : গঠন ও বিস্তৃতি	৭০২
৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	৭০৮
৪	ভূসম্পত্তির স্বত্ব-বিভাগ	৭১৫
৫	নড়াইল জমিদার বংশ	৭১৯
৬	নব্য জমিদারগণ	৭৩২
	সাতক্ষীরা জমিদার বংশ ৭৩২	
	১. হোগলা পরগণা ৭৩৪ ; লখ্পুরের কাশ্যপ চৌধুরী বংশ ৭৩৪ , পীলজঙ্গের বসুচৌধুরী ৭৩৭ , ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ ৭৩৮ , রামনগরের ঘোষ চৌধুরী বংশ ৭৩৯ , রেণী সাহেব ৭৪০	
	২. সুলতানপুর-খড়রিয়া পরগণা ৭৪২ , নলধার ভঞ্জচৌধুরীগণ ৭৪৩ ; হাটখোলার দত্তচৌধুরী বংশ ৭৪৪	
	৩. বেলফুলিয়া পরগণা ৭৪৬ , বেলফুলিয়ার বসু-চৌধুরী বংশ ৭৪৬ ; মৌভোগের দত্তচৌধুরী বংশ ৭৪৯	

পরিচ্ছেদ | পৃষ্ঠাঙ্ক

৪. চিরুলিয়া, মধুদিয়া ও রাঙ্গদিয়া ৭৫১, গোবরডাঙ্গার জমিদারগণ ৭৫১

৭ বাণিজ্য—তুলা, চিনি ও নীল ৭৫২

৮ নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৬৬

৯ রেণী ও মরেল-কাহিনী ৭৯৮

রেণী সাহেব ৭৯৮, মরেল সাহেব ৮০১

১০ সমাজ ও আভিজাত্য ৮০৮

ব্রাহ্মণ সমাজ ৮১০, বৈদ্য-বংশ ৮১৫ (শক্তি গোত্র ৮১৬, ধন্বন্তরি গোত্র ৮১৭, মৌদ্‌গল্য গোত্র ৮২০, কাশ্যপ গোত্র ৮২১), কায়স্থ-সমাজ ৮২২ (বঙ্গজ কায়স্থ ৮২২, দক্ষিণরাঢীয় সমাজ ৮২৫), নবশাখ সম্প্রদায় ৮৩৩, বৈশ্য-বারুজীবী ৮৩৪, সুবর্ণ বণিক ৮৩৬, যোগি জাতি ৮৩৮; কৈবর্ত্ত জাতি ৮৩৯, অনুন্নত অন্য জাতি ৮৪১, মুসলমান সমাজ ৮৪৫ (আশ্‌রাফ সম্প্রদায় ৮৪৬, আত্‌রাফ সম্প্রদায় ৮৪৯, পীরালি মুসলমান ৮৫০)

১১ শিল্প ও স্থাপত্য ৮৫১

মন্দির ৮৬১, মস্‌জিদ্‌, ইমামবারা ও দরগা ৮৬৭

১২ সাহিত্য ৮৬৯

লোক-সাহিত্য ৮৭২, কথকতা ৮৭৩, পাঁচালী ৮৭৩, সারিগীত ও ভাটিয়াল গান ৮৭৫, 'গুরুসত্য'-গীত ৮৭৬, 'বার'-সঙ্গীত, অষ্টক ও চড়ক সঙ্গীত ৮৭৬, গাজীর গীত, মানিকপীরের ছড়া ৮৭৭, কবি ও বাউল সঙ্গীত ৮৭৮; জারী গীত ৮৮০

প রি শি ষ্ট ৮৮৩

ক. ১ প্রতাপাদিত্যের পতন—স্যর যদুনাথ সরকার ৮৮৫

২ প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্‌রী—স্যর যদুনাথ সরকার ৯০০

৩ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ—স্যর যদুনাথ সরকার ৯০৮

খ. সতীশচন্দ্র মিত্র : জীবনী ও রচনাপঞ্জী—শিবশঙ্কর মিত্র ৯১৩

নি র্ঘ ণ্ট ৯৩৩

চিত্রসূচী

সতীশচন্দ্র মিত্র (আঃ ১৯১৪) আখ্যাপত্র

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র চার

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি ষোল

ডামরেলীর মন্দির ৪৮

প্রাচীন মুদ্রা ৪৯

১, ২ ক-খ, ৩ ক-খ: প্রাচীন হিন্দু-আমলের কার্ষাপণ (কাহন) বা অঙ্কচিহ্নযুক্ত (Punch-marked) রৌপ্যমুদ্রা, প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠ হইতে সংগৃহীত

৪ ক-খ: হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রৌপ্যমুদ্রা, ৯২৫ হিজরী

৫ ক-খ: সুলেমান কররানীর পুত্র দায়ুদ শাহের রৌপ্যমুদ্রা, ঈশ্বরীপুরে সংগৃহীত, ক পৃষ্ঠার নিম্নে নাগরী অক্ষরে 'শ্রীদাউদশাহী' লিখিত আছে

৬ ক-খ: দায়ুদ শাহের মুদ্রা, যশোহর-বারবাজার হইতে সংগৃহীত; ৯৮১ হিজরী

ত্রিকোণ-মন্দির, চণ্ডভৈরব ৬৪

মহামতি বিভারিজ্ ৬৫

হামামখানা ৮০

টেঙ্গা মস্‌জিদ ৮১

চকশ্রী মস্‌জিদ ৯৬

চাক্‌শিরি ৯৭

গোবিন্দদেব বিগ্রহ ১১২

গোবিন্দ-মন্দির, কাটুনিয়া ১১৩

যশোরেশ্বরী মন্দির ১১৩

রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় ১২৮

মহেন্দ্রনাথ গুহ্‌দেদার ১২৮

জটার দেউল ১২৯

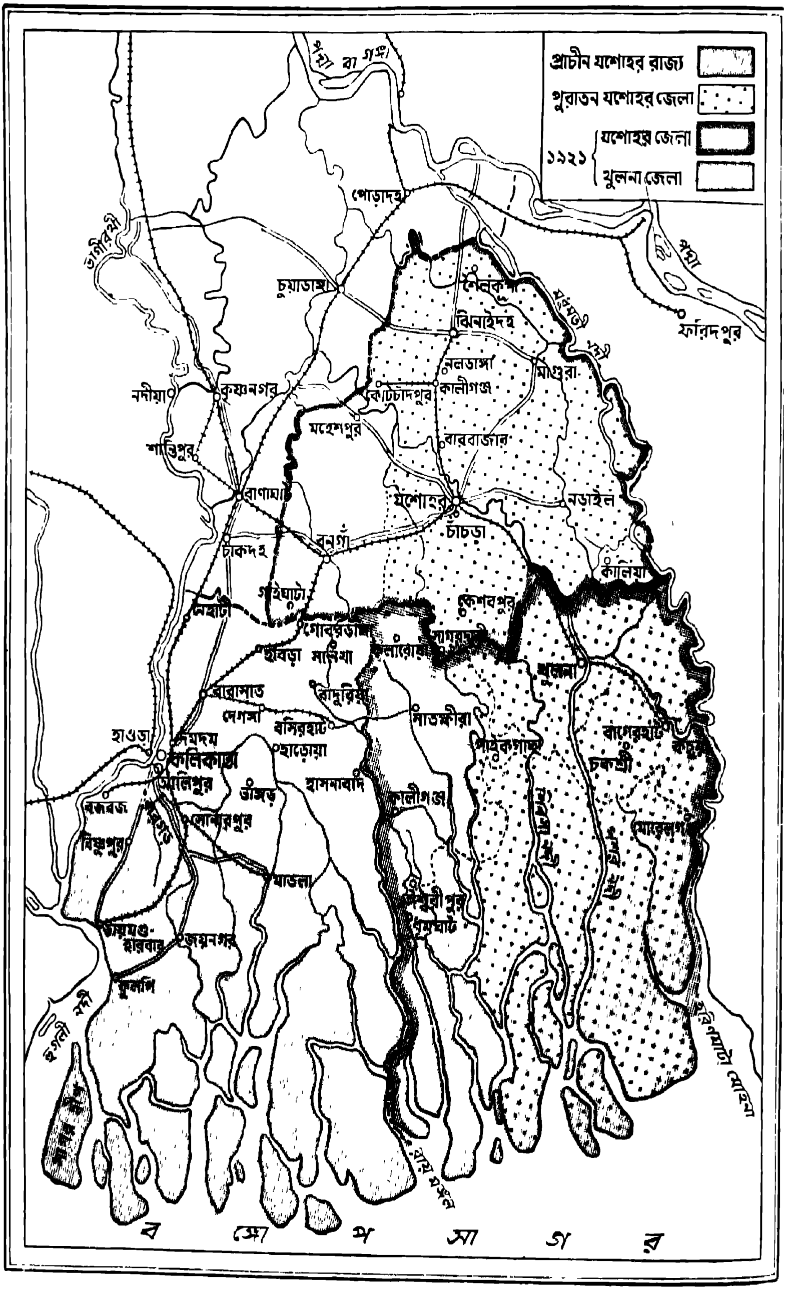
সন্দ্বীপের মস্‌জিদ	১২৯
বুরুজখানা, ধুমঘাট	১৯২
ধুমঘাট দুর্গ	১৯৩
শিবসাদুর্গ	২০৮
জাহাজঘাটার ভগ্ন অট্টালিকা	২০৯
ঢাকাই পলওয়ার	২১৫
পাতিল নৌকা	২১৮
জাহাজঘাটার ভগ্নগৃহের নক্সা	২২০
দুধলি ডক্	২২২
চণ্ডভৈরব, ঈশ্বরীপুর	২৪০
প্রতাপনগরের গড়	২৪০
পরবাজপুরের মস্‌জিদ	২৪১
বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা স্থান	২৪১
মীর্জানগরের কামান	২৫৬
হিজলীর মসনদ্ আলি মস্‌জিদ্	২৫৭
হিজলীর মসনদ্ আলি মস্‌জিদের শিলালিপি	২৫৭
রাজা মানসিংহ	৩৫৬
প্রতাপের কুকী সৈন্য	৩৫৯
'ঘুরাব' রণতরী	৩৮৪
'বহারিস্তানে'র ৪৭ (খ) পৃ	৩৮৪
ফৌজদারের আবাস বাটি	৩৮৫
চাঁচড়ার শিবমন্দির	৩৮৫
বলিয়া বা ভাউলিয়া জাতীয় নৌকা	৩৮৬
গুঞ্জানগরের মন্দির	৪০০
কানাইনগরের পঞ্চরত্নমন্দির	৪০০
দশমহাবিদ্যার মন্দির, চাঁচড়া	৪০১
মুড়লীর ইমামবারা	৪০১
রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়	৪৮০
নলডাঙ্গা রাজবাটী	৪৮০

অভয়ানগরের বড় মন্দির	৪৮১
ধূলগ্রামের কৃষ্ণ-মন্দির	৪৯৬
দেওয়ানবাটীর তোরণ, ধূলগ্রাম	৪৯৭
মহম্মদ মহ্সীন	৫১২
তেতুলিয়ার মস্জিদ্	৫১৩
সীতারামের বাসগৃহ, মহম্মদপুর	৫২৮
কৃষ্ণজী মন্দির, মহম্মদপুর	৫২৮
রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটী, মহম্মদপুর	৫২৯
লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টকোণ-মন্দির	৫৭৬
সত্রাজিৎপুরের মন্দির	৫৭৬
রামসাগর দীঘি, মহম্মদপুর	৫৭৭
সুখসাগর দীঘি, মহম্মদপুর	৫৭৭
সীতারামের দোলমঞ্চ	৫৯২
গোপালনগরের বুড়াশিব মন্দির	৫৯৩
দশভুজার মন্দির, মহম্মদপুর	৬০৮
রায়গ্রামের জোড়-বাঙ্গালা	৬০৯
পঞ্চরত্ন মন্দির, বনগ্রাম	৬২৪
বাঘুটিয়ার মন্দির	৬২৫
কোদ্লার প্রাচীন মঠ	৬৫৬
শালনগরের জোড়-বাঙ্গালা	৬৫৭
মহেশ্বরপাশার জোড়-বাঙ্গালা	৬৭২
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পৈতৃক বাটী, রাড়লী	৬৭৩
ফাদার লঙ্ সাহেব	৭৮৪
দীনবন্ধু মিত্র	৭৮৪
নীল গাছ	৭৮৪
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ	৭৮৫
মাইকেল মধুসূদন	৮০০
মাইকেলের সমাধিস্তম্ভ	৮০১
মোল্লাহাটির বড়কুঠি	৮১৬

বেণীদম্পতীর সমাধি	৮১৭
লোহাগড়ার জোড়-বাঙ্গালা	৮১৭
কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৮৩২
ব্রজলাল শাস্ত্রী	৮৩৩
মানকুমারী বসু	৮৩৩
সতীশচন্দ্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি	৯১৩

মা ন চি ত্র

প্রাচীন যশোর-রাজ্য ও পুরাতন যশোহর জেলা	প্রারম্ভ পত্র
যশোহর-খুলনার মানচিত্র (১৯২১)	১৪৪
মোগল বাহিনীর গতিপথ ও যশোরের যুদ্ধক্ষেত্র	৩৯৩
মহম্মদপুর দুর্গ	৫৬০


প্রাচীন যশোহর রাজ্য
পুরাতন যশোহর জেলা
১৯২১
যশোহর জেলা
খুলনা জেলা
পদ্মা বা গঙ্গা
পোড়াদহ
ভাগীরথী
চুয়াডাঙ্গা
শৈলকুপা
মধুমতী
পদ্মা
ফরিদপুর
ঝিনাইদহ
নলডাঙ্গা
মাগুরা
কোটচাঁদপুর
কালীগঞ্জ
নদীয়া
কৃষ্ণনগর
মহেশপুর
বারবাজার
শান্তিপুর
রাণাঘাট
যশোহর
নড়াইল
চাঁচড়া
বনগাঁ
চাকদহ
কালিয়া
গাইঘাটা
কেশবপুর
নৈহাটী
গোবরডাঙ্গা
সাগরদাঁড়ী
কলারোয়া
হাবড়া
খুলনা
বারাসাত
সাতক্ষীরা
দেগঙ্গা
বসিরহাট
হাওড়া
দমদম
কলিকাতা
হাড়োয়া
বাগেরহাট
পাইকগাছা
আলিপুর
হাসনাবাদ
কালীগঞ্জ
চকশ্রী
ভাঙ্গড়
বজবজ
সোনারপুর
মোরেলগঞ্জ
বিষ্ণুপুর
মাতলা
ঈশ্বরীপুর
ধূমঘাট
ডায়মণ্ড হারবার
জয়নগর
কুলপি
হুগলী নদী
রায়মঙ্গল
হরিণঘাটা মোহানা
ব ঙ্গো প সা গ র

প্রথম অংশ

ঐতিহাসিক

১. মোগল আমল

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

নদীধারা যেরূপ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমুদ্রগামী হয়, আমাদের আলোচ্য ইতিহাসের ধারাও তেমনি ভারতেতিহাসের অঙ্গীভূত হইতে চলিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এতদঞ্চল সমুদ্রগর্ভে ছিল; হিন্দু-বৌদ্ধযুগে নবোত্থিত ভূভাগে যাহা কিছু কীর্ত্তি-কাহিনী জাগিয়াছিল, সুন্দরবনের সাধারণ প্রকৃতিবশে, উত্থান-পতনের বিচিত্র নিয়মে, তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিকের অধ্যবসায় শুধু বিফলতায় পরিণত করিতেছিল। এমন সময়ে পাঠান জাতি আসিল; মুসলমানের ধর্ম্মমন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যজয় চলিল; সে রাজশক্তির পতাকা ধরিয়া হিন্দুরা আবার আসিয়া কিরূপে এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তাহা আমরা পূর্ব্বখণ্ডে দেখাইয়াছি। হিন্দু-দিগের সাধারণ জাতীয় প্রকৃতিই এই যে, যতক্ষণ তাহাদের ধর্ম্ম বা গার্হস্থ্য-জীবন অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহারা রাজশক্তি বিশেষ বিচার করে না; যতক্ষণ কেহ ধর্ম্ম বা সমাজে হাত না দেয়, ততক্ষণ তাহারা কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করে না। ইসলাম মন্ত্র প্রচারের জন্য যাঁহারা প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা বাস্তবিকই সাধু, পীর পয়গম্বর বা আউলিয়া, ত্যাগী সন্ন্যাসী বা ফকির। ধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি দেখিলে, চরিত্র-মাধুর্য্য দেখিলে, হিন্দুরা যেমন গলিয়া গিয়াছে, "দু'বাহু পসারিয়া" জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল জাতিকে প্রীতির পুষ্পে পূজা করিয়াছে, এমন বুঝি কোন জাতি করে না। আমরা আজিও যেমন গ্রামে গ্রামে সরসীকূলে বা বৃক্ষতলে অসংখ্য পীরদরবেশের পূজা করিয়া থাকি, এমন কি অত্যাচারী প্রচারকের উদ্দেশেও সির্ণী মানসা করিয়া থাকি, এমন কোন্ জাতি করিয়াছে? বিশেষতঃ ঐ সকল সাধুর ধর্ম্ম প্রচারের জন্য একাগ্র সাধনা যতই থাকুক, জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের একটা পরহিতরতি ছিল; দানধর্ম্মে বা জনহিতকর নানাকর্ম্মে তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন বলিয়া হৃদয়গুণে সকলের বরণীয় হইতেন। তাঁহারা যে কোনও সময়ে হিন্দুর ধর্ম্মে বা সমাজের মর্ম্মে আঘাত করিতেন না, তাহা নহে; কোন্ বিজিগীষু পরজাতিই বা সে বিষয়ে সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? কিন্তু মুসলমান প্রচারকের বেলায় ত্যাগীর আচরণ, ফকিরের বেশ এবং দাতার মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে সকল

কথা ভুলিত, এবং ফকিরের পশ্চাতে রাজশক্তির সহায়তার পরিচয় পাইয়া সকলে নত হইয়া থাকিত। পীরের জীবদ্দশায় হয়ত কোন বাদ প্রতিবাদ বা বিসম্বাদের সম্ভাবনা হইত ; কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর দোষের লেশমাত্রও বিলুপ্ত বা বিস্মৃত হইয়া যাইত ; তখন সাধুর সাধুত্বটুকু জাগিয়া উঠিয়া লোক-সমাজে তাঁহার কর্ম্ম বা সমাধি-ক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়া রাখিত। এখনও তাঁহাদের স্মৃতি এবং সাধুত্বের কাহিনীটুকু জাগ্রত রহিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হইতে পারে, কিন্তু পীর-পয়গম্বরের সহিত বিবাদ নাই ; মুসলমান পীরের আস্তানায় সির্ণী মানিয়া হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতেছে। মুসলমানের মসজিদে পাদুকা লইয়া প্রবেশ করিতে শুধু সেবাইত বা রক্ষকের তিরস্কারের ভয় আছে, তাহা নহে ; ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর তাহাতে একটা প্রাণের ভয় উপস্থিত হয়। রোগ বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে, মুসলমানও প্রাণের ভয়ে দেবীর মন্দিরে পূজা মানসিক করিয়া থাকেন। এখনও মাতা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে প্রায় এক-চতুর্থাংশ পূজা মুসলমানের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

এইভাবে পাঠান আমলে কত কাল ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানে কলহ মিটিয়া সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। নূতন আবাদ করা নূতন রাজ্যে হিন্দু ও পাঠান এই দুই জাতি সম্প্রীতির সহিত বসতি করিয়াছিল। এই ভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী অতিবাহিত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেখা গেল, হুসেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ। সমগ্র বঙ্গে সে এক সুবর্ণযুগ ; শুধু যে গৌড়ের লোকে তখন স্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত, তাহা নহে ; সমগ্র বঙ্গের লোক তখন সমৃদ্ধি শান্তির মুখ দেখিয়াছিল ; প্রজাবর্গ সুখে বাস করিত। সে সুখের অনুভূতি তখন যত হউক না হউক, যখন সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যমধ্যে নানা বিপর্য্যয় ও অশান্তি আরব্ধ হইয়াছিল, তখন লোকের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিত এবং 'সে হুসেন শাহের আমল আর নাই' বলিয়া সকলে দুঃখ-প্রকাশ করিত।

কয়েকটি ঘটনায় হুসেনী যুগ বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে গুণের মর্য্যাদা রাখিতেন, শিল্পসাহিত্যের উৎসাহ দিতেন ; বিশেষতঃ তখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে নবীন ধর্ম্মজীবন জাগিয়াছিল, দেশময় এক তীব্র আন্দোলন উঠিয়াছিল, ভক্তির ধারায় ধর্ম্মের ঔদাসীন্য ও জীবনের শুষ্কতা বিলীন হইয়া যাইতেছিল, হুসেন শাহ প্রকৃতপক্ষে সে স্রোতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন নাই। সে স্রোতে তাঁহার প্রধান অমাত্য ও প্রবীণ

কর্ম্মসচিব রূপ-সনাতনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, আরও কত লোককে যে বৈষয়িকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। হুসেন শাহ প্রথম প্রথম স্রোতের গতি না বুঝিয়া বাধা দিবার উপক্রম করিলেও, অবশেষে তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া নূতন বন্যার দর্শকমাত্র হইয়াছিলেন ; তবে তাঁহার সুশাসনের শান্তি এবং দেশময় লোকের সুখসমৃদ্ধি যে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিপোষকই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

যশোহর-খুল্‌না হইতে রাজধানী গৌড় অনেক দূর। গৌড়ে কোন রাজনৈতিক কলহ উপস্থিত হইলে, এ দূরবর্ত্তী দেশের কোণে তাহার কোন সংবাদ পৌঁছিত না। এই জন্যই হুসেনের পুত্র নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া এই যশোহর-খুল্‌নার একপ্রান্তে, বর্ত্তমান বাগেরহাট অঞ্চলে আসিয়া কিছুদিন রাজার মত বাস করিয়াছিলেন এবং এমন কি বাগেরহাট (খালিফাতাবাদ) ও মহম্মদপুর (মহম্মদাবাদ) হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া প্রজাশাসন করিয়াছিলেন।[১] সে সব কথা বিস্তৃতভাবে প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।[২] রাজা সুশাসক বা প্রতাপশালী হইলেই হইল, তিনি হুসেন বা নসরৎ যিনিই হন, প্রজাবর্গ তাহার বিশেষ কোন ইতর-বিশেষ করিত না। মোগল বাদশাহ বাবর তুর্কীভাষায় লিখিত আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে 'যে কেহ সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, সেই সর্ব্বত্র রাজা বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে।'[৩] বিশেষতঃ নানাগুণে হুসেন ও নসরৎ প্রজারঞ্জক হওয়ায় তাঁহাদের সময়ে শান্তি অব্যাহত ছিল। নসরৎ শাহের সময়েই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও ছুটিখাঁর মহাভারত রচিত হয়। এ সময়ে দেশের লোকে রাজ্য বা রাজনীতির বিশেষ ধার ধারিত না, তাহারা যদি কিছু বাহিরের কথা ভাবিত, সে সেই গৌরাঙ্গদেবের নূতন ধর্ম্মের নূতন কথা।

পাঠানদিগের প্রতি হিন্দুদের যাহা কিছু বিরক্তি বা বিদ্বেষ ছিল, তাহা ক্রমে হ্রাস পাইতেছিল। হুসেন ও নসরতের যুগে দেশের শান্তি, প্রজার ধনবৃদ্ধি, গুণের পুরস্কার ও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সৌহৃদ্যের জন্য বিদ্বেষভাব

---

১ Wright, H. N.—*Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta.* Vol. II, Part II, pp. 177-8, Nos. 211-12, 116-19.

২ প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, ৩৭৭ পৃ।

৩ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় খণ্ড (১৩২৪), ২৮৮ পৃ।

একপ্রকার নিঃশেষ হইল। প্রথমতঃ, বহুকালের শাসনের ফলে রাজনৈতিক অবস্থা ও জাতিগত সামান্য পার্থক্যভাব একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিদ্যা ও শরীর চালনা হিন্দুদের একপ্রকার অনভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং থাকিবার মধ্যে ছিল সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবাদ। চৈতন্যদেব ইহারও মীমাংসা করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের সন্নিকটে পীরাল্যাগ্রামের মুসলমানেরা যে ভাবে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব-গ্রন্থে ও ঘটকের পুঁথিতে আছে।[১] ঐ উৎপাতে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া চিরনির্ব্বাসিত হইতেছিলেন। সুতরাং সমাজে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা আবশ্যক। ভক্তের আবির্ভাব ব্যতীত ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত হয় না। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আত্মজীবনে এক মহান্ ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, মানুষের মনের ধন্ধ ঘুচাইয়া দিলেন, গতিমতি ফিরাইয়া দিলেন, তর্কজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তখন লোকের চমক ভাঙ্গিল; লোকে চাহিয়া দেখিল —এক নূতন প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে জাতি-বিদ্বেষ নাই, ভোগাসক্তি শক্তিহীন হইতেছে, ভক্তির পথে মুক্তির পথ সোজা হইয়া গিয়াছে।

মানুষে মানুষে বিদ্বেষের মূলে ধর্ম্মগত পার্থক্যই প্রধান। একটি ধর্ম্ম পাইবামাত্র মানুষ অন্ধের মত ভাবে, তাহার নিজের ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্য ধর্ম্ম নিকৃষ্ট; সে এককই শুধু বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান, অন্যলোকে ভুল বুঝিয়া নরকস্থ হইবে। ধর্ম্ম উপলক্ষ্য মাত্র, অহঙ্কারই এই বিদ্বেষের মূল। এই অহঙ্কারের জন্য মানুষ অন্যকে ঘৃণা করে—শত্রুতার সৃষ্টি করে। দীনতাই এই অহঙ্কার নাশের উপায়—তাই দীনতাই চৈতন্য-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। দীনতা আসিলে তুমি পরকে ঘৃণাবিদ্বেষ করিবে না; উহা হইতে সহিষ্ণুতা আসিবে, তখন তুমি পরের ঘৃণাবিদ্বেষ সহ্য করিবে; ইহা হইতে আসিবে—প্রেম; যখন বিদ্বেষ নাই, পরের বিদ্বেষে বিরক্তি নাই, তখন পরের প্রতি ভালবাসা বা অনুরক্তি আসিবে। দীনতা, সহিষ্ণুতা ও প্রেম—এই ত্রিতন্ত্রীতে বৈষ্ণব মন্ত্র বাজিবে, উহাতে বিশ্ব

১ প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, ৩৩৫ পৃ।

বিজিত হইবে। যতক্ষণ তুমি দীন, ততক্ষণ তুমি নিষ্ক্রিয়; যতক্ষণ তুমি সহিষ্ণু, ততক্ষণও তুমি একপ্রকার নিষ্ক্রিয়; কিন্তু যখন তুমি প্রেমিক, তখন তোমার কার্য্যক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত। সে কার্য্যের বিরাম নাই, পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর মত প্রেমের ধারা দেশ প্লাবিত করিয়া ছুটিতে থাকে। চৈতন্যের ধর্ম্মস্রোতেও এইরূপ শুধু বঙ্গ কেন, ভারতবর্ষের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

বিদ্রোহে দেশকে ছিন্নভিন্ন ও শান্তিশূন্য করে; বিপ্লবে দেশকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়ে। হিন্দু পাঠানে অনেককাল ধরিয়া বিদ্রোহ চলিতেছিল, সে কলহে শান্তি দেশান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য-যুগের ধর্ম্ম-বিপ্লবে যখন জাতিভেদ ও বিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করিল, তখন দেশের অবস্থা ফিরিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃত ভক্তের ধর্ম্ম ও ভক্তির পদার্থ দেখিলে সকলকেই শ্রদ্ধাবান হইতে হয়, তখন বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এইভাবে মুসলমানও হিন্দুর গুণগ্রাহী হইল, দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল।

এমন সময়ে গৌড়ের তক্তে বসিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ। বাল্যজীবনে তিনি হিন্দুর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা ধর্ম্ম-বিপ্লবের আবর্ত্তনে পড়িয়াই হউক, তিনি হিন্দু-মুসলমানে শান্তি, প্রীতি ও সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শাসনকাল বঙ্গের একটি স্মরণীয় যুগ। বঙ্গ তখন স্বাধীন; লোদীদিগের দুর্ব্বল শাসন তখন দিল্লী আগ্রা হইতে বহুদূরে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। বঙ্গে তখন শান্তি সুখ বিরাজিত; হুসেন শাহ যেমন সতর্ক ও বলশালী, তেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনাও বড় কম। শান্তি ও স্বাধীনতার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় প্রজার সমৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন জ্বলিয়া উঠে, রাজধানী গৌড়ের ধনৈশ্বর্য্যও তেমনি হঠাৎ বিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই গৌড়ের পতনের পর কিরূপে যশোরের সমুত্থান হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইবে।

নসরৎ বিলাসী হইলেও সুশাসক ছিলেন। তাঁহারই সময়ে মোগল-কুলতিলক বাবর লোদীদিগকে বিতাড়িত করিয়া পাঠান রাজত্ব করায়ত্ত করেন এবং আগ্রার রাজতক্ত অধিকার করিয়া লন। তিনি বঙ্গের দিকেও তাঁহার প্রবল বাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সুচতুর নসরৎ সামান্য উপঢৌকনে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। অচিরে বাবর ও তৎপরে

নসরৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন বাবরের পুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে এবং নসরতের ভ্রাতা মাহ্‌মুদ গৌড়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষের একটি প্রকৃতি দেখা গিয়াছে যে, যখনই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোনও বহিঃশত্রু এই দেশে প্রবেশ করিয়াছে, সে-ই পূর্ব্বতন শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।[১] আর্য্যদিগের প্রথম আগমন হইতে মোগল আক্রমণ পর্য্যন্ত এই একই ব্যবস্থা চলিয়াছে। মোগল আসিবামাত্র পাঠানের পতন আরম্ভ হইল। তবে উভয় জাতির সংঘর্ষ মিটিতে শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছিল। লোদীগণ আগ্রার সীমা হইতে বিতাড়িত হইবার পরদিন ভারতের সমস্ত পাঠান সম্প্রদায় এক হইয়া গেল এবং পাঠান প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্যবল সংগ্রহ করিতে লাগিল। অবিরত চতুর্দ্দিক হইতে দিল্লী আগ্রার উপর আক্রমণ চলিতেছিল; নবাগত মোগলরাজকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত এই পাঠান বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। লোদী, লোহানী, সুর প্রভৃতি আফগান জাতিরা মোগলবংশ নির্ম্মূল করিবার জন্য সর্ব্বত্র বিপুল ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু বীরত্বে মোগলেরা অতুল, বিপদসঙ্কুল প্রদেশে সহিষ্ণুতায় অজেয়; তাই আফগানেরা তাহাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছিল। বিপর্য্যস্ত পাঠানের দল তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আগ্রা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া, মগধ প্রদেশে আশ্রয় লইতেছিল এবং নানাজাতীয় পাঠান-সংঘর্ষে সেখানে এক ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই আবর্ত্তের মধ্যে বহুজনেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন; কেবল একজন মাত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—তিনি সের খাঁ। মগধে বহু পাঠানদলের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল এবং মোগল যে সকলের শত্রু তাহাও সত্য কথা। কিন্তু মোগল যদি পরাজিত হয়, তখন পাঠানদিগের মধ্যে কে অগ্রণী হইয়া প্রাধান্য স্থাপন করিবে, ইহাই বিষম সমস্যা। যাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পরস্পর কোন মিল নাই, মোগলের সহিত শত্রুতাসূত্রে একদিনে বিভিন্ন পাঠানদলের ঐক্য সাধিত হইতে পারে না। বহুজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমন্বয়

১ Hunter, W. W.—*Orissa* Vol. II, p. 14.

সাধন করা সহজ নহে। একমাত্র সের খাঁ ছলে বলে কূটকৌশলে সকলকে কখনও হস্তগত কখনও পর্য্যুদস্ত করিয়া, ক্রমে বিহার ও বঙ্গদেশ হস্তগত করিয়া লইলেন। অবশেষে তিনি সত্যসম্পর্কবিরহিত হইয়া হুমায়ুনকে আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত ও বিতাড়িত করিলেন এবং সবলে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া সেরশাহ বাদশাহ হইয়া বসিলেন।

সেরশাহের রাজ্যাধিকারের প্রণালী যাহাই হউক, তাঁহার রাজ্যশাসনের প্রণালী সুন্দর ও প্রজারঞ্জনশীল ছিল। সামান্য ছয় বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি দেশে শান্তি, সুন্দর রাজস্ব-ব্যবস্থা ও নানা জনহিতকর কার্য্যের সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এমন কি, এ সব বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসনও তাহার নিকট পরাজিত বলিয়া বোধ হয়।[১] সেরশাহ অসামান্য প্রতিভাবলে দুৰ্দ্ধর্ষ আফগান সর্দ্দারগণকে করতলে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিৰ্জ্জীব বংশধরগণ তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহাদের সময়ে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। এমন কি, হুমায়ুনের পুত্র আকবর দিল্লীশ্বর হইলেও সহজে বঙ্গদেশ অধিকৃত করিতে পারেন নাই। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গবিজয়ের জন্য মোগলের রণরঙ্গ চলিয়াছিল; প্রধান প্রধান সেনাদল সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বমুখে প্রেরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিগণ পাঠানের সহিত কঠোর যুদ্ধে বা অনভ্যস্ত বঙ্গের ব্যাধির উৎপীড়নে জীবনাহুতি দিতেছিলেন। এই সংঘর্ষকালে দক্ষিণবঙ্গের যশোর-রাজ্যের নবাভ্যুদয় হইয়াছিল। এখন আমরা সেই অভ্যুদয় কেন এবং কেমন করিয়া হইল, তাহাই দেখাইব।

১ 'It is impossible to avoid the observation, that no Government—not even the British—has shown so much wisdom as this Pathan.'—Keen; *Turks in India*, p. 42.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠান রাজত্বের শেষ

সেরশাহ অসীম প্রতিভাবলে যে দুর্দ্দান্ত পাঠান আমীরগণকে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত বশীভূত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নির্জ্জীব বংশধরদিগের মধ্যে অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। তৎপুত্র ইসলাম শাহের আট বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল এক প্রকার এই আফগানগণের বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সেরশাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সুলেমান খাঁ কররাণী মগধের ও মহম্মদ খাঁ সুর বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন (১৫৪৫)।[১] তাঁহারা তত্তৎপ্রদেশে একপ্রকার স্বাধীন ভাবেই ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন।

লোদী, কররাণী, ও সুর প্রভৃতি বংশীয়গণ আফগানদিগেরই বিভিন্ন শাখা।[২] এজন্য সুর-বংশীয়দিগের রাজত্বকালে কররাণীগণ রাজসরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অবশ্য গুণ না থাকিলে কেহই কৃতী হয় না। জামাল খাঁ কররাণীর চারি পুত্রই কৃতী হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাজ খাঁ আফগানদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান এবং কর্ম্মদক্ষ ছিলেন।[৩] মধ্যম সুলেমান খাঁ মগধের শাসনকর্ত্তা এবং অন্য দুই ভ্রাতা ইমাদ্ ও ইলিয়াস্ খাঁ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কয়েকটি পরগণার ইক্তাদার ছিলেন।[৪]

ইস্লাম শাহের মৃত্যুর পর (১৫৫৪), তৎপুত্র ফিরোজকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া সের শাহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ শাহ আদিল বা আদিল শাহ নামে সিংহাসন লাভ করেন।[৫] কিন্তু লোকে তাঁহাকে আদিল না বলিয়া 'আদেলি'

১ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875, pt. 1, p. 295.

২ Dorn—*History of the Afghans*, Part II, pp. 54-6; *Riyaz-us-Salatin*, tr. by Abdus Salam, p. 151. Various spellings are given: Dorn—'Kerranians, Kerrani', *Riyaz.*—'Krani, Karani Kararrani', Badaoni—'Kararani.' *See—Ain-i-Akbari*; tr. by H. Blochmann, p. 171 *note*, which says that the form 'Karzani' also occurs: Smith—*Akbar*, p. 123.

৩ Badaoni (tr. by W. H. Lowe), Vol. 1, p. 525; *Riyaz-us-Salatin*, p. 150 *note*.

৪ Badaoni, Vol. I, p. 541; Elliot, H. M.—*History of India*, Vol. IV, p. 506; *Riyaz*. p. 150.

৫ ইঁহার প্রকৃত নাম মবারেজ খাঁ, ইনি সেরশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম খাঁর পুত্র এবং নিহত শিশু ফিরোজের মাতুল।—Elliot, Vol. IV, p. 505; Badaoni (Lowe), Vol. I,p.335.

(বা মূর্খ) এবং আন্ধালি (বা অন্ধ) বলিয়া ব্যক্ত করিত,[১] কারণ তিনি যেমন অকর্ম্মণ্য ছিলেন, তেমনি দুর্বৃত্ত ব্যবহারে আমীরগণকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হিমু বা হেমচন্দ্র নামক একজন নীচজাতীয় বিকৃতমূর্ত্তি হিন্দু দোকানদারের উপর রাজ্যশাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তিনি সকলেরই মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিলেন।[২]

আদিল শাহের দরবারে যখন তাঁহার মূর্খতার জন্য নিত্য গোলযোগ উপস্থিত হইত, তখন একদিন তাজ খাঁ ভ্রাতার পরামর্শমত গোয়ালিয়র হইতে বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন।[৩] আদিলের আদেশে হিমু বা হেমচন্দ্র সসৈন্যে অনুসরণ করিয়া তাজ খাঁকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। কররাণীগণ আর কখনও প্রকৃত পক্ষে দিল্লীর বশীভূত হন নাই। এই সময়ে সুলেমান কররাণী বিহারে ও মহম্মদ খাঁ সুর বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এদিকে হিমুর অনুপস্থিতিকালে ইব্রাহিম খাঁ সুর হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। তখন হিমু রাজধানী অভিমুখে ধাবমান হইয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অল্পকাল মধ্যে সেকেন্দর খাঁ সুর পঞ্জাবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল্লীর উপর পতিত হইলেন এবং ইব্রাহিমকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু সেকন্দরও স্থায়ী হইলেন না। কারণ মোগলবীর হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে সবলে দিল্লী দখল করিলেন। তখন পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত সুরবংশীয়েরা দিল্লী হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত নানাস্থানে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তখন কররাণীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধনক্ষেপ করিতেছিলেন। সমগ্র দেশ

১ Elliot, Vol. I, p. 302; Elphinstone (9th), p. 450; *Riyaz-us-Salatin*, p. 147 *note*.

২ হিমু প্রথমে একজন দোকানদার ছিলেন; ইসলাম শাহ তাঁহাকে বাজারসমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন; আদিলের সময় তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন; আদিল তাঁহাকে সাম্রাজ্যের প্রধান শাসন-সচিব (Administrator-General of the Empire) নিযুক্ত করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিতে সম্মানিত করেন।—*Tarikh-i-Daudi*. (Elliot), Vol. IV, p. 506; *Riyaz-us-Salatin*, p. 147.

৩ Stewart, Charles—*History of Bengal* (Bangabasi edition), p. 168. [1813 ed. p 149—শি মি]

তখন আবর্ত্তময়; কাহার ভাগ্য কোথায় দাঁড়াইবে, কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না।

বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দিল্লীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে গিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই বিজয়ের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বে হিমু বাদশাহ হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আগ্রার প্রতি ধাবমান হন। হুমায়ুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন; তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর; তিনি সেনাপতি বৈরাম খাঁর সহিত সিংহাসন লাভের জন্য দিল্লীর দিকে ছুটিলেন; পথে পাণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৫৫৬)। এই যুদ্ধে বৈরাম সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত হিমু অচিরে তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর মোগল রাজত্বের সূত্রপাত্র করেন বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই প্রকৃতভাবে সে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মসনদে সমাসীন হন। স্থলেমান কররাণী অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন। তবে সর্ব্বদাই তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেন। অবশেষে বঙ্গেশ্বর জালাল উদ্দীনের পুত্র গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁকে সসৈন্যে পাঠাইয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তাজ খাঁ ভ্রাতার প্রতিনিধি স্বরূপ স্বল্পকালমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন।[১] দুই বৎসর মধ্যে তাজ খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্থলেমান বঙ্গ বিহার উভয় প্রদেশের একাধীশ্বর হইয়া বসেন। তিন বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যাও সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত করেন ১৫৬৭।[২]

মহম্মদ সুরের পর বাহাদুর শাহ বঙ্গেশ্বর হন। স্থলেমান কররাণী তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদিলকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭)।[৩] আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শের সাহ উপাধি

১ J. A. S. B, 1875 pt. I, p. 295; 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ। তাজ খাঁ ৯৭১-২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৬৩-৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর ছিলেন।

২ Dorn—*History of the Afghans*, pt I, p. 175; ৯৭৫ হিজরী বা ১৫৬৭-৮ অব্দে এই ঘটনা হয়।—J. A. S. B. (*Old Series*) 1900, pt. I, p. 189.

৩ *Riyaz-us-Salatin*, pp. 148-9.

লইয়া চুনারে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির হইয়া নিরুদ্দেশ হন।[১] ইব্রাহিম খাঁ স্থর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার পান নাই ; স্থলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও অবশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তাঁহার হত্যাসাধন করেন।[২] এইরূপে পাঠানদিগের মধ্যে যাঁহারা রাজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। তাজ খাঁর মৃত্যুর পর স্থলেমান বঙ্গবিহারের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। উড়িষ্যা এই সময়ে পলায়িত শত্রুর আশ্রয়স্থল ছিল ; প্রায় চারিশত বর্ষের চেষ্টায়ও মুসলমানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে পারেন নাই। বাদশাহ আকবর যখন চিতোর ধ্বংস করিতে উন্মত্ত, স্থলেমান তখন অবসর বুঝিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন , তিনি সেনাপতি কালাপাহাড়ের[৩] সাহায্যে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া লইলেন। এখন স্থলেমান পূর্ব্বভাগে একাধিপতি ; পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন বা ধর্ম্মপথ গ্রহণ করেন, এবং কতক স্থলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠানদিগের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যপ্রতিভার কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে। স্থলেমান ১৫৬৩ হইতে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালন করেন।[৪] তাজ খাঁ তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া শাসন করেন বলিয়া তাঁহার রাজত্বকাল উহারই অন্তর্ভুক্ত। স্থলেমান স্বীয় হস্তে রাজ্যভার লইয়া গৌড় হইতে তাঁড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এদিকে আকবর শাহও বৈরাম খাঁর কঠোর শাসন হইতে রাজ্যভার স্বীয় হস্তে লইয়া আগ্রায় স্থরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করিয়া মোগল

১ Elliot, IV, p. 509.

২ *Ibid.*, IV, p. 507 ; *Akbar-nama*, tr. by H. Beveridge, Vol. II, p. 480.

৩ ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়। প্রথমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ; ইঁহার প্রকৃত নাম রাজু বা রাজচন্দ্র। পরে ইনি জনৈক মুসলমান ললনার প্রেমে পড়িয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভীষণ দেবদ্বেষী হইয়া পড়েন। কাশী, কামরূপ ও পুরী—ইহার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশে অসংখ্য দেবমন্দির ভঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া হিন্দুর অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা করাই ইঁহার ধর্ম্ম হইয়াছিল। মখজানি-আফগানি প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইঁহার বিশেষ প্রসঙ্গ আছে।—*Ain-i-Akbari*, (Blochmann), p. 370 ; Asiatic Researches, Vol. IV ; বিশ্বকোষ, ৪র্থ, ২০ পৃ।

৪ স্থলেমান ৯৭১ হইতে ৯৮০ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।—*Ain.* (Blochmann), pp. 427, 618 ; Smith—*Akbar*, p. 453 *note*.

সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং উত্তর ভারতে মোগল পক্ষে আকবর এবং পাঠান পক্ষে সুলেমান প্রকৃতপক্ষে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হন।

উভয়ই চতুর লোক। আকবর যুবক, সুলেমান বৃদ্ধ। তবুও চতুরে চতুরে, যুবকে বৃদ্ধে মিত্রতা স্থাপিত হইল। সুলেমান দেখিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার দরবারে নতশির, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বস্ব তাঁহার করায়ত্ত, এ সময়ে নববলদৃপ্ত আকবরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া অনর্থক বলক্ষয় ও অবশেষে দেশত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? অতএব মিঞা সুলেমান 'হজরত আলি' এই গর্ব্বিত উপাধি ধারণ করিয়া গৌরব মণ্ডিত রহিলেন, অথচ কখনও আকবর শাহের অধীনতা অস্বীকার করিলেন না। বরং বাদশাহের প্রতিনিধি মুনেম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং সর্ব্বদা বাদশাহ-দরবারে আবেদন ও উপহারাদি প্রেরণ করিয়া সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তিনি নিজনামে কখনও মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই।[১] অপর দিকে আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, ভারত জুড়িয়া বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়াছে, সকল দিকেই তাঁহার শত্রুগণ মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান, তন্মধ্যে রাজপুত-শক্তি বড় প্রবল। সে শক্তি পর্য্যুদস্ত করিতে না পারিলে, রাজমুকুট খসিয়া পড়িবে; শুধু বঙ্গবিহারে কেন, কেন্দ্রীভূত পাঠান শক্তি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; একে একে সকলকে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে পাণিপথের যুদ্ধফল বিফল হইবে, আগ্রার রাজতক্ত উড়িয়া যাইবে। এমন সময় যদি তাঁহাকে সুলেমানের মত কৌশলী ও শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা চলে না। সুতরাং তিনিও সুলেমানের মৌখিক অধীনতায় স্বীকৃত হইয়া অন্যদিকে রাজ্যবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলেন; কেবলমাত্র সুলেমানের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, আগ্রার দিকে তাঁহার গতিপথ রুদ্ধ করিবার জন্য, সুযোগ্য সৈন্যাধ্যক্ষ মুনেম খাঁকে প্রহরীস্বরূপ জৌনপুরে শাসনকর্ত্তা করিয়া রাখিলেন। তিনি সুলেমানের উড়িষ্যা বা কামরূপ-বিজয়ে বাধা দিলেন না।[২]

১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃ।

২ আকবর ও সুলেমানের সন্ধি প্রকৃতই সদ্ভাবমূলক ছিল। এমন কি এরূপও জানা যায়, আকবর সুলেমানকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিতেন। সুলেমান রাত্রিকালে ও প্রত্যহ প্রাতে রাজকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ১৫০ জন সেখ ও উলমার সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ও প্রার্থনা

সুলেমানের সুশাসনে তাঁহার জীবদ্দশায় বঙ্গবিহারে কোন অশান্তির উদ্রেক হয় নাই। সত্য বটে কালাপাহাড় প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমগ্র রাজ্যে হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া প্রজার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ বিদ্রোহশূন্য হওয়ায় অরাজকতার কুফল ফলিতে পারে নাই। শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা না থাকিলে এ অবস্থা ঘটিতে পারে না। রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্যদক্ষতাই এই শৃঙ্খলার মূলীভূত কারণ। হুসেন শাহের মত সুলেমানও জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে গুণের আদর করিতেন এবং উচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ এবং রূপ-সনাতন যেরূপ হুসেনের প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুলেমানের সময়েও সেইরূপ গুহবংশীয় ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ এই তিন ভ্রাতা রাজসরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[১] ভবানন্দ, লোদী খাঁ, ও কতলু খাঁ সুলেমানের প্রধান অমাত্য এবং শিবানন্দ কানুনগো দপ্তরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উড়িষ্যা বিজয়ের পর লোদী খাঁ উড়িষ্যার এবং কতলু খাঁ পুরীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তখন রাজধানীতে শাসন ব্যবস্থায় ভবানন্দই সুলেমানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

প্রায় দশ বৎসর রাজত্বের পর সুলেমান পরলোকগত হন (১৫৭২)। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু ইনি পৈতৃক সিংহাসনের সহিত পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এমন কি রাজ্যলাভের সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নিজনামে খোৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন। অচিরে নানা কারণে অমাত্যগণের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। এজন্য হাঁসু বা হুসো নামক তাঁহার এক দুর্ব্বল-

করিতেন, উহারই অনুকরণে আকবর তাঁহার প্রখ্যাত আলোচনা সভা স্থাপন করেন। উহাতে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সাধুব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতেন এবং পরে ইহার জন্য ফতেপুর-শিকরীতে এক বিরাট ধর্ম্মসভাগৃহ বা ইবাদাতখানা নির্ম্মিত হইয়াছিল।—*Ain* (Blochmann), p. 171; *Riyaz*. p. 151; Badaoni, Vol. II, p. 203; Smith—*Akbar*. p. 131.

১ ইঁহাদের পিতার নাম রামচন্দ্র নিয়োগী। তিনি ভাগ্যান্বেষণে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রথমতঃ সপ্তগ্রাম ও পরে গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেন। ভবানন্দই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতামহ। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি সুলেমানের পুত্র দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আমরা পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ দিব।

মস্তিষ্ক জ্ঞাতিপুত্র উচ্চাশায় উন্মত্ত হইয়া তাঁহার হত্যা সাধন করিল।[১] কিন্তু শীঘ্রই প্রবীণ সেনাপতি লোদী খাঁর সহায়তায় সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ খাঁ হাঁসুকে হত্যা করিয়া ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজতক্তে বসিলেন।[২]

এই সময়ে গুজার কররাণী[৩] নামক একজন সেনাপতি বিহার অঞ্চলে বায়াজিদের পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মোগল পক্ষ অবলম্বন

১ হাঁসু সুলেমানের ভ্রাতা ইমাদের পুত্র এবং বায়াজিদের ভগিনীপতি অর্থাৎ সুলেমানের জামাতা।—*Muntakhabut-Twarik* (Lowe), Vol. II, p. 177 ; Elliot, Vol. IV, p. 510. আকবরনামা প্রভৃতির মতে তিনি বায়াজিদের জামাতা—*Akbar-nama* (Beveridge), Vol. III, p. 28 ; *Tabakat-i-Akbari* (Elliot), Vol, V, p. 372.

২ Dorn—*History of Afghans*, pt. 1, p. 182 ; *Riyaz-us-Salatin*, pp. 153-4 ; J. A S. B., 1875, pp. 304-5 , 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য়, ৩৭০ পৃ , 'গৌড়ের ইতিহাস', ২য়, ১৭৪ পৃ। এই স্থানে কররাণী বংশীয়দিগের বংশলতিকা প্রদত্ত হইল :

জামাল খাঁ
- তাজ খাঁ [বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি, ১৫৬৩-৪]
  - ইউসফ খাঁ [লোদী খাঁর জামাতা, দায়ুদ কর্ত্তৃক নিহত হন, ১৫৭৩]
- সুলেমান খাঁ, হজরত আলি [রাজত্ব, ১৫৬৩-১৫৭২]
  - বায়াজিদ শাহ [হাঁসু কর্ত্তৃক নিহত, ১৫৭৩]
  - দায়ুদ শাহ [১৫৭৩-৭৬]
    - জুনৈদ খাঁ [আকমহলে গোলার আঘাতে নিহত, ১৫৭৬] Bad. II, p. 245.
  - কন্যা
- ইমাদ খাঁ
  - হাঁসু [দায়ুদ কর্ত্তৃক নিহত, ১৫৭৩]
  - জুনৈদ খাঁ [আকবরের শরণাপন্ন, ১৫৬৬] *Akbarnama*, II, p. 397
- ইলিয়াস্ খাঁ

৩ গুজার কররাণী রণদক্ষ ছিলেন। 'Gujar Kararani who was the sword of the country set up in Behar, the son of Bayazid.'—*Akbarnama*, Vol. III, p. 28.

করিয়া গোরক্ষপুর হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু লোদী খাঁর বুদ্ধি-কৌশলে অচিরে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। বস্তুতঃ লোদী খাঁর মত সুচতুর ও শক্তিশালী সেনাপতি পাওয়া দায়ুদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। যতদিন দায়ুদ তাঁহার মন্ত্রণামত চলিয়াছিলেন, ততদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দায়ুদ রাজতক্তে বসিয়া যখন অপরিমিত ধনসমৃদ্ধি ও সৈন্যবল দেখিলেন, তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সুলেমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের সাহায্যে যে ভাবে রাজ্য বিস্তার ও দেশ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাস্তবিকই গৌড়নগরী অলকাপুরী হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে পাঠানেরা বহুকাল হইতে বঙ্গে একাধিপত্য করিয়া আপনাদিগকে প্রকৃত মালিক স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহারা নবাগত মোগলের উদ্যম, অধ্যবসায়, রাজবুদ্ধি ও বীর্য্য-প্রতিভার মাত্রা স্থির করিতে পারেন নাই। দায়ুদ রাজা হইয়াই নিজ নামে খোৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। এই মুদ্রা এখনও যশোহর-খুল্‌না অঞ্চলে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। সুলেমান কার্য্যতঃ বঙ্গে স্বাধীন হইয়া স্বাধীন নৃপতির মত রাজ্যজয় করিতে থাকিলেও প্রকাশ্যে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মোগল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। বায়াজিদ সিংহাসন পাইয়াই শাহ উপাধি ধরিলেন এবং নিজ নামে খোৎবা পড়াইতে লাগিলেন। দায়ুদ আরও একটু অগ্রসর হইয়া নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলন করিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার এমন প্রকাশ্য পন্থা আর নাই।

দায়ুদই পাঠান আমলের শেষ রাজা। দায়ুদের সময়েই যশোর রাজ্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কালে সেই যশোর রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আধুনিক সময়ের যশোহর ও খুল্‌না, এই দুই জেলা হইয়াছে। আমরা যে যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস লইয়া ব্যস্ত, প্রাচীন যশোর রাজ্যের উত্থান-পতনের সহিত তাহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্ত রায় এই যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা উভয়ে দায়ুদের রাজত্বকালে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। দায়ুদের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত তাঁহারা এরূপ ভাবে বিজড়িত যে, তাঁহাদের কথা বাদ দিয়া দায়ুদের ইতিহাস আলোচনা করা যায় না। মোগল-বিজয়ের সময় বঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ পাঠানের পক্ষভুক্ত হইয়া বহুকাল বঙ্গের রাজতক্ত লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন।

এই জমিদারগণ সাধারণতঃ ভৌমিক বা ভুঞা নামে কথিত হন, এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন বার জন বিশেষ ভাবে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। উঁহাদিগকে বারভুঞা বলিত। প্রতাপাদিত্য এই বারভুঞার অন্যতম এবং অগ্রগণ্য। তাঁহার কথা বলিতে গেলে বারভুঞার পরিচয় সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়। এই জন্যই আমরা এক্ষণে প্রথমতঃ বারভুঞার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া পরে প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিব। এবং সঙ্গে সঙ্গে দায়ুদের ইতিহাস বিবৃত করিয়া বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস হইতে যশোরের কাহিনী পৃথক্ করিয়া লইব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গে বারভুঞা

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় এবং সেই সময়ে পাঠান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু একদিনে সমগ্র বঙ্গ অধিকৃত হয় নাই; এমন কি পূর্ব্ববঙ্গ শাসনাধীন করিতে প্রায় দেড়শত বর্ষ লাগিয়াছিল। ততদিন বঙ্গের রাজত্ব দিল্লীর অধীন ছিল। সমগ্র বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর একদিন এক বঙ্গীয় পাঠান শাসনকর্ত্তা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া, প্রকাশ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪০)। সেই সময় হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবর কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় স্বাধীন-শাসন যুগ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন হইলেই যে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নহে। পাঠানেরা বিজিত হওয়ার পর দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল; প্রজ্জলিত বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইল; উহা নির্ব্বাপিত না হইয়া, বরং ভিতরে ভিতরে সন্ধুক্ষিত হইতে হইতে, অশান্তি সর্ব্বব্যাপী করিয়া তুলিল। যে যেখানে নেতার মত দাঁড়াইতে পারিল, সেই নেতৃত্ব পাইল; শত শত পলায়িত হিন্দু পাঠান তাহার পতাকার নিম্নে আশ্রয় পাইল। যাহারা পূর্ব্বে সামন্ত রাজা বা ভূম্যধিকারী ছিল, তাহারাই আকস্মিক নেতা হইবার সুযোগ পাইল; ক্রমে আরও বিস্তৃত স্থান দখল করিয়া প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। কেহ বা পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; এখন দৈবযোগে দেহের বলে ভূম্যধিকারী সাজিল।

আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের সকলকেই সর্ব্বদা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকিতে হইত। যখন তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা কমিত, তখন তাহারা অধিকার বিস্তারে মনোযোগ দিত। সে বিবাদের ফলে অনর্থের উৎপত্তি হইলে, তখনই পুনরায় নিজের গণ্ডীর ভিতর দাঁড়াইত এবং কূটমন্ত্রণা বা ষড়যন্ত্রের বলে উহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইত। এই ভূম্যধিকারীদিগকে ভুঞা বা ভৌমিক বলিত। পাঠান ও মোগলের সন্ধিযুগে এমন কত ভুঞা যে দেশমধ্যে জাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। অধিকারের বিস্তৃতি অনুসারে ইহাদের ক্ষমতার ন্যূনাধিক্য বুঝা যাইত।

উহাদের কাহারও বা শাসনস্থল একটি পরগণাও নহে, আবার কেহ বা

এক খণ্ড-রাজ্যের অধীশ্বর। কোথাও বা দশ বার জন ভুঞা একজনকে প্রধান বলিয়া মানিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিত। কখনও বা একজন প্রতাপান্বিত ভুঞা অন্য ভুঞার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। তখন রণ-রঙ্গ রাজায় রাজায় না হইয়া ভুঞায় ভুঞায় চলিত, আর প্রজাদিগের সকলকেই সেই যুদ্ধ-ব্যাপারে যোগ দিয়া ফলভাগী হইতে হইত। এই অরাজকতার যুগে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। সকলকেই রাজনৈতিকতায় যোগ দিতে হইত, নতুবা আত্ম-পরিবারের প্রাণ রক্ষা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইত। দৈশিক অশান্তির একটা অশুভ ফল আছে বটে, কিন্তু উহাতে যে মানুষকে অনলস ও কর্ম্মঠ করিয়া জাতীয় প্রাণের সাড়া দিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঐ যুগে দেশের মধ্যে শত অশান্তির ভিতর একটা প্রাণের পরিচয় ছিল। জীবদেহে স্নায়ু-সন্ধির মত দেশের মধ্যে এই ভুঞাগণ জাতীয় প্রাণের স্পন্দন-কেন্দ্র ছিলেন। আদ্যোপান্ত মুসলমান শাসনের উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি পশ্চিম দ্বার ভেদ করিয়া রাজ্যলিপ্সু বৈদেশিক জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন আচার-ব্যবহার লইয়া, একের পর এক ভারতে প্রবেশ করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিতেছে; দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশমধ্যে অত্যাচার, রক্তপাত, অশান্তি, বিদ্রোহ বা বিপ্লব চলিতেছে; অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মাত্র কোন কোন সবল সুশাসকের রাজত্বে দেশ শান্তির মুখ দেখিয়াছে, যুদ্ধের ঘনঘটা অপসৃত হইয়াছে, এবং শান্তির সুফল স্বরূপ শিল্প ও শিক্ষার সমুন্নতি হইয়াছে। প্রজাদের সাধারণ অবস্থা আমরা বড় কমই জানি, কত লক্ষ লোক মরিয়াছে তাহার কোন সংবাদ নাই। নবাগত মুসলমানের মত হিন্দুরাও যুদ্ধ করিত, মরিত, দপ্তরে হিসাব রাখিত, রাজস্ব সংগ্রহ করিত, কিন্তু অসংখ্য ইতিহাসে তাহার প্রসঙ্গ নাই।[১]

যে দুই চারিজন সুশাসক রাজতক্ত সুশোভিত করিতেন, তাঁহাদের রাজত্বকালে দেশের লোকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত; অনেক মনের ক্ষত আরোগ্যলাভ করিত। তাঁহাদের সদাশয়তায় সময় সময় অর্থবৃষ্টি হইত; তাঁহাদের জাঁকজমকপ্রিয়তার জন্য অনেক বিপুল সৌধ শিরোত্তোলন করিত। বাস্তবিকই বঙ্গদেশে পাঠান শাসনকালের যে সকল প্রাচীন মস্‌জিদ বা অট্টালিকা

১ Bourdillon, J. A.—*Bengal under the Mahomedans*, p. 23.

এখনও বিদ্যমান আছে, শিল্প হিসাবে উহা খুব উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-নিদর্শন না হইলেও, সে সকল যে এক গৌরবের যুগের জীবন্ত সাক্ষী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।[১] হুসেন শাহ সেইরূপ একজন সুশাসক, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে যে বিপ্লব আরব্ধ হইয়াছিল, সের শাহের অতি সংক্ষিপ্ত রাজত্বে তাহা নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ সের শাহ যতদিন বঙ্গে ছিলেন, ততদিন তিনি অত্যাচারী যোদ্ধা এবং তিনি দিল্লী গেলে, তাঁহার সুশাসনের নিদর্শন বঙ্গে পৌছিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের রাজ্যারম্ভ হইতে ১৫৫৬ অব্দে আকবরের রাজ্যলাভ পর্য্যন্ত বঙ্গে কোন সুশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সুলেমানের কঠোর শাসনেব মধ্যে যে শান্তিটুকু ছিল, তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচারে তাহার ফল শুভজনক হয় নাই। তৎপুত্র দাযুদ মোগলের নিকট পরাজয়ের পর যখন সেনাপতি মুনেমের সহিত সন্ধিসূত্রে উড়িষ্যার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও উড়িষ্যাবাসীর হৃদয়ের উপর কোন অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্যই তাঁহাকে অচিরে সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট অবস্থায় মৃত্যুর অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। মোট কথা, হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কোন সুশাসন ছিল না।

এই সময়ে গৌড়, তাণ্ডা বা রাজমহল যেখানেই রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেশের নানাস্থানে পূর্ব্বোক্ত ভুঞাদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সন্ধি-যুগেই কবিকঙ্কণ নিজে মোগল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অত্যাচারপীড়িত হন। তিনি তাঁহার চণ্ডী কাব্যের প্রারম্ভে মোগল ডিহিদার বা তহশীলদারগণের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তাহারা কিরূপে প্রজার খিল (পতিত) ভূমি লাল (উর্ব্বর) লিখিয়া বিনা উপকারে খতি (ঘুষ) খাইয়া প্রজাকুল ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে।[২]

১ Smith, V. A.—*Akbar*, p. 147.

২ ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যেন ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহ কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ সরীপ॥
উজীর হইল রায়জাদা, বেপারির দেয় খেদা, ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥

ভুঞাগণ অনেক স্থলে ঐ সকল ডিহিদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বিদ্রোহী প্রজাকে আশ্রয় দিয়া, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি যাহাই থাকুক, তাহারা দেশভক্ত সাজিয়া আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

উক্ত ভুঞা বা ভুঁইয়াগণকে শুদ্ধ ভাষায় ভৌমিক বলিত। এখনকার হিসাবে উহাদিগকে জমিদার বলা যায়। এখন যেমন অস্ত্রশস্ত্রসৈন্যবিহীন রাজা মহারাজা স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া, নানাভাবে সদসৎ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন সেরূপ হইত না; তখন আত্মরক্ষা বা রাজস্বসংগ্রহ জন্য যথেষ্ট সৈন্য রাখিতে হইত; দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র বা নৌবাহিনীর আয়োজন করিতে হইত; শত্রুর অপেক্ষায় তাহাদিগকে বীরবেশে বহু রাত্রি বিনিদ্র হইয়া থাকিতে হইত। বীর বলিয়া ভুঞাগণের খ্যাতি হইত, বীর বলিয়া প্রজারা তাহাদিগকে ভয় ভক্তি করিত। অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে যিনি ধর্ম্মপ্রাণ বা প্রজারঞ্জক হইতেন, সকলে মিলিয়া তাহাকে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দিত। উহার ফলে তিনিও নিজকে গৌড়েশ্বর বা দিল্লীশ্বর হইতে কম মনে করিতেন না।

এইরূপে কত ভুঞা যে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার খোঁজ রাখিত না। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বীরত্বে অগ্রগণ্য, যাঁহাদের রাজত্ব বিস্তীর্ণ এবং যাঁহারা বিপুল সৈন্যবলে শক্তিসম্পন্ন হইতেন, তাঁহাদেরই খ্যাতি স্থায়ী হইত। প্রবাদ এই, মোগলদিগের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে এইরূপ বার জন ভুঞা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এক প্রকার তাঁহারাই বঙ্গদেশকে বা নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে[১] নিজেরা ভাগ করিয়া

সরকার হইলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ারে চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়লি, টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ৫ পৃ

১ 'Bhati is a low country and received this name because Bengal is higher.'—*Akbar-nama*, (Beveridge), Vol III, pp. 645-6. 'The low marshy lands of Hegellee anciently called Batty as being in a great part subject to the overflowing of the tide.'—*Fifth Report*, p. 257; *cf. also*, Jarrett, Vol. II, p. 116; Blochmann, p. 342; J. A. S. B. for 1873 p. 226, for 1913 p. 446; Elliot, Vol. VI, p. 72.

লইয়াছিলেন ; এই জন্য বাঙ্গালাকে তখন 'বারভুঞার মুলুক' বা 'বারভাটি বাঙ্গালা' বলিত। কিন্তু তাঁহারা যে সংখ্যায় ঠিক বার জনই ছিলেন এবং সেই বার জন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, তাহা বলা যায় না। হয়ত এক জনের রাজত্বের শেষ সময়ে অন্যের রাজত্ব আরব্ধ হইয়াছিল, অথবা কোন প্রধান ভুঞার মৃত্যুর পর, তাঁহার কোন বংশধর নামমাত্র শাসন পরিচালন করিতেন, কিন্তু হিসাবের বেলায় তিনিও বার ভুঞার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন।

দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র, দ্বাদশ জন রাজার সম্মিলনও তেমনি ভারতের একটি বিশেষত্ব। অতি প্রাচীন কাল হইতে দ্বাদশ জন সামন্তরাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা মণ্ডলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্ত্তী নানাসম্বন্ধযুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ আছে।[১] প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণতঃ বারভুঞা বেষ্টিত হইয়া বসিতেন।[২] বাঙ্গালার মত আসামেও বার জন রাজা বা বার জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য শাসন হইত না এবং 'পাচ পীরের' নাম করিতে গিয়া যেমন নানা জনে নানা পীরের নাম করিয়াছেন, আসামে বারজন রাজার তালিকা পূরাইতেও বিভিন্ন নাম কথিত হয়।[৩] আরাকান, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেক

১ মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ১৫৫-৬ শ্লোক।

২ 'বার ভুঞা বেষ্টিত বসেছে নরপতি।'—মাণিক গাঙ্গুলী, ধর্ম্মমঙ্গল, সা.প.সং, ১৫১ পৃ
'বার ভুঞে বেষ্টিত ভূপতি কর ভূষা'—ঐ, ১৫০ পৃ

'ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহামদ,
রায়রেঞা বার ভুঞা বৈসে সারি সারি,
কোলে করি কাগজ যতেক কর্ম্মচারী।—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং ১৫১ পৃ

'হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার ভুঞা,
রায় রাঞা মোগল পাঠান মীর মিঞা।'—ঐ, ১৭৬ পৃ

'গুজরাটে কালকেতু খাতাইল রাজা,
আর কত ভুঞা রাজা সবে করে পূজা।'—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

৩ 'It is not clear why the number *twelve* should always be associated with them. Both in Bengal and Assam, whenever they are enumerated, twelve persons are always mentioned but the actual names vary.'—Gait, Edward, *History of Assam*, p. 37.

কালে বার জন সামন্ত রাজা বা ভুঞার আবশ্যক হইত এবং উহাদের অভিষেকও এক সময়ে সম্পন্ন হইত।[১] এখনও আমাদের দেশে বার জনে ভিন্ন কোন কাজ হয় না; বহুজনকে লইয়া যে কাজ হয়, তাহাকে বার-ইয়ারী বা বারোয়ারী কার্য্য বলে। উহাতে ঠিক বার জনই থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার বার ভুঞার কাণ্ডটিও প্রায় ঐ একই প্রকারের। কতকগুলি প্রধান প্রধান ভুঞা বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাদিগকে 'বারভুঞা' বলিত; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা যে সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বার জন ছিলেন, এমন বোধ হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে, বহুজনে 'বারভুঞার' কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কেহই ঠিক ভাবে বার জনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বার জনের নাম দিতে পারেন নাই; প্রত্যেকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। বাস্তবিক এই বার জন ভুঞা কে কে ছিলেন, তাহাই দেখিবার জন্য আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদেশী ও স্বদেশী লেখকদিগের বিবরণী হইতে সারাংশ গ্রহণ করিব।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনরীগণ ভারতবর্ষে আসেন। মোগল আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের বিবরণী বিশেষ প্রামাণিক।[২] উঁহাদের মধ্যে নিকলাস্ পাইমেণ্টা প্রধান, তিনি গোয়াতে ছিলেন। ঐ সময়ে ফার্ণাণ্ডেজ্, সোসা, ফন্সেকা ও বাউয়েস্ এই চারিজন জেসুইট মিশনরী বঙ্গে আসিয়াছিলেন, এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ প্রধান।[৩] ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ হইতে পাইমেণ্টার নিকট কতকগুলি পত্র লিখিয়া-

১ ভ্রমণকারী Manrique ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে আরাকাণ রাজের রাজ্যাভিষেককালে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, এবং উহার বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—'...that the new dignitary had himself proclaimed, not only Lord of the twelve Boines (Bhuiyas) of Bengala, but of the twelve kings on the crown of whose heads the soles of his feet always rested.'—Hosten's *Twelve Bhuiyas of Bengal*, J. A. S. B. Vol. IX, p. 447; Manrique, S.—*Itinerario*, p. 206; *Historical Accounts of Discoveries and Travels in Asia*, Vol. I. pp. 110-11.

২ 'The reports of the Jesuit missionaries for the Mogul period possess special value, having been written by men highly educated, specially trained and endowed with powers of keen observation.'—Smith, V. A,—*Oxford History of India*, p. XXI.

৩ Nicholas Pimenta, Francis Fernandez, Dominic da Sousa, and Andrewes Bowes.

ছিলেন। তিনি এই সকল পত্রের সার সঙ্কলন করিয়া পরবৎসর জেসুইট সম্প্রদায়ে সর্ব্বাধ্যক্ষ একোয়া ভিবার (Aqua Viva) নিকট এক বিবরণ পাঠাইয়া দেন (১৬০০)। ডু-জারিক নামক একজন স্পেনদেশীয় জেসুইট পাইমেণ্টার পত্রাবলী ও অন্যান্য স্পেনীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ মূল ফরাসী হইতে ক্রমে জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।[১] এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে বার ভুঞার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বার জনে পাঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মোগলদিগকে বঞ্চিত করতঃ নিজেরা পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। এই বার জনের মধ্যে ঈশা খাঁ মসনদ-আলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দু ভুঞাত্রয় শ্রীপুর, বাক্‌লা ও চ্যাণ্ডিকান বা চাঁদ খানের অধিপতি।[২]

উইলফোর্ড সাহেব এবং অধ্যাপক ব্লকম্যান বার ভুঞার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা উঁহাদের নাম দেন নাই।[৩] ডক্টর ওয়াইজ বিশেষভাবে বার ভুঞার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন; তৎপরে মহামতি বিভারিজও কিছু কিছু নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন।[৪] ওয়াইজ মহোদয়

---

১ Du Jarric, Pierre—*Histoire des Indes orientales.* Bordeaux, 1608. ইহার প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদের জন্য নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য' ৪৩৯-৫৯ পৃ দ্রষ্টব্য। [বর্ত্তমান সংস্করণের ২৭শ পরিচ্ছেদ এবং পরিশিষ্টে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের 'প্রতাপাদিত্যের সভায় খৃষ্টান পাদরী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—শি মি]

২ 'All the Patans and native Bengalis obey these Boyons ; three of them are Gentiles namely those of Chandican, of Sripur and of Bacala. The others are Saracens.'—J. & Pro. A. S. B. (H. Hosten.) 1913, p. 437-8 ; Purchas—*Pilgrimes*, Part IV, Book V, p. 511.

আরও পর্টুগীজ ঐতিহাসিকদিগের পুস্তকে এই ভুঞা (Boyons or Bujoes of Bengala) দিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে Philip De Brito এবং Bishop Dom Pedro, এই দুই জন প্রধান।—*Ibid.*

শ্রীপুর এখানে বিক্রমপুরের নামান্তর, বরিশাল বা চন্দ্রদ্বীপের নাম বাক্‌লা, প্রাচীন যশোর বা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্য নাম চ্যাণ্ডিকান। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে।

৩ *Asiatic Researches*, Vol. XIV, (Wilford), p. 451; Blochmann—*Contributions to the History and Geography of Bengal*, 1873, p. 18.

৪ J. A. S. B. 1874, (Dr. J. Wise), pp. 214; 1875, pp. 181-3; Beveridge—*Bakarganj*, p. 29; J. A. S. B. 1904, pp, 57-63.

বার জনের মধ্যে সাত জনের নাম দিয়া তাহার পাঁচ জনের বিবরণ লিখিয়াছেন। সেই সাত জন যথা :

> ১ ॥ ভাওয়ালের ফজল গাজী, ২ ॥ বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায়, ৩ ॥ ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ৪ ॥ চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলার কন্দর্প নারায়ণ, ৫ ॥ খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, ৬ ॥ যশোহর বা চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্য এবং ৭ ॥ ভূষণার মুকুন্দরাম রায়।

ইহার মধ্যে তিনি প্রথম পাঁচ জনের বিবরণ দিয়াছেন।

ইহা হইতে দেখা গেল যে, ওয়াইজ সাহেবের উল্লিখিত সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু এবং দুই জন মুসলমান। সুতরাং অবশিষ্ট পাঁচ জন সকলেই মুসলমান হইলে, বার ভুঞার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সাত জনের অধিক হয় না। ডু-জারিকের বিবরণীতে যে চারি জনেব নাম পাইয়াছিলাম, ওয়াইজ সাহেবের তালিকায় তাঁহারা ব্যতীত আরও তিন জনের নাম অতিরিক্ত পাওয়া গেল।

ম্যানরিক্ নামক একজন স্পেনদেশীয় ধর্ম্মযাজক ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা পর্য্যটন করিয়া এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।[১] উহাতেও বার ভুঞার উল্লেখ আছে। তাঁহার মতে ১২টি ভুঞা রাজ্যের নাম :

> ১ ॥ বাঙ্গালা, ২ ॥ হিজলী, ৩ ॥ উড়িষ্যা, ৪ ॥ যশোর, ৫ ॥ চ্যাণ্ডিকান, ৬ ॥ মেদিনীপুর, ৭ ॥ কর্ত্তাভু, ৮ ॥ বাক্‌লা, ৯ ॥ সলিমাবাজ, ১০ ॥ ভুলুয়া, ১১ ॥ ঢাকা ও ১২ ॥ রাজমহল।

ইহার মধ্যে আমরা পূর্ব্বকথিত সাতটি রাজ্যের মধ্যে চ্যাণ্ডিকান, কর্ত্তাভু, বাক্‌লা, ভুলুয়া ও ঢাকা বা শ্রীপুর এই পাঁচটি রাজ্য পাইতেছি। সে সাতটির অবশিষ্ট ভাওয়াল ও ভূষণার উল্লেখ ম্যানরিকের তালিকায় নাই; সম্ভবতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে সে দুইটি ভুঞা রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে ম্যানরিকের তালিকার অবশিষ্ট সাতটি রাজ্যের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে 'বাঙ্গালা' যে সুবর্ণগ্রাম বা সোণারগাঁও-এর নামান্তর,

১ Sebastian Manrique নামক স্পেনদেশীয় ভ্রমণকারী ১৬২৮ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি স্বদেশে গিয়া *Itinerario de las Missiones* নামক এক গ্রন্থ রোম হইতে প্রকাশিত করেন। উহা সাধারণতঃ Manrique's *Itinarary* বলিয়া পরিচিত।

তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা নগরী' নামক পুস্তিকায় সর্ব্ববিধ মতের সুন্দর সমালোচনা করিয়া নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি।[১] সোণারগাঁও এবং কর্ত্তাভু পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থান ; ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের দুই শাখা এই দুই স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশার পুত্র মুসা খাঁ যে 'বাঙ্গালার' অধিপতি ছিলেন, তাহা বৈদেশিক বিবরণীতে উল্লিখিত আছে।[২] মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময়ে হিজলীতে আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা কতলু খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার উকীল এবং জ্ঞাতিভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহানীর পুত্র ওসমান উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন।[৩] উক্ত ঈশা খাঁ স্বয়ং হিজলীতে এক দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হিজলী এখনও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত বন্দর। মেদিনীপুরের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে জালামুটা ও মাজনামুটা নামক দুইটি জমিদারী হিজলী হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথকভাবে শাসিত হইতে থাকে।[৪]

১ বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর—'বাঙ্গালা নগরী,' শ্রীনাথ প্রেস, ঢাকা। এই পুস্তকে বিভারিজ বাক্‌লাকে এবং হোষ্টেন টাডাকে বাঙ্গালা বলিতে চান, এইরূপ আরও অনেক মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। Beveridge—*Bakarganj*, p. 445 ; J. A. S. B. 1913, (Hosten), pp. 444-5.

২ 'Minimican, son of Massacan, who had been Emperor of Bengal before the Moors conquered it'—An unpublished letter of Fr. John Cabral, 1633. Monemohan Chakravarti identifies Massacan with Muchha Khan, son of Isa Khan of Katrabuh,—J. A. S. B. 1913, p. 445 ; 'বাঙ্গালা নগরী', ৫০ পৃ।

৩ *Ain* (Blochmann), p. 373 *note* ; Dorn—*History of the Afghans*, Vol. I p. 183. হিজলীতে ঈশার দুর্গের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

৪ A letter written on the 13th of October, 1812, by Mr. Crommelin, Collector of Hidgellee, quoted by Mr. Price, Settlement Officer of Midnapur, in his report on Majnamutha, 1874-5, as well as by Mr. Bayley's Settlement Report of Jalamutha Estate, 1844, both preserved in the Midnapur Collectorate.

উহা হইতে জানিতে পারি যে, হিজলী রাজ্যের কর্ম্মচারী কৃষ্ণ পাণ্ডে এবং ঈশ্বরী পট্টনায়ক যথাক্রমে জালামুটা ও মাজনামুটা জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। মছন্দরী ও মসনদ-আলি একই কথা, সে যুগে যে কোন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান আপনাকে মসনদ-আলি বলিয়া কীর্ত্তিত করিতেন।

সম্ভবতঃ ম্যানরিক্ উহাকেই মেদিনীপুর রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান বা যশোর যে অভিন্ন রাজ্য ছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। যশোরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পূর্ব্বে ভবেশ্বর রায় মোগলদিগকে সাহায্য করিবার পুরস্কারস্বরূপ 'যশোহরের রাজা'[১] উপাধি পাইয়া, ভৈরবকূলে বর্ত্তমান যশোহর নগরীর সান্নিধ্যে চাঁচড়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই চাঁচড়া রাজ্যই সম্ভবতঃ ম্যানরিকের বিবরণীতে যশোর রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিঙ্কর সেন নামক এক ব্যক্তি দ্বিগঙ্গা হইতে[২] আসিয়া বর্ত্তমান বরিশালের অন্তর্গত সেলিমাবাদে ১৪টি ভূখণ্ড দখল করিয়া লন; মহারাজ প্রতাপাদিত্য উহার ১৩টি হস্তগত করিয়াছিলেন। প্রতাপের পতনের পর কিঙ্করের পুত্র মদনমোহন মালিকশূন্য পরগণাগুলি পুনরায় স্বাধিকৃত করিয়া মোগল-সরকার হইতে উহার সনন্দ লাভ করেন। ইহাই সেলিমাবাদ রাজ্য। মদনমোহন বা তৎপুত্র শ্রীনাথ রায়ের সময়ে ম্যানরিক্ এ দেশে আসেন। কিঙ্কর সেন 'ভুঞা কিঙ্কর' বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ 'রায়ের কাটি' নামক স্থানে বাস করিতেন। এইজন্য সেলিমাবাদের রাজগণ এক্ষণে রায়ের কাটির জমিদার বলিয়া খ্যাত।[৩] মোগল-পক্ষীয় শাসনকর্ত্তা মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয়কালে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকমহল নামক স্থানকে আকবর নগর বা রাজমহল নাম দিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।[৪] তাহাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা দেশে তখনকার মোগল রাজধানী, এবং ম্যানরিকের সময়ে অন্য ভুঞা রাজ্যগুলি এক প্রকার রাজমহলের অধীন ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভৌমিকেরা সকলে এক সময়ে এক সঙ্গে ছিলেন না। এখন দেখা গেল, মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে যে সকল ভৌমিক ছিলেন,

১ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহতাব্ রায় (১৫৮৮-১৬১৯) প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করেন। তৎপুত্র কন্দর্প রায়ের সময়ে ম্যানরিক্ আসিয়াছিলেন। তিনি এই কন্দর্পকেই যশোহরের ভুঞা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—Westland, *Report of Jessore*, p. 45; Hunter—*Statistical Accounts*, Vol. II, p. 203; আনন্দনাথ রায়—'বারভুঞা', ১৯৪ পৃ।

২ বর্ত্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৭৫, ১৮১-২ পৃ।

৩ রোহিনীকুমার সেন—'বাক্‌লা,' ২৩০-৪ পৃ; Beveridge—*Bakarganj*, p. 121.

৪ *Ain-i-Akbari* (Blochmann), 340; Smith—*Akbar*, p. 242.

তাঁহাদের অনেকেই ম্যানরিকের ভ্রমণকালে বর্ত্তমান ছিলেন না। এমন কি, তাঁহাদের বংশধরগণের অনেকে তখন রাজ্যলাভে বঞ্চিত বা অন্যভাবে তিরোহিত হইয়াছিলেন। মোগল-বিজয়ের সমকালে যাঁহারা বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বনের প্রয়াসী ছিলেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য উঁহাদের অন্যতম এবং তাঁহারই সহিত যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। এই প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রায় অন্যান্য সকল ভুঞার সম্বন্ধ স্থাপিত বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; সেইরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই আমাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইতেছে। প্রতাপাদিত্য-সংস্রবেই যশোহর-খুল্‌নার ক্ষুদ্র ইতিহাসের সহিত তখন সমগ্র বঙ্গের, এমন কি, বিশাল ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই দেশব্যাপী বিরাট রাজনৈতিক ব্যাপারের একটি সজীব আভাষ দিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইতেছে।

যাঁহারা কোন না কোন প্রসঙ্গে এই মোগল-পাঠানের সন্ধিযুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তাঁহাদের সংখ্যাপূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নানা জনে নানা ভাবে এই সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বৎসরের উল্লেখ না করিলে, সেই বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভৌমিকগণের নামোল্লেখ করা যায় না। বৎসরানুসারে সেরূপ হিসাব ইতিহাসে কোথাও নাই। পাইলেও সে সংখ্যা সব বৎসর বার জন হইত কি না সন্দেহ। বঙ্গের ইতিহাস তখন এমনভাবে নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছিল যে, কোন বৎসর বার জন ভৌমিক থাকিলেও দুই এক বর্ষের মধ্যে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইত। এইরূপে ভুঞাদিগের প্রাদুর্ভাবের সময় সম্বন্ধে বিতর্ক আছে এবং থাকিতেও পারে; তবে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাঁহাদের কয়েকজনের সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই; আবার উঁহারাই ভুঞা শ্রেণীতে প্রধান এবং তাঁহাদিগেরই সহিত রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যশোহর-খুল্‌নার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমরা প্রথমতঃ ভুঞাদিগের নামোল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিয়া প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করিব এবং সেই ইতিহাসের সহিত ভুঞাগণের সম্বন্ধ যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে, আমরা নিম্নলিখিত

কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে পারি। নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের সংখ্যা বেশী ছিল।

১ ঈশা খাঁ মসনদ্-আলি : খিজিরপুর বা কত্রাভূ।
২ প্রতাপাদিত্য : যশোহর বা চ্যাণ্ডিকান।
৩ চাঁদরায়, কেদার রায় : শ্রীপুর বা বিক্রমপুর।
৪ কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় : বাক্‌লা বা চন্দ্রদ্বীপ
৫ লক্ষ্মণমাণিক্য : ভুলুয়া।
৬ মুকুন্দরাম রায় : ভূষণা বা ফতেহাবাদ।
৭ ফজল গাজী, চাঁদ গাজী : ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ।
৮ হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর : বিষ্ণুপুর।
৯ কংসনারায়ণ : তাহিরপুর।
১০ রামকৃষ্ণ : সাতৈর বা সান্তোল।
১১ পীতাম্বর ও নীলাম্বর : পুঁটিয়া।
১২ ঈশা খাঁ লোহানী ও ওসমান খাঁ : উড়িষ্যা ও হিজলী।

ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ছয় জনই বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহারাই তদানীন্তন রাজনৈতিক গগনে সমুজ্জ্বল এবং তাঁহারাই মোগলদিগের দিগ্বিজয়ের পথে কণ্টক হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের কথা পরে বলিব। অপর ছয় জনের মধ্যে কেবলমাত্র উড়িষ্যা ও হিজলীর পাঠান ভুঞাদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহারাই পাঠান বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর উড়িষ্যাই পাঠানদিগের আশ্রয়স্থল হয়; সেই স্থান হইতে পাঠানেরা বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ-বহ্নি ছড়াইয়াছিল। বিজয়ী মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই ভুঞাদিগের প্রধান কৃতিত্ব বা প্রধান অপরাধ। এ বিষয়ে যিনি যে পরিমাণে কৃতী, মোগলদিগের নিকট তিনি সেই পরিমাণে অপরাধী। প্রথম অপরাধী ওসমান—কতলুর প্রধান মন্ত্রী ঈশা খাঁর পুত্র ওসমান খাঁ উড়িষ্যা হইতে পাঠানের রাজতক্তের উত্তরাধিকারের দাবি করিতেন। সেই দাবির পক্ষপাতের জন্যই বঙ্গ ভরিয়া বিদ্রোহ জাগিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য সেই দাবির প্রধান পক্ষপাতী। হিজলীর ঈশা খাঁ ও উড়িষ্যার কতলু খাঁ একই লোহানী বংশসম্ভূত। এজন্য ঈশা খাঁ ও তৎপুত্র ওসমানকে আমরা এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছি। কেহ কেহ উঁহাদিগকে দ্বাদশ

ভৌমিকের অন্তর্ভুক্তই করেন না।[১] কিন্তু দায়ুদের মৃত্যুর পর যখন ওসমানের অধীনে পাঠানগণ বহুকাল পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে উড়িষ্যায় ভূম্যধিকারী ছিলেন, হিজলীর শাসনকর্ত্তা অবশেষে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেও যখন স্বীয় প্রদেশে প্রতাপান্বিত ছিলেন, তখন তাঁহারা নিজেরা ভুঞা নাম ধারণ করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে ভুঞা পর্য্যায়ভুক্ত না করিয়া উপায়ান্তর কি আছে? আকবরের বহু পরে যে ম্যানরিক্ এ দেশে ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন, তিনিও উড়িষ্যা ও হিজলীতে ভুঞা রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অপর পাচ জন ভুঞার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের গাজীগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়ান নাই। বিষ্ণুপুরের হাম্বীর মল্ল বহুদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিলেও যশোহরের সহিত তাঁহার বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাই না। পূর্ব্ববঙ্গীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগল বাহিনীর যে যাতায়াত চলিতেছিল, তিনি একপ্রকার তাহার দর্শকমাত্র ছিলেন। অবশিষ্ট তিনজন অর্থাৎ তাহিরপুর, সাঁতোড় ও পুঁটিয়ার ভুঞাগণ উত্তরবঙ্গে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন সত্য, এবং ঘোড়াঘাটের পলায়িত

১ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে নানা জনে নানা ভাবে ভুঞাদিগের গণনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় জেসুইট মিশনরীদিগের প্রমাণানুসারে আমাদের তালিকাভুক্ত প্রথম চারিজনকেই ভুঞা বলিয়া স্বীকার করেন ('প্রতাপাদিত্য' ৪৭-৫০ পৃ)। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী ('প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত', ২ পৃ) প্রথম ১১ জনের নাম স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি সাঁতোড়ের নামোল্লেখ না করিয়া 'পাবনা' লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দিনাজপুরের রাজাকে ভুঞা বলিতে চান, কিন্তু আমরা যে সময়ের আলোচনা করিতেছি, তখনও দিনাজপুরের রাজ্যের উৎপত্তি হয় নাই (কালীপ্রসন্ন—'নবাবী আমল', ৪৮৮-৯ পৃ)। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহোদয় ('কেদার রায়', ১০ পৃ) চাঁদ গাজী ও ফজল গাজীকে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া মাত্র ১০ জনের নাম দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রমাণাভাবে পুঁটিয়া, তাহিরপুর ও দিনাজপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আনন্দনাথ রায় মহাশয় 'বারভুঞা' নামক পুস্তকে কত ভুঞারই উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে ১২ জন বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। মোট কথা, সে পুস্তকে ঐতিহাসিকের মত কোন বিচার বা শৃঙ্খলা কিছুই নাই। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে' (৪৮৩-৪ পৃ) বারভুঞার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে নাম দেন নাই। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহোদয় 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' নামক বিরাট গ্রন্থে বারভুঞার তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে আমাদের তালিকার প্রথম ৯ জনের নাম আছে। ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়া আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং দিনাজপুরের গণেশ রায় ও পূর্ণিয়ার অজানিত রাজাকে অবশিষ্ট ভুঞা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাঠানের সহিত তাঁহাদের গুপ্ত সন্ধি থাকাও অসম্ভব নহে, কিন্তু মোগলেরা সেদিকে তেমন মনোযোগী হন নাই ; কারণ নিম্নবঙ্গের বিদ্রোহ-তরঙ্গ যখন মোগলের নূতন রাজধানী পর্য্যন্ত পৌছিতেছিল, তখন বঙ্গরাজ্য করায়ত্ত রাখিতে নিম্ন-বঙ্গের দিকেই অধিক চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ ভুঞাত্রয় বঙ্গের স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র স্থির না করিয়া সামাজিক প্রতিপত্তির দিকে অধিক মনোযোগী হন। সমাজপতি বলিয়াই তাহিরপুরের কংসনারায়ণ সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। এক্ষণে আমরা শেষোক্ত ছয়জন ভুঞার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

গাজীগণ : ভাওয়াল

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পালবংশীয় জমিদারদিগকে ধ্বংস করিয়া পালোয়ান শাহ নামক একজন ধর্ম্মপ্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র কারফরমা সাহেব সাধু ছিলেন এবং তাঁহার অনেক অদ্ভুত কর্ম্মের গল্প আছে। তাঁহারই অধস্তন সপ্তম পুরুষে মহতাব্ গাজীর পুত্র ফজল গাজী আকবরের সময়ে ভুঞা ছিলেন। মানসিংহ যখন ঈশা খাঁ প্রভৃতি ভুঞাগণের বিরুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গে আসেন, তখন গাজীগণ সহজে অধীনতা স্বীকার করেন।[১] চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী এই একই বংশের অন্য শাখা। সুতরাং তাঁহাকে পৃথক্ ভুঞা বলিয়া উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নহে।[২]

হাম্বীর মল্ল : বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের প্রাচীন নাম মল্লভূমি এবং এখনকার রাজারা মল্ল বলিয়া খ্যাত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রঘুনাথ সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিষ্ণুপুরের আদিমল্ল। তৎপরে ৪৭ জন রাজার পর

১ Elliot—Vol. VI, p. 105 ; J. A.S.B. Vol. XLIII, 1874, pp. 199-201.

২ 'According to tradition, the principality ruled over by this family consisted of the Pergannahs, now called Chand-Pratap, then Chandgazi, Telibabad or Tala Gazi and Bhawal or Bara Gazi'—Dr. Wise, —*Bara Bhuia,* in J. A, S. B. 1874, p. 201.

বীর হাম্বীর রাজত্ব পান (১৫৯৬)। তিনিই আকবরের সময়ে বিখ্যাত ভুঞা নৃপতি। সে সময়ে তিনি মোগলের নিকট নামে মাত্র অধীনতা স্বীকার করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়েই এই বংশের সহিত প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয়।[১]

কংসনারায়ণ : তাহিরপুর

ভট্টনারায়ণের বংশধর, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলভূষণ বিজয় লস্কর তাহিরপুরের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, তিনি দিল্লীশ্বর বা বঙ্গের কোন স্বাধীন সুলতান কর্ত্তৃক বঙ্গের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জমিদার হইয়া ২২ পরগণা এবং 'সিংহ' উপাধি লাভ করেন। বারাহী নদীব তীরে রামবামা নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তৎপুত্র উদয়নারায়ণের সময় তাহিরপুর ব্যতীত অন্য পরগণাগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এই উদয়ের পৌত্রই প্রসিদ্ধ কংসনারায়ণ। তিনি বারেন্দ্রকুলের প্রধান সংস্কারক এবং তদানীন্তন বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সুলেমান কররাণীর অধীন ফৌজদার ছিলেন এবং টোডরমল্ল তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বঙ্গ বিহারের দেওয়ান করিয়াছিলেন। এমন কি, গৌড়ের মহামারীতে মুনেম খাঁর মৃত্যু হইলে, তিনি অস্থায়ীভাবে কিছুকাল সুবেদারী করিয়া গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। পরে তিনি কেবলমাত্র বঙ্গের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই বঙ্গে দুর্গোৎসব নামক মহাযজ্ঞের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সমগ্র বঙ্গের ভুঞা নৃপতিগণ অবনত মস্তকে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন।[২]

রামকৃষ্ণ : সাতৈর

সামস্‌উদ্দীন্ ইলিয়াস্ যখন বাঙ্গালার প্রথম স্বাধীন সুলতান (১০৩৯-৫৮), তখন তিনি বিশিষ্টভাবে দুইজনের সাহায্য পান,—উভয়ই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শিখাই সান্যাল ও সুবুদ্ধি ভাদুড়ী। উভয়েরই খাঁ উপাধি ও বিস্তীর্ণ জমিদারী হইয়াছিল। সুবুদ্ধির বংশধরেরা ভাদুড়ী চক্র বা ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদারী

১ *Annals of Rural Bengal*, Vol. I, App. 1; *Statistical Accounts*, Vol. IV, p. 230; 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (কালীপ্রসন্ন), ৪৮৭ পৃ।

২ 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস', ১২৩ পৃ; 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ১১৭-৮ পৃ; 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৪৮৩ পৃ।

পান ; এই বংশীয় রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন সুলতান হইয়াছিলেন। শিখাই বা শিখিবাহন সান্যালের পুত্র বলাই সাঁতোড়ের রাজা হন[১]। টোডরমল্ল এই বংশীয় রাজা রামকৃষ্ণকে সামন্ত নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তিনি ভাতুড়িয়ার জমিদারী হ্রাস করিয়া সাঁতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেন। এইরূপে ভাতুড়িয়ার জমিদারী হ্রাস করা হইয়াছিল বলিয়া তথাকার ভূস্বামী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হন না। নতুবা আকবরের পূর্ব্বে ভাতুড়িয়ার অধিপতি একজন প্রধান ভৌমিক ছিলেন।[২] রামকৃষ্ণ বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্যকীর্ত্তির জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। রামকৃষ্ণের পত্নী শর্ব্বাণী দেবীর মৃত্যুর পর এই রাজ্য নাটোরের রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়।

পীতাম্বর : পুঁটিয়া

বৎসাচার্য্য নামক এক সন্ন্যাসী পুঁটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাগ্‌চি উপাধিধারী এবং বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-বংশীয় কুলীন। সম্ভবতঃ টোডরমল্লই লস্করপুর পরগণা বৎসাচার্য্যের পুত্র পীতাম্বরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বরই প্রথম 'রাজা' উপাধি পান। এক্ষণে এই নীলাম্বরের ধারাই চলিতেছে। পীতাম্বর একজন ভৌমিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে অন্যান্য প্রধান ভৌমিকদিগের মত কোন বিশিষ্ট বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। নীলাম্বরের প্রপৌত্র দর্পনারায়ণের সময় নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন সামান্য কার্য্যে পুঁটিয়া সরকারে প্রবেশ করেন এবং পুঁটিয়ার উকীলরূপেই মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে প্রেরিত হন।[৩]

১ এই রাজ্যের অধিকাংশ এক্ষণে ফরিদপুরের অন্তর্গত। সংস্কৃতে ইহাকে সান্তালি বলা হইত। সান্তালি বৈদিক ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সমাজ। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে সাতৈর, সাতৈল বা সাঁতোড় প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া আছে। এক্ষণে সাতৈরের সে নাম বা রাজপ্রতিপত্তি নাই। জেলার বিবরণীতে সাতৈরের শীতলপাটি বিখ্যাত, এই মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।—Hunter, *Statistical Accounts*, Vol. V, p. 292.

২ 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস,' ১১৯ পৃ, বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া যায় না, এইজন্য এই গ্রন্থ আলোচ্য, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (রাখালদাস), ২য় খণ্ড, ১৮৬-৭ পৃ; 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৭৪ পৃ।

৩ Mitra, Kishori Chand, *The Rajas of Rajshahi*,—Calcutta Review, 1873, p. 3.

লোহানীগণ : উড়িষ্যা ও হিজলী

সুলেমান কররাণী কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের সময় হইতে আফগান জাতীয় কতলু খাঁ লোহানী পুরীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।[১] তাঁহারই এক জ্ঞাতি ভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহানী তাঁহার উকিল স্বরূপ রাজধানীতে থাকিতেন। সুলেমানের পুত্র দায়ুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, কতলু উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রধান হন। আকমহলের যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হইলে, কতলু খাঁ উড়িষ্যার সর্ব্বেসর্ব্বা হন এবং ঈশা খাঁ তখন হইতে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হন। কতলুর মৃত্যুর পরে (১৫৮৯) তাঁহার নাবালক পুত্রগণের[২] পক্ষ হইতে ঈশা খাঁ বঙ্গের সুবাদার রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতে তিনি হিজলীতে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জীবদ্দশায় কিছুকাল মোগলের সহিত সন্ধিসূত্র অবিকৃত রাখেন।[৩] কতলু খাঁর জীবদ্দশায় ঈশার পুত্র ওসমান খাঁ

---

১ Badaoni, II, p. 174 ; *Ain.* (Blochmann), p. 366.

২ কতলু খাঁ তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—নসিব শাহ, লোদী খাঁ, এবং জামাল খাঁ, ঈশা খাঁ লোহানীর পাঁচ পুত্র ছিল—সুলেমান, ওসমান, ওয়ালী, মুল্‌হী এবং ইব্রাহিম (*Makhzan-i-Afghani*)। *See*, Dorn—*History of the Afghans*, Vol. II, p. 115. ব্লকম্যান ঈশার এক পুত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন [*Ain*, (Blochmann), p. 520 (2nd ed., p. 586—শি মি)]. কতলুর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তৎপুত্র নসিবের নামে উড়িষ্যার সনন্দ গৃহীত হয়, তজ্জন্য নসিবের নামে 'শাহ' সংযোগ দৃষ্ট হয়। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গের সুবেদার হইয়া আসেন, সেই বৎসরই কতলুর মৃত্যু হয়। তৎপুত্র জামাল খাঁ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন।

৩ ইনি মিঞা বা খ্বাজে ঈশা খাঁ লোহানী নামে কথিত হন। সে যুগে মুসলমানদিগের মধ্যে যে কেহ কোন প্রদেশের শাসকরূপে গদিতে বসিতেন, তিনিই 'মসনদ-আলি' উপাধিভূষিত হইতেন। উহারই অপভ্রংশে 'মছন্দরী' হয়। নাটকে নভেলে গল্পকথায় এই ঈশা খাঁ মছন্দরীর সহিত যশোরের রাজা বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথা শুনিতে পাই। 'মগজানী আফগানী' নামক ইতিহাস হইতে জানিতে পারি : 'After him (Kotloo), Isa Khan Lohani Miankhail, his Prime Minister, seized the reins of the state and held up the banner of sovereignty for the space of *five* years ; during which he gallantly fought Akbar's legions until he also took leave of life.'—Dorn, *History*, Vol. I, p. 183. ষ্টুয়ার্ট সাহেব তদীয় ইতিহাসে এই জীবনকাল ২ বৎসর করিয়াছেন, উহা ভুল বলিয়া বোধ হয়। (*See*, Stewart, *History of Bengal*, sect. VI.) তিনি বলেন '...as long as Khuaje Issa, the Prime Minister of the Afghans, lived the peace was preserved inviolate on both sides.' কিন্তু যখন মগজানী আফগানী ষ্টুয়ার্টের উক্তির

উড়িষ্যা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।[১] পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি উড়িষ্যা অঞ্চলে মোগলের বিপক্ষে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। অবশেষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, ইসলাম খাঁ যখন বঙ্গের সুবেদার হইয়া আসেন, তখনই ওসমান পরাজিত ও নিহত হন (১৬১২)।[২] ভুঞা বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগলদিগকে বহুবৎসর ধরিয়া

মূল গ্রন্থ, তখন তাহার অনুবাদের 'পাঁচ বৎসর' অবিশ্বাসযোগ্য নহে। Dorn কৃত অনুবাদের ১ম খণ্ডে Dr. Lee কতকগুলি ভুল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে '৫ বৎসর' ভুলের তালিকায় পড়ে নাই। সম্ভবতঃ ঈশা খাঁ অবশিষ্ট ৫ বৎসর জীবনের মধ্যে প্রথম দুই বৎসর উভয় পক্ষের সন্ধি স্থির ছিল, পরে বিবাদ হয় এবং তাহারই ফলে তিনি মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেই মানসিংহ আকবরের অনুমতি লইয়া (১৫৯২) পুনরায় উড়িষ্যায় গিয়া যুদ্ধ জয় করেন এবং কটক ও পুরী দখল করিয়া উড়িষ্যা মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।—Stewart, *History*, p. 208 (Bangabasi edition) [1813 ed., pp. 185-6 শি মি] ; *Ain.* (Blochmann), p. 340. মানসিংহ এবার আফগানদিগকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে হিজলীতে ঈশা খাঁ ও তৎপুত্রগণের প্রধান কেন্দ্র হয়।

১ মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া যখন উড়িষ্যা অভিযানের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রবর্ত্তী হন এবং ওসমানের সহিত যুদ্ধে কারারুদ্ধ হন। পরে কতলুর মৃত্যুর পর নিষ্কৃতি পাইয়া উভয় পক্ষের সন্ধির সাহায্য করেন। এই মূল ঘটনার উপর ভিত্তি রাখিয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন। ষ্টুয়ার্ট ওসমানকে কতলুর পুত্র বলিয়াছেন, ডর্ণের পুস্তকেও এক স্থলে (Vol. I, p. 183) তিনি দায়ুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। Dr. Lee এই ভুল সংশোধন করিয়াছেন। (Dorn, Vol. II, *Annotations*, p. 115). বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ধরিয়া লইয়াছেন। উহাই ঠিক, কারণ ঈশা কতলু খাঁর সহোদর ভ্রাতা না হইলেও জ্ঞাতি ভ্রাতা যে ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

২ ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর "Sulaiman 'reigned' for a short time. He killed, in a fight with the Imperialists, Himmatsingh, son of Raja Mansingh."—*Ain.* (Blochmann), 2nd ed., p. 586 ; Dorn, Vol. I p. 183. 'Usman succeeded him and received from Mansingh lands in Orissa and Satgaon and later in Eastern Bengal, with a revenue of 5 or 6 *lacs* per annum.'—*Ain.* (*Ibid*). ওসমানের শেষ পরাজয় উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয়, সে সময়ে ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার হইয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। ঐ স্থান যে ঢাকা হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে ছিল, তাহা ব্লকম্যানও বলিয়াছেন , ডর্ণ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধস্থানকে ঢাকা কোহিস্তান (Kohistan of Dakka) বলিতে চান।—Dorn, Vol. II, p. 116. *Firishta*, Part IV, p. 358, ও Stewart,

যে ভাবে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমঙ্কিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে আবার ঈশা ও তাঁহার বীর পুত্রের প্রাণান্ত চেষ্টা, কূটনীতি ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মোগলকে বিংশাধিক বর্ষকাল যথেষ্ট বিড়ম্বিত করিয়াছে। খিজিরপুরের ঈশা খাঁর মত হিজলী অঞ্চলের এই ঈশা খাঁ লোহানীও যে ভুঞাদিগের অন্যতম ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ওসমানের পতন সর্ব্বশেষে হইয়াছিল বলিয়া আমরা তাঁহাকে ভুঞার তালিকায় সর্ব্বশেষে স্থান দিয়াছি। নতুবা রাজনৈতিক কৌশল এবং বীর্য্যগৌরবে তিনি অনেকের অগ্রগণ্য ছিলেন।

প্রথম ও প্রধান ছয় জন ভুঞাব মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কারণ দাযুদের পতনের পর তিনি বহুসংখ্যক পাঠান সেনার অধিনায়ক হইয়া সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে এক রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রথম ভাগে প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে তিনি যে সকলের প্রধান ছিলেন, এবং অন্যান্য ভুঞাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না।[১] পাইমেণ্টার বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালীয় ভুঞাদিগের মধ্যে কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ প্রধান।

p. 275 [1813 ed., p. 212 শি মি]—এই দুই স্থানে ইহার বর্ণনা আছে। ষ্টুয়ার্ট যুদ্ধের স্থান সুবর্ণরেখা তীরেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি হয়ত ঢাকার নিকটবর্ত্তী অন্য কোন যুদ্ধের বর্ণনা ইহার সহিত ভুলক্রমে যোগ করিয়া দিয়াছেন (*See*, Hunter—*Orissa* Vol. II, p. 23)। ব্লকম্যানের (Ibid) নিজের মূল 'মগজানী' পুঁথিতে যুদ্ধস্থানের নাম 'Nek Ujyal' আছে। আমরা এই Ujyal-কে হিজলী মনে করি এবং হিজলীই ওসমানের পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ওসমানের পরাজয় সম্বন্ধে *Tuzuk-i-Jahangiri* (Rogers and Beveridge), Vol. I, pp. 208-14, এবং *Riaz-us-Salatin* (Salam), pp. 174-9 দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি 'বহারিস্থান' নামক নবাবিষ্কৃত ফার্সী গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে যে, এই যুদ্ধস্থান শ্রীহট্ট অঞ্চলে ছিল। এখনও এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হয় নাই। [অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এই যুদ্ধস্থান শ্রীহট্টে মৌলবিবাজারের ৪।৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—'প্রবাসী', ১৩২৮, অগ্রহায়ণ, ১৪৮ পৃ—শি মি]

১ 'The King of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogol slew their last King. After which twelve of them (i. e. the Bhuyas) joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Mogolls and still, notwithstanding the Mogoll's greatness, are great Lords, specially he of Siripur and of Ciandecan, and above all Moasudalim.'—Purchas, *Pilgrimes*, part IV, Book V, p. 511. আকবরনামায় আছে, 'Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness and made the twelve Zemindars of Bengal subject to himself.'—*Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 648.

কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে ঈশা খাঁ সর্ব্বাগ্রে (১৫৯৫) বশ্যতা স্বীকার করেন। অপর দুইজন উহার বহু পরেও বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়া তাঁহাদের অবসান হইয়াছিল। সুতরাং প্রধান স্থান দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিচার করিতে হইবে, প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাপ্য। আমরা তাহা পরে দেখিব। অপর তিনজন ভুঞার মধ্যে ভূষণার মুকুন্দরামই বহুদিন পর্য্যন্ত মোগলের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি মোগলের স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষ ইহাই বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি কখনও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, সামান্য পেশ্‌কস্‌ দিতেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে রাজ্যবিস্তার করিতে না পারিলেও অন্য ভুঞার সহিত গুপ্ত সন্ধি করিতেন এবং এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। বাক্‌লার কন্দর্প রায় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র এবং ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য মোগলের শত্রু হওয়া অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহেই অধিক বিব্রত ছিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে হত্যা করেন, পরে নিজেই মোগল চরণে অবনত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই কয়েক জন ভুঞা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা আবশ্যক।

ঈশা খাঁ

সুলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর বায়াজিদের শাসনকালে ঈশা খাঁ[১] প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং অসামান্য প্রতিভাবলে অচিরে আড়াই

১ ঈশা খাঁর জীবনী বিচিত্র। কথিত আছে, কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈশ্য রাজপুত অযোধ্যা প্রদেশ হইতে গৌড়ে আসেন এবং তথায় মুসলমান হইয়া সুলেমান খাঁ নাম ধারণ করেন। তিনি বাদশাহ হুসেন শাহের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশা ও ইসমাইল নামে তাঁহার দুই পুত্র হয়। কিছুদিন পরে সের খাঁর পুত্র সেলিম খাঁ যখন গৌড় আক্রমণ করেন, তখন সুলেমান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাঁহার পুত্র ঈশা ও ইসমাইল তুর্কী হস্তে বন্দী হন। পরে তাঁহার খুল্লতাত কুতবউদ্দীন উঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া নিজের দুই কন্যার সহিত উঁহাদের বিবাহ দেন। [Ain. (Blochman), p. 342 ; J. A. S. B. 1874, p. 210.] ইহার সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রথমতঃ, তাঁহার খুল্লতাত কুতবউদ্দীন কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে 'মাতুল' বলেন, কিন্তু উহারও প্রমাণ নাই ('গৌড়ের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ২৬৯ পৃ)। দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানেরা কখনও মুসলমান বন্দীকে দাসরূপে বিক্রয় করেন না ; তাহা হইলে সুলেমানের পুত্রগণ

হাজারী সেনানায়ক হন। দায়ুদের সময়ে তিনি একজন বিশিষ্ট সেনানী ছিলেন, এবং আকমহলের যুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার সৈন্যদলের অনেকে ঈশার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি উহাদের সাহায্যে সোণারগাঁও-এর অন্তর্গত খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি দৈবক্রমে একদিন চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণিকে দর্শন করিয়া রূপোন্মত্ত হন ও পরে চাঁদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে হস্তগত করিয়া সোনামণিকে হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করেন।[১] এই অপমানে চাঁদ রায় অচিরে প্রাণত্যাগ করেন (১৫৮৩)। এবং কেদার রায় প্রতিশোধ লইবার জন্য আজীবন বিদ্বেষবহ্নি প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ প্রথমতঃ বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বাজুহা ও সোণারগাঁ এই দুই সরকারের শাসনভাব পান এবং কতকগুলি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ ও পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিয়া লন। তৎপবে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শাহবাজ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কিছুই করিতে পারেন না।[২] ঈশা খাঁ সোণাবগাঁয়ে ও পরে কোচরাজাকে পরাজিত করিয়া জঙ্গল-বাড়ীতে পৃথক রাজধানী স্থাপন করেন। অবশেষে রাজা মানসিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া প্রথমতঃ একডালা ও পরে এগারসিন্ধু দুর্গে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করেন। তিনি ঈশা খাঁর সাহসিকতায় প্রীত হইয়া তাঁহাব সহিত সন্ধি করেন। ঈশা খাঁ তাঁহার সহিত আগ্রায় গিয়া ২২ পরগণার জমিদারী ও মসনদ-ই-আলি উপাধি লাভ কবেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব মৃত্যু হয়।[৩]

কিরূপে বিক্রীত হইলেন, বুঝা যায় না।—*Akbarnama* (Beveridge), III, p. 648, *Note*. কেহ কেহ বলেন হুসেন শাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ফতেমা ঈশাব মাতা ছিলেন।—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'কেদার রায়', ৩০ পৃ।

১ স্বরূপচন্দ্র রায়—'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস', ১০৩-০৪ পৃ, Bradley-Birt—*Romance of an Eastern Capital*, pp. 78-80; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'কেদার রায়', ৩২-৩৩ পৃ।

২ Ain. (Blochmann), p. 400; *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, pp. 657-60.

৩ 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', ৫৬ পৃ।

কেদার রায়

চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুই ভ্রাতা। তন্মধ্যে চাঁদ রায় জ্যেষ্ঠ। প্রবাদ এই, নিম রায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়া ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়া ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দেব-বংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিম রায় আগমন করেন। সে যুগে দেববংশের কয়েক শাখা বঙ্গের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন।[১] চাঁদ রায় ও কেদার রায় নিম রায় হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। পাঠান রাজত্বের পতনের পর ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে যে সময় বঙ্গ ভরিয়া ঘোর বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই দুই ভ্রাতা সুবর্ণগ্রামের সন্নিকটস্থ শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া, সবিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহারা প্রতাপশালী হইয়া যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করেন এবং সন্দ্বীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়া লন। দাযুদের প্রথম পরাজয়ের পর (১৫৭৫) মোগল পক্ষীয় ইতিমদ্ খাঁ প্রভৃতি কয়েকজনে সোনারগাঁও দখল করিতে আসেন।[২] তখন সন্দ্বীপ চাঁদ রায়ের হস্তচ্যুত হইয়া ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঈশা খাঁর সহিত বিবাদের জন্য কেদার রায় বহুদিনমধ্যে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে কার্ভালো প্রভৃতি পর্টুগীজগণ ঐ দ্বীপ অধিকার করিয়া কিছুকাল শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে উহা আরাকান রাজ্যের অধিকৃত হয় (১৬০২)। তখন কার্ভালো কতকগুলি জীর্ণতরী লইয়া আশ্রয়ের জন্য শ্রীপুর অভিমুখে যান। এই সময় মানসিংহ মুণ্ডা রায় নামক এক সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পথে নৌযুদ্ধকালে কার্ভালো কেদার রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব করেন।

---

১ কেহ কেহ বলেন চাঁদ রায়ের পুত্র কেদার রায়। সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নানাস্থান হইতে সংগৃহীত বংশাবলী হইতে দেখাইয়াছেন যে, চাঁদ ও কেদার রায় উভয়ে যাদব রায়ের পুত্র।—'কেদার রায়', ১৯-২১ পৃ। কি জন্য ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইঁহারা অকুলীন বলিয়া দেশীয় ঘটককারিকাদি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব। এই জন্য এই প্রসিদ্ধ ভুঞাবংশ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই জানিতে পারা যায়।

২ *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 119.

সে যুদ্ধে মুণ্ডা রায় পরাজিত ও নিহত হন।[১] তখন মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া কেদার রায়কে পরাজিত করেন। কেদার রায় সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করেন। মানসিংহ তখন তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু কেদার সন্ধিমত কর না দিয়া পূর্ব্ববৎ স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। তখন মানসিংহের আদেশক্রমে সেনাপতি কিলমক্ আসিয়া বিপুলবাহিনী সহ শ্রীপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইবার মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া ফতেজঙ্গপুরের বিখ্যাত যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়া লন।[২] ধর্ম্মনিষ্ঠ মান শ্রীপুর পরিত্যাগ করিবার সময় কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকে লইয়া প্রস্থান করেন।[৩]

মুকুন্দরাম রায় : ভূষণা

সেনাপতি মুনেম খাঁ যখন (১৫৭৪) সসৈন্যে বঙ্গে আসেন, তখন মোরাদ খাঁ নামক একজন সেনানী তাঁহার সহচর ছিলেন। তিনি ফতেহাবাদ[৪] সরকারে বিদ্রোহ দমন করেন।[৫] ভূষণাই এই সরকারে প্রধান জমিদারী ছিল। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' দেখিতে পাই, তখন অর্জ্জুন নামক এক রাজা ফতেহাবাদের জমিদার ছিলেন।

১ Campos—*Portuguese in Bengal*, p. 71 ; Purchas—*Pilgrimes*, Part IV, p. 513. কার্ভালোই মুণ্ডা রায়কে হত্যা করেন, ইহাই পর্টুগীজ ইতিহাসের মত। কার্ভালোর বিশেষ বিবরণ প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে।

২ Elliot, Vol. VI, p. 111 ; আনন্দনাথ রায়—'বারভুঞা,' ১০৭ পৃ, 'কেদাররায়', ৬১ পৃ।

৩ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে অম্বরে লইয়া যান নাই ; তিনি কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিলেন। সে মূর্ত্তি এখনও 'সল্লাদেবী' নামে অম্বরের রাজধানীতে পূজিত হইতেছেন। এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা পরে করা যাইবে। [এই অংশের ৩১শ পরিচ্ছেদ দ্র., শি মি] নিখিলনাথ রায়,—'প্রতাপাদিত্য', ৪৯৮-৫১৩ পৃ দ্রষ্টব্য।

৪ ফতেহাবাদকে সাধারণতঃ এক্ষণে ফরিদপুর বলে। সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর ফতে শাহের রাজত্বকালে (১৪৮২-৮৭) ফতেহাবাদ নামের উৎপত্তি হয়। ফতে শাহ হইতে আরম্ভ করিয়া হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি বহু নৃপতির ফতেহাবাদ নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায়।—*Catalogue of Coins in Indian Museum*, Vol. II, Part II, Nos. 153-54, 163, 169-70 and 202.

৫ *Ain-i-Akbari* (Blochmann), p. 374.

'উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম।'

—দীনেশ সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ১৬৭ পৃ

এই অর্জ্জুন রাজার সহিত পরবর্ত্তী জমিদার মুকুন্দরামের কোন রক্তসম্বন্ধ ছিল কি না, জানা যায় না। দায়ূদের সহিত মুনেম খাঁর সন্ধি হইলে, মোরাদ জলেশ্বরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। মুনেমের মৃত্যুর পর যখন দায়ূদ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া ভদ্রকের শাসনকর্ত্তা নজর বাহাদুরকে হত্যা করেন, তখন মোরাদ পুনরায় ফতেহাবাদে প্রেরিত হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।[১] মৃত্যুর পর তৎপ্রদেশীয় জমিদার ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম মোরাদের পুত্রগণকে অন্যায়রূপে হত্যা করিয়া সমগ্র ফতেহাবাদের রাজা হন।[২] টোডর মল্ল তাঁহাকেই ভূষণার জমিদার বলিয়া স্বীকার করেন (১৫৮২)। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে নামে মাত্র সামান্য পেশ্‌কস্ পাঠাইয়া বাদশাহের অধীনতার ভাণ করিতেন কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি স্বাধীনই ছিলেন। আকবরের রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি অন্যান্য ভুঞাগণের সহিত নানাসূত্রে যোগদান করিয়া দেশব্যাপী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন। প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়ের রাজত্ব উৎসন্ন হইলেও মুকুন্দরাম দমিত হন নাই। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খাঁ (১৬০৮) বঙ্গের

১ মোরাদ সম্ভবতঃ খানখানান্‌পুরে অবস্থিতি করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন নিকট-বর্ত্তী রাজবাড়ীতে কোন বিদ্রোহী রাজার রাজধানী ছিল (*Riaz-us-Salatin*, p. 42); কিন্তু তদ্ব্যতীত ভূষণা যে প্রাচীন কাল হইতে রাজধানী ছিল, তাহার পরিচয় আছে। দিগ্বিজয়প্রকাশে দেখিতে পাই, ধেনুকর্ণ রাজার পুত্র কণ্ঠহার 'বঙ্গভূষণ' উপাধি ভূষিত ছিলেন, এবং তিনি যশোরের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া ভূষণ বা ভূষণা নাম রাখেন। মুকুন্দরাম ও সীতারামের সময়ে ভূষণা বহু বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সে পরিচয় পরে দিব। পাদশানামা এই মুকুন্দকেই 'Mukindra of Bosnah' বলিয়াছেন।

২ 'Murad Khan died a natural death. Mukund, the landholder of that part of the country, invited his sons as his guests and put them to death and laid hold of his estate.'—*Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 469.

কেহ কেহ বলেন মুকুন্দ মোরাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পুত্রগণকে ভূ-বৃত্তি প্রদান করেন ('বারভুঞা', ১৩৮ পৃ); ব্লকম্যান সাহেব সুন্দরবনে মোরাদখানা নামে এক আবাদি মহল ছিল উল্লেখ করিয়াছেন। উহা মুকুন্দ প্রদত্ত ভূভাগ হইতে পারে।—J. A. S. B., 1873, p. 229.

শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলে, তিনি মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাঁহার অধীন একদল সৈন্য পাঠাইয়া কোচহাজো (কামরূপ) অধিকার করিয়া লন। তখন মুকুন্দরাম পাণ্ডু ও গৌহাটির থানাদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি সে পদে স্বীয় পুত্র সত্রাজিৎকে রাখিয়া স্বয়ং ভূষণায় আসেন। এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পেশ্‌কস্‌ বন্ধ করেন। কথিত হয়, এই সময়ে তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।[১] জাহাঙ্গীরের শাসনকালে যখন ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার হইয়া আসেন, তখন সত্রাজিৎ ঢাকায় আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক ফার্সী গ্রন্থ হইতে [পরিশিষ্ট দ্র., শি মি] জানিতে পারি, ইসলাম খাঁর ঢাকা যাইবার পথে ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ বা শাহজাদা রায় কয়েকটি হাতী উপহার দিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন (প্রবাসী, ১৩২৬, ১ম খণ্ড, ৫৫২ পৃ)। নবাব পুনরায় কোচহাজো অধিকার করিবার জন্য যে সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহার সহিত সত্রাজিৎ ছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সত্রাজিৎ কোচহাজোর রাজাভ্রাতা বলদেবের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া মোগলের গতিবিধি সমস্ত বিজ্ঞাপিত করেন। তখন সত্রাজিৎ বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হইয়া নিহত হন (১৬৩৬)।

কন্দর্পনারায়ণ : চন্দ্রদ্বীপ

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ দনুজ মর্দ্দনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়দেব অল্পকাল রাজত্বের পর অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২] তাঁহার একমাত্র কন্যা কমলার সহিত বলভদ্র বসুর বিবাহ হয়। কমলার পুত্র পরমানন্দ বসু রাজোব

১ 'বারভুঞা', ১৩৮ পৃ। ষ্টুয়ার্ট, ওয়াইজ বা অন্য কেহ মুকুন্দরামের পতনের কথা করেন না। মানসিংহের অনুপস্থিতিকালে (১৫৯৩-৪) যখন সৈয়দ খাঁ বঙ্গের সুবেদার হন, তখন হয়ত মুকুন্দের সহিত যুদ্ধ হয়। ইসলাম খাঁর সময়ে মুকুন্দ জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সত্রাজিৎই মোগল শাসকদিগকে অধিক বিরক্ত করিয়াছিলেন। ব্লকম্যান বলেন, 'Satrajit gave Jahangir's Governors of Bengal no end of troubles, and refused to send in the customary peskash or do homage at the Court of Dacca.' For Said Khan, *See, Ain.* (Blochmann), pp. 331-2.

২ বর্ত্তমান ইতিহাসের ১ম খণ্ডে (৩য় সং) ৪৭০ পৃষ্ঠায় চন্দ্রদ্বীপ রাজগণের বংশলতিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে—রোহিণীকুমার সেন, 'বাকলা', ১৬৩ পৃ দ্রষ্টব্য।

উত্তরাধিকারী হন। তৎপুত্র জগদানন্দ বাক্‌লার জলোচ্ছ্বাসে প্রাণত্যাগ করেন (১৫৮৪)।[১] জগদানন্দের পুত্রের নাম রাজা কন্দর্পনারায়ণ। ইনিই বারভুঞার অন্যতম। কন্দর্পনারায়ণ বরিশালের নিকটবর্ত্তী কচুয়া হইতে স্বীয় রাজধানী মাধবপাশা নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া ১৪।১৫ বৎসরকাল সদর্পে রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে ভুঞাদিগের মধ্যে আত্মকলহে এবং মগ ও ফিরিঙ্গির (পর্টুগীজ) অত্যাচারে দেশ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। কন্দর্পনারায়ণ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি বহুবার মগ ও ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন।[২] ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া কন্দর্পের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এবং মগাদি দস্যুর হস্ত হইতে দেশরক্ষাকল্পে কন্দর্প ও প্রতাপাদিত্য এই উভয় মহাবীরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগকে পরে এই সব ঘটনা বিবৃত করিতে হইবে। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রামচন্দ্র রাজা হন। ইনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসে ইঁহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

লক্ষ্মণমাণিক্য : ভুলুয়া

কথিত আছে পাঠানদিগের দ্বারা বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে বঙ্গাধিপ আদিশূরের বংশীয় রাজা বিশ্বম্ভর রায় চন্দ্রনাথতীর্থে যাওয়ার পথে মেঘনা নদের এক নবোত্থিত চরে ভুলুয়া নামে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।[৩] বিশ্বম্ভরের

১ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই জলোচ্ছ্বাসের বর্ণনা আছে [*See*, (Jarrett) Vol. II, p. 123], এই জলপ্লাবনে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয় ও রাজধানী বাকলা বিনষ্ট হয়। ঘটকগণের কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই, রাজপুত্র জগদানন্দ এই প্লাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবুল ফজল সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে জগদানন্দের স্থলে তাহার পিতা পরমানন্দের নাম করিয়াছেন।—'বাকলা', ১৬৬ পৃ। ব্লকম্যান এই ঘটনার তারিখ ১৫৮৫ বলিয়াছেন।—J. A. S. B., 1868, Dec.; *See also*, Beveridge—*Bakarganj*, p. 28.

২ র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) নামক এক ভ্রমণকারী ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলা পরিদর্শন করিয়া কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। *See*, Hackluyt's *Voyages*, Vol. II, p. 257, 'বিশ্বকোষ', ৩য় খণ্ড ৮৫ পৃ। কন্দর্পের সময়ের একটি পিত্তলের কামান এখনও বর্ত্তমান আছে।—'বাকলা', ১৬৭ পৃ, J. A. S. B., 1875, p. 207.

৩ ভুলুয়ার পত্তন সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। Dr. Wise উহার আলোচনা করিয়াছেন (J. A. S. B., 1874, p. 203)। ভুলুয়ার পত্তনের সময় সম্বন্ধে

পর একাদশ পুরুষে লক্ষ্মণমাণিক্য প্রাদুর্ভূত হন। বীরত্বের খ্যাতিতে তিনি বারভুঞার অন্যতম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত কন্দর্পের পুত্র রামচন্দ্রের বিবাদ ছিল। তাহারই ফলে রামচন্দ্র বহু রণতরী লইয়া গিয়া ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আনেন। পরে রামচন্দ্রের আদেশে মাধবপাশা রাজবাটীতে লক্ষ্মণ নিহত হন।[১] লক্ষ্মণমাণিক্য শুধু বীর ছিলেন না, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন।[২]

প্রতাপাদিত্য

আমরা এ পর্য্যন্ত একাদশজন ভুঞার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, এখন অবশিষ্ট মাত্র প্রতাপাদিত্য ; ইনি ভুঞাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট এবং বীরত্বে ও রাজশক্তি পরিচালনায় সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইঁহারই জন্য এক সময় যশোহব প্রাচীন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া 'যশোহর' হইয়াছিল ; মোগল আমলের যশোহরের ইতিহাসে ইনিই প্রধান ব্যক্তি। আমরা এখন যশোহর-খুল্নাব যে

কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয় ধরিলে, তদপেক্ষা অন্ততঃ ৩৭৫ বৎসর পরে লক্ষ্মণমাণিক্যের আবির্ভাব ধরিতে হয়। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থে (৩৯৪ পৃ) ভুলুয়া রাজবংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে লক্ষ্মণ বিশ্বম্ভরের ৭ম পুরুষ। সে হিসাব ঠিক হইলে আনুমানিক ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে বা বঙ্গের স্বাধীন পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে ভুলুয়ার পত্তন ধরিতে হয়, অথবা লক্ষ্মণকে সপ্তম পুরুষ না বলিয়া ১১শ পুরুষ ধরিতে হয়—'বিশ্বকোষ' ১৭শ খণ্ড, ১২২ পৃ ; নগেন্দ্র বসুর 'বঙ্গজ কায়স্থ কাণ্ড' প্রকাশিত হইলে বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে। [দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই—শি মি]

১ কেহ কেহ বলেন বীর লক্ষ্মণ-মাণিক্য অসজ্জিতভাবে রামচন্দ্রের রণতরীতে গেলে, রামচন্দ্র অন্যায়রূপে তাঁহাকে বন্দী করেন। ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ঘটককারিকায় আছে, রামচন্দ্র 'জিত্বা লক্ষ্মণমাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং। স্বরাজ্যে হানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দূলং॥' সুতরাং যুদ্ধে জয় করিয়া বন্দী করাই সম্ভবপর।—'রাজমালা' ৩৯৮ পৃ, নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', ৭৩ পৃ। আনন্দনাথ রায় মহাশয় রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণের প্রাণদণ্ডের কথা বিশ্বাস করেন না ; তিনি বলেন, ১৬০১ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপে মগদিগের সহিত যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, লক্ষ্মণমাণিক্য তথায় বীরের মত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। —'বারভুঞা', ১৫৭ পৃ।

২ কথিত আছে, লক্ষ্মণমাণিক্য শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র মত 'বিখ্যাত বিজয়' নামক এক বীররস-প্রধান সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতে 'শ্রীমল্লক্ষ্মণভূপতেরভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ' বলিয়া ভণিতা আছে।—'রাজমালা', ৩৯৬-৭ পৃ।

যুগের ইতিহাস লইয়া ব্যাপৃত, তাহাকে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ২৫ বৎসর মাত্র প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল বা বীরত্বের যুগ হইলেও, পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর ধরিয়া তাঁহার এবং তদীয় সেনাপতিবর্গের কীর্ত্তিকাহিনী এমন করিয়া যশোহর-খুল্‌নার অঙ্ক অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি এমনভাবে এদেশের সমাজকে অনুপ্রাণিত বা স্মৃতিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, যশোহর-খুল্‌না যেন 'প্রতাপময়' হইয়া গিয়াছে। এইজন্য পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আমরা প্রতাপের কথা বলিব। প্রতাপের কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গতঃ ভুঞা-রাজগণের কথা উল্লেখ কবিতে হইবে। সেজন্য এ অধ্যায়ে প্রধান প্রধান ভুঞাগণের পবিচয় মাত্র দিয়া রাখিলাম।

মোগলের বিপক্ষতাচরণ করাই ভুঞারাজগণের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এইজন্য তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল। নতুবা তাঁহাদের মধ্যে পবস্পরের কোন প্রকার মিলন বা সহানুভূতি ছিল না। তাঁহাদের সকলেই কোনও না কোন ভাবে পাঠান নৃপতিদিগের নিকট অনুগৃহীত ছিলেন; মোগলের আক্রমণে যখন পাঠানেরা ক্রমে ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎখাত হইতেছিলেন, তখন তাঁহারা এই দেশীয় রাজন্য বা ভৌমিকগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। ভুঞাগণ লবণেব মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কবেন। সকলের এক উদ্দেশ্য, তাই তাঁহাদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা সম্পর্ক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের আত্মগরিমা বা জাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা যে ছিল না, তাহা নহে; তবে আত্মরক্ষা এবং পাঠানদিগকে সাহায্য করাই প্রধান সাধনা হইয়াছিল। শুধু পশ্চিম দেশ হইতে আগত মোগল নহে, ভুঞাদিগেব আরও শত্রু ছিল; দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে আগত আরাকানী মগ, এবং ফিরিঙ্গি বা পর্টুগীজ দস্যুগণের পাশবিক অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন ও মনুষ্যশূন্য হইয়া যাইতেছিল; সকলের না হউক, অন্ততঃ যাঁহাদের রাজ্য সমুদ্রকূলবর্ত্তী, তাঁহারা প্রজার জীবন রক্ষার জন্য এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া পারিতেন না। তাই সময়ে সময়ে কয়েকজন মিলিয়া এই সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন। সে শত্রুগণও সহজ দস্যু নহে, তাহারাও রাজনৈতিক কূটকৌশলে অতুলনীয়; নানাভাবে ভুঞাদিগের দরবারে প্রবেশলাভ করিয়া কখনও উৎকোচ উপহার দিয়া, কখনও স্বার্থের মোহে অন্ধ করিয়া, ভেদনীতিদ্বারা ভুঞাসম্প্রদায়ের মধ্যে

হিংসানল জ্বালাইয়া দিত। তখন ভুঞাগণ আত্মঘাতীর মত পরস্পরের সহিত যুদ্ধরত হইতেন এবং সাগরতরঙ্গ বা নদীবক্ষ নররক্তে রঞ্জিত করিয়া নিজেরাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেন। মোগলের বিপুল বাহিনী যাঁহাদের দ্বারে দ্বারে হানা দিতেছিল, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপভাবে বলক্ষয় বা ধনক্ষয় দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া পড়া বিশেষ আশঙ্কার বিষয়ই ছিল, এবং তাহাতে উঁহাদের পতনের পথই পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচার মোগলেরই কার্য্যসিদ্ধির সহায় হইয়াছিল। পরে যখন ভুঞাদিগের পতন হইয়া গেল, তখন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলদিগকে অসংখ্য রণতরী পাঠাইয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই সকল শত্রু নিপাত করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের বারভুঞা পরাক্রান্ত আকবর বাদশাহের রাজশক্তিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিল; যদি সে পরীক্ষায় আকবর জয়ী না হইতেন, তবে পাঠানের করচ্যুত রাজদণ্ড কাহার হস্তে শোভা পাইত তাহা বলা যায় না! সময় অল্প বা সুযোগ স্বল্প হইলেও, ভুঞাগণ আপন আপন ক্ষেত্রে যে রণদক্ষতা ও রাজনৈতিক মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছিলেন, অপর পক্ষে মানসিংহ বা টোডরমল্লের অসাধারণ প্রতিভার সহায়তা না থাকিলে, তাঁহারা বঙ্গের ভাগ্য নূতন করিয়া গড়িতে পারিতেন। অবশেষে ভুঞাদিগের অভ্যুত্থান বিফল হইলেও তাঁহাদের শক্তিসঞ্চয় ও প্রচেষ্টার ফল বহুদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে আমরা তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইব। তাঁহার সাধনার ফলে এমন ভাবে যশোহর-খুল্‌নার ভাগ্যসূত্র সমগ্র বঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের ইতিহাসকে বঙ্গেতিহাস হইতে পৃথক্ করা যায় না।

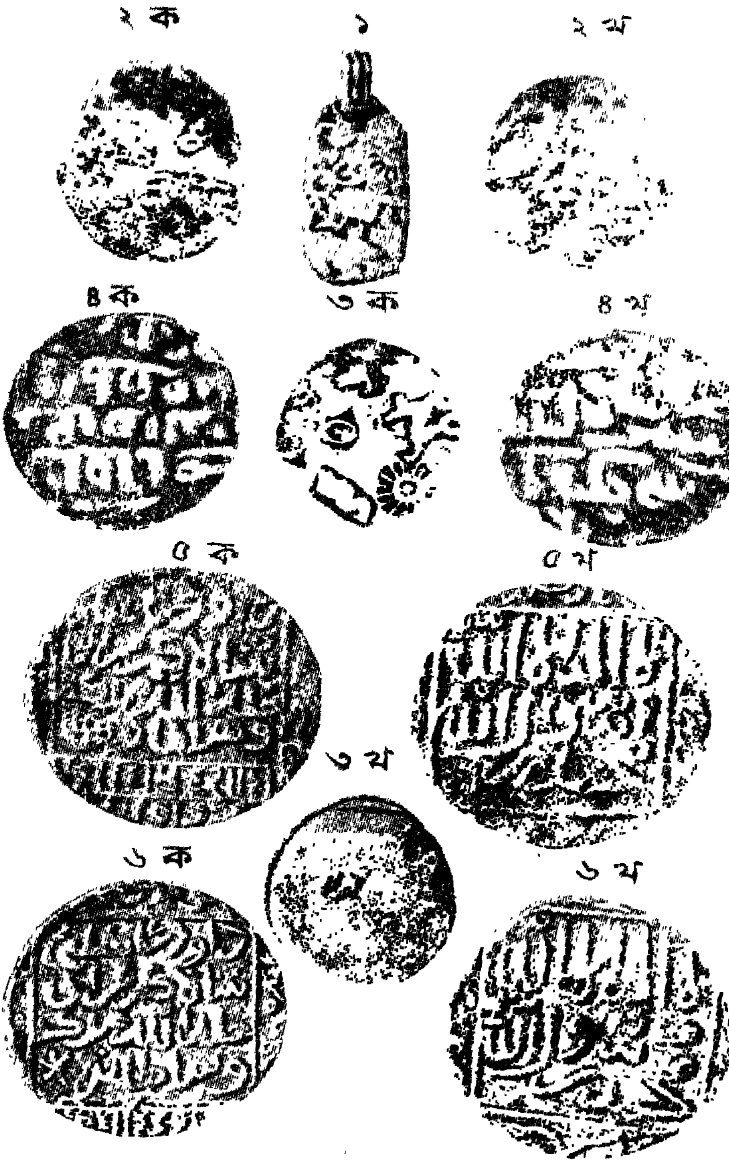
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের উপাদান

আমরা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করিব বটে, কিন্তু সে ইতিহাস পাইব কোথায়? যাহাকে ইতিহাস বলিতে পারি, সে সময়ের এমন কোন বিবরণ দেশীয় হিন্দুতে লিখে নাই; সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী বিখ্যাত মুসলমানী ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। আবুল ফজলের বিরাট গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নামগন্ধ নাই। অথচ সেই গ্রন্থ এবং নিজামউদ্দীন বা বদাউনীর বিস্তৃত ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মুনেম খাঁ, খাঁ জাহান, টোডরমল্ল, বা মানসিংহের মত কত কৃতী মোগল সেনাপতি ২৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গভূমিতে বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু সে বিদ্রোহী কে কে, তাহার পরিচয় নাই। সে সংঘর্ষের ফলে দিল্লী আগ্রার কত ওমরাহ দেশে না ফিরিয়া বঙ্গের কোণে নগণ্য পল্লীপ্রান্তরে কবরিত হইল, কত বিদ্রোহী যুদ্ধে বা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইল, কেহ বা বন্দীভাবে ধৃত বা পিঞ্জরাবদ্ধ হইল; কিন্তু সে বিদ্রোহী কে কে, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল না। ইতিহাসে বিদ্রোহের বার্ত্তা যাহা কিছু আছে, সে কেবল বিদ্রোহী পাঠানের কথা; কারণ পাঠানের হস্ত হইতেই মোগলেরা বঙ্গের মসনদ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে স্বল্পসংখ্যক পলায়িত পাঠান বিদ্রোহী বিরাট বঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিলেন, পাঠানের স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার পরিশোধকল্পে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠানের স্বত্বস্বামিত্বের দাবিতে নিয়ত যুদ্ধলিপ্ত হইতেছিলেন, বাঙ্গালার যে অসংখ্য ভুঞারাজগণ পাঠানকে স্বগণ বলিয়া গণ্য করিয়া মোগলের রক্তে তর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা আকবরের বৃত্তিভুক্ লেখকগণের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। মানসিংহ বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সপ্তদশবর্ষকাল সদর্পে বঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়াছিলেন, এবং নিজের যৌবনকে বার্দ্ধক্যে পরিণত করিয়া হৃতস্বাস্থ্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কাহার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, তাহা 'আকবরনামা' তন্ন তন্ন করিলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। না পাইলেই কি সে সব যুদ্ধের কথা, দেশময় রণদর্পের বার্ত্তা মুছিয়া ফেলিতে পারিব? যে প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়, যে ঈশা বা ওস্মান খাঁ বিদ্রোহী হওয়ায় মোগলকে বিংশাধিক



ডামবেলীর নবরত্ন মন্দির



প্রাচীন মুদ্রা

বর্ষকাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী মুছিবার নহে। দেশের গাত্রে, দেশীয়দিগের লুপ্ত ইতিহাসের পত্রে, তাহার শতচিত্র এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

আমরা যে যুগের কথা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বঙ্গীয় ইতিহাসের অসদ্ভাব ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের অভাব ছিল না। বাদশাহ আকবর স্বয়ং একপ্রকার অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হইলে কি হয়, তাঁহার মত শিক্ষার উৎসাহদাতা, শিক্ষিতের ও পণ্ডিতের প্রতিপালক জগতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; তিনি ঐতিহাসিকগণের নিপুণ গবেষণার জন্য সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতেন। রাজশক্তির সহায়তা পাইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একাগ্র চেষ্টায় বিরাট গ্রন্থসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন।[১] সেইজন্য অন্য যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, যেমন উপাদানের অল্পতায় সন্দেহাকুল হইতে হয়, আকবরের যুগে আসিলে, উপাদানের প্রাচুর্য্যে ঐতিহাসিককে পরিশ্রান্ত হইতে হয়। কিন্তু যে বিরাট ইতিহাসের কথা বলিতেছি, তাহার অধিকাংশই শুধু মোগলের কথায় পূর্ণ; বাদশাহের কার্য্যকাহিনী, রাজ্যবিজয় ও শাসননীতি তাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। শাহান্‌শাহার একটি নেত্রপলকও হয়ত তাহাতে লিপিবদ্ধ হইতে বাদ পড়ে নাই, কিন্তু অন্যপক্ষে হয়তঃ একটি দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাহার উল্লেখমাত্র নাই। ভারতীয় মোগলের কথা বলিতে গিয়া আবুল ফজল ভারতবাসীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন; প্রভুর অনাবশ্যক স্তাবকতায় ও অনর্থক কবিতায় তিনি অনেক স্থলে লেখনী কলঙ্কিত করিতে করিতে আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গের সহিত মোগলের কেবলমাত্র নূতন সম্বন্ধ হইতেছিল, আবার সে সম্বন্ধও শুধু বিদ্রোহীর সহিত বিজয়দৃপ্ত শাসকের

১ ইহার মধ্যে আবুল ফজল কৃত 'আকবরনামা' ও তদন্তর্গত 'আইন-ই-আকবরি', নিজামউদ্দীন কৃত 'তবকাত-ই-আকবরি' এবং বদাউনীকৃত 'মুন্তাখাবুৎ-তারিখী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'But it must be remembered that Abul Fazl's history was written too early for any notice of Pratapaditya's life to have been inserted in it.'—*See*, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (বঙ্গবাসী সংস্করণ), ৫৮৫ পৃ; Calcutta Review, 1870.

সম্বন্ধ। সে শাসকের স্তাবক ঐতিহাসিকগণ বঙ্গঘটিত বর্ণনার অন্তরালে রোষ-কষায়িত দৃষ্টি লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই; আর যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও অযত্ন ও অনভিজ্ঞতায় কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। মোগল পক্ষের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ভিন্ন এসকল ইতিহাস দ্বারা আমাদের বিশেষ সাহায্য হয় না।

১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ণ দুইশত বর্ষকাল বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। পরে বঙ্গের শেরশাহ্ দিল্লীশ্বর হইলে, বঙ্গ পাঁচ বৎসর মাত্র দিল্লীর অধীন ছিল; পুনরায় শেরশাহের অবসানের পর ১৫৪৫ হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আবার বঙ্গ একপ্রকার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। এ সময়ে বঙ্গের ইতিহাস ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুই একটি সীমান্ত যুদ্ধ ব্যতীত বহির্জগতের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই স্বাধীন বঙ্গের যে ইতিহাস আমরা পাই, তাহা মুসলমান শাসকের ইতিহাস—মুসলমান ঐতিহাসিকের রচিত মুসলমান-শাসনের ইতিহাস। সে ইতিহাসেও বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহিনী নাই বলিলেও হয়। এখন যেমন বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় লোকসংখ্যায় অধিক, তখন তত অধিক ছিল না। তখন মুসলমানেরা কতক নবাগত হইতেছিলেন, হিন্দুরা কতক মুসলমান হইয়া যাইতেছিলেন, এবং বঙ্গবাসী মুসলমানের বংশবৃদ্ধি নবোপনিবেশে দ্রুতগতিতে হইতেছিল—এই তিন কারণে কালক্রমে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অনুপাত ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুই প্রধান অধিবাসী; তাহাদের সমাজ, ধর্ম্ম ও গতিবিধি—ইহারই ইতিহাস তখন বঙ্গীয় ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমানী ইতিবৃত্তে সে অঙ্গের চিত্র নাই; মোগল অপেক্ষা পাঠানেরা হিন্দুর প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হইলেও হিন্দুর গতিমতির পরিমাপ করিয়া হিন্দুর ইতিবৃত্ত সমুজ্জ্বল করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং মোগল ও পাঠান কাহারও নিকট হইতে আমরা প্রস্তাবিত যুগের প্রকৃত ইতিহাস পাই না।

হিন্দু লেখকরাও নিজের জাতীয় চিত্র বিশেষভাবে রাখিয়া যান নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা সাহিত্যে, ধর্ম্মপ্রচার-কাহিনীতে, সমাজ-চিত্রে ও ঘটকের কারিকায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। যাহা কিছু আছে, তাহা প্রবাদবাক্যে জনশ্রুতিমুখে রঞ্জিত ভাষায় কতক প্রকাশ পায়; বংশবিবরণে এবং ব্রতকথা ও

উপকথায় তাহাদের কতক সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিককে এই লুকানো মাণিকের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। নতুবা বঙ্গের সর্ব্বাঙ্গীণ ইতিহাস আবির্ভূত হইবে না। রাজনৈতিক বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা মুসলমান ঐতিহাসিকগণের অনেক গ্রন্থ প্রামাণিক ধরিয়া লই বটে, কিন্তু সে বিষয়েরও অন্য পক্ষের কথা থাকিতে পারে। সেই কথার সন্ধান লইয়া, তাহার সহিত পারসীক গ্রন্থের প্রামাণিকতার সামঞ্জস্য করিয়া নূতন যুগের ইতিহাস গঠন করিতে হইবে। বৈদেশিক ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে ঘটনাবিশেষের অবতারণা না দেখিলেই তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। পারসীক গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলিতে প্রতাপের নামোল্লেখ নাই, তাহা বলিয়া কি তাঁহাকে অস্তিত্বশূন্য কল্পনা করিতে হইবে? আমাদের যশোহর-খুল্‌না প্রতাপাদিত্যের অস্তিত্বে পূর্ণ এবং তাঁহার বীরত্ব-প্রতাপে ধন্য। তাঁহার দানধর্ম্ম ও পূজা-ভক্তির কথা এদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। প্রতাপের যুগে দক্ষিণবঙ্গের জীর্ণশীর্ণ দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, বঙ্গপতির প্রকৃতি ও ব্যবসায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার অভিব্যক্তি এখনও আছে; এখনও এদেশের অঙ্গে অঙ্গে তাহার প্রমাণ চিহ্ন বর্ত্তমান; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যশোহর-খুল্‌না 'প্রতাপময়'। এদেশের সেই প্রতাপময়তার সজীব আভাস দিবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

তবে সেই চেষ্টা বড় কঠিন চেষ্টা। সমসাময়িক পারসীক বা অন্য বৈদেশিক গ্রন্থে যেটুকু প্রমাণ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহারই আলোকে পথ দেখিয়া লইতে হইবে। দেশীয় সাহিত্যে, ঘটককারিকা বা পুঁথিপত্রে, প্রাচীন দলিলাদি বা স্বল্পসংখ্যক শিলালিপিতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, সাবধানে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। সামাজিক ইতিহাস বা বংশ বিবরণে যে সকল ঘটনার ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ হয়, তাহার সন্ধান লইতে হইবে। প্রচলিত প্রবাদ বা জনশ্রুতির মূলে যেটুকু সত্য নিহিত থাকিতে পারে, সহিষ্ণুতার সহিত তাহার সমুদ্ধার করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকটে বা দেশের নানাস্থানে যে অসংখ্য কীর্ত্তিচিহ্ন আছে, যে সকল মন্দির, মসজিদ, দুর্গ বা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও সিক্তবাত নিম্নবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার সংবাদ বা বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, যে সকল স্থাপত্য-নিদর্শন বা সংশ্লিষ্ট কিম্বদন্তী এখনও কালের কবলে বা বিস্মৃতির গর্ভে

বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারও তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। এই ভাবে সকল তথ্য ও প্রমাণের সামঞ্জস্য করিয়া ইতিহাসের সারতত্ত্ব প্রকটিত করিতে হইবে। চাক্ষুষ প্রমাণকে প্রধান সহায় করিয়া যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যতটুকু প্রকৃত চিত্র লোক-সমাজের নয়নপথবর্ত্তী করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিব বটে, কিন্তু তৎসম্পর্কে কয়েকটি বলিবার কথা আছে। প্রথমতঃ, আজকাল যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিহাস লিখিত হইতেছে, তাহাতে প্রবাদের মূল্য স্বীকৃত হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই, লিখিত ইতিহাস কয়জনের পাওয়া যায়? এবং যাহা আছে, তাহাই যে রঞ্জিত বা পক্ষপাতদুষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কি? দেশের মধ্যে কয়জনের কার্য্যকলাপের দৈনন্দিন লিপি প্রস্তুত হইত? শিলালিপি বা স্মারকলেখমালা হইতে দুই চারিজন রাজা ব্যতীত কয়জন প্রাচীন কৃতী পুরুষের বিবরণী সংগ্রহ করা যায়? আর সেই ইতিহাস পাইলেই কি দেশের ইতিহাস হইল? দেশ কি শুধু কতিপয় রাজা বা রাজপুরুষের সমষ্টি লইয়া গঠিত? রাজা শুধু দেশের রক্ষক মাত্র; রাজার ইতিহাস শুধু দেশ-শাসনের ইতিহাস—দেশের বাহ্যাবরণের ইতিহাস। প্রজাই দেশের প্রাণ; সে প্রাণের স্পন্দন বা অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস। আমরা যে সমস্ত ইতিহাস পড়ি, তাহার অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত মাত্র। প্রজার কাহিনী বা দেশের প্রকৃত চিত্র তাহাতে নাই। যুগের পর যুগ ধরিয়া জনশ্রুতি, প্রবাদ বা গল্পকথার মধ্যে সে চিত্র ক্রমে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। অসত্য বা অতিরঞ্জনের আবর্জ্জনা সরাইয়া সে প্রবাদপুঞ্জ হইতে সার সত্য সংগ্রহ করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সকল প্রবাদ হইতেই মূল সত্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিলে, রাশীকৃত ইতিকথা হইতে সত্যের নির্য্যাস নির্গত করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং প্রবাদ একেবারে বাদ দিলে চলে না।

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া যথেষ্ট যশোলাভ বা অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন. তাঁহাদের একটা প্রকৃতি এই দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পাশ্চাত্য লেখক বা পর্য্যটকের বর্ণনা হইতে আমাদের রাশি রাশি দেশী কথার কোন প্রকার সমর্থন করাইতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় পুরাণ বা প্রাচীনকাহিনীর প্রতি

কিছুমাত্র আস্থাবান হন না। ইবন্ বতুতা[১] বা মার্কো পোলোর[২] মত ভ্রমণকারী অজানিত দূরদেশ হইতে ফিরিয়া নিজের দেশে আসর জমাইবার জন্য যে অসংখ্য আজগবি গল্পের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু অসত্য যে কত ছিল তাহার সংখ্যা নাই ; আমরা বুঝি না, তাহাই আমাদের ঋষিমুনির উপাখ্যান হইতে অধিক মূল্যবান বা আদরণীয় কেন! অনেকে নিজের ধর্ম্ম বা সংস্কারের নীল চসমা পরিয়া পরের দেশে ঘুরিয়া থাকেন, এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধির মাত্রানুসারে পরের কাহিনীর পরিমাপ করেন—কাজেই তাঁহারা নিজের তুলিকায় পরের দেশের এক অভিনব বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। বিশেষ সতর্ক না হইলে, সে চিত্র হইতে কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে যেস্থলে অন্যত্র হইতে কোন সন্ধান পাওয়ার সুযোগ নাই, সেখানে বৈদেশিক বিবরণী হইতে যতটুকু আলোকপাত করা যায়, ঐতিহাসিককে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে দেশের কথা দশের মুখে, বংশের কাহিনীতে, প্রবাদ-বাক্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে উহা কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে। ছাঁটিয়া কাটিয়া, অন্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া প্রকৃত তথ্যের উদ্ধার করিতে হইবে বটে, কিন্তু যে দেশে বেদ বা শ্রুতি জনশ্রুতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, সে দেশে প্রবাদসমূহ একেবারে বাদ দিলে চলে না। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের জন্য আমাদিগকে অনেক প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, নিম্নবঙ্গে পাহাড় পর্ব্বত নাই ; এখানে পাষাণ নির্ম্মিত মন্দির বা মসজিদ গড়িতে হইলে, সুদূর রাজমহল বা চট্টগ্রাম হইতে পাথর আনিতে হয়। সে বড় কঠিন কার্য্য, সে কার্য্য সকলের সামর্থ্যে কুলায় না। খাঁ জাহান আলি প্রভৃতি দুই একজন কোন কোন স্থানে কতক গাঁথুনি পাথরের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারও সব পাথর তাঁহাদের নিজের আনীত বা হিন্দু বৌদ্ধ আমলের পুরাতন মন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত, তাহা স্পষ্ট বলা যায় না।

১ ইবন্ বতুতা নামক একজন আফ্রিকাদেশীয় ভ্রমণকারী ২৫ বৎসর ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশ ঘুরিয়া ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে ফেজ নগরে ফিরিয়া গিয়া, আরবীয় ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেন ঐতিহাসিকের মতে 'He was deemed to be a daring liar.'

২ ভিনিস নগরবাসী ভ্রমণকারী মার্কো পোলো ১৩শ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া অদ্ভুত বিবরণী লিখেন।

পাথরের দেশ না হইলে সহজে পাথরের ইমারত হয় না। এজন্য এদেশের মন্দিরাদি প্রায় সবই ইষ্টক-রচিত। সেই ইষ্টক নির্ম্মিত হর্ম্ম্যে যদি কোন লিপি থাকে, তাহাও সাধারণতঃ শিলা-লিপি নহে, তাহা ইষ্টক-লিপি। নিম্নবঙ্গ বড় লবণাক্ত দেশ এবং ইহার বায়ু সর্ব্বদা জলীয় বাষ্পে আর্দ্র। ইহার ফলে, ইষ্টকে উৎকীর্ণ লিপি ত দূরের কথা, সব কঠিন জিনিসই বড় শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়িত ও বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আশঙ্কায়ও অনেকে মন্দিরাদিতে লিপি-সংযোগ করিতেন না। যাহা করিতেন, তাহারও অধিকাংশ আর নাই। অথচ (যেমন পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন) "আজকা'লকার 'বিজ্ঞান-সম্মত' ইতিহাসেব দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস হয় না।"[১] কিন্তু সে পাথুরে প্রমাণ কোথায় পাইব ? এদেশে যেখানে ২।১ খানি প্রস্তরলিপি ছিল, তাহাও ইমারত ভাঙ্গিয়া পড়ায় স্থানান্তরিত হইয়া মানুষের অযত্নে বা অবজ্ঞায় অপহৃত বা দেশান্তরিত হইয়াছে। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিলা-লিপির সাহায্যে এদেশেব ইতিহাসের উদ্ধার-কল্পনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।[২]

চতুর্থতঃ, আজকাল আর এক ধরণ দেখিতে পাই যে, কোন রাজার ইতিহাস লিখিতে গেলে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া চাই। মৌদ্রিক (numismatic) প্রমাণ যে বিশেষ বলবান, তাহাতে অবিশ্বাস করিতেছি না ; তবে ইহাই রাজাদের বেলায় একমাত্র বা প্রধান প্রমাণ নহে। জনৈক প্রসিদ্ধ মনীষী একদিন আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাস্যচ্ছলে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাব বৃদ্ধ প্রপিতামহের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা নাই, এজন্য তিনি তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান। বাস্তবিকই আমরা আমাদের গবেষণার নিপুণতা এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রামাণিকতা দেখাইবার জন্য মুদ্রার সন্ধান করি। মুদ্রা পাইলেই প্রমাণের একশেষ হইল এবং না পাইলে অন্য শত প্রমাণ দিয়াও যেন ঐতিহাসিকের নিস্তার নাই। প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র প্রমাণ সন্দেহের মধ্যে একটি মুদ্রাও যে ঐতিহাসিকের দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের মুখপাত।

২ Dr. Fleet ভারতীয় গুপ্ত সম্রাটগণের এবং কানিংহাম মহারাজ অশোকের শিলা-লিপি-সমূহের প্রচারদ্বারাও তৎকালীয় ইতিহাস উদ্ধার করিবার প্রধান সহায় হইয়াছেন।

দিতে পারে, তাহা স্বীকার করি। আমরা একদা সুন্দরবনে ভ্রমণকালে দৈবক্রমে দনুজমর্দ্দনের যে মুদ্রা পাইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিয়াছিলাম, তাহার কথা অনেকেই জানেন। উহা দ্বারা চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের অসামান্য সাহায্য করিয়াছে এবং অনেক লেখকের অনেক অদ্ভুত কল্পনা উড়াইয়া দিয়াছে। সে মুদ্রা যে খুব মূল্যবান, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।[১] লোকমুখে শুনি, প্রতাপাদিত্যের এইরূপ মুদ্রা ছিল; মুদ্রা প্রচার স্বাধীনতা ঘোষণার একটি অঙ্গস্বরূপ। কেহ কেহ তাঁহার সে মুদ্রা দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। আমি কিন্তু আজ ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও একটি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহার জন্য অনেক স্থানে গ্রামে গ্রামে, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছি; এ পর্য্যন্ত শতাধিক লোকের নিকট কতশত পত্র লিখিয়াছি, অর্থব্যয় করিয়া বহুবিধ মুদ্রা সংগ্রহে বাধ্য হইয়াছি, প্রতাপেব একটি মুদ্রার জন্য যথেষ্ট অর্থ দিব বলিয়া আমার প্রতিশ্রুতি বারংবার সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। কত আশা পাইয়াছি, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মুদ্রা পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রতাপাদিত্যের কাহিনী উড়াইয়া দেওয়া যায়? এ দেশ ও সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতাপের নামাঙ্কিত; একটি মুদ্রার অভাবে তাঁহার ইতিহাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয় বলিয়া ধরিতে পারি না। হয়ত এখনও তাঁহার নামাঙ্কিত ত্রিকোণ মুদ্রা অনেক পুরাতন গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর কৌটায় সঙ্গোপনে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত তাহা কোন ঐতিহাসিকের হস্তগত হইবে। কিন্তু আপাততঃ সে মুদ্রা ব্যতীতও তাঁহার অতীত ইতিহাস গঠিত হইতে পারে কিনা, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য।

'আকবর-নামা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য দুই একখানি পারসীক পুস্তকে যে তাহার বিবরণ ছিল, তাহা জানা গিয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রাম রাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'

১ সাহিত্য-পরিষদের উনবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে (১৬৮ পৃ) লিখিত হইয়াছিল: 'শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক চন্দ্রদ্বীপপতি দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা উদ্ধার করিয়া বঙ্গের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাসের এক তর্কসঙ্কুল অধ্যায়ের সুমীমাংসার সহায় হইয়াছেন।' এই মুদ্রা সম্বন্ধে যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস, ১ম খণ্ড ৩য় সংস্করণ, ৩০০-০৫ পৃ, প্রবাসী ১৩১৯, শ্রাবণ ও ভারতবর্ষ, ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ, এবং রাখাল দাসের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ১ম ভাগ, ১২৯ পৃ দ্রষ্টব্য।

আছে : 'এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে, সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি।'[১] এইরূপ কোন কোন পারস্য গ্রন্থ দেখিয়া এবং বংশগত প্রবাদাদির সাহায্যে যে বসু মহাশয় নিজ পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।[২] ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত খোড়গাছি-নিবাসী রাজা বসন্তরায়ের বংশধর রামগোপাল রায় মহাশয় 'সারতত্ত্বতরঙ্গিনী' নামক এক কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহার কতকাংশ ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় মহোদয় স্বীয় 'প্রতাপাদিত্য' পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে 'রাজনামা' নামক পারসী গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং 'অতঃপর শুন রাজনামা বিবরণ' এই বলিয়া গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।[৩]

সম্প্রতি গত বৎসরাধিক কালের মধ্যে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহোদয়ের অসামান্য অনুসন্ধিৎসার ফলে এই প্রসঙ্গযুক্ত আরও দুইখানি পারসিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একখানি—নবাব ইসলাম খাঁর সময়ে বঙ্গের দেওয়ান আসফ খাঁর অনুচর ও সঙ্গী আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী। যত দূর জানা গিয়াছে, ইহার একখানি মাত্র জীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে এবং উহার একখানি প্রতিলিপি অধ্যাপক সরকার মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায়, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য উপঢৌকন দ্রব্যসহ নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন।[৪] ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়

১ অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা আছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণ নাই। শ্রীরামপুরে ১৮০১ অব্দে মুদ্রিত মূল গ্রন্থ ১-২ পৃ।

২ তৎকালে বসুমহাশয়ের গ্রন্থের এইরূপ সমালোচনা হইয়াছিল :—'The History of Rajah Pratapaditya, the last Rajah of the island of Saugar; an original in the Bengalee language *Composed from authentic documents* by a learned native in college' (Buchanon's 'College of Fort William'). Italics আমরা দিলাম।

৩ নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য,' ২৮১-৮৫ পৃ।

৪ এই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত 'প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ' অধ্যাপক সরকার মহাশয় ১৩২৬, আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন (৫৫২-৫৩ পৃ)। [পরবর্ত্তীকালে অধ্যাপক উক্ত প্রবন্ধ নূতন পাঠোদ্ধারান্তে কিছু সংস্কার করিয়া ১৩৫৫, আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন। উহাতে প্রতাপাদিত্যের এই সাক্ষাতের তারিখ ২৭ এপ্রিল, ১৬০৯ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—শি মি]

যে প্রতাপাদিত্য ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ কর্তৃক বন্দী হইয়া মৃত্যুমুখে পড়েন নাই। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম 'বহারিস্তান'[১]; ইসলাম খাঁর সময়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যে বিরাট মোগল বাহিনী প্রেরিত হয়, তাহার গতিবিধি ও কার্য্য বিবরণী এই 'বহারিস্তানে' আছে এবং তাহা হইতে উক্ত আবদুল লতীফের উক্তিই সমর্থিত হয়। ইহার গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত ৭০০ পৃষ্ঠার একমাত্র পুঁথি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইতেছে। অধ্যাপক সরকার মহাশয় বহুব্যয়ে উহার সমস্ত পত্রগুলি তথা হইতে ফটো করিয়া আনিয়াছেন, এবং অতি কষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া কতকাংশের সংক্ষিপ্ত তথ্য ১৩২৭, কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন; এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে আমার সহিত আলোচনা হইয়াছিল এবং গ্রন্থোক্ত স্থানের পরিচয়ার্থ আমি কতকগুলি টিপ্পনী ঐ প্রবন্ধে সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলাম।[২] গ্রন্থকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। তবে এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখিতে চাই যে, প্রতাপের বিরুদ্ধে যে মোগল অভিযান গিয়াছিল, তিনি তাহার অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং স্বচক্ষে ঘটনাবলী দেখিয়া নিজ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাহার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য না হইয়া পারে না। এ গ্রন্থে কোন কোন বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট বা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও স্থূল ঘটনার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা হইতে জানিতে পারি, প্রতাপাদিত্যের শেষ পতন ইসলাম খাঁর হস্তে হইয়াছিল, মানসিংহের হস্তে নহে। মানসিংহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ প্রবাদের মূলও খুঁজিয়া পাই না, এবং ইহা সত্য বলিয়া ধরিতে পারি না। বিরুদ্ধ মতের সন্ধান না পাইলে হয়তঃ ইহারই উপর নির্ভর করিতে হইত; কিন্তু সমসাময়িক দুইজন লেখকের লিখিত ও পরস্পর সমর্থিত বিবরণ উপেক্ষনীয় নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত রামরাম বসুর গ্রন্থেও ইসলাম খাঁর দ্বারা

১ বহারিস্তান নামের অর্থ বসন্তের রাজ্য। বহার=বসন্তকাল। বোধ হয় দেশের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়াই গ্রন্থকার এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

২ অধ্যাপক সরকার 'বহারিস্তানের' অধিকতর পাঠোদ্ধারান্তে উক্ত প্রবন্ধ কিছু সংস্কার করিয়া ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ মাসের 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশ করেন। উহা বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ইতিপূর্ব্বে ইহার অনুবাদও বাহির হইয়াছে—*Baharistan-i-Ghaybi*; tr. by M. I. Borah, 1936. 2v.—শি মি

প্রতাপের শেষ পরাজয়ের কথা আছে এবং তাহাও পারসী গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত। আধুনিক ঘটককারিকার কাব্য-কথার বলে এ সকল প্রাচীন বিবরণী ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রাচীন ঘটককারিকা হইতেও সত্যনির্ণয়ের সহায়তা পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, এইরূপ বিবিধ মতের সমন্বয় করিয়া আমাদিগকে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে।

পর্টুগীজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় মিশনরীগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ঘটিত পুস্তক হইতেও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] তাহা হইতেও আমাদের গন্তব্যপথ আলোকিত হইবে। এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় লিখিত সকল আবশ্যক পুস্তক বা প্রবন্ধের যে আমরা সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। স্থানান্তরে যে প্রমাণ পঞ্জী দেওয়া হইল, উহাতে, যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার তালিকা দৃষ্ট হইবে।

১ Du Jarric, Peirre—*Histoire...des Indes Orientales.* 1610. Part IV. Chap. 29 & 32; Pimenta, A. R. P. Nicalao—*Historica Relatio de India Orientali*; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', ৪০৭-৫৯, ৪৬৩-৭৫ পৃ।

প ঞ্চ ম প রি চ্ছে দ

পিতৃ-পরিচয়

আদিশূরের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে বিরাট গুহ একজন। তাঁহার অধস্তন নবম পর্য্যায়স্থ অশ্বপতি বা আশ্ গুহ বঙ্গজ কায়স্থগণের এক বীজপুরুষ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ (বসু) রায় সমাজ সমীকরণ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থগণের 'বাক্‌লা-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আশ্ গুহ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হন। এই আশ্ গুহের এক প্রপৌত্রের নাম রামচন্দ্র। তিনি তখনকার হিসাবে কৃতবিদ্য বটে, কিন্তু ধনসমৃদ্ধ ছিলেন না। বরং তাহার পিতার অবস্থা শোচনীয় ছিল বলিয়াই জানা যায়। রামচন্দ্র উদ্যমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন।[১] তিনি অবস্থার উন্নতির জন্য অর্থান্বেষণে বাক্‌লা হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন।[২] সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটি শাসন কেন্দ্র। এখানে একজন প্রাদেশিক পাঠানশাসনকর্ত্তার অধীন, রাজস্ব সংগ্রহ ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বহু কর্ম্মচারী ছিল। বিশেষতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর।[৩] সুতরাং সেখানে

১ ঘটককারিকায় আছে: 'ছকড়ীতনয়ঃ শ্রেষ্ঠো রামচন্দ্রো মহাকৃতী।
মহামানী মহাশূরো নবভির্গুণৈর্যুতঃ॥'

২ পূর্ব্ববঙ্গে কোথায় রামচন্দ্রের বাড়ী ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ফরিদপুরের অন্তর্গত চন্দনাতীরবর্ত্তী চন্দনা গ্রামে তাহার বাস ছিল, এবং তিনি প্রথম জীবনে সাঁতৈর রাজ-সরকারে কর্ম্মচারী ছিলেন (দুর্গাচরণ সান্যাল কৃত 'সামাজিক ইতিহাস', ১৬০ পৃ), কিন্তু ইহার কোন প্রমান পাওয়া যায় না।

৩ সপ্তগ্রাম বন্দর অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। প্লিনি হইতে র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ পর্য্যন্ত বহু ভ্রমণকারী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গের পণ্যভার সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী পথে তাম্রলিপ্ত বা তমলুকে যাইত এবং তথা হইতে সমুদ্রপথে সুদূর ইয়োরোপ পর্য্যন্ত বাণিজ্য চলিত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে: 'সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়। ঘরে ব'সে সুখমোক্ষ নানাধন পায়।' ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে সপ্তগ্রাম পর্ত্তুগীজগণের একটি প্রধান আড্ডা হয়। তাহারা ইহাকে পোর্ট পেকিনো বা ক্ষুদ্র বন্দর বলিত, কারণ তাহাদের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল চট্টগ্রাম। 'The Royal Port of Bengal in the 16th Century and a great city but now a small village.' সপ্তগ্রামের এই সমৃদ্ধির যুগেই রামচন্দ্র তথায় গিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী নদী পলি পড়িয়া শাঁকরোল পর্য্যন্ত মজিয়া যাইতে লাগিল, তখন

অর্থোপায়ের বহু পন্থা মিলিতে পারে। এই আশায় রামচন্দ্র সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়া নিকটবর্ত্তী পাটমহলে শ্রীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় লন। শ্রীকান্ত ঘোষও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ এবং পূর্ব্ববঙ্গে তাহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল ; সেই সূত্রে রামচন্দ্রের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি রামচন্দ্রের রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। রামচন্দ্রের শ্বশুর ও শ্যালকেরা সপ্তগ্রামে চাকরী করিতেন। সেই সঙ্গে তিনিও তথায় মুহুরীরূপে প্রথম প্রবেশলাভ করেন। ক্রমে তাহার দিন ফিরিল, তিনি 'নিয়োগী' উপাধি পাইলেন। সপ্তগ্রামে আসিবার পূর্ব্বে তাহার অন্য এক বিবাহ হইয়াছিল। ঘটককারিকায় উল্লেখ আছে, তিনি প্রথম ষষ্ঠীবর বসুর কন্যা বিবাহ করেন। সে স্ত্রীর গর্ভে রামচন্দ্রের তিন পুত্র হইয়াছিল—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। ক্রমে তাহারাও সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন এবং রাজসরকারে কার্য্যারম্ভ করিলেন ; কানুনগো দপ্তরে তাহাদের কার্য্যের অত্যন্ত সুযশঃ হইল ; তিনজনের মধ্যে আবার শিবানন্দ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ক্রমে তিনজনেরই বিবাহ হইল ; ভবানন্দের এক পুত্র হইল—শ্রীহরি।[১] গুণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জানকীবল্লভ। শিবানন্দের তিন পুত্র হরিদাস, গোপাল দাস ও

হইতে সপ্তগ্রামের পতন হইল। 'The silting up of the Saraswati led to the establishment of the town and Port of Hugli by the Portuguese in 1537' —Hunter, *Statistical Accounts, Hugli*, p 262 ; 'সুবর্ণ বণিক' ২২৪ পৃ।

১ এই শ্রীহরিই পরে বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন। তাহার পূর্ব্বনাম সম্বন্ধে বহু মতবাদ আছে। ইদিলপুরের ঘটককারিকায় 'ভবানন্দ-সুতো জাতঃ শ্রীহর্ষ নামধেয়কঃ' আছে, অর্থাৎ তাহার নাম শ্রীহর্ষ ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা শ্রীধর বা শ্রীহরি এই উভয় নাম ব্যবহার করিয়াছেন। পারসীক গ্রন্থের মূলে বা ইংরাজী অনুবাদে লিপি বা পাঠোদ্ধারের দোষে এই দুই নামের আবার নানা অপভ্রংশ হইয়াছে। এমন কি কেহ সর্ম্মাদি, কেহ সৈয়দ হুরি পর্য্যন্ত করিয়াছেন। 'Sarmadi' [*Ain* (Blochmann) pp. 341-2], 'Sirhari' [*Akbarnama* (Beveridge), III, p. 172], 'Sadhauri' (Ibid III p. 31), 'Sridhar' [*Tabakat.*, (Elliot) ; V. pp 373, 378], 'Saiyid Huri' (Elliot. VI. 41), and 'Sarhor' [Badaoni, (Lowe), II. p. 184] ; See *also*, Jessore Gazetteer, p. 27 *note*.

[অধ্যাপক যদুনাথ সরকার লতীফের ফার্সী ভ্রমণকাহিনীতে প্রথমে 'পৃথ্বী' বা 'ভারতী' পড়িয়াছিলেন। ৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে পাদটিকা দ্রষ্টব্য—শি মি]

বিষ্ণু দাস ; ইহারা কেহই যশোহরে আসেন নাই, পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীহরি জানকীবল্লভ অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ; উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল, রামলক্ষ্মণের মত তাঁহাদের মধ্যে একাত্মভাব ছিল। শিবানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণের সহিত তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের বিশেষ সদ্ভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না ; তবে শিবানন্দ নিজে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য ও রাজকার্য্যে উচ্চপদস্থ বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

দৈবযোগে একদিন সপ্তগ্রামের তখনকার শাসনকর্ত্তার সহিত শিবানন্দের মতান্তর উপস্থিত হয়। তখন দেশে অরাজকতা চলিতেছিল। সেরশাহের অকর্ম্মণ্য বংশধর আদিল শাহ দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট ; বঙ্গের শাসন কর্ত্তা মহম্মদ খাঁ স্থর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছেন ; সুতরাং সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তাও গৌড়ের অধীন থাকিতে অসম্মত। শিবানন্দের মতে সে প্রস্তাব সঙ্গত নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ মতান্তর উপস্থিত হইল। (১৫৫৪) সামান্য অনৈক্য হইতে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। হুসেন শাহ যখন গৌড়েশ্বর সেই সময়ে রামচন্দ্র প্রথম সপ্তগ্রামে চাকরী আরম্ভ করেন ; বিগত প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিষ্ঠার সহিত রাজকার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে শিবানন্দের সহিত অসদ্ভাব সূত্রে যখন রামচন্দ্রকেও অনর্থক অপদস্থ হইতে হইল, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য সেই প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে পুনরায় ভাগ্যান্বেষণে গৌড় যাত্রা করিলেন। তিনি কেবলমাত্র ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া গেলেন ; পরিবারবর্গ সপ্তগ্রামে রহিল। বৃদ্ধ রামচন্দ্র ও তৎপুত্র শিবানন্দের কার্য্যের খ্যাতি পূর্ব্বেই রাজধানীতে পৌঁছিয়াছিল ; নবীন ভূপতি মহম্মদ শাহ পুরাতন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে ছাড়িলেন না ; বিশেষতঃ সপ্তগ্রামের শাসকের বিদ্রোহিতার বার্ত্তায় শিবানন্দের বিশ্বস্ততাসম্বন্ধে তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। ক্রমে রামচন্দ্রের পুত্রেরা রাজ-সরকারে প্রবেশ করিলেন। অল্পদিন মধ্যে রামচন্দ্রও পরলোক গমন করেন। তিনিই যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ।

এদিকে মহম্মদ শাহ শীঘ্রই সেরশাহের অনুকরণে দিল্লীশ্বর হইবার কল্পনায় সসৈন্যে আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ছাপরা-মৌএর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তখন তৎপুত্র খিজির খাঁ বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বঙ্গেশ্বর হন[১]

১ 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩৫৯ পৃ, *Riaz-us-Salatin*, p. 149.

(১৫৫৫)। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ বড় বিষম গোলযোগের সময়। অল্পদিন মধ্যে আকবর সেনাপতি বৈরামখাঁর সহিত অগ্রসর হইয়া পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লীশ্বর আদিলের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজতক্ত কাড়িয়া লন (১৫৫৬)। তখন আদিল সসৈন্যে পূর্ব্বমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু পরবৎসর গৌড়েশ্বর বাহাদুর শাহ্‌ এবং মগধের শাসনকর্ত্তা সুলেমান কররাণী উভয়ে মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিলকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এইবার বাহাদুর শত্রুশূন্য হইয়া কয়েক বর্ষকাল নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশ সুশাসন করেন।[১] সম্ভবতঃ তাঁহারই রাজদপ্তরে কার্য্যদক্ষতাগুণে ভবানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহাদের পরিবারবর্গ গৌড়ে আনীত হন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ্‌ গৌড়ে নিঃসন্তান পরলোকগমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা জেলালউদ্দীন প্রায় তিন বৎসব রাজত্ব করেন। জেলালের দেহান্তে তাঁহার এক শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসান হয়, কিন্তু ৭ মাস পরে গিয়াস্‌উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি সেই শিশুকে বধ করিয়া ১১ মাস গৌড়ে রাজত্ব করেন। তখন কররাণী বংশীয় পাঠান বীর তাজ খাঁ রাজদণ্ড কাড়িয়া লন (১৫৬৩)। কিন্তু অচিরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা সুলেমান রাজতক্তে উপবিষ্ট হন। এইরূপ অবিরত রাজপরিবর্ত্তন দেখিয়াই একদা নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছিলেন :

'রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে আর নাই।'

বাস্তবিকই পদ্মপত্রে জলের মত কিছু কাল হইতে গৌড়তক্তের রাজত্ব বড় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। সুলেমানের সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সেই চাঞ্চল্য আবার থামিল ; নিপুণ কর্ণধারের হস্তে বঙ্গের শাসন-তরণী আবার কিছুকালের জন্য সদর্পে ও নিরুদ্বেগে চলিল।

সুলেমান চতুর শাসনকর্ত্তা। তিনি অরাজকতার যুগে কঠোর ভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন. কিন্তু তিনি গুণীর সমাদর করিতেও জানিতেন। কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহে যোগদান না করিয়া সব কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া, ভবানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই সুলেমানের কৃপালাভ করিয়াছিলেন ; ক্রমে তাহারা উচ্চপদ পাইলেন, ক্রমে তাহাদের ভাগ্যাকাশ

১ Stewart—*History of Bengal*, p. 166.

পরিষ্কৃত হইল। ভবানন্দ মন্ত্রিত্বলাভ করিলেন, আর শিবানন্দ হইলেন কানুনগো দপ্তরের অধ্যক্ষ। এই সময়ে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয়ে উদীয়মান যুবক। সুলেমানেরও বয়াজিদ ও দায়ুদ নামে দুইপুত্র ছিল। মন্ত্রিপুত্রের সম্মান এত বাড়িয়াছিল যে, রাজপুরীতে শ্রীহরি ও জনকীবল্লভ রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত একত্র অবস্থান, ভ্রমণ ও শিক্ষালাভ করিতেন। সে জন্য তাহাদের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। এই সৌহৃদ্যই যশোহর রাজ্যস্থাপনের মূলীভূত কারণ।

গৌড়ের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সুলেমান নিকটবর্ত্তী তাণ্ডা বা টাঁড়া নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৫৬৪)। ইহা গৌড় হইতে আকমহল (রাজমহল) যাইবার পথে গঙ্গার চড়ায় প্রাচীন খাত পাগলা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখন আর উহার চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু তখন গৌড় ও তাণ্ডা এক হইয়া গিয়াছিল।[১] তাণ্ডাতে রাজধানী থাকিলেও রাজধানীর সাধারণ নাম গৌড় বা জিন্নতাবাদই ছিল। দশবৎসর রাজত্বের পর সুলেমান পরলোকগত হন। তাঁহার শাসনকালে তদীয় সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয় একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু হিন্দু-কুলাঙ্গার কালাপাহাড়ের[২] হিন্দুবিদ্বেষ ও মন্দিরবিগ্রহাদির বিনাশজন্য সুলেমানের রাজত্বকাল কলঙ্কিত হইয়াছিল। কথিত আছে, যখন কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করিয়া জগন্নাথ-দেবের মূর্ত্তি দগ্ধ করিবার আদেশ দেন, তখন শ্রীহরির চেষ্টায় পাণ্ডারা মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিতে পারিয়া তাহার শীর্ষে অশেষ আশীর্ব্বাণী প্রদান

---

১ Stewart—*History of Bengal*, p. 169. 'Old Tanda has been utterly swept away by the changes in the course of the Pagla'—*Ain-i-Akbari* (Jarret), II, p. 129. টাঁড়া শব্দের অর্থই চর বা উচ্চস্থান। পশ্চিম অঞ্চলে এমন অনেক টাঁড়া আছে এবং অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে টাঁড়া সংযুক্ত দেখা যায়। রাজধানীকে বিশেষ করিবার জন্য তাহাকে খাস বা খাসপুর তাণ্ডা বলিত।—'গৌড়ের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, ১৬৮ পৃ।

২ ইতিহাসে দুইজন কালাপাহাড়ের উল্লেখ আছে। ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়। উভয়ই ভীষণ দেবদ্বেষী ছিলেন। প্রথম কালাপাহাড় জৌনপুরের রাজা বার্বাক শাহের সেনাপতি এবং দ্বিতীয় কালাপাহাড় সুলেমান ও দায়ুদের সেনাপতি। দ্বিতীয় কালাপাহাড় হিন্দু, তাহার পূর্ব্ব নাম কালাচাঁদ রায়, বাল্যকালে তাহাকে লোকে 'রাজু' বলিয়া ডাকিত। *Akbarnama*, III, p. 31; 'বিশ্বকোষ', ৪র্থ খণ্ড, ২০ পৃ; 'সামাজিক ইতিহাস', ৮৮ পৃ, Elliot. IV, p. 512; Briggs, II, p. 248; Dow, II, p. 153, 'গৌড়ের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ১৬৯ পৃ।

করিয়াছিলেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ শিশুকাল হইতে পরম বৈষ্ণব ছিলেন।[১]

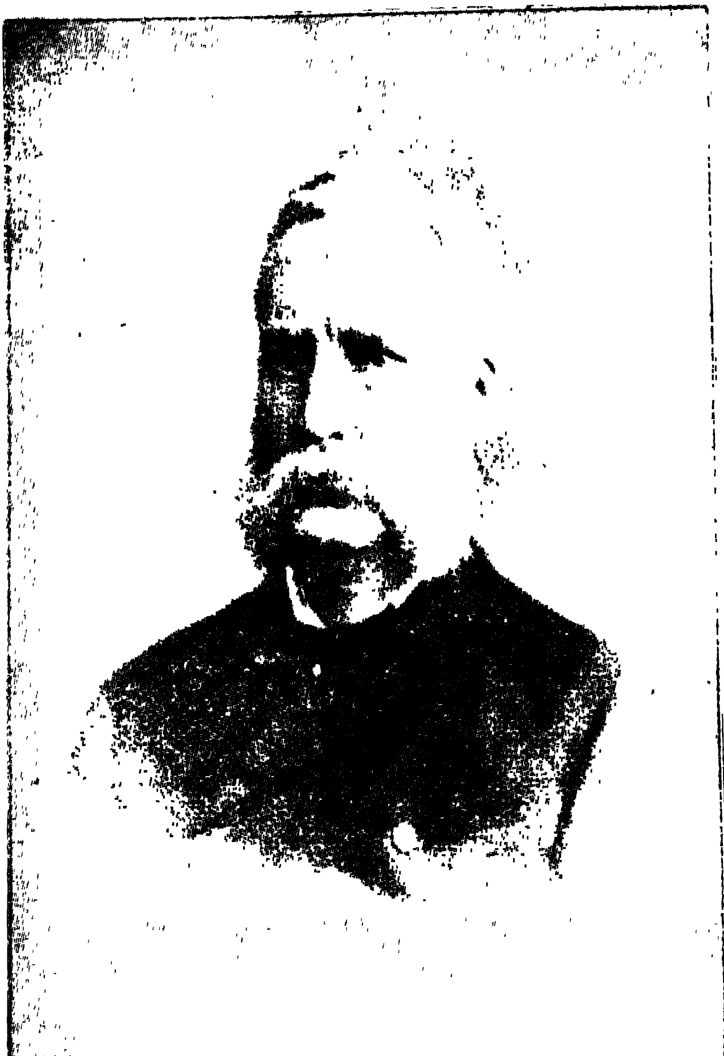
শ্রীহরির সহিত পরম কুলীন উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। যখন ভবানন্দ প্রভৃতি সপরিবারে গৌড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত পরে, অতি অল্পবয়সে শ্রীহরির ঔরসে উক্ত বসুকন্যার গর্ভে এক পুত্ররত্নের জন্ম হয়, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল—প্রতাপ। ইনিই কালে বিশ্ববিশ্রুত বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

১ রামচন্দ্রের প্রথম জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নামপ্রচার স্রোতে বঙ্গদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সে স্রোত গৌড় হইতে রূপসনাতনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। সপ্তগ্রাম ও গৌড়—রামচন্দ্রের এই উভয় কর্ম্মক্ষেত্রেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাহার বংশীয়গণ সকলেই হরিনামামৃত পান করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। বসন্ত রায় কিরূপে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তার সঙ্গলাভ করিতেন, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

২ প্রতাপাদিত্যের জন্মাব্দ স্থির করা বড় কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে বহুজনের বহুমত আছে। রামরাম বসু বলেন, যশোহরে আসিলে প্রতাপের জন্ম হয়। সুতরাং ১৫৭৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে জন্ম হইতে পারে না। জেসুইট মিশনরীগণ বলিয়া গিয়াছেন, ১৫৯৯ অব্দে প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যের বয়স ১২ বৎসর, তাহা হইলে ১৫৮৭ অব্দে তাহার জন্ম হয়। কিন্তু তখন প্রতাপের বয়স ১৩ বৎসরের অধিক নহে, সুতরাং বসু মহাশয়ের মত টিকে না। পূর্ব্বে স্থির ছিল ১৬০৬ অব্দে মানসিংহের হস্তে প্রতাপের শেষ পতন হয় এবং সেই বৎসরই তাহার মৃত্যু হয়, নুরনগর ও কাটুনিয়ার রাজবংশীয়দিগের বংশগত প্রবাদে প্রতাপ ৩৯ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, এই উভয়ের সমন্বয় করিয়া শ্রদ্ধেয় সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় ১৫৬৮ জন্মাব্দ স্থির করেন ('প্রতাপাদিত্য', ৩০ পৃ)। কিন্তু সম্প্রতি 'বহারিস্তান' নামক নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পারসীক গ্রন্থে দেখিতে পাই, ১৬০৯ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়। সুতরাং সে হিসাবে ১৫৭০ অব্দে প্রতাপের জন্ম এবং ১৫৭৮ অব্দে আগ্রা গমনকালে তাহার বয়স ৮ বৎসর মাত্র হয়; উহা অসম্ভব। ঐ একই প্রকারে ৪২ বৎসর বয়সের প্রবাদ মানিয়া লইয়া 'বিশ্বকোষের' সুলিখিত নিবন্ধে প্রতাপের জন্মাব্দ ১৫৬৪ স্থিরীকৃত হইয়াছে (১২শ খণ্ড, ২৫৮ পৃ)। কিন্তু উক্ত প্রবাদই অমূলক এবং মৃত্যু-তারিখও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং এ মতও সাহস করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ঘটককারিকায় আছে:—ইষুবেদ প্রমাণাব্দং কৃতং রাজ্যং স্ববীর্য্যত' অর্থাৎ প্রতাপ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং আরও আছে যে, সে রাজত্ব বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর আরব্ধ হয়। কিন্তু ১৬০২ অব্দের পূর্ব্বে বসন্ত রায়ের মৃত্যু না ধরিলে প্রতাপের মৃত্যু বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে অর্থাৎ ১৬৪৭ অব্দে পড়ে। ঘটককারিকার অনেক হিসাবেরই সমন্বয় করা যায় না এবং 'বহারিস্তানের' প্রমাণ পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাইব ১৫৭৮ অব্দে প্রতাপ আগ্রায় যান, তথায় বাদশাহ দরবারে তাহার প্রতিপত্তির কথাও



চণ্ডভৈরবের ত্রিকোণ মন্দির, ঈশ্বরীপুর



মহামতি বিভারিজ

পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয়

সুলেমানের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়া যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। প্রবীণ সেনাপতি লোদীখাঁর চেষ্টায় সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন (১৫৭৩)। তখনই তিনি পুরাতন বন্ধু ও বয়স্য শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে স্বীয় অমাত্যপদে বরিত করেন। তিনি শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' এবং জানকীবল্লভকে 'বসন্তরায়' উপাধি দেন।[১] অতঃপর তাঁহারা এই উপাধিতেই সকলের নিকট পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই

আছে। সুতরাং তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক এবং তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইতে পারে। তাহা হইলে জন্মতারিখ ১৫৬০ ধরা যায়। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় স্বপ্রণীত 'বঙ্গের বীরপুত্র' নামক কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তাঁহার নিকট বসন্ত রায়ের জামাতা রামরূপ বসু প্রণীত অতি পুরাতন একখানি হস্ত লিখিত পুঁথি ছিল, তদনুসারে তিনি কাব্য রচনা করেন এবং ১৫৬০ অব্দে জন্ম তারিখ স্থির করেন ('বঙ্গের বীর পুত্র' ৩৮ পৃ)। আমাদের মতে উক্ত পুঁথিখানি বিশ্বাস-যোগ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১২৯১ সালের ২৭শে ভাদ্র যোগেন্দ্রনাথের মাতার মৃত্যুদিনে উক্ত পুঁথিখানি তাঁহার হস্তভ্রষ্ট হয়, পরে আর পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, সব দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া আমরা স্থির করিতেছি যে, ১৫৬০ অব্দে বা তাহার পরে ২।১ বৎসরের মধ্যে গৌড়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয় নিখিলনাথও ১৫৬১ জন্মাব্দ স্থির করিয়াছেন।—'প্রতাপাদিত্য', ৭৯ এবং মূল ৯৫ পৃ।

১ সম্ভবতঃ দায়ুদ প্রথমে তাহাদিগকে 'বিক্রমাদিত্য' ও 'বসন্ত রায়' উপাধি দেন। পরে তাহারা যখন যশোর রাজ্য লাভ করেন, তখন তাহাদের যথাক্রমে মহারাজা ও রাজা উপাধি হইতে পারে। ঘটকেরা লিখিয়াছেন :

'বসন্তরায়-সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈব চ
প্রাপ্নুয়াৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদঃ।'

'বিশ্বকোষে'র মতে উহারা রাজোপাধি টোডরমল্লের চেষ্টায় বাদশাহের নিকট হইতে পান। নিখিলনাথ বলেন, উহা দায়ুদই দিয়াছিলেন।—'প্রতাপাদিত্য' ৮২ পৃ ও টিপ্পনী ১১, ২১। রামরাম বসুরও ঐ মত। সম্ভবতঃ দায়ুদের প্রদত্ত উপাধি টোডরমল্ল বহাল রাখিয়াছিলেন। [তবকত্-ই-আকবরীতেও দায়ুদের নিকট হইতে 'রাজা বিক্রমজিত' উপাধি প্রাপ্তির কথা আছে—'Sridhar the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the title of Raja Bikramajit...' *Tabakat-i-Akbari* (Elliot), 1873, Vol. V, p. 378,—শি মি]

সময় হইতে প্রতাপের নাম প্রতাপাদিত্য হয়। বিক্রমাদিত্য প্রধান মন্ত্রী এবং বসন্তরায় খালিসা বিভাগের কর্ত্তা ও কোষাধ্যক্ষ হন।[১] কিন্তু লোদীখাঁই রাজ্যমধ্যে সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহারই বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসিত হইত।[২]

দায়ুদ দৈবাৎ পিতৃ-রাজ্যলাভে আত্মহারা হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী, ৩,৩০০ হস্তী, ২০,০০০ বন্দুক ও কামান এবং বহুশত রণতরী তাঁহার করায়ত্ত আছে, তখনই তিনি উদ্ধত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।[৩] মোগলদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। দায়ুদ কতলু খাঁকে পুরীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন; পরে লোদী-খাঁর পরামর্শে জৌনপুরে জমানিয়ার[৪] মোগল দুর্গ আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ আকবর সুলেমানের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সুযোগ্য সেনাপতি মুনেমখাঁকে জৌনপুরে রাখিয়াছিলেন। দায়ুদের আকস্মিক আক্রমণে মুনেম পরাজিত হইয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তখন আকবর বঙ্গের পাঠান বিদ্রোহের গুরুত্ব বুঝিয়া, মুনেমের সাহায্যজন্য অগণ্য সৈন্য সহ স্বয়ং বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে লোদীখাঁ দুইলক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া মুনেমের সহিত সন্ধি করিলেন। সুলেমানের সহিত মুনেমের বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া, এই সন্ধির পথ সহজ হইয়াছিল। কিন্তু লোদীর পূর্ব্বশত্রু কতলুখাঁর পরামর্শে, দায়ুদ তাহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া বিশ্বাসঘাতকের মত লোদীর প্রাণ সংহার করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই সাধন করেন।[৫] এদিকে সন্ধির

১ 'বভুব খালিশাধীশঃ গৌড়কোষাধিপস্তথা'—ঘটককারিকা।

২ '(Ludi Khan) was the rational spirit of the eastern provinces and was helpful in promoting the cause of the Afghans'—*Akbarnama*, (Beveridge), III, p. 97.

৩ *Riaz-us-Salatin* pp 154-5.

৪ জমানিয়া দুর্গ বা প্রাচীন জমদগ্নি মুনির আশ্রম। উহা এক্ষণে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত।

৫ *Riaz*., p. 156.; *Tarikh-i-Badauni* (Elliot), V, p. 512; *Tabakat* (Elliot), V, p. 373. রিয়াজের মতে শুধু কতলুর পরামর্শে এবং নিজামউদ্দীনের মতে কতলু ও বিক্রমাদিত্য উভয়ের পরামর্শে দায়ুদ লোদীকে হত্যা করেন। শেষোক্ত মতে লোদীর প্রতি কতলু ও বিক্রমাদিত্য উভয়ের বিদ্বেষ ছিল। যাহাই থাকুক, অন্যায়রূপে লোদীকে হত্যা করা অত্যন্ত অধর্ম্মও মূর্খতার কার্য্য

প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহ টোডরমল্লকে[১] মুনেমের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান ; সেই সংবাদ পাইয়া এবং লোদীর মৃত্যুতে আশ্বস্ত হইয়া মুনেম গৌড়জয় করিবার জন্য সদর্পে পাটনা অবরোধ করেন। তখন শোণ নদের মোহানায় এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, দায়ুদ পাটনা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন (১৫৭৪)।

এদিকে দূরদর্শী ভবানন্দ মোগলের বিক্রম এবং আকবরের রাষ্ট্রজয়ের সংবাদ জানিতেন। সুলেমানের মৃত্যুর পর যখন রাজতক্ত লইয়া নানা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মকলহে লিপ্ত দৃপ্ত পাঠান কখনও মোগল-বীরের মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না ; আজ হউক, কাল হউক, এক ভীষণ দুঃখময় সময় আসিবে ; এখনও একটু মাথা রাখিবার স্থান রাখা প্রয়োজনীয়। তখন পরিবারস্থ সকলে পরামর্শ স্থির করিলেন। গুণানন্দ পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; কর্ম্মনিষ্ঠ শিবানন্দ এ সব কার্য্যে উদাসীন। ভবানন্দ জানিতেন, দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্ব্বপারে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত ভূভাগ ছিল ; প্রাচীন যশোর রাজ্যের অন্তর্গত এই ভূভাগ চাঁদ খাঁ মছন্দরী নামক এক ভূস্বামীর জায়গীরভুক্ত।[২]

হইয়াছিল। লোদীই দায়ুদকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। এই পরামর্শের জন্য বিক্রমাদিত্যের চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধনের মত পাপ আর নাই।

১ টোডরমল্লের নামের বহুবিধ বানান দেখিতে পাওয়া যায়,—টোডরমল্ল, তোড়লমল্ল, তোডরমল্ল, তোদরমল প্রভৃতি। কিন্তু 'টোডরানন্দ' বলিয়া তাঁহার একখানি প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। উহাতে তিনি নিজ নাম টোডরমল্ল বলিয়াই লিখিয়াছেন।—'বিশ্বকোষ', ৭ম, ৪০৩ পৃ।

২ 'দক্ষিণদেশে যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী দক্ষিণ সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল, সে নিঃসন্তান মরিয়াছে…'—রামরাম বসু। মহামতি বিভারিজ অনুমান করিয়াছিলেন, 'Chand Khan may well have been one of Khanja Ali's descendants' (*Bakarganj* p. 177); কিন্তু হয়ত তিনি জানিতেন না যে, বাগের-হাটের খাঁ জাহান স্বয়ং খোজা বা নপুংসক ছিলেন এবং তিনি নিঃসন্তান। তবে তাঁহার বহু অনুচর বা শিষ্য ছিল। তাঁহার অধিকৃত রাজ্য যে শিষ্য-পরম্পরায় ক্রমে হস্তগত হইতেছিল, তাহা অনুমান করা যায়। যদিও খাঁ জাহানের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে এই চাঁদ খাঁর আবির্ভাব দেখা যায়, তবুও কোন না কোন সূত্রে খাঁ জাহানের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে। চাঁদ খাঁ চক্ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, উহার অধিকাংশ জঙ্গলময়। এই চাঁদ খাঁ নাম হইতেই ভবিষ্যতে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যকে বৈদেশিকেরা Chandican বা Ciandecan বলিতেন। সে কথা পরে বলিব। জঙ্গলাকীর্ণ চকের উত্তরাংশ বর্ত্তমান সাতক্ষীরা সহরের কিছু উত্তর দিকে এখনও চাঁদ খাঁ মছন্দরীর বসতি বাটীর নিদর্শন পাওয়া যায়।

চাঁদ খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পড়ায় এ প্রদেশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না। উহা এক নদীবহুল বনাকীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত, সুতরাং সহজে দুর্গম। ভবানন্দ এই সন্ধান বাহির করিয়া, উহাই তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যক্ষেত্র বলিয়া স্থির কবিলেন। বিক্রমাদিত্য উহা দাযুদের নিকট যে প্রার্থনামাত্রই পাইলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য; সঙ্গে সঙ্গে যশোহর-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইতে চলিল। রাজ্য পাইবামাত্র বিলম্ব করিবার উপায় নাই, কারণ মোগল-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, এবং নিত্য নূতন দুর্ঘটনার সংবাদ আসিতেছে।

ভবানন্দ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোপেক্ষা উদ্যমী ও কর্ম্মক্ষম বসন্ত রায়কে চাঁদ খাঁ জায়গীরে পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা হইতে হুগলী-ত্রিবেণীর সন্নিকটে যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। তখনকার যমুনা এখনকার যমুনার মত শীর্ণা, ক্ষীণা, শৈবাল-মণ্ডিতা ক্ষুদ্র নদী নহে; তখন যমুনা প্রবল তরঙ্গশালিনী ক্রমবর্দ্ধিতায়তনী সমুদ্রগামিনী প্রচণ্ড নদী। এখন গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর রেলওয়ে পুল রহিয়াছে, তাহাকে যমুনা বলিয়া মনে করা কঠিন হয়; তবে লক্ষ্য কবিয়া দেখিলে, সেখানেও যমুনা এক সময়ে একমাইলের অধিক প্রশস্ত ছিল, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। ক্রমে ঐ নদী দক্ষিণে গিয়া ইচ্ছামতীর প্রবাহ লইয়া আরও প্রবল ও প্রশস্ত হইয়াছে। এখনও হাসনাবাদ প্রভৃতিস্থানে এই যুক্ত-প্রবাহের বিস্তৃতি প্রায় দুই মাইল হইবে। বসন্ত রায় বহুসংখ্যক নৌকা, রসদ এবং লোকজন লইয়া এই যমুনা-পথে চাঁদখাঁ চকে আসিলেন; জঙ্গল কাটিয়া এক নূতন রাজ্য পত্তন করিলেন; কোন প্রকারে গড়বেষ্টিত স্থানে উচ্চভূমির উপর যথাসম্ভব সত্বরতার সঙ্গে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া পরিবারবর্গ তথায় লইয়া আসিলেন। প্রাণের দায়ে এবং অর্থের বাহুল্যে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়; ভবানন্দের পরামর্শে এবং বসন্ত রায়ের কার্য্যদক্ষতায় যাহা সম্ভব, তাহা সুন্দর হইল; আত্মরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হইল; ভবানন্দ পরিবার-বর্গের অভিভাবক হইয়া থাকিলেন; শিবানন্দ এ অঞ্চলে আসিতেই চাহিলেন না। তিনি পূর্ব্বনিবাস বাকলায় গিয়া বসতি নির্দ্দেশ করিলেন।

এদিকে প্রবল মোগল শত্রু দলে দলে, জলে স্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন দাযুদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে বাকী রহিল না। এক সহস্র রণতরী লইয়া সম্রাট্ আকবর স্বয়ং পাটনায় পৌছিলেন। গঙ্গার অপর পারে হাজিপুরে আলম খাঁ

গিয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে স্বয়ং আকবরও উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধে মোগলেরা জয়লাভ করিল। দুর্গাধ্যক্ষ ও সেনানীগণের ছিন্নশির মোগলেরা নৌকা বোঝাই করিয়া দায়ুদের নিকট পাঠাইয়া দিল। তখন দায়ুদের ভয়ার্ত্ত আমীরগণ মহা গণ্ডগোল তুলিলেন। তাহাদের পরামর্শে পলায়ন বা আত্মসমর্পণই একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির হইল। দায়ুদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না; তিনি বুঝিলেন, ঔদ্ধত্যের ফল ফলিয়াছে; কিন্তু যখন জীবন-নাট্যের শেষাভিনয় নিকটবর্ত্তী, তখন বীরের মত আত্মোৎসর্গই শ্রেয়ঃ। আমীরেরা তাহা বুঝিলেন না; কতলু খাঁ দায়ুদকে মাদক-সেবনে হতজ্ঞান করিয়া তাঁহাকে লইয়া নৌকাপথে পলায়ন করিলেন।[১] তখন বিক্রমাদিত্য তাঁহার ধনসম্পত্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করিলেন।[২]

বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বেই নিজ সম্পত্তি এবং পরিজনবর্গ যশোরে পাঠাইয়াছিলেন। এখন দাযুদের ধনরত্ন অঙ্কগত হইল। পলায়িত দাযুদের জ্ঞান হইলে, এ সম্বন্ধে বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার অনেক কথা হইল। পলায়ন-পথে সে দুর্ব্বহ ধনভার লইয়া লাভ নাই, কারণ হয়তঃ তাহা মোগলেরা লুটিয়া

১ 'At last Katlu gave him (Daud) some narcotic draught, put him in a boat and escaped with him on the river Ganges.'—*Twarik-i-Daudi* (Elliot), Vol IV, p. 512. *See also*, the account of Daud in *Makhzan-i-Afghnni* and *Twarikh-i-Khan Jahan Lodi.* 'Dawood Khan... embarked in a boat at the water gate after it was dark and retreated towards Bengal'—*Ferishta* (Briggs), Vol. II, p. 245; Dow—*Indostan*, Vol. II, p. 250.

২ 'Sridhar the Bengali who was Daud's great supporter...placed his valuables and treasure in a boat and followed him.'—*Tabakat-i-Akbari* (Elliot), Vol. V, p. 378. 'Srihari who was Daud's rational soul was going off rapidly to the country of Catar (Jessore)'—*Akbarnama*, (Beveridge), Vol. III, p. 172. *See also*, *Al-Badaoni* (Lowe), Vol. II, p. 184. 'গৌড়েশ্বরের সোণারূপা পিত্তল কাঁসা যত কিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল, সমস্তই সহস্রাধিক নৌকা বোঝাই করিয়া দুর্ভেদ্য ও নির্জ্জন যশোহর নামক স্থানে আনিয়া রাখা হইল'—'বিশ্বকোষ', ১৮শ খণ্ড, ৪৯৩ পৃ। এই সকল উক্তিতে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা একেবারে অমূলক নহে। প্রবাদের সহিত ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যও প্রবল। এ প্রসঙ্গে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (রাখালদাস), ২য় খণ্ড, ৩৭৭ পৃ দ্রষ্টব্য।

লইবে। সুতরাং সমস্ত ধনরত্ন তিনি মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যের নিকট এই বলিয়া গচ্ছিত রাখিলেন যে, যদি কখনও মোগলের হাত হইতে বঙ্গদেশ তাঁহার করায়ত্ত হয়, তবে উহা গ্রহণ করিবেন, নতুবা উহা বিক্রমাদিত্যেরই থাকিল। তবে তাঁহাকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করান হইল যে, তিনি কখনও মোগলের পক্ষভুক্ত হইয়া পাঠানের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন না এবং এই অর্থভার বঙ্গের স্বাধীনতা এবং পাঠানের প্রভুত্ব রক্ষার জন্যই ব্যয় করিবেন। দায়ুদের তখন মনের ভীষণ অবস্থা; কোথায় তিনি প্রবল যুদ্ধে হারাইয়া মোগলকে তাড়াইয়া দিবেন, আব কোথায় আজ তিনি পরাজিত, লাঞ্ছিত এবং পলায়িত। উড়িষ্যা হইতে পাঠান সৈন্য আসিবার কথা ছিল, দায়ুদ সেই দিকে ছুটিলেন। বিক্রমাদিত্য নৌকাযোগে ধনভার যশোরে পাঠাইলেন।

দায়ুদের পলায়নের সংবাদ পরদিন প্রাতে আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ পাটনা দুর্গ অধিকার এবং নগরী লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। দায়ুদের সেনাপতি গুজর খাঁ কতকগুলি হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি দিয়া নিজে দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আকবর মুনেম খাঁকে বাদশাহী সৈন্যের সেনাপতি রাখিয়া স্বয়ং গুজরের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং দারিয়াপুরের[১] সন্নিকটে প্রায় ৪০০ হস্তী হস্তগত করিয়া লইলেন। মুনেম খাঁকে 'খাঁ খানান্' উপাধিসহ বাঙ্গালার নবাব কবিয়া আকবর শীঘ্রই আগ্রায় প্রত্যাগত হইলেন।

দায়ুদ তাণ্ডায় আসিলেন। তখনও তাঁহার উড়িষ্যার সৈন্য আসে নাই, অথচ মুনেম খাঁ নিকটবর্ত্তী। সুতরাং তিনি আবার উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করিলেন; তাণ্ডা বিনা রক্তপাতে মোগলের করায়ত্ত হইল। টোডরমল্ল দায়ুদের পশ্চাতে চলিলেন। উড়িষ্যায় যে পাঠান বল ছিল, তাহা লইয়া জুনেদ খাঁ[২] টোডরমল্লের দুই দল সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। তখন সাহায্যার্থ মুনেম খাঁ আসিলেন এবং জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মোগলমারী বা তুকারই নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ

১ বর্ত্তমান মোকামাঘাট ষ্টেশনের এক ক্রোশ দক্ষিণে।

২ ঐতিহাসিক নিজামউদ্দীনের মতে (Elliot, Vol. V, p. 385) দায়ুদের খুল্লতাত পুত্র এবং ফেরিস্তার মতে তাঁহার নিজের পুত্র জনৈদ খাঁ।

হইল। এ যুদ্ধে পাঠানবীর গুজর খাঁ অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন; সে বীরত্বের ফলে মুনেম পরাজিত ও আহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাঠান সেনা তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন মুনেম মহাকৌশলে পুনরায় সেনা সমাবেশ করিলে, হঠাৎ তীরের আঘাতে গুজর নিহত হইলেন; দায়ুদের পরাজয় হইল, তিনি আবার পলায়ন করিলেন। এবার টোডরমল্ল তাঁহাকে সবেগে সমুদ্র পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তখন দায়ুদ অনন্যোপায়, তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মুনেমের সহিত এক সন্ধি করিলেন।[১] উড়িষ্যা দায়ুদকে দেওয়া হইল; মুনেম আসিয়া বঙ্গবিহারের কর্ত্তা হইয়া গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

কিন্তু সে গৌড় আব নাই। বহুকাল হইতে বাঙ্গালার রাজধানীরূপে মনুষ্যাবাসের ঘনসন্নিবেশবশতঃ গৌড় নানা ব্যাধির আকর-স্থল হইয়াছিল। এজন্যই সের খাঁ বা সুলেমান উহা পরিত্যাগ করেন। মুনেমের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। ফলে অচিরকাল মধ্যে গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইল। উহাতে সে প্রাচীন নগরী একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। মুনেম খাঁ স্বয়ং সে করাল ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সংবাদ আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি ব্যস্ত হইয়া হুসেনকুলি খাঁকে 'খাঁ জাহান্' উপাধি দিয়া বঙ্গেশ্বর করিয়া পাঠাইলেন (১৫৭৫); কিন্তু লাহোর হইতে সৈন্য লইয়া খাঁ জাহানের বঙ্গে পৌছিতে একটু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে দায়ুদ উড়িষ্যা ও বঙ্গের সামন্তরাজগণের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অস্ত্র ধারণ করেন এবং প্রবল বেগে আসিয়া তাণ্ডা অধিকার করিয়া লন। অবশেষে খাঁ জাহান বহু সৈন্য লইয়া বঙ্গে আসিলে, আকমহলের সন্নিকটে উভয়দলে এক ভয়ঙ্কর অস্ত্রক্রীড়া হয়। এই যুদ্ধে দায়ুদের দুই পার্শ্বে কালাপাহাড় ও জুনেদ খাঁ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ বসন্ত রায় এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। দায়ুদ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও ভাগ্যদোষে পরাজিত হইলেন;[২] জলাভূমিতে তাঁহার অশ্বের ক্ষুর ভূমি-

---

১ Daud was acknowledged as King of Orissa and he 'gladly exchanged the throne of Bengal for the province of Orissa as a fief of the Moghul Emperor.' —Hunter, *Orissa*, Vol. II, p. 14. *Akbarnama* (Beveridge) III p. 184-5.

২ কেহ কেহ বলেন কতলু খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দায়ুদের পরাজয় ঘটে; *Makhzan-i-Afghani* (Elliot), IV, p. 513 *note.*

প্রোথিত হওয়ায় তিনি ধৃত হন।[১] খাঁ জাহানের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইল এবং তাহার ছিন্ন মুণ্ড সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল।[২] এখানেই বঙ্গের পাঠান রাজত্বের অবসান।

১ Badaoni (Lowe), Vol II, p. 245; *Akbarnama*, Vol. III, p. 255.

২ বাদাউনী বলেন, দায়ুদ বড় সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে হত্যা করিতে খাঁ জাহানের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমীরগণের প্ররোচনায় অবশেষে তাঁহাকে হত্যার আদেশ দিতে হইল।—Bad., II, p. 245.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যশোর-রাজ্য

দায়ুদ খাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই যশোর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৫৭৪)। সেখানে দুর্গ-সংস্থাপন ও গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে না হইতে, বসন্ত রায় আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ধনসম্পত্তি যশোরে প্রেরণ করেন। যখন দায়ুদের মোগল-বিদ্রোহ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল, তখন শুধু বঙ্গেশ্বর দায়ুদ নহেন, তাঁহার অনেক আমীর ও প্রধান কর্ম্মচারীও নিজ নিজ বহু সম্পদ বিক্রমাদিত্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন। যেদিন দায়ুদ নিশাকালে নৌকাযোগে পাটনা-দুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সেদিন কিরূপে বিক্রমাদিত্য অপরিমিত ধনরত্ন নৌকায় বোঝাই কবিয়া লইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মোগল-সৈন্য তেলিয়াগড়ি পার হইয়া তাণ্ডার নিকটবর্ত্তী হইলে, দায়ুদ হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি লইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন; তখন অনেক ধনরত্ন যশোরে আসিয়াছিল। রাজধানী লুণ্ঠনের ভয়ে নগরবাসীরা অনেকে ঐ সময়ে স্ব স্ব বসন-ভূষণ পর্য্যন্ত বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান করেন। তাঁহারা ক্রমে নৌকাযোগে ঐ সকল দ্রব্যাদি যশোরে প্রেরণ করিতেছিলেন। পরবর্ত্তী যুদ্ধে ও মহামারীতে সমস্ত নগরবাসী ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন হওয়ায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকে প্রাণত্যাগ করায়, প্রত্যর্পণ-প্রার্থীর অভাবে ঐ সকল সম্পত্তির অধিকাংশ যশোরে থাকিয়া যায়। ইহা ভিন্ন যুদ্ধভয়ে এবং মহামারীর উৎপাতে গৌড়-তাণ্ডার কত অধিবাসী যে যশোর রাজ্যের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

গৌড় নগরী বহুশত বৎসর হইতে প্রধান রাজধানী ছিল। হিন্দু ও পাঠান নৃপতিগণের অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার শোভা ও গৌরব বর্দ্ধন করিতে কখনও কাতরতা করে নাই। কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর হুসেন শাহের আমলে গৌড়ের অনেক মধ্যবিত্ত লোকও স্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত। এখনও 'হুসেন শাহের আমল' বলিলে, এক গৌরবময় স্থবর্ণযুগের কথা স্মরণ-পথে আনিয়া দেয়। সেই হুসেনী গৌড়,—সেই হিন্দুর গৌরব-প্রদীপ্ত, বৌদ্ধের কীর্ত্তিমণ্ডিত, পাঠানের বিলাস-বিলসিত, ধনসমৃদ্ধ ও হর্ম্মমালাসমন্বিত পুরাতন মহানগরী বহুযুগ ধরিয়া যে সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার কতকাংশ এক দৈব দুর্যোগে সুদূর

সুন্দরবনে আসিয়া, বসন্ত রায়ের নব প্রতিষ্ঠিত যশোর-রাজ্যের মহিমা বর্দ্ধন করিল।

যশোর নূতন রাজ্য নহে, বসন্ত রায় উহা নূতন করিয়া গড়িয়া ছিলেন মাত্র। যশোরের প্রাচীনত্বের কথা বিশেষভাবে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে চাঁদ খাঁ চকের কথা বলিয়াছি, তাহা এই যশোর রাজ্যেরই একাংশ। সুন্দরবনের উত্থানপতনে কত যুগ যুগান্তরের কীর্ত্তিচিহ্ন লোকচক্ষুর বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সব চিহ্ন যায় নাই। বসন্ত রায় আসিয়া বন কাটাইয়া নূতন আবাদ, নূতন গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে বন চিরকালই বন ছিল না, এক সময়ে সেখানে জনস্থানও ছিল। আমরা প্রথম খণ্ডে সুন্দরবনের ইতিহাস প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, সমতটের এই সব অংশ প্রাকৃতিক কারণে কতবার উঠিয়াছে, কতবার পড়িয়াছে। সুন্দরবনের উন্নমনে কত স্থান উঠিয়া মনুষ্যাবাসে পরিণত হইয়াছে, আবার আকস্মিক অবনমনে সে সব স্থান বসিয়া গিয়া ভূগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা দেখিব, কিরূপে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; কিন্তু সে মূর্ত্তির আবির্ভাব প্রাচীনকালে আরও কতবার হইয়াছিল, কত ভাগ্যবান্ ভক্ত সে মূর্ত্তির জন্য কতবার মন্দির গড়িয়াছিল। সুতরাং বসন্ত রায়ের যশোর যে নূতন কিছু, তাহা নহে ; ইহার পুরাতন কাহিনী যুগান্ত-বিস্তৃত।

যশোহরের প্রাচীনত্বের চিহ্ন আমরা এখনও পাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কালীগঞ্জ হইতে ঈশ্বরীপুরের মধ্যে নানাস্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা আমার হস্তগত হইয়াছে। উহার মধ্যে তিনটি প্রাচীন হিন্দু আমলের 'কার্ষাপণ' বা 'পুরাণ' নামক রৌপ্য মুদ্রা আছে।[১] প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আলেকজেণ্ডারেরর আক্রমণের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে মুদ্রা প্রচলনের নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত বৌদ্ধজাতকে কার্ষাপণ বা কাহাপণ নামক ভারতীয় মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়।[২] 'নাতিস্থূল রূপার পাত

১ কালিয়া-নিবাসী বন্ধুবর হিরণ্যকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় এই মুদ্রা কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন।

২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; 'প্রাচীনমুদ্রা', ১১-২ পৃ ; Rhys Davids, *Ancient Weight & Measures*, pp. 1-8.

খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ রজতমুদ্রা নির্ম্মিত হইত; পরে বিশুদ্ধি জ্ঞাপনের জন্য এই সকল মুদ্রার এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বে অঙ্কচিহ্ন মুদ্রাঙ্কণ' করা হইত।[১] এইজন্য এই সকল মুদ্রাকে অঙ্কচিহ্নযুক্ত (punch-marked) মুদ্রা বলে।[২] ইহা পুরাণ, কার্ষাপণ বা রূপ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। মনুর মতে তাম্রমুদ্রাকেই কার্ষাপণ বলে, কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে কার্ষাপণ বলিতে রজত বা সুবর্ণমুদ্রাও বুঝাইত। সেন রাজগণের তাম্রশাসনে, বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবনের তাম্রশাসনে, বহুস্থলে পুরাণের উল্লেখ আছে।[৩] পুরাণ যে রৌপ্য মুদ্রা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' হইতে জানিতে পারি, লক্ষ্মণসেন দেব যশোরেশ্বরীর মন্দির সন্নিধানে চণ্ডভৈরবের এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।[৪] প্রাচীন যশোরের সহিত লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সূত্রে সে সময়ের 'পুরাণ' মুদ্রা এ অঞ্চলে প্রচারিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক বিপ্লবে ঐ সকল স্থান মনুষ্যাবাসের অযোগ্য হইলে, নানাস্থানে নানাপাত্রে ঐ সকল মুদ্রা মৃত্তিকা-গর্ভে রক্ষিত হইতে পারে। বসন্ত রায় আসিয়া নূতন গ্রাম পত্তন করিলে পুনরায় তদবধি ঐ সকল মুদ্রা স্থানীয় লোকের নিকট থাকিয়া যাইতে পারে। আমি যে তিনটি মুদ্রার চিত্র বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশ করিতেছি, উহাকে পুরাণ বা রজত কার্ষাপণ বলা যাইতে পারে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি মুদ্রাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে গোলাকার ও অসমচতুষ্কোণ এই দুই প্রকার এই জাতীয় মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিকট দুই প্রকার মুদ্রাই আছে, উহার দুইটি গোলাকার এবং একটি অসমচতুষ্কোণ। তবে কোন গোলাকার মুদ্রার দুই পাশ ছাটিয়া লওয়ায় অসমচতুষ্কোণ হইয়াছে কিনা, ঠিক বলা যায় না। নিম্নশ্রেণীয় লোকে এই সকল মুদ্রা অলঙ্কারের মত গলায় পরিতেন বলিয়া উহাতে এখনও রৌপ্যের কড়া লাগান বা চিহ্ন আছে। এই সকল মুদ্রার বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্য, উহা যে সব নগরে মুদ্রিত হইত, তাহার চিহ্ন বা লাঞ্ছন দেওয়া থাকিত।[৫] এই জাতীয় মুদ্রার বিবরণীতে যে সকল চিহ্নের কথা

১ 'প্রাচীনমুদ্রা' (রাখালদাস), ১৬ পৃ।

২ Rapson, *Indian coins*, p. 3.

৩ 'প্রাচীনমুদ্রা' (রাখালদাস), ১৪-১৫ পৃ।

৪ বর্ত্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২০৭ পৃ।

৫ 'প্রাচীনমুদ্রা' (রাখালদাস), ১৬ পৃ।

উল্লিখিত হইয়াছে,[১] তাহার অনেকগুলি চিহ্ন আমার মুদ্রায় দেখা যায়।[২] উহা হইতে মুদ্রাগুলির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। আর এইরূপ বহু প্রকারের মুদ্রা যে এখনও এই প্রদেশে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, তাহাতে যশোরের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ হয়।

সেই বহুকালের প্রাচীন পতিত রাজ্য কাননাবর্জ্জনা ত্যাগ করিয়া আবার উঠিল। ইহার নাম পূর্ব্বে ছিল—'যশোর,' এখন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া সুপণ্ডিত বসন্ত রায় কর্ত্তৃক 'যশোহর' নামে কীর্ত্তিত হইল।[৩] সুতরাং যশোহর একটি আধুনিক নাম। প্রতাপাদিত্যের আমলের পূর্ব্বে লিখিত কোন প্রাচীন পুস্তকে 'যশোহর' নামে যশোর কখনও অভিহিত হয় নাই।[৪]

প্রথমতঃ বসন্ত রায় আসিয়া উপনিবেশের স্থান বাছিয়া লন। উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা অত্যল্পকাল মধ্যে কার্য্যে পরিণত হয়। তখন উপবঙ্গে যশোর রাজ্যের

১ J. A S. B., 1890, part 1, p. 151.

২ রথ, রথের চক্র, অশ্ব, রথের মধ্যে উপবিষ্ট মূর্ত্তি এবং আরও বহুবিধ চিত্র আমার মুদ্রাতে আছে।

৩ দিগ্বিজয় প্রকাশে—'উপবঙ্গে যশোরাদি দেশ কানন-সংযুতা'; তন্ত্রচূড়ামণিতে—'যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ', ভবিষ্যপুরাণে—'যশোর দেশ বিষয়ে', ঘটককারিকায়—'চন্দ্রদ্বীপ শিরস্থানং যশোরা বাহবস্তথা', ইত্যাদি সর্ব্বত্রই 'যশোর' শব্দ আছে। ক্যানিংহাম সাহেবের মতে আরবীয় জসর (সেতু) শব্দ হইতে যশোর শব্দের উৎপত্তি।—*Ancient Geography*, p. 502; বর্ত্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৬-৯ পৃ দ্রষ্টব্য। বসন্ত রায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ইহার 'যশোহর' নাম হইয়াছিল।

৪ বর্ত্তমান যশোহর জেলার সদর ষ্টেশন সহর যশোহর বা Jessore এর সহিত এই প্রাচীন যশোরের রাজধানী যশোহরের কোন সম্পর্ক নাই, বলিলেও চলে। অনেকে রেলপথে সহর যশোহরে নামিয়া বিক্রমাদিত্যের রাজধানী যশোহরের ভগ্নাবশেষের অনুসন্ধান করেন। এমন কি, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নব্যবয়সের নভেল 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' ভৈরব-তটে প্রতাপের রাজধানী যশোহর অবস্থিত এবং ভৈরব-বক্ষে কামানগর্জ্জনে প্রতাপের নিদ্রাভঙ্গ হইল এইরূপ বর্ণনাই আছে; দুঃখের কথা বলিবার নহে, বিংশাধিক সংস্করণেও সে ভ্রান্তির সংশোধন হয় নাই। সহর যশোহরের প্রাচীন নাম মুড়লী-কস্‌বা বা শুধু কস্‌বা। সেই পাঠান আমলের কস্‌বা বা সহরে যশোর-রাজ্যের একটি কিল্লা বা দুর্গ ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর চাঁচড়ার রাজবংশীয়েরা যশোর রাজ্যের একাংশ পাইয়া 'যশোরের রাজা' বলিয়া পরিচিত হইয়া সেখানে বাস করেন। ইংরাজগণ জেলা করিবার সময়ে কস্‌বার বদলে যশোহর (Jessore) নাম করিয়া দেন।—বর্ত্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৮ পৃ।

সীমা ছিল পূর্ব্বভাগে মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর,[১] পশ্চিমে কুশদ্বীপ ও প্রাচীন ভাগীরথীর খাত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। কুশদ্বীপ বা কুশদহ, বর্ত্তমান বসিরহাট ও বনগ্রাম মহকুমাব অন্তর্গত। ইহারই অন্তর্ভুক্ত গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে যমুনা ও ইচ্ছামতী সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। বর্ত্তমান টাকী ও হাস্‌নাবাদের দক্ষিণে আসিয়া এই যুক্তনদী কালিন্দী নামে ক্ষুদ্র শাখা রাখিয়া বামদিকে প্রবাহিত হইত। কালিন্দী তখন একটি ক্ষুদ্র খাল মাত্র; এখনকার মত বিপুলকায়া প্রবল নদী ছিল না। উহারই মোহনার দক্ষিণভাগে সমস্ত ভূভাগ ভীষণ সুন্দরবন ছিল। ঐ যমুনা ও কালিন্দীর মোহানার নিকট বসন্ত রায় প্রথম পত্তন করেন এবং তিনিই স্বীয় নামানুসারে স্থানটির নাম রাখেন—বসন্তপুর।

তখন এই স্থান হইতে বনের আরম্ভ হইয়াছিল। বসন্ত রায় এই স্থান হইতে বন কাটাইয়া দশ বার মাইল স্থান পরিষ্কৃত করেন। বিলম্ব করার উপায় ছিল না; এজন্য তিনি যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত একটি স্থান গড়বন্দী করিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই স্থানকে এক্ষণে গড় মুকুন্দপুর বলে।[২] বৃদ্ধ ভবানন্দ ও অন্য পরিবারবর্গ এই স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। কেবল রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া—বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ তাণ্ডার রাজধানীতে

১ কেশবপুর যশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। উহা যশোহর সহর হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কেশবপুর এখনও চিনি, গুড়, লঙ্কা ও বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

২ 'সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন। পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল।'—রামরাম বসু, 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র', ১৮০১, প্রথম সংস্করণ, ১৮ পৃ। ['প্রতাপাদিত্য' (নিখিলনাথ), মূল ৭ পৃ—শি মি]

মুকুন্দপুরে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বসন্তরায়ের প্রতিষ্ঠিত যশোহর রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া প্রতাপাদিত্য নিজের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই উভয় রাজধানীর অবস্থান লইয়া অনেক মতভেদ আছে। আমরা পরে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে উহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। মুকুন্দপুর অঞ্চলে বিক্রমাদিতের রাজধানী ছিল, এইটুকু আপাততঃ জানিয়া রাখা ভাল। মুকুন্দপুরের নামই এক্ষণে গড় মুকুন্দপুর, সেখানে এখনও গড়বন্দী বিস্তীর্ণ স্থান আছে, নদীর মত সে গড়ে বারমাস জল থাকে। সাতক্ষীরা ষ্টেটের ম্যানেজার লক্ষ্মণচন্দ্র রায় মহাশয় এই গড়বন্দী স্থানে বাস করিতেছেন।

ছিলেন। বসন্ত রায় দায়ুদের পলায়নের পর ধনরত্ন বোঝাই নৌকা লইয়া যশোরে আসেন। কতবার এইরূপ ধনরত্ন আসিয়াছিল, তাহার হিসাব নাই। দায়ুদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সন্ধির পর, যখন মুনেম খাঁ গৌড়ে আসিয়া রাজধানী খুলিয়া বসেন, তখন বিক্রমাদিত্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং মহামারীর সময়ে পলায়নপর বহু হিন্দু পাঠান ভদ্রলোকদিগকে প্রবোধ দিয়া যশোরে প্রেরণ করেন। গৌড় বহুকাল হইতে হিন্দু ও পাঠানের রাজধানী ছিল। সুলেমান প্রভৃতির আমলে শুধু পাঠান নিবাস নহে, তথায় বহু সামন্ত রাজন্যবর্গের আবাস-বাটিকা ছিল। এমন কি, বর্ত্তমান কলিকাতার মত, বহুলোকে পৈতৃক গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া গৌড় ও তাণ্ডায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একে মোগলের লুণ্ঠন ও অত্যাচার, তৎপরে স্বপ্নাতীত মহামারীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, উভয় বিপদে গৌড়বাসীরা একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাশের প্রতিও লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। নবনির্ম্মিত, কাননবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত যশোর রাজধানীর প্রতিপত্তির কাহিনীও লোকমুখে গৌড়ে পৌছিতেছিল। সুতরাং অনেকের মনে ধারণা হইল যে, শুধু স্বাধীনতা রক্ষা নহে, জীবনরক্ষার জন্যও যশোরের বক্ষ তাহাদের আশ্রয়স্থান। কত পরাজিত পাঠান সেনানী, কত লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব দেশীয় রাজন্য, পিতৃমাতৃহীন বা রাজ্যহীন রাজকুমার, পলায়িত পরিবারের অশক্ত আত্মীয়, প্রতিহিংসালোলুপ পাঠান সর্দ্দার এবং সর্ব্বোপরি চাকরীবিহীন অসংখ্য পাঠান সৈন্য—সকলেই যশোরকে একমাত্র শরণস্থল মনে করিয়া নানা পথে সেদিকে অগ্রসর হইল। এদিকে অরণ্য মধ্যে রাজ্য পত্তন করিয়া গুহপরিবারস্থ সকলে নবাগতদিগকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যে যশোহর প্রদেশ বহুজনসমাগমপূর্ণ জনপদে পরিণত হইল। এই সময়ে দায়ুদের শেষ পরাজয় ও হত্যা হইল। তখন সকল আশা ফুরাইল, পাঠানের সকল সাধনা বিফল হইয়া গেল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় দায়ুদের সঙ্গে সঙ্গে বা নিকটে নিকটে ছিলেন। এখন আর সেরূপ থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না। সুতরাং তাঁহারা তখন হইতে ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিলেন। কেহ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পায় না; প্রবাদ এই, তাঁহারা সন্ন্যাসীর বেশে ফিরিতেন।

খাঁ জাহান আকমহলের যুদ্ধজয়ের পর টোডরমল্লকে আগ্রায় এবং মুজঃফর খাঁকে পাঠানদিগের অনুসরণে বিহার অঞ্চলে পাঠাইয়া, নিজে প্রথমে সপ্তগ্রামে

—ও পরে কুচবেহারের বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন। টোডরমল্ল বহুসংখ্যক হস্তী ও লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া আকবরের নিকট যাইবার জন্য আদেশ পাইয়া প্রথমতঃ তাণ্ডায় আসেন। এবার তিনি এখানে অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই।[১] দায়ূদের প্রথম পরাজয়ের পর যখন মুনেম খাঁ গৌড়ে আসিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন, তখন টোডরমল্ল কিছুদিন হিসাবপত্র স্থির করিবার জন্য তাঁহার সহযোগী হইয়া তাণ্ডায় ছিলেন।[২] সেই সময়ে তিনি জানিতে পারেন যে, হিসাবপত্র সমুদায়ই বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ প্রভৃতির করায়ত্ত। তজ্জন্য তিনি উঁহাদের সন্ধান করেন এবং রাজসরকারে হিসাবপত্র পাইলে, তিনি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবেন এমনও কথা ছিল। তাহারই ফলে, এবং কায়স্থকুলতিলক টোডরমল্লের পবিত্র চরিত্রে পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস ছিল বলিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া প্রথম তাঁহার সহিত দেখা করেন। আগ্রায় যাইবার পথে টোডরমল্ল পুনরায় তাণ্ডায় আসিলে, এবারও সম্ভবতঃ উঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এবং তখন তাঁহারা দুই ভ্রাতায় মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন এবং হিসাবপত্র যেখানে যাহা ছিল, প্রত্যর্পণ করেন (১৫৭৬)। আকমহলের যুদ্ধের পূর্ব্বে মহম্মদ কুলি খাঁ[৩] নামক একজন মোগল সেনানী আফগানদিগের অনুসরণ করিবার জন্য সপ্তগ্রামে ছিলেন, তিনি তথা হইতে যশোররাজ্য আক্রমণ করেন, কারণ দায়ূদের বন্ধু বিক্রমাদিত্য ধনরত্ন সহ তথায় গিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সুদূর সুন্দরবন দুরধিগম্য

১ ১৫৭৬ জুলাই মাসে আকমহলের যুদ্ধ হয়। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে টোডরমল্ল গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সুতরাং তিনি যুদ্ধের পর ২।৩ মাসের মধ্যে আগ্রায় পৌছিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।—Smith, *Akbar*, p. 155.

২ 'In the 19th year, when Daud had withdrawn to Satganw (Hugli), Munim Khan remained with Rajah Todar Mall in Tandah to settle financial matters.'—*Ain.* (Blochmann), p. 341. 'Engaged in arranging matters political and financial.'—*Akbarnama* (Beveridge), III, p. 169.

৩ ইনি বার্লাস্ বা বর্ম্মকবংশীয় সম্ভ্রান্ত সেনানী। কিছুদিনের জন্য মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে মুনেম খাঁর সহকারিরূপে বঙ্গে আসেন। বিক্রমাদিত্য ধনরত্ন লইয়া যশোর যাইবার সময় ইনি তাঁহাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। টোডরমল্লের নিকট তিরস্কৃত হইয়া ইনি পুনরায় উড়িষ্যায় প্রেরিত হন, সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।—*Ain.* (Blochmann), p. 341.

স্থান এবং বিক্রমাদিত্যও তথায় তুকারই যুদ্ধ হইতে পলায়িত এবং অন্য প্রকার আশ্রয়ার্থী পাঠান সেনা হইতে যথেষ্ট পদাতিক ও নৌসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাবা জানিতেন যে, দায়ুদের বিপক্ষে যে যুদ্ধ-তরঙ্গ উঠিবে, তাহা যশোর পর্য্যন্ত না গিয়া ছাড়িবে না। কুলি খাঁর সহিত কোন বিশেষ স্থানে যুদ্ধ বাধিয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় না; তবে কুলি খাঁ যে কিছু করিতে না পাবিয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আবুলফজলের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।[১] ইহারই পর বিক্রমাদিত্য আসিয়া টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সম্ভবতঃ তখনই হিসাবেব পুস্তকাদি সমর্পণ করিয়া মোগল বাদশাহের সামন্তরাজ বলিয়া স্বীকৃত হন। তিনি যশোর-রাজ্যের বাদসাহী সনন্দ কিছু পরে পাইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ টোডরমল্লের অনুরোধ মত সে সনন্দ প্রদত্ত হয়। তবে এই সময় (১৫৭৭) হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের আরম্ভ বলা যাইতে পারে এবং এই সময় হইতে তাঁহারা রাজস্ব প্রদান করিতে থাকেন। বাদশাহী সনন্দ সেনাপতি খাঁ জাহানের মৃত্যুর (১৫৭৮) পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। মুজঃফর খাঁর শাসনকালে বঙ্গে যে জায়গীরদারগণেব সর্ব্বব্যাপী বিদ্রোহ হয়, তখন যশোরে কোন গোলযোগ ছিল না; বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের এইরূপ আনুগত্য দেখিয়া বিদ্রোহদমনকারী টোডরমল্ল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।[২]

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে যশোরে ফিরিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্য রাজসিংহাসনে সমাসীন হন। তদুপলক্ষে নূতন রাজধানীতে নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিষ্কণ্টকে

১ 'From Satganw Mahammad Quli Khan invaded the district of Jasar (Jessore) where Sarmadi a friend of Daud's, had rebelled but the Imperialists met with no success and returned to Satganw'—*Ain.* (Blochmann), pp. 341-2. এখানে ব্লকম্যান শ্রীহরিকে সর্মাদি বলিয়াছেন, বিভারিজের অনুবাদে শ্রীহরি (Sirhari) আছে।—*Akbarnama*, III, p. 172.

২ টোডরমল্ল এক বৎসরকাল গুজরাটের শাসন কর্ত্তা থাকিয়া ১৫৭৭ অব্দের শেষভাগে আগ্রায় আসিয়া সাম্রাজ্যের উজীর হন; পরে ১৫৮০ অব্দের প্রথমে বঙ্গের জায়গীরদারদিগের বিদ্রোহ দমন জন্য বাদশাহ অনন্যোপায় হইয়া টোডরমল্লকেই সেখানে প্রেরণ করেন এবং তিনি ১৫৮২ পর্য্যন্ত বঙ্গের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। শুধু যশোরের রাজা নহেন, জায়গীরদার-বিদ্রোহে কোন হিন্দু যোগ দেন নাই। কারণ, আকবরের নূতন ধর্ম্মমত উক্ত বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ব্লকম্যান লিখিয়াছেন 'not a single Hindu was on the side of the rebels.'—*Ain.*, p. 431.



হামামখানা, ঈশ্বরীপুর



টঙ্গা মসজিদ, ঈশ্বরীপুর

গৌড়ের ধনরত্নের অধিকারী হইয়া এবং সন্ধিসূত্রে মোগল বাদশাহের সঙ্গে সম্প্রীতি সংস্থাপন করিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় উভয়ে শান্তির সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনেক দিন পরে দক্ষিণবঙ্গ অরাজকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, আবার শান্তির মুখ দেখিল এবং প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য নূতন রাজ্যের রাজা বটে, কিন্তু তাহার শাসক ও পালক ছিলেন রাজা বসন্ত রায়।

বসন্ত রায়

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বসন্ত রায়ই প্রধান চরিত্র। তিনি বিক্রমের খুল্লতাতপুত্র, সহোদর ভ্রাতা নহেন। কিন্তু কোন সহোদরভ্রাতাদিগকেও পরস্পরের প্রতি এমন আকৃষ্ট দেখা যায় না। রাম-লক্ষ্মণের যুগলনাম যে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিশ্বের শ্রুতিমূলে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে, এই দুই ভ্রাতাও সেইরূপ অচ্ছেদ্য ও অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধনে সমাকৃষ্ট ছিলেন। বসন্ত রায়ের চরিত্রও অপূর্ব্ব চরিত্র। বিক্রমাদিত্য রাজা মাত্র, বসন্ত রায় রাজ্যের সব। রাজ্য সংস্থাপনকালে যাবতীয় রাজনৈতিক মন্ত্রণা তিনিই দিয়াছিলেন ; রাজ্য সংস্থাপিত হইলে, তিনিই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। যশোর রাজ্যের সেই প্রতিপত্তির যুগে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন :

'যশোহর পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ ॥'[১]

যশোহর নগরী বারাণসী তুল্য ছিল। কাশীক্ষেত্রে দুষ্কৃতদিগের দণ্ডবিধান করিয়া, নগররক্ষার ভার কালভৈরবের উপর ন্যস্ত ; বসন্ত রায়ও যশোরের যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রধান মন্ত্রী ; তিনিই কোষাধ্যক্ষ ; তিনিই সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা ; বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তিনি কোন কার্য্যের মন্ত্রণা করিতেন ; আবার নিজেই নায়ক হইয়া তাহা সুকৌশলে সম্পন্ন করিতেন। বসন্ত রায় অসমসাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যখন তাঁহার 'গঙ্গাজল' নামক তরবারি করে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতেন, তখন দলবদ্ধ লোকেও সহজে তাঁহার সামীপ্যলাভ করিতে পারিত না। কিন্তু সেই বীরপুরুষের বরবপুতে কঠোরতার ছায়া ছিল না। তাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বদাই সৌম্য, শান্ত ও ভক্তিভাবব্যঞ্জক। সে মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত, উৎসাহে তাঁহার নেত্রদ্বয় হাসিত, তাঁহার রহস্যময়ী ভাষা সভার মাঝে হাসির তুফান

১ [রামগোপাল রায়, 'সারতত্ত্বতরঙ্গিণী, ১৮৩৮,—'প্রতাপাদিত্য' (নিখিলনাথ), মূল ২৮৭ পৃ দ্রষ্টব্য।—শি মি]

বহাইত।[১] আবার এই মহাপুরুষ সর্ব্বদা দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-পরিশূন্য, সামাজিক এবং সমাজের একনিষ্ঠ প্রতিপালক। তিনি পণ্ডিতের সম্বর্দ্ধনা করিতেন, গুণের পুরস্কার দিতে জানিতেন; এবং নিজে যেমন বিদ্বান, তেমনি সঙ্গীতাদি কলা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একবার রাজসিংহাসন-পার্শ্বে গূঢ় মন্ত্রণায়, পরমুহূর্ত্তে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে কার্য্য-ব্যবস্থায়, কখনও অন্দরে পৌত্র-পৌত্রীদিগের সঙ্গে লীলারহস্যে, কখনও মন্দিরে পুষ্পবিল্ব লইয়া পূজা সাধনায়, কখনও সৈন্য সেনাপতি লইয়া অস্ত্রক্রীড়া প্রসঙ্গে, কখনও বা গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাকে লইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা তরঙ্গে—বসন্ত রায় নানাক্ষেত্রে, নানা সাজে চরিত্রাভিনয় করিতেন। ইতিহাসে, প্রবাদে বা গল্পে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তিনি মহাপ্রাজ্ঞ, কর্ম্মকুশল, সুরসিক ও ভক্তিমান। যশোর-রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; সে রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির কারণও তিনি এবং তাঁহার হত্যার ফলে সে রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ইহার সাক্ষ্য দিবে।

যে সকল কার্য্যের জন্য বসন্ত রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি দায়ুদের সময়ে খালিসা-বিভাগের কর্ত্তা বা রাজস্বসচিব ছিলেন এবং তাঁহার খুল্লতাত শিবানন্দ কানুনগো দপ্তরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন; সুতরাং জমি ও রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবপত্র ইহাদেরই হাতে ছিল, তন্মধ্যে বসন্ত রায়ের কার্য্যই দায়িত্বপূর্ণ, কারণ রাজকোষও তাঁহারই হস্তে ছিল। এজন্য মোগল কর্ম্মচারিগণকে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বতন যাবতীয় হিসাবপত্র বসন্ত রায়ের নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাদশাহ আকবর মনে করিয়াছিলেন যে, একজন নাজিম বা সুবাদার দ্বারা বঙ্গের শাসন চলিবে; কিন্তু তাহা হইল না। ইহার রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপার এত জটিল যে, উহার জন্য তাঁহাকে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে একজন

১ রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বসন্ত রায়ের চরিত্রেব এই ভাবটি অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে বহুবিধ ভ্রান্তির মধ্যেও বসন্ত-চরিতের বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রবাদ এ প্রসঙ্গে কোন মতবাদের সৃষ্টি করে নাই।

দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হয়।[১] কিন্তু তিনিও হিসাব ঠিক করিতে পারেন না। অধিকন্তু, পর বৎসর বাদশাহী উজীর মনসুরের নির্দ্দেশমত বঙ্গেশ্বর মুজঃফর খাঁ যখন কঠোরভাবে জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে বাকী প্রাপ্য আদায় করিতে যান, তখন তাহারা ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত করে। এ সময়ে যশোহরে কোন গোলযোগ হয় নাই। আকবরের নূতন ধর্ম্মমত এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া প্রধানতঃ পাঠানেরাই এই সময়ে বিদ্রোহী হন এবং টোডরমল্ল যখন বিদ্রোহ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি হিন্দু সামন্তরাজগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৫৮০ অব্দে টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং বিদ্রোহের শান্তি হইলেও তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহাকে বঙ্গ, বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি দুইবর্ষকাল সেই পদে সমাসীন ছিলেন। ভবিষ্যতে রাজস্ব ঘটিত দেনা পাওনা লইয়া এদেশে কোন গোলযোগ না হয়, এজন্য টোডরমল্ল সমগ্র বঙ্গের রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবের নাম 'আসল তুমার জমা'। ইহাতে খালসা ও জায়গীর[২] উভয়বিধ জমির উৎপন্ন হইতে মোট এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। এই হিসাব প্রস্তুত কালে বসন্ত রায়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই প্রধান সম্বল হয়। প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে বসন্ত রায়ের হিসাবই এখনও ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।[৩] সেই ভিত্তির উপর লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী

১ Ascoli—*Early Revenue History of Bengal*, p. 14.

২ মোগল আমলে রাজ্যবিশেষের সমস্ত জমি খালসা ও জায়গীর এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যে জমির রাজস্ব নিজাম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মচারীর বেতন ও সৈন্য সামন্ত রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাকে জায়গীর বলিত। আর ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট যে সমস্ত জমির রাজস্ব রাজ-কোষে জমা হইত, তাহার নাম খাল্‌সা জমা।

৩ ১৫৮২ অব্দে 'আসলতুমার জমা' অনুসারে বঙ্গদেশের ১০ সরকার ও ৬৮২ পরগণা ভুক্ত উভয়বিধ জমি হইতে মোট আয় ছিল—১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা। ১৬৫৮ অব্দে সুলতান সুজার সময় ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ পরগণায় মোট সংগ্রহ—১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। ১৭২২ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ এদেশকে ৩৪টি সরকার ও ১৩ চাকলায় বিভক্ত করিয়া যে 'জমা কামেল তুমারি' নামক হিসাব প্রস্তুত করেন, তদনুসারে মোট আয়—১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা। পরবর্ত্তীকালে নানাপ্রকার আবওয়াব ও বাজে আদায় হইতে ১৭৬৩ অব্দে কাশিম আলি খাঁর হিসাবে বঙ্গের আয়—২,৫৬,২৪,২২৩ টাকা

বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অল্পাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত উহা এখনও চলিতেছে। ক্রমে বর্দ্ধিত ও সংস্কৃত আকারে রাজস্বের একটা বাঁধাধরা হিসাব বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া না থাকিলে, ইংরাজ রাজত্বে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত একটি সুসঙ্গত আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত কিনা সন্দেহ। এই জন্য বসন্ত রায়ের নিকট বঙ্গবাসী এখনও ঋণী বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বসন্ত রায় নব প্রতিষ্ঠিত যশোর-রাজ্যের একটি রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করেন, পরে প্রতাপাদিত্যের সময় নূতন রাজ্য জয় প্রভৃতি কারণে উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়। মোগল আমলে নূরনগর ও মীর্জানগরের ফৌজদারগণ এই তালিকা ঠিক রাখিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও এই হিসাব মানিয়া লইয়া যশোর-রাজ্যের অধিকাংশ, সর্ব্বপ্রথম নলতার ভঞ্জ-চৌধুরী, চাঁচড়া, কৃষ্ণনগর ও নলডাঙ্গার রাজার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। প্রতাপাদিত্যের পরগণাগুলির অধিকাংশ প্রথমোক্ত তিন জনের হস্তে পড়িয়াছিল, পরে তাঁহাদের পতনের জন্য কতকাংশ নানাহস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রতাপের রাজধানী এখনও বংশীপুর লাটের অন্তর্গত। ৺বংশীবদন ভঞ্জচৌধুরীর নামানুসারেই বংশীপুর নাম হয়।

তৃতীয়তঃ, বসন্ত রায়ই যশোর-রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার নাম রাখেন যশোহর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারই নামানুসারে বসন্তপুর হইয়াছিল। সেখান হইতে জঙ্গল কাটিয়া সাত আট মাইল স্থান পরিষ্কৃত করিয়া তিনিই রাজধানী স্থাপন করেন। আমরা অনুমান করি, মুকুন্দপুরেই যশোহরের প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করিব, এস্থলে মাত্র বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি। মুকুন্দপুরের চারিপাশে শুধু গড়ের চিহ্ন নহে, রাজধানীর আরও অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। বসন্ত রায় এই মুকুন্দপুরের চারিধারে নিজের আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিসামাজিক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বসতি করাইয়াছিলেন। রাজধানীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। তবে রাজবাটীর জন্য যে সব অস্থায়ী গৃহ অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত নির্ম্মিত হইয়া-

দাঁড়ায়। ইহারই ভিত্তিতে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় ১৭৯৩ অব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হয়, তখন মোট আয়—২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা।—Ascoli, *Early Revenue History*, pp. 22-6; কালীপ্রসন্ন, 'নবাবী আমল,' ৮৩-৮৫ পৃ; *Fifth Report* (1812), p. 47.

ছিল, তাহা বাত-বন্যার হস্ত হইতে বহুদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এখনও মুকুন্দপুর অঞ্চলে যেখানে সেখানে প্রাচীন ইষ্টক-চিহ্ন দেখা যায়; ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি যে কোন কোন নূতন ইমারতের অঙ্গ পুষ্টি করে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য হিন্দু ও পাঠান বহু সৈন্য সংগৃহীত হইতেছিল। হিন্দুদিগের জন্য রাজধানীতে ও নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে বহু মন্দির ছিল এবং পাঠান সৈন্যগণের জন্য মুকুন্দপুরের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী পরবাজপুরে অপূর্ব্ব মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। পরবর্ত্তী কালে প্রতাপাদিত্যও তাঁহার নূতন রাজধানীতে এই প্রণালীতে টেঙ্গা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। সে কথা পরে বলিব; এখন এই প্রসঙ্গে পরবাজপুরের মসজিদের কথা বলিয়া লইতে চাই।

পরবাজ খাঁ নামক কোন পাঠান সেনানীর নামে পরবাজপুর হইতে পারে, অথবা নূতন স্থানের উপনিবেশ বলিয়া বসন্ত রায় ইহার নাম প্রবাসপুরও রাখিতে পারেন। পরবাজপুরে এখনও বহু মুসলমানের বাস আছে; এই স্থানে পাঠান সেনাদলের ছাউনি ছিল; তাহাদেরই উপাসনার জন্য এখানে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একটি অতি সুন্দর মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। মসজিদ্‌টির বাহিরের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫২´-৫´´ ইঞ্চি এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৩৯´-৮´´ ইঞ্চি। মসজিদ্‌টি দুইটি ঘরে বিভক্ত; পশ্চিমের ঘরটি এক গুম্বজের নিম্নে বেশ বড় ঘর, তাহার ভিতরের মাপ ২১´-৮´´×২১´-৮´´ এবং পূর্ব্ব দিকের ঘরটি তিন গুম্বজের নিম্নে, উহার পরিমাণ ২৪´-৮´´×৬´-১০´´ মাত্র। দুইটি ঘরের কোণে কোণে ৬টি মিনার আছে। বড় ঘরের উত্তর দক্ষিণে ২টি এবং ছোট ঘরের পূর্ব্ব পশ্চিমে ২টি মুসলমানী খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ, খিলানের উচ্চতা ১১´-৩´´ ইঞ্চি। দেওয়ালের ভিত্তি ৫´-৯´´ এবং বাহিরের প্রলম্বিত শিল্পকার্য্য সমেত, ৭´ ফুট। মেজে হইতে বড় গুম্বজের উচ্চতা ৩০´ ফুটের কম নহে। ইহার স্থাপত্য সম্পূর্ণ পাঠান আমলের; কারণ তখনও মোগল পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। গাথুনির ইটগুলি পাতলা ও সুন্দরভাবে পোড়ান, ঠিক খাঁ জাহান আলির ইটের মত। ভিতরে স্থানে স্থানে মেজের উপর এক ফুট পর্য্যন্ত মিনা করার চিহ্ন আছে; বাহিরের সকল গায়ে শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন। এতদঞ্চলে এমন অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত মসজিদ্ আর দেখি নাই। দুঃখের বিষয়, সরকারী বিবরণীতে এ কীর্ত্তিমন্দিরের উল্লেখ নাই।

চতুর্থতঃ, বসন্ত রায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে আনিয়া নূতন রাজধানীর চারিপার্শ্বে বসতি করান এবং তদবধি 'যশোহর-সমাজ' নামে একটি প্রধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিকগণের সভাসমিতির জন্য মুকুন্দপুরের সন্নিকটে বর্ত্তমান ডামরেলী বা ধামরেলী নামক স্থানে একটি সুন্দর সমাজমন্দির গঠিত হয়। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এই সমাজ ও মিলন-মন্দিরের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

পঞ্চমতঃ, বসন্ত রায়ের উদ্যোগে রাজধানীতে ও দূরবর্ত্তী নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। যশোররাজ্য যখন বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়, তখন কালীঘাটে কালী-দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, সে মূর্ত্তি একখানি পর্ণশালায় পূজিত হইত দেখিয়া বসন্ত রায় উহার জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।[১] বসন্ত রায় নিজে বৈষ্ণব হইলেও শাক্তদ্বেষী ছিলেন না। ডামরেলীর মন্দিরের নিকট আরও অনেকগুলি শিব মন্দির ছিল। রতনপুরের বুড়াশিবের মন্দির এই সময়ে রচিত। উহা এখনও আছে এবং ঐ স্থানের নাম শিববাটী। আর একটু দক্ষিণে কাটুনিয়ার সান্নিধ্যে মঠবাড়ী নামক স্থানে দুইটি সুন্দর দোতালা মন্দির ছিল; উহাতে কি বিগ্রহ ছিল বা উহার কি হইল, কিছুই জানা যায় না। গোপালপুরের গোবিন্দদেবের মন্দির, বেদকাশীর শিব মন্দির ও চতুর্ভুজ বাসুদেবের মন্দির বসন্ত রায়েরই ব্যবস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ সকল মন্দিরের কথা যথাস্থানে বলিব।

ষষ্ঠতঃ, বসন্ত রায় বহু গুণী ব্যক্তিকে সমাদরে আশ্রয় দিয়া বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। মোগলের অত্যাচারে এবং আকস্মিক মহামারীতে গৌড় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, যশোহরের গৌরবের দিন আসিয়াছিল; শুধু পলায়িত সৈনিক বা লালায়িত বণিক নহে, প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতগণও যশোহরের

১ 'কথিত আছে যশোহরের কায়স্থরাজা বসন্ত রায় (কালীঘাটে) কালীর পর্ণকুটীরের পরিবর্ত্তে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।'—'কালীক্ষেত্রদীপিকা,' ৭০ পৃ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'কলিকাতা—সেকালের ও একালের', ১১৯ পৃ। এই সময়ে কালীঘাট যশোর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; বসন্ত রায় শুধু মন্দির নির্ম্মাণ করেন নাই, তিনি কালীঘাট গ্রামখানিও ৺মায়ের বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।—'বঙ্গীয় সমাজ', ১৪৩ পৃ।

রাজসভা প্রভাম্বিত করিয়াছিলেন। এমন কি কথিত আছে, উজ্জয়িনীপতি প্রাচীন বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যও নয়জন প্রধান পণ্ডিতকে লইয়া নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডামরেলীর নবরত্নমন্দিরে এই নবরত্ন সভার সাময়িক অধিবেশন হইত। এই পণ্ডিতরত্নগণের মধ্যে ব্যাসকল্প ছিলেন—তর্কপঞ্চানন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম—কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন।[১] ইনি কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয়। কনৌজাগত দক্ষের ৮ম পুরুষে, বহুরূপ বল্লাল সেনের সময় নির্দ্দোষ কুলীন বলিয়া গণ্য হন; তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীকর হুগলীর নিকটবর্ত্তী খন্নিয়ানে বাস করেন। খন্যান এক্ষণে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন। শ্রীকরের বংশীয়েরা খন্যানের বা খনিয়ার চাটুতি বলিয়া খ্যাত।[২] শ্রীকরের ধারায় চণ্ডীবর চক্রবর্ত্তী বহুরূপ হইতে নবম পুরুষ এবং স্বরাই মেলের প্রধান কুলীন।[৩] তিনি ত্যাগশীল সাধুপুরুষ ছিলেন, এজন্য সাধারণতঃ চণ্ডীবর তপস্বী বলিয়া

১ সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন। নিখিলনাথ রায় মহাশয়ও তাঁহারই অনুকরণ করিয়াছেন।—শাস্ত্রী, ৬৮ পৃ; নিখিলনাথ, ১১২ পৃ। খোড়গাছির রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায় যশোর রাজবংশীয়গণের মধ্যে বয়সে প্রবীণ ছিলেন, গত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৮ অব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে আমি খোড়গাছি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তিনি ঐদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দৈবাৎ ভুল করিয়া শাস্ত্রীমহাশয়কে তিনি শ্রীকৃষ্ণ নাম বলিয়া দিয়াছিলেন; শাস্ত্রীমহাশয়ও অন্যত্র পরীক্ষা না করিয়া সেই কথাই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন এবং নিখিলনাথও তাহাই নিঃসন্দেহে নকল করিয়াছেন। নানাভাবে মিলাইয়া না লইলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য যে কিরূপ ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা তাহার নিদর্শন। শাস্ত্রী মহাশয় যাহাই করুন, নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আঁধার মাণিক, তথায় তর্কপঞ্চাননের অধস্তন বংশধরগণের নিবাস। সেখানে একটু অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম জানেন না। আমি তাঁহাদের প্রদত্ত বংশাবলী হইতেই কমলনয়ন নাম পাইয়াছি। বসন্ত রায়ের বংশধর খোড়গাছি নিবাসী ৺রামগোপাল রায় ১৮৩৮ অব্দে 'সারতত্ত্ব তরঙ্গিণী' নামে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন উহার কতকাংশ নিখিলনাথই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'কমল নামেতে তর্কপঞ্চানন' এইরূপই আছে। তাহার টীকায় নিখিলনাথ লিখিয়াছেন 'তর্কপঞ্চানন এতদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নামে অভিহিত'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের পুস্তক প্রচারের পরই এই নাম রটিয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ভুল থাকিবে, বিচিত্র নহে। —নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ২৮৬ পৃ।

২ লালমোহন বিদ্যানিধি, 'সম্বন্ধ নির্ণয়', ৪৪৮, ৪৫০ পৃ।

৩ 'কালীক্ষেত্র দীপিকা', (১৮৯১), ৬৩ পৃ।

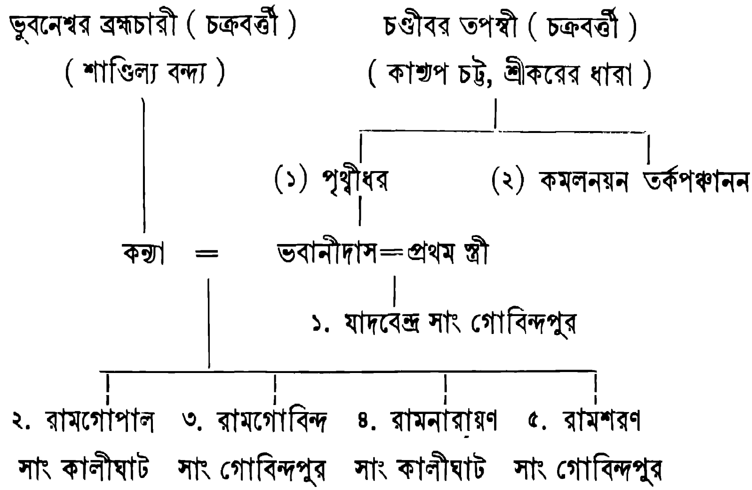
খ্যাত। ইহার দুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়,—পৃথ্বীধর ও কমলনয়ন।[১] তন্মধ্যে পৃথ্বীধরই বোধহয় জ্যেষ্ঠ, তিনি সন্ন্যাসীর মত তীর্থভ্রমণে দেশে দেশে ফিরিতেন। আর কমলনয়নের উপাধি ছিল—তর্কপঞ্চানন; তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য একদিন হুগলীর নিকট ত্রিবেণীতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন; কমলনয়ন দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলেন। খন্নিয়ান ত্রিবেণী হইতে বেশী দূর নহে। মন্ত্রপাঠে ভুল হইতেছিল দেখিয়া তর্কপঞ্চানন তাহা দেখাইয়া দেন এবং বিক্রমাদিত্যের অনুরোধে তিনিই শেষে মন্ত্র পড়াইয়া দেন। শ্রাদ্ধান্তে তর্কপঞ্চানন চলিয়া গেলেও বিক্রমাদিত্য তাঁহার বাড়ীতে যথাযোগ্য সিধা পাঠাইয়া দেন। তখনও চণ্ডীবর জীবিত ছিলেন, তিনি কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতির দানগ্রহণ করেন নাই; এজন্য তিনি তিরস্কার করেন। তাহারই ফলে, কমলনয়ন বসন্ত রায়ের অনুরোধে যশোহরে আসিয়াছিলেন এবং রাজগুরু বলিয়া স্বীকৃত হন। অচিরে তিনি অসামান্য প্রতিভাবলে রাজধানীতে অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'সারতত্ত্ব তরঙ্গিণী'তে আছে :

'কমল নামেতে তর্কপঞ্চাননোপাধি।
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণনিধি ॥
ছিলা রাজসভাসৎ পণ্ডিত অতি মান্য।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাখ্যাত্যাপন্ন ॥'

যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কালীঘাটে পীঠমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বসন্ত রায় দেবীমূর্ত্তির জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সে সময় ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রহ্মচারী সেখানকার সেবাইত ও অধিকারী ছিলেন। বসন্ত রায় তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত রায় তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন; সে কথা ঠিক মনে করি না। তর্কপঞ্চাননই রাজবংশের গুরু হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার বংশীয় আঁধার মাণিকের ভট্টাচার্য্যগণ এখনও গুরু আছেন। তর্ক-পঞ্চাননের ভ্রাতা পৃথ্বীধর তীর্থযাত্রা করিয়া নিরুদ্দেশ হইলে, তৎপুত্র ভবানীদাস

১ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২৯৭ পৃ।

পিতার অনুসন্ধানে যশোর অঞ্চলে আসেন, সেখান হইতে কালীঘাটে আসিয়া ভুবনেশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সন্তানাদির মধ্যে ভুবনেশ্বরের একমাত্র কন্যা ছিল; তিনি তাঁহার সহিত ভবানীদাসের বিবাহ দেন। পূর্ব্বেও ভবানীদাসের অন্য বিবাহ ছিল এবং খন্নিয়ানে তাঁহার সে পক্ষের যাদবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র নামক দুইপুত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। ভবানীদাস ৺মায়ের সম্পত্তিব অধিকারী হইয়া কালীঘাটে বাস করিলে, যাদবেন্দ্র আসিয়া নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরে বসতি করেন; রাজেন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ভুবনেশ্বরের কন্যার গর্ভে ভবানীদাসের চারি পুত্র হয়। যাদবেন্দ্র ও উক্ত চারিপুত্র—এই পাঁচজনে কালীমায়ের সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে 'হালদার' উপাধি পান। কালীঘাটের সুবিখ্যাত হালদার পরিবারের সহিত আঁধার মাণিকের ভট্টাচার্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।



(এই ৫জন কালীঘাটের হালদারবংশের আদি। বংশাবলীর জন্য 'কালীক্ষেত্র-দীপিকা', ১২৫-৮ পৃ দ্রষ্টব্য)

- চণ্ডীবর তপস্বী
  - (২) কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন
    - রামচন্দ্র বিদ্যানিবাস, সাং আঁধার মাণিক (গুরুবংশ)
      - রঘুনন্দন ন্যায়পঞ্চানন
        - শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার
          - রামশঙ্কর বিদ্যাবিনোদ
            - রামনিধি তর্কসিদ্ধান্ত
              - রামজয়
                - মথুরানাথ
                  - বসন্ত
                    - হেমন্ত, জীবিত, বয়স ২৪
              - গঙ্গাপ্রসাদ চূড়ামণি
                - কেদারনাথ বিদ্যারত্ন
                  - উমানাথ, জীবিত, বয়স ৪৬
                    - ধীরেন্দ্র
                  - ভবনাথ
                  - রজনী
                  - মন্মথ
    - পুরুষোত্তম, সাং ইছাপুর
    - জগদানন্দ সার্ব্বভৌম, সাং আঁধার মাণিক (পুরোহিতবংশ)
      - রতিকান্ত
        - যদুনন্দন
          - শ্রীবল্লভ
            - রামকানাই
              - গৌরহরি
                - তারিণীচরণ
                  - কৃষ্ণনাথ
                    - রামচন্দ্র, জীবিত, বয়স ১৮
      - রামনারায়ণ
        - গোপীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন
          - উপেন্দ্রকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ
            - পীতাম্বর ন্যায়বাগীশ
              - রামচন্দ্র
                - কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার
                  - কন্যা = দ্বারকানাথ মুখো
                    - ক্ষেত্রনাথ
                    - গোপালচন্দ্র
                    - সাং আঁধার মাণিক
      - কৃষ্ণদেব বিশারদ

প্রতাপাদিত্যের পতনকালে তর্কপঞ্চানন যশোহর ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামতীর তীরবর্তী আঁধার মাণিক বা কৃষ্ণনগর গ্রামে বসতি করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম এখান হইতে উঠিয়া ইছাপুরে গিয়া বাস করেন। অন্য পুত্র-দ্বয়ের মধ্যে রামচন্দ্র রাজবংশের ও টাকী শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের রাজ-জ্ঞাতিবর্গের গুরু বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদানন্দ সার্ব্বভৌম পুরোহিত বলিয়া স্থিরীকৃত হন। রামচন্দ্রের অধস্তন ৮ম পুরুষে উমানাথ প্রভৃতি এখনও আঁধার মাণিকে বাস করিতেছেন। জগদানন্দের দুই পুত্রের ধারা আঁধার মাণিকে এবং তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব বিশারদের ধারা খোড়গাছিতে আছেন।[১]

১ কৃষ্ণদেবের বংশীয় যদুনাথ (বয়স ৬৩) এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার গৃহে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের যে সব তায়দাদ বা নিষ্করের দলিল আছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দলিলগুলি হইতেই যদুনাথের বংশাবলী এইরূপ পাওয়া যায়: কৃষ্ণদেব—তৎপুত্র রুদ্ররাম বাচস্পতি—তৎপুত্র রামগোবিন্দ—তৎপুত্র গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার—তৎপুত্র রঘুরাম বিদ্যাপঞ্চানন—তৎপুত্র নন্দকিশোর—তৎপুত্র গোবিন্দ—তৎপুত্র কাশীনাথ—তৎপুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণই যদুনাথের পিতা। বসন্ত রায়ের পৌত্র রাজারাম পুরোহিত বংশীয় কৃষ্ণদেব বিশারদকে যে ৫৪/০ বিঘা নিষ্কর জমির সনন্দ দেন, উহা যদুনাথের নিকট এখনও জীর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। উহার অবিকল প্রতিলিপি এই:

'স্বস্তি পূজনীয়তম শ্রীকৃষ্ণদেব বিসারদ ভট্টাচার্য্য চরণেষু। শ্রীরাজারাম রায়স্য প্রণাম নিবেদনঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে সর্প্ররাজপুর ওগয়রহতে তোমাকে তপস্বীল জয়েন জমী ৫৪/ চৌয়ান্ন বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তর দিলাম। জমি উখিত করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করুন। ইতি সন ১০৯৪ শাল তেরিখ ১ কার্ত্তিক।'

'জায়জমী

ভাদুরিয়া—১৫/	পং নুরনগর
মুকুন্দকাটি—৭/	কুল্যান
মেরুদণ্ডিয়া—৪/	সহালিয়া
সান্তিয়ানগর—৭/	৩/
ভবানিপুর—২/	দেবীপুর
ধলবাড়িয়া—২/	১৩/
ফতুল্লাপুর—১/	———
	১৬/ ষোল বিঘা মাত্র।
৩৮/	৫৪/
আটত্রিষ বিঘা মাত্র	চৌয়ান্ন বিঘা মাত্র—'

নবম পরিচ্ছেদ

যশোহর-সমাজ

বিক্রমাদিত্য যখন যশোহরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, ক্রমেই তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার পিতা ভবানন্দ পরলোকগত হইলেন। বিক্রমাদিত্য প্রভূত অর্থব্যয়ে পরম সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। এতদুপলক্ষে অনেক চেষ্টার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আত্মীয়কুটুম্ব ও জ্ঞাতিবর্গকে আহ্বান করিয়া আনা হইল। তখন বাক্‌লাই বঙ্গজ কায়স্থকুলের প্রধান সমাজ। নবপ্রতিষ্ঠিত যশোহর সেই বাক্‌লা সমাজের অধীন ছিল। শ্রাদ্ধবিবাহাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এভাবে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে জ্ঞাতি কুটুম্ব আনিতে যাওয়া বড় কষ্টকর; বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ অত্যন্ত দূরে অবস্থিত এবং সামাজিক ব্যাপারে বাক্‌লার অধীনতা বড় অপ্রীতিকর হইল। বিশেষতঃ বাক্‌লা-সমাজে বহুকাল হইতে নানা নিম্নশ্রেণীর মৌলিকের সহিত কুলীনের বিবাহ-প্রথা অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রবর্ত্তিত থাকায় সমাজ-শোণিত কলুষিত হইতেছিল।[১] দূরদর্শী বসন্ত রায় বুঝিলেন, বংশবিশুদ্ধি দ্বারা সামাজিক উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না। সুতরাং এই কুল-বিশুদ্ধি রক্ষা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল।

বসন্ত রায় নিজের চেষ্টায় যশোহরে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা সুপ্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিলেন। বাক্‌লা (বরিশাল) ও ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিগোত্রীয়দিগকে অর্থ ও ভূমিবৃত্তি লোভে বশীভূত করিয়া যশোহরে আনিলেন; রাজধানীর নিকটবর্ত্তী চারিধারে তাহাদের বসতি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। শুধু স্বজাতীয় বঙ্গজ কায়স্থ নহে, সমাজ-দেহপুষ্টির জন্য বহুজাতির প্রয়োজন। সুতরাং বসন্ত রায় দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ও মহত্রাণ দিয়া নানাশ্রেণীর সুব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রভৃতি জাতিদিগকে বসতি করাইলেন।[২] সহজে-কোন সম্মানিত ব্যক্তি পরাশ্রয় আসেন নাই,

১ সতীশচন্দ্র রায়, 'বঙ্গীয় সমাজ', ১৪৫, ৩৪০-১ পৃ; খোসালচন্দ্র, 'বাখরগঞ্জের ইতিহাস', ৫৪ পৃ।

২ 'চন্দ্রদ্বীপ পুরাং তস্মিন্ কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ তথা।
বৈদ্যকমানয়ামাস সমাজেশঃ বভুবঃ সঃ॥'—ঘটককারিকা

'চন্দ্রদ্বীপ আদি সমাজ মানে সর্ব্বজন। সমাজ করিলা যশোর ঘটক কুলীনে
বিক্রমপুর ইদিলপুর সমাজ বাখানি। যথায় পূজিত সদা ঘটক চূড়ামণি॥'

এজন্য বিক্রমাদিত্য সকলকেই স্ব স্ব মর্য্যাদার অনুরূপ ভূমিবৃত্তি দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ নবোত্থিত যশোর-রাজ্য তখন লক্ষ্মীর লীলাভূমি ; এমন স্থলে বাস করিবার লোভ অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এই নূতন সমাজে বহু কুলীন ও মৌলিক যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুলীনের সংখ্যাই অধিক। মিত্রবংশীয় কেহই আসেন নাই; বঙ্গজ মিত্রগণ কুলীন নহেন। মৌলিকদিগের মধ্যেও মাত্র কয়েক ঘর আসিয়াছিলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।[১] বৎস, রাঘব, পৃথ্বীধর, চক্রপাণি, থাকবসু ও গাভবসু প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বসু কুলীনগণ ইচ্ছামতী-কূলবর্ত্তী টাকী, শ্রীপুর সৈদপুর, পুঁড়া ও জালালপুরে, বর্ত্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী কাড়াপাড়া ও উৎকূল গ্রামে এবং বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার ওলপুরে বাস করেন। ওলপুর ও কাড়াপাড়ার রায় চৌধুরীগণ উচ্চ কুলীন। তন্মধ্যে শেষোক্ত স্থানের গাভবসুবংশীয় পরমানন্দ রায় বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানীদেবীকে বিবাহ করিয়া যশোহর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী পরমানন্দ-কাঠিতে বাস করেন। ঘোষ কুলীনদিগের বিভিন্ন থাক এই সময় হইতে ক্রমে বাঁশদহ, শিবহাটি, জালালপুর, শ্রীপুর, পুঁড়া ও খোঁড়গাছিতে উপনিবিষ্ট হন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য আশ্‌গুহবংশীয়। এই থাকের রাজ-জ্ঞাতিগণ অনেকে যশোহরে আসেন। তন্মধ্যে ভবানীদাস রায় চৌধুরী প্রধান এবং মহাপ্রতিভাশালী। ইনি রামচন্দ্র গুহের পিতৃব্য চতুর্ভুজের প্রপৌত্র, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা। ভবানীদাস রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে মাইহাটি পরগণা বৃত্তি পান। সামাজিক হিসাবে রাজবংশীয়দিগের নিম্নেই তাহার আসন ছিল ; এজন্য পরবর্ত্তী যুগে ইহার বংশধরগণকে নায়েব গোষ্ঠীপতি বলিত।[২] ইনি টাকী ও শ্রীপুরের রায় চৌধুরীগণের মূল। মুন্সী রামকান্ত ও কালীনাথ এই বংশের কৃতী পুরুষ এবং বর্ত্তমান সময়ে রায়

যশোহরের কথা কিছু করি নিবেদন। আশ বংশে নরপতি ছিলা মহাজন ॥
কায়স্থ কুলীন যত গুণেতে পূজিত। নানা ধন দিয়া সবে করিলা তোষিত ॥
গোষ্ঠীপতি হইলা রাজা বহু পুণ্যফলে। ঘটক কুলীন মতে অনুমতি দিলে ॥'

১ বিশেষ বিবরণ সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত 'বঙ্গীয় সমাজে' ও ঘটকদিগের কারিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থের কুলকারিকা আমার নিকট আছে। সেগুলি অত্যন্ত প্রাচীন পুঁথি।

২ 'বঙ্গীয় সমাজ', ৩৪১ পৃ ; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য' মূল ১৬৬-৭ পৃ।

যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সর্ব্বত্র সুপরিচিত।[১] গুহ বংশের অন্য শাখাও ক্রমে এদেশে আসিয়াছিলেন। রায় চৌধুরী, রায় সরকার, চাকলাদার প্রভৃতি নানা উপাধিধারী হইয়া তাঁহারা টাকী, শ্রীপুর, পুঁড়া, বেঁওকাটি, সৈদপুর ও জালালপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও বসতি করিতেছেন। এড়ুগুহবংশীয় দেওয়ান রামভদ্র রায় এক সময় পুঁড়ায় বসতি করেন ও সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন।[২] তাঁহার কথা পরে বলিতে হইবে। গুহবংশীয় যাহাদের কথা বলা হইল, তাহাদের কতক কুলীন, কতক বা কুলজ।

শুধু তাহাই নহে। মৌলিকদিগের মধ্যেও মধ্যল্য[৩] দত্ত ও দাস বংশীয়েরা যশোহর-রাজধানীর সন্নিকটে পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে, এমন কি, ভৈরবকূলবর্ত্তী রঙ্গদ্বীপ বা রাংদিয়ার অন্তর্গত সিংগাতি, উৎকূল প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা আছেন।

বহরমপুরের সেনগণও যশোহর-সমাজভুক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার রামদাস সেন বহরমপুরের আদি সম্মানিত জমিদার বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ইত্না এবং খুল্নার সিংহ-গাতির দত্ত চৌধুরীগণ বসন্ত রায়ের শ্বশুর বংশীয়। যশোহর-সমাজে কুলীনের সংখ্যাই অধিক এবং সে কুলীনগণ প্রায়ই মৌলিকক্রিয়া করিতেন না; এই জন্য এ সমাজে মৌলিকের সংখ্যা বড় অল্প। মৌলিকদিগের সকলেই মধ্যল্য অর্থাৎ প্রধান; মৌলিকের নিম্নশাখাগুলি এ সমাজে নাই।

যশোহর সমাজ কেবল কায়স্থ লইয়া হয় নাই। নানা শ্রেণীর কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় বৈদ্য এ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গুরুবংশীয় কাশ্যপ চট্টোপাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের আশ্রিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দপুরের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে ধলবাড়িয়া, দেবনগর প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। বৈদিক শ্রেণীভুক্ত

১ সুপণ্ডিত দধিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'টাকী রায়চতুর্ধুরীণ বংশম্' নাম দিয়া সংস্কৃত কবিতায় এই বংশের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলির নিম্নে সুন্দর বঙ্গানুবাদ আছে।

২ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, এই বংশীয় এবং পুঁড়ার অধিবাসী।

৩ বঙ্গজ মৌলিকেরা যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে মধ্যল্য প্রধান। অন্য তিন শাখা—মহাপাত্র, নিম্ন মহাপাত্র ও অচলা। 'যশোহর সমাজ কুলীন প্রধান বলিয়া তথায় কুলীন, কুলজ ও মৌলিক এই তিন শাখা মাত্র।'—'বঙ্গীয় সমাজ', ৬৪ পৃ।

রামভদ্র ভট্টাচার্য্য[১] সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি পরমানন্দ কাটিতে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ইচ্ছামতীর কূলবর্ত্তী শ্রীপুর, ঘলঘলিয়া ও ধলতিতা গ্রামে এবং ভাগীরথীতীরে রাজবংশের গঙ্গাবাসের বাটীর সন্নিকটে ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ায় বাস করিতেছেন এবং বঙ্গের বহু উচ্চবংশের কুলগুরুরূপে দেশপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে। বঙ্গজ বৈদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্ম্মোপলক্ষে যশোহর রাজসরকারে প্রবেশ করেন[২] এবং অবশেষে ভৈরবকূলে উৎকূল, মূলগড় ও ভট্টপ্রতাপ প্রভৃতি স্থানে বাস করেন; রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ মজুমদার রাজ-কবিরাজরূপে যশোহরে আসেন এবং রাজ্যপতনের পর বর্ত্তমান কলারোয়ার নিকটে কেরলকাতায় ও পরে তথা হইতে ভাণ্ডারপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। এখনও ভাণ্ডারপাড়ার কবিরাজ গোষ্ঠী বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। এইরূপে পূর্ব্বদিকে মধুমতী ও পশ্চিমে ভাগীরথীতীরে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কপোতাক্ষী ও ইচ্ছামতী পথে বহুদূর পর্য্যন্ত নানাবিধ কুলীন, বংশজ ও মৌলিক কায়স্থ, বৈদিক রাঢ়ী ও কুলীন শ্রোত্রিয় প্রভৃতি নানাবিধ ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় বৈদ্য প্রভৃতি জাতি যশোহর-খুল্‌নার সমাজ-দেহের প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইয়া

১ করতোয়া তটবর্ত্তী মালতী নামক স্থানে 'বাৎস্যগোত্রীয়' রামভদ্রের পূর্ব্বনিবাস ছিল। তিনি কুলদেবতা সঙ্গে করিয়া প্রথমতঃ কলিকাতায় গোবিন্দপুরে বাস করেন; পরে তথা হইতে বসন্ত রায়ের সহিত পরিচয়সূত্রে যশোহরে আসেন। তিনি মৃত্যুকালে স্বকীয় সিদ্ধমন্ত্র দৈবক্রমে পুত্র নারায়ণকে না দিয়া জামাতা নারায়ণকে দিয়া যান। জামাতা নারায়ণ (বশিষ্ট গোত্রীয়, বৈদিক) এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া গঙ্গাতীরে ভট্টপল্লীতে বাস করেন। নারায়ণ ভট্টের নামেই ভট্টপল্লী হইয়াছে, আধুনিক ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যগণ অধিকাংশই ইহার বংশধর। রামভদ্রের পুত্র নারায়ণ নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, তাঁহার তিন পুত্রের একজন পিতার গৃহদেবতার অধিকারী হইয়া শ্রীপুরে বাস করেন, অন্য এক পুত্র পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তরের অধিকারী হইয়া শ্রীপুরের নিকটবর্ত্তী ঘলঘলিয়ায় বাস করেন। সে বংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র পৈতৃক পুঁথিপত্রের অধিকারী হইয়া বর্ত্তমান বারাসাত লাইট রেলওয়ের দণ্ডীরহাট ষ্টেশনের সন্নিকটে ধলতিতা নামক স্থানে বাস করেন।

২ বঙ্গজ বৈদ্যকুলে বিষ্ণুদাসবংশীয় জানকীবল্লভ বিশ্বাস (মজুমদার) প্রতাপাদিত্যের সরকারে চাকরী করিয়া পুরস্কার স্বরূপ সুলতানপুর-খড়রিয়া পরগণার জমিদারী পাইয়া মূলঘরে বাস করেন; তাহার আশ্রিত কুলীনদিগের মধ্যে ধন্বন্তরি (লক্ষ্মণ, আদিত্য ও বিকর্ত্তন) বংশীয়গণ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।



চকশ্রী মসজিদ



চকশ্রী বা চাকশিরি

রহিয়াছেন। মুকুন্দপুরের পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র কালিন্দীর অপর পারে যেখানে পূর্ব্বদেশীয় সামাজিকগণ প্রথম বসতি করেন, তাহাকে এখনও 'বাঙ্গালপাড়া' বলে; প্রাচীন ম্যাপে বাঙ্গালপাড়া বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। বাঙ্গাল-পাড়া ও বাঁকড়া প্রভৃতি স্থান হইতে সামাজিকগণ ক্রমে উত্তরদিকে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন।

এইরূপে পৃথক্‌ভাবে বসন্ত রায় যে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন উহার নাম হইল,—'যশোহর-সমাজ'। এ সমাজ এখনও আছে; যশোর-রাজ্য নাই, কিন্তু যশোহর-সমাজ প্রতিপত্তি-শূন্য হয় নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছিলেন যশোহর-সমাজের সমাজপতি। বিশেষ ক্ষমতা ও ন্যায়পরতার সহিত ইহার সামাজিক শাসন চলিতে লাগিল। আজ সে শাসন নাই, বন্ধন অনেক শিথিল হইয়াছে; কিন্তু যশোহর-সমাজের নাম আছে, খ্যাতি সম্মান আছে, আরও আছে এবং তাহা সহজে যাইবে না—ইহার বংশ-বিশুদ্ধি। এখনও এই সমাজের লোকেরা বাক্‌লা প্রভৃতি স্থানের সামাজিকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না।

যাবতীয় সামাজিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সামাজিকগণ সময় সময় সমবেত হইতেন; তজ্জন্য সমাজগৃহ বা মিলন-মন্দির ছিল। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুকুন্দপুরের সন্নিকটে ধামরাইল বা ডামরেলী পরগণার অন্তর্গত মুস্তাফাপুর গ্রামে কালিন্দী-তীরে একটি বিরাট নবরত্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইছাপুরের হোড়চৌধুরীগণের নবরত্ন মন্দির ব্যতীত যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে এত বড় নবরত্ন মন্দির আর নাই; কিন্তু ইছাপুরের মন্দির অপেক্ষা এ মন্দির আরও সুন্দর এবং অধিকতর কারুকার্য্যযুক্ত। মন্দিরটি এখনও দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু উহার নয়টি রত্ন বা চূড়াই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কথিত আছে, এখানে মালবরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার মত যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা বসিত; সমাজের মিলন হইত, তাহাতে সামাজিক বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত। প্রবাদের কথা সরকারী রিপোর্টেও মানিয়া লওয়া হইয়াছে।[১] এই মন্দিরে কোন দেব বিগ্রহ ছিল না। মন্দির ত অনেক আছে, কিন্তু এ মন্দির দেখিতে বড় সুন্দর ছিল, ইহা খুল্‌না জেলার

১ 'The Navaratna is said to have been built by Raja Vikramaditya the father of Maharaj Pratapaditya. ......There is no idol within the

অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।[১] ইহা দেখিলে দিনাজপুরের কান্তনগরের মন্দিরের দৃশ্য মনে পড়ে; উভয়ই একই প্রকার স্থাপত্যানুমোদিত নবরত্ন মন্দির।[২] প্রতাপাদিত্যের যুগেব বহু মন্দিরের মত ইহারও সদর পশ্চিম দিকে; সে দিকে কালিন্দীতীরে দ্বাদশটি শিব মন্দির ছিল, মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণেও সামাজিক ও লোকজনের থাকিবার জন্য বহু ইষ্টক গৃহ ছিল বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ আছে। সেই সব ভগ্নস্তূপের মধ্যস্থানে নির্জ্জন প্রান্তরে বহুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র সমূহের মাঝে এখনও ডামরেলীর মন্দির দাঁড়াইয়া আছে; এখনও ইহার ভগ্নাংশে যে শিল্পকৌশল ও ভাব-চাতুর্য্যের বিকাশ আছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।[৩]

Navaratna and it seems that there never was any image within it. It appears that Navaratna was never dedicated to a God or Goddess. ......It was built for a different purpose, viz. as a *Shamaj mandir.*' —*Ancient Manuments in the Lower Provinces of Bengal*, 1896, p. 150.

১ যশোর-রাজগণের পতনের পর ধামরাইল পরগণা নল্‌তার গোলকনাথ ভঞ্জ চৌধুরীর অধিকৃত হয়। ভঞ্জ মহাশয়দের নিকট হইতে উহা এক সময়ে জয়নগরের মিত্রগণ ক্রয় করেন। তৎপরে উহা বর্ত্তমান গড়মুকুন্দপুর নিবাসী লক্ষ্মণচন্দ্র রায় মহাশয়ের পিতা ৺ নন্দকুমার রায় খোস কোবালায় খরিদ করেন। শুনা যায়, তিনিই জঙ্গল কাটাইয়া মন্দিরের আবিষ্কার করেন। কালে তাঁহার পুত্রগণের হস্ত হইতে উহা হুগলী জেলার কাকশিয়ালী নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় খরিদ করিয়া লন। শ্রীপুর নিবাসী তারাপদ ঘোষ মহাশয় উহার অধীনে পত্তনীদার।

২ দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের মত সুন্দর অভগ্ন ইষ্টক-মন্দির বঙ্গদেশে আর আছে কিনা সন্দেহ। ফার্গুসন সাহেব কৃত সুবিখ্যাত 'স্থাপত্যের ইতিহাসে' এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে' ঐ মন্দিরের ছবি আছে।

৩ ডামরেলীর মন্দিরটি সমচতুষ্কোণ। সমগ্র মন্দিরটি বাহিরে প্রত্যেক দিকে ৩৩'-৮" ইঞ্চি এবং গর্ভমন্দিরও বাহিরে প্রত্যেক দিকে ১৩'-১০" ইঞ্চি। গর্ভমন্দিরের উপর একটি বড় গুম্বজ ও চতুঃপার্শ্বস্থ অলিন্দের চারিকোণে চারিটি ছোট গুম্বজ ছিল। এই পাঁচটি গুম্বজের উপর পাঁচটি চূড়া ব্যতীত সর্ব্বোচ্চ চূড়ার চতুষ্কোণে আরও চারিটি চূড়া ছিল, এইরূপে সর্ব্বসমেত নয়টি চূড়া। সমগ্র মন্দিরের উচ্চতা মেজে হইতে ৪৭' ফুট। মন্দিরের মেজে কত উচ্চ ছিল, জানিবার উপায় নাই; কারণ মন্দির অনেক বসিয়া গিয়াছে। মন্দিরের বাহিরে উত্তরদিকে দরজা বা খিলান নাই। অন্য তিনদিকে তিনটি করিয়া খিলান। গর্ভমন্দিরে মাত্র পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দরজা আছে। গর্ভমন্দিরের গায়ে দক্ষিণ দিকে নানা ফুল কাটা ছবি, ও একটি বড় গরুড় মূর্ত্তির উপর কৃষ্ণরাধার যুগলরূপ। পশ্চিমদিকেও ঐরূপ গর্ভমন্দিরের গায়ে অসংখ্য ছবি অঙ্কিত, ধনুকধারী বীর, হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধযাত্রা, অশ্বারোহী, সিপাহী, দশ-অবতার প্রভৃতি অসংখ্য চিত্রে সুখচিত।

এই মন্দিরের গায়ে পশ্চিম বা সদরদিকে গর্ভমন্দিরের গায়ে একখানি ইষ্টকলিপি আছে। উহার কয়েকটি অক্ষরের একটু একটু ভাল পড়িতে পারা যায় নাই, তাহা হইলেও আমরা যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই :

শাকে বেদসমাযুক্তে বিন্দু বাণেন্দু সংমিতে।
মঠোঽয়ং স্বর্গসোপানং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতঃ স্বয়ং ॥[১]

১৫০৪

১ 'Ancient Manuments', 1896, নামক সরকারী বিবরণীতে এই লেখাটি এইরূপে পঠিত হয় :

'শাকে বেদ সময়ুতে-বসুবাণ সমন্বিতে
ইয়ং মগসোপান————

After the word সোপান what followed cannot be made out.'

শ্রদ্ধেয় বন্ধু ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় উক্ত পাঠই স্থির রাখিয়া প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় বহু যত্নসংকলিত স্বকীয় বিখ্যাত পুস্তকে (মূল ৮০-৮৩ পৃ) নানা বাদানুবাদ করিয়াছেন কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয়, যিনি বহুভাষা হইতে বহুতথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বহ্বায়াসে প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বদেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, যিনি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের স্বশ্রেণীভুক্ত কায়স্থ এবং যাঁহার জন্মপল্লী প্রতাপের রাজধানী হইতে বহুদূরবর্ত্তী নহে; তিনিও সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিচিহ্নের মধ্যে বোধহয় কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নাই। সেরূপ একটু চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইতেন তিনি যে একটি 'ইন্দু' শব্দ বাস্তবিক অনুমান বলে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহা ঐ লিপিতে স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। 'খুল্না' পত্রের অন্যতম লেখক অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন ('খুল্না,' ১০ই ফাল্গুন, ১৩২৬) তাহা এই :

'শকে বেদ সমায়ত বসুরাব্দে—রিতে
মঠোয়ম—র্গ সোপান শ্রীকৃষ্ণেন কৃতময়। ১৬০৪'

কিন্তু ইহাতে ভাষাই হয় না। তিনি লিখিয়াছেন 'শ্লোকের ব্যাকরণ শুদ্ধির দিকে শিল্পীরও লক্ষ্য নাই, আমরাও লক্ষ্য করি নাই।' বিক্রমাদিত্যের সভায় এমন সুন্দর মন্দিরের জন্য একটি সাধারণ শ্লোক লিখিবার পণ্ডিত ছিলেন না, বা শিল্পীর যথেচ্ছ কার্য্যের প্রতি কটাক্ষ করিবার লোক ছিল না, —একথা আমরা বিশ্বাস করি না। অবিনাশচন্দ্র ১৫০৪ সংখ্যার '৫' টির উপরিভাগ একটু সামান্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহাকে '৬' পড়িয়াছেন এবং পরে ১৬০৪ শক মিলাইবার জন্য কতকগুলি অযৌক্তিক জল্পনা কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। এখন যে কেহ ইচ্ছা করিলে আমাদের উদ্ধৃত পাঠ সেই স্থানে গিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারেন; তখন আমাদের কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। আমি 'খুল্না' পত্রে অবিনাশচন্দ্রের পত্রের যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলাম। আমার স্বচক্ষে পাঠোদ্ধার করিবার

ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫০৪ শাকে বা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বর্গসোপান-তুল্য এই মঠ নির্ম্মাণ করেন। অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব কর্ম্মকর্ত্তা (বিক্রমাদিত্য) 'সর্ব্বং কৃষ্ণার্পণমস্তু' এই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বকীয় কর্তৃত্ববুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া শ্রীভগবান্‌ই স্বয়ং এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই কথা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে পরম বৈষ্ণব ছিলেন; মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার যুগল রূপের চিত্র দেখিয়াও তাহাই অনুমান হয়। এখানে যে লিপি প্রদত্ত হইল, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াই বিশেষ

সময় দুই একস্থলে ইষ্টকাক্ষর লোণার দোষে একটু একটু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যে সব সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেছি। 'বিন্দু' কথার 'ব' কারে একটি 'ই' কার চিহ্ন স্পষ্ট নাই, উহা হইতে কেহ কেহ 'বসু' পড়িয়াছেন। 'সংমিতে' শব্দের 'সং' স্পষ্ট নাই এবং 'ম'টি 'ব'এর মত পড়া যায়। কিন্তু ইহাতে অর্থবোধের কোন ক্ষতি নাই। 'মঠোঽয়ং' শব্দে লুপ্ত অকারটিকে কেহ কেহ 'ই' পড়িয়াছেন, কিন্তু পুংলিঙ্গ মঠ শব্দে ইয়ং ব্যবহৃত হইতে পারেনা। 'স্বর্গ' কথার 'স্ব'টি 'ম'এর মত পড়িয়া ও রেফটি একটু অস্পষ্ট থাকায় 'স্বর্গ' মগে পরিণত হইয়াছে। উহাতে কোন অর্থ বোধ হয় না। বেদ=৪, বিন্দু=০, বাণ=৫, ইন্দু=১। 'অঙ্কস্য বামাগতি' অনুসারে ১৫০৪ শাক বা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহাই বিক্রমাদিত্যের সময়। যাহারা 'বিন্দু' স্থানে 'বসু' পাঠ করেন, তাহারা মন্দিরটি ১৫৮৪ শাক বা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলেন অর্থাৎ উহা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর বহুবৎসর পরে অন্যকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলেন। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। ইহার কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ, লিপির নিম্নে যে শাক সংখ্যা আছে, তাহার শূন্যটিকে কোন প্রকারে '৮' বলিয়া পড়া যায় না, দ্বিতীয়তঃ, মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ ছিল না, থাকিলে সেকথা লিপিতে বা প্রবাদে থাকিত; সুতরাং ইহা মঠ বা সমাজ মন্দির বা অন্য কোন স্মৃতি সৌধ। তৃতীয়তঃ, এমন সুন্দর মঠ বিক্রমাদিত্যের পরে কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে অপরপক্ষে একটি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে বুদ্ধিমন্ত খাঁ চৌধুরী নামক একজন বারুজীবী জাতীয় জমিদার বাস করিতেন, এখনও খোসবাসে তাঁহার খনিত পুষ্করিণী আছে এবং ঐস্থান ভাদবাড়ী (ভদ্রাসন) নামে খ্যাত। তিনিই নাকি এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। নিখিলনাথ রায় মহাশয়, এইরূপ একটা মতের পরিপোষক। তিনি বলেন, 'উহা বিক্রমাদিত্যের বহুপরে অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।' ('প্রতাপাদিত্য', মূল ৮৩ পৃ) কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই 'বিন্দু' স্থানে বসু পাঠের সমন্বয় করিতে গিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বচক্ষে দেখিলে এসব ভুল হয় না। কবে আমাদের দেশে চাক্ষুষ প্রমাণের বলে ইতিহাস লিখিত হইবে? ডামরেলীর মন্দিরের লিপির তারিখ হইতে নিঃসন্দেহরূপে বিক্রমাদিত্যের সময় নিরূপিত হইতে পারে বলিয়া এত বিস্তৃতভাবে ইহার প্রকৃত পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিলাম।

সতর্কতার সহিত উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। ইহাতে যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতে ঠিক বিক্রমাদিত্যের সময়ই পড়ে।

সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভের অব্যবহিত পরে এই মন্দিরের কার্য্যারম্ভ হয় এবং অবশেষে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য শেষ হয়। সুতরাং প্রতাপের রাজত্বারম্ভ এই অব্দের পূর্ব্বে হইতে পারে না এবং এ মন্দিরও প্রতাপাদিত্যের মত শাক্তের নির্ম্মিত নহে।

দশম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দদাস

রামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রগণ যখন গৌড়ে ছিলেন, তাহার ৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমগ্র বঙ্গে এক নূতন ধর্ম্মের তুফান বহিয়াছিল, সে তরঙ্গে কোমল হৃদয় মাত্রই ভাসিয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সম্ভবতঃ রামচন্দ্রই সপ্তগ্রাম বা গৌড়ে বাস করিবার সময়ে নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সপ্তগ্রাম ও গৌড় উভয় স্থানেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব আসিয়াছিল, সে প্রভাবে রঘুনাথ ও রূপ-সনাতন ভাসিয়া গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রামচন্দ্র যে বৈষ্ণব হইবেন, সে বড় বেশী কথা নহে। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় জন্মাবধি বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণলীলা পদগান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই সময়ে গৌড়ে তাঁহাদের সহিত পদকবি গোবিন্দদাসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।[১] গোবিন্দদাস তখন তাঁহার অতীব স্বাভাবিক এবং মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর প্রভাবে লোকমাত্রকে

১ শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ও ভক্ত, বৈদ্যবংশীয় চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডে বাস করিতেন। তাঁহার দুইপুত্র, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ, কালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী তেলিয়া-বুধরীতে বাস করেন। গোবিন্দ প্রথমতঃ স্বীয় মাতামহ দামোদর সেনের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে যখন তাহার বয়স ৪০ বৎসর, তখন ভীষণ গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া দৈবপ্রত্যাদেশ বশতঃ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে, সেই দীক্ষার সময়ে তাহার মুখ-পঙ্কজ হইতে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত ফুটিয়া ছিল। সেই এক গানে একজনকে অমর করিতে পারে। গোবিন্দকে বুঝিতে হইলে সে গানটি বাদ দেওয়া চলে না, সেজন্য উহা উদ্ধৃত করিতেছি :

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ, এভব সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত, বরিখ এদিন, যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগিরে॥
এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল-জল, জীবন টলমল, জপহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ-বন্দন, পাদ-সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান, আত্মনিবেদন, গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥

তদবধি মাতামহের কবিত্ব, জন্মদাতার বৈষ্ণব প্রেম, এবং গুরু শ্রীনিবাসের দেবপ্রভাব একত্র সম্মিলিত হইয়া, গোবিন্দের মুখে যে পদাবলী ফুটাইয়া ছিল, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া বঙ্গবাসীকে

মোহিত করিয়া দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়া আখ্যাত হইতেছিলেন। গোবিন্দের পিতামহ দামোদর[১] মহাকবি ছিলেন; গোবিন্দ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এমনও বর্ণনা আছে যে বাগ্দেবী যেন দাসীর মত তাঁহার লেখনী জুড়িয়া থাকিতেন।[২] কাব্যসাগর মন্থন করিয়া গোবিন্দ তাঁহার পদ রচনা করিতেন, আর সে পদাবলী যখন তাঁহার কণ্ঠে সুরের সহিত গীত হইত, তখন শ্রোতৃবর্গের প্রাণ কাড়িয়া লইত। মহাপ্রাণ বসন্ত রায়ের সহিত গোবিন্দদাসের প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছিল। তিনি যশোরে আসিয়া গোবিন্দকে ভুলিতে পারেন নাই; তাঁহার জীবনে তিনি কখনও গোবিন্দ নাম ভুলেন নাই; তাঁহার ইষ্টদেবতা গোবিন্দদেব, তাঁহার প্রাণের বন্ধু গোবিন্দদাস, তাঁহার পুত্র ছিলেন গোবিন্দ রায়, গোবিন্দ যেন বসন্ত রায়ের জীবন পথের সাথী। তাঁহার অনুরোধে কিছুদিন পরে পরে গোবিন্দদাস যশোহরে আসিতেন, আসিলে আর সহজে যাইতে পারিতেন না। রাজকার্য্য হইতে যখনই কোন অবসর মিলিত, রাজভ্রাতৃদ্বয় তখনই গোবিন্দকে লইয়া তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতেন। যুবরাজ প্রতাপাদিত্য আজন্ম বৈষ্ণব ছিলেন এবং কীর্ত্তন গানও ভালবাসিতেন। প্রতাপ যেমন বসন্ত রায়ের নিকট অসি-শিক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রাথমিক শিক্ষাও তাঁহারই নিকট পাইয়াছিলেন।

বসন্ত রায় যে শুধু সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে। তিনিও স্বভাব কবি। তিনিও পদ রচনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিতরঙ্গ, শুধু বঙ্গকলিঙ্গ কেন,

ধন্য করিয়াছে। শ্রীনিবাস ও জীবগোস্বামী উভয়ে তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দেন। গোবিন্দ কবিরাজ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হন এবং ১৬১৩ অব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন (জগবন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত 'গৌরপদ-তরঙ্গিনী', ৭০ পৃ)। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় আরও ১২ বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দের জন্মকাল স্থির করেন। তাহা হইলে ১৫৬৬ অব্দে গোবিন্দ বৈষ্ণব হন। সম্ভবতঃ তাহারই দুই এক বৎসর পর গৌড়ে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১ 'পাতালে বাসুকির্বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা, খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥'—সঙ্গীতমাধব

২ 'শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, বন্দিত কবি-সমাজ, কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাঁহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে, অলৌকিক কবি শিরোমণি॥'
—বল্লভদাস

ভারতের বহু অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল। এক নবাগত সঞ্জীবনীশক্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে কত অধম সন্তান প্রেমিক হইল, কত লক্ষপতিকে রাজর্ষি করিয়াছিল। সঙ্গীত বা পদ রচনা করা একালের একটা প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু বঙ্গবাসী বা হিন্দু কেন, কত মুসলমান কবি, এমন কি একপ্রকার নিরক্ষর আকবর বাদশাহ পর্য্যন্ত, পদরচনা করিতেন।[১] কবিদিগের মধ্যে সেকালে তর্জ্জায় লড়াই হইত। একজন কবিতায় যে সকল প্রশ্ন করিতেন, অন্যে তৎক্ষণাৎ কবিতায় তাহার উত্তর দিতেন। গোবিন্দদাসের সহিত বসন্ত রায়ের সেরূপ লড়াই চলিত। বসন্ত রায় এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসহকারে সত্বর উত্তর প্রদান করিতেন যে, গোবিন্দদাসও তাঁহার কবিত্ব ও অনুসন্ধানের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। রাসলীলা প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন :

'কুসুমিত কুঞ্জ কল্পতরুকানন, মণিময় মন্দিরমাঝ।
রাসবিলাস কলাউৎকণ্ঠিত, মনোমোহন নটরাজ॥
কামিনী-কর-কিশলয়-বলয়াঙ্কিত রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রায় বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥'

—পদাবলী, ৭৬ পৃ

আবার মানপ্রসঙ্গে কতস্থানে আছে, যেমন :

'রায় চম্পতি, বচন মানহ, দাস গোবিন্দভাণ।'
'রায় চম্পতি, ও রস গাহক, দাস গোবিন্দ ভাণ।'

—পদাবলী, ২০৮-০৯ পৃ

---

১ 'জীউ জীউ মেরে, মনচোরা গোরা।
আপনি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে, ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চার চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পঁহুকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী॥'

—'গৌরপদ তরঙ্গিনী', ২৫৭ পৃ

As regards Akbar's formal illiteracy, Dr. Vincent A. Smith writes : 'He never learned elements of reading and writing'—*Akbar*, p. 337.

এসকল স্থানে নিঃসন্দেহে বসন্ত রায়কে বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থানে 'দ্বিজরাজ বসন্ত' ভণিতাও আছে, যেমন শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ প্রসঙ্গে :

'পদতলে থলকি, কমল ঘন রাগ, তাহে কলহংস কি নুপুর জাগ।
গোবিন্দদাস, কহয়ে মতিমন্ত, ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥'[১]

—পদাবলী, ৮২ পৃ

প্রতাপাদিত্যের রাজসিংহাসনে আরোহণের পরেও গোবিন্দদাস যশোহরে আসিতেন। তৎপ্রণীত সঙ্গীতে প্রতাপের নামের ভণিতা আছে, যেমন 'মাথুর' প্রসঙ্গে :

'এত হি বিরহে আপহি মূরছই, শুনহ নাগর কান।
প্রতাপ আদিত, এ রস ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান॥'[২]

সম্ভবতঃ যশোরেশ্বরী দেবীর পুনরাবির্ভাবের পর প্রতাপাদিত্য যখন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং যখন অবিরত মোগলের সহিত সংঘর্ষের জন্য তাঁহাকে

---

১ জগদ্বন্ধু ভদ্র মহোদয় গোবিন্দদাসের যশোহর আগমন স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, যে 'দ্বিজরাজ বসন্ত রায়ের' কথা গোবিন্দের পদাবলীতে আছে, তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব এবং যশোহরের বসন্ত রায় ছিলেন কায়স্থ ও শাক্ত। সুতরাং তাঁহার মতে উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বসন্ত রায় কায়স্থ হইলেও তাঁহাকে লোকে ঠাকুর বসন্ত রায় বা বসন্ত ঠাকুর বলিয়া ডাকিত এবং তাঁহাকে 'দ্বিজরাজ বসন্ত' ভণিতা দেওয়া অসম্ভব নহে। 'দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে' এমন ভণিতা প্রসাদী পদাবলীর অন্ততঃ গাথকের মুখে সচরাচর শুনা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বসন্ত রায় বৈষ্ণবই ছিলেন, শাক্ত ছিলেন না, প্রতাপের মত তিনি শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তবে উদার হিন্দুর মত তাঁহার শক্তি-বিদ্বেষ ছিল না; পুরুষানুক্রমে তদ্বংশীয়েরা বৈষ্ণব; নিজের রাজ্যমধ্যে পড়িয়াছিল বলিয়াই তিনি পীঠস্থানে মায়ের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই কালীঘাটেও তিনি শ্যামরায় বিগ্রহের উপাসক ছিলেন। সেই শ্যামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন; কেহ কেহ বলেন সে বিগ্রহের পদতলে বসন্তের নাম লেখা আছে। আমি স্বচক্ষে তাহা দেখি নাই। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য স্বতন্ত্র দ্বিজ বসন্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু গোবিন্দদাস যে বসন্ত রায়ের সভা উজ্জ্বল করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বসন্ত দুই জন থাকিলেও প্রতাপাদিত্য দুইজন ছিলেন না। গোবিন্দের পদে প্রতাপাদিত্যের ভণিতা আছে। গোবিন্দদাস যে যশোহরে আসিতেন, পূজ্যপাদ ৺হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় সে মতের পরিপোষক। গোবিন্দের পদে পাইকপাড়ার কবি নৃপতি নরসিংহের উল্লেখ আছে।

২ অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সঙ্কলিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী', ২৪১ পৃ; 'বিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, ২৬৬ পৃ; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', উপক্রমণিকা, ১১৩ পৃ।

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সম্ভবতঃ তখন হইতে যশোহরের সহিত গোবিন্দের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা হইতে খুল্লতাতের অনুরোধে গোবিন্দদেব বিগ্রহ লইয়া আসেন। উহার জন্য বসন্ত রায় গোপালপুরে অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সে কথা পরে বলিব। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। সে মন্দিরের সংলগ্নভাবে একই চত্বরে আরও যে কয়েকটি সৌধ গঠিত হইয়াছিল, উহা এক্ষণে স্তূপীকৃত ইষ্টকে পরিণত হইয়াছে। সে সকল গৃহে সাধুভক্তগণ আসিয়া বাস করিতেন, প্রাতঃসন্ধ্যায় কীর্ত্তন-রঙ্গে তাহা প্রতিধ্বনিত হইত। তখন গোবিন্দদাস যশোহরে আসিলে, সেখানেই অধিষ্ঠান করিতেন। গোবিন্দ ও বসন্ত রায়ের ইষ্টদেবতা গোবিন্দদেব বিগ্রহ এখনও আছেন এবং নিত্য পূজিত হইতেছেন। যথাস্থানে তাহার বিবরণ দিব। প্রতাপাদিত্যের পতন ও পরলোক গমনের কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দদাস দেহত্যাগ করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বংশ-কথা

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যশোহর-রাজগণের বংশকথা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ বংশধরগণের নাম ও তাহাদের সম্বন্ধ-সূত্র না জানিলে পরবর্ত্তী ঘটনাবলী সহজে বুঝা যাইবে না। এজন্য আমরা ঘটকদিগের প্রাচীন পুঁথিতে আশগুহ বংশীয় গজপতি হইতে প্রতাপাদিত্যের সন্ততি পর্য্যন্ত এই বংশের বিবরণী যতটুকু আছে, তাহা এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি; পরবর্ত্তী অংশের বংশতালিকা প্রয়োজন মত স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। প্রতাপাদিত্যের বাল্যকথা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রপৌত্রের প্রসঙ্গ তুলিতে যাওয়া প্রচলিত প্রণালীর অনুমত না হইতে পারে; কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে ঔপন্যাসিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। সরল সত্য পূর্ব্বক্ষণে বলিয়া রাখাই ভাল, কারণ তাহা হইতে পরে অনেক দ্বিরুক্তি বা কৈফিয়তের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমার নিকট যে সকল বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকা আছে, তন্মধ্যে একখানি অতিজীর্ণ পুরাতন পুঁথিতে আশগুহের বংশশাখা পাইয়াছি; উহার যে অংশে যশোহর-রাজগণের প্রসঙ্গ আছে, অতিকষ্টে পাঠোদ্ধার করিয়া সেইটুকুমাত্র এখানে প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য ঘটককারিকার সহিত যে ইহার সামঞ্জস্য আছে, তাহা ভাল ভাবে মিলাইয়া দেখিয়াছি। এজন্য এই পুঁথিখানি প্রামাণিক বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এই বিবরণীতে দান গ্রহণ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে; যে সকল বংশের সহিত বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল, পৃথক পৃথক ভাবে সে সব বংশের প্রসঙ্গেও এই রাজবংশীয়দিগের নাম যথোপযুক্ত ভাবে পাইয়াছি। এই বংশাবলী অতি সংক্ষিপ্ত, ইহাতে অনর্থক কথা নাই। কিন্তু দান গ্রহণের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার আছে, তাহা দেখিলে সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গাভ-বসুবংশীয় পরমানন্দ রায় বসন্ত রায়ের ভগিনীপতি ছিলেন; তিনি যশোহর-রাজ্যের পতনের পর বর্ত্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী হাবেলী কাড়াপাড়ায় বাস করেন। সমাজে তিনি উচ্চকুলীন বলিয়া বিখ্যাত; এখনও তাহার বংশধরগণ সগৌরবে তথায় বাস করিতেছেন। তাহাদেরই আশ্রিত ঘটকদিগের নিকট হইতে আমি

কতকগুলি প্রাচীন কারিকা সংগ্রহ করিয়াছি। কারিকায় বর্ণাশুদ্ধি অনেক আছে, কিন্তু তাহা সংশোধন না করিয়াই অবিকল প্রকাশ করিলাম। এই কারিকায় কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বিবাহস্থলে 'বিং', কন্যাদানের বেলায় 'দানং' এবং সম্বন্ধের প্রকৃতি প্রসঙ্গে 'সৎ, উচিতং, উপ, উপকড়ি, অপ, অত্যপ' প্রভৃতি। উচ্চঘরে বিবাহ কার্য্য করিলে 'সৎ', সমান ঘরে কার্য্য করিলে 'উচিতং', তন্নিম্নে অন্যান্য সঙ্কেত। 'অপ' ও 'অত্যপ' অত্যন্ত হীন সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। 'দৌ' বলিতে দৌহিত্র বুঝিতে হইবে, যেখানে 'বসুদৌ' আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, বসুকন্যার গর্ভজাত সন্তান।

'গজপতি গুহ বিং সৎ লক্ষ্মণ ঘোষ উপগণপতি ঘোষ। দানং উপকামঘোষ উপ—ঘোষ। সুতা ছকড়ি গুহ জগন্নাথগুহ চতুর্ভুজ গুহ *। ছকড়ি গুহ বিং সৎ জনার্দ্দন বসু উপ রাম ঘোষ। দানং সৎ গোপিনাথ বসু উপ জিতামিত্র বসু গন্ধর্ব্ব মল্লিক। সুত রামচন্দ্র গুহ বিং উচিতং সষ্টিবর বসু উচিতং শ্রীকান্ত ঘোষ। দানং সৎ জগদানন্দ বসু উপ ভবানন্দ ঘোষ। সুতা বসুদৌ ভবানন্দ গুহ গুণানন্দ গুহ সিবানন্দগুহাঃ। ভবানন্দ গুহ বিং সৎ পরাশর ঘোষ উপ শ্রীনিবাস ঘোষ। দানং সৎ জগদানন্দ রায় সৎ শ্রীনিধি বসু উপ চতুর্ভুজ ঘোষ উপকড়িচাঁদ বসু। সুতা শ্রীহরি গুহ রাজা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রশিখর গুহৌ। বিক্রমাদিত্য বিং সৎ বিষ্ণুঘোষ সৎ উগ্রকণ্ঠ বসু। দানং সৎ গোবিন্দ ঘোষ লস্কর উচিতং নয়নানন্দ বসু অত্যপ চাঁদরায় দেব। সুতৌ বসুদৌ রাজা প্রতাপাদিত্য ঘোষদৌ ভূপতি রায় লক্ষ্মীনাথ রায়াঃ। প্রতাপাদিত্য বিং সৎ জগদানন্দ রায় সৎ গোপাল ঘোষ—কবিশ্চন্দ্র খাঁ নাগ। দানং উচিতং রাজবল্লভ রায় উপগ্রহ রাজা রামচন্দ্র পণং বিনা। সুতা নাগদৌ উদয়াদিত্য অন্তরায় সংগ্রাম রায় ঘোষ দৌ রামভদ্র রায় রাজীব লোচন রায় জগদ্বল্লভ রায়া। উদয়াদিত্য বিং সৎ কন্দর্প রায়। অনন্ত রায় বিংসৎ গোপালদাস বসু সুত বিজয়াদিত্য বিংসৎ রমাবল্লভ রায় বসু। সংগ্রাম রায় বিংসৎ চাঁদ বসু। রাম ভদ্ররায় বিংসৎ জগন্নাথ—। রাজীব লোচন বংশ নাস্তি। জগত বল্লভ রায় বিংসৎ গোবিন্দ লস্কর। * * * চন্দ্রসিখর গুহ বিং সৎ শ্রীচন্দ্র বসু॥ গুণানন্দ গুহ বিংসৎ জগদানন্দ বসু অত্যপ অনন্তদত্ত ইটনা। * দানং * উপকড়ি পৃথ্বীধর বসু সৎ পরমানন্দ বসু। সুতা কৃষ্ণদাস গুহ বিদ্যাধর রায় জানকীবল্লভ গুহ বসন্ত রায় * * * বসন্ত রায় বিংসৎ জয়ন্ত ঘোষ সৎ

মনোহর বসু অত্যপ কৃষ্ণদত্ত ইটনা (কন্যাদ্বয়ং)। দাং উপকড়ি রাজিব বসু উপ কন্দর্প রায় উচিতং সুবানন্দ বসু। সুতা চণ্ডিদাস গুহ জগদানন্দ রায় নারায়ণ দাস রায় দত্ত দৌ রাজা জশহরজিত চাঁদ রায় রূপরায় বসুদৌ শ্রীরাম রায় গোবিন্দ রায় কমোল রায় পরমানন্দ রায় মধুসুদন রায় রমাকান্ত রায়াঃ। জগদানন্দ রায় বিংসৎ শ্রীবিষ্ণু বসু বংশ নাস্তি। * * * রাজা জশহরজিত বিংসৎ চাঁদ বসু বংশ নাস্তি॥ * * শিবানন্দ মজুমদার বিংসৎ হয়গ্রিব ঘোষ উপকড়ি শ্রীকৃষ্ণ বসু। সুতা মুকুট রায় গোবিন্দ রায় বিষ্ণুদাস রায়াঃ॥'

কাড়াপাড়ার কারিকা,[১] আশগুহ বংশ, ৯৯—১০০পত্র

বিরাট গুহের ৯ম পর্য্যায়ে আশ বা অশ্বপতি গুহ। তৎপুত্র গজপতি হইতে বংশাবলী উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে কতকগুলি নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। আমরা ক্রমান্বয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি :

১. সপ্তগ্রামে গিয়া রামচন্দ্র শ্রীকান্ত ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। সে স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সরকারী কার্য্যারম্ভ করিতে অন্ততঃ ২৫ বৎসর লাগে; কনিষ্ঠ শিবানন্দের কার্য্যারম্ভের পরও কয়েক বৎসর তাহারা সপ্তগ্রামে ছিলেন। এত দীর্ঘকাল রামচন্দ্র সপ্তগ্রামে ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান কারিকা হইতে পাওয়া যাইতেছে, ভবানন্দ প্রভৃতি তাহার প্রথম পক্ষের অর্থাৎ ষষ্ঠীবর বসুর কন্যার গর্ভজাত সন্তান। রামচন্দ্র রাজসরকারে প্রবেশ করিবার পর তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সপ্তগ্রামে আসেন।

২. এখানে দেখা গেল, বিক্রমাদিত্যের অন্য একটি ভ্রাতা ছিলেন—চন্দ্রশেখর গুহ এবং তিনি বিবাহিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন বংশবৃদ্ধির উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজা হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পড়েন; কারণ বিক্রমাদিত্যের রাজা হওয়ার পর তদ্বংশীয় সকলেরই উপাধি হইয়াছিল 'রায়', কিন্তু চন্দ্রশেখরের সে উপাধি নাই।

৩. বিক্রমাদিত্যের দুই বিবাহ; তন্মধ্যে উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যার গর্ভে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। অন্য অর্থাৎ ঘোষ দুহিতার গর্ভে ভূপতি রায় ও লক্ষ্মীনাথ রায় নামক অন্য দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে লক্ষ্মীনাথের সন্ধান নাই;

১ এই কারিকা সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রামাণিক ও অতি পুরাতন কারিকা। কাড়াপাড়া নিবাসী সারদাচরণ কাণ্ডারী মহোদয়ের নিকট হইতে এই কারিকা সংগ্রহ করি।

ভূপতি রায়ের বংশ ছিল ; তাহার পুত্রের নাম মুকুটমণি। শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিলনাথ রায় যে কারিকা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আধুনিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত।[১] তাহাতে আছে, মুকুটমণি প্রতাপের পুত্র ; কিন্তু সেকথা ঠিক নহে। ইদিলপুর, দেহেরগাতি ও কাড়াপাড়ার কারিকা হইতে প্রতাপের পুত্রগণের নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মুকুটমণি নাই।

৪. প্রতাপাদিত্য গোপাল ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন ; তিনি গোপাল-দাস বসুর কন্যা বিবাহ করেন নাই, সে কন্যার সহিত তাহার পুত্র অনন্ত রায়ের বিবাহ হয়। মাল্‌খা নগরের কুরচিনামায় আছে :

'দানং গোপাল বসুনা কৃতিনা জগতীতলে।
বিক্রমাদিত্য তনয়ে প্রতাপাদিত্য সংজ্ঞকে ॥'[২]

সে কথা ঠিক নহে। একাধিক কারিকা হইতে পাওয়া গিয়াছে যে, প্রতাপ গোপাল ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। নিখিলনাথও ইহাই স্থির করিয়াছেন।[৩] গোপালদাস বসু বিখ্যাত কুলীন ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। যশোহর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোপালদাস বসু বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ বসু রায়ের সহিত কুল মর্য্যাদা বিষয়ে বিবাদ করিয়া যশোহরে আসেন।[৪] তাহার আবাসস্থান এখনও বসুর হাট বা বসির হাট বলিয়া খ্যাত ;[৫] বসিরহাট ২৪-পরগণা জেলার একটি সবডিভিসন। এই কারিকা হইতে দেখিতেছি, তাহার কন্যার সহিত প্রতাপ-পুত্র অনন্ত রায়ের বিবাহ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর গোপালদাস বসু বসুর হাট হইতে চলিয়া গিয়া প্রথমে ঢাকায় ও পরে মালখা নগরে বাস স্থান নির্ণয় করেন। তাহারই নামানুসারে ঢাকাসহরের একটি অংশ বসুর বাজার বলিয়া আখ্যাত হয়। আওরঙ্গজেবের সময় গোপালদাসের পৌত্র দেবিদাস নওয়ারা মহল বা নাব

১ 'প্রতাপস্তাপরঃ সুতো মুকুটমণিসংজ্ঞকঃ'।—নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৩৪২ ও ৪৮১ পৃ। ইদিলপুরের ঘটককারিকায় মুকুটমণি ভূপতি রায়ের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত। শাস্ত্রীমহাশয়ের কারিকা যে আধুনিক তৎসম্বন্ধে নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৩৬৩-৪ পৃ দ্রষ্টব্য।

২ 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', ১৩১৯, ৪র্থ সংখ্যা, ১৭১ পৃ।

৩ 'প্রতাপাদিত্য', ৯১ পৃ ; 'বঙ্গীয় সমাজ', ১৫২ পৃ।

৪ রোহিণীকুমার সেন, 'বাক্‌লা', ১৬৫ পৃ।

৫ 'ঢাকা রিভিউ', ২য় খণ্ড, ১৩১৯ ,১৭১ পৃ।

বিভাগের কানুনগো ছিলেন। মালখা নগরে দেবিদাসের নির্ম্মিত 'সেঘরা' নামক সৌধে যে ইষ্টকলিপি আছে, উহা হইতে ১০৮৭ সন বা ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ পাই।[১]

৫. প্রতাপের অন্য বিবাহ কবিশ্চন্দ্র খাঁ নাগের কন্যার সহিত হইয়াছিল, দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ কবিশ্চন্দ্র খাঁ একটি উপাধি মাত্র, উহার প্রকৃত নাম জিতামিত্র নাগ। অন্যান্য কারিকায় জিতামিত্র নাগের কথাই আছে। রামরাম বসুর গ্রন্থে 'নাগ-ঝি'র কথা আছে।[২] নাগকন্যাই প্রতাপাদিত্যের পাটরাণী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যের মাতা।

৬. এই কারিকা হইতে দেখিতে পাইতেছি, প্রতাপের, দুই কন্যা ছিল। প্রথমটি রাজবল্লভ রায়ের সহিত বিবাহিত হয়। সে জামাতা রাজবাটিতে বাস করিতেন বলিয়া ঘটকেরা তাহাকে 'উপগ্রহ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য কন্যার সহিত বাক্‌লার অধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। সে কন্যার নাম বিন্দুমতী। বিন্দুমতী রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের জননী। তিনি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এ উক্তি মিথ্যা।[৩]

৭. এতদিন উদয়াদিত্য ভিন্ন প্রতাপের অন্য পুত্রগণের নাম পাওয়া যায় নাই; এই কারিকায় সকল নাম স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। কেহ বলেন প্রতাপের একাদশ পুত্র ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বসন্ত রায়ের পুত্র সংখ্যা ১১ এবং প্রতাপের পুত্র সংখ্যা ৬। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের একাদশ সংখ্যা ভুলক্রমে প্রতাপের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে।[৪] প্রতাপের পুত্রগণ কেহই শিশু ছিলেন না; সকলেরই বিবাহ প্রতাপের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তাঁহার পতনের পর পুত্র কেহই জীবিত ছিলেন না; সুতরাং তাহাদের বিবাহ তাঁহার জীবদ্দশায় না হইয়া পারে না। শুধু তাহাই নহে; দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায়ের একটি পুত্র সন্তান বিজয়াদিত্যও প্রতাপের জীবদ্দশায় ভূমিষ্ঠ হন। তাহারও বিবাহের উল্লেখ ঘটককারিকায় আছে। সম্ভবতঃ শেষ যুদ্ধের পর বিজয়াদিত্য জীবিত ছিলেন

১ 'ঢাকা রিভিউ', উক্ত সংখ্যা, ১৭২ পৃ।

২ 'প্রতাপাদিত্য', ৯১ পৃ; রামরাম বসুর গ্রন্থ (মূল সংস্করণ), ১৫১ পৃ ['প্রতাপাদিত্য', মূল ৬৩ পৃ—শি মি]।

৩ নিখিলনাথ রায় 'প্রতাপাদিত্যে'র ১৪৮ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি নাই। এ বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব।

৪ নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৪৮১ পৃ।

এবং তাহার বিবাহ পরে হইয়াছিল। আমরা পরে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব।

৮. অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহোদয় 'বহারিস্তান' নামক ফার্সী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সম্প্রতি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে নূতন সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি '১৬০৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রতাপাদিত্যের দূত সেখ বদী ঐ রাজার কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম আদিত্যকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া রাজমহলে নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল।'[১] সংগ্রামাদিত্য যে প্রতাপের কনিষ্ঠপুত্র তাহা এই কারিকা হইতে জানা গেল। পূর্ব্বে ইহা জানা ছিল না।

৯. গাভবসু বংশীয় পরমানন্দ রায় গুণানন্দের কন্যা ভবানী দেবীকে বিবাহ করেন এবং তদবধি তিনি কুলগ্রন্থ নিচয়ে 'ভবানীপরমানন্দরায়' এরূপ জোড়ানামে পরিচিত হইয়াছেন। ভবানী দেবী বসন্ত রায়ের কন্যা নহেন।[২] কারিকায়ও তাহা দেখিতে পাই না। পরমানন্দ ও বসন্ত রায় উভয়ে ১৪ পর্য্যায়ভুক্ত। পরমানন্দের সহিত ১৫ পর্য্যায়ের কন্যার বিবাহ হয় নাই।

১০. রামচন্দ্রগুহের সরকারী কার্য্যে নিয়োগের পর হইতে তাঁহার 'নিয়োগী' উপাধি হয়। ক্রমে তদ্বংশীয়দিগের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে, নিয়োগীর পুত্রগণ 'মজুমদার' উপাধি পান, এবং মজুমদারের পুত্রগণ রাজা হন এবং 'রায়' উপাধি ধারণ করেন। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকের আদি বা রাশি-নামও বদলাইতে থাকে। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের নামের পরিবর্ত্তন আমরা জানি। বসন্ত রায়ের একটি ভ্রাতা ছিলেন কৃষ্ণদাস গুহ ; তাহার নাম পরিবর্ত্তন হইয়া বিদ্যাধর রায় হইয়াছিল। এইরূপে বসন্ত রায়ের পুত্র চণ্ডীদাস গুহের নাম হয়—জগদানন্দ রায়। বরিশাল-দেহেরগাতির প্রসিদ্ধ ঘটকগণের কুলগ্রন্থ হইতে আমি যে বিবরণ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ ও তাঁহার পুত্রগণের সকলেরই নামের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সে কারিকা অনুসারেও প্রতাপের পুত্র সংখ্যা ৬ এবং তাহাদের নামের সহিত বর্ত্তমান কারিকার সম্পূর্ণ মিল আছে। প্রতাপাদিত্যের নিজের পূর্ব্বনাম গোপীনাথ এবং তাঁহার পুত্র

১ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক, ২ পৃ ['শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫,—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য -শি মি]।

২ 'বঙ্গীয় সমাজ', ২০৫ পৃ।



গোবিন্দদেব বিগ্রহ



যশোরেশ্বরীর বর্ত্তমান নাটমন্দির



কাটুনিয়ার গোবিন্দ মন্দির

উদয়াদিত্যের পূর্ব্ব নাম জগন্নাথ। দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায়ের নাম হইয়াছিল প্রতাপ-নরেন্দ্র, সংগ্রাম রায় বা সংগ্রামাদিত্যের অন্য নাম প্রতাপ-কর্ণ, রামভদ্রের নাম প্রতাপ-ভীম, রাজীবলোচনের পরবর্তী নাম প্রতাপ-অর্জ্জুন এবং জগদ্বল্লভের নাম হইয়াছিল প্রতাপচন্দ্র; পঞ্চপুত্রের কেহই কিন্তু প্রতাপ বর্জ্জিত নহেন। প্রতাপের পুত্রগণের নূতন নামগুলি বর্ত্তমান রাজবংশীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ জানেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভুল ধারণা চলিয়া আসিতেছে। আশা করি, বর্ত্তমান কারিকাগুলি হইতে সে সন্দেহের নিরসন হইবে।

১১. শিবানন্দের পুত্রগণের নাম সম্বন্ধে অন্য কারিকার সহিত কিছু অমিল হইতেছে। শিবানন্দ ভ্রাতৃগণের সহিত মনোমালিন্য-সূত্রে যশোহরে আসেন নাই; কথিত আছে, তিনি পূর্ব্ববঙ্গে চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত রোয়াইলে বাস করেন; নিখিলনাথ 'কায়স্থ-বংশাবলী' নামক গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, শিবানন্দের তিন পুত্রের নাম হরিদাস, গোপালদাস ও বিষ্ণুদাস। তন্মধ্যে বিষ্ণুদাস পরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যশোহরে আসিয়াছিলেন। তাহার নাম লইয়া বর্ত্তমান কারিকার কোন অমিল নাই। কেবল মাত্র হরিদাস ও গোপালদাস স্থলে মুকুট রায় ও গোবিন্দ রায় পাই। গোপাল ও গোবিন্দে ভুল হওয়া অসম্ভব নয় এবং হরিদাসের অন্য নাম মুকুট রায় হইতেও পারে। মুকুট রায় নামটি অনেকস্থলে উপাধিস্বরূপই লক্ষ্য করিয়াছি। যাহা হউক, তিন পুত্রের মধ্যে অন্য কোন বংশ খ্যাতিলাভ না করুন, হরিদাসের বংশ পুনরায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহার পৌত্র রাজনারায়ণ মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে কানুনগো দপ্তরের সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া মজুমদার হন; তাঁহার ভ্রাতা গোপীকান্তের বৃদ্ধপ্রপৌত্র উদয়চন্দ্র প্রথমতঃ সামান্য বেতনে উক্ত নবাব-সরকারে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে নায়েব দেওয়ানের পদ পান, এবং দেওয়ান রাজা পরেশনাথের মৃত্যুর পর কিছুদিন কার্য্যতঃ দেওয়ানের কার্য্য করিয়া 'রায়রাইয়াঁ' খেতাব ও অশেষ সম্মানভাজন হন।[১] কিন্তু পদের গৌরব অপেক্ষাও তিনি চরিত্র, ধর্ম্মপ্রাণতা ও দানশীলতার গৌরবে দেশে বিদেশে খ্যাতি মণ্ডিত হইয়াছিলেন।[২]

১ রাজা পরেশনাথ যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বসুবংশের একজন কৃতী পুরুষ। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও পাঁজিয়ায় বাস করিতেছেন। এই প্রসিদ্ধ কায়স্থ প্রধান গ্রাম যশোহর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

২ Mazumdar, Purnachandra—*Musnad of Murshidabad*, pp. 166-8.

বংশলতিকা

১ বিরাট গুহ
|
২ নারায়ণ
|
৩ দশরথ
|
৪ ভরত
|
৫ পীতাম্বর
|
৬ সাঞি
|
৭ তপন
|
৮ শঙ্কর
|
৯ অশ্বপতি বা আশগুহ — বিন্ গুহ

৯ আশগুহ
|
১০ গজপতি
|
১১ ছকড়ি — জগন্নাথ — ১১ চতুর্ভুজ

১১ ছকড়ি
|
১২ রামচন্দ্রগুহ, নিয়োগী
=ষষ্টীবর বসু কন্যা (ক)
=শ্রীকান্ত ঘোষ কন্যা (খ)
|
(ক) ১৩ ভবানন্দ মজুমদার — (ক) ১৩ গুণানন্দ মজুমদার — (ক) ১৩ শিবানন্দ মজুমদার

১৩ ভবানন্দ মজুমদার
|
১৪ শ্রীহরি গুহ
রাজা বিক্রমাদিত্য
=উগ্রকণ্ঠবসু কন্যা (গ)
=বিষ্ণুঘোষ কন্যা (ঘ)
|
(গ) ১৫ রাজা প্রতাপাদিত্য — (ঘ) ভূপতি রায় — (ঘ) লক্ষ্মীনাথ রায়

(গ) ১৫ রাজা প্রতাপাদিত্য
=গোপালঘোষ কন্যা (চ)
=জিতামিত্রনাগ কন্যা,
রাণী শরৎকুমারী (ছ)

ভূপতি রায়
|
মুকুটমণি (উৎকূল)

১৩ শিবানন্দ মজুমদার
|
হরিদাস — গোপালদাস — বিষ্ণুদাস

১১ চতুর্ভুজ
|
১২ স্বয়ম্বর
|
১৩ দুর্লভ
|
ভবানীদাস (টাকী) — জগদানন্দ (শ্রীপুর) — ১৪ রমাবল্লভ (ভুলুয়া)

১৪ রমাবল্লভ (ভুলুয়া)
|
জগদ্বল্লভ (সন্দ্বীপ)
|
ভবানী
|
চূড়ামণি
|
গৌরচন্দ্র
|
ত্রিলোচন
|
২০ প্রাণহরি গুহ
(জীবিত, সন্দ্বীপ
বয়স ৫০)
|
বরদাপ্রসন্ন — সতীশ

(গ)

১৫ রাজা প্রতাপাদিত্য
=গোপালঘোষ কন্যা (চ)
=জিতামিত্রনাগ কন্যা,
রাণী শরৎকুমারী (ছ)

- (ছ) ১৬ উদয়াদিত্য
- (ছ) ১৬ অনন্তরায় =গোপালদাস বসু কন্যা
  - ১৭ বিজয়াদিত্য
- (ছ) সংগ্রামাদিত্য
- (চ) রামভদ্র রায়
- (চ) রাজীবলোচন রায়
- (চ) জগদ্বল্লভ রায়

১৩ গুণানন্দ মজুমদার

- ১৪ জানকীবল্লভ, রাজা বসন্ত রায় =মনোহরবসু কন্যা (জ) =কৃষ্ণরায় কন্যা (ঝ)
  - চণ্ডীদাস গুহ বা জগদানন্দ রায়
  - নারায়ণ
  - রাঘব রায় বা রাজা যশোহরজিৎ রায় (ঝ)
  - ১৫ চন্দ্র শেখর বা চাঁদ রায় (ঝ)
    - ১৬ রাজারাম
      - ১৭ নীলকণ্ঠ (খোড়গাছি)
      - শ্যামসুন্দর (রামজীবনপুর)
  - রূপ রায় (জ)
  - শ্রীরাম
  - গোবিন্দ (জ)
  - কমল (জ)
  - পরমানন্দ (জ)
  - মধুসূদন
  - রমাকান্ত
- কৃষ্ণদাস গুহ বা বিদ্যাধর রায়
- ভবানী দেবী =পরমানন্দ রায়

দ্বা দ শ প রি চ্ছে দ

প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, বৈষ্ণব পরিবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার নাম রাখা হইয়াছিল—গোপীনাথ; তিনি পিতার 'বিক্রমাদিত্য' ও 'মহারাজ' উপাধি লাভের পর, যুবরাজ হইয়া প্রতাপাদিত্য নামে পরিচিত হন। প্রতাপের জন্মকোষ্ঠীর ফলে তাহার 'পিতৃহন্তা' দোষ ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি মাতা ও পিতা উভয়েরই মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তাহার যখন বয়স ৫ দিন মাত্র, তখন সূতিকাগৃহেই তাহার জননীর মৃত্যু হয়। শ্রীহরি পত্নী-বিয়োগে যেমন মর্ম্মব্যথা পাইলেন, পুত্রের পিতৃঘাতী হওয়া নিশ্চিত মানিয়া লইয়া তেমনই আরও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তিনি প্রতাপের প্রতি প্রথম হইতেই আন্তরিক বিরক্ত ছিলেন।

কিন্তু খুল্লতাত জানকীবল্লভের স্নেহগুণে প্রতাপের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। খুড়ামহাশয় স্নেহমমতার মূর্ত্তিমান অবতার। কোষ্ঠীর ফলাফলে তাঁহার আস্থা থাকিলেও, পুরুষকারে তাঁহার আস্থা অধিক ছিল। সুতরাং শ্রীহরি পিতা হইয়া শিশুর প্রতি বিরক্ত হইলেও খুল্লতাত তাহার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল। ইহার আরও একটি কারণ ছিল; প্রতাপের মাতা যখন হঠাৎ দেহত্যাগ করেন, তখন জানকীবল্লভের জ্যেষ্ঠা পত্নী সূতিকাগৃহেই তাহার মাতা হইয়া বসিলেন।[১] তাঁহার কোন সন্তান ছিল না, ভবিষ্যতে হয়ও

১ সম্ভবতঃ ইনি জয়ন্ত ঘোষের কন্যা। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ঘটককারিকা হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখিয়াছি, বসন্ত রায় ঘোষকন্যা, বসুকন্যা এবং দুইটি দত্তকন্যা বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ঘোষদৌ বলিয়া কোন পুত্রের উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত জগদানন্দ ও নারায়ণদাস রায়ের বেলায় তাহারা কাহার দৌহিত্র তাহার উল্লেখ দেখি না। তাহারা দুইজনে ঘোষ দৌহিত্র হইতেও পারেন, কারণ অন্য পুত্রগণের মধ্যে বসুদৌ ও দত্তদৌ এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জগদানন্দের কোন বংশ নাই, তাহা নিশ্চিত, নারায়ণদাসের কোন বংশবৃদ্ধির পরিচয় পাই না। হয়ত তাহারা অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন। না হইলেও তাহাদিগকে ঘোষদৌহিত্র বলিয়া ধরিতে পারি না; কারণ বংশানুক্রমিক প্রবাদানুসারে প্রথমা পত্নীর কোন সন্তান হয় নাই, এইরূপেই জানা আছে; ঘটককারিকায় ঘোষদৌ বলিয়া উল্লেখ নাই, ইহাও সন্দেহের অন্য কারণ।

নাই। সুতরাং তাঁহার অপার মাতৃ-স্নেহ সর্ব্বাংশে প্রতাপেরই প্রাপ্য হইল। অন্য স্ত্রীগণের গর্ভে বসন্ত রায়ের একাদশ পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষের অর্থাৎ বসুকন্যার গর্ভজাত প্রথম সন্তানই সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ, তাহার নাম ছিল গোবিন্দ রায়। তিনি প্রতাপের কনিষ্ঠ হইলেও প্রায় সমবয়স্ক। রাঘব ও চন্দ্রশেখর বা চাঁদ রায় দত্তকন্যার গর্ভজাত।[১] এই রাঘবই পরে 'যশোহরজিৎ' উপাধি পান। ঘটকেরা তাহার নাম বাদ দিয়া সেই উপাধিই বসাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, অন্য স্ত্রীগণের সকলেরই পুত্র সন্তান ছিল, প্রথমা স্ত্রীর কিন্তু একমাত্র স্নেহের ধন প্রতাপ। প্রতাপের যে নিজের জননী নাই, তাহা তিনি জানিতেন না, খুল্লতাত পত্নীর অতুল স্নেহে তাহার সে জ্ঞান ভাসিয়া গিয়াছিল। প্রতাপ সেই মাকে বড় ভক্তি করিতেন, ভয় করিতেন, তাহার সকল ঔদ্ধত্য সে মায়ের স্নেহের কটাক্ষে বিলুপ্ত হইত। প্রতাপের সেই মাতাই তাহার রাজত্ব-কালে 'যশোহরের মহারাণী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রতাপের পাটরাণী কখনও লোকমুখে মহারাণী পদবী পান নাই।

অতি শিশুকালে প্রতাপ অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ ছিলেন। কিন্তু বয়সের সঙ্গে ক্রমে তাহার চঞ্চলতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা যাহা করিতে হয়, তিনি শীঘ্রই তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন। সময়ের প্রথামত তাহাকে সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙ্গালা

সম্ভবতঃ বসন্ত রায় কৃষ্ণদেব রায়ের যে দুইকন্যা বিবাহ করেন, তাহারই একজনের গর্ভে প্রথম দুইপুত্র ও পরজনের গর্ভে যশোহরজিৎ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

১ কণৌজাগত মৌদ্গাল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র নারায়ণ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করেন; তিনি বঙ্গজ কায়স্থ দত্ত বংশের আদি। নারায়ণ হইতে ৭ম পুরুষে কুমী দত্ত মধ্যল্য শ্রেণীভুক্ত হন, তৎপুত্র রবি দত্তের কুলে ৮ম পুরুষে কৃষ্ণ ও গোপী দত্ত মধুমতী তীরবর্ত্তী ইটনা বা ইতনায় বাস করিতেন। বংশাবলী এই: রবি—গোপাল—শূলপাণি—বাণেশ্বর—পুণ্ডরীকাক্ষ—চতুর্ভুজ—জগন্নাথ—কৃষ্ণ রায় দত্ত ও গোপী রায় দত্ত। রাজা বসন্ত রায় কৃষ্ণ রায় দত্তের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং সেই বিবাহের ফলে কৃষ্ণ ও গোপী দুইভ্রাতায় ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া রাঙ্গদিয়া পরগণায় বাস করেন এবং রায় উপাধিধারী হন। বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী সিংহগাতি নিবাসী যদুনাথ রায় এই বংশীয়। গোপী রায়ের পুত্র চাঁদ রায়ের এক ধারা টাকীর নিকটবর্ত্তী শ্রীপুরে বাস করেন। স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত চাঁদ রায় হইতে ৯ম পুরুষ। রবি দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্করের বংশে ১০ম পুরুষে মহেশের এক কন্যা রাজা যশোহরজিৎ বিবাহ করেন।

শিখিতে হইল। তাহার বিদ্যাবত্তার কোন বিশিষ্ট-পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তিনি সংস্কৃত তান্ত্রিক স্তবাদি অতি সুন্দর আবৃত্তি করিতেন, ফারসীতে পত্র লিখিতে ও সুন্দরভাবে কথা কহিতে পারিতেন, নানাবিধ প্রাদেশিক বাঙ্গালায় সকল জাতীয় সৈন্যগণের সহিত কথা কহিতেন, ইহার পরিচয় আছে। গোবিন্দদাসের সহিত তাহার সম্প্রীতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আগ্রা দরবারে সমস্যাপূরণ ও নিজের সভাপণ্ডিতগণের সহিত সদালাপ ও শাস্ত্রচর্চার কথা পরে বলিব। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সব শিক্ষায় তাহার তত মতি ছিল না; তিনি স্বাভাবিক প্রতিভার ফলে শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্র-শিক্ষারই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব ছিল না; পাঠান রাজ্যের ধ্বংসের সময় বহু কর্ম্মক্লান্ত পাঠানবীর যশোহর-রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক ছিলেন বসন্ত রায় স্বয়ং। সেই মসীজীবী কায়স্থ সন্তান বহুদিনের সাধনার ফলে যখন অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সহজে কোন বীর তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না।

প্রতাপ তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন এবং শিষ্যের মর্ম্মও গুরু বুঝিয়াছিলেন। উদীয়মান যুবকের অদম্য উদ্যম ও লোক-পরিচালনার ক্ষমতা দেখিয়া দূরদর্শী বসন্ত রায় প্রতাপের নিকট অনেক আশা করিতেন; এবং অগ্রজের মত তাহার প্রতি সন্দিগ্ধ না হইয়া প্রকৃতই ভ্রাতুষ্পুত্রের মত তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। প্রতাপকে তিনি আশ্রয় দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন এবং আশার আলোক দেখাইতেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে প্রতাপ তাহা বুঝিতেন না; বাহিরে যাহাই হউক, ভিতরে প্রতাপ চিরদিনই খুড়ার কথায় ও কার্য্যে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই খুড়াই তাহার পিতার মত পিতা। ভাগ্যের দোষ শুধু প্রতাপের নহে, সমগ্র বঙ্গের ভাগ্যদোষে, প্রতাপ হঠাৎ তাঁহার হত্যাসাধন করিয়া পিতৃঘাতীর ফল সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপের রাজোচিত বিপুল শরীর ছিল। মল্লযুদ্ধে, তীরসঞ্চালনে, তরবারি তাড়নায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহার ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইলেও তাহার বীরত্বে বাধা দিতেন বলিয়া মনে হয় না। দায়ুদ শাহ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বীরের মত বীর ছিলেন, এজন্য মোগলের পক্ষে তাঁহাকে পরাজিত করা সহজ হয় নাই। বিক্রমাদিত্য ছিলেন সেই দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী।

গৌড়রাজ্যের ধনবল ও জনবল পর্য্যালোচনা করিয়া, পাঠান পক্ষ হইতে স্বাধীনতা ঘোষণার যে মন্ত্র স্থির হইয়াছিল, তাহার অন্যতম উপদেষ্টা এই বিক্রমাদিত্য। লোদী খাঁ বা কতলুখাঁর মত প্রধান প্রধান আমীরগণের সহিত বিক্রমাদিত্যই সমপদবীতে অবস্থিত ছিলেন। মুসলমান ইতিহাসে বসন্ত রায়ের বিশেষ উল্লেখ নাই, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ বহুস্থানে আছে। ইঁহাদেরই কার্য্যকারিতায় গৌড়রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপিত ও রাজকোষ বর্দ্ধিত হয়। বিক্রমাদিত্যই যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবীর প্রতাপাদিত্যের জন্মদাতা। আজকাল যাহারা এই বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যকে নাট্যরঙ্গমঞ্চে আনিয়া রক্তশূন্য ভয়াতুরের চিত্র দেখাইতেছেন, তাহারা বাঙ্গালী হইয়াও সাধ করিয়া লেখনীর মুখ দিয়া বাঙ্গালীব মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিতেছেন।[১]

প্রতাপ সঙ্গীদিগকে লইয়া মৃগয়া করিতেন। সুন্দরবনের প্রান্তেই যশোর-রাজধানী। এখনও লোকে মৃগয়া করে; এখনও সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী স্থানের নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই সামান্য সরঞ্জাম লইয়া শিকার করিতে বাহির হয়। কেমন করিয়া শিকার করে, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি।[২] প্রতাপ রাজার পুত্র, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী; তাহার অস্ত্র সরঞ্জাম, দলবদ্ধ সঙ্গী ও লোকলস্করের অভাব ছিল না। প্রতাপও মৃগয়া করিতেন, ব্যাঘ্র গণ্ডার মারিতেন,[৩] জীবজন্তু মারিতেন, কুমীর শূকর গুলিবিদ্ধ করিতেন, হরিণ শিকার

১ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য দ্বারা যে এক হাস্যাস্পদ চরিত্রাভিনয় করাইয়াছেন, তাহা বড়ই অপ্রীতিকর। প্রবীণ বিক্রমাদিত্যের সে দুর্দ্দশা দেখিলে শীতরক্ত বাঙ্গালীর মুখে বিরক্তির রক্তিমা প্রতিভাত না হইয়া পারিবে না। প্রতাপাদিত্যের মুল্লুক পর্য্যন্ত যাহারা জানেন না, কখনও দেখেন নাই, তাহারাই যদি সহরের ত্রিতলে বসিয়া নাট্যমঞ্চের তাগাদায় পড়িয়া স্বদেশীয় বীরের এরূপ অস্বাভাবিক অবমাননা করেন, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। কবির পথ কি এতই নিরঙ্কুশ! বাঙ্গালী আজকাল এতই গল্পরসিক যে তাহার নিকট হইতে সস্তায় বাহাবা লইতে কোনও প্রকার চেষ্টা, অনুসন্ধান বা ঐতিহাসিক সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয় না!

২ বর্ত্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ৩য় সং ১১৮ পৃ।

৩ সুন্দরবনে যথেষ্ট গণ্ডার ছিল, এখন বোধহয় আর নাই। গণ্ডারের সংবাদ প্রথম খণ্ডে (১০০ পৃ) দিয়াছি। গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল প্রস্তুত হইত, সে জন্যও গণ্ডার শিকারের প্রয়োজন ছিল। প্রতাপের রাজধানীতে এখনও মৃত্তিকার নিম্নে গণ্ডারের অস্থি পাওয়া যায়; সম্প্রতি আমিও গণ্ডারের অস্থি সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

করিয়া স্তূপীকৃত করিতেন, আর মারিতেন অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য পাখী। উড্ডীয়মান পক্ষীও তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত না। উড্ডীয়মান পক্ষী শিকারে লক্ষ্যের উত্তম পরীক্ষা হয়; এজন্য এখনও শিকারি মাত্রই এই শিকারে আমোদ পায়। প্রতাপ ইহাতে অপূর্ব্ব আমোদ পাইতেন। একদিন তৎকর্ত্তৃক শরবিদ্ধ এক পাখী ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পড়িল। পক্ষীর তীব্র যাতনা ও অনর্থক হত্যা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল; বিশেষতঃ শিকারের ক্ষেত্র বনে জঙ্গলে অন্যত্র আছে, রাজপুরীর মধ্যে নিরীহ পক্ষীর হত্যায় শিকারের পৌরুষ অপেক্ষা নির্দ্দয়তারই অধিক পরিচয় পায়। প্রতাপের ঔদ্ধত্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোষ্ঠীর ফল মনে পড়িল। তিনি প্রতাপের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এইরূপ ভাবে দিনে দিনে প্রতাপেব এমন কত অত্যাচারের কথা বৃদ্ধ রাজার কর্ণগত হইত। ক্রমে তাঁহার বিরক্তির মাত্রা এত বাড়িল যে, শুনা যায়, তিনি পুত্রের বিনাশের কল্পনা করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেন।

সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর নামে প্রতাপের দুইজন ভক্ত অনুচর জুটিয়াছিল। বঙ্গজ গুহ বংশীয় সূর্য্যকান্ত পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসেন এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান বারাসাত হইতে আসেন। তিনজনে প্রাণে প্রাণে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের বীরত্ব, উদারতা ও অসমসাহসিকতার কথা সমগ্র যশোরে বিস্তৃত হইল। রাজপুরীর কক্ষে, যমুনার উন্মুক্ততীরে ও সুন্দর-বনের অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া যখন তখন তিনজনে যে বিরাট কল্পনা আঁটিতেন, তাহারই ফলে উত্তরকালে আগ্রার সিংহাসন পর্য্যন্ত টলিয়াছিল। প্রতাপ কখনও বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গ ছাড়া হইতেন না। তিনি যে-কোন অত্যাচারের নায়ক হইতেন, তাহার সঙ্গী থাকিতেন এই দুইজন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রতাপকে লইয়া বড় বিপদে পড়িলেন। অবশেষে উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলেন যে, বিবাহ দিলে প্রতাপের মতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং তাহা হইলে সঙ্গীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কালক্ষেপ করিবে না। এজন্য তাঁহারা উভয়ে উদ্যোগী হইয়া প্রতাপের বিবাহ দিলেন। ঘটককারিকায় প্রতাপের তিন বিবাহের উল্লেখ আছে। সর্ব্ব প্রথমে পরমকুলীন জগদানন্দ রায়ের (বসু) কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়, হয়তঃ এ বিবাহ বাল্যকালেই হইয়াছিল। ঘটককারিকায় এ বিবাহের কোন সন্তানাদির উল্লেখ নাই।

সম্ভবতঃ, এ স্ত্রী অকালে পরলোকগত হন। তৎপরে সম্মানিত মধ্যল্য জিতামিত্র নাগের কন্যা শরৎকুমারীর সহিত মহাসমারোহে প্রতাপের বিবাহ (১৫৭৮) হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শরৎকুমারীই তাহার পাটরাণী বা প্রধানা মহিষী ছিলেন। জিতামিত্র নাগ রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে গৌড়ে ছিলেন। তিনি বসন্ত রায়ের সহিত সম্পর্কিত ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। বিদ্যাগৌরবে তিনি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন; ঘটককারিকা হইতেই আমরা জানিতে পারি, তাহার অন্য উপাধি ছিল কবিশ্চন্দ্র। বসন্ত রায় তাহাকে সমাদরে আহ্বান করিয়া রাজধানীর পার্শ্বে বসতি করাইয়া ছিলেন। এখনও সে স্থানকে 'নাগবাড়ী' বলে।[১] সম্ভবতঃ, গোপাল ঘোষের কন্যার সহিত প্রতাপের বিবাহ তিনি রাজা হইবার অনেক পরে হইয়াছিল।

বিবাহ হইল; তিনি নাগকন্যা শরৎকুমারীকে পরম গুণবতী প্রণয়িনীরূপে পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া মনে হয় না। সে ঔদ্ধত্য, সেই বনে জঙ্গলে মৃগয়াভিযান, সেই পথে প্রান্তরে কৃত্রিম সমরাভিনয়—সেই একইভাবে চলিতে লাগিল। তখন বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় পুনর্ব্বার পরামর্শ করিলেন; এবার স্থির হইল, রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য প্রতাপকে কিছুকালের জন্য রাজধানী আগ্রায় প্রেরণ করিতে হইবে। বসন্ত রায় এ প্রস্তাবে প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে দূরদর্শী বিক্রমাদিত্যের ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। বিচার করিয়া দেখা হইল যে, বিক্রমাদিত্য মোগলের সামন্ত রাজা; রাজধানীতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যশোর-রাজ্যের সনন্দ প্রাপ্তির পর হইতে নিয়মমত রাজস্ব পাঠাইতেছেন বটে, কিন্তু তিনি বা বসন্ত রায় একবারও বাদশাহ দরবারে সাক্ষাৎ করেন নাই। আঁকমহলের যুদ্ধের পর যখন টোডরমল্ল আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন বসন্ত রায়কে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন। বসন্ত রায় শীঘ্র যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াও এ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই। এখন বিক্রমাদিত্যের শরীর তত সুস্থ নহে; রাজকার্য্যের অধিকাংশই বসন্ত রায়কে নির্ব্বাহ করিতে হয়। এ অবস্থায় তাঁহার নিজের আগ্রায় যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ তিনি এখনও পাঠানের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া নিজে যাইতেও ইচ্ছা করেন না।

১ গোপালপুরের উত্তরাংশে 'নাগবাড়ী' গ্রাম এখনও আছে।

এমত অবস্থায় প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রতাপকে রাজধানীতে প্রেরণ করিতে পারিলে সব দিক রক্ষা হয়। বিশেষতঃ, বিশাল মোগল রাজধানীর যুদ্ধসজ্জা ও সৈন্যবাহিনী দেখিলে এবং বাদশাহ-দরবারের ব্যবহার পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলে, প্রতাপের অনেক শিক্ষালাভ হইবে; সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের উপকণ্ঠে যে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব ও অনর্থক ঔদ্ধত্য জাগিতেছিল, তাহাও প্রশমিত হইয়া যাইবে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতাপের আগ্রা-গমন স্থিরীকৃত হইল। যে প্রতিভা ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আদর্শের অভাবে মলিন হইতেছিল, বিশাল রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে তাহারই প্রকাশলাভের পথ খুলিল। প্রতাপ তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্থির করিয়া বসিলেন যে, তাহাকে আগ্রা প্রেরণের মূল কারণ বসন্ত রায়। কিন্তু খুড়া মহাশয়ের স্নেহের গুণে প্রকাশ্য ভাবে সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না। তিনি সুযোগ্য পুত্রের মত রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। উপযুক্ত যানবাহন, সঙ্গী, সরঞ্জাম ও উপঢৌকন দ্রব্যাদি লইয়া প্রতাপ শীঘ্রই আগ্রা যাত্রা করিলেন। সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর তাহার সঙ্গেই গিয়াছিলেন।

ত্র য়ো দ শ প রি চ্ছে দ

আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র

দায়ুদের পতনের পর টোডরমল্ল আগ্রায় প্রত্যাগত হইয়া সম্মানিত হন (১৫৭৬)। কিন্তু তখনই গুজরাটে শাসন-বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তিনি শাসনকর্ত্তা হইয়া সেখানে প্রেরিত হন। বৎসরান্তে তিনি বিদ্রোহাদি দমন করিয়া পুনরায় আগ্রায় আসেন; তখন বাদশাহ তাঁহাকে উজীরের পদে উন্নীত করিয়া রাজা উপাধি দেন (১৫৭৮)। ইহারই কিছুদিন পরে বসন্ত রায়ের পত্র লইয়া প্রতাপাদিত্য আগ্রার দরবারে উপনীত হন। সে দরবারে টোডরমল্লের বিপুল সম্মান; প্রতাপ পত্র লইয়া তাঁহারই নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রতাপকে সুযোগমত বাদশাহের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ১৫৭৫ হইতে বাদশাহ আকবর অধিকাংশ সময় তাঁহার নূতন রাজধানী ফতেপুর-শিকরীতেই কাটাইতেন, এবং যে সময় প্রতাপাদিত্য গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই স্থানেই ছিলেন। ১৫৭৮ অব্দে পাঞ্জাব হইতে শিকরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর বাদশাহ নূতন ধর্ম্মমতস্থাপনের উদ্দেশ্যে অবিরত অগ্ন্যুপাসক, খৃষ্টান ও জৈন প্রভৃতি বহু ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত বাদবিতর্ক করিয়া দিনপাত করিতেন। সম্ভবতঃ আগ্রা হইতে টোডরমল্লের সহিত শিকরীতে গিয়া প্রতাপাদিত্য বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

বসন্ত রায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ যখন তাঁহার পত্র লইয়া প্রতাপ রাজা টোডর-মল্লের সহিত দেখা করিলেন, তখন সুলিখিত পত্রের বিনীত ভাষা অপেক্ষা পত্র বাহক যুবরাজের তেজোদীপ্ত মূর্ত্তিই তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনিও প্রতাপের কথা খুব ভাল ভাবেই আকবরকে জানাইলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যশোর-রাজ্যের সনন্দ দিবার সময় বাদশাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কথা শুনিয়াছিলেন; আজ তিনি সেই সামন্তরাজের পুত্রকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিলেন। মানসিংহ বা টোডরমল্লের বীরত্ব খ্যাতিতে যিনি মুগ্ধ, সেই উদার নৃপতি আজ উদীয়মান বঙ্গীয় যুবরাজের বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তির অনাদর করেন নাই, বরং অতিরিক্ত সমাদরই করিয়াছিলেন।[১]

১ প্রবাদ আছে, একদা সুরসিক বাদশাহ আকবর সমবেত কবি ও রাজন্যবর্গের পূরণ করিবার জন্য সভায় একটি সমস্যা উপস্থিত করেন, সেটি এই—'শ্বেত ভুজঙ্গিনী যাঁত চলি হেঁ।' যখন কেহই

প্রতাপাদিত্য যখন আগ্রাতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন মিবারপতি প্রতাপসিংহের অদ্ভুত প্রতাপ ও বীরত্ব কাহিনী রাজধানীর ঘরে ঘরে গীত হইতে ছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলের নিকট হল্‌দিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ পার্ব্বত্য বন্দরে, বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য-রাজধানী, আত্মীয়বন্ধু, ধনজন, এমন কি আশ্রয়স্থান পর্য্যন্ত নাই; তিনি পুত্র পরিবার, সৈন্যসামন্ত ও প্রজাবর্গ লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে, কত দুঃখকষ্টে, অনাহারে অনিদ্রায় কালযাপন করিতে ছিলেন, কিন্তু মোগলের করে স্বাধীনতাধন বিসর্জ্জন দেন নাই; মোগলের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বংশ-গৌরব বিনষ্ট করেন নাই; সামান্যভাবে একটু অবনতি স্বীকার

সন্তোষজনক ভাবে সে সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না, তখন প্রতাপাদিত্য উঠিয়া সে সমস্যা নিম্নলিখিতভাবে পূরণ করেন :

'শো বর কামিনী নীর নাহারতি রিত (রীত) ভালি হেঁ।
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছ চল্ল চলি হেঁ॥
রায় বেচারি আপন মনমে উপমা ও চারি হেঁ।
কে ছঙ্গ মরোরতি সেত (শ্বেত) ভুজঙ্গিনী, জাত চলি হেঁ॥'

—রামরাম বসু, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র,' মূল গ্রন্থ ২৬ পৃ

অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠরমণী জলে স্নান করিতে ছিলেন, এ রীতি ভাল। পরে পুষ্করিণীর ঘাটের উপর বস্ত্র নিঙ্গড়াইয়া উহার ধারে ধারে চলিয়া যাইতে ছিলেন। তাহা দেখিয়া রায় বেচারা আপন মনে এই উপমা স্থির করিলেন যেন মূর্ত্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলিয়া যাইতেছিলেন।

—নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৯৬-৭ পৃ

'বিশ্বকোষে' (১২শ খণ্ড, ২৬৩ পৃ) 'চির মচরকে' স্থলে 'চির আঁচারকে,' 'গচপর' স্থলে 'গঠ পর' ও 'কে ছঙ্গ মবোরতি' স্থলে 'কৈছন মরাবতী' আছে। 'চির আঁচরকে' অর্থে বস্ত্রাঞ্চল বুঝায়, 'চির মচরকে' থাকিলে : চির=বস্ত্র, মচরকে=নিঙ্গড়াইয়া, গচপর ও গঠপর উভয়েরই একই অর্থ : ঘাটপর বা ঘাটের উপর; বাবিকে=বাপীকে=পুষ্করিণীর।

এই সমস্যা পূরণের গল্প কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ, 'রাজনামা' প্রভৃতি যে পারসী গ্রন্থানুসারে বসু মহাশয় নিজ পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতেই এই সমস্যা পূরণের গল্প থাকিতে পাবে। 'বহারিস্তানে' এ গল্প আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই।

বসু মহাশয় বলেন, এই সমস্যাপূরণ হইতে প্রতাপের পরিচয় হয়; তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; তবে সমস্যাপূরণের সময় হইতে তিনি বাদশাহের সুনজরে পড়েন, এটুকু সত্য হইতে পারে। বসু মহাশয়ের গ্রন্থে আছে, 'ইহাতে বাদশাহের অনুমতিতে উজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।'—'প্রতাপাদিত্য', মূল ২৬ পৃ।

করিয়াও মোগলের পায়ে আত্মাহুতি প্রদান করেন নাই। আরাবল্লীর গিরিকন্দর হইতে যখন প্রত্যহ সেই স্বদেশ প্রেমিক রাজর্ষি প্রতাপের অপার স্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রবাদ-বাক্যের মত রাজদ্বারে ধ্বনিত হইতেছিল, তখন বঙ্গীয় যুবরাজের মানস-নয়নে স্বদেশ-সেবার এক অতি সজীব আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিল। একথা কোন প্রামাণিক ইতিহাসে না থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহা সত্য না হইয়াও পারে না। যখন প্রতাপাদিত্য রাজধানীতে ছিলেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলনা, যে প্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের কথা ত স্বতন্ত্র; তাহার ছিল যোদ্ধজীবন, অদম্য আশা ও রাজ্য-পিপাসা; সম্মুখে নিজেরই নামধারী রাজপুতবীরের অলৌকিক আদর্শ; উভয়েরই স্বাধীনতার শত্রু মোগল, প্রতাপাদিত্যের যে স্বাধীন হইবার বাসনা নূতন করিয়া জাগিবে, সে কিছু বিচিত্র কথা নহে।

বিকানীরের রাজকুমার কবিবর পৃথ্বীরাজ সম্রাট আকবরের সভাসদ ছিলেন। তিনি প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্রতাপসিংহের বীরত্ব পৃথ্বীর হৃদয় উদ্বেলিত করিত। এক সময়ে মিবারেশ্বরের কঠোর প্রতিজ্ঞা দৈব কারণে মন্দীভূত হইবার উপক্রম হইলে, কিরূপে পৃথ্বীরাজের কবিত্বপূর্ণ পত্রে তাঁহাকে পুনরুদ্দীপিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।[১] রাজধানীতে পৃথ্বীরাজের খ্যাতি সর্বত্র; বাদশাহ দরবারে পরিচিত হওয়ার পর প্রতাপও পৃথ্বীর সহিত পরিচিত হন। পৃথ্বীরাজের বাক্যে প্রতাপ-সিংহের প্রতি তাহার হৃদয় আরও আকৃষ্ট হয়। আগ্রা হইতে প্রতাপ নিজ সঙ্গী সূর্য্যকান্ত ও শঙ্করকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন; সম্ভবতঃ তিনি যখন নূতন রাজধানী শিকরীতে গিয়াছেন, তখন তথা হইতে আজমীর ও চিতোর যান; মিবারের রাজধানী চিতোর তখন মোগল কবলিত; সেখানে প্রতাপাদিত্য সহজে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। চিতোরই তাহার নিকট প্রধান তীর্থক্ষেত্র হইল। তিনি চিতোর দুর্গের সংস্থান ও নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া আসিয়াছিলেন। দেশে বিদেশে রাজপুতের সেই বীরত্ব-খ্যাতি, শত্রুমিত্র মোগল-পাঠান সকলের নিকট সেই স্বদেশপ্রেমিক বীরজাতির চরিত্রের

১ সতীশচন্দ্র মিত্র, 'প্রতাপসিংহ', ৩য় সংস্করণ, ১৪৬ পৃ।

প্রতিপত্তি, আর সর্ব্বোপরি প্রতাপসিংহের কঠোর প্রতিজ্ঞার জীবন্ত দৃষ্টান্ত যুবরাজ প্রতাপাদিত্যকে একেবারে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। খোসরোজের দিন হিন্দু রমণীর প্রতি আকবরের অত্যাচার কাহিনী, এবং সামন্ত রাজগণের নিকট হইতে কন্যা আনিয়া বিবাহ করিবার প্রথা নানা বর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া মোগল বাদশাহের প্রতি স্বজাতিভক্ত হিন্দুর একটা তীব্র ঘৃণা জন্মাইয়া দিতেছিল।[১]

প্রতাপ তীর্থভ্রমণ করিয়া রাজধানীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, একবার কোনরূপে স্বদেশে গিয়া রাজতক্তে বসিতে পারিলে, যতশীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া মোগলের কবল হইতে স্বাধীনতা গ্রহণ করিবেন। মহাপ্রাজ্ঞ বসন্ত রায়ের নিকটও যে মোগলের অধীনতা কিছু প্রিয় পদার্থ ছিল, তাহা নহে। তবে তিনি মোগলের শক্তি বুঝিতেন, এজন্য অনর্থক চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ যে বয়সে লোকে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চায়, পরিণাম চিন্তা না করিয়া দুস্তর সাগরে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না, বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সে বয়স আর ছিল না। আবার প্রতাপ মিবারের যে জ্বলন্ত আদর্শ দেখিলেন, মোগল সরকারের যে রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেন, শত্রুপক্ষের যে সব অভাব ও দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইলেন, যশোহরে রাজভ্রাতৃদ্বয় তাহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং প্রতাপ দেখিলেন, তাঁহাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আত্মমতে আনয়ন করা যাইবে না। অথচ রাজতক্তে বসিয়া রাজবল করায়ত্ত করিতে না পারিলে, স্বাধীনতা ঘোষণার উপযোগী কোন আয়োজনই করা যায় না। যৌবনের চাঞ্চল্যে বিলম্ব সহ্য করা যায় না; এজন্য প্রতাপ বন্ধুগণের পরামর্শে এক কৌশলের অবতারণা করিলেন। কিন্তু টোডরমল্ল তখন আগ্রায় থাকিলে, কোনও কৌশল খাটিত না।

১ বাদশাহ আকবর বাস্তবিকই উচ্চবংশীয় সামন্তরাজগণের পরিবার হইতে এক একটি কন্যা লইয়া নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন অথবা নিজ বংশীয় কাহারও সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপ চতুর শাসন নীতিবলে তিনি বহু রাজপুত বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদের বংশ ও চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে গৃহীত কন্যাকে সাধারণতঃ ডোলার কন্যা বলিত। উত্তরকালে প্রতাপাদিত্যও এইরূপ এক ডোলার কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া রামরাম বসু মহাশয় যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে।—রামরাম বসুর মূল গ্রন্থ, ১২৬ পৃ; নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য', মূল ১১৪-৫ পৃ। স্থানান্তরে এ বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে।

১৫৮০ অব্দের প্রারম্ভে বঙ্গ বিহারে জায়গীরদারদিগের ভীষণ বিদ্রোহ হয়।[১] তখন রাজা টোডরমল্ল সে বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া দুই বৎসরকাল অতি সুন্দরভাবে শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রতাপাদিত্য ১৫৭৮ অব্দের শেষভাগে আগ্রায় গিয়া দুই তিন বৎসরকাল সেখানে ছিলেন। টোডরমল্লের অনুপস্থিতিকালে প্রতাপাদিত্য এক কৌশল অবলম্বন করিয়া যশোর-রাজ্য নিজহস্তে লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজধানীতে থাকার সময় বসন্ত রায় বাদশাহের রাজস্ব প্রতাপের নিকটই পাঠাইতেন। প্রতাপ দুই তিন বারের প্রেরিত টাকা সরকারে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিলেন এবং সুযোগমত বাদশাহকে জানাইলেন যে, যশোরের ভূঞাগণ রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতেছেন না। বঙ্গীয় বিদ্রোহের পর এ সংবাদ বড় শুভসূচক বোধ হইল না। অপর পক্ষে প্রতাপ প্রকাশ করিলেন যে বাদশাহ যদি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে যশোরের সামন্তরাজ করিয়া সনন্দ দেন, তাহা হইলে তিনি রীতিমতভাবে বাকী রাজকর পরিশোধ করিয়া দিয়া চিরদিন মোগলের ছন্দানুগত রহিবেন।

গুণগ্রাহী সম্রাট প্রতাপের প্রতি সুদৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতাপের কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার মত একজন উদীয়মান বীরযুবকের নামে যশোর-রাজ্যের দ্বিতীয় সনন্দ লিখিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত খেলাত, যানবাহন ও সৈন্য-সামন্ত দিয়া অনুগৃহীত রাজকুমারকে স্বদেশে পাঠাইলেন। প্রতাপ সঞ্চিত অর্থ

১ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময়কার বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মুজঃফর খাঁর কঠোরতার জন্য জায়গীরদারগণ বিদ্রোহী হন। এই ভাবে তিনি যাহাদিগকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাঁকশাল জাতি প্রধান। এই তেজস্বী জাতি বহু বৎসর যাবত প্রাণ দিয়া মোগল সিংহাসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া তাহারা বহু জায়গীর পাইয়াছিলেন। মুজঃফর ভুলক্রমে তাহাদের কয়েকজনকে অপমানিত করিয়া বঙ্গে বিদ্রোহ প্রজ্জলিত করেন। কাঁকশালগণ অনেকে বিদ্রোহের মন্ত্রণা স্থির করিতে এবং বিতাড়িত পাঠানের সহিত সহযোগিতা করিতে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য যশোরে আসিয়াছিলেন। রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্বকোণে যমুনার পূর্ব্ব পারে বসন্ত রায় তাহাদের জন্য আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ঐ স্থানকে কাঁকশিয়াল বলিত। কাক ও শিয়ালের সহিত এ নামের সম্বন্ধ নাই। ইংরাজ আমলে ঐ স্থানের মধ্যদিয়া কালীগঞ্জ হইতে পূর্ব্বমুখে যে খাল খনিত হয়, তাহাকে কাঁকশিয়ালীর খাল বলে, উহা এক্ষণে নদীর মত প্রশস্ত, এবং কলিকাতা হইতে পূর্ব্বগামী নৌকাসমূহের জলপথ হইয়াছে। ইংরাজিতে উহাকে

হইতে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সময়েও টোডরমল্ল বঙ্গদেশে ছিলেন ; তখনকার সময়ে সম্রাট কখনও কোনভাবে প্রধান কর্ম্মচারী-দিগের মতাপেক্ষা করিতেন না। এজন্য তিনি বা বসন্ত রায় এ ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্য যথাসময়ে যশোরে পৌছিলেন এবং অকস্মাৎ সেই বাদশাহী লস্কর সহ অসন্দিগ্ধ যশোহর-দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন (১৫৮২)। এই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পিতৃদ্রোহিতার প্রথম উন্মেষ।

এক্ষণে Coxeali বলে (Khulna Gazetteer p. 9)। কাঁকশালদিগের বিরক্তির কারণ জানিয়া, আকবর তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য মুজঃফরকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তখন কাঁকশালদিগের সহিত যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল এবং মুজঃফরও শান্তি সংস্থাপনে নিপুণ ছিলেন না। বাবা খাঁ কাঁকশাল বিহার হইতে আগত মাশুম খাঁ কাবুলীর সহিত একযোগে এমন বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন যে, তাহাদের হস্ত হইতে বঙ্গ রক্ষা করা দায় হইয়া পড়িল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন: 'The throne of Akbar was at no period so shaken as by the rebellion here described.'—Stewart, *History of Bengal*, p. 191. কালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কাঁকশিয়ালীর খালকে Goodlad creek বলিত, কারণ উহা Goodlad সাহেবের ব্যবস্থায় খনিত হয়।



রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়



রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার



জটার দেউল



সলীমের মসজিদ

চ তু র্দ্দ শ প রি চ্ছে দ

প্রতাপের রাজ্যলাভ

এদিকে রাজকুমারের প্রত্যাবর্ত্তনে যশোহর পুরী উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত আশীর্মাল্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। যশোহরের মহারাণী যশস্বী পুত্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিন্তু যখন রাজকুমারের বিদ্রোহ-সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন সকলেই যেমন বিস্মিত, তেমনই ক্ষুণ্ণ হইলেন। সকলেই আশঙ্কা করিল, প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল বুঝি এইবার ফলিয়া যায়। সকলেই বিচলিত হইল—বিচলিত হইলেন না শুধু রাজা বসন্ত রায়। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রতাপের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তিনি অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন ; অসন্তুষ্টি বা সন্দেহের রেখামাত্র কোথায়ও প্রকাশ না পায়, সর্ব্বাগ্রে তাহা করিলেন ; পরে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সাহসে ভর করিয়া প্রতাপের শিবিরে গিয়া সকল গণ্ড-গোলের মীমাংসা করিয়া আসিলেন। প্রতাপকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার কার্য্যে তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই, বরং সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কারণ তাঁহাদের জরাজীর্ণ দেহে রাজত্ব করিবার বয়স আর নাই। প্রতাপ বাদশাহী সনন্দ আনিয়াছেন, সে ভাল হইয়াছে ; বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর পুনরায় আর আনিতে হইবে না ; সনন্দ না আনিলেও তিনি অচিরে যুবরাজ পদে বরিত হইতেন। বাদশাহ যে তাঁহার প্রতি অনুকম্পা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য পৌরজন সকলে ধন্য হইয়াছে। প্রতাপও দেখিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে অল্পদিনে বিক্রমাদিত্যের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; সুন্দরবনের নূতন আবহাওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য যেন আর রক্ষিত হইবে না। অন্য দিকে বসন্ত রায় তাঁহার কথাগুলি এমন প্রাণের সঙ্গে বলিলেন, যে তাঁহার ভাষা হইতে যেন স্নেহ উছলিয়া পড়িতেছিল। সে স্নেহের স্রোতে বিদ্রোহের বহ্নি ভাসিয়া গেল ; প্রতাপের ব্যাঘ্রমূর্ত্তি শান্ত হইল।

তখন প্রতাপ হাসিমুখে আবার রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন ; অমনি সর্ব্বত্র আনন্দ স্রোত বহিল। প্রতাপ যেখানে যান, সেখানেই সমাদর অভ্যর্থনা ; তিনি দেখিলেন, তাঁহার সকল কল্পনা বিফল হইয়াছে। নগরের আনন্দ-কোলাহল, তোরণের দুন্দুভিরব ও অন্তঃপুরের হুলুধ্বনির মধ্যে সকল গর্ব্ব বিসর্জ্জন

দিয়া দৃপ্ত যুবককে পুনরায় রাজকুমার সাজিতে হইল। তখন বসন্ত রায় উদ্যোগী হইয়া বহুকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে দিলেন; বৃদ্ধ নৃপতি নামে মাত্র রাজা থাকিয়া অনেক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রতাপ যাহা করিতেন, কেহই বাধা দিত না। প্রতিভার পথে কেই বা অন্তরায় হইতে পারে?

বসন্ত রায়ের পুত্রগণের মধ্যে সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসগুহ বা জগদানন্দ রায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঘটকদিগের কারিকায় তাঁহার পুত্রগণের নামের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই। বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের পৃথক্ তালিকা দিতে গিয়াও এরূপ হইয়াছে। সুতরাং পুত্রগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট জানা যায় না। জগদানন্দের বংশ নাই; সম্ভবতঃ তাঁহার অকাল মৃত্যু হইয়াছিল। অপর ১০টি পুত্রের মধ্যে আমরা মাত্র চারিজনের বিশেষ সংবাদ পাই; এবং তাঁহাদের দুইজনের বংশ এখনও আছে। উঁহাদের নাম—গোবিন্দ, রাঘব, চন্দ্র বা চাঁদরায় ও রমাকান্ত। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ এবং রাঘব মধ্যম। প্রতাপ ও গোবিন্দ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, গোবিন্দ কিছু ছোট। রাঘব তৎকনিষ্ঠ; এই রাঘবেরই অন্য নাম কচু রায়। বসন্ত রায়ের হত্যার সময় রাঘব কচু বনে লুকাইতে পারেন, কিন্তু তখন তিনি শিশু ছিলেন না, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক।[১] ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মানসিংহ আসিয়া কচু রায়কে রাজা করিয়া যান। যাহা হউক, সে কথার বিশেষ আলোচনা পরে করিব। এখন গোবিন্দ রায়ের কথা বলিতেছি; তাঁহার সহিত প্রতাপের সদ্ভাব ছিল না, বরং জ্ঞাতি-বিরোধই ছিল। চাঁদ রায়কে প্রতাপ ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু গোবিন্দের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। গোবিন্দ অতিরিক্ত ঈর্ষাপরবশ এবং অল্পবুদ্ধি ছিলেন। প্রতাপ ও তাঁহার সঙ্গিগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ ও কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন। গোবিন্দ রায় অবিরত প্রতাপের বিরুদ্ধে নানা কথা মাতার নিকট জানাইতেন এবং পরে তাঁহার ঈর্ষা-প্রণোদিত বর্ণনায় উহা বসন্ত রায়ের কর্ণগোচর হইত। তিনি শুনিতেন, বুঝিতেন, কিন্তু সহজে বিচলিত

১ বিপদে পড়িলে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকেরও কচু বনে পলায়ন করা অসম্ভব নহে। মানসিংহের সহিত যুদ্ধকালে রাঘবের বয়স ২৫ বৎসর ধরিলে প্রতাপের আগ্রা হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহার বয়স ৪।৫ বৎসর। তখন কোনদিন প্রতাপের ঔদ্ধত্য জন্য রাঘবকে লুকাইয়া রাখা বিচিত্র নহে। 'বঙ্গাধিপপরাজয়ে' এইরূপ কথাই আছে। সে পুস্তকও প্রবাদের ভিত্তিতে লিখিত। তবে তাহাতে অনেক অত্যদ্ভুত ঘটনা আছে।—৫৯৪ পৃ।

হইতেন না। হয়তঃ নির্ব্বোধ পরিবারবর্গকে তিনি কোন কথা বলিলে, তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া প্রতাপের কর্ণে পৌছিত। প্রতাপ একে খুল্লতাতের প্রতি সন্দিগ্ধ, তাহাতে পরের মুখে নানা কথা শুনিয়া উদ্রিক্ত হইয়া পড়িতেন। বসন্ত রায় প্রতাপের ঔদ্ধত্যে মনে মনে যে বিরক্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে তিনি বয়সে প্রবীণ এবং উদার-হৃদয়; সুতরাং সব দিকে সামঞ্জস্য করিয়া হৃদয়ের গুণে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া চলিতেন।

কিন্তু অসদ্ভাব ক্রমেই একটু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ইহা আর কেহ না বুঝেন, বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্য বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, উভয় পরিবারের সদ্ভাব কখনও থাকিবে না। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া উহার ॥৵০ দশআনা অংশ প্রতাপকে এবং ।৵০ ছয়আনা অংশ কনিষ্ঠভ্রাতা বসন্ত রায়কে দিলেন। ভ্রাতৃভক্ত বসন্ত রায় ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। রাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্য হইলেও, উহার সংস্থাপক ও ব্যবস্থাপক তিনিই ছিলেন; তাঁহার পক্ষে তুল্যাংশ দাবি করা অসঙ্গত হইত না এবং সেরূপ দাবি করিবার জন্য তিনি পুত্রদিগের দ্বারা বিশেষভাবে প্ররোচিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে পাছে প্রতাপের বিরক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির সৃষ্টি হয়, এজন্য তিনি জ্যেষ্ঠের কথায় সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। তখন বিক্রমাদিত্য রাজ্যটিকে চিহ্নিত মত ভাগ করিয়া দিলেন। কালিন্দী হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত পশ্চিমাংশ পাইলেন বসন্ত রায়; উহা এক্ষণে সম্পূর্ণ ভাবে ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত; আর কালিন্দী হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব্বরাজ্য পড়িল প্রতাপের অংশে; উহা এখন সম্পূর্ণ খুল্‌না জেলার অন্তর্গত; আপাততঃ উভয় রাজ্যাংশের রাজধানী যশোহরেই রহিল। সমগ্র রাজ্যের পরিরক্ষণ জন্য আবশ্যকমত উপযুক্ত স্থানে নির্ব্বিবাদে সৈন্য রক্ষা ও দুর্গনির্ম্মাণ করা যাইবে, ইহাই স্থির হইল।

প্রতাপ একস্থানে উভয় অংশের রাজধানী রাখিতেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এ সময়ে যশোহর নগরের অনেক দূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত সুন্দরবন পরিষ্কৃত হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে যেখানে যমুনা পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বমুখে ইচ্ছামতী বা কদমতলী শাখা এবং পশ্চিম দিকে যমুনা প্রবাহিত হইতেছিল, সেই স্থান পর্য্যন্ত প্রায় ৮।১০ মাইল স্থান পরিষ্কৃত হইয়া-

ছিল।[১] সেই স্থানে যমুনা ও ইচ্ছামতীর দক্ষিণ পারে ভীষণ জঙ্গল ছিল। প্রতাপাদিত্য ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি যমুনা গর্ভ হইতে উত্থিত আগ্রা দুর্গ এবং গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে ইল্লাহাবাদ দুর্গ দেখিয়া আসিয়াছেন। এইবার তিনি তদনুকরণে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাটে নূতন দুর্গ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। বর্ত্তমান মুকুন্দপুরে যে যশোহর নগরীর প্রথম দুর্গ স্থাপিত হয়, তাহাতে উত্তর দিক হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া, সেই দিকেই বাধা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দক্ষিণ দিক হইতেও শত্রুর আগমন অসম্ভব ছিল না। আরাকাণ ও সন্দ্বীপ হইতে মগেরা পররাষ্ট্রজয় ও দেশ লুণ্ঠনে অসাধারণ শক্তিশালিতার পরিচয় দিতেছিল, পর্টু‌গীজ ফিরিঙ্গিরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দস্যুবৃত্তি করিতেছিল। সুতরাং চতুর্দ্দিক হইতে দুরধিগম্য ও দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রয়োজন। প্রতাপ এবার তাহারই আয়োজন করিলেন। বসন্ত রায় তাঁহার প্রস্তাব প্রতিভাসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন এবং তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া, নূতন রাজধানীর পত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা ছিল, প্রতাপ তাহার সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

ধূমঘাটে রাজধানী নির্ম্মিত হইতে থাকিল। বসন্ত রায় স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিক্রমাদিত্য রোগাক্রান্ত হইয়া হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন (১৫৮৩)। মহাসমারোহে যশোহর রাজধানীতে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাহিত হইল। এই শ্রাদ্ধকালে যশোহর ও বাক্‌লা উভয় স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া রাজোপচারে অভ্যর্থিত হইলেন। এই সময়ে ডামরেলীর সমাজমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া উহাতে ইষ্টকলিপি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই স্থানেই পণ্ডিতবর্গ ও সামাজিকগণের সমাগম ও সম্বর্দ্ধনা হইল। এই শ্রাদ্ধকার্য্যে রাজবংশের ইষ্টদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতা করিলেন। বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সুব্যবস্থা ও সামাজিকতায় সমবেত ব্যক্তিবর্গ সকলেই সমধিক পরিতুষ্টি লাভ করিলেন।

১ প্রথম সংস্থাপিত যশোহর-নগরী উত্তর দক্ষিণে ৮।১০ মাইল বিস্তৃত ছিল। রামরাম বসুও ইহাকে পঞ্চক্রোশী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন একটি ক্ষুদ্র স্থানকে যশোহর বলিত না। উপকণ্ঠ লইয়া ১০ মাইলব্যাপী সমস্ত স্থানের সাধারণ নাম ছিল যশোহর।

স্বর্গগত নৃপতির যাবতীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়ার পর, বসন্ত রায় উদ্যোগী হইয়া পরবর্ত্তী বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।[১] এতদুপলক্ষে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভুঞা নৃপতি ও অন্যান্য ছোট বড় রাজন্যবর্গ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া যশোহরের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের অসামান্য চেষ্টার ফলে এবং তাঁহার অনুচর বর্গের প্রাণপণ পরিশ্রমে ইঁহাদের অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এ সময়ে কে কে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে দুই একজন আসিয়াছিলেন, তাহা বলা যায়; ভূষণার মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং উড়িষ্যার ঈশা খাঁ মছন্দরী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ যখন কতলু খাঁর উকীল স্বরূপ গৌড়ে অবস্থান করিতেন, তখন বসন্ত রায়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। তাঁহারা উভয়ে পাগড়ী বদল করিয়া প্রকাশ্য মিত্রতা স্থাপন করেন।[২] এইজন্য ঈশা খাঁকে বসন্ত রায়ের 'পাগড়ী-বদল ভাই' বলিত। সত্রাজিৎ রায়ের সহিত এই সময়ে প্রতাপের যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। রাজন্যবর্গ লইয়া আমোদে প্রমোদের অভিষেক উৎসবের সমারোহ বৃদ্ধি করা ব্যতীত এ ব্যাপারে প্রতাপের আরও নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সুযোগমত তাঁহাদের প্রকৃতি ও শক্তি পরীক্ষা করা এবং মোগলের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি বা বিরক্তি কিরূপ ছিল, তাহাও বুঝিয়া লওয়া এই অভ্যর্থনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, যাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল হইয়াছিল, মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি তাঁহাদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া লইলেন। অন্যত্র হইতে সময়কালে সাহায্য পাওয়া যে অসম্ভব নহে, প্রতাপের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাঁহার উৎসাহ উদ্যম আরও বাড়িতে লাগিল।

ভাগ্যবানের পথ ভগবানই পরিষ্কার করিয়া দেন। প্রতাপের জীবনে ইহা

১ যতদূর বুঝা যায় তাহাতে ১৫৮৩ অব্দের শেষভাগে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। এবং ১৫৮৪ অব্দের এপ্রিল মাসে বা ১৫০৬ শাকের বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়। ইহা তাঁহার যশোহর ভুঞা-রাজ্যের ॥৵০ অংশপ্রাপ্তির প্রথম অভিষেক। তিনি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন ধুমধাটে তাঁহার পুনরভিষেক হইয়াছিল।

২ সত্যচরণ শাস্ত্রী, 'প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত', ৮১ পৃ, *Ain.* (Blochmann), p. 342 *note.*

বিশিষ্টভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। যখন কেবলমাত্র জাগতিক চেষ্টায় কার্য্য হয় না, তখন সহসা দৈবশক্তি আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত উদ্বোধন করিয়া দেয়। মোগলের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্য মনে মনে স্থির হইয়াছিল ; আত্মবল বৃদ্ধির জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিতেছিল ; কিন্তু এখনও লোকের বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ হয় নাই। বিশ্বাস না হইলে প্রাণে বল আসিবে কেন ? প্রাণ দিয়া পরের বা দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি জাগিবে কেন ? প্রতাপ শক্তিশালী, প্রতাপ উদ্যমশীল, প্রতাপ সাহসী ও অদ্ভুতকর্ম্মা ; কিন্তু তবুও লোকের বিশ্বাস জাগে নাই। হঠাৎ একটি দৈব ঘটনায় যশোরেশ্বরী দেবীর আবির্ভাবে তাঁহার প্রতি লোকমাত্রের অটল বিশ্বাস স্থাপিত হইল।

প ঞ্চ দ শ প রি চ্ছে দ

যশোরেশ্বরী

প্রতাপাদিত্য আগ্রা হইতে যে সৈন্যদল সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহার অধিনায়ক ছিলেন এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠান বীর—কমল খোজা। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম খোজা কামাল বা কামালউদ্দীন হইতে পারে; কিন্তু তিনি সাধারণতঃ হিন্দু ভাবাপন্ন কমল নামেই পরিচিত। প্রথমতঃ তিনি প্রতাপের শরীররক্ষী সেনার অধিনায়ক ছিলেন; পরে ক্রমশঃ তাঁহাকে আরও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে উন্নীত করা হয়। প্রায়ই তাঁহাকে এক একটি প্রধান দুর্গে অধীশ্বর করিয়া রাখা হইত। আমরা পরে দেখিতে পাইব, তাঁহার নামানুসারে একটি প্রসিদ্ধ দুর্গের নাম হইয়াছিল—গড় কমলপুর। তাঁহার উপর প্রতাপের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনিও চিরদিন সে বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। রাজ্যারোহণের পর প্রতাপাদিত্য যখন ধুমধাটে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, তখন তাহার প্রধান ভার কমল খোজার উপর অর্পিত হইল।[১]

যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গম স্থলের দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে এই বিস্তীর্ণ মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যমুনা ও ইছামতী উহার উত্তর ও পূর্ব্বদিক বেষ্টন করিয়া থাকিল এবং দক্ষিণ দিকে ইছামতী হইতে হানরখালি নামে একটি খাল খনিত হইল এবং পশ্চিমদিকে হানরখালি হইতে কামারখালি নামক অন্য একটি খনিত খাল বাহির হইয়া যমুনায় মিশিল। এই ভাবে ইহার বাহিরের গড়খাই হইল। ভিতরে চারিদিকে বিস্তৃত পরিখা কাটিয়া মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করিয়া বেষ্টন প্রাচীর প্রস্তুত হইল; উহারই মধ্যে সৈন্যাবাসের জন্য ইষ্টক ও কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহসকল প্রস্তুত করা হইল। পূর্ব্বদিকে উহার সদর তোরণ হইল। সেই দ্বারের পার্শ্বে দুর্গাধ্যক্ষের আবাস স্থান ছিল। কমল খোজা দিবারাত্রি সেইস্থানে থাকিয়া দুর্গ নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধান করিতেন। গভীর নিশীথেও তিনি প্রহরীর মত এই পূর্ব্বদ্বারে বসিয়া থাকিতেন। সেস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে তখনও ভীষণ অরণ্য ছিল। প্রবাদ এই, ঐ অরণ্যের মধ্যে গভীর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তিনি এক স্থান হইতে অগ্নিশিখা উঠিতেছে দেখিতে পাইতেন। দুর্গের

১ ১৯শ এবং ৩৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য—শি মি

পূর্ব্বোত্তর কোণে ইছামতী বা কদমতলীর উপর একটি খেয়াঘাট হইয়াছিল। সেই ঘাটের মালিক যশা পাটনীও রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে ঐরূপ অগ্নিশিখা দেখিত। ক্রমে এই কথা যখন প্রতাপের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি জঙ্গল কাটিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিলেন। এই অগ্নিশিখায় কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, দুর্গের সান্নিধ্যে রাজধানীর সহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল। জঙ্গল কাটিয়া স্থান পরিষ্কৃত হইলে, তন্মধ্যে স্তূপীকৃত ইষ্টকাদির ভগ্নাবশেষের নিম্নে যশোরেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইল। পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, সে অতীব কৃষ্ণবর্ণ বা কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত ভয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তি। বাস্তবিকই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। মূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন বিভীষিকাময়ী মৃত্যু-মূর্ত্তি আর দেখি নাই।[১] সেই অতি বিস্তার বদনা জিহ্বাললন-দশনা ভীষণা মূর্ত্তি দর্শন করিলে, মানব মাত্রেরই আতঙ্কের সঞ্চার হয়; কিন্তু এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই, সে ভীতির সঙ্গে ভক্তি বিজড়িত থাকে; ভীতির পদার্থ হইতে মানুষে সরিয়া যাইতে চায়, কিন্তু হিন্দুর প্রাণ লইয়া কেহ সে মূর্ত্তি দেখিবার বেলায় নেত্র নিমীলিত করিতে চায় না। আতঙ্কে রোমাঞ্চিত হইতে হয় সত্য, কিন্তু উহা ভক্তিতে পুলকিত হইবার নিদর্শন কিনা, তাহা স্থির করা যায় না। বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা মৃত্যু-মূর্ত্তি, প্রকৃতপক্ষেই তাহা বিশ্বমাতার শ্রীমূর্ত্তি। প্রথম আবিষ্কারের সময় ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এই অপূর্ব্ব রচনা—করুণাময়ীর শ্রীমূর্ত্তি যিনি দর্শন করিলেন, তিনিই ভক্তিতে বিগলিত হইয়া গেলেন।

এ মূর্ত্তি যে পীঠমূর্ত্তি তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না। মহাপ্রাণ বসন্ত রায়, যিনি কালীঘাটের পীঠমূর্ত্তির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিনিলেন। তান্ত্রিক সাধক তর্কপঞ্চানন আসিয়া তন্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া স্থির করিয়া দিলেন, ইনি একান্নপীঠের অন্যতম যশোরের পীঠ-দেবতা—অতএব ইঁহার নাম মাতা যশোরেশ্বরী :

১ মাতা যশোরেশ্বরী সত্যযুগ হইতে বর্ত্তমান আছেন। সে প্রমাণ আমরা প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। এ মূর্ত্তির নির্ম্মাণপ্রণালী আদি হিন্দুযুগের পদ্ধতির অনুযায়ী। এজন্য আমরা ইহার ভাস্কর্য্যের পরিচয় প্রথম খণ্ডে (৩য় সং, ১৬৬-৭০ পৃ) দিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে দেবীর পূর্ব্বতন মন্দিরাদি সম্বন্ধে কিছু পুনরুক্তি না করিলে সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

'যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী
চণ্ডশ্চভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ'—তন্ত্রচূড়ামণি

তবে ত যশোর-রাজ্যের ইহাই পীঠস্থান, ইহাই শীর্ষস্থান, যশোর নাম ত ইহারই হওয়া উচিত। পূর্ব্বে বসন্ত রায় যে নূতন সহরকে যশোহর বলিয়াছিলেন, তাহা ত ঠিক হয় নাই। প্রতাপ বাস্তবিকই রাজধানী করিবার জন্য ভাগ্যক্রমে প্রকৃত স্থানই বাছিয়া বাহির করিয়াছেন। এতদিন ধূমঘাটের সীমান্ত পর্য্যন্ত যশোহর নাম বিস্তৃত হইয়াছিল; এখন ধূমঘাট সে নামের অন্তর্ভুক্ত হইল। ক্রমে ধূমঘাটের রাজধানী যত দক্ষিণে পূর্ব্বে বিস্তৃত হইতে লাগিল, উত্তরদিকের প্রাচীন সহর তত নগণ্য ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং তাহার যশোহর নাম অবশেষে যমুনা পার হইয়া ধূমঘাটে সংলগ্ন হইল। যে স্থানে যশোরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইল, তাহার নাম হইল যশোরেশ্বরীপুর, উহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া হইল ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুর বলিলে প্রতাপাদিত্যের ধূমঘাট-যশোরের একাংশকে বুঝাইত। এখনও তাহাই বুঝায়; এখনও দক্ষিণাঞ্চলের কোন লোক ঈশ্বরীপুর বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যাইবার সময় 'যশোর যাইতেছে' বলিয়া পরিচয় দেয়। সে অঞ্চলে এখনও 'যশোর' বলিলে ইংরাজ আমলের আধুনিক জেলা যশোহর বুঝায় না। একস্থানের যশঃ হরণ করিয়া অন্যস্থানে লইতে লইতে যশোহর নাম যে কত স্থানই ভ্রমণ করিল! কিন্তু যেখানেই গিয়াছে, যশঃ রক্ষা করিতেছে, এখন শেষ রক্ষা করিতে পারিলে হয়।

যশোরেশ্বরী মূর্ত্তির আবির্ভাব হওয়া মাত্র প্রতাপ ভক্তি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অচিরে পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল বহুদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইল; স্তূপীকৃত ইষ্টক সরাইয়া ফেলা হইল; প্রতাপাদিত্য মায়ের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য উপযুক্ত আদেশ দিলেন। পীঠস্থানের সন্নিকটে তিনি দুর্গের স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। দুর্গ, সহর ও মন্দিরের গঠনকার্য্য পূর্ণবলে চলিতে লাগিল। তন্মধ্যে মন্দিরের কর্ম্ম যাহাতে যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিত্তি খনন কালে মৃত্তিকার নিম্নে যে কত ইট কাঠ বাহির হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। মায়ের মূর্ত্তিও নূতন নহে; মন্দিরও কতবার পড়িয়াছে, কতবার গড়িয়াছে, তাহা বলা যায় না। কাল তাহার একমাত্র সাক্ষী।

প্রাচীন যশোর একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। ভবিষ্যপুরাণ হইতে দেখিতে পাই,

এখানে সতীদেহ হইতে বাহু ও পদ পতিত হয়। কবিরাম কৃত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ দেবীর জন্য এখানে শতদ্বারযুক্ত এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুনরায় ধেনুকর্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় নৃপতি তীর্থদর্শনে আসিয়া মায়ের ভগ্নমন্দির স্থলে এক নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। সুন্দরবনের ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, সুন্দরবন বহুবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। কখনও এখানে জন কোলাহলময় লোকালয় ছিল ; কখন তাহা উৎসন্ন হইয়া মনুষ্যশূন্য হইয়াছে। একে প্রস্তরশূন্য বঙ্গদেশ, তাহাতে লবণাক্ত বায়ু-প্রবাহ, উভয় কারণে প্রাচীন অট্টালিকা বিনষ্ট হয়। যশোরেশ্বরীর মন্দিরও এইভাবে কতবার নষ্ট হইয়াছে। মন্দির যাইতে পারে, কিন্তু যে অপূর্ব্ব কষ্টিপাথরে এই পীঠমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার বিনাশ বা ক্ষয় নাই। এবার মা যেমন উঠিলেন, সেই প্রস্তরের কালিমার মধ্য হইতে কালী মায়ের আভা ফুটিল। মূর্ত্তি যেখানে উঠিলেন, সেইখানেই রহিলেন ; কারণ সে বিরাট প্রতিমা অচল অটল, যেন পাহাড়ের মত ভারী। যে ভাবে উঠিয়াছিলেন, এখনও সেই ভাবেই আছেন। দেহের যতটুকু অংশ মেজের উপরে আছে, ততোধিক এবং স্থূলতর অংশ ভূপ্রোথিত রহিয়াছে। এই অচলা মূর্ত্তির চারিধারে বেড়িয়া মন্দির উঠিল। প্রবাদ এই, মায়ের জ্বালাময়ী মূর্ত্তি বলিয়া উহার মস্তকোপরি ছাদ থাকিত না, ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া জ্বালা নির্গমনের পথ হইত ; তদবধি সেইস্থানে চিম্‌নীর মত গাথিয়া ফাঁক্ করিয়া দেওয়া হয়। এ মূর্ত্তি পরে মানসিংহ লইয়া গিয়াছেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা সত্য নহে। আমরা পরে তাহা দেখাইব। যশোরেশ্বরী দেবী এখনও নিত্য পূজিত হন, শনি মঙ্গল বারে সেখানে লোকারণ্য হয়। কালীঘাটের মত ঈশ্বরীপুরও জাগ্রত পীঠ।

মন্দিরের কার্য্য শেষ হইলে, তান্ত্রিক বিধানে মহাসমারোহে মায়ের মূর্ত্তির অঙ্গরাগ ও অভিষেকাদি করিয়া পূজার সুব্যবস্থা করা হইল। এ সকল কার্য্য রাজগুরু তর্কপঞ্চানন ও তাঁহার পুত্রগণের সাহায্যে সুসম্পন্ন হইল। সম্ভবতঃ কালীঘাট হইতে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীও এই সময়ে যশোহরে আগমন করিয়াছিলেন। মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপেরও জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বৈষ্ণব কুলে তাঁহার জন্ম ; রামচন্দ্র নিয়োগী হইতে তদ্বংশীয়েরা সকলেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ; তন্মধ্যে আবার বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় বৈষ্ণব-চূড়ামণি।

প্রতাপও বাল্যকাল হইতে, এমন কি রাজা হইবার পরও কিছুদিন বৈষ্ণব মতের পক্ষপাতী ছিলেন, গোবিন্দ দাসের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান ছিল না, যোদ্ধৃজীবনের মধ্যে তাঁহার কোন অবসরও ছিল না। তিনি ধর্ম্মের ভাব দেখাইতেন, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে অধিকৃত করিতে পারে নাই। এইবার সে ভাব চলিয়া গেল ; মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপের মতি গতি ফিরিয়া গেল। তিনি নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তর্কপঞ্চাননের নিকট শাক্তমন্ত্রে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শক্তির উপাসক এবার নিজে মহা-শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন। অরণ্যে লোকারণ্য হইল, অসংখ্য লোকে মায়ের দুয়ারে পূজা দিতে আসিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল যে, প্রতাপের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। লোকে বলিতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য দেবী ভবানীর বরপুত্র।

তাই কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—'বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর।' ধর্ম্মকে ধরিতে পারিলে জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির হয় ; তখন লোকমত আসিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠকে আশ্রয় করে। লোকে শুনিল, প্রতাপাদিত্য এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, দেবী যুদ্ধে বা রাজ্য শাসনে চিরকাল তাঁহার সহায় থাকিবেন, তিনি স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার না করিলে বা রাজলক্ষ্মীকে নিজে দূরীভূত না করিলে, যশোরেশ্বরী মাতা কখনও তাঁহার প্রতি বিমুখী হইবেন না। এ স্বপ্ন বৃত্তান্তের মূল কোথায়, তাহা জানা যায় না ; তবে অচিরে একথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবানুগৃহীত মানব বলিয়া প্রতাপের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তেজঃসম্পন্ন সুন্দর মূর্ত্তি, অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও অদ্ভুত বীরত্ব খ্যাতি মানবমাত্রকেই লোকপ্রিয় করিয়া থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যদি শুনে, দেবী কালিকা স্বয়ং তাঁহার সহায়, তাহা হইলে আর কথা থাকে না। সাধারণ লোকে তাঁহাকে একেবারে দেবতা বলিয়াই মানে এবং বনে জঙ্গলে ভীষণ বিপদে যেখানে ইচ্ছা সেইস্থানেই লোকে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে। রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধনবল প্রতাপের করায়ত্ত হইয়াছে ; এতদিনে দেববলে বলীয়ান হওয়ায় লোকবলও তাঁহার হস্তগত হইতে চলিল। বনাস্ত ও নদীবহুল যশোর-রাজ্য সহজে দুর্গম এবং নবাগত মোগলের প্রতি তখনও লোকে অতীব সন্দিগ্ধ এবং ভক্তিশূন্য ; সুতরাং দেশ ও কাল উভয়েই

তাঁহার সহায়; স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন চেষ্টা করিতে হইলে, ইহাই তাহার উপযুক্ত সময়। প্রতাপ সময় বুঝিয়া যথোচিত আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে আয়োজনের পরিচয় আমরা পরে দিতেছি; আপাততঃ যশোরেশ্বরীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বিগ্রহের পরিচয় দিয়া লইব।

প্রত্যেক পীঠদেবতারই এক একটি ভৈরব থাকে, যশোরেশ্বরীর ভৈরবের নাম চণ্ডভৈরব। অতি প্রাচীনকাল হইতে তাঁহার জন্য একটি পৃথক্ মন্দির ছিল, এ মন্দিরও কতবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে জানে? কথিত আছে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেন এই চণ্ডভৈরবের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ যখন ভৈরবটি পাইলেন, তখন তাঁহার মন্দির বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি উঁহার জন্য একটি ত্রিকোণ মন্দির গঠন করিলেন; বারংবার সংস্কারের পর সে ত্রিকোণ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে। তাহার দরজাগুলি নাই, ভিতরও জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে; পুনরায় উহার সংস্কার প্রয়োজনীয়। চণ্ডভৈরব এখন মায়ের মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। প্রতাপও চণ্ডের সব অংশ পান নাই, উহা একটি বড় বাণলিঙ্গ; প্রতাপ উহার ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ লিঙ্গাংশটুকু আবর্জ্জনার মধ্যে পাইয়াছিলেন। এ অংশ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত; তিনি উহার নিম্নবর্ত্তি গৌরী পট্টের পরিবর্ত্তে একখানি শ্বেত প্রস্তরের ত্রিকোণ পীঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাতে পঞ্চমুণ্ডী আসন কল্পনা করা হইয়াছিল। একখানি চৌকির উপর এই ত্রিকোণ পীঠ পাতিয়া তন্মধ্যস্থ গর্ত্তমধ্যে শিবলিঙ্গটি বসাইয়া পূজা করা হয়। সেই ভাবেই উহার ফটো লওয়া হইল।

যশোরেশ্বরীর মন্দির মধ্যে আর একখানি অতি সুন্দর পাষাণ প্রতিমা আছেন। উহা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত ও পরিচিত হন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা গঙ্গামূর্ত্তি। উহার বিশেষ বিবরণ ও ছবি প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল;[১] দেবী মকরবাহনা নানালঙ্কার-ভূষিতা হইয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং তাঁহার মুখচ্ছবি হইতে দিব্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে।

১ প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, ২৩৭-৮ পৃ। আমার গৃহীত ফটো দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রতিমার ভাব ও ভাস্কর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং উহা যে গঙ্গামূর্ত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বঙ্গে যে একটি বিশিষ্ট ভাস্কর্য্য প্রণালী ছিল এ মূর্ত্তি তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই প্রতিমা যশোরেশ্বরী-মূর্ত্তির সহিত একই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমরা পূর্ব্বখণ্ডে দেখাইয়াছি যে, প্রায় শতবর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী একটি মোকদ্দমার বর্ণনা হইতে জানা যায়, যশোরেশ্বরী দেবী সত্যযুগ হইতে প্রকাশিত আছেন ; আর প্রতাপাদিত্যের সময় হইতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নিষ্কর বৃত্তি চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রতাপাদিত্য এই মূর্ত্তি আনিয়া দেবীর মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন এবং উঁহার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। অন্নপূর্ণা সত্যযুগ হইতে থাকিলে, যশোরেশ্বরীর সহিত একসঙ্গে সেরূপ উল্লেখ থাকিত। নিশ্চয়ই প্রতাপাদিত্য অন্যত্র হইতে এ মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন, এবং ইহার অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গামূর্ত্তি গঙ্গাতীরবর্ত্তী তীর্থক্ষেত্রে ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না; কাশীধামের অপর পারে রামনগরে গঙ্গার গর্ভ হইতে উত্থিত এক মন্দিরে গঙ্গাদেবীর যে অপূর্ব্ব মর্ম্মর প্রতিমা দেখিয়াছি, তেমন সুন্দর জীবন্তমূর্ত্তি বোধ হয় জগতে আর নাই। কাশী যেমন এক গঙ্গাতীর্থ, সগরদ্বীপও তাহাই। অনুমান করি, প্রতাপাদিত্য যখন সগরদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তখন তথায় এই গঙ্গামূর্ত্তি পান এবং উহা নিজ রাজধানীতে স্থানান্তরিত করেন। আমরা দেখাইয়াছি, ইহা সেন রাজগণের আমলের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। প্রতাপাদিত্যের সময়ে এ মূর্ত্তি চিনিতে ভুল হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। হয়ত চাঁদরায় বা অন্য কোন পরবর্ত্তী রাজার আমলে ইহার বৃত্তি ব্যবস্থার সময় গঙ্গামূর্ত্তি ভ্রান্তিবশতঃ অন্নপূর্ণা নামে উল্লেখিত হন।

দীক্ষার পর প্রতাপাদিত্য রীতিমত তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান দ্বারা সাধন আরম্ভ করেন। এইরূপ পূজাদির সময় তিনি সুরাপান করিতেন। সাধন-মার্গে সুরাপানের গুণভাগ যাহাই থাকুক, উহার দোষভাগও প্রতাপের চরিত্রে বিশেষ-ভাবে বর্ত্তিয়াছিল। তিনি মত্তাবস্থায় কয়েকটি ঘোর নির্দ্দয়তার কার্য্য করিয়া নিজের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু পূজা বা সুরাপান নহে, কার্য্যকর্ম্মে এবং মন্দিরাদি নির্ম্মাণেও তান্ত্রিকতা দেখাইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যশোরেশ্বরীর মন্দিরের ঈশানকোণে চণ্ডভৈরবের যে মন্দির প্রস্তুত হয়, উহা ত্রিকোণাকৃতি। তিনটি প্রাচীরের মন্দির আমরা আর দেখি নাই। পূজার পর ৺মায়ের নির্ম্মাল্যাদি রাখিবার জন্য মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিকোণ করিয়া ইষ্টক গ্রথিত পুষ্পাধার প্রস্তুত করেন। ছাগাদি বলি দিলে, তাহা হইতে রক্ত বহিয়া

গিয়া পূর্ব্বপার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণীতে পড়িত, উহার নাম 'খর্পর পুষ্করিণী' ; উহাও ত্রিকোণাকৃতি। প্রতাপের প্রচলিত তাঁহার স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রাও ত্রিকোণাকৃতি ছিল বলিয়া কথিত আছে। আমরা পরে দেখাইব, প্রতাপ মুসলমানদিগের জন্য একটি মসজিদ ও খৃষ্টানদিগের জন্য একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেন ; মায়ের মন্দির, মসজিদ ও গির্জ্জা, এই তিন জাতির তিনটি উপাসনালয় এমন ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, যেন একটি ত্রিভুজের তিন কোণে পড়ে।

প্রতাপ এই সময় হইতে নিত্য তান্ত্রিক পূজাদি করিতেন। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ আছে। গোবরডাঙ্গার নিকট ইছাপুরে রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ছিলেন। গল্প আছে, তিনি নাকি বাটী হইতে ৮ ক্রোশ দূরে গিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন। তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। এক সময়ে তিনি প্রতাপকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হওয়াতেই হউক বা অন্য কোন কারণে প্রতাপের বিরাগ-ভাজন হন। তখন প্রতাপ সসৈন্যে আসিয়া বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে যমুনার কূলে ছাউনী করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ স্নানান্তে দৈবশক্তিবলে প্রতাপাদিত্যের শিবিরে প্রবেশ করেন এবং প্রতাপের ভৃত্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্বহস্তে রাজার পূজার আয়োজন করিয়া রাখেন। প্রতাপ সে আয়োজন প্রণালী দেখিয়া চমকিত হন এবং কে করিয়াছে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সিদ্ধান্তবাগীশ আত্মপরিচয় দেন। প্রতাপ তাঁহার সহিত আলাপে ও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তখনই তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। তখন রাঘব রাজাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। প্রতাপ তখন উত্তর করেন, তিনি পরের রাজ্যে অন্যের অন্নগ্রহণ করেন না। বাস্তবিকই ছাউনি স্থানটি সিদ্ধান্তবাগীশের দখলে ছিল। তখন তিনি উহা তৎক্ষণাৎ দলিল লিখিয়া প্রতাপাদিত্যকে অর্পণ করেন এবং প্রতাপকে সমাদরে অন্নদানে অভ্যর্থনা করেন। তদবধি ঐ স্থানটির নাম হয় প্রতাপপুর। গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে রেলওয়ে পুলের একটু দক্ষিণদিকে যমুনার কূলে উচ্চভূমিতে প্রতাপপুর এখনও আছে।[1]

---

১ প্রতাপপুর এখনও সুন্দর স্থান। উহার পূর্ব্বদিকে কণকণার বাওড়, দক্ষিণদিকে রত্নখালি ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে যমুনা। প্রতাপপুরে এক সময়ে নীলকুঠি বসিয়াছিল। উহা এক্ষণে কুশদহের জমিদার মণীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক মহাশয়ের অধীন। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরের হড় চৌধুরী ;

যশোরেশ্বরী দেবী পশ্চিমবাহিনী। এখন চক্‌মিলানো বাড়ীর পূর্ব্বপোতায় মায়ের মন্দির রহিয়াছে। আধুনিক লোকের মুখে প্রবাদ এই, প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখী হইয়া দেবী মন্দিরসমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন।[১] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে :

'শিলাময়ী নামে, ছিলা তাঁর ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি॥'

এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। দেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া কাজের বেলায় বিমুখী হইতে পারেন, কিন্তু শরীরের বেলায় সম্ভবতঃ পূর্ব্ববৎই ছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী করিয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্তু যশোরেশ্বরীর আবিষ্কারের সময় হইতে তাঁহাকে পশ্চিমমুখী দেখা গিয়াছিল। তাই সাধারণতঃ লোকে যে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কবি তাহা দিয়াছেন। আর সে কবির কাব্য আধুনিক হইলে কি হয়,[২] যখন কবির ভাষায় আছে, তখন তাহাই সকলে ঐতিহাসিক তত্ত্বের মত ধরিয়া বসিয়াছেন। মা ত বিমুখী বহু লোকের ভাগ্যে হইয়া থাকেন, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইবার বা পোতা সমেত মন্দির উল্টাইবার গল্প ত আর কোথায়ও শুনি না। পশ্চিম অঞ্চলে সব দিকে ফিরানো দেবতা-মূর্ত্তি দেখা যায়; আমাদের এই দেশেই মা শুধু এক দিকে ফিরিয়া থাকিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমমুখী হইয়াই মাতা আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন; সেইভাবে তাঁহার মন্দির

রাঘবের পৌত্র রঘুনাথ কৃতী পুরুষ ছিলেন; তাঁহারই সময়ে ইছাপুরে বিখ্যাত নবরত্ন মঠমন্দির ও অন্যান্য সৌধাবলী নির্ম্মিত হয়। স্থানান্তরে মঠমন্দিরের পরিচয় দিব।—'খাটুরার ইতিহাস', ১৪৭-৯ পৃ। এই সিদ্ধান্তবাগীশ প্রতাপের পতনের পর মানসিংহের সভায় সমাদরে সংকৃত হন। তদুপলক্ষে রচিত শ্লোকের অর্দ্ধাংশ এই :

'সংখ্যাবান সাংখ্যতর্কাগমনিগম বিচারেষু বিশ্বপ্রকাশি।
সুশ্রীমান্ মানসিংহ প্রভৃতি নৃপতিভিঃ সংকৃতোহয়ং সভায়াং॥'

—বঙ্গীয় সমাজ, ১৮৪ পৃ

১ '........she caused the temple he had built towards the West to be changed from its original position on the South'—Smyth, Ralph, *Report of 24-Pergannahs*; নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৩৭৮ পৃ।

২ অন্নদামঙ্গলের প্রথম সংস্করণ কলিকাতায় ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়। অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের পতনের অন্ততঃ ১৬০ বৎসর পরে।

চকমিলান বাড়ী, পশ্চিম দিকে তোরণ ও তাহারই সম্মুখে পুষ্করিণী প্রভৃতি হয়। শেষে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, সুন্দরবনের সাময়িক নিমজ্জন বশতঃ মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শ্বাপদসঙ্কুল হয়। কিছুদিন পূজা একপ্রকার বন্ধই ছিল। পরে বর্ত্তমান অধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ আসিয়া পুনরায় পূজার ব্যবস্থা করেন। তদ্বংশীয়দিগের সময়ে মন্দিরাদির সংস্কার ও নূতন গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। সে বিবরণ আমরা পরে দিব। এই দ্বিতীয় বার আবির্ভাবের পর দেবীর পশ্চিমবাহিনী মূর্ত্তি ও দেশের পতন অবস্থা, এই উভয় মনে করিয়া লোকে দেবীর মুখ ফিরাইবার প্রবাদ গড়িয়াছিল। আর যে দোষের জন্য দেবী মুখ ফিরাইলেন, তাহাও প্রতাপের নিজের দোষ নহে; আমরা পরে দেখাইব যে পরের জন্য কল্পিত গল্প প্রতাপের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে।[১]

মায়ের বাড়ীর প্রকৃত তোরণ পশ্চিমদিকে হইলেও উত্তরদিকে সদর দরজা ছিল; অদূরবর্ত্তী বারদুয়ারী গৃহে যখন প্রতাপ দরবারে বসিতেন, তখন সেখান হইতে মায়ের বাড়ীর সদর দ্বার দেখিবেন বলিয়াই এই দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাকে যদি স্থানচ্যুত করাই যাইত, তবে দক্ষিণ পোতায় মন্দির করিয়া উত্তর-বাহিনী মাকে দেখা চলিত। কিন্তু মা যে অচলা; তিনি পশ্চিমবাহিনীই আছেন এবং এখনও সদর দরজা উত্তরদিকে রহিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের পশ্চিমবাহিনী কালী ছিলেন বলিয়া একটি জনশ্রুতিই আছে।

যশোরেশ্বরী দেবীকে এইভাবে পশ্চিমমুখী অবস্থায় পাইবার পর, প্রতাপাদিত্য যেখানে যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রায় সর্ব্বত্রই পশ্চিমমুখ করিয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সুন্দরবনের ২৩৩ নং লাটে, শিবসা নদীর সঙ্গমের সন্নিকটে, সেখের টেক নামক স্থানে কালীর খালের কূলে, আমরা প্রতাপাদিত্যের যে ৺কালী-মন্দিরের বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি, তাহাও পশ্চিমদ্বারী। সে মন্দির এখনও অনেকটা অভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে

১ বিক্রমপুরের কেদার রায়ের ইষ্টদেবীর নাম শিলাময়ী; মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া যান। এখনও তিনি অম্বরে আছেন, তাঁহার নাম সল্লা দেবী বা শিলা দেবী। সেই দেবী কন্যারূপে কেদার রায়কে ছলনা করিলে তিনি তাহাকে তাড়াইয়া দেন, এজন্য শিলাময়ী কেদারের প্রতি বিমুখী হন। প্রতাপের ভাগ্যদোষে কবির লেখনী সেই গল্প আনিয়া তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়াছে। এ বিষয় আমরা পরে বিশেষ বিচার করিব।

এবং তাহা দেখিবার যোগ্য।[১] এ কথা অনেকেই জানেন যে, প্রতাপাদিত্য কাশীধামে ৺চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাট পাষাণনির্ম্মিত করিয়া দেন। সে ঘাট এখনও আছে এবং প্রতাপাদিত্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। চৌষট্টি যোগিনী কাশীক্ষেত্রের আদি দেবতা বলিয়া বিদিত। প্রতাপ শুধু তাঁহার ঘাট বাঁধিয়া দেন নাই, তিনি পরে সেই দেবী-মন্দিরের ঠিক সম্মুখে একটি পশ্চিমদ্বারী গৃহে পশ্চিমমুখী করিয়া ভদ্রকালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[২] সে দেবীমূর্ত্তি এখনও আছেন। শুধু দেবীমূর্ত্তির বেলায় নহে, তাঁহার সময়ে যেখানে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সব মন্দিরগুলিই বোধ হয় পশ্চিমদ্বারী হইয়াছিল। গোপালপুরের যে প্রসিদ্ধ গোবিন্দদেব বিগ্রহের কথা আমরা পরে বলিব, সে মন্দিরও পশ্চিমদ্বারী। বেদকাশীতে যে শিব মন্দিরের রাশীকৃত ইষ্টক ও প্রস্তর স্তূপ দেখিয়াছিলাম, তাহাও পশ্চিমদ্বারী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম।

সাধারণ গল্পগুলি হইতে শুনি, দেবী বিমুখী হইয়া পশ্চিমবাহিনী হইবার অল্পকাল পরে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। কিন্তু উল্লিখিত ভদ্রকালীর মূর্ত্তি বা গোবিন্দদেব বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা যে পতনের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, মাতা যশোরেশ্বরী দেবী যে স্থানে যে ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই আছেন। তিনি বিরূপা হইলেই যে দেহরূপের ব্যতিক্রম হওয়া দরকার, তাহা নহে; অন্য নানাভাবে তিনি পাপীর শাস্তি দিয়া থাকেন। প্রতাপাদিত্য এই ভাগ্যদেবতা

১ বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, ৮০-৮২ পৃ। মন্দিরের বাহিরের মাপ প্রতি দিকে ২১´-৩", ভিত্তি ৫´-৩" এবং ভিতরের উচ্চতা ২৫´-৬"। বাহিরের ইটে বিশেষতঃ পশ্চিম দিকে সুন্দর কারুকার্য্য ছিল। জঙ্গলের মধ্যে এমন সুন্দর মন্দির আর নাই। আমরা উহার সংবাদ ও ছবি প্রকাশিত করিয়াছি।

২ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, প্রতাপাদিত্য আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কাশীধামে আসিয়া চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট বাঁধিয়া দেন (৫২ পৃ)। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তিনি তখনও বৈষ্ণব, এবং তান্ত্রিকমতে দীক্ষিত হন নাই। বহুলোকের সুবিধার জন্য একটি প্রসিদ্ধ মন্দিরের সন্নিকটে ঘাট বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইলেও, তখন যে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাহা নিশ্চিত। যশোরেশ্বরীর আবির্ভাবের পর তিনি নিজে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই পশ্চিমমুখী কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, ইহাই সম্ভবপর।

পাইয়া, যতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে, তাহার বসন-ভূষণ ও পূজায়োজনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে রত্নালঙ্কারের কিছুই এখন নাই।[১]

মাতা যশোরেশ্বরী ভীষণা কালীমূর্ত্তি। তাঁহার মুখমণ্ডল মাত্র সম্বল। হস্ত পদাদি কিছুই নাই।[২] কণ্ঠ হইতে সমস্ত নিম্নাংশ প্রলম্বিত রক্তবস্ত্রের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। বাহির হইতে ঐ অংশ প্রকাণ্ড প্রস্তরপিণ্ডবৎ বোধ হয়। অধিকারিগণ ভিন্ন অন্য কাহারও সে অংশ দেখিবার সাধ্য নাই; তাঁহারাও বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দেখিতে পান না। এ সম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে যে বিবরণ পাইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

'শ্রীশ্রী৺মাতা যশোরেশ্বরী দেবীর শ্রীমূর্তি কেবল প্রস্তরময় মুখমণ্ডল মাত্র জানিবেন। কণ্ঠের নিম্নাংশে হস্তপদাদি আর কিছুই নাই। একটি প্রস্তরময় প্রায় সমচতুষ্কোণ বেদীর উপর এই কৃষ্ণপ্রস্তরের নির্ম্মিত মুখমণ্ডলটি দৃঢ়রূপে বসান; ঠিক যেন জগজ্জননীরূপে বসিয়া রহিয়াছেন বলিয়া সাধারণের ভ্রম হয়। প্রথমতঃ ঐ সমচতুষ্কোণ উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত বেদিটি প্রায় এক হস্ত পর্য্যন্ত

১ এখন থাকিবার মধ্যে স্বর্ণজিহ্বা ও মুকুটে সামান্য সৌন্দর্য্য আছে। নকীপুরের জমিদার ৺হরিচরণ চৌধুরী মহোদয় যে মুণ্ডমালা গড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বড় বেশী নহে এবং তাহা চৌধুরী মহাশয়ের দানের মত হয় নাই। অবশ্য মূর্ত্তির গায়ে অলঙ্কার দিবার বেশী স্থান নাই, সবই প্রায় বস্ত্রে ঢাকা। কিন্তু মাকে দিবার শক্তি বা ইচ্ছা থাকিলে, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার পন্থা এখনও আছে। মায়ের পূজার জন্য প্রতাপের আমলের একজোড়া রৌপ্যনির্ম্মিত ভারী কোশাকুশি ও রৌপ্যকুণ্ড ছিল, কালক্রমে কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উহা স্থানান্তরিত হইয়া টাকীতে হরিচরণ দাসের নিকট বন্ধক পড়িয়াছিল। টাকীর স্বনামধন্য জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উহা ১৩০৲ টাকা ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। কোশার উপর 'শ্রীকালী' লেখা আছে। মন্দিরে প্রাচীন-কালের একটি তাম্র ঘট আছে, উহা অত্যন্ত ভারী। কেহ কেহ অন্য ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া সন্দেহ করেন। আমরা ১ম খণ্ডে গঙ্গামূর্ত্তির ছবির সঙ্গে উহার ছবি দিয়াছি।—১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৪১ পৃ।

২ 'বিশ্বকোষে' (১ম, ৪৯৭ পৃ) কিন্তু যশোরেশ্বরীর এক অদ্ভুত ছবি দেওয়া হইয়াছে। দেবীকে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী করা হইয়াছে। যশোরেশ্বরী দেবী পূর্ব্ববৎ এখনও আছেন, যথাস্থানেই আছেন, তাঁহার কিন্তু হস্তপদ নাই। না দেখিয়া শুনিয়া 'বিশ্বকোষে'র মত প্রামাণিক অভিধানে কাল্পনিক ছবি প্রকাশিত করা যে কত অন্যায় এবং তাহাতে গ্রন্থের মূল্য কত কমে, তাহা সহজেই অনুমেয়। গ্রন্থকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন, মানসিংহ যশোরেশ্বরী দেবী লইয়া গিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি অষ্টভুজা, সুতরাং একটি অষ্টভুজা মূর্ত্তিই মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি—দুর্গা মূর্ত্তি, এবং প্রতাপাদিত্যের আরাধ্যা দেবী আদ্যা বা কালীমূর্ত্তি, সে হিসাব করা হয় নাই।

চতুর্দ্দিকে উচ্চ হইয়া তথা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া কণ্ঠদেশে গিয়া মিশিয়াছে। কিন্তু এই দৃঢ় প্রস্তরাবরণের মধ্যে যে কণ্ঠের নিম্নভাগ কি প্রকার, তাহা দেখিবার বা জানিবার কোনও উপায় নাই ; ঐ প্রস্তরাবরণ অতিশয় দৃঢ়রূপে বেমালুম জোড়া, তাহা খোলা বা ভাঙ্গা সম্পূর্ণ অসাধ্য ! দেখিলে অনুমান হয় যে, মুখমণ্ডল আকারে যেরূপ বড় সেই অনুযায়ী যদি শ্রী৺দেহ ও হস্তপদাদি থাকে, তবে তাহা এত অনুচ্চ হইতেই পারে না। সুতরাং নিশ্চয়ই মৃত্তিকা মধ্যে (যদি হস্তপদাদি থাকে) কতকাংশ প্রোথিত আছে। ৺মায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া, হয় কবি কল্পনা, আর না হয় প্রথমে দক্ষিণবাহিনী ছিলেন, পরে মানসিংহের যুদ্ধ জয়ের পর হয়তঃ ঐ মূর্ত্তি উঠাইয়া লওয়ার চেষ্টা করায় হস্তপদাদির কোন হানি হইতে পারে, এজন্য কিংবা সেবাইতগণের বিনয়ানুরোধে লইয়া যাওয়া আর আবশ্যক মনে করেন নাই, তৎপরে কণ্ঠের নিম্নাংশ ঐ কঠিন প্রস্তরাবরণে চিরকালের মত আচ্ছাদিত করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখী হওয়ার চিহ্নস্বরূপ পশ্চিমবাহিনী করিয়া বসান হইয়াছিল।'

আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি মায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া কবিকল্পনা মাত্র। এমন কি বিমুখী হওয়ার কথাটাই প্রতাপের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নহে। মানসিংহ এতবড় বিরাট প্রস্তরমূর্তি লইয়া যাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মায়ের মূর্ত্তি পূর্ব্বে কেমন ছিল বা কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা, কেহই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আমার বোধ হয়, মা যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। অনেক স্থানেই পীঠমূর্ত্তির মুখমণ্ডল বা দেহাংশ-বিশেষমাত্র সম্বল থাকে। যশোহরেও তাহাই। মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্তির অন্তরালে করুণাময়ীর প্রতিভা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ষো ড় শ প রি চ্ছে দ

প্রতাপাদিত্যের রাজধানী

প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা একটি প্রশ্নের বিষয়। এই সদুত্তর দিবার জন্য বহুবার সুন্দরবন ও তৎসান্নিধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি, বহুবর্ষ ধরিয়া সন্ধান লইয়াছি। সে চেষ্টা ও সাধনার ফল এই স্থানে প্রকটিত করিব। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতে হইবে, বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর অবস্থান কোথায়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানীকে আমরা যশোরের প্রথম বা পুরাতন রাজধানী বলিব এবং প্রতাপের রাজধানীকে দ্বিতীয় বা নূতন রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিব। ধূমঘাট সুন্দরবনের একটি পত্তন, উহা আধুনিক ম্যাপে ১৬৫ নং ধূমঘাট বা বংশীপুর লাট বলিয়া খ্যাত। গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে টিবির মোহানায় যমুনা ও ইছামতী দুই নদী মিশিয়াছিল; পরে ধূমঘাট লাটের উত্তরাংশে পুনরায় উহারা বিযুক্ত হইয়া দুইদিকে গিয়াছিল। এই মোহানার সন্নিকটে উক্ত ধূমঘাটের মধ্যে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দুর্গ হইতে পূর্ব্বদিকে ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সাধারণ নাম যশোহর। কিন্তু যশোহর বলিতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। যশোহর এক সময় বহুবিস্তৃত সহর ছিল; ঈশ্বরীপুর উহার একাংশ মাত্র। সে সহরের অন্যান্য অংশ এখন তত খ্যাত নহে বলিয়া, যশোহর বলিতে এখন সাধারণতঃ ঈশ্বরীপুর অঞ্চলকেই বুঝায়।

পূর্ব্বোক্ত নূতন ও পুরাতন রাজধানী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য আমাদিগকে অন্ততঃ ৫টি বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিতে হইবে :

১ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটের উত্তরাংশে ছিল; কিন্তু বিক্রমাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা ঠিক নাই। মহামতি বিভারিজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকেরা এই মতাবলম্বী।

২ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত ধূমঘাটের উত্তরাংশে ছিল এবং প্রতাপের রাজধানী আধুনিক ধূমঘাটের দক্ষিণভাগে অবস্থিত, কিন্তু সে স্থান এক্ষণে ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ। সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী।

৩ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত উত্তরাংশে বা ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে ছিল ; কিন্তু প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল গঙ্গার মোহানায় সগর-দ্বীপে। এই দ্বীপের অন্য নাম চ্যাণ্ডিকান দ্বীপ। নিখিলনাথ রায় মহোদয় এই মতের প্রবর্ত্তক।

৪ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী তেরকাটিতে বা ১৬৯ নং লাটে ছিল; উহা এক্ষণে ঘোর অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। প্রতাপের নূতন রাজধানী ঈশ্বরীপুরের কাছে ছিল। কেহ বা বলেন, পুরাতন রাজধানী ঈশ্বরীপুরে এবং নূতন রাজধানী তেরকাটিতে ছিল। এই মতের পরিপোষক বহু লোক নহেন। তবে তেরকাটিতে যে মনুষ্যাবাস ছিল, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন।

৫ প্রাচীন রাজধানী মুকুন্দপুর অঞ্চলে এবং নূতন বা ধূমঘাট দুর্গ ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

শেষোক্ত মতই আমাদের নিজমত এবং এই মত স্থাপনের জন্য আমরা নিয়মিতভাবে অপর মতগুলির খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব :

১॥ বিভারিজ বলেন,[১] প্রথমতঃ, চাঁদ খাঁর নামীয় জায়গীর পাইয়া বিক্রমাদিত্য যে রাজধানী স্থাপন করেন, তাহার নাম যশোহর। চাঁদ খাঁ চক হইতেই পাশ্চাত্যেরা রাজ্যটির নাম চ্যাণ্ডিকান করিয়াছেন। প্রতাপ পিতার রাজধানী ত্যাগ করিয়া, ধূমঘাটে নূতন রাজধানী করেন। তাহাও চাঁদ খাঁ জায়গীরের রাজধানী, এজন্য উহাও চ্যাণ্ডিকান বলিয়া কথিত হয়। (প্রতাপ কার্ভালো নামক এক পর্টুগীজ সেনানীর হত্যাসাধন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে ; আমরা পরে উহার সত্যাসত্য বিচার করিব। আপাততঃ তর্কের জন্য উহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলাম)। দ্বিতীয়তঃ, কার্ভালোকে চ্যাণ্ডিকান হইতে যশোরে ডাকিয়া লইয়া প্রতাপ কার্ভালোকে হত্যা করেন ; সে সংবাদ পরদিন রাত্রিতে চ্যাণ্ডিকানে (খৃষ্টানদিগের নিকট) পৌছে। সুতরাং যশোহর সহর

১ Beveridge, *District of Bakarganj*, pp. 176-9 ; J. A. S. B., 1876., pp. 71-6. Mr. H. J. Rainey বিভারিজের কথায় আস্থা না করিয়া বলেশ্বর নদীর হরিণঘাটা নামক মোহানার সন্নিকটে চণ্ডীশ্বর নামক স্থানে ধূমঘাট রাজধানী ছিল বলিয়া কল্পনা করেন (Calcutta Review, 1877, Vol. 65, p. 266.), কিন্তু সেখানে রাজধানীর চিহ্ন নাই ; সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে একটি বন্দর ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৮৩-৪ পৃ।

চ্যাণ্ডিকান হইতে দূরে। কিন্তু তাহা কোথায়, বিভারিজ তাহা ঠিক করেন নাই। তবে আমরা এইটুকু পাইলাম যে, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে ধুমঘাট রাজধানী এবং উহাই চ্যাণ্ডিকান। তবে কালে বিক্রম ও প্রতাপের রাজধানী যে পরস্পর মিশিয়া এক হইয়াছিল, তাহা ফক্‌নার প্রভৃতি বৈদেশিক অনুসন্ধিৎসু লেখকও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।[১]

২॥ যাঁহারা বলেন, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল এবং উহার দক্ষিণে ৮।১০ মাইল দূরে প্রতাপ নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, কয়েকটি কারণে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রথমতঃ, তাহা হইলে প্রতাপের নূতন দুর্গদ্বার হইতে অদূরে যশোরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি বাহির হইবার প্রবাদ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণে ৮।১০ মাইল পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়া আবাদ হইয়াছে। উহার অধিকাংশই নকীপুরের ৺হরিচরণ চৌধুরী মহাশয়ের এলেকাধীন। ঐস্থানে তাঁহার হরিনগর কাছারী আছে। তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে ধুমঘাট নদী। কাছারীর উত্তর-পশ্চিমে ঈশ্বরীপুর পর্য্যন্ত সবস্থানই এক্ষণে আবাদ হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানে কোন ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় নাই। ধুমঘাট নদী ও কদমতলীর মোহানা হইতে সিঙ্গুড়তলী, চুণকুড়ি ও ঘজিখালি নদীপথে পশ্চিমমুখে যমুনাতে পড়িতে হয়; এই পথের উত্তরে আবাদ ও দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলে কোন মনুষ্যাবাসের সংবাদ পাই নাই। যমুনা হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে আইবুড়ীর দোয়ানিয়া ও মঠের খাল দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় বটে, কিন্তু তথায় রমজাননগর নামক হাল আবাদে দুই একটি পুকুর, কতকগুলি বেলগাছ এবং সামান্য ইষ্টকাদি ভিন্ন প্রকাণ্ড দুর্গ বা রাজধানীর কোন চিহ্ন নাই। প্রায় ২৫ বৎসর কাল প্রতাপাদিত্যের মত পরাক্রান্ত ভূপতি যেখানে রাজাসন পাতিয়া শাসন করিয়াছিলেন, তাহার নিকট কোন কীর্ত্তি-চিহ্ন নাই, অথচ তাহার বহুদূর দক্ষিণে মালঞ্চ হইতে বহির্গত হরিখালি নদীর পার্শ্বে ভগ্ন ইষ্টকালয় এখনও বর্ত্তমান আছে

১ 'There is certainly much to be said in favour of this (Beveridge's) theory, and it is reasonable to assume the Bikram's headquarters and Pratap's new capital, which were so close to each other, would be amalgammated when Pratapaditya took the reins of government into his own hands'—Faulkner, Leo P., '*Where Pratapaditya Reigned*', Calcutta Review, 1920, p. 183.

এবং তাহারও দক্ষিণে কোন কোন স্থানে ইষ্টক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ১৭৩নং লাটে ইচ্ছামতী ও আড়-পাঙ্গাসিয়ার মধ্যবর্ত্তী আড়াই বাঁকীর দোয়ানিয়ার উত্তরাংশে প্রতাপের একটি নৌসেনা নিবাস ছিল, কিন্তু তথায় দুর্গের কোন পরিচয় নাই। এ সকল দূরে বসিয়া কল্পনা নহে, প্রাণ হাতে করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া চাক্ষুষ প্রমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছি, ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে ২০ মাইলের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল না। তৃতীয়তঃ, ধূমঘাট সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে আছে :

'যশোর-দেশ বিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে।
ধূমঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ং ॥'

অর্থাৎ যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট পত্তন ছিল; সেখানেই প্রতাপা-দিত্যের রাজধানী। কিন্তু ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণে গিয়া আর কোথায়ও যমুনা ও ইচ্ছামতীর প্রত্যক্ষ মিলন হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে প্রতাপের রাজধানী ছিল না।

৩॥ নিখিলনাথ রায় মহোদয় বলেন, প্রতাপের রাজধানী সগরদ্বীপে ছিল।[১] নিজের মত স্থাপন জন্য তিনি প্রধানতঃ দুইটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যশোর ও ধূমঘাট সংলগ্ন স্থান। সুতরাং যশোর হইতে কার্ভালোর হত্যার সংবাদ চ্যাণ্ডিকানে পৌছিতে এক দিনেরও অধিক সময় লাগিতে পারে, অতএব চ্যাণ্ডিকান যশোর হইতে খুব দূরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে এই বলা যায়, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক বা তাঁহার জ্ঞাতসারে কার্ভালোর হত্যা যদি সত্যই হইয়াছিল ধরিয়া লই, তাহা হইলেও সে সংবাদ ধূমঘাটস্থ মিশনরীগণকে না জানাইয়া যতক্ষণ চাপিয়া রাখা যায়, তাহার চেষ্টা হইতে পারে; তজ্জন্য সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হওয়া সম্ভব। নিখিলনাথ সগরদ্বীপকে চ্যাণ্ডিকান ধরিয়া লইয়া বলেন, যশোর হইতে সগর দ্বীপ বহু দূরবর্ত্তী বলিয়া এরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু যত সময় লাগিয়াছিল, এখনও তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে। কিন্তু 'সে সময়ে দ্রুত জলযানযোগে সর্ব্বদা যেরূপ গতায়াত হইত' বলিয়া তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া

১ 'প্রতাপাদিত্য', ১৩৩-৪৫ পৃ।

যায় না।[১] দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার অন্য প্রমাণ এই যে, বিভারিজ প্রভৃতি লেখকগণ কোন ম্যাপে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ না দেখিলেও তিনি ১৯০৫ অব্দে প্রকাশিত সার্ টমাস্ রো'র মানচিত্রে 'Ile de Chandeican' বা চ্যাণ্ডিকান দ্বীপের অবস্থান আছে দেখিয়াছিলেন।[২] এবং রামরাম বসুর গ্রন্থে ও অন্যান্য বহুস্থলে প্রতাপাদিত্যকে সগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে।[৩] প্রতাপাদিত্য যে চ্যাণ্ডিকানের রাজা, তাহা জেসুইট মিশনরীগণের বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে। ইহা হইতে নিখিলনাথের বিচারপ্রণালী এইরূপ দাঁড়াইতেছে: প্রতাপ চ্যাণ্ডিকানের রাজা, প্রতাপ সগরদ্বীপের রাজা, অতএব সগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। তর্কবিজ্ঞানের বিচারে ইহার মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্তবাদ থাকিয়া যাইতে পারে, তাহা হয়ত তিনি লক্ষ্য করেন নাই। বিশেষতঃ সার টমাস রো'র ম্যাপের উপর তিনি অতিরিক্ত নির্ভর করিয়াছেন; সার টমাস ভৌগোলিক নহেন এবং তাঁহার ম্যাপে যে ভাবে চ্যাণ্ডিকান দ্বীপের পূর্ব্বদিকে ঢাকার সন্নিকটে সাতগাঁ নগরীর স্থান দেখান হইয়াছে, তাহাতে সে ম্যাপের কিছুই বিশ্বাস করা চলে না। 'পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চ্যাণ্ডিকান' বলিতেন, এ কথা নিখিলনাথই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।[৪] প্রকৃতপক্ষে সগরদ্বীপ চ্যাণ্ডিকান রাজ্যের একাংশ মাত্র, এবং প্রতাপ চ্যাণ্ডিকানের রাজা হইয়াও সগরদ্বীপের রাজা ছিলেন। তাহা হইলে সগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে না। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর গ্রন্থে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে যে, তখন হুগলী বা গঙ্গানদীর পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রদেশ চ্যাণ্ডিকান বলিয়া বিদিত ছিল; সগরদ্বীপের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার প্রবাহকে চ্যাণ্ডিকান নদী বলা হইত; এমন কি, ১৬০৪ অব্দে হুগলী অঞ্চলকে চ্যাণ্ডিকান প্রদেশ বলিত।[৫] সুতরাং সার টমাস্ রো'র ম্যাপে

১ 'প্রতাপাদিত্য', ১৪৩ পৃ।

২ ১৯০৫ অব্দে 'Glasgow' হইতে Purchas, *'Pilgrimes'* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে এই মানচিত্রকে Sir Thomas Roe's map বলিয়া উল্লিখিত আছে।—'প্রতাপাদিত্য', ১৪০ পৃ।

৩ *List of Ancient Monuments in Bengal*, p. 146; J. A. S. B., Dec. 1868.

৪ Bernmilli, Tean, *Description Historique*, Vol. II part 2, p. 408—as quoted by Nikhil Nath Roy ('প্রতাপাদিত্য', ১৪৩ পৃ)।

৫ 'Before 1596, when earliest edition of Van Linschoten's work was published, the country to the East of the Hugli river was known as the

সগরদ্বীপের চ্যাণ্ডিকান নাম হওয়া বিচিত্র নহে। চ্যাণ্ডিকান নামে একটা রাজ্য ছিল, এবং সে রাজ্যের রাজধানী সগরে ছিল বলিয়া মনে করি না।

এইরূপ মনে করিবার হেতুও আছে; সগরদ্বীপে রাজধানীর মত কোন নিদর্শন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে-দক্ষিণাংশে সমুদ্রতীরে প্রধান সহর ছিল, তাহা এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে গিয়াছে। বাস্তবিকই দ্বীপের কতকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে কপিল মুনির মন্দির ছিল; এখন মন্দির নাই, মূর্ত্তি আছে। প্রতিবৎসর পৌষসংক্রান্তির সময়ে লক্ষ লোকে আসিয়া তাঁহার পূজা করে; সমস্ত বৎসর ভরিয়া ২।১ জন মাত্র লোক সে মূর্তির প্রহরীস্বরূপ থাকে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ প্লাবনে দ্বীপের এই দশা হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে এখানে দুই লক্ষ লোকের বাস ছিল।[১] আমরা এই দ্বীপের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি এবং এই দ্বীপে বা নিকটবর্ত্তীস্থানে কোন প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আছে কিনা বিশেষভাবে তাহার সন্ধান লইয়া আসিয়াছি। যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে দ্বীপের দক্ষিণাংশ সমুদ্রগর্ভে গেলেও খুব বেশীদূর যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহা সত্য কথা। এমন সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানে কেহ রাজধানী স্থাপন করিলে তাহা সমুদ্রসৈকত হইতে একটু দূরে করাই সম্ভব। তাহা হইলে যতটুকু ভাঙ্গিয়াছে, তাহাতেই রাজধানীর চিহ্ন বিলুপ্ত হইত না। এখনও দ্বীপটি ১৬৫ বর্গ মাইল। ইহার কোথায়ও কোন দুর্গ বা বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদের নিদর্শন পাই না। পৌষ সংক্রান্তিতে যেখানে মেলা বসে, তাহার উত্তরাংশে জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকালয়, কয়েক মাইল দূরে উত্তরদিকে বামুনখালি নামক স্থানে একটি মন্দির এবং উত্তরভাগে অর্থাৎ সগরেরই এক অংশ মনসাদ্বীপে মৃত্তিকা নিম্নে ইষ্টক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২] মোট কথা,

country of Chandecan. One of the channels of the Hugli near Saugor Island, if not the Hugli itself, was then called the river of Chandecan. In 1604, the Jesuit Residence at Hugli was designated as situated in the Chandecan district.'—J. A. S. B., 1913, No. 10, p. 441; 1911, p. 16. Cf. Van Linschoten—*Itinerario*, part II, Amsterdam, 1596, Ch. xi.

১ বিশেষ বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৫৭-৬০ পৃ দ্রষ্টব্য।

২ সগরদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বিখ্যাত Light House বা আলোকমঞ্চ আছে। উহার যিনি বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহার নাম Mr. A. J. Manuel, ইনি বিশিষ্ট সজ্জন; আমি তাঁহার নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে তিনি লিখিয়াছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্তিকার নিম্নে একটি সুবর্ণ

এখানে রাজধানী ছিল না; তবে সমুদ্রপথে হিজলীর দিক হইতে কোন শত্রু আসিয়া রাজ্যাক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য প্রতাপাদিত্যের সময়ে এখানে একটি প্রধান নৌবাহিনীর আড্ডা ছিল। সেইজন্য বন্দর বা নৌসেনার নিবাস-গুলি যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কতক ভগ্ন হইয়া সমুদ্রগর্ভে এবং কতক ভীষণ প্লাবনে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিখিলনাথও এ কথা স্বীকার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন: 'প্রতাপাদিত্য ইহাকে নৌ-বাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা তাঁহার রাজধানী যশোর অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের নিকট সুপরিচিত ছিল।'[১] আর এই রাজধানী যশোর বলিতে ধূমঘাটের নূতন রাজধানী বুঝিলে সকল গোলমাল চুকিয়া যাইত এবং অনেককে গতানুগতিকের মত ভুল ধারণা পোষণ করিতে হইত না।[২]

৪ ॥ এক্ষণে আমরা চতুর্থ মতের বিচার করিব। কেহ কেহ বলেন, বিক্রমাদিত্যের রাজধানী তেরকাটি বা তিওরকাটি জঙ্গলে ছিল। এই স্থান এখন সুন্দরবনের ১৬৯ নং লাটের অন্তর্গত এবং ঈশ্বরীপুর হইতে ৭।৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। তেরকাটি গভর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গল (Reserve Forest); উহা এখন বেশ উচ্চ ভূমি; এজন্য শীঘ্র আবাদী বন্দোবস্ত হইবার কথা চলিতেছে। ইহা যে এক সময়ে মনুষ্যের আবাসভূমি ছিল, তাহা অনেকে জানিত; এজন্য ইহার পত্তন ও অধিবাসী সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিয়াছে। তবে ইহা যে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল না, তাহাই আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের প্রথম কারণ এই, গৌড় হইতে গঙ্গাপথে আসিতে গেলে যমুনা দিয়া হাসনাবাদ অঞ্চলে আসাই সহজ; এবং সেখানে বসন্ত রায়ের পত্তন স্থান এখনও

অঙ্গুরীয়ক পাইয়াছিলেন, উহার উপর একটি ছোট মনুষ্য-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে বলিয়া বোধ হয়। পত্রের উপর তিনি অঙ্গুরীয়কটির সুস্পষ্ট ছাপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আলোকমঞ্চের নিকট একস্থান খনন করিতে মাটীর নিম্নে কতকগুলি কূয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; উহার সহিত কোন সময়ের কোন লবণের কারখানার কিছু সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সগরদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চন্দনপীড়ি নামক গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গলে একটি মন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় আছে। টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বুড়বুড়ীর তট নামক আবাদে G Plot এর 2nd Portion এ একটি মন্দির দণ্ডায়মান আছে। উহা প্রাচীন বিশালাক্ষীর মন্দির ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

১ 'প্রতাপাদিত্য', ১৪৪-৫ পৃ।—শি মি

২ Mukherjee, Radha Kumud—*History of Indian Shipping*, p. 216.

বসন্তপুর নামে খ্যাত। তেরকাটিতে আসিবার বেলায় ভৈরব-কপোতাক্ষীর পথে বহু ঘুরিয়া আসিতে হয়, এবং ততদূর না আসিয়াও আবাদী অঞ্চলে প্রথম পত্তন হইতে পারিত। যমুনা ঘুরিয়া তেরকাটি যাইতে হইলে, ধূমঘাট ছাড়িয়া তথায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তেরকাটিতে দুর্গ বা রাজধানীর কোন চিহ্ন নাই। আমরা তিনদিক হইতে তেরকাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি। পূর্ব্বদিকে চুনার নদী হইতে তেরকাটির খালে প্রবেশ করিয়া ৭।৮টি আইট্ বা পুরাতন বাটীর চিহ্ন এবং বহু গ্রাম্য বৃক্ষলতা দেখিয়াছিলাম। পরে নৈহাটির খাল ও নৈহাটির দোয়ানিয়া দিয়া প্রবেশ করিয়া নানা মনুষ্যাবাসের নিদর্শন, ইষ্টক, পুষ্করিণী এবং গাব প্রভৃতি গ্রাম্যতরু দেখিয়াছিলাম। এমন কি, একস্থানে বকুল বৃক্ষ ও দুর্ব্বাক্ষেত্র দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। পশ্চিমদিক হইতেও এইরূপ মালঞ্চ নদী হইতে টাটের খাল দিয়া কলাগাছি নদীতে পড়িলাম; বগিদোয়ানী, কেয়া ও তেরকাটির খাল—কলাগাছিয়া হইতে উঠিয়াছে। উহারই একটির কূলে ভীষণ ঘোষড় বনের মধ্যে কতকগুলি আইট্ পাইলাম। এখানে ভিটা, গাবগাছ ও নানা স্থানে ইট আছে। একজন বলিয়াছিলেন, একটি মস্‌জিদ্ আছে, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও তাহা দেখিতে পাই নাই। কোথায়ও বিস্তীর্ণ দুর্গ, স্থায়ী দেবালয় বা রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ আমাদের নয়ন-পথে পড়ে নাই। ইহা দ্বারা স্থির হয়, তেরকাটিতে প্রাচীন বা নূতন কোন রাজধানী ছিল না।

ধূমঘাটে নূতন রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর সে সহর উত্তরদিকে প্রাচীন যশোহরের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চপদস্থ ধনী বা ভদ্রলোকের বসতি ঈশ্বরীপুরে বা তাহার উত্তর দিকে হইয়াছিল, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর বা ব্যবসায়ী লোকের বসতি একটু দূরে দূরে তেরকাটি অঞ্চলে বা ধূমঘাট নদীর পশ্চিমকূলে হইয়াছিল। তেরকাটি নামটি হইতেও তাহা অনুমিত হয়। তেরকাটি বা তিওরকাটি অর্থাৎ যেখানে তিওর বা মৎস্যজীবিগণ জঙ্গল কাটিয়া বসতি করিয়াছিলেন। উহার মধ্যবর্ত্তী মোড়লখালি, পোদখালি প্রভৃতি খালের কূলেও ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর লোকের বসতি ছিল বলিয়া বোধ হয়; উঁহারা প্রকাণ্ড সহরের লোকের খাদ্যসরঞ্জামাদি সরবরাহ করিতেন। এখনও কলিকাতার উপকণ্ঠে বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও ব্যবসায়ীরা মৎস্য তরকারী প্রভৃতি দ্রব্যজাত লইয়া গিয়া অতি প্রত্যূষ হইতে

সহরের জনতা বৃদ্ধি করেন। সেইরূপ তেরকাটির লোকের যাতায়াতের জন্যও ধুমঘাট পর্য্যন্ত যে সোজা রাস্তা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে, উহার পাশে পাশে অসংখ্য ভিটা এখনও পড়িয়া আছে ; পূর্ব্বে ধুমঘাটের সহিত তেরকাটি সংলগ্ন গ্রাম ছিল, এখন একটি নদী দ্বারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।[১]

৫॥ এতক্ষণ আমরা প্রথম চারিটি মতের খণ্ডন করিয়াছি ; এখন আমরা পঞ্চম মত বা আমাদের নিজ মতের সমর্থন করিব। অন্য মতের নিরসন করাতেই এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ধুমঘাটে বা ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল ; এবং আমরা অনুমান করিয়াছি, এখন যে স্থানকে মুকুন্দপুর বলে, সেখানেই প্রথম বা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল—যশোহর। পরে প্রতাপের ধুমঘাট রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী হইলে, তাহারও নাম হয়—যশোহর। ক্রমে কীর্ত্তিমণ্ডিত এই উভয় রাজধানী পরস্পর মিশিয়া গিয়াছিল এবং আট দশ মাইল লইয়া সমস্ত স্থানটাই যশোহর

১ এ সম্বন্ধে আমি একজন অভিজ্ঞ পদস্থ বৃদ্ধের পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি : 'তেরকাটী জঙ্গলটি চণ্ডীপুর জঙ্গলের লপ্ত ছিল। সুন্দরবনের কমিশনার যখন জমিদারী জঙ্গল ও গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গলের সীমা ঠিক করেন, তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনার রস্ সাহেব চণ্ডীপুর ও তেরকাটির মধ্যবর্ত্তী সীমানা ঠিক করিয়া এক মাটির পিল্‌পা দেন। ঐ সময়ে বংশীপুরের জঙ্গল ইজারাদার শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় কদমতলী নদী হইতে চুনার নদীতে সহজে যাইবার জন্য উপরোক্ত পিল্‌পার পাশ দিয়া লম্বে পনর কাঠা এবং প্রস্থে ৫ হাত একটি খাল কাটান, ঐ খালের বর্ত্তমান নাম 'কাটা দৈইনা' (দোয়ানিয়া)। উহা মুন্সীগঞ্জের হাটখোলার সম্মুখে স্থিত। বর্ত্তমানে ঐ খাল খুব প্রবল হইয়াছে এবং জমিদারী জঙ্গল ও গবর্ণমেণ্টের জঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। চণ্ডীপুর যাহা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাহা মনুষ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যায় ঐ খাল বিস্তীর্ণ হওয়ার প্রধান কারণ অপর পার হইতে কোন বন্য জন্তু আসিয়া চণ্ডীপুর পারের মনুষ্যালয়ের কোন ক্ষতি না করে। ঐ খাল কাটার পূর্ব্বে যখন আমি চণ্ডীপুর আবাদে আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন চণ্ডীপুরের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ যশোহরের দিক হইতে একটি রাস্তা চণ্ডীপুরের উপর দিয়া তেরকাটি অভিমুখে গিয়াছে, অনুমান হইত। ঐ রাস্তার উত্তরাংশে বড় বড় ভিট্টা এবং কোন কোন স্থানে দক্ষিণাংশে বড় বড় ভিট্টা ও পুকুরের চিহ্ন এবং গ্রাম্য গাছ গাছালি থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত পূর্ব্বে ঐ স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমি সর্ব্বদাই বনের দৃশ্য এবং পুরাকালের ভিট্টা-পুকুর গাছগাছালি বনের মধ্যে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতাম। তৎকালে ঐ চণ্ডীপুরে ব্যাঘ্র গণ্ডার নানাবিধ হিংস্র জন্তুর বাস ছিল। অনেকের ধারণা সুন্দরবন জঙ্গলে গণ্ডার থাকিতে প্যারে না। কিন্তু গণ্ডার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।'—শ্রীপুর-নিবাসী কালীপদ বসু মহাশয়ের পত্র।

এই সাধারণ নামে পরিচিত হইল। নতুবা যশোহর নামে কোন চিহ্নিত গ্রাম নাই। যাহা হইক, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ মুকুন্দপুর ও ঈশ্বরীপুরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কীর্ত্তিরাজির বিচার করিয়া আমাদের মত স্থাপন করিব।

মুকুন্দপুরে বিস্তীর্ণ দুর্গ ছিল, তাহা এখনও বেশ বুঝা যায়। উহার তিন পাশের পরিখাতে এখনও প্রায় বারমাস জল থাকে। ইহার নাম মুকুন্দপুর হইল কেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে নামটির কিছু ইতিহাস আছে, মনে হয়। এক্ষণে মুকুন্দপুরের গড়ের মধ্যে জয়রাম রায় ও লক্ষ্মণচন্দ্র রায় ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণের মত সৌহৃদ্যে সুখে বাস করিতেছেন।[১] ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদে। তথায় লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ রামচন্দ্র রায় আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে নদীয়ার রাজার উকীল ছিলেন। তখন ধুলিয়াপুর নদীয়ারাজের প্রধান পরগণা। সেই সূত্রে রামচন্দ্র স্বীয় কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার-স্বরূপ প্রভূত ব্রহ্মোত্তর পাইয়া এই মুকুন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তদবধি এই পাঁচ পুরুষ অর্থাৎ আনুমানিক ১৫০ বৎসর তাঁহারা এখানে বাস করিতেছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের পতনের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে রামচন্দ্র মুকুন্দপুরে আসেন। সেই দীর্ঘকাল প্রাচীন যশোহরের কত কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা কে জানে?

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে দুর্গের অবস্থা কি ছিল, এখন তাহা বলিবার উপায় নাই; তবে এখনও গড়ের মধ্যে প্রায় ১৫০৲ বিঘা জমি আছে ও তাহাতে যেখানে সেখানে ইষ্টক চিহ্ন আছে; সে সব স্থানে রাজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বসন্ত রায় প্রথমতঃ বসন্তপুর হইতে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে করিতে অনতিদূরে মুকুন্দপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। উহার চারিধারে আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত

১ লক্ষ্মণচন্দ্র রায় সাতক্ষীরা ষ্টেটের ম্যানেজার, খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং কৃতী ও মিষ্টভাষী সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়া যশস্বী। ইহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, মুখোপাধ্যায়। রামচন্দ্রের সময় হইতে রায় উপাধি হয়। রামচন্দ্র ফুলিয়ামেলের প্রধান কুলীন কেশব চক্রবর্ত্তীর পৌত্রকে কন্যাদান করিয়া সম্মানিত হন। তিনি মুকুন্দপুরে আসিয়া এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ এবং নন্দদুলাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত, কাঁটালের কাঠে প্রস্তুত সুন্দর পুতুল ও কারুকার্য্য-যুক্ত একখানি রঙ্গমহল ঘর এখনও আছে। বংশাবলী এই: রামচন্দ্র—দুর্গাপ্রসাদ, যদুনাথ ও গৌরীপ্রসাদ; যদুনাথ—বৈদ্যনাথ, শ্রীনাথ ও নন্দকুমার; নন্দকুমার—জয়রাম ও লক্ষ্মণচন্দ্র; জয়রাম—সত্যেন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও নরেন্দ্র; লক্ষ্মণচন্দ্র—শৌরীন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্র।

ও সামাজিকদিগের বসতির ব্যবস্থা হয়। ধলবাড়িয়া, মুকুন্দপুর, দেবনগর ও পরমানন্দকাটি প্রভৃতি গ্রামে অধ্যাপক, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণবর্গের বাস হয়। কালিন্দী তখন ক্ষুদ্র স্রোতমাত্র; তাহার অপর পারে বাঙ্গালপাড়া, বাঁকড়া প্রভৃতি স্থানে রাজজ্ঞাতিগণের বসতি নির্দ্দিষ্ট হয়। নিকটবর্ত্তী পরবাজপুর, বারকপুর[১] প্রভৃতি স্থানে সেনানিবাস ছিল। পাঠান সৈন্যের উপাসনার জন্য পরবাজপুরে যে সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয়, তাহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। বসন্তপুরের অপর পারে দম্‌দমা নামক স্থানে গুলি বারুদ প্রস্তুত হইত।[২] বিক্রমাদিত্যের সময়েই গোপালপুরের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হয়; উহার জলাশয়ের পরিমাণই ৯৯ বিঘা। যশোহর সহরকে কাশীধামের সহিত তুলনা করিতে গিয়া ইহাকেই মণিকর্ণিকা দীর্ঘিকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। ডামরেলীর সমাজমন্দির এই মুকুন্দপুরের সান্নিধ্যে ছিল; অতি অল্পকাল পূর্ব্বে যে উহার জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গৌড়ের যশোহরণকারী সহরের সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য যে সব শিল্পীর সমাগম হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খণ্ডিকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি কতকের বাস এখনও

---

১ বারক শব্দে অশ্ব বুঝায়। অশ্ব রাখিবার স্থান বলিয়া ইহার নাম বারকপুর হইতে পারে। ইংরাজী Barrack (বারাক) শব্দ হইতে যে বাঙ্গালা এক বারিক শব্দ হইয়াছে, তাহাতে সৈন্যাবাস বুঝায়। কিন্তু সে শব্দ যোড়শ শতাব্দীতে এদেশে আসে নাই। ইংরাজ আমলে সুন্দরবনে সৈন্য রাখিয়া সে স্থানের নাম বারাকপুর রাখিবার কথা শুনা যায় নাই। কলিকাতার সন্নিকটে ইংরাজ দিগের একটি সৈন্যাবাস হয় এবং সে স্থানের নামও বারাকপুর বটে। কিন্তু খুল্‌না জেলায় যে কয়েক স্থানে বারকপুর গ্রাম আছে, তাহার সহিত ইংরাজ সৈন্যের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে করি না। সম্ভবতঃ এই সকল স্থান হাতিবেড়, হাতিরডাঙ্গা বা হাতিয়া প্রভৃতি স্থানের মত অশ্বের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

২ দমদমায় গুলি বারুদ প্রস্তুত হইত এবং এখানকার কামানের দমাদম্ শব্দে লোকে ভয় পাইত, এই জন্য ইহার নাম দমদমা। কলিকাতার সন্নিকটে যেরূপ দমদমা ও বারাকপুর বলিয় দুইটি স্থান আছে, বসন্তপুরের সন্নিকটেও দমদমা ও বারকপুর আছে। প্রতাপাদিত্যের কপোতাক্ষ দুর্গের সন্নিকটেও দম্‌দমা এবং গাদিগুমা বলিয়া দুইটি গুলিবারুদের আড্ডা ছিল। সে স্থান এক্ষণে কাশী আবাদ ফরেষ্ট ষ্টেশনের দক্ষিণে ঘোর অরণ্যানীর মধ্যে পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ ইংরাজেরা বাঙ্গালীর সেই পুরাতন দমদমা নাম গ্রহণ করিয়াছেন। নৈহাটির কাছে গঙ্গাতীরে জগদ্দলে প্রতাপের যে দুর্গ ছিল, উহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাবে পুরাতন বারাকপুর ও দমদমা থাকা বিচিত্র নহে। 'The name Dum-Dum is a corruption of Dam-Dama meaning a raised mound or battery' —*Gazetteer, 24-Parganas* (O' Malley), p. 232.

আছে। এই সকল তথ্য একত্র মিলাইয়া দেখিলে সহজে অনুমিত হইবে যে, বিক্রমাদিত্যের রাজধানী মুকুন্দপুরে ছিল।

এই মুকুন্দপুর হইতে ৮।১০ মাইল দক্ষিণে যেখানে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সম্মিলিত প্রবাহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইদিকে গিয়াছে, সেই 'যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে'র দক্ষিণ পারে প্রতাপাদিত্যের ধূমঘাট দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই দুর্গের অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে ৺যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। যেখানে ক্রোশৈক বিস্তৃত যুক্তনদী যমুনা ৪।৫ মাইল সোজা দক্ষিণ মুখে আসিয়া মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেইস্থানে প্রতাপাদিত্যের প্রকাণ্ড বুরুজখানা। উহার মৃত্তিকার ঢিপি এখনও রহিয়াছে, তাহা প্রায় ১০।১২ হাত উচ্চ। ইহার উপর নদীমুখ করিয়া প্রকাণ্ড কামান সজ্জীভূত থাকিত, তাহাতে যখন অনল উদ্গীরিত হইত, তখন নদীবক্ষে বহুদূরেও শত্রু-তরণী তিষ্ঠিতে পারিত না। আর এই প্রধান বুরুজের দুইপার্শ্বে উভয় নদীর কূলে কূলে পূর্ব পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত, মাটীর প্রাচীরের উপর সারি সারি বুরুজ ছিল, প্রত্যেকটির উপর কামান থাকিত। এখনও তাহার অসংখ্য ঢিপি বর্ত্তমান আছে। ইহারই কাছে যেখানে সেখানে মাটীর মধ্যে কামানের গোলা পাওয়া গিয়াছে।

প্রধান বুরুজ হইতে শতাধিক হস্ত দক্ষিণে ধূমঘাট দুর্গের বেষ্টন-পরিখা। উহা দুর্গটির চারিধার ঘিরিয়া আছে; এক একটি নদীর মত প্রশস্ত; এখনও তাহাতে জল থাকে। এই পরিখার বাহিরে কিছুদূরে বাহিরের পরিখা ছিল; উত্তর ও পূর্ব্বদিকে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীদ্বারা এবং অন্য দুইদিকে দুইটি খনিত খাল দ্বারা দুর্গটি বেষ্টিত হইয়াছিল। পশ্চিমের খালটির নাম কামারখালি; উহার কূলে কূলে গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণকারী কামারদিগের বসতি ছিল। দক্ষিণের খালের নাম হাবরের খাল বা হানরখালি। কামারখালি উত্তরদিকে গিয়া যমুনায় এবং হানরখালি পূর্ব্বমুখে গিয়া ইচ্ছামতীতে মিশিয়া ছিল। কামারখালি বেশ প্রশস্ত; তাহা দিয়া পাথর ও লৌহ বোঝাই জাহাজ আসিত। এখনও ঐ খালের কূলে ও দুর্গপ্রাচীরের পার্শ্বে রাস্তার ধারে রাশি রাশি লৌহ-মণ্ডূর বা লোহার গু পাওয়া যায়। পাথরের গোলকের উপর লৌহের আবরণ দিয়া কামানের গোলা হইত।[১]

১ এখনও দুর্গের পার্শ্বে যেখানে সেখানে পাথর পাওয়া যায়। উহা কুড়াইয়া লইয়া কলুগণ ঘানি-গাছের ভার দিবার জন্য ব্যবহার করিতেছে, দেখিয়াছি। করিম কলু গড়ের দক্ষিণ পাড়ে

ভিতরের যে বেষ্টন-পরিখার কথা বলিলাম, তাহারই মধ্যে ছিল মৃণ্ময় দুর্গ। তাহার দীর্ঘায়ত মৃত্তিকা-প্রাচীর কতকাল ধরিয়া ক্ষয়িত হইয়া এখনও পাহাড়ের মত উচ্চ রহিয়াছে এবং উহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কত কত লোকের বসতি হইয়াছে। উহারই মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমির উপর সৈন্যাবাস প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। এই প্রায় সমচতুষ্কোণ ভূমির পরিমাণ ২১৪॥৪ বিঘা, উহার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ প্রত্যেকদিকে ১২।১৩ শত হাত হইবে। এই মৃন্ময় দুর্গের[১] ভিতরেও সম্ভবতঃ প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া ঘুরাইয়া অপ্রশস্ত খাল ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে উহা বাহিরে গিয়া দূরবর্ত্তী কামারখালিতে মিশিয়াছিল। সেই খাল এখনও আছে এবং কামারখালির সহিত উহার মিলনস্থানকে 'শরৎখানার দহ' বলে। আধুনিক সকল দুর্গেই এরূপ পলায়নের গুপ্ত পথ থাকে এবং তাহাকে Water gate বা জলপথ বলে।

প্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পরে সুন্দর বনের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে অকস্মাৎ এই দুর্গ ও রাজধানী অবনমিত হইয়া বহুকাল জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন দুর্গপ্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান অনেককাল ধরিয়া ডুবিয়া থাকে এবং সমস্ত গৃহাদি বিনষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রমে তাহার উপর উচ্চ পাহাড়ের মাটি ধুইয়া পলিস্তর জমিয়া যায় এবং অট্টালিকাদি সমস্ত ভূগর্ভস্থ হয়। সেই মাটীর স্তরে অবশেষে সুন্দরী প্রভৃতি বন্য বৃক্ষ জন্মিয়া ভীষণ অরণ্য হইযা যায়। বহুকাল পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ প্রায় ১৭৫

নিজের বাড়ীর বেড় কাটিবার সময় একপ্রস্ত সুন্দর পাথরের বাসন পাইয়াছিলেন। দরিদ্র লোক, দুর্ভিক্ষের বৎসরে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বংশীপুরের নায়েব নলতা নিবাসী হরিশ্চন্দ্র ঘোষ উহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়া লন। গড়ের দক্ষিণ দিকে রমজান গাজির বাড়ীর পার্শ্বে গর্ত্ত কাটিতে গিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাশি রাশি শঙ্খ বাহির হয়। বাছিয়া উহার ৫।৬ শত বংশীপুরের নায়েব মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় লইয়া যান। উহার ২।৩টি আমিও দৌলতপুরে লইয়া আসিয়াছিলাম। এ সব শঙ্খে উৎকৃষ্ট শাঁখা হইতে পারিত; কিন্তু আমার অনুমান হয়, অট্টালিকার গাথুনির চূণের জন্যই সমুদ্রকূল হইতে ভারে ভারে শঙ্খ আসিত। উত্তর দিকে যমুনার পুরাতন খাতে একস্থানে স্তূপীকৃত পাথরখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। সে সব পাথর গোলা প্রস্তুত করিবার জন্যই আসিয়াছিল।

১ হিন্দু শাস্ত্রে প্রস্তর ও ইষ্টকাদি নির্ম্মিত মহীদুর্গের কথা আছে (মনুসংহিতা, ৭ম-৭০)। কিন্তু নিম্নবঙ্গে প্রস্তরদুর্গ অসম্ভব; ইষ্টকদুর্গ নির্ম্মাণ করাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ এবং কামানের মুখে তাহাও নিরাপদ নহে। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নির্ম্মিত হইলে মৃণ্ময় দুর্গই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল।

বৎসর পরে, যখন উহার নিকটবর্ত্তী স্থান বাসের উপযোগী হইয়া উঠে, তখন দূর স্থান হইতে লোক আসিয়া ধনধান্যের লোভে এই প্রদেশে বাস করে এবং তাহারাই উক্ত দুর্গ মধ্যস্থ জঙ্গল কাটিয়া আবাদ পত্তন করে। চারিপার্শ্বে প্রকাণ্ড মাটীর ঢিপি, এবং মধ্যস্থান নিম্ন দেখিয়া, তাহারা উহাকে প্রাচীন কালের কোন এক প্রকাণ্ড দীঘি বলিয়া অনুমান করে। লোকে শুনিয়াছে, প্রতাপের পর একসময়ে চাঁদ রায় কিছুকাল এই প্রদেশে রাজত্ব করেন; তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত সনন্দ এখনও দেখা যায়। এইজন্য তাহারা উক্ত প্রাচীন দুর্গকে দুর্গ না বলিয়া 'চাঁদরায়ের দীঘি' বলিয়া কীর্ত্তিত করে। এখনও সাধারণ লোকে মধ্যবর্ত্তী স্থানকে 'দীঘির বিল' বলে। কিন্তু প্রাচীন ম্যাপ ও অন্যান্য বিবরণীতে প্রাচীন দুর্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দীঘি নহে। যদি উহা দীঘিই হইত, তাহা হইলে উহার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সুন্দরী বৃক্ষ জন্মিত না। এখনও ২।১ হাত মাটীর নিম্নে সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া যায়। জলাশয় হইলে তাহার গর্ভে জোব মাটি জমিত; প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা তুলিতে পারিত না এবং উহার মধ্যেও পাহাড়ের মাটীর মত সুন্দর রক্তাভ মাটী হইত না। পাহাড়ের উপর ও পার্শ্বে খুঁড়িলে যেখানে সেখানে ইষ্টকরাশি বাহির হইত না।[২]

দুর্গের পূর্ব্বদিকে পরিখার বাহিরে একটি স্থানকে এখনও রাজবাড়ী বলে। ঐ স্থানে কয়েকটি পুকুর ও স্থানে স্থানে যথেষ্ট ইষ্টক পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এইস্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল এবং তাহা পূর্ব্বমুখী করিয়া নির্ম্মিত হয়। রাজবাটীর সিংহদ্বার হইতে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি রাস্তা দক্ষিণমুখে গিয়া ৺যশোরেশ্বরী বাড়ীর সদর দরজায় মিশিয়াছে। রাস্তাটি এখনও আছে। সেই রাস্তার অপর পারে ঠিক রাজবাটীর সম্মুখে বারদুয়ারী গৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। ইহা অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত সুদৃঢ় অট্টালিকা ছিল।

১ এই 'দীঘির বিলের' জমি খুব উর্ব্বরা এবং তাহাতে বেশ ভাল সুপুষ্ট ধান্য হয়। সে ধানে চিটা হয় না। ঐ জমি আড়াই বা তিন টাকা বিঘায় জমা বিলি হয়। এখনও দীঘির বিলের ধানের একটা খ্যাতি আছে; লোকে যত্ন করিয়া বেশী মূল্যে সে ধান খরিদ করিতে ভালবাসে।

২ কত শত ইষ্টকগৃহ যে ইহার মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সারনাথ, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে খনন কার্য্য দ্বারা যেরূপ বিস্ময়কর সৌধমালা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ কতকগুলি ইষ্টকগৃহ পাওয়া যাইতে পারে।

মোগলদিগের ভাষায় ইহাই প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী-আম বা সাধারণ দরবার গৃহ।[১] কথিত আছে, প্রতাপ এই পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ গৃহে দক্ষিণমুখী হইয়া দরবারে বসিলে মায়ের মন্দিরের সদর দ্বার দেখিতে পাইতেন, এখনও তাহা দেখা যায়। বারদ্বারীর সম্মুখে পদ্মপুকুর। উহারই দক্ষিণে আসিয়া যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দির। উহা একটি চকমিলান বাড়ী। উত্তরদিকে সদর দ্বার, তাহার দুই পার্শ্বে সারি সারি কয়েকটি ঘর। পূর্ব্ব পোতায় মন্দির এবং মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে পশ্চিম পোতায় তাহার একটি তোরণ এবং উহার দুই পার্শ্বে ও দ্বিতলে কয়েকটি বাসের গৃহ। দক্ষিণেও সারি সারি পাকা ঘর। মধ্যস্থলে আধুনিক নাটমন্দির, পূর্ব্বে কি ছিল জানা যায় না। মায়ের বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটি সদর পুষ্করিণী এবং পূর্ব্বদিকে খর্পরপুকুর ও উত্তর-পূর্ব্ব অর্থাৎ ঈশান কোণে চণ্ডভৈরব মহাদেবের ত্রিকোণ মন্দির। মায়ের বাড়ী ত্যাগ করিয়া আরও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে একটি প্রাচীন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে লোকে সাধারণতঃ হাবসিখানা বলে। ইহা অতি সুন্দর শক্ত ইমারত ছিল, এখন অনেকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উহার মধ্যে একপার্শ্বে একটি কূপ দেখিয়া লোকে বলিত, এই স্থানে কয়েদীদিগকে হাজতে বা বন্দী করিয়া রাখা হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি স্নানাগার মাত্র; কূপ হইতে জল তুলিয়া নলসংযোগে উহা গৃহান্তরে নীত হইত এবং সেখানে সম্ভবতঃ গরম ও ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলের ব্যবস্থা হইত; কোন উচ্চপদস্থ আমীর তথায় উন্মুক্তদেহে দ্বারবদ্ধ ঘরে স্নান করিতে পারিতেন।[২] পার্শ্বে সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ আছে এবং দ্বিতলেও থাকিবার ঘর ছিল, তাহা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ

১ বারদ্বারী শব্দের অর্থ বার বা দ্বাদশটি দ্বারযুক্ত গৃহ নহে। 'What was once a large building with 12 entrance gates (baradwari)'—*List of ancient Monuments*, p. 146. বস্তুতঃ 'বার' শব্দ 'দরবার' শব্দের সংক্ষিপ্ত অংশ, ইহার অর্থ সভা। বারদ্বারী বলিতে প্রকাশ্য সভাগৃহই বুঝায়, উহাতে দ্বাদশটি দ্বার থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

২ 'It was more probably a Hummamkhana or bathing place of some Nawab with a well in the building for the supply of water'—*List of ancient Monuments*, p. 146. কিন্তু গত ২৪।১১।২০ তারিখের কলিকাতা গেজেটে (২১৮৬ পৃ) ইহাকে হামামখানা বা হাবসিখানা না বলিয়া Hofiz khan's বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্য এই গৃহটি অভ্যাগত আমীর ওমারহগণের অভ্যর্থনার জন্য নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার পতনের পর মোগল ফৌজদারের ধূমঘাটে অবস্থানের সময় তিনি এই গৃহেই বাস করিতেন।[১] দুর্গের পাঁচ মাইল উত্তরে জাহাজঘাটায় এবং মোগল ফৌজদারের পরবর্ত্তী শাসনকেন্দ্র ত্রিমোহানীতে এইরূপ হামামখানা সম্বলিত বাসগৃহ আছে। যথাস্থানে উহার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি 'প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার' আইন অনুসারে ঈশ্বরীপুরের হামামখানা গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংস্কৃত ও রক্ষিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

হামামখানা ছাড়িয়া আর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে এক প্রকাণ্ড পুরাতন মস্‌জিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে উহাকে টেঙ্গা মস্‌জিদ্ বলা হইয়াছে;[২] 'টেঙ্গা' নামের উৎপত্তির কোন কারণ জানা যায় না। ইহা যে প্রতাপাদিত্যের নূতন রাজধানীতে অবস্থিত মুসলমান সৈন্য ও রাজকর্ম্মচারিগণের উপাসনা-গৃহ বলিয়া নির্ম্মিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পুরাতন রাজধানীর পার্শ্বে যেমন পরবাজপুরের সুন্দর মস্‌জিদ্, তেমনি ধূমঘাটের নূতন রাজধানীতে এই পঞ্চগুম্বজযুক্ত প্রকাণ্ড উপাসনালয়। মস্‌জিদ্‌টি এক শ্রেণীতে পাঁচটি ঘরে বিভক্ত, প্রত্যেক ঘরের উপর একটি গুম্বজ। মস্‌জিদের বাহিরের পরিমাণ ১৩৬′×৩৩′, মধ্যস্থলের ঘরটির ভিতরের মাপ ২০′–৯″× ২০′–৯″ এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্য চারিটির প্রত্যেকটি ১৮′–৭″×১৮′–৭″ ইঞ্চি। মেজে হইতে গুম্বজের উচ্চতা ৩৮′। মস্‌জিদটি অন্ততঃ পাঁচ ছয় ফুট বসিয়া গিয়াছে; কারণ, উহার মেজে প্রথম সময়ে যদি মাটী হইতে ৩′ ফুট উচ্চ ধরা যায়, তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে, সেই মেজেই তিন ফুট মাটীর নিম্নে বসিয়া গিয়াছে। মধ্য ঘরের দরজার খিলান ৭′–৩″ প্রশস্ত এবং অন্য ঘরগুলির দরজার খিলান ৬′–৩″ প্রশস্ত। ভিত্তি সর্ব্বত্রই ৭′ ফুট। বাগেরহাটে খাঁ জাহান আলির সমাধিমন্দিরাদি ব্যতীত এরূপ শক্ত মস্‌জিদ্ এ প্রদেশে বড়

১ আমরা 'বহারিস্তান' হইতে জানিতে পারি, পুরীর অধীশ্বর কতলু খাঁর পুত্র জামাল খাঁ প্রতাপাদিত্যের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। এইরূপ সম্মানিত বংশীয় ব্যক্তিগণ সময় সময় এই গৃহে বাস করিতেন।—'প্রবাসী', কার্ত্তিক, ১৩২৭, ৩ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—শি মি]

২ *List of ancient Monuments*, p. 146; Hunter, *Statistical Accounts, 24-Pergunnahs*, p. 118.

কম দেখিতে পাওয়া যায়। মস্‌জিদের পূর্ব্বদিকে তিনদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি চত্বর ছিল এবং মস্‌জিদের দরজা হইতে পূর্ব্বদিকের সদর ফটক ৮৬´ ফুট দূরবর্ত্তী ছিল। এই চত্বরের উত্তর গায়ে সারি সারি কয়েকটি সমাধি ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি 'বার ওমরার কবর' বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে, এক সময়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যে বারজন মোগল ওমরাহ প্রেরিত হন, তাঁহাদের সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, প্রতাপের সুব্যবস্থায় তাঁহাদের মৃতদেহ এই স্থানে আনিয়া কবর দেওয়া হয়। ইহা একপক্ষে যেমন হিন্দুবীরের বিজয়স্তম্ভ, অন্যপক্ষে মৃতশরীরের প্রতি তাঁহার সদন্তঃকরণের পরিচায়ক।

টেঙ্গা মস্‌জিদের উত্তরাংশে আর একটি অষ্টকোণ গুম্বজওয়ালা ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ এক্ষণে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কোটরস্থ আছে। হিন্দুরা বলেন উহা লক্ষ্মীদেবীর মন্দির এবং মুসলমান মৌলবীদিগের মতে উহা 'বিবির আস্তান' অর্থাৎ মুসলমান রমণীগণের নেমাজ করিবার ঘর। এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; প্রধান প্রধান জুম্মামস্‌জিদের একাংশে স্ত্রীলোকদিগের নেমাজের ব্যবস্থা দিল্লী আগ্রায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের জনবহুল যশোহর নগরীতে রমণীবর্গের জন্য এইরূপ রাজোচিত বিশেষ ব্যবস্থা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই প্রশংসনীয়।

যশোহরের জুম্মামস্‌জিদ্ হইতে উত্তরদিকে বহুদূর অগ্রসর হইলে, ইছামতীর কূলে খৃষ্টানদিগের জন্য গীর্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল; সে গীর্জ্জার ভগ্নাবশেষ ও সংশ্লিষ্ট কবরখানা এখনও আছে। সে গীর্জ্জা চ্যাণ্ডিকানেই ছিল বলিয়া বিবরণ আছে।[১] সুতরাং ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে অর্থাৎ যশোহরেই চ্যাণ্ডিকান; অর্থাৎ যশোহর ও চ্যাণ্ডিকান অভিন্ন এবং এই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের লোকবিশ্রুত রাজধানী।

আর একটি কথা বলা হইলেই আমাদের এ প্রসঙ্গ শেষ হয়। 'বহারিস্তান' হইতে জানিতে পারিতেছি, প্রতাপের শেষ পরাজয়ের প্রাক্কালে মোগল

১ ইহাই বঙ্গদেশের প্রথম খৃষ্টীয় গীর্জ্জা ('la premiere Eglise')।—Du Jarric, Peirre, '*Histoire...des Indes Orientales*', Chapitre XXX; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৪২১ ও ৪৪৮ পৃ, Beveridge, *Bakarganj*, p. 176. এই গীর্জ্জা নির্ম্মাণের বিশেষ বিবরণ পরে দিব।

সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ এবং মীর্জ্জা সহন[১] যখন প্রতাপের অনলবর্ষী কামানের মুখে অতি কষ্টে যমুনা ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল পার হইয়া পূর্ব্বদিকে ইছামতীতে প্রবেশ করেন, তখন ইনায়েৎ কাগরঘাট নামক স্থানে আসিয়া বাম পারে ছাউনি করেন এবং মীর্জ্জা বীরবিক্রমে নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিক হইতে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেন।[২] এই কাগরঘাটই খাগড়াঘাট; উহা এখনও ইচ্ছামতীর পরপারে বর্ত্তমান আছে। খাগড়াঘাট গ্রামের পশ্চিমার্দ্ধ ৺মাতা যশোরেশ্বরী দেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি, এখনও উহার আয় মাতার সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং খাগড়াঘাটের অবস্থান হইতেও প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। আশা করি, এই বিস্তৃত আলোচনার পর প্রতাপের রাজধানী সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না।

১ নূতন পাঠোদ্ধারে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার 'সহন' স্থলে 'নথন্' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন— 'শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫।—শি মি

২ প্রবাসী, ১৩২৭, কার্ত্তিক, ৬ পৃ; [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—শি মি]; Rennel's map No. 1—'Cogregot'; ইহাই খাগড়াঘাট। এই স্থান তালা-খাজরা পরগণার একটি ছিটমহল। খাগড়াঘাটার পূর্ব্বার্দ্ধ এক্ষণে সাতক্ষীরার স্বনামখ্যাত জমিদার মহাশয়দের এলেকাধীন। যেখানে ইনায়েৎ খাঁর ছাউনি হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে নিম্নভূমি, ধানের ক্ষেত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপের আয়োজন

প্রতাপাদিত্যের নূতন রাজধানী কোথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ৺যশোরেশ্বরী দেবী যেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেখানেই আছেন; সেই ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে প্রতাপের ধূমঘাট দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ গঠিত হইল। তখন পুনরায় বসন্ত রায়ের উদ্যোগে মহাসমারোহে সেই নূতন রাজধানীতে প্রতাপাদিত্যের অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। রাজধানীর কিন্তু নামের পরিবর্ত্তন হইল না; তাহা পূর্ব্ববৎ যশোহর নামেই অভিহিত হইত। রাজ্যাভিষেকের সময়ে এবারও অনেক ভুঞা রাজা যশোহরে আসিলেন; আত্মবল ও দেশরক্ষার অনেক কল্পনা স্থিরীকৃত হইয়া গেল। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র; নতুবা তৎসম্বন্ধীয় কোন বিশ্বাসযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ পাইবার উপায় নাই।

রাজ্যলাভের সঙ্গে প্রতাপের আনন্দলাভ হইয়াছে; রাজ্যের অপরিমিত কর্ম্মভার পাইয়া তাঁহার দৃপ্ত চিত্ত শান্ত হইয়াছে; দুর্গম প্রদেশে দুর্ভেদ্য দুর্গ তুলিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া তাঁহার অপরিমিত সাহস ও বীরপ্রতিভা জাগিয়াছে; আর দৈবানুগ্রহে যশোরেশ্বরী দেবীর বিকাশে তাঁহার মনে দৃঢ় বল ও অপরিমিত আশার সঞ্চার হইয়াছে। এইভাবে তৃপ্তি, বল ও আশার সংমিশ্রণফলে তিনি ভবিষ্যতের জন্য এক বিরাট কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নূতন রাজ্যের নূতন প্রজাদ্বারা যদি কিছু করিতে হয়, তাহার সকল আয়োজন নিজেরই করা প্রয়োজন; তাঁহাকে আগাগোড়া সবই নিজেই গড়িয়া লইতে হইবে। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য রাজ্য পত্তন করিয়াছেন মাত্র, সে ভিত্তির উপর গঠন কার্য্য কিছুই হয় নাই। কোন কিছু গঠন বা সংগঠনের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য গুছাইয়া লইলেন।

তিনি বাদশাহ আকবরকে দেখিয়াছেন, আগ্রার রাজদরবার ও রাজনীতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন; আর দেখিয়াছেন রাজপরিবারে আত্মকলহ, শিবিরে ষড়যন্ত্র এবং পাঠানের পুনরুত্থান চেষ্টা। সে চেষ্টার স্রোত যে রাজধানী প্লাবিত করে নাই, তাহা নহে। তবে বাদশাহের গুণগ্রাহিতা কতিপয় হিন্দু বীরের মর্য্যাদার সমাদর করিয়া মোগল সিংহাসন দৃঢ় করিয়াছিল।

হিন্দু লবণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে এবং সেই জন্য বাদশাহের নিমিত্ত দেহের রক্ত জলের মত ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল।[১] যে হিন্দু মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া শিষ্টভাবে মোগলের সেবা করিতে পারিত, হিন্দু বীর্য্যের উন্মেষ দেখিলে সে হিন্দু যে সহজেই সেই দিকে যোগ দিতে পারে, প্রতাপের তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না।

পাঠানরাজত্ব গিয়াছে, কিন্তু পাঠান শক্তি যায় নাই। বাহিরের স্রোত এখন অন্তঃসলিল হইয়া বহিতেছে। মোগল রাজতক্ত কাড়িয়া লইলেও সমগ্র বঙ্গে কখনও সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। যেখানে মোগলের অত্যাচার, যেখানে মোগলের প্রতি অসন্তোষ বা যেখানে মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিবে, সেখানেই পাঠানেরা শত্রুপক্ষের দলবৃদ্ধি করিবে। সুতরাং হিন্দুস্বাধীনতার জন্য সুকৌশলে চেষ্টা করিতে পারিলেই হিন্দু ও পাঠান উভয় বলের সাহায্য অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িবে। সুযোগ বুঝিয়া কার্য্য করাই এক্ষণে কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রতাপ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তিনি নানাভাবে সৈন্য গঠন ও সীমান্ত রক্ষা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কয়েকটি প্রধান কারণে তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

প্রথমতঃ, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাধান্য স্থাপন তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। এ উদ্দেশ্য ছোট বড় সকলেরই থাকে, তাঁহারও ছিল। সে অরাজকতার যুগে সবলে দাঁড়াইতে না পারিলে, পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দাঁড়াইতে হইলেই যুদ্ধবল চাই। তেমন দাঁড়াইতে অনেকেই চাহিয়াছিল; ভুঞারাজগণ সকলেই নিজের গণ্ডীতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সকলেরই একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুতরাং প্রতাপাদিত্যের আত্মপ্রাধান্যের চেষ্টা স্বার্থমূলক বা ঘৃণাজনক হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাঁহার মত বীরপুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক বা নিতান্ত অগৌরবের বিষয় ছিল না। প্রতাপের

১ বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজত্বের সৈনিকবিভাগ এখনও প্রকৃষ্টভাবে এই গুপ্তরহস্য বুঝিতে পারেন নাই। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব একস্থলে রাজা টোডরমল্ল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

'This valiant soldier whose history exhibits the support which Mahomedan Emperors derived from Hindu valour and suggests the loss which the Anglo-Indian army sustains for not availng itself of native officers of rank &c'—Hunter, W. W., *Orissa*, 1872. Vol. 11, p. 15.

উত্থান চেষ্টা প্রারম্ভকালে ব্যক্তিগত বা প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ফল বহুদূর গড়াইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠানের পক্ষসমর্থনের জন্য প্রতাপ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একটি ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে এই কার্য্যে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। পাঠান-রাজের কৃপাবলেই তাঁহারা প্রথম যশোররাজ্য প্রাপ্ত হন। পাঠানের ধনবলই যশোরের সমৃদ্ধির ভিত্তি। মোগলের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালন জন্য যে সমস্ত ধন-সম্পত্তি ন্যাস-স্বরূপ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা মোগলের চরণে উপঢৌকন দেওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কার্য্য। যে কার্য্যের জন্য দায়ুদের জীবন গিয়াছে, যে সাধনায় পাঠানেরা ছিন্ন ভিন্ন উৎসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেই কার্য্যের জন্য যিনি উদ্যোগী হইবেন, তিনিই দায়ুদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। পাঠান ভূপতির রক্তসম্পর্কিত ওসমান উড়িষ্যা অঞ্চলে যে পাঠান শক্তির উদ্বোধনের জন্য আমরণ চেষ্টিত ছিলেন, প্রতাপাদিত্য আপনাকে বঙ্গদেশে পাঠানের উত্তরাধিকারী কল্পনা করিয়া, সেই পাঠান প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে উদ্যোগী হইলেন। মিথ্যা কথা বলিয়া এবং সামন্তরাজ হইবার অঙ্গীকার করিয়া আকবর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করা প্রতাপের একটি যৌবনসুলভ চাপল্যের ফল; সে দুরভিসন্ধি তাঁহার চরিত্রানুগত নহে এবং তদ্দ্বারা তাহার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্কই আরোপিত হইয়াছে।

পাঠানেরা যখন প্রথম বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, তখন তাহারা বিদেশীয় এবং শত্রুর মত বিবেচিত হইত। শেষে পাঠানেরা এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিল; বঙ্গের অন্ন, বঙ্গের পণ্য, বঙ্গের সুখদুঃখ সকলই তাহারা আপন করিয়া লইল। তখন পাঠানে হিন্দুতে গলাগলি, কোলাকুলি বন্ধুত্ব হইল। হিন্দু পাঠান হইল, পাঠান হিন্দুর মতে মিশিতে লাগিল। তৎপরে আসিল—মোগল। পশ্চিমাঞ্চলকে অসিমুখে ও অগ্নিমুখে দিতে দিতে যখন মোগল আসিল, তখন হিন্দুর নিকট মোগল হইল শত্রু, আর পাঠান হইল আপন জন। হিন্দুরা এ ভাব পোষণ করিতে করিতে, যখন ত্বরিতে মোগলের হাতে পাঠান হারিল এবং অবশেষে তাড়িত হইয়া দেশ ছাড়িল, তখন দেশ মধ্যে একটা তীব্র কল্পনা ইহাই জাগিল, কেমন করিয়া মোগল শত্রুর ধ্বংস করিয়া দেশকে পুনর্ব্বার পাঠান শাসনতলে স্থাপন করা যায়। তাই প্রতাপ পাঠান সৈন্য ও পাঠান সেনানীর সহায়তা পাইয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশে হিন্দুশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রতাপ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইতে পারে, পাঠানের সমর্থন তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সামর্থ্যের সফলতা দেখিয়া অবশেষে জাতীয় গৌরবের জন্য প্রাণপাত করিবার কল্পনা তাঁহাকে যে অমানুষিক কার্য্যে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠানের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু আত্মকলহের জন্য যদি পাঠানের দিন শেষ হইয়া থাকে,[১] পাঠান যদি কিছুতেই আর না জাগে, তবে হিন্দুশক্তি জাগাইতে হইবে, মোগলকে কিছুতেই উঠিতে দেওয়া হইবে না, ইহাই প্রতাপের প্রতিজ্ঞা হইল। বঙ্গদেশ তখন হিন্দুর দেশ; সকল দেশের সকল জাতিরই নিজের দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার অধিকার আছে। হিন্দুরা পাঠান শাসনকালে প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া সে স্বাধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিলেও, আবার যদি মোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালে সুযোগ বুঝিয়া তাহারা স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা করে, তাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রতাপাদিত্য তাঁহার স্বজাতীয় হিন্দুর এই চিরন্তন অধিকার লাভের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সমগ্র দেশ যদি জাগিত, তবে প্রতাপের প্রতিজ্ঞাও থাকিত। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা শেষকালে সফল হয় নাই বলিয়া আমরা মূলে তাহার উদ্দেশ্যেরই সন্দেহ করি। প্রকৃতপক্ষে সময় তখন আসে নাই, দেশ তখন জাগে নাই; একজন বা দশজন জাগিলেই দেশ জাগে না। তখনও ঘরে ঘরে আত্মকলহ চলিতেছিল, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে দেশ ডুবিয়া ছিল; সমাজ ও সংস্কারের মোহমন্ত্রে দেশের বা দশের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। একাকী প্রতাপ বা ভুঞারাজগণ তাহার কি করিবেন? প্রতাপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অসময়ে চেষ্টা করিতে গিয়া কত ভুল করিয়াছিলেন, কত নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া, তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার কথা আমরা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাঁহার আয়োজনের

১ Sher-Khan once said: 'I will very shortly expel the Mughals from Hind, for the Mughals are not superior to the Afghans in battle or single combat, but the Afghans have let the empire of Hind slip from their hands on account of their internal dissensions'.—*Twarikh-i-Sher Shahi*, (Elliot & Dowson), Vol. IV, p. 330.

যদি পরিচয় দেওয়া যায়, তবে আশা করি, তাঁহার দেশসেবার বার্ত্তা একেবারে মুছিয়া যাইবে না।

চতুর্থতঃ, সকল উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গেলেও আমরা প্রতাপাদিত্যের একটা চেষ্টার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না; তিনি একদিকে যেমন মোগলের অত্যাচার, অন্য দিকে তেমনই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদিগের পাশবিক অত্যাচার হইতে দেশবাসীদিগকে শান্তি দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোগলের সহিত তাঁহার পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল; তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ হইতে উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই আরাকাণী মগ ও পাশ্চাত্য পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গি দস্যুগণের ভীষণ আক্রমণে দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থান সম্পূর্ণ মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল; তাঁহার রাজত্ব-কালে এই উভয় দস্যুদলের প্রবল প্রতাপ আরও বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছিল। এজন্য নানাস্থানে দুর্গ সংস্থান ও উপযুক্ত নৌবাহিনী সংগ্রহ করিয়া তিনি এই দস্যুদিগকে দমন করিয়াছিলেন। সে অত্যাচারের বিবরণ না জানিলে, প্রতাপের কার্য্যের গুরুত্ব ও তাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এজন্য আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সেই অত্যাচার কাহিনী বলিব।

এক দিক হইতে বাদশাহী মোগল সৈন্য ও অন্যদিক হইতে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদল, উভয়ের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা ও আত্মরক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; বিশৃঙ্খল দস্যুদলকেও নিবৃত্ত বা নিগৃহীত করা যায়, কিন্তু সুশিক্ষিত মোগলকে বিধ্বস্ত করা অতি দুরূহ কার্য্য। মোগলের গুণগ্রাহিতা লোক বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মভার দিয়াছিল; আকবরের সমদর্শিতা বহু লোককে বশীভূত করিয়াছিল। সে শান্তনীতির বলে অনেকেই মোহিত হইল। পাঠান আত্মবিক্রয় করিল; হিন্দু জাতি দিয়া দাসত্ব করিতে লাগিল। সুতরাং মোগলেরা দেশীয়দিগের বাহু ও মস্তিষ্কের বলে বলবান হইয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল। এ দুরন্ত শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে হইলে যথেষ্ট সতর্কতা আবশ্যক। প্রতাপাদিত্য মোগল দরবারে বাস করিবার সময় এ সকল বিষয় বিশেষভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি জানিয়াছেন, মোগলের অশ্বারোহী যেমন সুপটু, পদাতিক তেমন নহে। মোগল স্থলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে। মোগলের অন্য প্রকার সাজ সরঞ্জাম যথেষ্ট থাকিলেও নৌকা বা জাহাজের তেমন সংস্থান নাই; যাহা কিছু ছিল, তাহাও প্রধানতঃ বঙ্গদেশের জন্য এবং উহা বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত।

এখনও মোগলদিগের কামান বন্দুকের পর্য্যাপ্ত সংগ্রহ বা ব্যবহারপটুতা হয় নাই। মোগলেরা পাহাড় পর্ব্বতে ও মরুকল্প শুষ্কদেশে যেমন অভ্যস্ত, সিক্তবাত বা কর্দ্দমাক্ত বঙ্গদেশে তাহারা সেরূপভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না। মোগলের সাজসরঞ্জাম এত অধিক এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার যে, অতিদূরবর্ত্তী বঙ্গের এক কোণে আসিয়া নদীবহুল ও জঙ্গলাকীর্ণ দেশের সহিত যুদ্ধ করা তাহাদের পক্ষে বড় দুঃসাহসিক সংকল্প। এই সকল তথ্যের প্রতি বিশিষ্টভাবে লক্ষ্য রাখিয়া, প্রতাপ সুকৌশলে নিজের দুর্গ নির্ম্মাণ, সৈন্যগঠন ও নৌবাহিনী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমরা অগ্রে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারের কথা বলিয়া, পরে মোগলের সহিত তাঁহার যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিব।

অ ষ্টা দ শ প রি চ্ছে দ

মগ ও ফিরিঙ্গি

আমরা যে মগ ও ফিরিঙ্গির কথা বলিয়াছি, তাহাদের অত্যাচার কাহিনী শুনিবার পূর্ব্বে তাহাদের পরিচয় জানা আবশ্যক। অগ্রে মগের কথা বলিতেছি। মগেরা আসিত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকাণ হইতে। আরাকাণ বর্ত্তমান চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। একটি পর্ব্বতমালা এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা জুড়িয়া বসিয়া ইহাকে সমগ্র ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক্ করিয়াছে; আর পশ্চিমসীমার সর্ব্বত্রই বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালায় প্রতিহত। এই উভয় সীমার মধ্যে থাকিয়া রাজ্যখণ্ডের উত্তরদিকের বিস্তৃতি ৫০ মাইলের অধিক হইবে না, এবং ক্রমে সরু হইয়া দক্ষিণ দিকে কোন কোন স্থানের প্রস্থ ১৫ মাইল মাত্র। পশ্চিম দিক হইতে সমুদ্রই নদীর নামে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; অধিবাসীরা একপ্রকার সমুদ্রমধ্যেই বাস করে, সমুদ্রবক্ষে খেলা করে, তাহারা নাববিদ্যায় দক্ষ। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই দুর্গম; সমুদ্রের কূলে কূলে কতকগুলি দুর্গ আছে এবং সমুদ্রমধ্যেও অনেকগুলি দ্বীপ ইহাদের রাজ্যভুক্ত এবং সুরক্ষিত; পরদেশীর পক্ষে এ রাজ্য জয় করা বড় কঠিন। এইজন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ক্ষুদ্রজাতি তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। রামাবতী তাহাদের রাজধানী ছিল, উহার বর্ত্তমান নাম সান্দোবয় (Sandoway)। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আরাকাণ রাজ্য ব্রহ্মবাসীরা অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতেই, ব্রহ্মযুদ্ধের পর উহা ইংরাজাধিকৃত হইয়াছে (১৮২৬)। এখন আরাকাণ নিম্ন ব্রহ্মের একটি বিভাগ এবং আকিয়াব উহার প্রধান নগরী। বাণিজ্য বা রণসজ্জায় আরাকাণীরা উত্তরে চট্টগ্রামে আসিত এবং সেখান হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে আসিবার পথে সন্দ্বীপ তাহাদের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ব্রহ্মবাসীর মত আরাকাণীদিগকেও সাধারণতঃ মগ বলে এবং ধর্ম্মের হিসাবে তাহারা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সে উদার মতের কোন নীতি তাহারা অনুসরণ করিত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, হিংসা ও দস্যুতাই একসময়ে তাহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম

ভারত হইতে পর্টুগীজগণ আসিয়া আরাকাণ ও নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে সমুদ্রতীরে বাস করে। প্রথমতঃ মগেরা এই বিদেশীকে বন্ধুভাবে লুফিয়া লইয়াছিল; কারণ তাহারা উৎকৃষ্ট নাবিক এবং দস্যু ব্যবসায়ের উপযুক্ত সহচর। বিশেষতঃ, বঙ্গে আসিয়া দস্যুতা করার জন্য বঙ্গের শাসক, পাঠান বা মোগল সকলেই মগের প্রতি বিরূপ ছিলেন; মগেরাও উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বিশেষ সাহায্য পাইবে বলিয়া পর্টুগীজদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু সমব্যবসায়ীর সদ্ভাব বেশীদিন থাকে না; সুতরাং মগ ও পর্টুগীজের মধ্যে কখনও মিত্রতা, কখনও সংঘর্ষ হইত। উহার ফলে অনেক সময় বঙ্গের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। সেই কথাই আমরা বলিতেছি; কিন্তু অগ্রে দেখিব, এই পর্টুগীজগণ কোথা হইতে আসিল এবং কেমন করিয়া তাহারা ফিরিঙ্গি নাম পাইয়াছিল।

পর্টুগাল ইয়োরোপের একটি প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্ররাজ্য। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীতে নৌসাধনে অনেক নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্য অনেক বড় দেশের চক্ষু ফুটাইয়াছিল। পর্টুগীজ নরপতি মানুয়েলের রাজত্ব কালে ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসেন। অনেককাল হইতে ইয়োরোপের লোকেরা স্বর্ণভূমি ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল; পর্টুগীজ গামা সে পথ বাহির করিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। শুধু পথ দেখান নহে, পর্টুগীজরা বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার এই উভয় কল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে তাহারা পশ্চিম ভারতে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পত্তন করিল; অল্প কাল মধ্যে গোয়া নগরীতে দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করিয়া নানাস্থানের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিল। গামা বঙ্গদেশে না আসিলেও তাহার কথা জানিতেন এবং তৎসম্বন্ধে লিখিয়া যান। বঙ্গকে তখন ভারতের ভূ-স্বর্গ ('Paradise of India') বলা হইত। মোগলদিগের সনন্দাদিতে ঐ নামেই বঙ্গদেশের পরিচয় ছিল।[১]

একে বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ, তাহাতে আবার উহার দক্ষিণাংশ গভীর

১ Hill, S. C., *Bengal in 1756-57*, Vol III, p. 160; Campos, *Portuguese in India*, p. 19, note.

জঙ্গলাকীর্ণ। এদেশে অসংখ্য নদীর জলে ক্ষেতে ক্ষেতে সোণা ফলে; নদীর কূলে দুর্গম প্রদেশে স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়।[১] নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা থাকিলেও যাহারা নাববিদ্যায় সুদক্ষ নহে, বঙ্গ তাহাদের পক্ষে দুর্গম প্রদেশ। তথায় নদী বেষ্টিত স্থান মাত্রই দুর্গের মত হয়। এজন্য এ প্রদেশ পলায়িত বা দুর্ব্বৃত্তের আশ্রয়স্থল। রাজা প্রজা বহুজনে এদেশে আসিয়া গুপ্তভাবে রহিয়া গিয়াছেন। পাঠান আমলে খাঁ জাহান বা শাহ জালাল প্রভৃতি কত সাধু ফকির এখানে আস্তানা করিয়া ছিলেন; দনুজমর্দ্দন কিরূপে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করেন, হুসেন-পুত্র নসরৎ কিরূপে খুল্‌নার অন্তর্গত বাগেরহাটে পিতার জীবদ্দশাতেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি।[২] মোগল আমলেও হুমায়ুন, শের খাঁ, শাহজাহান প্রভৃতি কত রাজা বা আমীর এদেশে আসিয়া বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। ভুঞারাজগণ বহুকাল বঙ্গের নানাভাগে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তেমনি পর্টুগীজ, ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিগণ বঙ্গে আসিয়াই সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির পথ বাহির করেন।[৩] ইংরাজরাজ্যের প্রথম সোপান বঙ্গ হইতে আরব্ধ হয়। কিন্তু সে কথায় এখন আমাদের কাজ নাই।

আমরা দেখিতে পাই, পর্টুগীজদিগের প্রথম আমলে অথবা ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাহারা বঙ্গে আসিতে থাকে। শুধু বাণিজ্যের লোভে নহে, অন্য কারণেও বঙ্গ তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল। তাহারা নাববিদ্যায় দক্ষ, বঙ্গে তাহার যথেষ্ট প্রসার আছে। তাহারা দুঃসাহসিক অভিযান ভালবাসে, বঙ্গে তাহার সুযোগ মিলে। এখানে বীরত্ব দেখাইলে রাজ্য-জয় হয়, দস্যুতা করিলে অর্থলাভ হয় এবং ধন ও জীবন লইয়া পলায়ন বা বসতি স্থাপন উভয়ই সহজ-সাধ্য। সুতরাং এই দেশই তাহাদের জাতীয় প্রতিভা বা প্রকৃতির

১ 'প্রসিদ্ধা উর্ব্বরা ভূম্যো বহুশস্য বহুপ্রজাঃ।
নদীমাতৃকদেশোঽয়ং লোকানাং সুখদায়কঃ॥'—লঘুভারত

২ বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৩০৯ ৩৪৫-৫৭, ৩৭৭ পৃ।

৩ পর্টুগাল রাজ্যের অধিবাসীদিগকে পর্টুগীজ, ইংলণ্ডের লোকদিগকে ইংরাজ, ফ্রান্সের লোককে ফরাসী, হল্যাণ্ডের অধিবাসীকে ওলন্দাজ এবং ডেনমার্কের লোককে এদেশীয়েরা দিনেমার বলিত। পর্টুগীজেরাই পরে ফিরিঙ্গি বলিয়া অভিহিত হইত। কেন তাহা পরে বলিতেছি।

অনুকূল।[১] পর্টুগীজেরা ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে প্রথম বঙ্গে আসে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম কোয়েলহো (Coelho) চট্টগ্রামে আসেন ; পর বৎসর সিলভিরা (Silveira) আরাকাণে দেখা দেন। শেষে প্রতি বৎসর তাহাদের তরণী পণ্যভার লইয়া বঙ্গে আসিত। ১৫২৮ অব্দে ডে মেলো (De Mello) ধরা পড়িয়া বহুকাল গৌড়ে বন্দী ছিলেন। মামুদ শাহের রাজত্ব কালে পর্টুগীজেরা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের আদেশ পায় (১৫৩৭-৮) ; তাহারা এই দুই স্থানকে যথাক্রমে বড় বন্দর (Porto Grande) ও ছোট বন্দর (Porto Pequeno) বলিত। ক্রমে হুগলীতে পর্টুগীজদিগের প্রধান আড্ডা হইলেও তাহাকেই ছোট বন্দর বলা হইত।[২] সের খাঁর আক্রমণকালে পর্টুগীজেরা মামুদ শাহের পক্ষে যুদ্ধ করে এবং তাহারা শকড়িগলি ও তেলিয়াগড়িতে বঙ্গের দ্বার রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন র‍্যালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) বঙ্গে আসেন, তখন হুগলী সম্পূর্ণরূপে পর্টুগীজদিগের অধিকৃত দেখিতে পান।[৩] পর্টুগীজেরা নৌবাহিনীর নিরাপদ আশ্রয় স্থানকে বন্দর বলিত, এই বন্দর কথা হইতে 'ব্যাণ্ডেল' হইয়াছে ; এক সময়ে বঙ্গে তাহাদের অনেকগুলি ব্যাণ্ডেল

১ 'In a labyrinth of rivers the adventurers could dive and dart, appear and disappear, ravage the country and escape with impunity. Hence Bengal has been the victim of exploits and depradations of foreign and native adventurers alike.'—Campos, *The Portuguese in Bengal*, p. 24.

২ পেড্রো ট্যাভারিস্ (Padro Tavares) নামক একজন পর্টুগীজের উপর বাদশাহ আকবর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বঙ্গের কোথাও একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করিবার আদেশ দেন। তখন এই ট্যাভারিস্‌ই হুগলী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হন (১৫৭৯)। আকবর-নামায় এক পরতাপ বার (Partab Bar) ফিরিঙ্গির কথা আছে। বিভারিজ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ট্যাভারিস্ ও পরতাপ বার অভিন্ন।—*Akbarnama*, Vol. III, pp. 349-51 ; *Ain.* (Blochmann), p. 440 ; Elliot, Vol. VI p. 59. ম্যানরিকের Itinerario পুস্তকে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।—Bengal Past and Present, Part II, 1616 ; J. A. S. B., 1904, p. 52 ; Campos, pp. 52-3 ; বারটলি (Bartoli) নামক পর্য্যটকের বৃত্তান্তে আছে, 'Pietro Tavares as being a military servant of Akbar and also as captain of a port in Bengal.'

৩ Fitch, Ralph—*England's Pioneer to India*, ed. by J. H. Riley, 1899.

ছিল। হুগলীর নিকটবর্ত্তী ব্যাণ্ডেল নামক স্থানের উৎপত্তি এইরূপ। এই সকল উপনিবেশে অবস্থান করিবার সময় তাহাদের বিশেষ কোন শাসন-ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিন্‌সটেন (Van Linschoten) নামক পর্য্যটক ভারতবর্ষে ছিলেন; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্টুগীজদিগের আড্ডা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে তখনও তাহাদের কোন দুর্গ বা শাসন-শৃঙ্খলা ছিল না; তাহারা যেখানে সেখানে অব্যবস্থিতভাবে বাস করিত, স্ব স্ব প্রধান ছিল, কেহ কাহারও শাসন মানিত না। তাহারা নানা অপরাধে অপরাধী বলিয়া একস্থানে স্থায়িভাবে বসতি করিতে সাহসী হইত না।[১]

পশ্চিম ভারতে বম্বে অঞ্চলে যে সব পর্টুগীজ বাস করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে গুরুতর দুর্ব্বৃত্ততার জন্য অপরাধী হইত। তখন গোয়ার পর্টুগীজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে শাস্তি পাইবার ভয়ে পলায়ন করিয়া বঙ্গে আসিত। বম্বে অঞ্চল হইতে আসিত বলিয়া এই জাতীয় লোকের সাধারণ নাম ছিল 'বম্বেটে'। দস্যুবৃত্তিই এদেশে তাহাদের প্রধান ব্যবসায় হইত, এজন্য তদবধি দস্যুদুর্ব্বৃত্ত-দিগকে এদেশে এখনও বম্বেটে বলা হয়। প্রথমতঃ আরাকাণ ও চট্টগ্রামের উপকূলে নানাস্থানে তাহাদের আড্ডা হয়। তথা হইতে তাহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে প্রবেশ করিত; চট্টগ্রাম হইতে বঙ্গে আসিতে, পথে পড়িত সন্দ্বীপ। এই সন্দ্বীপ বা সোমদ্বীপ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে একটি সমুর্ব্বর সুন্দর দ্বীপ; উৎপন্ন শস্য ও পণ্যের গৌরবে উহার নাম ছিল স্বর্ণ দ্বীপ। সেই স্বর্ণ দ্বীপ কথা হইতেই

১ 'The Portingalles deale and traffique thether, and some places are inhabited by them, as the havens which they call Porto Grande (Chittagong) and Porto Pequeno, that is the great haven and the little haven, but there are no Fortes, nor any government, nor police, as in (Portuguese) India (they have), but live in a manner like wild men and untamed horses for that everyman doth what hee will, and everyman is Lord (and maister), neither esteeme they anything of justice, whether there be any or none, and in this manner doe certayne Portingalles dwell among them, some here, some there (scattered abroade), and are for the most part such as dare not stay in India for some wickednesse by them committed.'—Van Linschoten (Hakluyt edition), p. 95; Bengal Past and Present, Part I, 1915, pp. 80-81.

সন্দ্বীপ নাম হইয়াছে। দ্বীপটি ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রশস্ত।[১] ফ্রেডারিক্ নামক একজন ভিনিসীয় পর্য্যটক ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তাঁহার মতে সন্দ্বীপ তখন একটি প্রধান উর্ব্বরতাশালী বহুজনপূর্ণ সমৃদ্ধ দ্বীপ।[২] ডু-জারিকের ১৬১০ খৃষ্টাব্দের বিবরণী হইতে জানা যায়, সন্দ্বীপ লবণের ব্যবসায়ের জন্য ভারতের মধ্যে প্রধান ছিল। প্রতি বৎসর দুইশতের অধিক জাহাজ লবণ বোঝাই করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইত।[৩] সন্দ্বীপের এইরূপ সমৃদ্ধির জন্য তৎপ্রতি মগ, পর্টুগীজ, মোগল বা ভুঞারাজগণের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তাহারই ফলে সন্দ্বীপের কূলে ও জলে বহুবার ভীষণ রণক্রীড়া হইয়াছিল, সে কথা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব। ফ্রেডারিকের আগমন কালে সন্দ্বীপের প্রধান অধিবাসী ছিল মুর বা মুসলমানগণ। ক্রমে তথায় মগ ও পর্টুগীজগণের বসতি হয়। পুরাতন হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা খুব কমই ছিল। পর্টুগীজদিগের পূর্ব্বে কয়েক বৎসরকাল সন্দ্বীপ বারভুঞার অন্যতম কেদার রায়ের শাসনাধীন ছিল, পরে সে কথা বলিব।

চট্টগ্রামেই পর্টুগীজদের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আরাকাণ-রাজের অধীন হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথমতঃ সে রাজার সহিত পর্টুগীজদিগের সম্প্রীতি ছিল ; সেই সম্প্রীতির ফলে তাহারা দলে দলে আসিয়া চট্টগ্রামে বাস করিতে থাকে, কারণ এই স্থানের রমণীয় অবস্থান গুণে তাহারা মোহিত হইয়াছিল। ক্রমে তথায় তাহাদের বংশবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তাহারা অস্ত্রবলে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু

১ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী হাতিয়া ও বামনী দ্বীপ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১,৯৫০০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। উহার অর্দ্ধেক Mr. Courjon এবং অপরার্দ্ধ সমানাংশে Mr. Delanny এবং শিবদুলাল তেওয়ারী একত্রযোগে খরিদ করেন, মোট রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে ৩৮,৪২০৲ টাকা স্থিরীকৃত হয়। এখন্ নিজ সন্দ্বীপের প্রায় ।৶০ কুর্জ্জনের কন্যা Mrs. Massingham এবং অপরাংশ তুলাংশে ডিলানি ও তেওয়ারীর জমিদারী ভুক্ত আছে। আমরা ১৯১২ অব্দে এই সকল জমিদারীর কাছারী পরিদর্শন করিয়াছিলাম।

২ 'The Island was one of the most fertile places in the world, densely populated and well cultivated'—Noakhali Gazetteer (Webster), p. 17.

৩ Du Jarric—*Histoire...des Indes Orientales*, part IV, Chap. 32; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৪৪৯-৫০ পৃ।

তৎপূর্ব্বেও উক্ত সহরে পাহাড়তলীর নিকট তাহাদের একটি দুর্গ ছিল এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে অর্থাৎ কর্ণফুলি নদীর মোহানার অপরপারে ডিয়াঙ্গা (Dianga) নামক স্থান তাহাদের বসতির জন্য একটি বড় সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডাঙ্গা হইতে ডিয়াঙ্গা হইয়াছিল, এখনও উহাকে ফিরিঙ্গির বন্দর বা শুধু বন্দর নামে অভিহিত করা হয়। কেবল ডিয়াঙ্গায় নহে, আরও কয়েকটি স্থানে পর্টুগীজদিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। তন্মধ্যে একটি স্থানের নাম রামু (Ramu)।[১] বোধ হয় ইহারই পূর্ব্বনাম রামাবতী ছিল। তবে ডিয়াঙ্গাই যে তাহাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই স্থানেই তাহাদের প্রথম গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয় (১৫৯৯)।[২]

ভাস্কো ডা গামার সময় হইতে পর্টুগীজগণ যখন এদেশে আসিত, তাহারা স্বদেশ হইতে স্ত্রীলোক সঙ্গে আনিতে অনেকে পারিত না। উহার ফল এই হইয়াছিল যে, কোন সুযোগ পাইলে বা যুদ্ধ-বিদ্রোহ কালে তাহারা এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। অবশেষে গোয়া নগরী অধিকারের পর নরপতি মানুয়েলের আদেশক্রমে গোয়ার শাসনকর্ত্তা আল্‌বুকার্ক পর্টুগীজেরা এদেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারিবে বলিয়া অভিমত প্রচার করেন। তবে নিয়ম ছিল, তাহারা উত্তম বংশীয় স্ত্রীগণকে খৃষ্টান করিয়া লইয়া পরে বিবাহ করিবে।[৩] যাহারা নিয়মানুসারে বিবাহ করিত, আল্‌বুকার্ক তাহাদিগকে বসতির জমি দিতেন। কিন্তু নিয়ম আর কয়দিন থাকে? তবে বিবাহ হউক বা না হউক, বহুজনে স্ত্রীলোক গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ হইল। এইভাবে গোয়ার লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল বলিয়া অন্যস্থানের পর্টুগীজদিগের ঈর্ষা

১ রেণেলের ১ নং ম্যাপে মহেশখালি ফাড়ির পূর্ব্বপারে নদীতীরে Ramoo আছে; উহা বর্ত্তমান কক্সবাজার (Cox's Bazar) হইতে ৯ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।—Chittagong Gazetteer, p. 188 ভ্রমণকারী ম্যানরিক্ ডিয়াঙ্গা হইতে রামুতে আসিয়াছিলেন।—*Ibid.*, pp. 176-7.

২ Father Barbe, Vicar of Chittagong, wrote on Sept. 5, 1843: 'The first church [of the Portuguese on the Chittagang side] was built by them at Deang (Dianga) which is at the mouth of the river.'—Bengal Past and Present, 1916, part II, pp. 261-2. মহামতি ব্লকম্যান বলেন দক্ষিণডাঙ্গা বা ব্রাহ্মণডাঙ্গা নামের অপভ্রংশ হইতে ডাঙ্গা ও পরে ডিয়াঙ্গা হইয়াছে।

৩ Danver—*Portuguese in India,* Vol. I, p. 217; 'বিশ্বকোষ,' ১১ খণ্ড, ১৪ পৃ।

হইল এবং তাহারাও কোন প্রকারে বিবাহ করিয়া মনুষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপে যাহারা বিবাহ করিয়া বাস করিত, তাহারা অর্থপ্রাচুর্য্যে সুখে থাকিত, আর কখনও দেশে ফিরিতে চাহিত না। শুধু ভারতবর্ষে নহে, এইরূপে পর্টুগীজেরা নানাদেশে রক্ত সম্বন্ধ পাতাইয়া দেশ ভুলিয়া গেল ; পর্টুগালে স্ত্রী সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিল, এবং দেশ ক্রমে মনুষ্যশূন্য হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে যে উদ্যমশীল পর্টুগীজ জাতির পতন হইল, তাহার প্রধান কারণ এই। অবশেষে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্টুগাল যখন স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হইল, তখন হইতে পর্টুগীজ জাতির ব্যক্তিত্ব মুছিয়া যাইতে লাগিল, উপনিবেশের অধিবাসীর সঙ্গে স্বদেশের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গেল। তখন হইতে যাহারা ভারতবর্ষে ছিল, তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসায় হইল দস্যুতা ও ইন্দ্রিয়-সেবা। তাহাদের সহিত এদেশীয় স্ত্রীলোকের সংযোগে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারাই ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত।[১]

এই পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বৃত্ততার জন্য পদচ্যুত হইয়া বা স্বজাতির নিকট মুখ দেখাইতে না পারিয়া বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিত, তাহারা

১ আমরা এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (৩য় সং ৬৪-৬৫ পৃ) ফিরিঙ্গি নামের উৎপত্তির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ফ্রাঙ্ক কথা হইতে ফিরিঙ্গি হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে যখন মুসলমানদিগের সহিত ইয়োরোপীয়দিগের সংঘর্ষ হয়, তখন আরবীয়েরা সকল ইয়োরোপীয় জাতিকেই ফ্রাঙ্ক বলিত। পরে পর্টুগীজ প্রভৃতি জাতিরা যখন বাণিজ্যার্থ ভারতে আসেন, তখনও সকল জাতির সাধারণ নাম হইয়াছিল ফ্রাঙ্ক বা ফিরিঙ্গি।

'Frank is the parent word of Feringhi by which name the India-born Portuguese are still known. The Arabs and Persians called the French crusaders Frank, Ferang, a corruption of France. When the Portuguese and other Europeans came to India, the Arabs applied to them the same name Ferang, and then Feringhi.'—Campos, *Portuguese in Bengal*, p. 47 *note*.

এই সকল ইয়োরোপীয়দের মধ্যে পর্টুগীজেরাই প্রথম বঙ্গদেশে আসিয়া উৎপাত করিত এবং তাহারাই প্রথম ফিরিঙ্গি নাম পাইয়াছিল। তাহাদের চরিত্রদোষে ফিরিঙ্গি নামে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। এজন্য অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতিরা এ নাম ঘৃণা করেন এবং এ নামে পরিচিত হইলে অপমানিত বোধ করেন। এখন পর্টুগীজদিগের সংসর্গজাত বর্ণসঙ্করকে ফিরিঙ্গি বলা হয় ; আমরা পর্টুগীজ দস্যুদিগকেই ফিরিঙ্গি বলিব। ইহারা চট্টগ্রামীর নিকট প্রতঙ্কীচ নামে খ্যাত ; 'আলোয়ালের পদ্মাবতী'তে প্রতঙ্কীচের উল্লেখ আছে।

চরিত্রদোষে জাতি হারাইয়া এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিত এবং বিলাস স্রোতে গা ঢালিয়া দিত; অনেকে একাধিক বিবাহ করিত বা উপপত্নী রাখিত এবং ক্রমে স্ত্রীপুত্রের জন্য ভারাক্রান্ত হইয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। যখন বাণিজ্যে তাহাদের তৃষ্ণা মিটিত না, তখন তাহারা দস্যু-ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? ফিরিঙ্গি দস্যুরা আরাকান, চাটিগাঁও, সন্দীপ প্রভৃতি স্থানে বসতি করিয়া তথা হইতে লুঠপাটের জন্য বঙ্গের দক্ষিণভাগে ঢাকা হইতে সগরদ্বীপ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। আরাকাণী মগ ও এদেশীয় অন্য দস্যুরা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গিগণের চরিত্রের মিল ছিল, এজন্য তাহারা ফিরিঙ্গিদিগকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছিল। মগেরা পূর্ব্ব হইতেই দস্যুতা করিত; দস্যুতার শাস্ত্রে কে কাহার শিক্ষক, তাহা বলিবার উপায় নাই। মগেরা অনেকে স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকার উপর বাস করিত, যাযাবর জাতির মত একস্থান হইতে সপরিবারে অন্যত্র যাইবার আপত্তি ছিল না।[১] ফিরিঙ্গিদিগেরও স্ত্রী সঙ্গে লইয়া চলা ফেরা স্বভাবসিদ্ধ। অচিরে মগের সহিত ফিরিঙ্গিরা মিশিয়া গেল এবং দস্যুবৃত্তির মন্ত্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। পতিত ফিরিঙ্গির সহিত মিশিয়া বৌদ্ধ মগগণও পতনের শেষ সীমায় নামিল। এই দুই জাতির দস্যুবৃত্তির সহিত যে দক্ষিণবঙ্গের অনেক পলায়িত বা পরিত্যক্ত হিন্দু মুসলমান যোগ দিতনা, তাহা নহে। সকলে মিলিয়া এক নূতন দস্যুর জাতি গড়িয়াছিল, তাহাদের অমানুষিক উৎপাতে বঙ্গদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইতেছিল। এই দুর্দ্দিনে, এই দুরন্ত দস্যুদলের দমন জন্য সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া মহাবীর প্রতাপাদিত্য ও তাঁহার সহযোগী ভুঞাগণ বহুদিন পর্য্যন্ত দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। সে দস্যুতার বিভীষিকাময় দৃশ্য না দেখিলে কেহ বঙ্গবীরগণের কৃতিত্ব ও পুরুষত্বের পূর্ণ পরিচয় পাইবেন না। লেখনী কলঙ্কিত হইলেও আমরা সে নির্ম্মমতার চিত্র প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে কোন সুশাসন ছিল না; তখন এই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণ বঙ্গের দক্ষিণ দিক হইতে নদীপথে দেশের মধ্যে যেখানে সেখানে প্রবেশ করিত এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও জাতিনাশ করিয়া বঙ্গের শান্তপল্লী-গুলিকে শ্মশানে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বর্ত্তমান বরিশাল,

১ Fitch, Ralph (Riley), pp. 154-55.

খুল্‌না ও চব্বিশপরগণা জেলার দক্ষিণাংশ উহাদের প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল। আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি, এই মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার সুন্দরবন ধ্বংসের অন্যতম কারণ। সুন্দরবনে মনুষ্যাবাস ছিল; শুধু নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ে লোকের বাস উঠিয়া যায় নাই; গেলেও পুনরায় ভূমির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তথায় মনুষ্যাবাস বসিত। কিন্তু এই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের অত্যাচারে কেহ আসিতে বা তিষ্ঠিতে পারে নাই। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ এই অত্যাচারের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিয়াছেন। বার্ণিয়ারের[১] ভ্রমণ কাহিনীতে আছে চৌর্য্য ও দস্যুতাই উহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজ লইয়া সমুদ্রপথে দ্বীপপুঞ্জের উপর পড়িত অথবা নদী নালা বাহিয়া শতাধিক মাইল পর্য্যন্ত দেশের ভিতর প্রবেশ করিত; সহর, বাজার বা জনসংঘ দেখিলে কিংবা দরিদ্র ভদ্রলোকগণের বিবাহাদি উৎসব ও কোন ক্রিয়াকর্ম্মের সন্ধান পাইলে তথায় গিয়া আক্রমণ করিত। যাহা পাইত লুটিয়া লইত; ছোট বড় সব স্ত্রীলোককে অসাধারণ নির্দ্দয়তার সহিত ধরিয়া লইয়া দাস-শ্রেণীভুক্ত করিত; যাহা লইতে পারিত না, তাহা অগ্নিসাৎ করিয়া দিয়া যাইত। এই জন্যই গঙ্গার মোহানায় যে সকল দ্বীপ পূর্ব্বে জনাকীর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সে সব স্থানে ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তু ভিন্ন অন্য অধিবাসী নাই। অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা পলাইবার সুযোগ বা সামর্থ্য না থাকায় দস্যুহস্তে বন্দী হইত, দস্যুরা

১ Francois Bernier নামক একজন ফরাসী ডাক্তার ১৬৫৫-১৬৬১ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ঘুরিয়া ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ফরাসী ভাষায় লিখিত পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। উহাতে (Bangabasi edition, pp. 156-57) আছে :

'Their ordinary trade was robbery and piracy. With some small and light gallies they did nothing but coast about that sea, and entering into all rivers there about, and into the channels and arms of ganges and between all these isles of the lower Bengal and often penetrating even so far as forty or fifty leagues up into the country, surprized and carried away whole towns, assemblies, markets, feasts and weddings of the Gentiles and others of that country, making women slaves great and small, with strange cruelty and burning all they could not carry away. And thence it is that at present there are seen in the mouth of Ganges so many fine isles quite deserted, which were formerly well-peopled, and where no other inhabitants are found but wild beasts and specially tigers.' [Bernier, F.—*Travels of the Mogul Empire* ; ed., by A. Constable, 1891, p. 175, শি মি]

তাহাদের মধ্যে অচল অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষদিগকে হয়ত পরদিনই যেখানে সেখানে সস্তায় বেচিয়া ফেলিত। সমর্থ পুরুষদিগের মধ্যে কতক খালাসী করিত এবং কতককে খৃষ্টান করিয়া নিজেদের দস্যু-ব্যবসায়ের সহযোগী করিয়া লইত। অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহাদিগকে গোয়া, সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি নানাস্থানে বিক্রয় করিয়া আসিত। এবং মিশনরীগণ শত চেষ্টা করিয়া দশ বছরে যাহা না পারিতেন, তাহারা এইভাবে একবৎসরে তদপেক্ষা অধিক লোককে খৃষ্টান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত।[১]

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমভাগে যখন বাঙ্গালার নবাব মীরজুম্লা আসাম জয় করিবার জন্য বিরাট মোগলসৈন্য পরিচালনা করেন, তখন শিহাব্-উদ্দীন মহম্মদ তালীশ নামক জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহার সহযাত্রী হন। তালীশ এই আসামাভিযানের এক বিস্তীর্ণ বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। উহার অনেক প্রতিলিপি দেখা যায়, এমন কি, উর্দ্দু, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছিল।[২] অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বড্লিয়ান লাইব্রেরীতে তালীশের গ্রন্থের যে হস্তলিপি পুঁথি আছে, তাহার পশ্চাতে এক পরিশিষ্ট ছিল।[৩] অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহোদয় ঐ পরিশিষ্টের পত্র সমূহের ফটো আনাইয়া তাহার অনুবাদ প্রচার করেন।[৪] উহার মধ্যে সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম-বিজয়ের ইতিবৃত্ত আছে এবং সেই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাপক সরকার মহাশয় উক্ত তালীশের বিবরণী এবং আলমগীর-নামার সাহায্যে এই অত্যাচার সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৫] উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, কিরূপে আরাকাণী মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণ জলপথে আসিয়া বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ বহুজনকে ধরিয়া লইয়া যাইত। উহারা বন্দীদিগের হাতের

১ 'This infamous rabble impudently bragging, that they made more Christians in one year, than all the Missionaries of the Indies in ten; which would be a strange way of enlarging Christianity.'—Bernier, p. 158. [Bernier (Constable), p. 176. শি মি]

২ *Twarikh-i-Asham* (Paris, 1815).

৩ Persian Ms. Bod. 569, Sachau and Ethe's catalogue, entry No. 240.

৪ J. A. S. B., June, 1907, pp. 257-260.

৫ '*The Feringhi Pirates of Chatgaon, 1665 A. D.*' in J. A. S. B., 1907, pp. 419-25.

তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া সরু বেত চালাইয়া দিত এবং এই ভাবে হালি গাঁথিয়া লইয়া হতভাগ্যদিগকে তাহাদের জাহাজের পাটাতনের নিম্নে একটির উপর একটি রাখিয়া স্তূপীকৃত করিয়া বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত। লোকে যেমন কুক্কুটাদি পক্ষীর খাদ্যের নিমিত্ত শস্য ছড়াইয়া দেয়, সেইভাবে বন্দীদিগের খাদ্যের নিমিত্ত সকালে বিকালে অসিদ্ধ তণ্ডুল-মুষ্টি নিক্ষেপ করিত। এই খাদ্যে যাহারা প্রাণ ধারণ করিতে পারিত, দেশে ফিরিয়া দস্যুরা তাহাদিগকে সামর্থ্য অনুসারে চাষ বা অন্য কঠিন কার্য্যে নিয়োজিত করিত। অবশিষ্টগুলিকে দাক্ষিণাত্যে লইয়া গিয়া ওলন্দাজ, ইংরাজ বা ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়া আসিত। সময় সময় তাহাদিগকে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরে লইয়া গিয়া বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিত। তাহাদের বিক্রয়ের প্রণালী এইরূপ ছিল: বন্দীর জাহাজ উক্ত বন্দরে পৌঁছিলে, তাহারা লোক পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণকে সংবাদ দিত। দস্যুগণ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে এই ভয়ে ক্রেতারা লোকজন সঙ্গে করিয়া তীরে উপস্থিত হইত, এবং জনৈক লোককে টাকাকড়ি সঙ্গে দিয়া দস্যুদিগের জাহাজে প্রেরণ করিত। দর দামে বনিলে দস্যুরা টাকা লইয়া বন্দীদিগকে তীরে উঠাইয়া দিত। সাধারণতঃ এই ভাবে ফিরিঙ্গিরাই বন্দীদিগকে বিক্রয় করিত; মগেরা তাহাদিগের দ্বারা কৃষিকার্য্যাদি করাইয়া লইত। পাদ্রী ম্যানরিক্ খৃষ্টান ফিরিঙ্গিগণের পক্ষ হইতে আরাকাণ-রাজের নিকট যে নিবেদন জানাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার নিজের কথাতেই আছে: 'প্রত্যেকেই জানেন এই পর্টুগীজগণ কিরূপে প্রতি বৎসর বাক্‌লা, সলিমানাবাদ, যশোর, হিজলী ও উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের উপর আক্রমণ করিয়া (মোগল) শত্রুর শক্তি নাশ এবং আপনার (আরাকাণরাজের) শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহারা সম্পূর্ণ নগরী ও গ্রামগুলি পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যে লইয়া আসিয়াছে। এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহারা এই রাজ্যে এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া বসতি করাইয়াছে।'[১] এই ম্যানরিকের বিবরণীর

১ '...everybody knows how many raids they (Portuguese) make every year with their fleets on the lands and kingdoms of Bacala and Solimanuas, Jassor, Angelim and Ourixa, thereby not only decreasing the power of the enemy, but also increasing yours.......They brought to your dominions entire cities and villages (*Poblaciones*), there being years when they introduced over eleven thousand families.'—Bengal, Past and Present, 1916, Part II, p. 258.

অন্যত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি যে পাঁচ বৎসর কাল আরাকাণে ছিলেন, তন্মধ্যে পর্টু্গীজ ও মগ দস্যুগণ বঙ্গদেশের এই সকল স্থান হইতে ১৮০০০ লোক ডিয়াঙ্গা ও অঙ্গারখালি (Angarcale) নামক স্থানে আনিয়াছিল। চট্টগ্রাম হইতে হুগলী পর্য্যন্ত কোন স্থানই তাহাদের উৎপাতে নিরাপদ ছিল না।[১] যশোরের উপরই যেন তাহাদের উৎপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। এখানে যশোর বলিতে যশোর-রাজ্য বা খুল্‌নার দক্ষিণাংশই বুঝিতে হইবে। ম্যানরিক্ আরাকাণে যাইবার পথে যখন ডিয়াঙ্গায় উপস্থিত হন, তখন শুনিলেন পর্টু্গীজ কাপ্তেনেরা ঐরূপ দস্যুতার জন্য যশোরে গিয়াছিল।[২] হুগলীর নিকট যে সকল পর্টু্গীজেরা আড্ডা করিয়াছিল, তাহারা ভাগীরথী প্রভৃতি নদীপথে দস্যুতা করিত, মাশুল না লইয়া কোন জাহাজ বা নৌকাকে চলিতে দিত না। এই সময়ে গ্রামে গ্রামে ছেলে-ধরার ভয় হইয়াছিল। 'পর্টু্গীজেরা ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া বিভিন্ন দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। ইহাদের উৎপাতে যে কত সহর, কত শত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে, কত শত বণিকেব সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।'[৩] এই জন্যই সম্রাট্ শাহজাহানের আদেশে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে একবার এই 'প্রতিমাপূজক ফিরিঙ্গিরা অধিকাংশ হত, আহত ও নিদারুণরূপে অপমানিত হইয়া হুগলি অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল।'

এইরূপে বহুকাল ধরিয়া অবিরত পাশবিক দস্যুবৃত্তি চলিয়াছিল। তাহার ফলে আরাকাণ অঞ্চলে যেমন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, দক্ষিণ বঙ্গ তেমনি ক্রমশঃ জনশূন্য ও আত্মরক্ষাকল্পে শক্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত নদীর কূলে সকল স্থানে মনুষ্যাবাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল ; তাহাদের লুণ্ঠন ও মনুষ্যাপহরণের জন্য পথের পাশে কোন স্থানে কোন লোক বাস করিত না, প্রদীপের বাতি জ্বলিত না।[৪] গ্যাষ্ট্রেল ও রেণেলের প্রাচীন

১ *Ibid.*, p. 281.

২ 'They had gone (to Jassor) evidently on one of their annual filibustering slave-raiding expeditions against the Moghuls of Bengal.'—*Ibid.*, p. 268.

৩ 'বিশ্বকোষ', ১১শ খণ্ড, ৪১ পৃ।

৪ 'Not a householder was left on both sides of the rivers on their track from Dacca to Chittagong. They swept it with the broom of plunder and abduction leaving none to inhabit a house or kindle a fire all the tract'—J. A. S. B., 1907, pp. 422-3.

ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দক্ষিণবঙ্গের বহুস্থান এই দস্যুদিগের দ্বারা জনশূন্য হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখিত হইয়াছে।[১]

মগেরা আসিয়া যে মুল্লুকের উপর পড়িত, তাহার শাসন-নীতি মানিত না, একেবারে ধ্বংস করিয়া ছাড়িত। শাসনহীন প্রদেশকে এখনও লোকে 'মগের মুল্লুক' বলে। সমস্ত দক্ষিণবঙ্গ এইরূপে মগের মুল্লুক হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরে আসিল ফিরিঙ্গি। তাহারাও অনেক দেশকে নিজের দেশ করিয়াছিল, অনেক জলপথকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। সুন্দরবনের সমৃদ্ধ নগরীসমূহ তাহারাই বিনষ্ট করিয়াছিল। এখনও সুন্দরবনেব মধ্যে 'ফিরিঙ্গিখালি', 'ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়া', 'ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি' প্রভৃতি নামসমূহ অনেক প্রাচীন হৃদয়-বিদারক স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিয়া থাকে। আমরা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পড়িয়াছি,—'ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধার।' পর্টুগীজদিগের নৌবহরের নাম আরমাডা (Armada); উহারই অপভ্রংশে হার্ম্মাদ হইয়াছে। উহা হইতে ফিরিঙ্গি দস্যুদিগকেই এদেশের লোকে 'হারমাদ' বলিত।[২] দুঃসাহসিক বঙ্গীয় বণিকগণ 'রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হাবমাদের ডরে', এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু বহুদিন সে বণিকের দুঃসাহস থাকিল না। যে বঙ্গবাসিগণ নানা দ্বীপোপদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদের গতিপথ রুদ্ধ হইল; যে বঙ্গবণিকেরা সচরাচর সিংহল পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য করিত, তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল। তাহাদের অগণ্য পণ্য কতক লুটিয়া লইত, কতক বা হাট বাজার হইতে সস্তায় কিনিয়া লইয়া এই ফিরিঙ্গিরা অর্থাগমের পথ সোজা করিত। এই সময় হইতে দেশীয় বণিকদিগের পক্ষে সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ হইল। অনেক আদার ব্যাপারীও পূর্ব্বে জাহাজের খবর রাখিত, এখন তাহারা কূপমণ্ডূকের মত গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন পণ্ডিতেরা কথায় কথায় বলিতেন 'কিমার্দ্রক-বণিজঃ বহিত্র-চিন্তয়া', অর্থাৎ আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি? যে বঙ্গ একদিন শস্য-সম্ভারের প্রাচুর্য্যে জগতের

১ Gastrell—*Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Faridpur and Backergunj, Surveyed 1764-72*; Rennell—*Bengal Atlas* (1780).

২ 'The tribe was called Harmad. This word (Harmad) is evidently Armad, a corruption of Armada, Armad is used in the sense of fleet in *Kalimat-i-Taiyabat*'—J. A. S. B, 1907, No. 6, p. 425 *note*.

পণ্যভাণ্ডার বলিয়া গণ্য হইত, সে বঙ্গ আজ অন্ন-বস্ত্রের অভাবে দীনা হীনা কাঙালিনী। আজ আমাদের প্রাচীন গৌরব বিলুপ্ত; আমাদের ঔপনিবেশিকতা বা বাণিজ্য প্রবৃত্তি একেবারে সুষুপ্ত; আমাদের সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রশাসনে নিষিদ্ধ। যাহারা এক দিন সগর্ব্বে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাইয়া সিংহলে, সৌরাষ্ট্রে বা অর্ম্মাজে গিয়া অবাধে বাণিজ্য করিত, তাহারা আজ কালাপানির ভয়ে থরহরি কম্পিত। কেন এমন হইল? কখন হইতে এমন হইল? কে বঙ্গের ধ্বংসের পথ প্রথম প্রস্তুত করিল? অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করিতে পারিবেন, এই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুর অবিশ্রান্ত আক্রমণ, অক্লান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অমানুষিক অত্যাচারই বঙ্গধ্বংসের অন্যতম কারণ। এই অত্যাচারে বঙ্গের যাহা অনিষ্ট হইয়াছে, এমন অনিষ্ট বোধ হয় কোন দেশের আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যিনি যখন এই অত্যাচার হইতে বঙ্গবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত স্বদেশহিতব্রতে সর্ব্বাগ্রগণ্য। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য কত দুর্গ নির্ম্মাণ ও সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন; তাহার বিবরণ পরে দিবার জন্যই পূর্ব্বক্ষণে এই অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিয়া লইতেছি। আমরা দেখিব, প্রতাপাদিত্য যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই দস্যুদিগের উৎপাত দমিত ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে সিবাষ্টিন্ গঞ্জেলিস নামক এক দুর্দ্দান্ত নায়কের কর্তৃত্বাধীন হইয়া আবার ফিরিঙ্গিরা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে আবার ৫০ বৎসর কাল তাহাদের দারুণ অত্যাচার চলিয়াছিল, ম্যানরিকের চাক্ষুষ সাক্ষ্য হইতে তাহার কতক আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁ সর্ব্বশেষে ইহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয়কালে তিনি বহুক্ষেত্রে রণক্রীড়া করিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যুদলকে 'সায়েস্তা' করিয়া অর্থাৎ পর্য্যুদস্ত ও নিয়মানুবর্ত্তী করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও আমাদের ভাষায় দুর্ব্বিনীত লোককে 'সায়েস্তা' করিবার কথা প্রচলিত আছে।

বাঙ্গালা মুল্লুক এই সব দস্যুদলের খাস তালুকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম জয় করিলে, মগ ও ফিরিঙ্গি উভয় জাতিই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তখন জনৈক প্রধান কাপ্টেনের অধীন কতকগুলি ফিরিঙ্গি ঢাকায় গিয়া নবাবের শরণাপন্ন হয়। সায়েস্তা খাঁ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা যে আরাকাণীদের পক্ষভুক্ত হইয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ কর,

মগেরা তোমাদের বেতন কি ভাবে দিত?' তদুত্তরে তাহারা সরল ভাবে বলিয়াছিল, 'মোগলরাজ্য আমাদের বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; বাঙ্গালা দেশকে আমাদের জায়গীর বলিয়া ধরিতাম; সেখানে বারমাস অনায়াসে আমাদের লুণ্ঠন সংগ্রহ করিতাম; এজন্য আমাদের কোন আমলা বা আমীন রাখিতে বা কাহারও নিকট হিসাব নিকাশ দিতে হইত না।'[১] এই উক্তিই তখনকার বঙ্গের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

এইরূপ অবাধ দস্যুতার ফলে বঙ্গবাসী এক সময়ে ধনেপ্রাণে যে কত নির্য্যাতিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। তবে এই সম্পর্কে তাহারা স্বদেশীয় সমাজের নিকটও কম নিগৃহীত হয় নাই। দস্যুর অত্যাচার সায়েস্তা খাঁর সময় হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ না হউক, একেবারে কমিয়া গিয়াছিল,[২] কিন্তু সমাজের নির্য্যাতন আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষকাল বা দশ পুরুষ ধরিয়া সমানভাবে চলিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফিরিঙ্গি ও মগেরা নদীপথে দেশের মধ্যে বহুদূর প্রবেশ করিত এবং সুযোগমত গ্রামের উপর পড়িয়া রক্তারক্তি, লুটপাট করিত, কিছু না পারিলেও দুই একটি স্ত্রীলোক বা ছেলে ধরিয়া লইয়া যাইত। দেশের লোকে প্রাণের ভয়ে এবং ততোধিক মানের দায়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না। অনেকে ধরা পড়িয়া জীবন ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ যাহারা যুবতী অথবা যাহারা নিতান্ত বৃদ্ধা নহে, তাহারা যে কত ঘৃণিত পাশবিক অত্যাচার সহ্য

১ "The Feringhis replied, 'Our Salary was the Imperial dominion! We considered the whole of Bengal as our Jagir. All the twelve months we made our Collection (i. e. booty) without trouble, we had not to bother ourselves about amlas or amins, nor had we to render accounts and balances to anybody'." —J. A. S. B., 1907, No. 6, p. 425. উক্ত প্রধান কাপ্টেনের নাম মুর নহে। মূলে Capitan Mor আছে, উহার অর্থ Chief Captain. অধ্যাপক সরকার তাঁহার *Aurangzib*, VIএর দ্বিতীয় সংস্করণে এ ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন।

২ কিন্তু কমিয়া গেলেও সে অত্যাচার একেবারে যায় নাই। এমন কি বৃটিশ শাসন-কালেও যায় নাই। Rev. J. Long সাহেবের উক্তি হইতে জানিতে পারি: 'The Mugs, as late as 1824, were object of terror even to Calcutta, and in 1760, the Government had a *bund* thrown across the river near the site of the Botanical Gardens to prevent them and the Portuguese pirates coming up.'—J. A. S. B., 1864.

করিত, সে কলঙ্ককাহিনী মসীবর্ণে চিত্রিত করিবার ভাষা নাই; যে সব স্ত্রীলোক পলাইবার কালে কোন প্রকারে ধৃত বা স্পর্শিত মাত্র হইত, তাহারা কোন গতিকে উদ্ধার পাইলেও সমাজের শাসনে জাতিচ্যুত বা সমাজবর্জ্জিত হইয়া থাকিত। তাহাদের স্বামী বা পিতা নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে পবিত্র জানিয়া স্নেহের কোলে টানিয়া লইলেও, নির্দ্দয় হিন্দু-সমাজের রুক্ষ কটাক্ষ তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাইত না। বংশ-কাহিনীর তথ্য জানিতে গিয়া গল্প শুনিয়াছি, একটি স্ত্রীলোক নদীর ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময়ে দুই একজন মগ, দস্যুতার উদ্দেশ্যে না হইতে পারে, অন্য কারণে পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি মগের ভয়ে জলে ডুব দিয়া রহিল, ভাবিল মগেরা চলিয়া গেলে উঠিবে। কিন্তু একজন মগ তাহাকে ডুব দিতে দেখিয়া ভাবিল, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় আত্মহত্যার জন্য ডুব দিয়াছে; অমনি সে ছুটিয়া গিয়া জল হইতে চুল ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ডাঙ্গায় আনিল; পরে জীবিত দেখিয়া, ব্যাপার বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সেই স্পর্শমাত্র দোষে চির-জীবনের জন্য চিহ্নিত ও কলঙ্কিত হইয়া থাকিল। তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে গ্রহণ করার পাপে পুরুষানুক্রমে পাতিত্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এমন সব গল্প আছে, দস্যুরা গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার কালে, শুধু রঙ্গরহস্যের জন্য পথের পার্শ্বস্থ স্ত্রীলোকদিগকে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিত বা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া থুথু ফেলিত। অঙ্গুলি স্পর্শ হইত বা না হইত, থুথু গায়ে আসিয়া পড়িত বা না পড়িত, দূর হইতে যাহারা এই মগের চেষ্টা দেখিত বা অট্টহাসির রোল শুনিত, তাহারাই হতভাগ্য গৃহস্থকে নিগৃহীত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। ফলে দাঁড়াইত এই, কতকগুলি গৃহস্থ আপনাদের দুর্ভাগ্যবশে অথবা অরক্ষিত অরাজক দেশের দোষে, সমাজে পতিত ও অপবাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত। এই কলঙ্ককে 'ফিরিঙ্গি বা মগো পরিবাদ' বলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বর্গীর উৎপাত হয়, তখন 'বর্গীঠেলা' পরিবাদও হইয়াছিল। কৌলিক বিশৃঙ্খলার আংশিক প্রতীকার কল্পে ব্রাহ্মণ সমাজে যে মেল-বন্ধন হইয়াছিল, এই জাতীয় পরিবাদ যে তাহার অন্যতম কারণ, তাহা বোধ-হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপে পরিবাদগ্রস্ত পরিবারকে মগো-ব্রাহ্মণ, মগো-বৈদ্য, মগো-কায়েত, মগো-নাপিত প্রভৃতি খেতাবে পরিচিত রাখা হইত। এই কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া তাহারা পরবর্ত্তীকালে উচ্চবংশে বিবাহ

দ্বারা রক্তসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই এবং ক্রমশঃ নিম্নপদস্থ স্বজাতীয়ের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধযুক্ত হইতে হইতে তাহারা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারকে যে সমাজে কার্য্যতঃ প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়, সে সমাজ জানিয়া শুনিয়া হয়ত সাধারণ স্পর্শদোষেই একটা বংশকে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম বা সমাজের পংক্তি হইতে খরচ ব্যতীত জমা নাই; বহুকাল হইতে আমাদের সমাজের বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের মা বাপ নাই; নতুবা স্বদেশীয় লোকের উপর এইরূপ অনর্থক অসম্ভব নির্ম্মমতা দেখাইয়া, জাতীয়তার শক্তিকে নির্ম্মূল করিবার ব্যবস্থা হইত না। এখনও যমুনা, সরস্বতী, ভৈরব বা মধুমতীর কূলে ত বটেই, এমন কি, যশোহর জেলার উত্তরভাগস্থ নবগঙ্গাব তীরে মাগুরা অঞ্চলের নানাস্থানে বা ফরিদপুরের অভ্যন্তরে ভূষণা প্রভৃতি স্থানে মগো-পরিবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের বাস রহিয়াছে। বংশ বা ব্যক্তির নামের তালিকা দিয়া লাভ নাই, এবং সে পরিচয় দিতে গিয়া, তাঁহাদের পুরাতন পবিবাদের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

শুধু সাময়িক অত্যাচার বা সামাজিক নিগ্রহ হইতেই মগ ফিরিঙ্গির সহিত আমাদের সম্বন্ধের শেষ হয় নাই। এস্থানে তাহাদের অত্যাচারের বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই সকল বৈদেশিকের সহিত আমাদেব যে সকল অন্য সম্বন্ধ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের গায়ে নানাস্থানে তাহাদের গতিবিধি ও বসতির সম্বন্ধ এখনও আছে। দক্ষিণ বঙ্গে মঘিয়া, মগরা, মগুখালি, মগপাড়া প্রভৃতি স্থান তাহাদেব নামাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে খুল্না ও ২৪-পরগণায় সমুদ্রকূলে এবং বরিশালের অন্তর্গত গুল্সাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, থাপরাভাঙ্গা, মগপাড়া প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক মগফিরিঙ্গী বা তাহাদের যৌনসম্বন্ধজাত সঙ্করজাতি এখনও বাস করিতেছে। নোয়াখালিতে হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপে, চট্টগ্রামে আদিনাথ, কক্স বাজার, রামু প্রভৃতি স্থানে, সুন্দরবনে হরিণঘাটার মোহানার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীরে অনেক মগপল্লী রহিয়াছে। ঢাকার নিকটবর্ত্তী ফিরিঙ্গিবাজারে ও চট্টগ্রাম সহরে অসংখ্য ফিরিঙ্গি অতি দুরবস্থায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং সীমাবদ্ধ স্বজাতির মধ্যে বিবাহাদি করিয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রোগের তালিকায় 'ফিরিঙ্গি-ব্যাধি'র মত এক প্রকার অতি কুৎসিত ভয়ঙ্কর উপদংশ জাতীয় ব্যাধি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। চরক, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈদ্যক গ্রন্থে এই রোগের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র ভাব-প্রকাশেই এই রোগের বিবরণ আছে। ভাবপ্রকাশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ; এজন্য সহজে অনুমেয়, পূর্ব্বে এদেশে এ রোগের নাম গন্ধ ছিল না।[১] ভাবপ্রকাশে এই 'ফিরঙ্গ-ব্যাধি'র এইরূপ নিদান প্রদত্ত হইয়াছে :

'গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরিঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরিঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥
ব্যাধিরাগরুজোহ্যেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ।
ভবেত্তলক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ ॥'

ফিরিঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ইতি বিশেষার্থং অর্থাৎ ফিরিঙ্গিণী সংসর্গই এই রোগের প্রধান কারণ। এই দুরারোগ্য ব্যাধির সাংঘাতিক বীজাণু নিম্ন শ্রেণী ও ইন্দ্রিয়-সেবীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়া গলিত কুষ্ঠাদি রোগে মানুষের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

তৃতীয়তঃ, আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিতেও বৈদেশিক ফিরিঙ্গির সম্বন্ধ রহিয়াছে। অনেক নূতন ফলমূল বা ফুল তাঁহারা দূর দেশ হইতে এখানে আনিয়া দিয়াছেন। অনেক জিনিসের নাম এবং উহা প্রস্তুত করিবার বা ব্যবহারের প্রণালী আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি। আমাদের আনারস, পেপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, নোনা আতা, চীনের বাদাম, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি। তাঁহারাই আফ্রিকা হইতে গান্ধাফুল আনিয়া আমাদের বাগান সাজাইয়াছিলেন; এইজন্য খৃষ্টান উৎসবে গান্ধাফুলের এত বাহার ও পসার। তামাক তাঁহারাই প্রথম দক্ষিণ ভারতে আনেন (১৫০৮), কিন্তু ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহার বিশেষ ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। এখনও আমাদের দেশের লোকে ফিরিঙ্গি রুটি (পাঁওরুটি) খায়, স্ত্রীলোকেরা ফিরিঙ্গি খোপা বাঁধে। আমাদের ঘরের কড়ি, বরগা, জানালা, গরাদিয়া, কামরা, বারান্দা, পেরেক সকলই ফিরিঙ্গি কথা;

১ 'বিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, ৬০২ পৃ, 'শব্দকল্পদ্রুম', ফিরঙ্গ শব্দ, ২৮০৪ পৃ।

আমাদের আফিসের আলমারী, কাদেরা, মেজ, আল্‌পিন, ফিতা, চাবি সবই তাঁহাদের আনীত জিনিস ; আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য বোতাম, বয়েম, বোতল, বালতি, বাসন প্রভৃতি তাঁহাদের ভাষা এবং হয়ত তাঁহাদের আনীত দ্রব্য। কামান, পিস্তল, লস্কর, বজরা, বয়া (Buoy), মাস্তল, তুফান প্রভৃতি কথা তাঁহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি ; আমরা তাঁহাদের অনুকরণে গীর্জা, পাদ্রী, ইংরাজ, মিস্ত্রী প্রভৃতি নাম দিয়াছি। আমরা পয়সা 'রেস্ত' করি, 'কামিজ' 'ইস্ত্রি' করিয়া পরি, বৎসর 'কাবার' করি, উপদেশের কথা 'টুকিয়া' লই, কুঠিতে 'আয়া' রাখি, পুস্তক 'ছাপা' করি, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে 'জোলাপ' লই, দ্রব্যাদি 'নীলাম' করি,—এসব স্থলে তাঁহাদের কথাই ভাষাগত করিয়া লইয়াছি।[১] আমাদের ভাষা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শব্দভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে। অত্যাচার পীড়িত হইলেও বাঙ্গালী এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য।

১ Campos, *Portuguese in Bengal*, Chap. XVII.

উ ন বিং শ প রি চ্ছে দ

প্রতাপের দুর্গ-সংস্থান

প্রতাপাদিত্য যে বিশেষভাবে রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন, তাঁহার দুর্গ-সংস্থান দেখিলে উহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হয়। প্রতাপ রাজত্ব করিতে করিতে সময় ও প্রয়োজন বুঝিয়া নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। প্রথমতঃ, সমস্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার পরই যে তিনি স্বাধীনতা প্রচার বা শত্রুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। দুর্গগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। কখন কোন্‌টি বা কোন্‌টির পর কোন্‌টি নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। আবার, দুর্গগুলির বিষয় আনুমানিক সময়ানুযায়ী বিভিন্ন স্থানে নানাজাতীয় ঘটনার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইলে, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধনীতি জ্ঞানের কোন সজীব আভাস পাওয়া যাইবে না। এজন্য আমরা এখানে একই স্থলে সকল দুর্গের ও তৎসংশ্লিষ্ট নৌবাহিনী প্রভৃতির প্রধান প্রধান আড্ডাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থিত করিলাম। দুর্গগুলির প্রয়োজনীয়তা ঘটনাবলীর সহিত যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

১ য শো হ র দু র্গ॥ আমরা পূর্ব্বে বিশদভাবে দেখিয়াছি যে, যশোর-রাজ্যের প্রথম রাজধানী মুকুন্দপুরে ছিল ; তথায় প্রথম দুর্গ নির্ম্মিত হয়। রাজধানীর নাম যশোহর হইয়াছিল বলিয়া তথাকার দুর্গকে আমরা যশোহর-দুর্গ বলিয়াছি।[১]

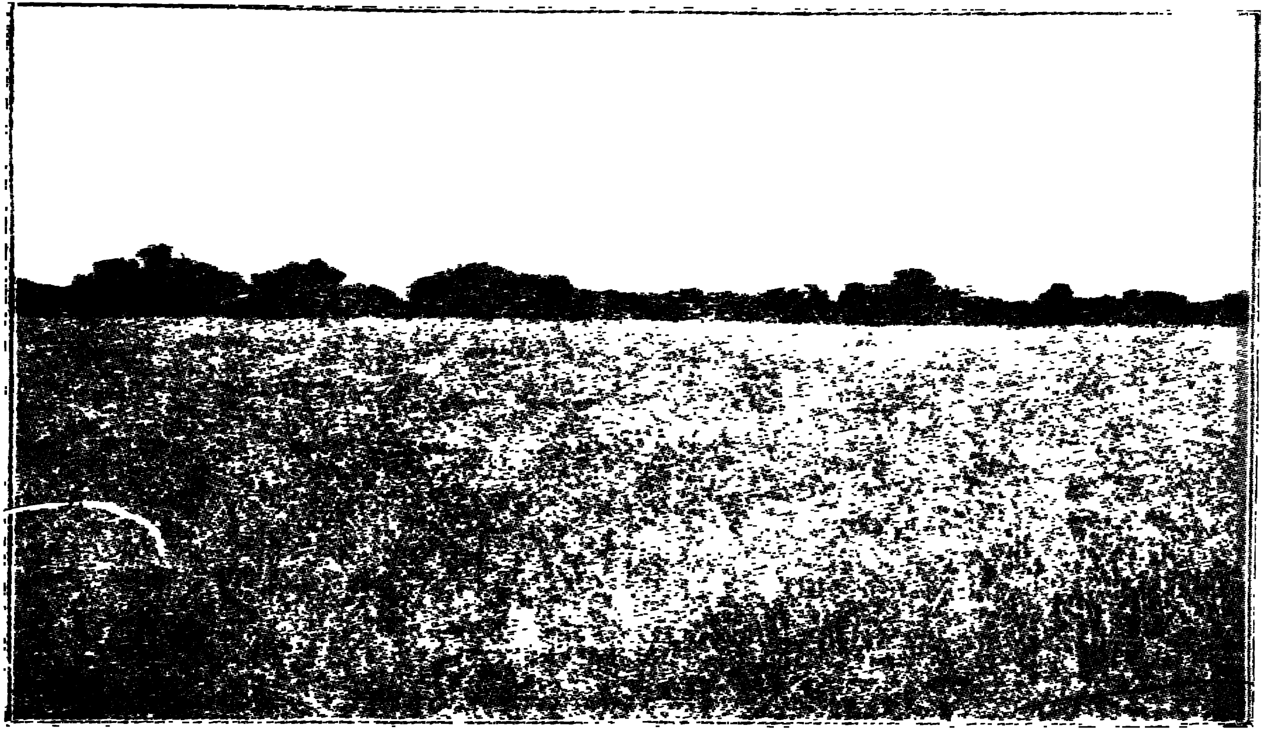
২ ধূ ম ঘা ট দু র্গ॥ পরে প্রতাপাদিত্য নিজে যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমে ধূমঘাটে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলে, সে সহরের নাম পরে যশোহর হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুর্গটিকে আমরা ধূমঘাট দুর্গ বলিতে পারি। ইহাই রাজ্যমধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গ। প্রতাপের রাজত্বের শেষভাগে প্রথম রাজধানী নগণ্য হইয়া পড়ে এবং তখন ধূমঘাটকেই যশোহর সহর বলিত ; এমন কি, বসন্তপুর হইতে ঈশ্বরীপুর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটিরই সাধারণ নাম যশোহর হইয়াছিল। এই সময়ে মুকুন্দপুরের পৃথক্ নামকরণ হয় ; নতুবা পূর্ব্বে তাহার নাম যশোহরই ছিল। মুকুন্দপুর ও ধূমঘাট এই দুইটি দুর্গের বিশেষ বিবরণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন অন্যান্য দুর্গের কথা বলিব।

৩ রা য় গ ড় দু র্গ॥ বিক্রমাদিত্যের জীবদ্দশায় যশোহর-রাজ্য দ্বিধা

১ [পরে ইহা 'মুকুন্দপুর দুর্গ' বলিয়াও উল্লেখিত হইয়াছে।—শি মি]



বুরুজখানা ধূমঘাট



ধূমঘাট দুর্গ

বিভক্ত হয় ; পূর্ব্বদিকের ৷৷৶০ অংশ প্রতাপাদিত্য পান ও পশ্চিমভাগের ।৵০ অংশ বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রগণের সম্পত্তি হয়। প্রতাপ ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিলে, বসন্ত রায় কিছুদিন প্রাচীন রাজধানীতে থাকিয়া স্বীয় রাজ্যাংশের পরিচালনা করেন। কিন্তু তাহাতে সুবিধা বোধ করিলেন না ; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতাপের সহিত বসন্ত রায়ের পুত্রগণের কোন সদ্ভাব ছিল না। নিকটে থাকিলে উভয় পক্ষের জ্ঞাতিবিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় এবং রাজ্য পরিচালনার সুবিধার জন্য বসন্ত রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। পশ্চিম সীমায় গঙ্গাতীরে কোথায়ও রাজধানী হইলে শাসনের সুব্যবস্থা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনিষ্ঠ বসন্ত রায়ের পক্ষে বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের সুযোগ ঘটে। তখন ৺কালীঘাটের সন্নিকটে বেহালা-বড়িষা প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ সমাজ-পল্লী ছিল ; তিনি এই স্থানে রাজধানীর স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। বসন্ত রায় এ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন ; তিনিই প্রথম কালীঘাটের মায়ের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন ; সেই সূত্রে মায়ের সেবক যোগসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মচারীই তাঁহাকে কালীঘাটের সন্নিকটে রাজধানী স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন। তখন তিনি বেহালা ও বড়িষা উভয়ের মধ্যে সরশুনা গ্রামের উত্তরাংশে রাজধানীর স্থান নির্দ্দেশ করেন। ঐ স্থানে যে দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম—রায়গড় দুর্গ। দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখন বিশেষ কিছু নাই ; কেবল স্থানে স্থানে ইষ্টক ও পরিখার চিহ্ন বর্ত্তমান। আর সেই দুর্গের পার্শ্বে যে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনিত হয়, তাহা এখনও 'রায়দীঘি' বলিয়া খ্যাত।[১] উহা প্রায় ষাট বিঘা জলাশয়, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫০০´×৬০০´ ফুট হইতে পারে। বেহালার শেষ সীমায় চৌমাথা হইতে পশ্চিমমুখে বজ্‌বজ্‌ পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা গিয়াছে, উহারই পার্শ্বে বাসুদেবপুর গ্রামের সীমায় এবং সরশুনার

১ দীঘিটি এখনও অত্যন্ত গভীর ; উহাতে বারমাস জল থাকে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা দামদলে একেবারে ঢাকা ছিল, এখন অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে। তবুও কূলের দিকে হোগলা ও নল নটা যথেষ্ট আছে। কেহ কেহ উহার কতকাংশ ঘিরিয়া লইয়া আপন আপন পুকুর করিয়া লইয়াছেন। উত্তর পাহাড়ে পুষ্প ব্যবসায়ী কৈবর্ত্তদিগের বাস। তাঁহাদের একজন বাঁধ দিয়া দীঘির যে অংশ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, তাহার উত্তর কূলে একটি পুরাতন পাকা ঘাট আছে। দীঘিটি এখন বামাচরণ রায় মহাশয়ের জমার অধীন ; দীঘিতে অনেক মৎস্য আছে, তজ্জন্য উহার জলকর আছে এবং [illegible] উহার [illegible] ২।১টি মেছকুমীর জুটিয়াছে।

উত্তর গায়ে এই দীঘি অবস্থিত। উক্ত চৌমাথা হইতে পূর্ব্বমুখে এক ক্রোশ দূরে আদিগঙ্গার ঘাট, ঐ স্থানে এক সময় ৺করুণাময়ী কালীমাতার মন্দির ছিল। এখনও উহা 'করুণাময়ীর ঘাট' বলিয়া পরিচিত। রায়দীঘি হইতে এখন গঙ্গার দূরত্ব প্রায় তিন মাইল; পূর্ব্বে এত দূর ছিল না, গঙ্গা মজিয়া চড়া পড়িয়া যাওয়ায় রায়গড়ের ভদ্রাসন এত দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। সরগুনা গ্রাম হইতে আদিগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথের নিদর্শন পাওয়া যায়; ইহাকে লোকে 'দ্বারির জাঙ্গাল' বলে।[১] গঙ্গা পার হইয়াও এই জাঙ্গাল পূর্ব্বমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এখনও অনেক স্থলে উহার উচ্চ ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, বসন্তপুরের পর পারে কালিন্দীর তীর পর্য্যন্ত উচ্চ গড় বা জাঙ্গাল ছিল বলিয়া বুঝা যায়। এই গড়ের উপর দিয়া রায়গড় হইতে ধূমঘাট যাতায়াত করিবার সুবিধা ছিল। এখনও বর্ত্তমান হিঙ্গুলগঞ্জের হাটের উত্তরধারে পশ্চিমমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত উচ্চ গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। এখন উহার নিকট দিয়া হাসনাবাদের খাল খনিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা, রায়গড়ের সহিত যশোহর দুর্গের সম্বন্ধ ছিল, যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, এখনও তাহার অস্পষ্ট প্রমাণ আছে। রায়গড়ও একসময়ে সুরক্ষিত সুন্দর দুর্গ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের কোন নিদর্শন নাই। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র ঘোষ সত্যই লিখিয়া গিয়াছেন, 'রায়গড়ের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে এখন তাল পুকুরের তালের ন্যায় বোধ হয়।'[২]

যেরূপ জাঙ্গালের কথা বলা হইল, নিম্নবঙ্গে তেমন পুরাতন জাঙ্গাল অনেক

১ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র গ্রন্থকার ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বলেন, বর্দ্ধমানাধিপের এক রাজধানী এক সময়ে এই স্থানে ছিল। দ্বারি নামক তাঁহারই কোন মহিলার অর্থে এই জাঙ্গাল নির্ম্মিত হয়। সেই রাজারই বাইমহল এখন বেহালা নামে পরিচিত। এখনও বেহালার দক্ষিণসীমায় সখের বাজার আছে। দ্বারির জাঙ্গাল নামের উৎপত্তি এইভাবে হইতে পারে; কিন্তু বসন্ত রায়ের সময়ে সে জাঙ্গাল সংস্কৃত ও প্রলম্বিত হইয়া দীর্ঘ গড়ে পরিণত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে।

২ ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষ সরগুনার ঘোষবংশীয় স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন, সোসাইটির বাৎসরিক বিবরণী হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস ও সুন্দরবন সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। (*See*, Proceedings of the Asiatic Society for December, 1868) রায়দীঘির দক্ষিণভাগে তাঁহার আবাস বাটী ছিল। এখনও তথায় তাঁহাদের [illegible] বাড়ী আছে। ১২৭৫ সালে যখন তিনি 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করে[illegible]

দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও লোকে উহা নির্ম্মাণ করে। উহার সাধারণ নাম গড়। এখনও লোকে গড় তুলিয়া বাড়ী করে; সাধারণ প্রজারা নিজের জমির সীমা দিয়া যে পগার কাটে তাহাকে গড় বলে এবং উহার মাটী তুলিয়া ঢিপি করিয়া যে প্রাচীর তৈয়ার করে, তাহাকেও গড় বলে। প্রকৃতপক্ষে পগারের নাম গড়খাই বা পরিখা এবং উপরের প্রাচীরের নাম গড়। প্রতাপাদিত্যের সময়ে এই গড়ে অনেক উদ্দেশ্য সাধন করিত; ইহার জন্য বানবন্যায় নদীর জল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না; ইহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাতায়াত এবং পণ্য বা রসদ প্রেরণ করা চলিত; ইহার উপরে বা পশ্চাতে সৈন্য রাখিয়া শত্রুর গতিরোধ করা হইত। প্রতাপাদিত্য প্রধানতঃ এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানীর দূর সীমান্তে এইরূপ গড় রচনা করিয়াছিলেন।

৪ কমলপুর দুর্গ॥ আমরা রায়গড় হইতে পূর্ব্বমুখে যমুনা পর্য্যন্ত এইরূপ গড়ের চিহ্ন পাইয়াছি। বর্ত্তমান কালীগঞ্জের[১] নিকট যমুনা পার হইয়া এই গড় পুনরায় পূর্ব্বমুখে রহিমপুর, মহব্বৎপুব, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া খোলপেটুয়া নদী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যমুনা কূল হইতে শ্রীপুর পর্য্যন্ত তিন চারি মাইল স্থানে এই গড় খুব উচ্চ এবং প্রশস্ত আছে। কোন কোন স্থানে ইহার উচ্চতা ষোল-সতর ফুট পর্য্যন্ত হইবে, এবং ইহার উপর দিয়া দুইজন অশ্বারোহী স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি চলিয়া যাইতে পারিত। এই গড়ের দক্ষিণে স্থানে স্থানে বড় বড় দীঘি আছে।[২] এই গড়ের উপর মধ্যে মধ্যে বুরুজ ছিল;

জঙ্গল ছিল। উক্ত পুস্তকে ঐ সময়ের ও ২০ বৎসর পূর্ব্বের ফটোগ্রাফ হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া হয়। তাহাতে রায়গড়ের দুর্গের একটি সুরঙ্গ ও রায়দীঘির চিত্র আছে।

১ কালীগঞ্জ নাম আধুনিক। প্রতাপের পতনের পর বাজিতপুর পরগণা নদীয়ার রাজার হস্তগত হয়। চাঁচড়ার রাজা কৃষ্ণরাম (১৭০৫-১৭২৯) ঐ পরগণা খরিদ করেন। কালক্রমে তাহা কলিকাতার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের হস্তে যায়। তদ্বংশীয় কানাইলাল ঠাকুর নারায়ণপুরে কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তজ্জন্য কালীগঞ্জ নাম হয়। ঠাকুরবাবুরা বাজিতপুর Mr. Archibald Grantএর নিকট বন্ধক রাখেন। গ্রাণ্টের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে খরিদাসূত্রে উহার বার আনা অংশ এক্ষণে সাতক্ষীরার জমিদারদিগের সম্পত্তি হইয়াছে। *See*, Westland—*Jessore*, p. 59.

২ গড়ের আধ মাইল দক্ষিণে শ্রীকলা গ্রামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের নাম 'বাসুদেব রায়ের দীঘি।' উহার পাহাড়ের উপর ঘোড়ানাল ফকিরের আস্তানা ছিল।

তথায় প্রকাণ্ড কামান সকল পাতা থাকিত। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও মহব্বৎপুরের গড়ে দুইটি প্রকাণ্ড কামান ছিল।[১] কালীগঞ্জ হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তারালি নামক স্থানে[২] আর একটি এক মাইল দীর্ঘ গড় দেখিতে পাওয়া যায়, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। ঐ গড়ের উপর একস্থানে যে হাট বসে, তাহাকে 'গড়ের হাট' বলে।

মহব্বতপুরের গড়টি খোলপেটুয়া নদী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তখন খোলপেটুয়া এখনকার মত বড় নদী ছিল না। সম্ভবতঃ সেতুদ্বারা নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নদীর পর পার হইতে সমুচ্চ প্রকাণ্ড গড় পুনরায় প্রায় ৩ মাইল দূরবর্ত্তী কপোতাক্ষী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ণ দুই মাইল পর্য্যন্ত এই গড় বেশ ভাল অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।[৩] এই গড়ের উত্তর পার্শ্বে প্রতাপাদিত্যের নামানুসারে

১ উহার একটি কামান যমুনার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। অপরটি একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী আসিয়া লইয়া যান। কালীগঞ্জ নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তিনি এখনও জীবিত আছেন।

২ রাম গোস্বামী নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধকপুরুষ উত্তরশ্রীপুরে বাস করিতেন। তিনি তারালি, মাঘুরালি এবং লক্ষ্মীনাথপুর, এই তিন স্থানে তিনটি কালীবাড়ী ও সাধনপীঠ স্থাপন করেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ এই তিনটি পরস্পর দূববর্ত্তী স্থানে মায়ের পূজা করিতেন। একদা তিনি শুভক্ষণে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রথমতঃ তিনি নলতার পার্শ্ববর্ত্তী কালীবাটীতে সাধনা করেন, কিন্তু মা সেখানে তাঁহাকে দর্শন দিলেন না, তাই তিনি বলিয়াছিলেন, 'মা! ঘুরালি' অর্থাৎ আমাকে দেখা দিলি না; তাই সে স্থানের নাম হইল 'মাঘুরালি'। পররর্ত্তী সাধনপীঠে তারা মা তাঁহাকে দেখা দিলেন, তখন তিনি পূর্ণানন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তারা! এলি'—তাই সে স্থানের নাম হইল 'তারালি'। তিনটি স্থানেই মায়ের মূর্ত্তি নাই, ঘটে পূজা হয়। মাঘুবালিতে একখানি প্রস্তরময় যোনিপীঠে পূজা হইত, সে পীঠ আছে এবং মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। সেখানকার মন্দিরটি বেশ উচ্চ, উহার গর্ভমন্দিরটির পরিমাণ ১৬'-২" × ১৬'-২"; ঈশান কোণে একটি শিবমন্দির ছিল, উহা ভগ্ন হওয়ায় লিঙ্গটি মায়ের মন্দিরে আনীত হইয়াছে।

৩ এই গড়ের বিস্তৃতি ১৬০' ফুট হইতে ২২৫' ফুট পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে ৮।১০ ফুট উচ্চ আছে। কপোতাক্ষীর নিকটবর্ত্তী আধ মাইল স্থানে গড়টি নদীর সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ কপোতাক্ষী নদী মজিয়া যাওয়ায় এই আধ মাইল স্থান চড়া পড়িয়াছে। লোকে বলে এসব দেবতার কীর্ত্তি; এক রাত্রিতে এই প্রাচীর গঠিত হয়; রাত্রি শেষ হইলে খনকেরা ঝুড়ি ফেলিয়া চলিয়া যায়। এখনও একটা স্থানকে 'ঝুড়িঝাড়া' বলে। খুলনা জেলায় এমন প্রবাদ অনেক স্থানের সম্বন্ধে আছে; তালার নিকট 'আগড়ঝাড়া'র স্তূপ, আগরহাটির নিকট 'ডালিঝাড়া' নামক ভিটা দৃষ্টান্তস্থল (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২১২ পৃ)। এই গড়ের মুখে খোলপেটুয়ার সন্নিকটে

প্রতাপনগর গ্রাম এবং দক্ষিণ ধারে গড়-কমলপুর। কমলখোজা নামে প্রতাপের যে একজন বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নামানুসারে এই দুর্গের নাম কমলপুর দুর্গ। ইহাকে সাধারণতঃ কপোতাক্ষী দুর্গ বলা হইত এবং ইহা পূর্ব্বদেশীয় বা ভৈরব ও কপোতাক্ষী পথে আগত শত্রু নিবারণের জন্য একটি প্রধান বহির্ব্বল ছিল। এই দুর্গ খোলপেটুয়া হইতে কপোতাক্ষী পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহার উত্তর সীমায় গড় ও দক্ষিণ সীমায় একটি পরিখা ছিল। সে পরিখা এক্ষণে খালে পরিণত হইয়াছে। খালের দক্ষিণে একটি সুপেয় সলিলপূর্ণ পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। দুর্গের পূর্ব্বভাগে কপোতাক্ষীর পূর্ব্বধারে যেখানে এক্ষণে ভীষণ জঙ্গল রহিয়াছে, তথায় দমদমা ও গাদিগুমা নামক স্থানে এই দুর্গের ব্যবহারোপযোগী গোলাগুলি প্রস্তুত হইত।

৫ বেদকাশী দুর্গ॥ গড় কমলপুর হইতে কপোতাক্ষী দিয়া একটু দক্ষিণদিকে আসিলে কপোতাক্ষী ও খোলপেটুয়ার মোহানায় পড়া যায়। সেখান হইতে যুক্তনদী আড়পাঙ্গাসিয়া নামে সমুদ্রগামী হইয়াছে। ঐ মোহানা হইতে গোলখালি দিয়া শাঁখবাড়িয়ায় পড়িতে হয়; সে নদীতে জোয়ার দিয়া উত্তরমুখে গেলে নদীর পশ্চিমপারে বিখ্যাত বেদকাশী নামক স্থান।[১] তথায় প্রতাপাদিত্যের বেদকাশী দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। স্থানীয় লোকে এই দুর্গকে 'বড় বাড়ী' বলে; উহার ইষ্টক গ্রথিত বহিঃপ্রাচীরের ভগ্নাংশ এখনও আছে। স্থানে স্থানে উচ্চ গৃহগুলির ভগ্নস্তূপ একতালা বাড়ীর মত উচ্চ রহিয়াছে। দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, উহার পরিমাণ ১৫০০×৮০০ হাত হইবে। দুর্গের চারিপাশে এখনও পরিখা আছে, তাহার বিস্তৃতি ৬০´ ফুটের কম নহে। দুর্গের মধ্যে

একটি ভাল পুষ্করিণী আছে, উহার জল সুমিষ্ট এবং বহুদূর হইতে লোকে আসিয়া তথাকার জল লইয়া যায়। এই সুবিস্তৃত গড় একটি সম্পত্তিবিশেষ। বহুলোকে গড়ের উপরে ও পার্শ্বে বাড়ী করিয়া গড়টিকে একটি গ্রাম করিয়াছে এবং গড়গ্রামে তাহাদের বাড়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। পুষ্করিণীটির দক্ষিণ পারে যে হাট হয়, তাহার নাম গড়ের-হাট এবং পূর্ব্ব পারে জমিদারী কাছারী। চকগড়ে ২৫ হাজার বিঘা জমিতে ২০,০০০ টাকা হস্তবুদ আছে; অবশ্য গড় ও নিকটবর্ত্তী আবাদ লইয়া চকগড় হইয়াছে। ঢাকা নিবাসী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সম্পত্তির মালিক।

১ প্রতাপনগরের সমসূত্রে কপোতাক্ষী পার হইলে মদিনার আবাদে (২১২ নং লাট) আট্‌রা গ্রামের মধ্য দিয়া শাঁখবাড়িয়া পর্য্যন্ত সোজা রাস্তা ছিল। তখন নদীপথে ঘুরিয়া বেদকাশীতে যাইতে হইত না। উক্ত রাস্তার চিহ্ন এখনও আছে।

২।৩টি পুকুর আছে, একটির নাম শীলপুকুর ; সেটি সম্ভবতঃ পোস্তবাঁধা ছিল। দুর্গের মধ্যে সর্ব্বত্র রাশি রাশি ইষ্টক এখনও আছে ; অনেক লোকে এই ইট কুড়াইয়া লইয়া কাদার গাঁথুনি করিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছে। দুর্গের বাহিরে বসন্ত রায়ের প্রতিষ্ঠিত উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির ও অন্যান্য মন্দির ছিল। সে কথা পরে বলিব।

৬ শি ব সা দু র্গ॥ বেদকাশী হইতে বজ্‌বজে নদী দিয়া আড়ুয়া-শিবসা নদীতে পড়িতে হয়, অনতিদূরে এই আড়ুয়া-শিবসা এবং মূল শিবসা মিশিয়া প্রকাণ্ড ত্রিমোহানা হইয়াছে, উহাকে 'রূপসার দহ' বলে ; এই স্থান হইতে যুক্তনদী মর্জ্জাল নামে সমুদ্রে পড়িয়াছে। মোহানার নিকট মর্জ্জালের পূর্ব্বপারে সুন্দরবনের আধুনিক ২৩৩নং লাট ; উহাকে সাধারণতঃ 'সেখের টেক' বলে। এই স্থানে প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বদেশীয় শত্রু বা দস্যুর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য একটি দুর্ভেদ্য ইষ্টকদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহাকে আমরা শিবসা দুর্গ বলিয়া পরিচিত করিব। পূর্ব্বে সেখের খাল, দক্ষিণে কালীর খাল, পশ্চিমে মর্জ্জাল বা মার্জ্জার নদী এবং উত্তরে শিবসার মোহানা, এই সন্ধিস্থানে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের বিশেষ বিবরণ ত দূরের কথা, অস্তিত্বের সংবাদও বিশেষ ভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই।[১] দুর্গের বেষ্টন প্রাচীর সর্ব্বত্র ইষ্টক-রচিত, উহার বেধ ৫ ফুট। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, কোন কোন ঘরের ভিতর

১ বনবিভাগীয় বিবরণী হইতে সরকারী রিপোর্টে অতি অল্পদিন হইল লিখিত হইয়াছে : 'On the east bank of the Marjal river, are the ruins of what appears to have been a fort, enclosed court-yard or square, built of burnt country bricks, and enclosing a tank about 120 feet square. This is situated about 500 yards from the Marjal river in allotment No. 233'—Khulna Gazetteer, p. 50.

আমরা বহুকষ্টে এই ভীষণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার বিবরণ ও চিত্র সংগ্রহ করিয়াছি, ফটো লইবার সময়েও কিভাবে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কয়েকজনকে বন্দুকহস্তে সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল, মন্দিরের ছবিতে তাহার পরিচয় আছে। (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৮০-৮১ পৃ)। স্থানটি নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের জমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। দুর্গের ভিতরে ও বাহিরে নিবিড় অরণ্য। গাবগাছ, বটজাতীয় বড় গাছ, জিওলগাছ, শটীগাছ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যাবাসের পরিচয় দেয়। দুর্গের উত্তরদিকের প্রাচীরের ফটো লওয়া হইল। উহাতে যে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ শায়িত দেখা যাইতেছে, তাহা একটি গাবগাছ। আর যে একটি গাবগাছ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহার বেষ্টন ১৩ ফুট।

দেওয়াল অনেকটা ঠিক আছে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে দুর্গের তোরণ-দ্বার ছিল। ইহার চতুঃপার্শ্বে পরিখার চিহ্ন আছে এবং বাহিরে একটি প্রকাণ্ড দীঘির খাত রহিয়াছে। দুর্গটির বাহিরে ঈশান কোণে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে ; উহা শিব-মন্দির বলিয়া অনুমান হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে কালীর খালের কূলে প্রতাপাদিত্যের যে কালীর মন্দির এখনও একপ্রকার অভগ্ন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতেছে, উহার বিশেষ বিবরণ সুন্দরবনের ইতিহাসে দিয়াছি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৮০-৮১ পৃ)।

৭ জ গ দ্দ ল দুর্গ ॥ মোগলদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের রীতিমত সংঘর্ষ আরম্ভ হইলে, রায়গড় হইতে আরও উত্তরদিকে, বর্ত্তমান কাঁকনাড়া ও ভট্টপল্লীর সন্নিকটে জগদ্দল নামক স্থানে আর একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয় ; উহারই নাম জগদ্দল দুর্গ। ইহা গঙ্গার ঠিক পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ; তিন দিকে বিস্তৃত পরিখা ছিল ; কেবল মাত্র পশ্চিমদিকে ভাগীরথী দ্বারা পরিখার কার্য্য হইত। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রতাপের পূর্ত্ত-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা জগৎসহায় দত্তের নামানুসারে জগদ্দল নাম হইয়াছে ; উহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ জগদ্দল নাম পূর্ব্বেও ছিল।[১] যদিও নানা কলকারখানায় জগদ্দলের অধিকাংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তথাপি তথাকার দুর্গচিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। পরিখাগুলি সুস্পষ্ট আছে, স্থানে স্থানে উহার খাত পুষ্করিণীতে পরিণত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া সদর রাস্তা চালাইবার জন্য রীতিমত পুল করিতে

১ প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বেও জগদ্দল ছিল। বঙ্গদেশের একটি বৌদ্ধ মহাবিহারের নাম ছিল, জগদ্দল। কিন্তু সে জগদ্দল এখানে কিনা, বলা যায় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের মতে সে জগদ্দল পূর্ব্ববঙ্গে রামপালের নিকট ছিল। মালদহে জগদ্দল নামে দুইটি প্রাচীন স্থান বাহির হইয়াছে। উহার কোন একটি জগদ্দল মহাবিহার হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন (আর্য্যাবর্ত্ত, কার্ত্তিক, ১৩১৮, ৪৯২ পৃ)। এখানেও যে গঙ্গাতীরে সেই মহাবিহার থাকিতে পারে না, তাহা নহে। হয়ত তাহার চিহ্নাদি দেখিয়াই প্রতাপ এস্থানে দুর্গ স্থাপনের মত করেন এবং হয়ত নামের মিল দেখিয়া জগৎসহায় দত্তেরও এখানে দুর্গ-নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরের সিংহল যাত্রার বর্ণনায় জগদ্দলের উল্লেখ আছে :

'গরিফা ছাড়িয়া ডিঙ্গী গেল গোন্দলপাড়া,
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া।'

এই ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল। নিশ্চয়ই তাহার অনেক পরে এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

হইয়াছে। দুর্গের মাঝখানে এখনও একটি বাঁধাঘাটওয়ালা পুষ্করিণী 'রাজ-পুষ্করিণী' নামে কীর্ত্তিত হয়। ভাগীরথীর উপর যেখানে দুর্ভেদ্য প্রাকার-বেষ্টিত রাজবাটী ছিল, তথায় কতজনে গঙ্গাবাসের জন্য বাড়ী করিয়া লইয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের সময়ে জগদ্দল দুর্গ রাজপরিবারের গঙ্গাবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত। বসন্ত রায়ের সহিত রাজ্য বিভাগের পর তিনি যেমন অধিকাংশ সময় সপরিবারে রায়গড়ে বাস করিতেন, প্রতাপও সেইরূপ কখনও কখনও জগদ্দলে থাকিতেন।[১]

৮ সালিখা দুর্গ ॥ প্রতাপাদিত্যের আর একটি দুর্গের নাম সালিখা দুর্গ। এই সালিখা দুর্গ কোথায়, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। রাজ-বংশীয়দের বংশগত প্রবাদ হইতে জানা যায়, সালিখা নামে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। কাটুনিয়ার রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, বর্ত্তমান কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে সালখিয়া আছে, সেখানেই প্রতাপের দুর্গ ছিল এবং এই স্থানে ভাগীরথী-বাণিজ্যের শুল্ক আদায় হইত। রেলওয়ে কোম্পানিগুলির কার্য্যের উৎপাতে হাওড়া সহরের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, কোন প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন, কিছুই উদ্ধার করিবার উপায় নাই। রামরাম বসুও বলেন, সালকিয়া থানায় প্রতাপের সহিত মোগলদিগের শেষবার যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে সালখা হাওড়ার সালখিয়া বলিয়া বোধ হয় না। 'বহারিস্তান' নামক পারসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, শেষবার সাল্‌খায় মোগলের সহিত প্রথম নৌযুদ্ধ হয় এবং উহা যশোর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত।[২] আরও জানিতে পারি, ঐ যুদ্ধের পরদিন কুচ (march) করিয়া মোগল সৈন্য বুধন বা বুড়ন দুর্গে পৌছিয়াছিল। এই বুড়ন প্রতাপের রাজধানী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে, কারণ তিনি একটি

১ প্রতাপের সঙ্গে যশোহর হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ কায়স্থগণ উঠিয়া আসিয়া জগদ্দলে বাস করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ গোত্রীয় বৈদিক ভট্টাচার্য্যগণের আদিপুরুষ নারায়ণ ভট্ট তাঁহার শ্বশুর যশোহর-পরমানন্দকাটি নিবাসী রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিয়া তথা হইতে আসিয়া জগদ্দলের পার্শ্বে যেখানে বাস করেন তাহারই নাম হয় ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া। যে সব বঙ্গজ কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ২।১ ঘর এখনও আছেন, কিন্তু তাঁহারা সামাজিক সুবিধার জন্য দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন।

২ 'প্রবাসী', ১৩২৭ কার্ত্তিক, ৩-৪ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

খাল দিয়া সহজে সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন। এই খালটি বোধ হয় এখনকার কালিন্দী নদী। হাসনাবাদের দক্ষিণে বুড়নহাটি নামক যে স্থান আছে, খুব সম্ভবতঃ উহাকেই মোগলেরা বুড়ন দুর্গ বলিয়াছেন। ঐ স্থানে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যসামন্তের সাময়িক ছাউনি পড়িত, কোন সুরক্ষিত দুর্গ ছিল না। ঐস্থান হইতে উত্তরদিকে ১০।১২ মাইল দূরে ইছামতীর কূলে সাল্‌খা হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, যমুনা ও ইছামতী যে টিবির মোহানায় মিশিয়াছে, তাহারই সান্নিধ্যে কোথায়ও সাল্‌খা থানা ছিল; ঐ মোহানার নিকটে সাল্‌খি বলিয়া একটি নদী ইছামতীতে মিশিয়াছিল। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে সে নদী আছে,[১] কিন্তু আধুনিক ম্যাপে নাই। সম্ভবতঃ নদীটি মজিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। এই নদীর মোহানায় সাল্‌খা থানা হওয়া খুব সম্ভবপর। কারণ, এই স্থানে পর্য্যাপ্ত নৌবাহিনী লইয়া দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলে উত্তরদিকের শত্রু ভাগীরথী-যমুনা বা ভৈরব-ইছামতী যে পথেই আসুক না কেন, তাহার গতিরোধ করা যায়। সম্ভবতঃ এইস্থানে মোগলের সহিত প্রথম নৌযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সে যুদ্ধ কয়েকদিন চলিয়াছিল (রামরাম বসুর মতে যুদ্ধ সাতদিন চলিয়াছিল); এই কয়েক দিন মোগলেরা যেমন অগ্রসর হইতেছিল, প্রতাপের সৈন্যদল তেমনি হটিয়া যাইতেছিল, পরে কয়েকদিন পরে যেখানে যুদ্ধ শেষ হইল, সেখান হইতে বুড়ন ১০।১২ মাইল বা একদিনের দূরবর্ত্তী হইতে পারে। মোটকথা, ইছামতীর কূলবর্ত্তী টাকি প্রভৃতি স্থান হইতে টিবির মোহানা পর্য্যন্ত যে স্থানে সাল্‌খা ছিল সেখানে প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত একটি মৃন্ময় দুর্গ রচনা করিয়া লইয়াছিলেন।

যে কয়েকটি দুর্গ বর্ণিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, উত্তর দিক হইতে শত্রু (অর্থাৎ মোগল শত্রু) আসিলে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের কি ব্যবস্থা ছিল। শত্রু প্রধানতঃ ভাগীরথী দিয়াই আসিবার কথা; সে পথে আসিয়া শত্রু যদি ত্রিবেণী হইতে যমুনাতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাধা দেওয়া হইত না; শত্রুকে সাহসে ভর করিয়া যমুনাপথে অনেকদূর যাইতে হইত। দৈবক্রমে ভৈরব ও ইছামতী দিয়া শত্রু আসিলেও ঐ একই কথা, যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমের পূর্ব্বে তাহাকে

১ Rennel—*Bengal Atlas*, Map No. 1.

বাধা দেওয়া হইত না। প্রয়োজন হইলে সেই সঙ্গমস্থলে, অর্থাৎ টিবির মোহানায় (সম্ভবতঃ এইস্থানেরই নাম ছিল সালখা) নৌবাহিনী দ্বারা শত্রুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইত। নতুবা তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল বন্য নদীপথে আরও অগ্রসর হইতে দেওয়া হইত। কালিন্দী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে, বসন্তপুরের নিকটে আসিয়া শত্রুবাহিনী দেখিত প্রতাপের অসংখ্য রণতরী কামান সজ্জিত করিয়া বিপক্ষের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। এক পারে বুড়নে সৈন্য-শিবির, অপর পারে দমদমার গুলি-বারুদখানা। সেখান হইতে একটু অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ দিকে মুকুন্দপুর দুর্গ এবং মহব্বৎ-পুরের গড়ের অসংখ্য অগ্নিবর্ষী তোপ সজ্জীভূত। সে সব স্থানেও যদি যুদ্ধজয় করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে যমুনা বাহিয়া আরও অগ্রবর্ত্তী হইতে বিপক্ষের পক্ষে সুযোগ হইত, তাহা হইলে যমুনা ও ইছামতীর মুক্ত সঙ্গমে যশোহরের দুরাক্রম্য দুর্গের ভীষণ বুরুজখানা তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইত। শত্রু যদি যমুনা বা ইছামতী দিয়া না আসিয়া ভৈরব পথে কপোতাক্ষ দিয়া আসিত, তাহা হইলে তাহার অভ্যর্থনার জন্য কমলপুরের কপোতাক্ষদুর্গ, এবং আরও পূর্ব্বদিকে যদি শিবসা বাহিয়া আসিত, তবে শিবসা দুর্গ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু উত্তর দেশীয় শত্রুর পক্ষে শিবসা পথে আসা সহজ বা সুবিধাজনক ছিল না। এজন্য শিবসা ও বেদকাশী দুর্গ সাধারণতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশীয় শত্রুকেই বাধা দিত।

শত্রু-সৈন্য যদি ভাগীরথী হইতে যমুনায় প্রবেশ না করিয়া আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে প্রথমতঃ জগদ্দলে পরে রায়গড় হইতে তাহাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা হইত। তখন খিদিরপুর হইতে খনিত খালে ভাগীরথীর সহিত সরস্বতী বা রূপনারায়ণের সংযোগ হয় নাই, তখন আদিগঙ্গা পথেই বাণিজ্য পথ ছিল। সে পথে গেলে বিদ্যাধরী নদী দিয়া বর্ত্তমান মাতলার কাছে পৌঁছিতে হয়। সেখানে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। বিদ্যাধরীতে না পড়িয়া গঙ্গার পথে গেলে গঙ্গার সাগরসঙ্গমে সগরদ্বীপ; সেই স্থানে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীর পর্য্যাপ্ত সমাবেশ ছিল। উত্তরদিগ্বর্ত্তী শত্রুর কখনও নানা বাধা অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে পড়িবার সাধ থাকিত না। মাতলা বা সগর দুর্গ প্রধানতঃ মগ ও ফিরিঙ্গি প্রভৃতি সামুদ্রিক দস্যুদিগের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু এই দুইটি দুর্গ নহে, দক্ষিণ দিকেও শ্রেণীবদ্ধ-

ভাবে কতকগুলি নৌদুর্গ ছিল। তাহারই কথা এখন বলিব। উত্তর সীমায় যেমন শিবসা হইতে রায়গড় পর্য্যন্ত ৫।৬টি দুর্গ ছিল, এবং এই সকল স্থানে যেমন স্থল-যুদ্ধের উপাদানই প্রধানতঃ সজ্জীভূত থাকিত, দক্ষিণ দিকের মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি শত্রুর জন্য সেইরূপ ধূমঘাট হইতে মাতলা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী-মোহানায় এক শ্রেণী দুর্গ ছিল, এবং সেই সকল দুর্গে জলযুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত রণ-তরীসমূহ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। প্রথমোক্ত দুর্গশ্রেণীতে রসদাদি ও লোকজনের যাতায়াত জন্য যেরূপ উচ্চ মৃন্ময় গড় প্রস্তুত হইয়াছিল, দক্ষিণ দিকের দুর্গশ্রেণীর জন্যও সেইরূপ স্থানে স্থানে খনিত খাল দ্বারা নদীপথে যাতায়াতের জন্য সোজা পথ আবিষ্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল। মানচিত্র হইতে ইহা সহজে বোধগম্য হইবে।

৯ মা ত লা দু র্গ॥ কপোতাক্ষ দুর্গ হইতে দক্ষিণ দিকে খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষী নদী মিশিয়া আড়পাঙ্গাসিয়া নাম ধারণ করে। আবার ধূমঘাটের নিম্নে ইছামতী নদী যমুনা হইতে বিমুক্ত হইয়া উক্ত পত্তনের পূর্ব্বসীমায় কদমতলী নাম ধারণ করে এবং পরে দক্ষিণদিকে আসিয়া মালঞ্চ হয়। বহু দক্ষিণে আসিয়া এই মালঞ্চ আবার আড়পাঙ্গাসিয়ার সহিত মিশিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। ধূমঘাট পত্তনের দক্ষিণে মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যে সামান্য ব্যবধান ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে এক খনিত খাতের দ্বারা এই ব্যবধান বিলুপ্ত হয়। এই খাতের নাম 'আড়াইবাঁকীর দোয়ানিয়া'[১] কারণ উহা মাত্র আড়াই বাঁক দীর্ঘ। আড়াইবাঁকীর নয়নাভিরাম মোহানা হইতে একটু দক্ষিণে গেলে মালঞ্চ ও যমুনার মধ্যে সামান্য ব্যবধান ছিল, প্রতাপের পর্টুগীজ সেনাপতির ব্যবস্থায় আর একটি খনিত খাত দ্বারা উভয়ের সংক্ষিপ্ত সংযোগ সাধিত হয়; এই খাতকে এখনও 'ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়া' বলে। এই দোয়ানিয়ার মুখ হইতে যমুনা পথে একটি শাখানদী দিয়া রায়মঙ্গলে পড়িতে হয়;[২] রায়মঙ্গল বাহিয়া আরও উত্তরদিকে আসিয়া বড় কলাগাছিয়া ও আঠারবাঁকী নদী দিয়া অবশেষে

১ যে নদী বা খালের দুই দিক হইতে জোয়ার ভাটা চলে তাহাকে দোয়ানিয়া বলে; অসংখ্য প্রশস্ত নদী থাকার জন্য সুন্দরবনের অধিকাংশ খালই দোয়ানিয়া বা দ্বিমুখী। ১ম খণ্ডে সুন্দরবনের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২ এই শাখা নদী এক্ষণে ১৭৬ নং লাটের দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কালিন্দী শাখাই নিম্নে আসিয়া রায়মঙ্গলে মিশিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

মাতলার কাছে বিদ্যাধরীতে মিশিতে হইত, মাতলার নিকট সেই মোহানায় একটি দুর্গ ছিল। ইহাকে মাতলাদুর্গ বলে; প্রতাপের বিখ্যাত সেনাপতি হায়দর মানক্লী এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল—হায়দরগড়।[১]

১০ আ ড়া ই বাঁ কী দু র্গ॥ আড়পাঙ্গাসিয়া ও মালঞ্চের মধ্যবর্ত্তীস্থানে পূর্ব্বোক্ত আড়াইবাঁকীর খনিত খালের উত্তরাংশে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীর প্রধান আড্ডা ছিল। অগাষ্টাস্ পেড্রো নামক একজন বিখ্যাত পর্টুগীজ নৌ-সেনাপতি এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই দুর্গকে আড়াইবাঁকীর দুর্গ বা ফিরিঙ্গি দুর্গ বলা যাইতে পারে।[২] দুর্গের নিম্নে নৌবহর রাখিবারও ব্যবস্থা ছিল। একটু পূর্ব্বদিকে বংশ-কঞ্চিকার মত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একটি খাল খনিত হয়। ইহাকে কঞ্চিকার খাল বলিত।[৩] ঝটিকাদির সময়ে সমস্ত জাহাজ ও নৌকা নিরাপদে এই খালের মধ্যে রাখা হইত। ধূমঘাট দুর্গ হইতে মাতলা দুর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত জলপথের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য ফিরিঙ্গি সেনাপতি দ্বারা সাধিত হইত; এজন্য এই দীর্ঘ জলপথকে 'ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি' বলিত, ইহা ফিরিঙ্গি জাতীয় নাবিক প্রহরী দ্বারা রক্ষিত কর্ম্মক্ষেত্র। শত্রুর গতিবিধি দেখিবার জন্য এই পথে সর্ব্বদা চৌকি-নৌকা বা রণতরী চলাফেরা করিত এবং মোহানায় মোহানায় সাহায্যকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহর সজ্জিত থাকিত। এই বহরের অধ্যক্ষদিগকে মীরবহর বলিত। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশদভাবে দেখাইয়াছি, আরাকানী মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুরা কিরূপে বঙ্গোপসাগর হইতে নদীপথে দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া শান্ত পল্লীবাসীর ধনপ্রাণ ও মানসম্ভ্রমের উপর অত্যাচার

১ এই দুর্গের স্থান বর্ত্তমান মাতলা বা ক্যানিং সহরের উত্তরাংশে অবস্থিত। এস্থানে এখনও বুরুজখানা প্রভৃতি উঁচু ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়; নিকটে প্রতাপনগর নামক গ্রাম, কুঠি বাড়ী, রাজার খাল, হায়দর আবাদ এখনও অনেক প্রাচীন কথা মনে করাইয়া দেয়। এই হায়দর আবাদ এক্ষণে সুন্দরবনের ৫৭ নং লাটের অন্তর্গত। ইহাকে সাধারণ লোকে হেদে বলে।

২ এই দুর্গ ১৭৩ নং লাটের অন্তর্গত। ইহাকে নৌদুর্গ বলা যাইতে পারে; নদীর মধ্যে রণতরী প্রভৃতি রাখিবার ভাল ব্যবস্থা ছিল। উপরে সাধারণ দুর্গের মধ্যে অধ্যক্ষ অগাষ্টাস্ পেড্রোর কুঠি ছিল। যেখানে তাহার সামান্য ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাকে লোকে 'বড় কুঠি' বলে।

৩ কঞ্চীর দোয়ানিয়া এখনও আছে। সরকারী ম্যাপেও উহা কুঞ্চি (Koomchee) নামে লিখিত হইয়াছে। এই কঞ্চী এক্ষণে ২০২ নং লাটের পূর্ব্ব বেষ্টন হইয়াছে।

আরম্ভ করিয়াছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির সুরক্ষণ ও সুব্যবস্থা করিয়া এই দস্যুদলকে বারংবার পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে দেশরক্ষা করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতীয় প্রজাবর্গের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সুন্দরবনের নদীপথে যখন তখন যে সব খণ্ড-যুদ্ধ হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই। কিন্তু যে সুন্দরবনে কোন কালে লোকের বসতি ছিল কিনা বলিয়া কতজনের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে সে সুন্দরবনের জনবহুলতা এবং বিপুল সৈন্যবল সংগ্রহের কথা দেশের এক নূতন অবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত করে। এখন হয়ত কোন ফিরিঙ্গি দস্যুর হত্যার জন্য প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে কালিমা অর্পণ করিবার জন্য আমরা মহাব্যস্ত, কিন্তু সে হত্যার পশ্চাতে দস্যু কর্ত্তৃক আমাদের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়দিগের হত্যার কি শোণিত-স্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহার আমরা সন্ধান রাখিব না! এই সকল দস্যুগণ শুধু দেশের মধ্যে নহে, দেশীয়দিগের রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কত ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা-প্রয়াসী প্রতাপের রাজনৈতিক জীবনকে কত বিড়ম্বিত করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত বিষয়। এই দস্যুদলের জন্য তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত যুদ্ধায়োজন করিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার নৌ-সেনানীদিগকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে কামান সাজাইয়া সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত। এই একাগ্র চেষ্টার ফলে ভাগীরথীর মোহানা হইতে মধুমতীর মোহানা পর্য্যন্ত সমগ্র যশোর-রাজ্যের দক্ষিণভাগ এমন সুন্দরভাবে সুরক্ষিত হইয়াছিল যে, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এই সকল স্থানে প্রত্যেক বড় নদীর মোহানায় বা নদী-সঙ্গমে দুর্গ বা নৌ-সেনা রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। হয়ত সকল সন্ধান আমরা দিতে পারিলাম না, এবং পারিবারও সম্ভব কম। কিন্তু আমরাই বহু সন্ধানের ফলে যে সংবাদ দিতেছি, তাহাতেই প্রকৃত অবস্থার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যাইবে। পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা নদীপথে দেশ রক্ষার প্রণালীটি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।

১১ সগর দুর্গ॥ ভাগীরথীর মুখে সগরদ্বীপে একটি প্রধান দুর্গ ও নৌসংস্থান ছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে, সগরে প্রতাপাদিত্যের প্রধান রাজধানীই ছিল, সে মতের প্রতিবাদ কল্পে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে সগর দুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন

ভগ্নাবশেষ দেখা গিয়াছে, তাহারও বিবরণ দিয়াছি। সুতরাং এখানে সগর দুর্গ সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

১২ মণি দুর্গ ॥ ভাগীরথী হইতে পূর্ব্বদিকে প্রধান মোহানা জামিরা নদীর। সে নদী দিয়া শত্রু আসিয়া ঠাকুরাণী নদীতে পড়িলে, উহার শাখা মণি নদীর পার্শ্বে একটি দুর্গ ছিল। এইস্থান এক্ষণে ২৬ ও ১১৬ নং লাটের মধ্যে। এই দুর্গকে মণি দুর্গ বলিতে পারি; কারণ ইহা মণি নদীর পার্শ্বে এবং স্থানটিকে এখনও মণির টাট বলে। এ দুর্গকে জয়নগর দুর্গও বলা যায়, কারণ ইহার পার্শ্বে ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০ এই সব লাটগুলি একত্র যোগে জয়নগব বলিয়া চিহ্নিত হয় এবং মণির টাটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি খালকে এখনও জয়রাম হাতীব গড় বলে। 'হাতী' কৈবর্ত্তদিগের একটি উপাধি। কৈবর্ত্তবংশীয় জয়রাম মণি দুর্গের অধ্যক্ষ থাকা বিচিত্র নহে এবং তাঁহার নাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম জয়নগর হইতে পারে। মণির টাটে মৃন্ময় প্রাচীরের চিহ্ন আছে এবং পার্শ্বস্থ রায়দীঘি ও কঙ্কণদীঘি নামক দুইটি বৃহৎ জলাশয় রায়গড় দুর্গপতির সহিত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতেছে। দুর্গের বাহিরে মণি নদীর মোহানার কাছে একটি উত্তুঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে 'জটার দেউল' বলে। বহুদূর হইতে এই দেউল দেখা যায়; উহার উচ্চতা ৬০।৭০ ফুটের কম হইবে না। সম্ভবতঃ ইহা একটি বিজয়-স্তম্ভ।[১] ইহার বয়স ৪।৫ শত বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং উহা প্রতাপাদিত্যের আমলের বিজয়স্তম্ভ হওয়া বিচিত্র নহে। কথিত আছে, ইহারই নিকটবর্ত্তী বিদ্যাধরী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ-সেনানী রুডা একটি নৌযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন (Bengal, Past and Present, Vol. II, p. 259)। জটার দেউল একটি মৃত্তিকা

১ জটার দেউল ১১৬ নং লাটের অন্তর্গত। ম্যাপে ইহাকে প্যাগোডা (Pagoda) বা (বৌদ্ধ) মন্দির বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণী হইতে জানিতে পারি—Mr. Swinhoe has published a figure of the ruins lately discovered in Lot 116. The temple is of the Buddhist type of architecture! Rev. J. Long বোধ হয় এই দেউল দেখিয়াই 'a fine Hindu temple two centuries old' বলিয়া গিয়াছেন। মেজর স্মিথ (Smyth) বলেন যে, এই স্থানে একটি মন্দিরে ৮ বৎসর বালকের আকার বিশিষ্ট একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল।—Hunter, *Statistical Accounts*, Vol. I, p. 88; 24-Parganas Gazetteer, p 29.

স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাহিরের মাপ ৩০´—৯´´×৩০´—৯´´, ভিতর ১০´—৯´´ ×১০´—৯´´ এবং ভিত্তি ১০´ ফুট। উচ্চতা প্রায় ৭০´ ফুট। পূর্ব্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ, উহা ৯´—৬´´ বিস্তৃত। দেউলটি পাতলা ইটের গাঁথুনি, আগাগোড়া সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত, শুধু নিম্নের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিল্পকলা বিলুপ্ত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহার সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে। জামিরার পূর্ব্বভাগে মাতলা নদী দিয়া শত্রু আসিলে, তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ মাতলা বা হায়দর দুর্গে প্রতিরোধ করিত। এখান হইতে ধুমঘাট বা যশোহর যাইতে পূর্ব্বোক্ত ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি দিয়া সোজা পথ ছিল বলিয়া এ দুর্গ এত উত্তরদিকে সংস্থাপন করা হয়।

১৩ রা য় ম ঙ্গ ল দু র্গ ॥ মাতলার পূর্ব্বে রায়মঙ্গলের মোহানাই প্রধান এবং উহা একটি ভীষণ সঙ্কটময় স্থান। রায়মঙ্গলের পথে শত্রু আসিলে রায়মঙ্গল ও কলাগাছিয়ার সঙ্গমস্থলে বর্ত্তমান ১৪৬ নং লাটে একটি দুর্গ ছিল, উহার নাম রায়মঙ্গল দুর্গ।[১] কথিত আছে, ইহার আশ্রয়ে প্রতাপাদিত্যের টঙ্কশালা (টাঁকশাল) এবং মহাপরাধীদিগকে নির্ব্বাসন দিবার জন্য কারাগার ছিল। এখানে ইষ্টকস্তূপাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।[২] রায়মঙ্গলের পূর্ব্ববর্ত্তী মালঞ্চের

১ সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্র-ভীতি নিবারক 'দক্ষিণ রায়' নামক এক গ্রাম্য দেবতার পূজা হইয়া থাকে। আমরা প্রথম খণ্ডে ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (৩য় সং ৪৩০-২, ৪৩৮-৩৯ পৃ)। সম্ভবতঃ এই 'রায়' হইতে 'রায়মঙ্গল' নাম হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণরাম দাস নামক একজন প্রাচীন কায়স্থ কবি এই দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী রচনা করেন, তাহার নাম 'রায়মঙ্গল'। প্রাচীন কালে এইরূপ অনেক 'মঙ্গল' লেখা হইত; নদীর নামে পাঁচালীর নাম হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।—'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,' ১৩০৩, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৮৬ পৃ [৮ম সং, ৬৯ পৃ—শি মি]।

২ এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণী (১৮৬৮) হইতে জানিতে পারি, 'In lot No. 146 there are brick ruins with terracotta ornaments.' [Proc. Asiatic Soc., 1868, p. 271—শি মি] কেহ কেহ বলেন, রায়মঙ্গল ও কলাগাছিয়ার মোহানাকে লক্ষ্মীনারায়ণের মোহানা বা সংক্ষেপতঃ "ন'য়ের মোহানা" বলে, নাবিকেরা উহার অপভ্রংশে "ন'র মোহানা" করিয়া লইয়াছে, অন্যমতে নই নদী ও কলাগাছিয়ার সঙ্গমে অর্থাৎ ১০৯ নং লাটের পার্শ্বে ন'র মোহানা ছিল; কিন্তু সে স্থল আমরা স্বচক্ষে ঘুরিয়া দেখিয়া কোন ভগ্নাবশেষ পাই নাই। ১৪৬ নং লাটই দুর্গস্থান বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে টাঁকশাল থাকিবার কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। রায়-মঙ্গলের নাম শুনিলে লোকে ভয় পায়, এবং লোককে রায়মঙ্গল পাঠাইবার কথা বলিয়া ভয় দেখান

মোহানা দিয়া শত্রু আসিলে সমগ্র ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির শাসনদণ্ড এবং রাজধানীর সর্ব্বপ্রধান নৌ-দুর্গ তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। ইহা ব্যতীত আড়পাঙ্গাসিয়া যেখানে মালঞ্চে মিশিয়াছে, সেখানে, ১৮৮ নং লাটের পশ্চিম সীমানায় একটি স্থানে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ১৭৯ নং লাটে হরিখালি নামক সুদীর্ঘ খালের একটি পাশখালির কূলে একটি বড় ইষ্টকগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। এ সকল স্থানে রীতিমত দুর্গ প্রতিষ্ঠা কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত লাট সমুদ্রের অতি সন্নিকটে। আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে মর্জ্জালের মোহানা। এই মর্জ্জালের উপরই শিবসা দুর্গ, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মর্জ্জালের পূর্ব্বদিকে পশরের মোহানা। ঐ পশর ও পানকুশী নদীর সঙ্গমস্থলে ঝাপা নামক শাখানদীর উত্তরভাগে ইষ্টকগৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই অংশ এখন এমন নিবিড় জঙ্গল সমাচ্ছন্ন যে, ইহা এখনও ফরেষ্ট বা বন-বিভাগের শাসনাধীন হয় নাই।[১] পশরের পরে বিখ্যাত বলেশ্বর বা মধুমতীর মোহানা—উহার নাম হরিণঘাটা। এখানে সম্ভবতঃ কোন বিখ্যাত বন্দর ছিল, তাহা এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে।[২]

১৪ চকশ্রী দুর্গ॥ যশোর-রাজ্যের পূর্ব্বদিক হইতে শত্রুর আগমনের সম্ভাবনা অল্প। এজন্য এদিকে অধিক সংখ্যক দুর্গ নাই। চকশ্রী বা চাকশিরি দুর্গই এ দিকের প্রধান দুর্গ ও নৌসেনা-নিবাস। চাকশিরি লইয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের যে বিষম বিবাদ হয়, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং চাকশিরির অবস্থানের যে একটা বিশেষত্ব ছিল,

হয়। সম্ভবতঃ ইহার কয়েকটি কারণ আছে : প্রথমতঃ, এখন যেমন কোন অপরাধীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়া আন্দামান দ্বীপে পাঠান হয়, প্রতাপাদিত্যের সময় সেইরূপ রায়মঙ্গল দুর্গে পাঠান হইত। দ্বিতীয়তঃ, রায়মঙ্গল বড় বিস্তৃত প্রবল নদী, ইহার সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শ, নাবিকেরা ভয়ে এ পথে যাইতে চাহে না।

১ কোন বনবিভাগীয় বা সরকারী বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র জানিবার উপায় নাই। যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে আমরা তাহাদেরই মুখে এ স্থানের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বর্ত্তমান চাঁদপাই ফরেষ্ট ষ্টেশন হইতে এই স্থানের অনুসন্ধান চলিতে পারে।

২ De Barros এবং Van den Broucke প্রভৃতির ম্যাপে সুন্দরবনের যে পাঁচটি বিনষ্ট নগরীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নল্‌দি (Noldy) নামক নগর এই স্থানের নিকট ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। [বর্ত্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৪৬৫ পৃ (পরিশিষ্ট ক) দ্রষ্টব্য—শি মি]



শিবসা দুর্গ



জাহাজঘাটার ভগ্ন অট্টালিকা

তাহা সহজে অনুমেয়। এই চাকশিরি কোথায়, এই বিষয় লইয়া লেখকদিগের মধ্য নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়, কারণ তাঁহারা কেহই স্থানটি চক্ষে দেখিয়া লিখেন নাই। শুধু ইতিহাসের খাতিরে নহে, চাকশিরির নদী-দৃশ্য একটি দেখিবার জিনিষ।

খুল্‌না জেলার বাগেরহাট হইতে ছয় মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এবং রামপাল থানার ছয় সাত মাইল পূর্ব্বোত্তরে বর্ত্তমান চকশ্রী অবস্থিত। পশ্চিম ও উত্তরে ধোৗতখালি এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে কুমারখালি নামক দুইটি শাখা নদী এই চককে বেষ্টন করিয়া রামপালের সন্নিকটে উভয়ে মিলিত হইয়াছে এবং তথা হইতে 'মঙ্গলা' নাম ধারণ করিয়া পশরে গিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে ধোৗতখালি হইতে রামপাল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটির নাম ছিল চকশ্রী।[১] কারণ এই স্থানের নবোত্থিত আবাদ শস্য-প্রাচুর্য্যে সমস্ত চকের শ্রী-সম্পাদন করিয়াছিল। এখন চাকশিরির মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম হইয়াছে। পূর্ব্বে ভৈরব হইতে পশর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জলাকীর্ণ ছিল। উহার মধ্যে রঙ্গদ্বীপ (রাঙ্গদিয়া), মধুদ্বীপ (মধুদিয়া), পরবর্ত্তী মধুদ্বীপ (পারমধুদিয়া) প্রভৃতি দ্বীপের উন্মেষ হইলেও সমস্ত

১ প্রাচীন দলিলাদিতেও এই স্থান চকশ্রী নামে অভিহিত। একব্বরিয়া, ঝালবুনিয়া, তালবুনিয়া, বড়দিয়া, আঙ্গারিয়া, চণ্ডীপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এই চকের অন্তর্গত। বেলফুলিয়া নিবাসী রাখালদাস সিংহ মহাশয় প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষগণ চকশ্রীর চারি আনা অংশ খরিদ করিয়া বাটোয়ারা-সূত্রে তালবুনিয়া মৌজা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত প্রাচীন খতিয়ানে (৩৵ হইতে ৩।৵ পৃষ্ঠা) এই বিবরণ আছে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সুন্দরবনের অন্যান্য অংশের মত চকশ্রীও ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। বহুকাল পরে অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এ স্থানও উচ্চ হইয়া আবাদে পরিণত হয়। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বদন হাওলাদার নামক এক সওদাগর নবাবের কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এখানে আসেন। তৎপুত্র সেখ কালাই মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে সনন্দ পাইয়া সমস্ত চকশ্রী দখল করিয়া এই স্থানে বাস করেন। সেই সময় তিনি একটি সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ও 'বড়পুকুর' নামক একটি জলাশয় খনন করেন। উভয় কীর্ত্তিই বর্ত্তমান। মস্‌জিদটি মোগল স্থাপত্যানুযায়ী গঠিত, উহার বাহিরের মাপ ২২´×২২´ ভিতরে ১৫´×১৫´, ভিত্তি ৩´—৬", উহাতে একটি মাত্র গুম্বজ এবং ৪টি মিনার আছে, মিনারের উচ্চতা ১৫' ফুট। স্থানীয় লোক এই স্থানে নেমাজ করেন। সেখ কালাইএর বাড়ীতে একটি পাকা কবর ও দরগা আছে। সেখ কালাইএর দুই পুত্র ছিলেন—সুমুজ উদ্দীন ও মইবুল্যা। সুমুজ উদ্দীনের পুত্র নুর উদ্দীন রাজা বিবিকে বিবাহ করেন এবং নিজে নিঃসন্তান বলিয়া সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দেন। এজন্য মইবুল্যার পুত্র জমিরতুল্যার সহিত বিবাদ চলিতে থাকে। সেই বিবাদ-সূত্রে নানাস্থানীয় জমিদারগণ প্রবেশ করিয়া

স্থানের মাঝে মাঝে বহু বিস্তৃত বিল ছিল। সুতরাং মধুমতী বা ভৈরব নদ হইতে পশ্চিম-দক্ষিণমুখে সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, চকশ্রীর পথে আসিতে হইত এবং ঐ স্থলে সুদৃঢ় সৈন্যাবাস বা নৌ-বাহিনী থাকিলে, শত্রুর গতি প্রতিহত করা যাইত। বিশেষতঃ চারিদিকে চক্রাকারে নদী থাকাতে জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি নিরাপদে রাখা চলিত। চাকশিরির এই অবস্থান-কৌশলের জন্যই প্রতাপাদিত্য এই স্থানে একটি প্রধান নৌ-সেনার আড্ডা করিতে সঙ্কল্প করেন। রাজ্যরক্ষার জন্য সে সংকল্প এত প্রয়োজনীয় যে, তজ্জন্য তিনি অবশেষে পিতৃব্যের সহিত বিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিবাদের বিবরণ পরে দিব।

চকের উত্তর সীমায় ধোতখালির দক্ষিণ কূলে যেখানে এখন চাকশিরির হাট বসে, তাহাই দুর্গের স্থান। ধোতখালির উত্তর পার হইতে উহার ফটো লওয়া হইয়াছিল। এই চাকশিরির নিকটবর্ত্তী কালীগঞ্জ, চণ্ডীতলা, কালিকাতলা, দুর্গাপুর প্রভৃতি এই স্থানে হিন্দু প্রাধান্যের পরিচয় দিতেছে। হাটের দক্ষিণাংশে একটি কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে এবং প্রাচীন একটি পুকুরও তাহার পার্শ্বে রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী একব্বরিয়া গ্রামের পূর্ব্বভাগে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, উহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। সম্ভবতঃ দীঘিটি প্রতাপাদিত্যের সময়ে খনিত এবং উহার সন্নিকটে দুর্গাধ্যক্ষের আবাস গৃহাদি ছিল। এখন কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না; বড় দীঘি দেখিলেই লোকে বলে, তাহা খাঞ্জাই কীর্ত্তি, অর্থাৎ খাঁ জাহান কর্ত্তৃক খনিত দীঘি। সে কথার কোন মূল্য নাই, কারণ পুরাতন অধিবাসীর কোন বংশধর এখানে বাস করিতেছেন না। এখন চাকশিরির কিছুই নাই; আছে মাত্র প্রাচীন নাম আর আছে মাত্র এখানকার হাট, উহা মঙ্গল ও শুক্রবারে লাগে। ইহাকে এ অঞ্চলে কাটিকাটা হাট বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হাট বলে; এবং সুন্দরবনের পূর্ব্বভাগের আবাদের বহুলোক এখানে আসিয়া হাট করে।

উপরিভাগে প্রতাপাদিত্যের যে ১৪টি প্রধান দুর্গের কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত

ক্রমে ক্রমে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরীগণ, বেলফুলিয়ার সিংহ, নওয়াপাড়ার ঘোষ ও সারসার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশীয় ধনী ব্যক্তিবর্গ সমগ্র প্রাচীন চাকশিরি বণ্টন করিয়া লইয়াছেন।

আরও কতকগুলি ছোট ছোট দুর্গের সন্ধান পাওয়া যায়।[১] কেহ কেহ বলেন, সুদূর পূর্ব্ব কোণে মেঘনা নদীর মোহানার নিকট কোন স্থানে একটি দুর্গ ছিল; পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যের অধিপতি রঘু নামক সেনানী সেখানে অধ্যক্ষ থাকিতেন। ঘটককারিকাতেও 'প্রাচ্যপতি রঘু' একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু দুর্গের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করি। উত্তরভাগে আধুনিক যশোহর সহরের সন্নিকটে মুড়লীতে প্রতাপাদিত্যের একটি সৈন্যাবাস ছিল; চাঁচড়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায় ইহার কিল্লাদার বা দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই তথ্যের সত্যাসত্য আমরা পরে বিচার করিব। মোগলের সহিত প্রতাপের বিশেষ ভাবে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ধুমঘাটের ৫।৬ মাইল উত্তরে মৌতলায় একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ইহারই পার্শ্বে জাহাজঘাটা বা নৌ-বাহিনী সংস্কার ও নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রধান কর্ম্মশালা ছিল। এখানে অনেক নাব-সৈন্য থাকিত এবং গুলিবারুদ প্রস্তুত হইত। এই স্থানে একজন ফিরিঙ্গি অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারই বাসের জন্য জাহাজঘাটায় প্রশস্ত বাসগৃহ ছিল। রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র চাঁদ রায় বা চন্দ্রশেখর রায় এই সকল ব্যাপারের সহকারী ছিলেন।

১ কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান কলিকাতার চারিদিকে প্রতাপাদিত্যের সাতটি দুর্গ ছিল; মাতলা, রায়গড়, টানা, বেহালা, সালখিয়া, চিৎপুর ও আটপুর (মূলাজোড়), এই সাতটি স্থানে এই সকল দুর্গের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে মাতলা ও রায়গড়ের বিবরণ দিয়াছি। রায়গড় ও বেহালার দুর্গ বোধ হয় অভিন্ন। মূলাজোড়ের পার্শ্বে যে দুর্গ আছে, তাহা বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতির বাসের জন্য নির্ম্মিত হয়; সামনে (সম্মুখে) গড় ছিল বলিয়া নিকটবর্ত্তী ষ্টেসনের নাম হইয়াছে শ্যামনগর।—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'কলিকাতা—সেকালের ও একালের', ৪৩ পৃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা

নদীবহুল ভাটিরাজ্যে রাজত্ব করিতে গেলে পর্য্যাপ্ত নৌ-সংস্থান না হইলে চলে না। সে অঞ্চলে যেখানে সেখানে গিয়া শত্রুকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিবার এমন উপায় আর নাই। মোগলদিগের এ বিষয়ে ভাল ব্যবস্থা ছিল না, তাহা প্রতাপাদিত্য জানিতেন। পূর্ব্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই প্রস্তুত হইত। আকবরের সময় একটি বাদশাহী নৌ-বিভাগ ছিল; বহুদেশ হইতে উৎকৃষ্ট নৌকা সংগৃহীত হইত বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশের মত অন্য কোথাও ভাল সমুদ্র-গামী জাহাজ প্রস্তুত হইত না। বাদশাহ নানা দেশ হইতে কারিগর আনাইয়া লাহোর ও এলাহাবাদে বহুসংখ্যক তরণী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।[১] কিন্তু বঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে উহারা অতি কমই আসিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় যখন পূর্ব্ববঙ্গে মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি জলদস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন নবাব সায়েস্তা খাঁ ঢাকা প্রদেশে অসংখ্য নৌকা ও জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল। মহাভারতে মনোরথগামিনী, সর্ব্ববাতসহা ও যন্ত্রযুক্ত তরণীর উল্লেখ আছে।[২] নৌ-সাধনোদ্যত বঙ্গবাসীকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী রঘু বঙ্গদেশে জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।[৩] বঙ্গবীর বিজয়সিংহ সিংহলে রাজ্য স্থাপন করেন। বঙ্গীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ যব, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। অজান্তা প্রভৃতি গিরিগুহায় এবং যব দ্বীপাদির ভাস্কর্য্য-শিল্পে প্রাচীন ভারতের নৌ-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ

১ *Ain-i-Akbari* (Blochmann), pp. 279-80.

২ 'ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিস্রংস্তিভিঃ কৃতাম॥'
—'মহাভারত', আদিপর্ব্ব, ১৪৯।

৩ 'রঘুবংশম', ৪র্থ, ৩৬ শ্লোক।

যুগে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি ভাবে হিন্দু বণিকেরা নানা চিত্রবিচিত্র ডিঙ্গা সাজাইয়া বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন, প্রাচীন সাহিত্যে ও চীন পর্য্যটকের বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার অন্তর্গত খণ্ডগিরির শিলালিপিতে আছে, কলিঙ্গ-রাজপুত্রকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত 'নাব-ব্যাপার' শিখিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে এই নাব-ব্যাপার একটি প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল। বঙ্গ ও কলিঙ্গের লোকেরাই যে এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[১] বঙ্গের মধ্যে আবার দক্ষিণ বঙ্গের অর্থাৎ সমতটের অধিবাসীরা নাব-বিদ্যায় অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। সপ্ত ডিঙ্গা সাজাইয়া ধনপতি বা চাঁদ সওদাগর কিরূপে বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং পণ্য বিনিময়ে দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেন, তাহার কথা না শুনিয়াছেন, এমন লোক বিরল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে উহার বিশেষ বিবরণ আছে এবং উহা হইতেই দেখা যায়, নৌকাগুলি, মাঝি ও দাঁড়ী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিত। বাঙ্গাল নাবিকেরা পথে বিপদে পড়িয়া বাঙ্গালের ভাষায় কান্দিয়াছিল, সে বর্ণনা চণ্ডীতে আছে।[২]

প্রতাপাদিত্যও এইরূপে ডিঙ্গা সাজাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বাণিজ্যের জন্য নহে। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার পৈতৃক নিবাস এবং সপ্তগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এই দুই স্থান হইতে তাঁহার উৎকৃষ্ট পোত নির্ম্মাণকারী কারিগর অনিতে কষ্ট হয় নাই। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যের জন্য সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল, 'কর্ণাট, গুজরাট, কাশী, কনখল, লঙ্কা, দ্রাবিড় হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সকল শফরের (সহরের) বণিক সপ্তগ্রামে আসিয়া বাণিজ্য করিত,' কিন্তু সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও যাইত না।[৩] এখানে সকল দেশের নৌকা-নির্ম্মাণপদ্ধতি পরিজ্ঞাত

---

১ Mookerji, Radhakumud, *Indian Shipping*, 1912, pp. 46-9; *Teh Periplus of Erythrean Sea'* (Wilford W. Schoff), p. 255.

২ 'কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলু মাগু পো॥'...ইত্যাদি
—'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', ডিঙ্গার বিনাশে নাবিকদের রোদন
(বঙ্গবাসী সংস্করণ), ১৯৮ পৃ

৩ 'এসব সফরে যত সদাগর বৈসে।
জঙ্গ ডিঙ্গা ল'য়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥

ছিল ; সকল দেশীয় লোকেরা এখানে আসিয়া আবশ্যক মত নৌকা নির্ম্মাণ বা সংস্কার করিয়া লইত। কবিকঙ্কণ প্রতাপাদিতের সমসাময়িক লোক।[১] তাঁহারই বর্ণনায় দেখিতে পাই, কোন কোন সদাগরী ডিঙ্গা "আশী গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গের দু'কূল", এবং কোন ডিঙ্গায় বহুসংখ্যক দাঁড় ছিল। প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র যে নৌকায় যশোহর রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা চৌষট্টি দাঁড়যুক্ত এবং কামানদ্বারা রক্ষিত ছিল।[২] এই সকল নৌকাকে 'কোশা' নৌকা বলিত, এই সকল সুদীর্ঘ নৌকা দ্রুতগমনের জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদিত্যের বহুসংখ্যক কোশা নৌকা ছিল।[৩] অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহোদয় সম্প্রতি 'বহারিস্তান' নামক পারসিক গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, যুদ্ধকালে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতির সঙ্গে 'বেপারি, কোশা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোয়া, পশতা ও জলিয়া জাতীয় নৌকা ছিল।'[৪] ইহা ব্যতীত দুই এক খানি 'পিয়ারা' এবং

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্যে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥'

—'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' (ঐ সংস্করণ), ১৯৬ পৃ

'কথা-সরিৎ-সাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়, বণিকেরা 'যান পাত্র বা যান পাত্রক' নামে এক প্রকার পোতে সমুদ্র যাত্রা করিতেন, চীনেরা অদ্যাপি উহাকেই যান্‌ক নামে ব্যবহার করিতেছেন (Chinese Junk)। ঐ যান্‌কই জঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। এই পোতের আকার খুব বড় এবং তলদেশ বিস্তৃত। ইহাতে অনেক বোঝাই ধরিত।—'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', বৈশ্যকাণ্ড, ৬৯-৭০ পৃ।

১ 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন।

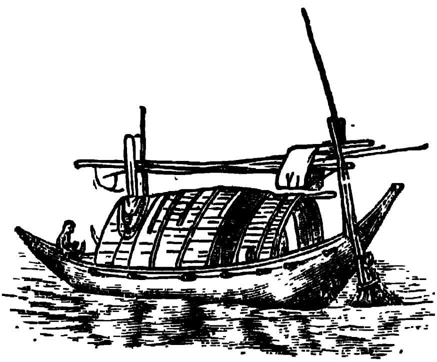
২ 'চতুঃষষ্টিদণ্ডযুক্তা নৌরানীতা মহামতিঃ। নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতঃ।' —ঘটককারিকা, নিখিলনাথের 'প্রতাপাদিত্য', মূল ১১৯ পৃ। [উক্ত গ্রন্থের রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' অংশের টিপ্পনী, ৬৯—শি মি]

৩ সম্ভবতঃ হিন্দুরা পূজার সময় যে কোশা ব্যবহার করেন, কতকটা তাহারই মত আকার বলিয়া এই নৌকাগুলির নাম কোশা নৌকা।

৪ 'প্রবাসী', কার্ত্তিক, ১৩২৭, ৪ পৃ। [পুনরায় পাঠোদ্ধারান্তে অধ্যাপক সরকার 'বলিয়া'-কে 'ভলিয়া' বলিয়াছেন—'শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ ; পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—শি মি।]

'মহলগিরি' নৌকাও ছিল। ইহার মধ্যে কোশা নৌকার কথা বলিয়াছি; অপর নৌকা সমূহের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

এই সকল নৌকার মধ্যে ঘুরাব (Grab) সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত ও শক্তিশালী। উর্দ্দু 'ঘুরাব' শব্দে কাক পক্ষী বুঝায়। ইহাতে সাধারণতঃ দুইটি এবং বড়গুলিতে তিনটি মাস্তুল থাকে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ইহা বেশ প্রশস্ত; প্রায়ই সম্মুখে দুইটি বড় কামান এবং দুইপার্শ্বে কতকগুলি করিয়া ছোট কামান সাজান থাকিত। 'বলিয়া' নৌকা বোধ হয় আমরা যাহাকে 'ভাউলিয়া' বলি, সেইরূপ ছোট, লম্বা, একপার্শ্বে ছইওয়ালা দ্রুতগামী নৌকাকে বুঝায়। 'পাল' বলিতে খুব সম্ভবতঃ ঢাকা হইতে আমদানী 'পলওয়ার' নৌকাকে বুঝাইত; ইহাতে একটি মাত্র প্রকাণ্ড মাস্তুল থাকে এবং অত্যন্ত বোঝাই ধরে। 'মাচোয়া' (সম্ভবতঃ Massoola boat) নৌকার তক্তাগুলি কাতা বা শণ দিয়া বাঁধিয়া প্রস্তুত করা হইত এবং উহাতে তরঙ্গের বেগ সহ্য করিতে পারিত। এ জাতীয়



ঢাকাই পলওয়ার

নৌকা মাদ্রাজের উপকূলে ব্যবহৃত হইত।[১] 'পশতা' (Fusta) এক প্রকার দুই মাস্তুলিয়া দ্রুতগামী জাহাজ।[২] জলিয়া (gallivat, not galliot) নৌকা

১ Wheeler, J. T., *Early Records of British India*, p. 54; *Indian Shipping*, p. 236.

২ পশ্‌তা বা ফস্‌তা Brigantine নৌকার মত। এই পোত সাধারণতঃ দস্যুদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত।

দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ব্যবহৃত হইত। ইহা দাঁড়ের সাহায্যে চালিত হইত। ইহার উপরে পাতলা বাঁশের পাটাতনের দুই পার্শ্বে ৪০।৫০টি পর্য্যন্ত দাঁড় বসান থাকিত; বৃহদাকারের জালিয়া বা জল্‌বাগুলিতে ৬টি বা ৭টি পর্য্যন্ত ছোট কামান পাতা থাকিতে পারিত।[১] পিয়ারা নৌকাগুলি ময়ূরপঙ্খী বা সুন্দর বজরার মত। উহার ভিতর আরোহিগণ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত। মহলগিরি তরণী পিয়ারা অপেক্ষাও সুন্দর ও বড়। উহাতে রাণী বা উচ্চবংশীয়া মহিলারা আরোহণ করিতেন। প্রত্যেক বহরে সেনাপতি বা আমীরদিগের জন্য এরূপ ২।১ খানি তরণী থাকিত। বেপারি নৌকা বাণিজ্যের জন্য এখনও ব্যবহৃত হয়। ইহা ঘুরান ছইওয়ালা এবং সম্মুখে কয়েকটি দাঁড় এবং মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মাস্তুল থাকে। অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি বহনের জন্যই এ সব নৌকা যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় ছিল।

যে দেশে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সংস্থান, নদীর অবস্থা ও উপকূলের প্রকৃতি যেরূপ, সে দেশে তদনুযায়ী নৌকা বা রণতরী প্রস্তুত হইয়া থাকে।[২] এইজন্য ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশে নৌকা বা জাহাজ নির্ম্মাণের সময় কোন এক প্রকার আদর্শের অনুকরণ করিলেও উহার মাল মসলা এবং ব্যবহারের প্রণালী পৃথক হওয়াতে আদর্শেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। উপরিভাগে যে সকল পোতের কথা বলা হইল, উহার অধিকাংশই রণতরী; এজন্য প্রতাপাদিত্যকে উহার অধিকাংশই অন্যের অনুকরণে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। তাঁহার নৌ-বিভাগে যে সকল পর্টুগীজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যের মালবর ও করমণ্ডল উপকূলের কয়েকজাতীয় পোত—যেমন ঘুরাব, পশ্‌তা, মাচোয়া বা মাছুলা এবং জালিয়া বা জল্‌বা (Jalbah)—যশোহরে প্রবর্ত্তন

১ *Indian Shipping*, p. 242; *Bombay Gazetteer*, Vol. 1, Part II, p.89. জালিয়া ও জল্‌বা (Jalbah) বোধ হয় একই কথা। ইহা প্রাচীন গ্যালি (Galley) জাহাজেরই প্রকারান্তর। ইংরাজীতে Gallivat ও Galliot দুই নাম আছে। উহার মধ্যে Galliot গুলি ইয়োরোপে ভূমধ্যসাগরে এবং Gallivat গুলি দাক্ষিণাত্যের উপকূলে ব্যবহৃত হইত। মোগলদিগের নৌ-বাহিনীতে জালিয়া বা জল্‌বা জাহাজই অধিক সংখ্যক থাকিত।

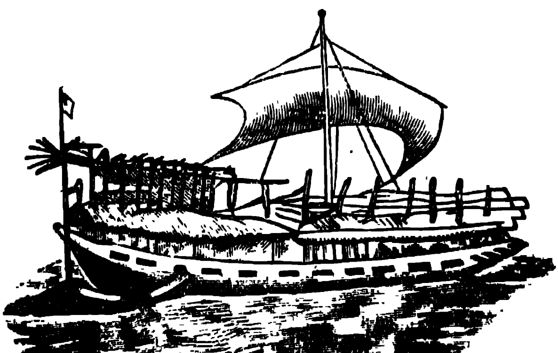
২ 'The build of the boats all along the coast of India varies acording to the localities for which they are destined and each is peculiarly adapted to the nature of the coast on which it is used.'—Bevan, H., *Thirty Years in India*, Vol. I, p. 14.

করিয়াছিলেন। অবশ্য সপ্তগ্রাম এবং সন্দীপ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ পোত পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইত। প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোহরের কারিগরগণ জাহাজ-নির্ম্মাণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সায়েস্তা খাঁ অনেক জাহাজ যশোহর হইতে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। কয়েক প্রকার নৌকা যশোহরের নিজ সম্পত্তি ছিল; যেমন, ডিঙ্গি, পান্‌সী, বাছাড়ী ও বালাম। "যখন লোহার ব্যবহার জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানাদেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত, তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে।"[১] আমরা এক্ষণে বালাম চাউলই চিনি, বালাম নৌকার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে এখনও বালাম চাউল প্রধানতঃ খুল্‌না ও বরিশাল জেলা হইতে নানা দেশে রপ্তানি হয়। দক্ষিণ খুল্‌না বা প্রাচীন যশোহরের বালাম নৌকা নিজস্ব। প্রতাপাদিত্যের সময়েও রসদ প্রেরণের জন্য এ নৌকার প্রচলন খুবই ছিল। বড় নৌকা বা জাহাজকে পূর্ব্বকালে ডিঙ্গা বলিত; এবং সর্ব্বজাতীয় ছোট নৌকার সাধারণ নাম ছিল—ডিঙ্গি। একজন লোকে একখানি বৈঠা দিয়া ইহা স্বচ্ছন্দে বাহিতে পারে; নদীতীরবাসী প্রত্যেক গৃহস্থের এ নৌকার প্রয়োজন ছিল এবং এখনও উহা ব্যবহৃত হয়। যশোহরে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ডিঙ্গি অপেক্ষা একটু বড় নৌকা ছই বা আবরণ দিয়া দাঁড় বসাইলে 'পান্‌সী' হইত এবং উহাতে অল্প সংখ্যক লোক চলাফেরা করিতে পারিত। যে সব প্রকাণ্ড আকারের পান্‌সী ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আসিত, তাহাকে 'সৈদপুরী পান্‌সী' বলে। পান্‌সী অপেক্ষা একটু বড় ও শক্ত, অনাবৃত, ভারবাহী নৌকাকে 'বাছাড়ী' বলে; তদপেক্ষা বড় হইলে 'বাছাড়ী জাহাজ' হয়। এখনও 'বাছাড়' উপাধিধারী নমঃশূদ্র জাতীয় লোকেরা বহুসংখ্যক প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে বাস করেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের নামানুসারে এই প্রকার নৌকার নাম হইয়া থাকিবে। এই সকল নৌকা ব্যতীত সংবাদাদি প্রেরণের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগামী সিপ নৌকা, ভারী দ্রব্য ও হাতী ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু বহনের জন্য 'ঢাকাই পাটুয়া', 'ভড়' বা 'জঙ্গ' নৌকা ব্যবহৃত হইত।

১ কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণ, ২৭ পৃ।

'পাতিল' নৌকা উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে আসিত, এবং মোগলবাহিনীতে রসদ বহনের জন্য উহা ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনীতে ঘুরাব, জালিয়া, বালাম, পলওয়ারী ও কোশার সংখ্যাই অধিক। তন্মধ্যে, ঘুরাব, কোশা ও জালিয়া প্রকৃত রণতরী।[১] অপরগুলি অধিকাংশই ভারবাহী।

এই সকল জাহাজ ও নৌকা গঠন করিতে প্রতাপাদিত্যের আর একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। সুন্দরবনে পোতনির্ম্মাণের উপযোগী কাঠের অভাব ছিল না। তন্মধ্যে সুন্দরীকাঠই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই কাঠ দেখিতে সুন্দর, গাঢ় লালবর্ণ, ইহা খুব শক্ত এবং ভারসহ; কাঠে গিরা বা গাঁইট কম, ফাঁড়িলে দীর্ঘ তক্তা হয়; এ কাঠ জলে ভাল থাকে, লোনায় সহজে নষ্ট হয় না। এমন কি, জলের মধ্যে সুন্দরীকাঠ শাল বা সেগুন অপেক্ষাও বেশী দিন টিকে। এখন যেমন ভাল সুন্দরীকাঠের বিশেষ অভাব, তখন তাহা ছিল না।[২] প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর কাছে নিজের এলেকায় বহুকালের সঞ্চিত



পাতিল নৌকা

সুন্দরীবৃক্ষ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া এই কাঠে অসংখ্য তরণী গড়িয়াছিলেন। জাহাজের তলায় সুন্দরীকাঠ ভাল উপাদান ছিল; বাইনের তক্তায় পাটাতন ও আবরণের বিশেষ সাহায্য করিত।

১ মোগলদিগের নওয়ারা বিভাগে ঘুরাব, পাতিল, জলবা এবং কোশার সংখ্যা বেশী ছিল। মগদিগের নৌ-বিভাগে ঘুরাব, জল্‌বা, জঙ্গি (জঙ্গ বা Junk) এবং কোশা ও বালাম অধিক।

২ বর্ত্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৯৩-৪ পৃ।

একমাত্র সুন্দরীকাঠই যে অবলম্বন ছিল, তাহা নহে। সকল কারিগরে সুন্দরীকাঠ দ্বারা কার্য্য করিতে সমর্থ বা সম্মত ছিলেন না। ঘুরাব প্রভৃতি প্রধান জাহাজগুলি অন্য দেশের ধরনে শাল সেগুনে নির্ম্মিত হইত। ইয়োরোপে ওক (oak) কাঠে জাহাজ গড়া হইত; সে দেশের লোকে ওকের গৌরবে গর্ব্বান্বিত ছিল। কিন্তু ওক অপেক্ষা সেগুন অনেক ভাল। ওকের জাহাজ বার বৎসরে পরিবর্ত্তন করিতে হইত; কিন্তু সেগুনের পোত ৫০ বৎসর থাকিত। সেগুনের তলা ও শাল শিশু দ্বারা অন্যান্য অংশ গড়িলে জাহাজ খুব দীর্ঘস্থায়ী হইত।

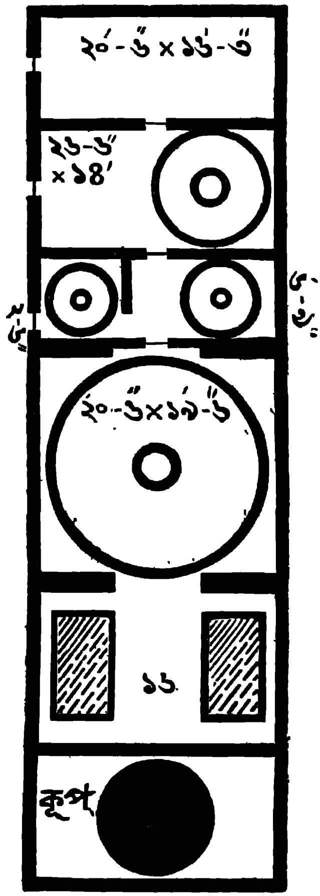
প্রতাপাদিত্যের উৎকৃষ্ট রণতরীর সংখ্যাই সহস্রাধিক ছিল, অন্যান্য পোতের সংখ্যা ততোধিক। ইসলাম খাঁর নবাবী আমলে আবদুল লতীফ নামক যে ভ্রমণকারী নূতন দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারি, প্রতাপাদিত্যের 'যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা ছিল।'[১] মোগল সেনানী ইনায়েৎ খাঁ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, তখন প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ৫০০ রণপোত লইয়া তাঁহাকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সেই সময় রাজধানীর সন্নিকটে ও প্রধান প্রধান নৌ-দুর্গে রাজ্যরক্ষার জন্য আরও অনেক রণতরী ছিল। রসদাদি সংগ্রহ ও যাতায়াত ব্যবস্থা জন্য, যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কার্য্য ও সংস্কার জন্য যে আরও কত শত জাহাজ ও নৌকা কত স্থানে ছিল, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে তাহারও আনুমানিক সংখ্যা যে সহস্রাধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল জাহাজ নির্ম্মাণ ও সংস্থানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যশোহর দুর্গ হইতে[২] ৪।৫ মাইল উত্তরে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তথায় নৌ-বিভাগের কার্য্যালয় স্থাপিত হইল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী বা উজবেগ জাতীয় কর্ম্মচারীর অধীন কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল। এই কর্ম্মচারী কে, জানিতে পারি নাই। তৎপরে পর্টুগীজ জাতীয় ফ্রেডারিক্ ডুড্লিকে (Frederick Dudley) নিযুক্ত করিলে, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। কর্ম্মদক্ষ ডুড্লির পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সন্ধান পাওয়া যায়

১ প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃ [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—শি মি]।

২ ধূমঘাট দুর্গকেই এখন হইতে আমরা সাধারণতঃ যশোহর দুর্গ বলিব। প্রাচীন যশোহর দুর্গ বলিতে হইলে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে মুকুন্দপুর দুর্গ বলিয়া উল্লেখ করিব।

নাই। নৌ-বিভাগের প্রধান কার্য্যালয়ের নাম হইয়াছিল, জাহাজঘাটা; তথায় ডুড্‌লি ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের কর্ম্মশালা ও আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইল; উহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। যমুনার খাতের পূর্ব্বতীরে জাহাজঘাটা; এ স্থানের খাতের ধার দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের আমলের পুরাতন রাজবর্ত্ম এক্ষণে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা হইয়াছে। এই রাস্তার পার্শ্বে ৪১৬´× ২১০´ ফুট পরিমিত স্থানে এখনও ইষ্টক স্তূপ, প্রাচীর, খিলান প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। উত্তর দিকের মৃত্তিকা প্রোথিত কয়েকটি প্রাচীর দেখিয়া তত পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না; সম্ভবতঃ নীলকরগণ এখানেও প্রাচীন গৃহাদি ভাঙ্গিয়া কুঠি স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন; যমুনার জল লোনা হওয়াতে বোধ হয় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ভগ্নচিহ্নের মধ্যে পূর্ব্বপার্শ্বে শতাধিক ফুট দীর্ঘ এক ভগ্ন অট্টালিকা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উহাই ছিল পোতাধ্যক্ষের আবাস-বাটিকা। উহার উত্তর দিকে একটি খোলা ঘর, সেই দিকে সদর। তাহার দক্ষিণে একটি গুম্বজওয়ালা ঘর, উহাই আফিস। তৎপরে দুই পার্শ্বে দুইটি গুম্বজওয়ালা ছোট ঘর, দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান। তাহার দক্ষিণে একটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘর, সম্ভবতঃ শয়ন ঘর, উহাও গুম্বজওয়ালা। তাহারই পার্শ্বে স্নানাগার, উহাতে দুইধারে দুইটি চৌবাচ্চা; অট্টালিকার গাত্র সংলগ্ন প্রকাণ্ড ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া নলদ্বারা ঐ জলে চৌবাচ্চা পুরিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক গুম্বজের



জাহাজঘাটার ভগ্নগৃহ

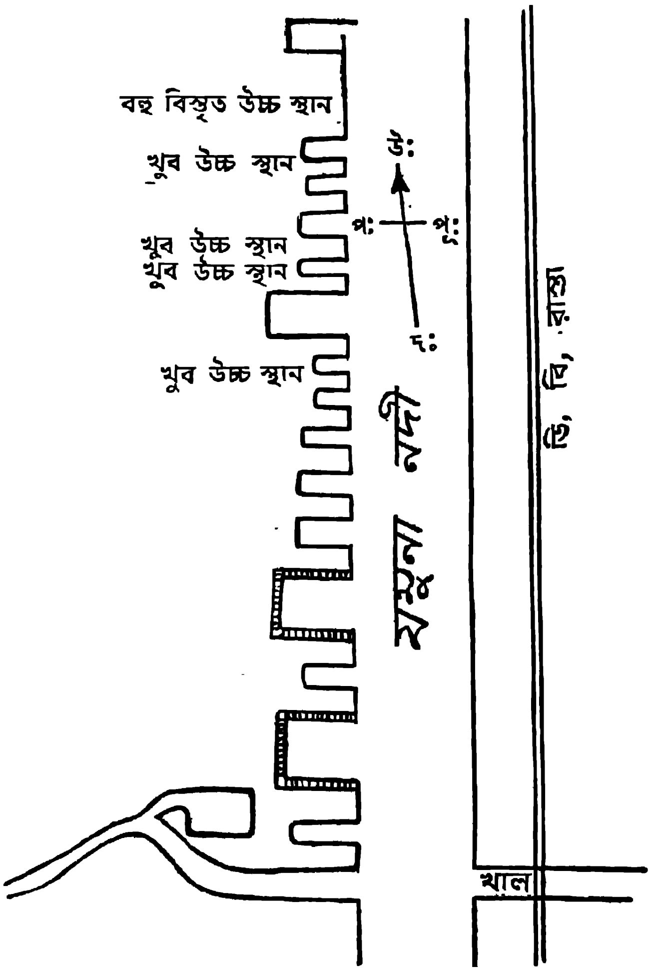
উপরই এক একখানি গোলাকার স্ফটিক বসান ছিল, তজ্জন্য গৃহগুলি বাহিরের আলোকে আলোকিত হইত।

জাহাজঘাটাকে কেহ কেহ কোটাঘাটাও বলে। কেহ কেহ বলে, ভগ্ন কোটাটিতে নবাবের কাছারি বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পতনের পর অল্পদিন মধ্যে ধূমঘাট বাসের অযোগ্য হইলে, মোগল ফৌজদার কিছু দিনের জন্য জাহাজঘাটার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। জাহাজঘাটার একটু উত্তরে একটি ঢিপি আছে; কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে পর্টুগীজ পোতাধ্যক্ষ ও তাঁহার স্বজাতীয়দিগের জন্য একটি গীর্জ্জা ছিল; অনুমান অযৌক্তিক নহে, কারণ পার্শ্ববর্ত্তী মৌতলায় মুসলমানদিগের জন্য একটি মস্‌জিদ্ আছে। হিন্দুদিগের ত কথাই ছিল না, নিকটবর্ত্তী নকীপুর, পরমানন্দকাঠি ও গোপালপুরে অনেকগুলি হিন্দু মন্দির ছিল।

জাহাজঘাটা ও মৌতলার কতকাংশ লইয়া পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ছিল। এখানে নৌ-সৈন্য ও গোলন্দাজ সৈন্যেরা বাস করিত। উত্তরদিক দিয়া পরিখার পরিচয় স্বরূপ একটি কাটাখাল আছে। ঐ খালে এখনও অনেক স্থানে জল থাকে। দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে খালের দক্ষিণ গায়ে মৌতলার প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ্। উহা এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং স্থানীয় বহুলোকে সেখানে নেমাজ করেন। এই মস্‌জিদের জন্যই স্থানটির নাম হইয়াছে নেমাজগড়। মস্‌জিদ্‌টির ভিতরের মাপ ১৯′–২″×১৯′–২″ ইঞ্চি; ভিত্তি ৩′–৩″, মাটি হইতে গুম্বজের নিম্ন পর্য্যন্ত উচ্চতা ১২′ ফুট; একটি মাত্র বড় গুম্বজ, মিনার নাই। পূর্ব্বদিকে ৩টি এবং উত্তর দক্ষিণে প্রত্যেক দিকে ২টি করিয়া দরজা। পরবাজপুর ও ঈশ্বরীপুরের বিখ্যাত মস্‌জিদের মত, এই নেমাজগড়ের মস্‌জিদও প্রতাপাদিত্যের উদারতার পরিচয় দিতেছে।

জাহাজঘাটা হইতে একটু উত্তর দিকে গিয়া যমুনার পশ্চিম পারে দুধ্‌লি ডক্ বা পোত নির্ম্মাণ স্থান। কর্ম্মাধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ডুড্‌লির (Dudley) নামানুসারে এই স্থানটির নাম হইয়াছে দুধ্‌লি। এই স্থানে পূর্ব্বদিক হইতে একটি খনিত খাল আসিয়া যমুনায় মিশিয়াছে এবং উহা অপর পার হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে; এই খাল হইতে উত্তর-পূর্ব্ব মুখে একটি পাশখালি বাহির করিয়া একটি কৃত্রিম হ্রদে মিশান হইয়াছিল। বড় বড় জাহাজ সংস্কারের এন্য এই খাল দিয়া আসিয়া এই হ্রদে নামিতে পারিত; এবং সেখানে প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দিয়া, হ্রদটিকে শুষ্ক করিয়া লইয়া জাহাজের তলদেশ পরীক্ষা বা সংস্কার করা যাইত। উক্ত খালের মুখ হইতে বরাবর উত্তর দিকে নদীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া

বড় পুষ্করিণীর মত কতকগুলি খাত কাটা রহিয়াছে। দুই দুইটি খাতের মধ্যবর্ত্তী স্থান এখনও পাহাড়ের মত উচ্চ আছে। একটি খাতের পরে ঢিপি, পুনরায়



দুধ্‌লি ডক্‌

খাত, পুনরায় ঢিপি, এই ভাবে আমরা ১৩০টি খাত গণনা করিতে পারিয়াছিলাম। এ খাতগুলিকে ডক বা গুঁদি বলিত। গুঁদির মধ্যে কতকগুলি ১০০´×৬০´ ফুট পরিমিত এবং অনেকগুলি ইহা অপেক্ষা কমবেশী নানা আকারের হইবে। নদীর

দিক ব্যতীত গুঁদি সকলের অপর তিন পার্শ্ব ইষ্টকগ্রথিত ছিল ; এখনও ২।৪টিতে সেরূপ গাঁথুনি আছে। মধ্যবর্ত্তী ভিট্টাগুলির কতক অত্যন্ত উচ্চ। এক মাইলের অধিক দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেলে, তবে গুঁদিগুলি পার হইয়া যাওয়া যায়। উত্তর দিকে যেখানে গুঁদিগুলি শেষ হইয়াছে, সেখানে যমুনা নদী প্রায় দুই মাইল প্রশস্ত ছিল ; এখনকার খাত দেখিলে উহা অনুমিত হয়। গুঁদির মুখে দুই পার্শ্বের ইষ্টক প্রাচীরের প্রান্তের সহিত কাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট লাগান ছিল ; জাহাজ বা নৌকাগুলিকে উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঐ সকল কপাট বন্ধ করিয়া জল নিষ্কাশন পূর্ব্বক উহাদিগকে মেরামত করা হইত, অথবা শুষ্ক গুঁদিতে রাখিয়া নূতন পোত নির্ম্মাণ করিয়া জলপূর্ণ করতঃ সেগুলিকে ভাসাইয়া লওয়া হইত। শুধু দুধ্‌লিতে নহে, জাহাজঘাটা, আড়াইবাঁকীর মোহানা, সগর দ্বীপ ও অন্যান্য স্থানেও পোত-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা ছিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

লোক-নির্ব্বাচন

একক কেহ কখনও কোন কার্য্য করিতে পারে না; বড় কার্য্যে অন্যের সহায়তা চাই। সেই সহায়তার সদ্ব্যবহার করাই ব্যক্তি-বিশেষের কৃতিত্বের পরিচায়ক। সৈন্যগণের দেহ-রক্তের বিনিময়ে যুদ্ধে জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু যশস্বী হন সেনাপতি। তবে সৈনিকের প্রাণপণ বিক্রম প্রদর্শিত না হইলে, সেনাপতিত্ব বিফল হয়। যে সব রাষ্ট্র-বিজয়ী বীর জগতের ইতিহাসে কীর্ত্তি-মণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিজ অপেক্ষা সহকারী সৈন্য ও সেনানীবর্গের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দেশে যখন একটা নূতন আন্দোলন উঠে, নূতন বিপ্লব জাগে, পূর্ব্ব হইতে কেমন এক প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার আয়োজন হইতে থাকে। সেই আন্দোলনের স্রোতের মুখে তাহারই আনুকূল্যের জন্য যখন একজন বুক পাতিয়া দাঁড়ায়, তখন অলক্ষিত ও অতর্কিত ভাবে শতজন আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করে; তখন ভগবানের ব্যবস্থায় পূর্ব্ব হইতে যে সমস্তই প্রস্তুত ছিল, তাহা দেখিয়া সকলে অবাক হয়। বিধি-নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন বড় কার্য্য হয় না; এবং তাহা যখন হয়, এই ভাবেই হইয়া থাকে।

একবার কর্ম্মী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিলে, সহকারীর অভাব হয় না; কিন্তু সে কর্ম্মীর কোন অমানুষিক শক্তি এবং নির্ব্বাচন কৌশল চাই। কৃতী পুরুষের ইতিহাসে দেখা যায়, তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে প্রয়োজন মত এমন সব লোক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন যে, সহকারিগণের স্বকীয় ক্ষমতা অপেক্ষা তাঁহার নির্ব্বাচন কৌশলের অধিক প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রতাপাদিত্যের লোক বাছিয়া লইবার প্রণালী অতি সুন্দর ছিল; তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় যদি কিছু সাফল্য হইয়া থাকে, তবে ইহাই তাহার মূলীভূত। তাঁহার সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষগণের কার্য্যবিভাগ সমালোচনা করিলে, এ কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কর্ম্মচারিগণের কোন লিখিত তালিকা নাই; সমসাময়িক 'বহারিস্তান' প্রভৃতি গ্রন্থে দুই একটি নাম পাওয়া যায়; বহুদিন পরে লিখিত ঘটকের পুঁথিতে কতকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, কোন সমসাময়িক স্মারক-লিপি তাহার ভিত্তি হইতে পারে। ইহা ব্যতীত দেশের নানাস্থানে এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষগণের বংশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সে বংশের উত্তরাধিকারিগণের গৃহ-রক্ষিত কোন

বংশ-তালিকা হইতে বা বংশগত প্রচলিত প্রবাদ হইতে কতক সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। সকল তথ্যের সমাবেশ করিয়া আমরা বিভাগ অনুসারে যে তালিকা করিয়াছি, এখানে তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রত্যেকের কার্য্যকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে না।

গৌড় নগরী লুণ্ঠিত ও মহামারিতে উৎসন্ন হইলে, যাঁহারা নবপ্রতিষ্ঠিত যশোহরে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক হিন্দু জমিদার-বংশীয় কায়স্থ-তনয় ছিলেন, তাঁহার নাম সূর্য্যকান্ত গুহ। তিনি গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন এবং বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত তাঁহার এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সংগঠিত হয়।[১] কয়েক বৎসর পরে যখন প্রতাপের বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ-তনয় যশোহরে আসিয়া প্রতাপের আশ্রয় লন। অতি অল্পকাল মধ্যে এই ব্রাহ্মণ যুবক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে প্রতাপের চিত্তে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রতাপ বা সূর্য্যকান্ত অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। বঙ্গে স্বাধীনতার উন্মেষই প্রতাপের সাধনা, সে কল্পনা গৌড়ে থাকিতেই জাগিয়াছিল; সকলেরই বাল্যজীবন ভবিষ্যতের সূচনা দেখাইয়া থাকে। শঙ্করও বাল্য হইতে সেই একই চিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন। প্রতাপ যাহা চান, শঙ্করে তাহা মিলিল; প্রবৃত্তির মিলনে অচিরে উভয়ের

১ সূর্য্যকান্তের পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' সূর্য্যকান্তকে 'সূর্য্যকুমার' করা হইয়াছে এবং তিনি জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ তথ্যের মূল পাই নাই। আধুনিক নাটকে তাঁহাকে শঙ্করের শিষ্য ও অনুচর—একজন সাধারণ লোক বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। ঘটকদিগের মতে তিনি গুহ বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ এবং প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি।

'সূর্য্যকান্তঃ মহাশূরঃ গুহকুলস্য ভূষণং।
প্রতাপাদিত্যসেনানী হয়গ্রীবোপমঃ কিল॥'

'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' আছে, যুদ্ধাবসানে সূর্য্যকুমার প্রতাপের কন্যাকে বিবাহ করেন। সূর্য্যকান্ত রাজজ্ঞাতি হইলে সে বিবাহ হইতে পারে না। আমরা ঘটককারিকা হইতে দেখাইয়াছি, রাজা রামচন্দ্র ব্যতীত প্রতাপের অন্য জামাতার নাম রাজবল্লভ রায়। ঘটকগণ সর্ব্বত্রই সূর্য্যকান্তকে মহাশূর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা: 'সূর্য্যকান্তঃ মহাশূরঃ সর্ব্বশস্ত্র-বিশারদঃ।' অন্যত্র প্রতাপ স্বয়ং বলিতেছেন, 'শৃণু সূর্য্য মহাশূর যশোহরপ্রদীপক'। [নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৩০৮, ৩১৬ এবং ৩৩৭ পৃ।—শি মি]

মনোমিলন হইল ; সে বন্ধুত্ব এ জীবনে কখনও ছিন্ন হয় নাই। ইয়োরোপে ম্যাট্‌সিনির চিন্তা ও মন্ত্রণা যেমন গ্যারীবল্‌ডির কার্য্যকারিতায় প্রকাশিত হইয়া, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ইটালীর স্বাধীনতার গাথা লিখিয়া রাখিয়াছে, শঙ্করের ধ্যান-জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতাপের অসীম সাহস, বীরত্ব ও কার্য্যকারিতাকে সম্পোষণ করিয়া বঙ্গেতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়কে গৌরবময় করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে চিরানুগত প্রথায় ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্বই ক্ষত্রিয়ের রাজত্বকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে ; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী[১] ছিলেন মন্ত্রী এবং প্রতাপাদিত্য ছিলেন কর্ম্মী ; আর সে কর্ম্মের সহায়ক ছিলেন, বীরবর সূর্য্যকান্ত। এই তিন জনের অপূর্ব্ব সম্মিলনে মধুর ফল ফলিয়াছিল। তিন জনের হৃদয় ও উদ্দেশ্য এক হইলেও কার্য্য বিভাগানুসারে কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রণালী বিভিন্ন ছিল।

প্রতাপাদিত্য রাজা ; শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত তাঁহার প্রধান সহচর ও সহকারী। দুই জন দুই বিভাগের কর্ত্তা। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী সুপণ্ডিত, ধীর স্থির, কর্ত্তব্যকঠোর এবং ব্রাহ্মণোচিত প্রতিভা-সম্পন্ন। রাজ্যশাসন, রাজস্ব-সংগ্রহ ও আয়-ব্যয় প্রভৃতি প্রধান ভার তাঁহার উপর। অন্যদিকে সূর্য্যকান্ত অসমসাহসী, মহাযোদ্ধা, সর্ব্বশস্ত্র-বিশারদ এবং লোক-পরিচালনে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী। রাজত্বের প্রথমভাগে তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ; সৈন্যরক্ষণ, যুদ্ধ-ব্যবস্থা এবং বলসঞ্চয়ের জন্য প্রধান দায়িত্ব তাঁহার। শঙ্কর দেওয়ানি ও মন্ত্রণা বিভাগের কর্ত্তা এবং সূর্য্যকান্ত সৈন্য-বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রত্যেক বিভাগে ইঁহাদের সহকারী ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, রূপরাম বা রূপবসু এই দুই জন শঙ্করের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণ বালক লক্ষ্মীকান্ত রাজ সরকারে আশ্রয় লইয়া ক্রমে সদ্‌গুণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে উন্নতি লাভ করিয়া

১ কাশ্যপ গোত্রে দক্ষবংশে বর্ত্তমান ২৪-পরগণার অন্তর্গত বারাসাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ঈশ্বরীপুরের ৫।৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এখনও শঙ্করহাটি বা শঙ্করকাটি বলিয়া একটি গ্রাম আছে ; যশোহর বাসকালে শঙ্করের তথায় বাসাবাটি ছিল। প্রতাপের পতনের পর তিনি পুনরায় বারাসাতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে তাঁহার বংশের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

প্রধান দেওয়ানের পদ পান।[১] তিনি রাজস্ব বিভাগে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। এমন কি, প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর প্রভৃতি যখন যুদ্ধাদি জন্য স্থানান্তরে যাইতেন, তখন লক্ষ্মীকান্তের উপর রাজ-প্রতিনিধির ভার অর্পিত হইত।

দেওয়ানী বিভাগে আরও অনেক কর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে দুর্গাদাস সমাদ্দার নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক যশোহর রাজ-সরকারে প্রবেশ করেন, এবং কার্য্যদক্ষতায় রাজস্ব বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হন। ভবিষ্যতে ইঁহারই নাম হইয়াছিল ভবানন্দ মজুমদার এবং তিনি নদীয়ার কেশরকোনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।[২] শঙ্করের সহকারী আর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, রূপরাম বা রূপ বসু। ইনি বসন্ত রায়ের জামাতা। পদোন্নতিতে তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের প্রথম ভাগে সমর-সচিব হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পরামর্শ এবং যুদ্ধাদির আয়ব্যয় নির্দ্ধারণ ও সামরিক ব্যবস্থা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। রূপ বসুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে প্রতাপের প্রধান সহায় হইয়াছিল। বংশীপুরে যশোহর-দুর্গের দক্ষিণে ‘রূপরামের দীঘি’ তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়াছে।[৩] বসন্ত রায়ের হত্যার পর এই রূপরাম শত্রু হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করেন। অন্য

১ ইনি বর্ত্তমান বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। ইঁহার বাল্যজীবন উপন্যাসের মত রহস্যময়, কর্ম্মজীবন কৃতিত্বে উদ্ভাসিত এবং শেষজীবন ঐশ্বর্য্যে বিলসিত। কিন্তু প্রভু প্রতাপাদিত্যের প্রতি কৃতঘ্নতার জন্য তাঁহার সকল মাহাত্ম্য মলিন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা ৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে ইঁহার জীবনী ও বংশ বিবরণের আলোচনা করিব।

২ ইনি মানসিংহের আক্রমণ কালে মোগল পক্ষে সাহায্য করেন বলিয়া ১৪ পরগণার জমিদারী, মোগল সরকারে কানুনগো চাকরি এবং মজুমদার উপাধি পান। তিনি যে প্রতাপাদিত্যের সরকারে চাকরি করেন, তাহার বিশিষ্ট লিখিত প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। কিন্তু প্রবাদ শতমুখে তাঁহাকে কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্রের মত দেশদ্রোহী বলিয়া অখ্যাত করিতেছে। মানসিংহের আক্রমণ প্রসঙ্গে যখন ভবানন্দের কথা বলিতে হইবে, তখন এই প্রবাদের সত্যাসত্য বিচার করিব।

৩ ইঁহাদের আদিম বাস ঢাকার অন্তর্গত মাল্‌খানগর। তথাকার পৃথ্বীধর বসু বংশে যদুনন্দন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তৎপুত্র রূপরাম বসন্ত রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। রাজবৈবাহিক যদুনন্দন প্রভূত বৃত্তি পাইয়া আঁধারমাণিকের নিকটবর্ত্তী মালঙ্গপাড়ায় আসিয়া বাস করেন এবং রূপরাম যশোহরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার পদোন্নতি হইলে লক্ষ্মণকাটি নামক স্থান বৃত্তি

কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রীপতি গুহ, বয়াজিৎ হাজারি ও জগৎসহায় দত্ত বিশেষ বিখ্যাত। শ্রীপতি গুহ[১] স্বরাজ্য মধ্যে রসদ সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতেন। বয়াজিৎ হাজারি[২] পররাজ্যে যাইবার জন্য রসদ সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। জগৎসহায় দত্ত[৩] পূর্ত্তবিভাগের প্রধান কর্ত্তা বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহারই নামানুসারে জগদ্দল দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। এই স্থলে আরও কয়েকজন নিম্ন কর্ম্মচারীর নাম করা যায়: আমীন ও রাজস্ব সংগ্রাহক কালনীর দত্ত, কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ এবং কানুনগো জানকীবল্লভ।[৪] ইহারা প্রত্যেকেই নিজ যোগ্যতার গুণে যথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শাসন ও সমর বিভাগে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য সূর্য্যকান্তের সাহায্যে যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা ও নিয়োগাদি করিতেন। যাঁহারা কোন দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা যুদ্ধসম্বন্ধীয় সকল ব্যবস্থা করিতেন, অধিকন্তু প্রাদেশিক শাসনভারও তাঁহাদের হস্তে ছিল। এই স্থানে কয়েকজন দুর্গাধ্যক্ষের নাম

পাইয়া যশোহরে বসতি করেন। তাঁহার বংশীয়গণ এখনও টাকীর নিকটবর্ত্তী সৈদপুরে বাস করিতেছেন।

১ শ্রীপতি গুহ শ্রীপুরের 'রায়' উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ।

২ ইঁহারই নামানুসারে প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে বিস্তৃত বাজিতপুর পরগণা, সম্ভবতঃ উহা তিনি প্রতাপের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

৩ ইনি শ্রীহট্টবাসী কায়স্থ, কি সূত্রে তিনি প্রতাপের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই।

৪ কালনীর দত্ত বর্ত্তমান বনগ্রামের দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাগ্‌আচড়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল; তথা হইতে তদ্বংশীয়গণ প্রথমতঃ সুখপুকুরিয়ায় ও পরে বনগ্রামে বাস করেন। এই বংশীয় স্বরূপ নারায়ণ টাকীর জমিদারগণের খ্যাতনামা আমীন ছিলেন। তৎপুত্র বিষ্ণুচরণ ইংরাজ আমলে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইয়া 'রায় বাহাদুর' খেতাব পান (১৮৯২)। কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ 'রায়' উপাধিযুক্ত মুখোপাধ্যায়। ইহার বংশধরেরা বোধখানা, বানা, নিমটা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। বানা নিবাসী তারকচন্দ্র রায় মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি এক্ষণে 'রায় সাহেব' উপাধিযুক্ত এবং বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ বিভাগের জয়েণ্ট রেজিষ্ট্রার। তিনি ঐতিহাসিক চর্চ্চায়ও পরমোৎসাহী, তিনিই সীতাহাটি হইতে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এক সময়ে খড়রিয়া ও বেলফুলিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন; এই বংশীয় রায়চৌধুরীগণ মূলগড়ে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কাজুলিয়ায় বাস করিতেছেন।

করিতে পারি : সগর ও মেঘনা দুর্গের কর্ত্তা—পুরুষোত্তম রায় চৌধুরী[১] এবং তাঁহার অধীনে ছিলেন রঘু। কপোতাক্ষ দুর্গের অধ্যক্ষ—কমলখোজা ; মাতলা দুর্গের অধ্যক্ষ—হায়দর মানক্লী[২] এবং চকশ্রী দুর্গাধ্যক্ষ—মুয়াজিম বেগ ও তাঁহার সহকারী মধুসূদন মীরবহর।[৩] প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতিগণের মধ্যে সূর্য্যকান্ত, কমলখোজা, জমাল খাঁ, যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং ফিরিঙ্গি রুডা, এই কয়েকজনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে 'বহারিস্তানে' সূর্য্যকান্তের নাম নাই ; সম্ভবতঃ তিনি মানসিংহের নিকট প্রতাপাদিত্যের পরাজয় কালে যুদ্ধে নিহত হন বা তৎপরে কার্য্য ত্যাগ করেন। খোজা কমল, জমাল খাঁ এবং উদয়াদিত্যের কথা বহারিস্তানে স্পষ্টতঃ উল্লেখিত আছে। কমল প্রভুভক্ত বীরের মত শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে তনুত্যাগ করেন। জমাল খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কতলু খাঁর তৃতীয় পুত্র।[৪] মোগলদিগের সহিত শেষ সংঘর্ষকালে যখন সালখিয়ার সন্নিকটস্থ নৌ-যুদ্ধে খোজা কমল নিহত ও উদয়াদিত্য পলায়িত হন, তখনও জমাল খাঁ তীর হইতে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে পরাজিত হন।

প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সৈন্য ৯ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান সেনাপতির অধীন ইহার প্রত্যেক বিভাগে পৃথক পৃথক সেনানী ছিলেন। সৈন্য বিভাগের নামের সঙ্গে সেনানীবর্গের নামোল্লেখ করিতেছি :

১ বরিশালে পুরুষোত্তমের পূর্ব্বনিবাস ছিল, ইনি বসন্তরায়ের মাতুল। রাজকার্য্য উপলক্ষে যশোহরে অবস্থান কালে যেখানে বাসাবাটী ছিল, উহাকে এখনও পুরুষোত্তমপুর বলে। প্রাচ্যপতি রঘুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

২ সুলেমান ও বাবুই মানক্লী দুই ভাই। তাঁহারা উভয়ে দায়ূদ শাহের সেনাপতি। —*Ain*. (Blochmann), pp. 370, 473. বাবুই মানক্লী কতলু খাঁর ভগিনীপতি। বাবুই মানক্লীর পুত্রের নাম হায়দর। তাঁহারই নামানুসারে মাতলা দুর্গের নাম হায়দর গড়।

৩ মধুসূদন মাইনগরের বসু বংশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ। চাকশিরি দুর্গের মীরবহর বা নাবাধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী পারমধুদিয়ায় বাস করেন। এখনও পারমধুদিয়া প্রভৃতি স্থানের 'মীরবহর' বসুরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত কুলীন। দৌলতপুর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, চরিত্রগুণে এই বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন।

৪ *Ain*. (Blochmann),—p. 520 ; *Baharistan*, Bab., Dastan 10, 49a. সম্ভবতঃ

১ ঢালী বা পদাতিক সৈন্য : এ বিভাগে অধ্যক্ষ মদন মল্ল[১] এবং সহকারী কালিদাস রায়[২], সবাই বাঁড়ুয্যে[৩] প্রভৃতি।

২ অশ্বারোহী সৈন্য : অধ্যক্ষ প্রতাপ সিংহ দত্ত[৪] এবং সহকারী মাহী উদ্দীন, বৃদ্ধ নুর উল্লা প্রভৃতি।[৫]

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগল কর্তৃক উড়িষ্যায় পাঠানদিগের পরাজয়ের পর জমাল খাঁ প্রতাপের সৈন্যদলভুক্ত হন। খাজা কমলের কথা ৩৩শ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

১ ঘটককারিকায় আছে : 'সামন্তো মদনশ্চৈব ঢালীনাং পতি মল্লজঃ'। ঘটকদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায়, মানসিংহের সহিত যুদ্ধকালে তিনি অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কথিত আছে, এই মদন মল্লের পূর্ণনাম মদন মোহন মিত্র এবং তিনি যশোহর-চাঁচড়ার নিকটবর্ত্তী মিত্রসিঙ্গা গ্রামের প্রসিদ্ধ কায়স্থ মিত্রবংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৩ পর্য্যায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ কুলীন শুক্লাম্বর মিত্র এই মিত্রসিঙ্গায় প্রথম বসতি করেন। সম্ভবতঃ মদন মোহন শুক্লাম্বরের প্রপৌত্র। তিনি নিজে সম্ভবতঃ নিঃসন্তান, এজন্য কারিকায় তাঁহার নিজ ধারা উল্লেখ নাই। মিত্র-সিঙ্গার মিত্রগণ বহুদিন হইতে চাঁচড়া রাজ সরকারে দেওয়ানি প্রভৃতি চাকরি করিয়াছেন। দেওয়ান স্বরূপচন্দ্রের বংশীয়গণ এক্ষণে রাজঘাটে বাস করিতেছেন।

২ ইনি বিভাগদি ও সেখহাটির কশ্যপগোত্রীয় রায়চৌধুরিগণের পূর্ব্বপুরুষ। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর চেঙ্গুটিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। ইহার কথা ৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে আলোচনা করিব।

৩ সবাই বা সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরের অন্তর্গত আলতাপোলের বিখ্যাত বাঁড়ুয্যে বংশের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি শাণ্ডিল্য বন্দ্যঘটীবংশীয় মকরন্দের ৮ম অধস্তন বংশধর এবং কুলীন-শ্রেষ্ঠ চতুর্ভুজের পুত্র। চতুর্ভুজের তিন পুত্র 'লোহাই, সবাই, সুন্দ' মধ্যে সবাই এবং সুন্দ বা সুন্দরমল্ল প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। সেনহাটির সিদ্ধান্তবংশীয়েরা সুন্দরমল্লের বংশধর। এমনও দিন ছিল যখন প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণেরাও যুদ্ধব্রতে লিপ্ত হইয়া মল্ল বলিয়া পরিচিত হওয়া অগৌরবের বিষয় মনে করিতেন না। সবাই ও সুন্দরের কথা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

৪ 'দত্তঃ প্রতাপসিংহশ্চ মহারথিগণাধিপ'—ঘটককারিকা। এই প্রতাপসিংহের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

৫ মাহী উদ্দীনের নামে প্রসিদ্ধ মাইহাটি পরাগণা। প্রতাপের পতনের পর এই পরগণা রাজা চাঁদ রায় কর্তৃক টাকী-শ্রীপুরের রায় চৌধুরীদিগকে বৃত্তিস্বরূপ প্রদত্ত হয়। উঁহারা এখনও তাহা ভোগ করিতেছেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, প্রতাপের সেনাপতি এই নুর উল্লার নামানু-সারে নুরনগর গ্রাম হয়। ইনি যশোহরের ফৌজদার নুর উল্যা নহেন। কিন্তু নুরনগরের নাম ফৌজদার নুর উল্যার নামে হওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।—'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', ২য় খণ্ড, ৩২৮-৩৩ এবং ৪৯৫-৮ পৃ দ্রষ্টব্য।

৩ তীরন্দাজ সৈন্য : এই বিভাগের অধ্যক্ষদিগের মধ্যে স্থন্দর, ধুলিয়ান বেগ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।[১]

৪ গোলন্দাজ সৈন্য : অধ্যক্ষ ফেরঙ্গ জাতীয় ফ্রান্‌সিস্কো রুডা বা রডা।[২]

৫ নৌ-সেনা বিভাগ : সর্ব্বাধ্যক্ষ অগষ্টাস্ পেড্রো (Augustus Pedro) ; ইহার অধীন আরও কয়েকজন পর্টুগীজ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় না। সময় সময় চকশ্রী দুর্গের অধ্যক্ষ মুয়াজিম বেগ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেন। এই নৌ-সেনাপতি বা মীরবহর পেড্রোর তত্ত্বাবধানে পোতাশ্রয় (Haven) এবং পোত-নির্ম্মাণ স্থান (Dock) সকল রক্ষিত হইত। ফ্রেডারিক ডুড্‌লি পোতসংস্কারের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; ডুড্‌লির অধীন খাজা আব্বাচ নামক এক ব্যক্তি ডকের জাহাজগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ডকের পার্শ্বে এখনও একটি স্থান তাঁহার নামানুসারে খাজাবাড়িয়া বলিয়া কথিত হয়।

৬ গুপ্তসৈন্য : বিপক্ষের গতিবিধি ও অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য যেমন নদীপথে ফিরিঙ্গি ফাঁড়িতে রণতরী চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, স্থলপথেও সেইরূপ কয়েকদল সৈন্য সর্ব্বদা গুপ্তভাবে নানাদিকে ভ্রমণ করিত। চার-চক্ষু না হইলে রাজার রাজ্য চলে না। কথিত আছে, সুখা নামক এক জন দুঃসাহসিক বীর গুপ্তসৈন্য-দলের অধিনায়ক ছিলেন।[৩]

১ ধূলিয়ান বেগের নামে সম্ভবতঃ প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে ধূলিয়াপুর পরগণা হয়। এই ধূলিয়ান বেগ চকশ্রী দুর্গাধ্যক্ষ মুয়াজিম বেগের পিতা। উঁহারা উজবেগ জাতীয়।

২ ফেরঙ্গপতি রুডা একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। তিনি মোগল সংঘর্ষকালে কয়েকটি যুদ্ধে জয়-লাভ করেন। *See*, 24-Parganas Gazetteer, p. 29 ; *Bengal Past and Present*, Vol. II, p. 259.

৩ 'গুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ' — ঘটককারিকা। সুখা যে কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

৭ রক্ষিসৈন্য : স্বয়ং প্রতাপাদিত্য, তাঁহার পরিবারবর্গ, প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির দেহরক্ষার জন্য কয়েকদল সুগঠিত শরীর-রক্ষী সৈন্য ছিল। উহার পরিচালকদিগের মধ্যে বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী, রত্নেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর রায় প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।[১]

৮ হস্তিসৈন্য : এ বিভাগের কোন চিহ্নিত অধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায় না।

৯ পার্ব্বত্য কুকি-সৈন্য : ইহার অধ্যক্ষ রঘু। তাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

১ ইনি নলতার বিখ্যাত ভঞ্জচৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ। বিজয়রামের পিতা যাদবেন্দ্র প্রতাপের রাজ-সরকারে উচ্চপদ পাইয়া খাঞ্জের নিকটবর্ত্তী নল্‌তায় বাস করেন। বিজয়রাম বিখ্যাত বীর ছিলেন। প্রতাপের পতনের পর তিনি নবাব-সরকার হইতে বাজিতপুর পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লন। উহার তিন আনা অংশ এখনও ভঞ্জচৌধুরীগণ ভোগ করিতেছেন। রত্নেশ্বর রায়ের ইতিহাস চাঁচড়া-প্রসঙ্গে পৃথক পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব।

দ্বা বিং শ প রি চ্ছে দ

সৈন্যগঠন

যোদ্ধার পক্ষে সৈন্য গঠনের মত কঠিন কার্য্য আর নাই। এই কার্য্যের পূর্ব্বে রাজ্যের অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়, শত্রুর বল ও যুদ্ধ-প্রকৃতি বিচার করিতে হয়। সকল বিচার করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে হয় যে, সৈন্য গঠনে বা পরিচালনে কষ্ট না হয়; শত্রুর সর্ব্ববিধ আক্রমণ ব্যর্থ করা যায় এবং নূতন প্রণালীতে অধিকতর বলশালী সৈন্য-সমাবেশ-দ্বারা বিপক্ষকে অকস্মাৎ চমকিত ও পরাভূত করা যায়। প্রতাপাদিত্যের ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি সর্ব্বদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের যে ৯ প্রকার সৈন্য ছিল, তাহার নামোল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। পরাক্রমশালী বড় রাজাদিগের সব রকমের সৈন্য অল্পবিস্তর থাকে, কিন্তু সব সৈন্যদলের উপর তাঁহাদের সমান নির্ভর চলে না। অবস্থাভেদে নানা জাতীয় সৈন্য-সংখ্যার তারতম্য করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তাহা হইতেই যোদ্ধার সৈন্য-গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব বুঝা যায়।

অর্থের দায়ে যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা প্রকৃত যুদ্ধ করে না। যাহারা প্রাণের দায়ে, ধর্ম্মের রক্ষার্থ বা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, তাহারাই প্রকৃত যোদ্ধা; সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে বঙ্গে প্রাণের দায়ে যুদ্ধ করিবার সুযোগ আসিয়াছিল। পাঠান-শক্তি পরাজিত, নবাগত মোগলের প্রতাপে দেশ বিকম্পিত। পাঠান সৈনিকেরা পলায়ন করিয়া অনেকে যশোর-রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে; পয়সা পায় না পায়, যেখানে মোগলের বিপক্ষে কেহ যুদ্ধ করে, সেখানেই তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। কারণ আর কিছু লাভ হউক বা না হউক, প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে। বাঙ্গালী হিন্দুরাও কেহ অর্থের লোভে, কেহ বা মোগলের অত্যাচার ভয়ে, আর কেহ বা প্রতাপের শাসন-কৌশলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। সুতরাং পাঠান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায় হইতে প্রতাপের পক্ষে সৈন্য-সংগ্রহে অসুবিধা ছিল না। তিনি আবশ্যক মত পর্য্যাপ্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

উত্তর-ভারতে পার্ব্বত্যদেশে যে ভাবে যুদ্ধ করা যায়, দক্ষিণবঙ্গে, সুন্দরবনের প্রান্তে, নদীবহুল, লবণাক্ত ও কর্দ্দমিত ভাটি অঞ্চলে সে ভাবে যুদ্ধ করা চলে

না। সুতরাং স্থানের অবস্থানুসারে প্রতাপকে যুদ্ধ-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ভাল অশ্ব পাওয়া যায় না, দক্ষিণবঙ্গের পথঘাট, নদীনালা অশ্বপরিচালন পক্ষে সুবিধাজনক নহে। এজন্য অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা পদাতিক সৈন্যের দিকে তাহার অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। পুরুষানুক্রমে যাহারা সুন্দরবনে যাতায়াতে চিরাভ্যস্ত, এমন অসংখ্য সবলকায় নিম্নশ্রেণীর লোক লইয়া তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'ঢালী' সৈন্য গঠন করিলেন। তাঁহার হস্তি-সৈন্য অতি কম ছিল, ষোলটি হল্‌কা বা দল মাত্র। এক দলে ১০।১৫টির অধিক হস্তী না থাকিতেও পারে।[১] প্রতাপের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা সে সময়ের পক্ষে নিতান্ত কম ছিল না; তাঁহার অযুত বা দশ সহস্র অশ্বসাদী বা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য তীরন্দাজ ও ঢালী সৈন্যের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল; ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে তাঁহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ছিল এবং প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে ও ভারতচন্দ্রের কবিতায় আছে:

'ষোড়শ হল্‌কা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।'[২]
'অন্নদামঙ্গলে'র অন্যত্র আছে:

'সিন্দুর সুন্দর, মণ্ডিত মুদ্গর, ষোড়শ হল্‌কা হাতি।
পতাকা নিশান, রবিচন্দ্রবাণ, অযুতেক ঘোড়া সাতি॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।' ইত্যাদি

দেখা যাইতেছে, ভারতচন্দ্র সর্ব্বত্র ঢালী সৈন্যের বেলায় বায়ান্ন হাজার সংখ্যা স্থির রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রবাদই ইহার ভিত্তি; আবদুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানিতে পারি, প্রতাপের রাজত্বের শেষাংশেও তাঁহার বিশ

১ 'ষোড়শ হল্‌কা হাতি' (ভারতচন্দ্র)। হস্তীর দল বা যূথকে আরবীতে হল্‌কা বলে। এখনও আমরা মাছের 'হালি' বলিয়া থাকি। কিন্তু এক হল্‌কায় কত হাতী থাকিতে পারে, তাহার স্থিরতা নাই। বিশ্বকোষে 'ষোল শ হল্‌কা হাতী' এইরূপ পাঠান্তর নির্দ্দেশ করিয়া হস্তীর সংখ্যা ১৬০০ শত ছিল, ইহাই বলিতে চান। অন্নদামঙ্গলের প্রথম সংস্করণের পুস্তকেও এ পাঠান্তর নাই, থাকিলেও হল্‌কা কথার অর্থ হয় না। এ মত আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।—'বিশ্বকোষ', ২২শ খণ্ড, ৫৩৫ পৃ।

২ সাতি, সাথী শব্দ সাদি বা সাদী শব্দের অপভ্রংশ। অশ্ব গজ বা রথারোহীকে সাদী বলে।

হাজার পাইক বা পদাতিক সৈন্য ছিল।[১] তাহাতে রাজত্বের প্রথম বা প্রতাপান্বিত অবস্থায় তাঁহার পদাতিক সৈন্য সংখ্যা বায়ান্ন হাজার পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ও পৃথক্‌ভাবে ৫২ হাজার ঢালী ছিল, হয়ত এ কথা ঠিক নহে; সম্ভবতঃ ঢালী সৈন্যেরই কতক আবশ্যক মত তীর ধনু লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। তবে এই পদাতিক বা ঢালী সৈন্য যে তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

ঢাল এবং সড়কী বা বর্শাই ঢালীদিগের প্রধান সজ্জা ছিল। সুন্দরবনে তখন বহুসংখ্যক গণ্ডার ছিল; উহাদের চর্ম্ম হইতে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তুত হইত। গণ্ডার চর্ম্মের ঢালের তুলনা নাই; এমন ঢাল আর কিছুতেই হয় না। এ দেশে সড়কী বা বর্শাও অতি সহজ এবং সুলভভাবে প্রস্তুত হইত। সরু দীর্ঘ বাঁশের অগ্রভাগে, সুন্দরীগাছের সরু ছিটের শীর্ষে, বা সুপারির চটা বা বাখারির মাথায় সূক্ষ্মাগ্র লৌহ-ফলক লাগাইয়া সড়কী হইত। লৌহ-ফলক না হইলেও শুধু সুপারির চটা সরু করিয়া লইলেই বর্শার কাজ চলিত। মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া, কটিবন্ধ আঁটিয়া এই ঢাল সড়কী লইয়া ঢালী সৈন্য ডাক ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়িত। এই তীব্র চীৎকারে লোকের মনে আতঙ্ক হইত এবং বহুদূরে যুদ্ধধ্বনি ঘোষিত হইত। এই সকল ঢালী সৈন্য কোন বাধা বিপত্তি মানিত না, প্রাণপাত করিয়াও যুদ্ধ করিত। খাঁ জাহানালির পদাদিক সৈন্যের মত ইহাদেরও কোদাল বা কুঠার অস্ত্রমধ্যে গণ্য হইত। উহারা জঙ্গল কাটিত, গড় কাটিত এবং খাল নালা বাঁধিয়া পুল প্রস্তুত করিয়া চলিত। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অদম্য যোদ্ধা, তেমনি জঙ্গলে কাঠুরিয়া, জলে নৌকার দাঁড়ী এবং পথে কোড়াদারের কাজ করিত। প্রতাপের পতনের পর এই সকল সৈন্য ও তাহাদের কার্য্য-প্রণালী দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।[২] এই ঢালী

১ প্রবাসী ১৩২৬ আশ্বিন, ৫৫২ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

২ এখনও যশোহর এবং খুল্‌না এই উভয় জেলার পাড়াগাঁয়ে যেখানে সেখানে 'ঢালী' উপাধি-ধারী মুসলমান ও নমঃশূদ্র বংশ বাস করিতেছেন। এই উপাধি তাঁহাদের বংশগৌরব সূচনা করে। এখনও জমিদারে জমিদারে দৈবাৎ কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে, উভয় পক্ষের 'লাঠিয়াল'দিগের ঢাল সড়্‌কীই প্রধান অস্ত্র হয়। এখনও বিবাহে ও পর্ব্বদিনে ঢালীপাক খেলা হয়। বরযাত্রীর মিছিলে বা সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢালী সৈন্যের মত উচ্চ চীৎকার করিবার প্রথা আছে; 'ঢাল ও তরবারি না লইলে যে সেকালে যুদ্ধ বা সর্দ্দারী করা চলিত না' প্রবাদ-কথায় তাহার প্রমাণ আছে। উপযুক্ত

সৈন্য প্রতাপাদিত্যের এক প্রধান অবলম্বন এবং তাঁহার সৈন্যগঠন-প্রণালীর প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পর্টুগীজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতি ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজন্যবর্গের সেনাবিভাগে প্রবেশ করে। প্রতাপের রাজত্বকালে উহারা বঙ্গোপসাগরে ও পার্শ্ববর্ত্তী দক্ষিণবঙ্গে আসিত; বাণিজ্য, দস্যুতা, ধর্ম্মপ্রচার বা চাকরী প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে উহারা দেশের মধ্যে প্রবেশ করিত। কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়া যশোরে আসিত, কেহ বা আত্ম-কলহ জন্য প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় ভিক্ষা করিত। প্রতাপ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্য করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইত, কেহ তাঁহার শরীর-রক্ষী সাজিত, কেহ জাহাজ নির্ম্মাণে, গুলিগোলা প্রস্তুত করিবার কৌশলে বা গোলন্দাজের কার্য্যে নিজের ক্ষমতা দেখাইয়া চাকরী পাইত। প্রধানতঃ তাহাদের দ্বারা দুইটি কাজ হইত; কেহ জাহাজ নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিয়া নাব-বিভাগে নায়ক হইত; আর কেহ গুলিগোলা প্রস্তুত করিয়া কামান লইয়া যুদ্ধ করিত। উভয়ই গুরুতর কার্য্য। প্রতাপ যে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে সুফল ফলিয়াছিল। দেশের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, কিন্তু রুডা, পেড্রো বা ডুড্‌লি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। পর্টুগীজ জাতির মধ্য হইতে এই গোলন্দাজ ও নৌ-সৈনিক সংগ্রহ করা প্রতাপাদিত্যের সৈন্য-নির্ব্বাচন প্রণালীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব।

পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত প্রতাপাদিত্যের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে রঘু, সুখা এবং পূর্ত্তবিভাগীয় কর্ম্মচারীর মধ্যে জগৎ সহায় দত্ত প্রভৃতি অনেকে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা হইতে আসেন। শুনা যায়, রঘুর অধীন

সরঞ্জাম না লইয়া কোন কার্য্যে উদ্যোগী হইলে, লোকে বলে, 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার। প্রতাপের ঢালীসৈন্যের নায়ক বা ঢালীসর্দ্দারের বংশীয়গণ এখনও এদেশে সম্মানিত। খুল্‌না জেলায় 'ঢাল'-সংযোগে বহুস্থানের নাম হইয়াছে। হরি নামক কোন্ ঢালী. হরিঢালী গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা; ইতিহাস তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। চকশ্রীর সন্নিকটে এক চকেরই নাম হইয়াছে ঢালচাকা। সুন্দর-বনের নিকটে ঢালচাকার হাট বিখ্যাত। কালীগঞ্জের সন্নিকটে যে স্থানকে এক্ষণে ধলবাড়িয়া বলে, হয়ত তাহার আদিম নাম ছিল ঢাল-বাড়ী। ইহা ভিন্ন ঢালী, ঢালনগর, ঢালীর চক প্রভৃতি আরও কত গ্রাম আছে।

প্রতাপের এক দল পার্ব্বত্য কুকী সৈন্য ছিল। ইঁহারা মুখে চিত্র বিচিত্র করিতেন, হাতে পায়ে গায়ে নানা অদ্ভুত আদিম-যুগীয় অলঙ্কার পরিতেন এবং তীর ধনুক, বর্শা ও টাঙ্গি লইয়া যুদ্ধ করিতেন। যুদ্ধে ইঁহারা সহজে ক্লান্ত হইতেন না; আহারের ক্লেশে চঞ্চল হইতেন না এবং ক্রুদ্ধ হইলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। শত্রুগণ ইঁহাদের অদ্ভুত যুদ্ধ-প্রণালী জানিত না; সুতরাং তাহারা ইঁহাদের অব্যবস্থিত কঠোর যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত হইত। বঙ্গোপসাগরের কূলে বা দ্বীপে যাহারা বাস করিত, তাহারা সকলেই অল্প বিস্তর নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হইত। প্রতাপ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ইহাদের দ্বারা নৌ-সেনা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে বা নিকটবর্ত্তী গ্রামে যে সব কৈবর্ত্ত, বাগদী, নমঃশূদ্র, পোদ (পৌণ্ড্রক) ও বেদিয়া প্রভৃতি জাতি ছিলেন, তাঁহারাও দলে দলে আসিয়া সৈন্যদলভুক্ত হইতেন। এই ভাবে পার্ব্বত্য জাতি, দ্বীপবাসী ও আদিবাসী সৈন্য দ্বারা সামরিক বিভাগের বল সঞ্চয় করা তাঁহার সৈন্য-গঠন প্রণালীর তৃতীয় বিশেষত্ব।

প্রতাপাদিত্য গুলিগোলা ও অস্ত্রশস্ত্রের যথেষ্ট সংস্থান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যে মোগলদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাহারা কামানের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত; যথেষ্ট কামানের প্রয়োগই তাহাদের যুদ্ধ জয়ের গুপ্ত মন্ত্র। আকবর স্বহস্তে বন্দুক চালনা করিতেন; তাঁহারই হাতের গুলিতে রাজপুত বীর জয়মল্লের বিনাশ হয়। প্রতাপ এসব জানিতেন এবং তজ্জন্য তিনি কামান বন্দুকের বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া মোগল-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। এজন্য পর্য্যাপ্ত লৌহের প্রয়োজন; কিন্তু উহা বঙ্গদেশে সহজে পাওয়া যায় না। প্রতাপের যে ছোট বড় বহুসংখ্যক কামান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। এখনও ধূমঘাট রাজধানীতে দুর্গের গায়ে প্রকাণ্ড বুরুজ খানা ও ইছামতীর পার্শ্বে সারি সারি বুরুজ বা অসংখ্য কামান রাখিবার ঢিপি বর্ত্তমান আছে। কালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মহব্বৎপুর গড়ের উপর যে কয়েকটি প্রকাণ্ড কামান ছিল তাহা স্বচক্ষে দেখিবার লোক এখনও জীবিত আছেন। এখনও একটি বড় কামান ত্রিমোহিনীতে পড়িয়া আছে, প্রবাদ আছে উহা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী হইতে গৃহীত।[১] প্রতাপাদিত্যের প্রত্যেক দুর্গে এবং অনেক স্থানের

১ ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী চণ্ডীপুরের বাঁধের কাছে যে একটি লৌহময় জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা সরকারী ব্যবস্থায় সাতক্ষীরায় আনীত হইয়া বহুকাল কাছারীর নিকট পড়িয়াছিল। রাজা

গড়ের মাঝে মাঝে কামান প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল কামানের অধিকাংশ যশোহর রাজধানীতে বিখ্যাত শিল্পীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেশীয় শিল্পীর নির্ম্মিত বড় কামান এখনও ঢাকা, বরিশাল ও মুর্শিদাবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত প্রতাপের কামানের দুই চারিটি পর্টুগীজ বা পাঠানদিগের নিকট হইতে ক্রীত বা গৃহীত হইতে পারে। কামান ও গোলা প্রস্তুত করিবার জন্য যে যথেষ্ট লৌহ রাজধানীতে আনীত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরিষ্কৃত লৌহ মণ্ডূর আনিয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ বাহির করিয়া লইয়া কামান ও গোলার জন্য ব্যবহৃত হইত। অব্যবহার্য্য মণ্ডূর বা লৌহের গু কারখানার পার্শ্বে পরিত্যক্ত হইত। এখনও ধূমঘাট দুর্গের বাহিরে ও অন্যান্য স্থানে রাশি রাশি লৌহ-মণ্ডূর দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থান হইতে এই মিশ্রিত লৌহ-পিণ্ড সংগৃহীত হইত এবং বিষ্ণুপুর বা সেন-পাহাড়ীর হিন্দু ভূঞাগণ প্রতাপের সহিত সখ্যসূত্রে এতদ্বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার নানা জাতীয় গোলা ছিল, তন্মধ্যে বড় গোলা সকল চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) সম্পূর্ণ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত গোলা। রায়পুরের অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি উহার একটি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার্থ কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম। এই গোলাটির পরিধি এক ফুট; লৌহ অপেক্ষাও উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। সম্ভবতঃ লৌহের সহিত অন্য কোন ধাতুর মিশ্রণে এই অত্যন্ত ভারী গোলা প্রস্তুত হইয়াছিল। (২) লৌহের আবরণ বিশিষ্ট পাথরের গোলা। পর্য্যাপ্ত লৌহের অভাবে প্রতাপ এই নূতন উপায় অবলম্বন করেন। পাথরের গোলকের উপর পুরু লৌহের আবরণ দিয়া তাহাই কামানে ব্যবহৃত হইত। (৩) সেরূপ আবরণ না দিয়া শুধু প্রস্তর-গোলকই কামানে পুরিয়া গোলার মত প্রযুক্ত হইত।- এখনও রাজধানীর সন্নিকটে নানা স্থানে এইরূপ পাথরের গোলা পাওয়া যায়। উহার কতকগুলি শ্রীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের প্রযত্নে ঈশ্বরীপুরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে এবং আমার নিকট সংগৃহীত আছে। চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহোদয় পরিষদের তিনটি গোলকের তত্ত্বানুসন্ধান

গিরীন্দ্রনাথ রায় উহা চাহিয়া লইয়া নিজের খোঁড়গাছির বাড়ীতে রাখিয়াছেন। তিনি বলেন সেটি কামান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, উহা কোন নিমজ্জিত জাহাজের ভগ্নাংশ হইতে পারে।

করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১] তাহা হইতে মোটামুটি জানা যায়, উহার মধ্যে দুই প্রকার গোলা ছিল, তাহাদের পরিধি ৯২ ইঞ্চি হইতে এক ফুট পর্য্যন্ত। এক প্রকার গোলা অত্যন্ত দৃঢ় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং অন্য প্রকার গোলা 'নদীসৈকতস্থিত বালুকণা একত্র করিয়া চুনা প্রভৃতি দিয়া' প্রস্তুত। প্রস্তরের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র অনুমান করিয়াছেন যে, উহা রাজমহল হইতে আনীত। নদীপথে রাজমহল বা অন্যস্থান হইতে যে রাশি রাশি পাথর আনা হইত, তাহার অন্য পরিচয় আছে। ধূমঘাট দুর্গের সন্নিকটে যমুনার কূলে স্থানে স্থানে প্রস্তররাশি পাওয়া যায়, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ সকল পাথর দেখিলেও তাহা রাজমহলের পাথর বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপ ভাবে আনীত পাথর যে শুধু গোলা প্রস্তুত করিতেই শেষ হইত, তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে সব কষ্টিপাথর পাওয়া যাইত, তদ্দ্বারা দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের স্তম্ভাদি গঠিত হইত। কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভ ও পাদপীঠাদি এখনও বেদকাশীতে পড়িয়া রহিয়াছে। সব সময়ে এই প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যাইত না; বিশেষতঃ মোগল সংঘর্ষকালে গঙ্গাপথে কোন দ্রব্যাদি আনিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। এজন্য প্রতাপাদিত্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিলেন। (৪) তিনি মাটীর গোলক তৈয়ার করাইয়া পোড়াইয়া লইতেন এবং উহার উপর লোহার আবরণ দিয়া গোলারূপে ব্যবহার করিতেন। বেদকাশীতে 'পাথরখালি' নামক খালের কূলে স্থানে স্থানে পাথর, লৌহমণ্ডূর এবং এই প্রকার পোড়ামাটীর গোলা এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'পাথরের গোলা কামানের গোলারূপে অনেক দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে'; কিন্তু পোড়ামাটির গোলাকে লৌহমণ্ডিত করিয়া বোধ হয় একমাত্র প্রতাপাদিত্যই ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শুধু কামান ও গোলা নহে, যশোহরের কারখানায় নানাবিধ বন্দুক প্রস্তুত হইত। এখনও অনেক পুরাতন বন্দুকের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। খোড়গাছি

১ এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, যশোহরের গোলার প্রস্তরে 'বক্রভঙ্গ ফেলস্কর, অপিট ও অয়স্কান্ত' ব্যতীত গালাগনিট নামক এক পদার্থ আছে। এই প্রস্তর ক্ষার শ্রেণীর অন্তর্গত। তেমন প্রস্তর রাজমহলে ও দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায়। প্রতাপের পক্ষে দাক্ষিণাত্য হইতে পাথর আনিবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য অনুমান হয়, তিনি এই সব পাথর রাজমহল হইতে আনেন।—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৯ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৫৯—৬০ পৃ।

রাজবাটীতে তিনটি পুরাতন বন্দুকের নল আছে। দুইটিতে কিছু কিছু কাঠ আছে ; কুন্দা কোনটিতে নাই। ছোট নল দুইটির প্রত্যেকটি ৫´-৪´´ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং বড়টি ৭´ ফুট দীর্ঘ। বড়টির ছিদ্র পূর্ণ এক ইঞ্চি বিস্তৃত। সাত ফুট নল-যুক্ত বন্দুক বড় ভারী, ঐরূপ বন্দুকের নাম ছিল, জর্দ্দাল বন্দুক ; এখনকার লোকের নলটি হাতে তুলিয়া লওয়াই কষ্টকর ব্যাপার। যশোহরের কর্ম্মকারগণ নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ তরবারি, খাণ্ডা, গুপ্তি, টাঙ্গি, বর্ম্ম ও বর্শার ফলক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন ; তাঁহাদের শিল্পগৌরবে যশোহর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। প্রতাপের পতনের পর ইঁহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইলেও, এখনও কালীগঞ্জের কামারগণ যেমন খাঁড়া, কাটারি ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করেন, তেমন সুন্দর জিনিষ অন্যত্র সহজলভ্য নহে। প্রতাপাদিত্য যে নিজ সৈন্যদলকে এবম্বিধ নানারকম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সৈন্য-গঠন প্রণালীর চতুর্থ বিশেষত্ব।

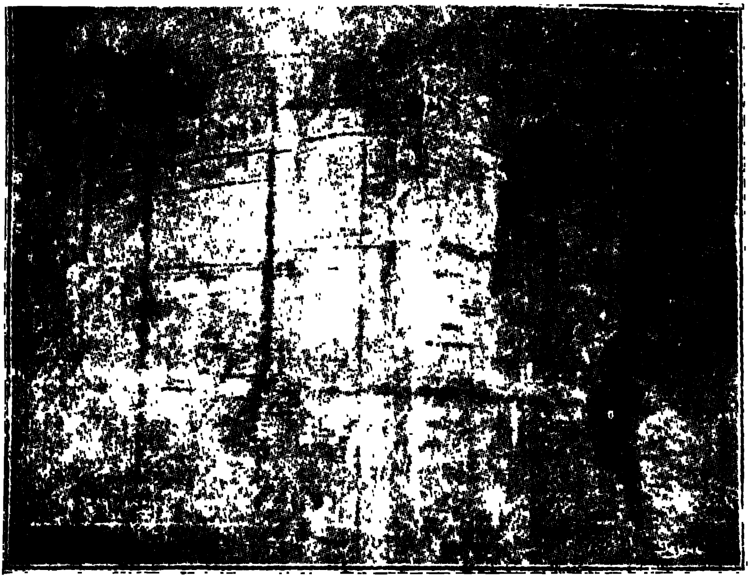
এতক্ষণ আমরা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিলাম। তিনি কি ভাবে দুর্গ নির্ম্মাণ ও নৌ-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, কি ভাবে সৈন্য গঠন ও তাহাদের পরিচালনার জন্য লোক নির্ব্বাচন ও রসদ সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন, তাহাই দেখাইলাম। এখন আমরা তাঁহার কার্য্যকলাপ ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। এতক্ষণ যাহার আয়োজন করিয়াছি, এখন তাহার প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে হইবে।



চণ্ডভৈরব, ঈশ্বরীপুর



প্রতাপনগরের গড়



পররাজপুরের মসজিদ



বঙ্গে প্রথম গীর্জ্জা, ঈশ্বরীপুর

ত্র য়ো বিং শ প রি চ্ছে দ

প্রতাপের রাজত্ব

এইবার আমরা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের কথা বলিব। সময়ানুক্রমে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করা যায় না; কারণ, সমসাময়িক বা বিশ্বাসযোগ্য লিখিত বিবরণী না থাকিলে, ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির রাখা সম্ভব নহে। পূর্ব্বে আমরা কয়েকটি পরিচ্ছেদে তাঁহার যুদ্ধাদির আয়োজনের পরিচয় দিয়াছি। বর্ণিত সকল ঘটনাই যে রাজ্যারম্ভেই হইয়াছিল, এমন কথা নহে; ততগুলি দুর্গ বা নৌ-বাহিনী নির্ম্মাণ বা লোক সংগ্রহ অল্প দিনে হয় না; তবে কখন কোন্ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা যখন নির্দ্ধারিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, তখন একজাতীয় ঘটনাগুলি একত্র প্রকাশিত করাই ভাল। সেরূপভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়। আমরাও তাহাই করিয়াছি।

যতদূর বুঝিতে পারা যায়, প্রতাপাদিত্য ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে রীতিমত স্বহস্তে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই বৎসরই তাঁহার ধূমঘাটের দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল; তাহা অচিরে সম্পন্ন হইল। এই বৎসরই মাতা যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব হইল এবং তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইল। সেই পীঠমূর্ত্তি আবির্ভাবের ফলে তিনি দেবানুগৃহীত বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এই দৈব কারণে তাঁহার নিজেরও চরিত্রোন্নতি হইল। তিনি গুরুদেবের নিকট নিয়মমত পূর্ণাভিষিক্ত হইলেন এবং রীতিমত তান্ত্রিক পূজা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই বৎসরই মহারাণী শরৎকুমারীর গর্ভে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। মায়ের আবির্ভাবে যে ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন—উদয়াদিত্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বনাম ছিল গোপীনাথ; ভক্ত বসন্ত রায় গোপীনাথের প্রথম পুত্রের নাম রাখিলেন জগন্নাথ। আমরা পরে দেখিব, স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া এই পুত্র যথার্থই বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। নূতন দুর্গ, নূতন ইষ্টদেবতা এবং নবকুমার লাভ এই তিনটি ঘটনার জন্য এই বৎসরটি বিখ্যাত হইয়া থাকিল।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইতে গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতাপ ও বসন্ত রায়

প্রাচীন রাজধানীতেই বাস করিতেছিলেন। ১৫৮৭ অব্দে ধূমঘাট দুর্গ ও তৎসংলগ্ন আবাসবাটিকাদি নির্ম্মিত হইলে, প্রতাপ সপরিবারে তথায় স্থানান্তরিত হইলেন এবং বসন্ত রায়ের উৎসাহে ও সুব্যবস্থায় তথায় তাঁহার পুনরভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র হইতে ভুঞারাজগণ নূতন রাজধানীতে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য মহা ধূমধাম হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধূমঘাটের নাম দেশে বিদেশে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকিল। প্রতাপ এই সকল ভুঞা-নৃপতিগণের সহিত নূতন রাজনীতির আলোচনা করিতে লাগিলেন; কিরূপে সকলে সমবেত হইলে সকলের সাধারণ শত্রু মোগলকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা যায়, ইহাই তাঁহাদের মন্ত্রণার প্রধান বিষয় ছিল। অবশ্য পক্ষভুক্ত পাঠান সর্দ্দারেরা এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস ও উৎসাহ দিতেছিলেন। ইহাতে যে শুধু দেশ-মাতৃকার সেবা হইবে, তাহা নহে; স্বকীয় স্বার্থ ও দেশের উন্নতির পন্থাও উদ্ভাবিত হইবে। এ কল্পনায় প্রতাপই নিজের অত্যধিক আগ্রহের পরিচয় দিলেন, কে কে অগ্রণী হইবেন, কোন্ দেশ হইতে কোন্ প্রকার সৈন্য সংগৃহীত হইবে এবং কি ভাবে সমবেতভাবে কার্য্য চলিবে, ইহাই বিষম বিতর্কের বিষয় হইল। কেহ সদুদ্দেশ্য বুঝিয়া সম্মতি দিলেন, কেহ ইহাকে প্রতাপের আত্ম-প্রাধান্য স্থাপনের কৌশল মনে করিয়া স্পষ্ট ভাবে মতামত দিলেন না। যাহা স্থির হইল, তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ্য রাখা হইবে, এবং উপযুক্ত আয়োজন করিয়া ভবিষ্যতে দূতের সাহায্যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হইবে। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী এই সকল কূটমন্ত্রণায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেন। তবে বসন্ত রায় এই ব্যাপারে যোগদান করিলেন না; মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তিনি দেশীয় লোকের শক্তি ও প্রকৃতি বুঝিতেন। প্রতাপ বা তাঁহার সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ দুই এক জনের মনে স্বাধীনতার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশ না জাগিলে তাহা বিফল হইবে এবং অসময়ে চেষ্টা করিয়া বিফলতা লাভ করিলে ভবিষ্যতের আশাও কিছু থাকিবে না, প্রতাপকে তিনি তাহা বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন না, বরং খুল্লতাতের প্রতি এই বিরুদ্ধ মতের জন্য আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায়ও প্রতাপের ভবিষ্যৎ বিপদ-সঙ্কুল মনে করিয়া নিজে পৃথক হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে কেহ বিশেষ কিছু বলিলেন না, কিন্তু মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। প্রতাপ

ধূমঘাটে রাজত্ব আরম্ভ করিলে, বসন্ত রায় গঙ্গাতীরে রায়গড় দুর্গে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়া, অধিকাংশ সময় তথা হইতেই যশোর রাজ্যের ।৵ ছয় আনা অংশের শাসনকার্য্য করিতে লাগিলেন। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে কখন কখনও তিনি যশোহরে আসিতেন।

যুদ্ধ বা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যের যে চণ্ডমূর্ত্তি দেখি, শাসনকালে তাহা ছিল না। তাঁহার মূর্ত্তিতে যে কঠোর ভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না, সকল যোদ্ধারই তাহা থাকে; আলেকজেণ্ডার, নেপোলিয়ন, প্রতাপসিংহ বা শিবাজী সকলেরই এক কঠোর ভাব ছিল, উহা বীর্য্য-প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ। দেশের শাসক বীরপুরুষের মুখে যদি স্ত্রীজনোচিত কোমল ভাব বা মধুর ভাষা শুনিতে চাই, অনেক স্থলে তাহাতে নিরাশ হইতে হয়। প্রতাপাদিত্যের কঠোরতার অন্তরালে হৃদয়ের অন্তস্তলে এক অপূর্ব্ব কোমলতা ও মহাপ্রাণতা ছিল; বাহিরে তাহা ন্যায় বিচারে, উদার ব্যবহারে এবং দয়াদাক্ষিণ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। বসন্ত রায়ও শিষ্টের পালনে ও প্রজারঞ্জনে দক্ষ ছিলেন, দুষ্টের দমনেও তাঁহার আগ্রহ ছিল, তিনি মিতব্যয়ী, মিতাচারী এবং সহৃদয় ব্যক্তি; ধীর স্থির ভাবে সুবিবেচনায় যাহা করা যায়, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু প্রতাপের প্রতিভা অন্যরূপ; তাঁহার যোদ্ধৃজনসুলভ কঠোর প্রকৃতি মানুষকে শঙ্কান্বিত করিত, তাঁহার শাসন হয়ত কোন কোন স্থলে বড় কঠোর হইয়া যাইত; কিন্তু বহুক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ উদারতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইত। লোকে তাঁহাকে ভয় করিত সত্য, কিন্তু আবার তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিলে সকল ভয়, সকল নিন্দা ভাসিয়া যাইত। তাঁহার এই সকল গুণের বহু গল্প এখনও প্রদেশে প্রচলিত আছে। কোন্ সময়ে কোন্ ঘটনা হইয়াছিল, আমরা তাহার আনুপূর্ব্বিকতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কয়েকটি গল্প এখানে প্রকাশ করিতেছি। এ সকল গল্প অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু ইহা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দেব-চরিত্রের পরিচয় পাইলেই মানুষে তাহা লোক-শিক্ষার জন্য সম্পত্তির মত ব্যবহার করে এবং উত্তরাধিকার স্বরূপ পরবংশীয়গণের জন্য রাখিয়া যায়। পুরুষপরম্পরায় উহা উপদেশ দিবার জন্য আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে।

অভিষেক বা অন্য কোন উৎসব উপলক্ষে একদিন প্রতাপাদিত্য মহারাণীর সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমাগত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে স্বর্ণমুদ্রা দান

করিতেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের নির্দ্দেশ মত মহারাণীই হাতে করিয়া মুদ্রা দিতেছিলেন। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণকে দিবার সময় মহারাণীর হস্ত হইতে দানের মুদ্রা একটি নিম্নস্থ পাত্রে পড়িয়া যায়; তিনি তৎক্ষণাৎ হাত দিয়া পাত্র হইতে একটি মুদ্রা উঠাইয়া দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিক যে মুদ্রাটি হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেইটিই কি তিনি তুলিতে পারিয়াছেন? মহারাণী ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিলেন না। তখন প্রতাপ বলিলেন, 'ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য যাহা হাতে করিয়া উঠান হইয়াছিল, তাহা দেওয়াই হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে; যখন তাহা হইতে হস্তচ্যুত মুদ্রাটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন তিনি কিছুতেই দত্তাপহারী হইতে পারেন না।' মহারাজ তখন অম্লান বদনে হুকুম দিলেন, 'পাত্রস্থ সমস্ত মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দান কর'। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ভাগ্য খুলিয়া চিরদরিদ্রতা ঘুচিল। ব্রাহ্মণ দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রবাদ আছে, দিল্লী বা আগ্রা হইতে এক ভাট কবি ভিক্ষার জন্য যশোহরে আসেন। রাজধানী হইতে প্রতাপের অনুপস্থিতি বশতঃ কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া পরে একদা স্থানান্তরে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজ তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি আর অধিক দিন বিলম্ব করিতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে তাঁহাকে একটি অশ্ব ও সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবার আদেশ দেন। ভাট কবি অবাক্ হইয়া গেলেন, অবশেষে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, ভারতের কোন স্থানে তিনি এমন দানশীলতা দেখেন নাই। সেই অবধি আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, 'না চাহিতে ঘোড়াটা হল, চাহিলে হাতিটা পেতাম'।[১]

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বন্দ্যঘটী-বংশীয় কুলীনশ্রেষ্ঠ চতুর্ভুজের পুত্র সবাই ও সুন্দর প্রতাপাদিত্যের সেনানী ছিলেন। সবাই বা সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি বিবাহ করিয়া বহু কুলীনের কুলরক্ষার হেতু হইয়াছিলেন। সবাই ছিলেন ঢালী সর্দ্দার এবং বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার 'ঢাল মাপা খাই ছিল,' অর্থাৎ তিনি একখানি ঢাল পরিপূর্ণ করিয়া কড়ি না লইয়া কাহারও কন্যার পাণিপীড়ন করিতেন না। তাঁহার ঢাল খানিতে অন্যূন ৯৫০৲ টাকার কড়ি ধরিত; তিনি

১ 'বিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, ২৬৯ পৃ।

বিবাহের পূর্ব্বে এমন বহুজনের নিকট হইতে ৯৫০৲ টাকা খাইয়া বসিতেন।[১] একদা এক কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'সবাইকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে তাঁহার কুল থাকে না, তিনি উহাকে সম্মত করাইতে না পারিলে রাজবাটীতে জলগ্রহণ করিবেন না।' প্রতাপাদিত্য তৎক্ষণাৎ সবাইকে ঢাল মাপিয়া টাকা দিয়া সম্মত করিলেন। তখন উপবাসী ব্রাহ্মণ অন্নজল গ্রহণ করিলেন। প্রতাপের দানশীলতা দেশে বিদেশে বিঘোষিত হইল।

প্রবাদ আছে, চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রত্নেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রক্ষি-সৈন্য দলের কর্ত্তা ছিলেন। অত্যন্ত বলবান বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। গোপালপুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তথায় বহু সহস্র ব্রাহ্মণকে পংক্তি ভোজন করান হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড খুঁটির উপর সামিয়ানা টাঙ্গান ছিল; এক দিন উহার নিম্নে যখন বহু ব্রাহ্মণ পংক্তি-ভোজনে রসনার সাধ মিটাইতে-ছিলেন, তখন হঠাৎ দম্‌কা বাতাসে খুঁটিটি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকায় ব্রাহ্মণভোজন বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রত্নেশ্বর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি উহা দেখিয়া মহাবিক্রমে খুঁটিটি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অটল হইয়া দাঁড়াইলেন এবং ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহারাজের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ অনুগত বীর সেনানীর কর্ত্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, রত্নেশ্বরের নাম রাখিলেন—যজ্ঞেশ্বর এবং তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন।[২]

১ ভট্টনারায়ণ হইতে ১৭শ পুরুষে চতুর্ভুজ বিখ্যাত কুলীন: তৎপুত্র ১৮ সবাই, লোহাই, সুন্দর। সবাই হইতে ধারা এইরূপ:—১৮ সবাই—১৯ কেশব—২০ হরিনারায়ণ—২১ মথুরেশ—২২ নন্দকিশোর—২৩ রত্নেশ্বর—২৪ নীলকণ্ঠ—২৫ কৃপারাম—২৬ মুক্তারাম সাং চালিতাবাড়িয়া—২৭ রামকুমার, ইনি ১২১৭ সালে আলতাপোলে বসতি করেন। তৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয় (রায়বাহাদুর), জগজ্জয় প্রভৃতি। ২৮ জগজ্জয়—২৯ কুঞ্জবিহারী—৩০ উপেন্দ্র—৩১ গুরুদাস, পঞ্চানন প্রভৃতি। সবাই বাঁড়ুয্যের ৯৫০৲ খাওয়ার প্রবাদ এখনও চলিয়া আসিতেছে। কোন কার্য্যের পূর্ব্বে কেহ বাধ্যবাধকতা করিয়া না ফেলিলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি তোমার ৯৫০ খাইয়াছি যে এই কার্য্য করিব?'

২ এই স্থানে যজ্ঞেশ্বর রায়কে পরগণা দানের কথা আছে। তদ্বিষয় আমরা চাঁচড়া বংশের ইতিহাস প্রসঙ্গে বিচার করিব। তবে প্রতাপাদিত্য যে যজ্ঞেশ্বরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। যশোহর কালেক্টরীর ৩২৪ নং সিদ্ধ নিষ্কর তায়দাদ দেখিলে জানা যায়, রাজা

প্রতাপাদিত্যের কল্পতরু হওয়ার গল্প লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করেন, তখনই এই দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সেদিন প্রতাপ ও তাঁহার মহিষী মুক্তহস্তে দান করিতেছিলেন। প্রার্থিগণ যে যাহা চাহিল, তাহাই পাইল। অর্থের ত কথাই নাই, বসন ভূষণ, স্বর্ণ রৌপ্য, ভূমি বা সামগ্রী, হাতি ঘোড়া, যান বাহন, যে যাহা চাহিল, সকলই অকাতরে বিলাইয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ প্রতাপাদিত্যের দানশীলতার শেষ পরীক্ষা করিবার জন্য মহারাজের নিকট তাঁহার মহিষীকে প্রার্থনা করিলেন। আজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ-শালী প্রতাপাদিত্য সর্ব্বসমক্ষে দান-শৌণ্ডিকতার পরীক্ষা দিবার জন্য দণ্ডায়মান, হিন্দু-নৃপতির নিকট সে পরীক্ষাক্ষেত্র তখন ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত; ব্রাহ্মণের প্রগল্‌ভ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই; তাহা হইলে যে মহারাজকে নিরয়গামী হইতে হইবে। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া প্রতাপ সত্যপালন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। মহিষীও তাঁহার সতী সাধ্বী, প্রকৃত সহধর্ম্মিণী; তিনি মহারাজের মুখের পানে চাহিয়া ইঙ্গিত মাত্র ভিখারী ব্রাহ্মণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সমবেত লোক সকল অবাক হইয়া সেই কাণ্ড দেখিতেছিল। এবার ব্রাহ্মণ বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি করযোড়ে নিবেদন করিলেন, 'মহারাজের দানশক্তি বুঝিবার জন্য আমি এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মহিষী আমার কন্যা-স্থানীয়া, আমি পুনরায় মহারাজকে দান করিতেছি। যখন আপনি রাজা, তখন আমার দান গ্রহণ করিতেও আপনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।'[১] প্রতাপ প্রথমতঃ সে প্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই; শেষে সভাসদবর্গের শাস্ত্রের ব্যবস্থা মত মহিষীর ভারানুরূপ অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া মহারাণীকে পুর্নগ্রহণ

প্রতাপাদিত্য চাঁচড়া বংশের পূর্ব্বপুরুষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে শ্যামরায় ঠাকুরের সেবার্থ ১২৩৫০ বিঘা জমি নিষ্কর দেন। উহা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী নিষ্কর বলিয়া দশশালা বন্দোবস্তের সময় বহাল থাকে। মলই, রামচন্দ্রপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি পরগণায় উক্ত নিষ্কর জমি আছে। শ্যামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন। চাঁচড়া বাটীতে তাঁহার যে সুন্দর জোড় বাঙ্গলা ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, শুধু সম্মুখের একটি মাত্র প্রাচীর আছে। পূর্ব্বপোতার নূতন গৃহে এক্ষণে শ্যামরায়ের পূজা হয়।

১ 'বিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, 'প্রতাপাদিত্য' প্রবন্ধ (চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), ২৬৯ পৃ, রাম-রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' (মূলগ্রন্থ) ১২৭ পৃ, নিখিলনাথের টিপ্পনী, ১১৫ পৃ।

করিলেন। অচিরে এই সকল দানের কাহিনী যশোহর রাজ্যের সর্ব্বত্র লোক-সমাজে প্রচারিত হইল। তখনই ভাটমুখে কবিতা রচিত হইয়াছিল :

'স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকী পাতালে,
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে।'[১]

এই গল্পের কতটুকু সত্য বা অসত্য, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এমন কবিতা অকারণে রচিত হয় না; তাহা যদি হইত, তবে দেশে অনেক খ্যাতিসম্পন্ন রাজাও আছেন, তাঁহাদের অনেকের নামে এমন কবিতা রচিত হইত। যতদিন এই কাহিনী প্রবাদবাক্যে রক্ষিত হইবে, ততদিন প্রতাপাদিত্যের দানের মহিমা নিষ্প্রভ হইবে না! এই দান শুধু সাধারণ দান নহে, এই দানশীলতার অন্তরালে সেই বঙ্গীয় নৃপতির যে মহাপ্রাণতা এবং কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সকলেরই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এইরূপে যখন প্রতাপাদিত্যের যশোপ্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল, তখন ক্রমে ক্রমে কত পণ্ডিত ও গুণিজন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাদের আশ্রয় দান করিতেন এবং যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিতেন। বাদশাহ দরবারে প্রতাপ নিজেই কিরূপে সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন, সে গল্প পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার নিজের রাজসভায় সেইরূপ সমাগত পণ্ডিতেরা সমস্যা পূরণ ও নানাবিধ দার্শনিক তর্ক করিতেন। গুরুদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন ইঁহাদের সকলের অগ্রণী ছিলেন; তিনিই সাধারণতঃ দুই পক্ষের শাস্ত্র বিচারে মধ্যস্থতা করিতেন। তবে তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অন্যান্য সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে অবিলম্ব সরস্বতী ও কবি ডিম্‌ডিম্‌ সরস্বতী নামক দুই ভ্রাতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উভয়ই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন মুখে মুখে বড় দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এজন্য

১ এই কবিতাটি আগ্রা হইতে আগত জনৈক ভাটের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। বসু মহাশয় ভাটের গল্পটা বড় বেশী অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাটের পক্ষে বাঙ্গলা কবিতা রচনা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় কোন দেশীয় ভাট বা কবি ইহা রচনা করেন এবং দান-শীলতার গল্পের সঙ্গে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

তাঁহার উপাধি হয়—অবিলম্ব সরস্বতী। অন্য জন দর্শনশাস্ত্রে আরও বড় পণ্ডিত হইলেও শ্লোক-রচনার বেলায় ভ্রাতার মত দ্রুত কবি ছিলেন না, এজন্য তাঁহাকে লোকে বলিত কবি ডিম্‌ডিম্। এ দুইটি, উপাধি মাত্র ; তাঁহাদের প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। সরস্বতী উপাধি তাঁহাদের কয়েক পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছিল।

প্রতাপাদিত্যের যশোকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অবিলম্ব সরস্বতী একদিন রাজমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন :

'প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম নিভালয়।
স্বেদেন প্রোঞ্ছিতা সন্তু বিধের্দুর্লেখ-পংক্তয়ঃ ॥'

হে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, একবার আমার কপালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি আদিত্যস্বরূপ, তোমার দৃষ্টিমাত্র কপালে দর দর ধারায় ঘর্ম্ম বহিবে এবং উহা দ্বারা আমার পোড়া কপালের বিধিলিপি ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, অর্থাৎ মহারাজ আপনার কৃপাদৃষ্টি পাইলে আমার দুরদৃষ্ট ঘুচিবে। প্রতাপকে এইরূপে আদিত্য বা সূর্য্য কল্পনা করিয়া তিনি অন্য সময়ে আরও অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কবিকলা-কৌশলের গুণে একটি কবিতা এখনও সুধী-সমাজে আত্মরক্ষা করিয়াছে। তাহা এই :

'দানাম্বুসেক-শীতার্ত্তা যশোবসনবেষ্টিতা।
ত্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে ॥'

হে প্রতাপাদিত্য, তোমার দানরাশি জলধারাতুল্য শীতল, তাহার সিঞ্চনে ত্রিলোকের লোক শীতার্ত্ত হইয়াছে, এবং শীত নিবারণ জন্য তাহারা তোমার যশোরূপ বস্ত্রদ্বারা গাত্র আবৃত করিয়াছে ; অবশেষে তাহাতেও শীত না যাওয়ায়, তুমি প্রতাপ-বলে সূর্য্যতুল্য বলিয়া তোমার সেবা করিতেছে। অর্থাৎ তোমার দানশীলতার কীর্ত্তি-কাহিনীতে সমাকৃষ্ট হইয়া সকল লোকে তোমার আশ্রয় লইতে আসিতেছে। বৃত্তিভুক্ পণ্ডিতেরা স্তাবকতা অনেক করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন সুকৌশলে কবিতা গ্রথিত করিয়া অতি অল্প কবিই দুই একটি মাত্র শ্লোক দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যশোহরের কবিচন্দ্র এইরূপ স্বভাব-কবি ছিলেন, অন্যত্র আমরা তাঁহার কথা বলিব। বর্ত্তমান যুগে নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এইরূপ সরল সুন্দর দ্রুত কবিত্বের জন্য খ্যাতি-মণ্ডিত। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, অবিলম্ব সরস্বতীর মত কবির মুখে অজস্র উদ্গীরিত কবিতারাজি

একেবারে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। হয়ত তাহার অনেকগুলি উদ্ভট-কবিতায় আছে, কিন্তু কোন ভণিতা নাই বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। প্রতাপাদিত্যের নাম-সংযোগে এই দুইটি শ্লোক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।[১]

প্রতাপাদিত্য অবিলম্ব ও তাঁহার ভ্রাতার জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অবিলম্ব সরস্বতী শুধু কবি নহেন, তিনি পরম ভক্ত ও সাধক এবং সিদ্ধকুলে তাঁহার জন্ম। কথিত আছে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের গুরু কেশব ভারতীর বংশে এই দুই ভ্রাতার জন্ম হয়। প্রতাপের ব্যবস্থামত অবিলম্ব সরস্বতীর প্রধান কাজ ছিল, মাতা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে নিত্য চণ্ডীপাঠ। যে কেহ চণ্ডীপাঠ করিতে পারেন না; পাঠের সময় একটি বর্ণাশুদ্ধি বা উচ্চারণ-দুষ্টি ঘটিলে, চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয় এবং পুনরায় সংকল্প করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিতে হয়। আমরা পরে দেখিব, প্রতাপের পতনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই চণ্ডীপাঠ কার্য্য শুদ্ধ ও শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে চলিয়াছিল। যে দিন অবিলম্বের মুখে চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হইল, বারংবার চেষ্টায়ও শুদ্ধপাঠ মুখ নিঃসৃত হইল না, সেই দিন সরস্বতী চণ্ডী বন্ধ করিয়া মায়ের মন্দির পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রতাপ নিজের ভাগ্য বুঝিয়া লইলেন এবং অনতিবিলম্বে অখণ্ডনীয় কর্ম্মফলে স্বীয় কর্ম্ম-জীবনের পরিসমাপ্তি দেখিলেন। সে কথা পরে হইবে, আপাততঃ আমরা সরস্বতী ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশ-পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসী কাটোয়ায় বাস করিতেন। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয়, সিমলাই গাঞি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। আদি নিবাস হুগলীর অন্তর্গত বৈঁচির নিকটবর্ত্তী সিমলা গ্রাম। মহাপ্রভু ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। যতদূর জানিতে পারিয়াছি[২]

১ বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর মহোদয় স্বকীয় 'উদ্ভট-সমুদ্র' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে অবিলম্ব সরস্বতীর স্বরচিত এই দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তাঁহার সংগ্রহ-সাগরের অন্য রত্নগুলির মধ্যে এই সরস্বতীর সম্পত্তি আর কিছু নাই, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। দুঃখের বিষয়, পূর্ণচন্দ্রের গ্রন্থে অবিলম্বের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

২ অবিলম্ব সরস্বতীর বংশ বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে তাঁহার বংশীয়গণের সন্ধান পাইয়াছি, সেখানেই নিজে গিয়া বা পত্রদ্বারা বারংবার প্রার্থনা জানাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আশানুরূপ সদুত্তর পাই নাই। যশোহর-প্রতাপকাঠি নিবাসী কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই বংশীয়। তাঁহার নিকট হইতে বংশবিবরণ পাইবার

কেশব ভারতীর দুই পুত্র ছিলেন—ছত্রভারতী ও নন্দকিশোর। সম্ভবতঃ নন্দকিশোর অসামান্য মেধার ফলে শতাবধানী উপাধি পান। নন্দকিশোরের রামানন্দ ও রামগোবিন্দ নামে দুই পুত্র হয়। রামগোবিন্দ হুগলীর অন্তর্গত শ্রীবরা গ্রামে বাস করেন ; তথাকার ভট্টাচার্য্যগণ এবং নদীয়ার সরকার গোষ্ঠী এই বংশীয়। প্রাতঃস্মরণীয় শ্যামাচরণ সরকার ব্যবস্থা-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রামানন্দেব পুত্রের নাম মুকুন্দরাম সরস্বতী। সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে যশোহরে আসেন এবং বৃত্তিভোগী হইয়া বর্ত্তমান কালীগঞ্জের উত্তরাংশে নল্‌তার নিকটবর্ত্তী খলসিয়ানী গ্রামে বাস করেন। বিক্রমাদিত্য এই মুকুন্দরামকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ইঁহারই নামানুসারে মুকুন্দপুর নাম হইয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। মুকুন্দরামের পুত্রদ্বয়ের নাম অবিলম্ব সরস্বতী ও কবি ডিম্‌ডিম্‌ সরস্বতী। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে অবিলম্ব সরস্বতী অল্পবয়স্ক যুবক ছিলেন এবং তাঁহার পতনের পর তিনি কপোতাক্ষী তীরে সাগরদাঁড়িতে বাস করেন। রায়েরকাঠি প্রভৃতি স্থানের বাসুকী-গোত্রীয় রাজবংশের বিবরণী হইতে জানিতে পারি :

'চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস-মন্ত্রদাতা,
কেশব ভারতী ছিল ঠিক যেন ধাতা।
সাগরদাঁড়ি বাসী বটে শ্রোত্রিয় প্রধান,
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞি হন।
সে কেশব ভারতীর সন্তান সুন্দর
সিদ্ধ পুরুষ অবিলম্ব সরস্বতীবর।
সে মহাত্মার কাছে রাজা রুদ্রনারায়ণ
ভক্তিভরে ইষ্টমন্ত্র করেন গ্রহণ।'[১]

জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার আলস্য ত্যাগ করাইতে পারি নাই। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তিনি একটু চেষ্টা করিলে সকল শাখার বিবরণ একত্র করিয়া দিতে পারিতেন। অগত্যা আমার চেষ্টার ফলে যাহা পাইয়াছি তাহার সত্যতা উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করিতে না পারিয়াই প্রকাশ করিলাম। যিনি সত্য উদ্ধার করিয়া আমার কোন ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন, তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

১ 'বাসুকি-কুল গাথা', 'বাক্‌লার ইতিহাস', ২৩৩ পৃ।

অবিলম্ব সরস্বতী রুদ্রনারায়ণের পিতৃগুরু ছিলেন। রুদ্রনারায়ণ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং উহার পূর্ব্বেই রুদ্রনারায়ণের দীক্ষা হয়। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের পতনের পর অবিলম্ব সরস্বতী সাগরদাঁড়িতে বাস করেন। এখনও তথায় তাঁহার বাড়ী, সাধন-কালীতলা এবং বুড়া শিব নামক ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ আছে এবং এখনও পার্শ্ববর্ত্তী কপোতাক্ষীর ঘাট বুড়া শিবের ঘাট বলিয়া বিদিত। লোকে বুড়া শিবের মানসা করে এবং প্রবাদ আছে তাঁহার ঘাটে কখনও কুমীর দেখা যায় না। ভারতীবংশীয় কয়েক ঘর এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু সিদ্ধপুরুষের গৃহদেবতা বুড়া শিবের পূজাদির যাহা দুর্গতি দেখিলাম, তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।[১] অবিলম্বের কত প্রসঙ্গ যশোহর-খুল্‌নার কত স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী মসিদপুর গ্রামের প্রান্তে ভৈরবকূলে একস্থানে তাঁহার সাধনাসন দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে এখনও 'অবিলম্ব সরস্বতীর বটতলা' বলে; গুল্ম-বিজড়িত বৃক্ষ-স্তবকের ঘনচ্ছায়া এখনও সেই নির্জ্জন স্থানটিকে ভীতি সঙ্কুল করিয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-রাঙ্গদিয়ার একটি গ্রাম্য রাস্তাকে 'অবিলম্ব সরস্বতীর জাঙ্গাল' বলে এবং বাজুয়া গ্রামে তাঁহার ভিট্টাও দেখান হয়।[২] সাগরদাঁড়ি হইতে অবিলম্বের বংশধর ষষ্ঠীদাস বিদ্যালঙ্কার রায়েরকাঠিতে উঠিয়া যান। ষষ্ঠীদাসের সন্তানগণ রায়েরকাঠি হইতে সাগরদাঁড়ির সম্পত্তির অংশভাগী ছিলেন।[৩]

১ ভারতবংশীয় যাঁহারা এক্ষণে সাগরদাঁড়িতে আছেন, তন্মধ্যে ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রধান। বুড়া শিবটি কিন্তু দৌহিত্রবংশীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের (যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) গৃহে হীনভাবে পালিত হইতেছেন। সাগরদাঁড়ি কবিবর মাইকেলের জন্মভূমি, তাঁহার স্মৃতিসৌধের নিকটে অবিলম্ব সরস্বতীর বাসভূমিতে তাঁহার বুড়াশিবের জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রামের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না।

২ ভৈরবের অপর পারে কোঁড়ামারা গ্রামে এখন ভারতীবংশীয়েরা বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে অক্ষয়কুমার ভারতী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাঁহারা নিজ বংশের ইতিহাসে সম্পূর্ণ উদাসীন।

৩ যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৯৩২৮নং তায়দাদ্ হইতে দেখা যায়, ওধনকাটি ডাকনাম রায়েরকাঠি নিবাসী রামজয়, রামলোচন ও মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যদিগের পূর্ব্বাধিকারী প্রপিতামহ কেশবানন্দ সরস্বতীর নামে নেহালপুর সাগরদাঁড়িগ্রামে ৫১/ বিঘা নিষ্কর ছিল। উহার অর্দ্ধাংশ

প্রতাপের পরলোক গমনের পর যখন চাঁচড়া রাজগণ যশোহররাজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন, তখন তদ্বংশীয়েরা অবিলম্ব সরস্বতীর বংশধরগণকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভারতীবংশীয়েরা প্রতাপকাটি ও কামালপুর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। কবি ডিম্‌ডিমের বংশধরগণ প্রাচীন খলসিয়ানী ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী চাঁপাফুল প্রভৃতি গ্রামে ও পরে বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত সাল্‌খে, চাতরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন।[১]

এক্ষণে সাগরদাঁড়ির ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অবিলম্ব সরস্বতীর প্রপৌত্রের নাম কেশবানন্দ, এবং চাঁচড়ার মনোহর রায়ই কেশবানন্দকে উক্ত নিষ্কর দিয়াছিলেন।

১ সম্ভবতঃ অবিলম্বের পৌত্র সর্ব্বানন্দ কবিকণ্ঠাভরণ প্রতাপকাটি আসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপরাম; তৎপুত্র গৌরীকান্ত ও নীলকান্ত। গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের পুত্র রামচন্দ্র শিরোমণি, তৎপুত্র গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বনাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেদারনাথ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের পিতা। ইহা আদ্যোপান্ত পণ্ডিতের বংশ। কবি ডিম্‌ডিমের ধারায় চাঁপাফুলে রামচন্দ্র তর্কতীর্থ খ্যাতনামা পণ্ডিত। কবি ডিম্‌ডিমের একটি ধারা এইরূপ: তৎপুত্র প্রসন্ন সরস্বতী—রামভদ্র—ঘনশ্যাম, কৃষ্ণকিঙ্কর—কাশীনাথ—দুর্গাপ্রসাদ, বিষ্ণুপ্রসাদ; দুর্গাপ্রসাদ—কামাখ্যানাথ, সাং—চাতরা; বিষ্ণুপ্রসাদের বর্ত্তমান নিবাস সাল্‌খা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

উড়িষ্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল মোগলাধিকৃত বঙ্গরাজ্যের হিসাব প্রস্তুত করিয়া এবং শাসনের কতক ব্যবস্থা করিয়া এ দেশ হইতে চলিয়া যান। তিনি আর কখন বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসেন নাই। বঙ্গের বিদ্রোহ কিন্তু তাঁহার যাওয়ার পর শান্ত হয় নাই। এই বিদ্রোহ-বহ্নি বহুস্থানে নানা আকারে বহুকাল পর্য্যন্ত জ্বলিয়াছিল, ইহার প্রশমন করিবার জন্য শাসনকর্ত্তাদিগকে বহুকাল ধরিয়া বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশের সে অবস্থা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি।

টোডরমল্লের পর আকবর আর একজন প্রধান সেনাপতিকে বঙ্গে পাঠাইয়া দেন। ইঁহার নাম মীর্জা আজিজ্ কোকা; ইনি বাদশাহের ধাত্রীপুত্র; সুতরাং ইহার প্রতি তিনি আজীবন বিশেষ সদয় ও স্নেহযুক্ত ছিলেন।[১] বঙ্গে আসিবার কালে ইনি পাঁচ-হাজারী মন্সবদার পদে উন্নীত হন, তখন ইহার নাম হয় খান্-ই-আজম্। সাধারণতঃ ইঁহাকে আজম্ খাঁ-ই বলা হয়। আজম্ খাঁ এক বৎসরের কিছু অধিক কাল বঙ্গে ছিলেন। ইঁহার আগমনের প্রাক্কালে প্রতাপাদিত্য নিজ নামে যশোহর-রাজ্যের সনন্দ লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। ঘটককারিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই খাঁ আজমের সহিত প্রতাপাদিত্যের প্রথম সংঘর্ষ হয়।[২] এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ এই সময়ে

১ "Though offended by his (Aziz) boldness, Akbar would but rarely punish him; he used to say: 'Between me and Aziz is a river of milk which I cannot cross'."—*Ain.* (Blochmann), p. 325; কারণ উভয়েই এক মায়ের স্তন্য পান করিয়াছিলেন।

২ ঘটক কারিকায় আছে:

'সম্বাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গীরো মহীপতিঃ।
প্রেষয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ॥
*　　*　　*
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন ভূতলে॥'

—[নিখিলনাথ, মূল ৩০৬ পৃ—শি মি]

প্রতাপাদিত্য পিতার মৃত্যু, রাজ্যের বিভাগ, নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা, সৈন্যগঠন ও অন্যান্য ব্যাপারে এরূপভাবে লিপ্ত ছিলেন যে, প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি মোগলের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

ভবেশ্বর রায় নামক একজন ক্ষত্রিয় সেনানী খাঁন আজমের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি চাঁচড়া রাজবংশের আদি পুরুষ। উক্ত রাজ পরিবারের বংশগত প্রবাদ[১] হইতে জানা যায়, ভবেশ্বর রায় খাঁ আজমের নিকট সৈয়দপুর, ইমাদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর, এই চারি পরগণার সনন্দ পাইয়াছিলেন (১৫৮৪) এবং এই সম্পত্তি তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ করেন (১৫৮৮)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, খাঁ আজম এই চারিটি পরগণা প্রতাপের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া ভবেশ্বরকে প্রদান করেন।[২] প্রতাপের সহিত যে আজমের বিরোধ হইয়াছিল এই ঘটনা হইতে তাহা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। কবিরাম কৃত 'দ্বিগ্বিজয়-প্রকাশ' হইতে জানিতে পারি, ভদ্রতীরবর্ত্তী কেশবপুরই প্রতাপের যশোর-রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। উক্ত চারিটি পরগণাই ভদ্রনদীর অপর পারে, কেশবপুরের উত্তরাংশে বর্ত্তমান যশোর সহরের পার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং উক্ত পরগণাগুলি প্রতাপাদিত্যের সনন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ; এবং তাহা ভবেশ্বরকে প্রদান করা হইলে প্রতাপের প্রকাশ্যে আপত্তি করিবার কিছু

কিন্তু জাহাঙ্গীর আজমকে প্রেরণ করেন এবং তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হন, এই উভয় উক্তিই ভুল। আজম্ আকবরের শাসনকালে ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত বঙ্গে ছিলেন, পরে বঙ্গে আসেন নাই, এবং তিনি ১৬২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হন।—*Ain.* (Blochmann), p. 327.

১ গত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদাকণ্ঠ রায়বাহাদুর গভর্ণমেণ্টের নিকট যে বর্ণনা দাখিল করেন তাহাতে ছিল: 'As far as I can gather from the coincidence of historical facts and from traditions and family records in my Sherista, this Hindu general was Raja Bhabeswar Roy, a well-to-do and influential man of Oudh and the founder of the Jessore Raj family who, in obedience to an order from the Emperor, took upon himself the arduous duty of coming to Bengal and quelling the insurrection in co-operation with Azim Khan.' কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আমরা যেরূপ জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ভবেশ্বরের পূর্ব্ব-পুরুষই অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বঙ্গে আসিয়া, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জেমো নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে তাঁহারা এদেশীয় সমাজভুক্ত হন। সবিশেষ বিবরণ পরে দিব।

২ Westland, *Jessore*, p. 45 ; Khulna Gazetteer, p. 36-7.

ছিল না। সে সব পরগণার উপর তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু তখন তিনি এমন ভাবে নিজের রাজ্য-ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত যে, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণার জন্য অপ্রস্তুত অবস্থায় মোগলের সহিত বিরোধ করিতে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। অপর পক্ষে, বিদ্রোহ দমন করিতেই আজমের আগমন; অথচ তিনি প্রতাপের পথ আগুলিয়া অস্বাস্থ্যকর নিম্নবঙ্গে বসিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং তিনি প্রতাপের মত দুর্দ্দান্ত জমিদারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ভবেশ্বরকে থানাদার করিয়া, যশোর-রাজ্যের ঠিক উত্তর সীমায় ছাউনি করিয়া থাকিতে আদেশ দিলেন এবং সৈন্যবর্গের ব্যয় নির্ব্বাহের জায়গীর স্বরূপ উক্ত চারি পরগণার সনন্দ দিলেন। কেশবপুরের নিকট ভদ্রনদীর অপর পারে যেখানে ভবেশ্বরের প্রথম ছাউনি হয়, সেখানে হাট বসিল; ভবেশ্বরের নামে হাটের নাম হইল ভবহাটি এবং দুই মাইল উত্তরে যেখানে মাটীর গড় করিয়া ভবেশ্বর প্রথম আবাসস্থান স্থাপন করিলেন, তাহারই নাম হইল মূলগ্রাম।[১] ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাহার পর উক্ত পরগণাগুলি তৎপুত্র মহতাবরাম রায়ের হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপাদিত্যের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া চলিতেন।

রামরাম বসু বলেন, বাদশাহ আকবর সর্ব্বপ্রথম আবরাম খাঁকে প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠান এবং তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। ফতেপুর-শিকরীর সেখ সেলিমের ভ্রাতুষ্পুত্র সেখ ইব্রাহিম খাঁ আজমের শাসনকালে বঙ্গ বিহারে ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না এবং তাঁহার মৃত্যুও ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় হইয়াছিল।[২] নিখিলনাথ রায় মহোদয় ঘটককারিকা ও বসু মহাশয়ের উক্তির কতকটা সমন্বয় করিতে গিয়া উহার অনৈতিহাসিক অংশ বাদ দিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, খাঁ আজমের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রথম ইব্রাহিম সৈন্য লইয়া যান, এবং তিনি পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পরে আজম গিয়া প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন।

১ বর্ত্তমান কেশবপুরের দুই মাইল উত্তরে এখনও মূলগ্রাম আছে। সেখানে ভবেশ্বর সিংহের গড়কাটা বাড়ীর চিহ্ন আছে। এক্ষণে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ কাঁসারি পরিবার ইহার অধিবাসী। তাঁহারা সকলেই কাঁসা পিত্তলাদি ধাতুদ্রব্যের ব্যবসায়ী।

২ *Ain.* (Blochmann), p. 403; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ১৩৪-৫ পৃ।

কেহ কেহ বলেন, খাঁ আজমই পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং বসিরহাটের সন্নিকট-বর্ত্তী সংগ্রামপুরে যুদ্ধ হয়। কিন্তু এ বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ নহি। তবে ঘটক-কারিকার কথা পরিত্যাগ করিলেও বসু মহাশয়ের উক্তি একেবারে পরিত্যাজ্য নহে। তিনি পারসীক ভাষায় লিখিত বিবরণী দেখিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন, এইরূপই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ আজম ও ইব্রাহিমের সহিত যুদ্ধের কথা লোক পরম্পরায় চলিয়া না আসিলে, ঘটকেরাই বা কোথায় পাইলেন? সুতরাং যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে এবং সংগ্রামপুর স্থানের নামটিও তাহার ইঙ্গিত করে। তবে যুদ্ধ হইয়া থাকিলেও যে পরে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য যে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। আমাদের বিশ্বাস, ধুমঘাটে নূতন রাজধানী করিয়া শাসন করিবার সময়ও তিনি সামন্ত রাজা ছিলেন এবং তদনুসারে রাজসরকারে কিছু কিছু পেশ্‌কস্‌ বা উপহার প্রেরণ করিতেন। কিন্তু সে শুধু বাহ্য নিদর্শন মাত্র, রাজ্য মধ্যে তিনি স্বাধীন রাজার মতই চলিতেন।

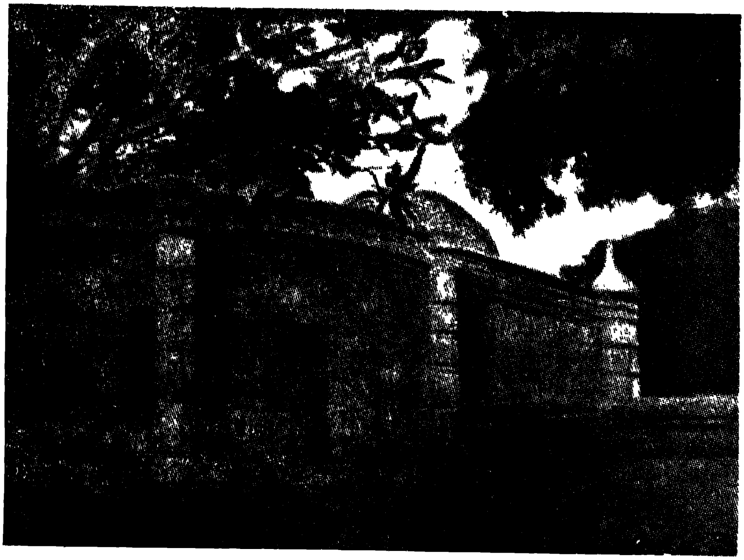
এমন সময়ে (১৫৯১) উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হন। তাঁহারা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়া লইয়া ক্রমে কটক ও জলেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং অবশেষে বিষ্ণুপুরের ভুঞা হাম্বীর মল্লের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসেন।[১] শুধু আক্রমণ নহে, এমনভাবে গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া দেশ ছারখার করিতে থাকেন যে, প্রজাকুল একান্ত ব্যাকুল হইয়া হাম্বীরের কৃপাপ্রার্থী হন। তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা; কিন্তু তিনি এদেশের আবহাওয়ার প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ যে, নিজে বিহারেই থাকিতেন, সৈয়দ খাঁ রাজধানী তাণ্ডায় থাকিয়া তাঁহার সহকারীস্বরূপ বঙ্গ শাসন করিতেন।[২] হাম্বীর মল্ল সর্ব্বপ্রথমে পাঠান বিদ্রোহের কথা মানসিংহ ও সৈয়দ খাঁকে জানাইলেন। মানসিংহ হাম্বীরের প্রতি সদয় ছিলেন। কারণ, হাম্বীর বহুকাল পর্য্যন্ত আকবরের অনুরক্ত সামন্ত রাজ ছিলেন। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কতলু খাঁর সৈন্যদল মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহকে পরাজিত

১ *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 934.
২ Stewart, *History of Bengal* (Bangabasi Edition), p. 205.

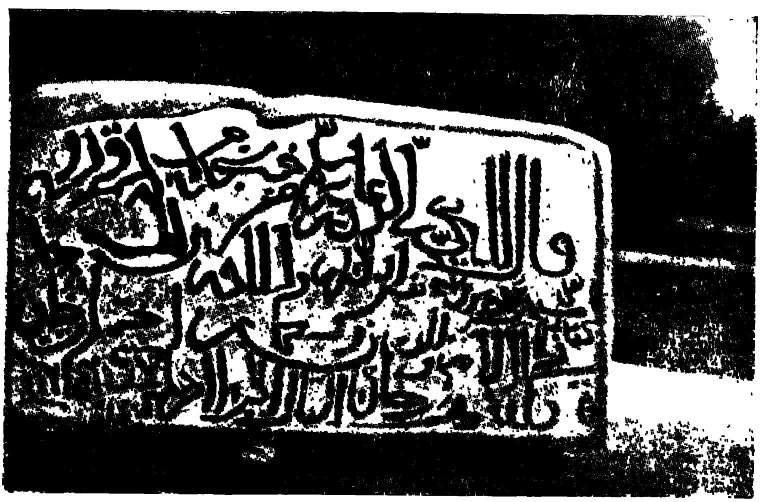


মীর্জানগরের কামান

[গ্রন্থকার কামানের উপর উপবিষ্ট]



হিজলীর মসনদ আলি মসজিদ



হিজলীব মসজিদের শিলালিপি

ও আহত করেন, তখন হাম্বীর মল্লই তাঁহাকে বিষ্ণুপুর লইয়া আশ্রয় দেন, তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন।[১] সে কথা মানসিংহের মনে ছিল। তিনি সত্বর বাদশাহের অনুমতি লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং সৈয়দ খাঁর উপর এই মর্ম্মে হুকুম জারি করিলেন যে, তিনি যেন স্বয়ং এবং সমস্ত সামন্ত রাজগণের সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন। সৈয়দ খাঁ এই সময়ে খুব অসুস্থ ছিলেন, তবুও আয়োজন করিতে বিরত হইলেন না। তিনি অন্যান্য সামন্ত রাজাদিগকে যেমন লিখিলেন, তেমনি যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যকেও লিখিয়াছিলেন।[২] অন্যদিকে হাম্বীর মল্লও এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কয়েকটি কারণে প্রতাপাদিত্য এই উপলক্ষ্যে মোগলপক্ষে যুদ্ধ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রথমতঃ, মনে মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্যভাবে তিনি মোগলের বিপক্ষাচরণ করিতে পারেন না; সৈন্য দিয়া বাদশাহকে সাহায্য করা প্রত্যেক সামন্ত নৃপতির অবশ্য কর্ত্তব্য; পূর্ব্ববার পাঠানের সহিত সন্ধি করিয়া মানসিংহ বাদশাহের নিকট দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এ জন্য এবার তিনি কেবলমাত্র বঙ্গ বিহারের সৈন্য লইয়া উড়িষ্যা জয় করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প;[৩] সুতরাং সকল সামন্ত রাজদিগকে সৈন্য লইয়া আসিতেই হইবে এবং সৈয়দ খাঁর অসুখ থাকিলে কি হয়, তাঁহাকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেই হইবে, এইরূপ হুকুম আসিল। এরূপ অবস্থায় বাদশাহী আদেশ কিছুতেই অমান্য করা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ, সুবেদারের আদেশ অমান্য করিলেও হিন্দু ভুঞাদিগের মধ্যে অন্যতম হাম্বীর মল্লের অনুরোধ উপেক্ষনীয় নহে। তৃতীয়তঃ,

---

১ *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 879 ; Elliot, Vol. VI, p. 86.

২ বঙ্গের বিদ্রোহ দমন জন্য প্রত্যেকবারই সামন্ত রাজগণের উপর এইরূপ আদেশ হইত। একবার খিজিরপুরের ঈশা খাঁর বিদ্রোহ কালে, 'An order was issued to Said K. and other fief-holders of Bengal and Behar to act in unity and to exert themselves to punish the landholder (Isa).'—*Akbarnama*, Vol III, p. 660. এবারও '...when Said K. got well he joined with...Babui Mankli...and other fief-holders of that country together with 6000 men and 500 horse.'—*Ibid*, III, p. 935. প্রতাপাদিত্য তখনও নগণ্য ব্যক্তি, আবুল ফজল এস্থলে তাঁহার নাম না করিলেও তিনি যে উক্ত সামন্তরাজগণের (fief-holders) মধ্যে ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩ 'Rajah Man Singh. who repented of the peace he had made, resolved to conquer the country and obtained leave from the court. He chose the soldiers of Behar and Bengal for this enterprise.'—*Akbarnama*, III, p. 934

আফগানেরা জগন্নাথের পুরী লুণ্ঠন করিয়া এবং পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া, সর্ব্ব-জাতীয় হিন্দুর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একবার বিক্রমাদিত্যই জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি[১] এবার তাঁহার পুত্র সেই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? চতুর্থতঃ, বীরমাত্রেই বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য উদ্যোগী হন, তাহার একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। বিশেষতঃ এমন একটা বিরাট অভিযানে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় থাকিতে পারে। এ জন্য প্রতাপ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য লইয়া উড়িষ্যার যুদ্ধে যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইলেন। বসন্ত রায়ও এ অভিযানে তাঁহাকে বাধা দেন নাই; কারণ মোগলের আনুগত্য, হাম্বীরের সাহায্য এবং জগন্নাথ উদ্ধার, ইহার কোনটিই তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না। ঈশা খাঁর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল বটে, কিন্তু ঈশা এবার এই সন্ধি ভঙ্গ করা ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন; তিনি তখন জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু জরাজীর্ণ অবস্থায় হিজলীতে বাস করিতেছিলেন।[২] বিদায়কালে যখন প্রতাপ খুল্লতাতের পদধুলি লইতে গেলেন, তখন বসন্ত রায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং উড়িষ্যা হইতে তাঁহার জন্য একটি শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

মানসিংহ নিজে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্যদল লইয়া গঙ্গাপথে অগ্রসর হইলেন; এবং বিহারের সৈন্য সমূহকে ইউসফ্ খাঁর অধীন হইয়া ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া মেদিনীপুর যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এ দিকে সৈয়দ খাঁ কোন প্রকারে রোগশয্যা হইতে উঠিয়া মখ্‌সুম্ খাঁ, পাহাড় খাঁ, তাহির খাঁ ও বাবুই মান্‌ক্লী প্রভৃতি সেনানীবর্গ লইয়া মেদিনীপুর আসিয়া মিশিলেন। প্রতাপাদিত্যও তথায় আসিয়া বঙ্গীয় সেনার দলপুষ্টি করিলেন। তথা হইতে সমগ্র বাদশাহী সৈন্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া জলেশ্বরের দিকে চলিল। অপর পক্ষে পাঠান সৈন্যও জলেশ্বর ডান দিকে রাখিয়া তথা হইতে সুবর্ণরেখা নদীর কূলে কূলে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইল; এবং বনপুর[৩] নামক স্থানে উভয় সৈন্য পরস্পর

১ বর্ত্তমান খণ্ড, ৬৩ পৃ।

২ বর্ত্তমান খণ্ড, ৩৬ পৃ পাদটীকা।

৩ The India office Mss seem to have Binapur; Elliot, VI, p 89 has Midnapur; Beames in J. A. S. B. (1883), p. 236 says the battle was fought

সম্মুখীন হইয়া সুবর্ণরেখার দুই পারে দাঁড়াইল। কয়েকদিন পরে মানসিংহ তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলে, একদিন পাঠান সৈন্য সুবর্ণরেখা পার হইয়া মোগলদিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিল।

সম্মুখে ৭৫টি হস্তী ও ৮৪০০ অশ্বারোহী লইয়া কতলু খাঁর দুই পুত্র নসিব ও জমাল খাঁ এবং পশ্চাতে ৮০টি হস্তী ও ১২০০ অশ্বারোহী সহ ঈশা খাঁর পুত্রদ্বয় সুলেমান ও ওসমান যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান। অপর পক্ষে মানসিংহ স্বয়ং মধ্যস্থলে এবং বিহারী সৈন্য লইয়া দক্ষিণ ভাগে রায় ভোজ, রাজা সংগ্রাম ও বাকির খাঁ এবং বামভাগে তোলক খাঁ, ফরাক খাঁ প্রভৃতি সেনানীবর্গ ভীষণ যুদ্ধ করিলেন। মোগলের কামান সমূহ সর্ব্বাগ্রে থাকায় গোলাঘাতে হস্তী সমূহ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাবুই মানক্লী ও পাহাড় খাঁ প্রভৃতি বঙ্গীয় সেনানীগণ হঠাৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাঠান দলের দক্ষিণাংশের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১] প্রতাপাদিত্য এই বাবুই মানক্লীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ পাহাড় খাঁ প্রভৃতি তাঁহার সে বীর্য্যপ্রভা দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। অবশেষে আফগানেরা পরাজিত হইলেন এবং তিন শত সৈন্যকে শবরূপে রণক্ষেত্রে রাখিয়া পলায়ন করিলেন।

পরদিন মোগলেরা আরও অগ্রসর হইয়া জলেশ্বর দখল করিয়া লইলেন। সৈয়দ খাঁ রুগ্নদেহ লইয়া আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত না হইয়া এই স্থান হইতে বঙ্গের দিকে ফিরিলেন। কিন্তু মানসিংহ এবার শত্রুদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। পাহাড় খাঁ ও বাবুই মানক্লী রাজারই অনুবর্ত্তন করিলেন। প্রতাপাদিত্য সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি এবার উড়িষ্যায় তীর্থ দর্শন করিবেন এবং খুল্লতাতের জন্য শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিবেন।

on the N. Bank, Subarnarekha. *See*, *Akbarnama* (Beveridge), III, p. 932 *note*. 'Great battle at Banapur'—Hunter, *Orissa*, vol. II, Appendix p. 195. [Sarkar, J. N,—'Benapur, 10 or 12 miles from Jaleshwar.'—*Hist. of Bengal* (Dacca), II, p. 209 *note*.—শি. মি.]

১ *Akbarnama*, III, pp. 935-6. জলেশ্বরের সন্নিকটে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা এদেশে প্রচলিত প্রবাদে এবং রামগোপাল রায় কৃত 'সারতত্ত্ব তরঙ্গিনী'তে আছে—'জলেশ্বর পাটনায় হইল সংগ্রাম', এখানে 'পাটনা' বলিতে পত্তন বুঝাইতেছে।—নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ২৮২ পৃ।

মানসিংহ ভদ্রকে আসিয়া শুনিলেন, পাঠান সেনানীবর্গ কটকের নিকটবর্ত্তী সরণগড় দুর্গে এবং কতক সমুদ্র সান্নিধ্যে আলদুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। দুর্জ্জন সিংহ প্রভৃতি আলদুর্গ দখল করিতে প্রেরিত হইলেন। মানসিংহ স্বয়ং কটকে পৌছিয়া সরণগড় অবরোধ করিলেন। তিনি এইবার ইউসফ খাঁর উপর ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং পুরীতে গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। প্রতাপাদিত্যও তাঁহার সহযাত্রী হইয়া তীর্থ দর্শন করিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র খুরদা ও পুরীর অধীশ্বর; সরণগড় তাঁহারই অধিকারভুক্ত। মানসিংহ ভাবিলেন, রামচন্দ্র নিশ্চিতই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু তাহা করিলেন না; তিনিও পাঠানদিগের সহিত সহযোগী হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু টোডরমল্লের সময় হইতে তিনিই মোগলের সামন্তরাজ ছিলেন। মানসিংহ তাঁহার বিরুদ্ধ স্বভাব দেখিয়া পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইলেন এবং জগৎ সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গকে রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র তখন দুর্ভেদ্য খুরদা দুর্গে আশ্রয় লইলেন, মোগল সৈন্যেরা মহোল্লাসে তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র লুটপাঠ করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতাপাদিত্য পুরী বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে ৺গোবিন্দদেবের অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ ও সুন্দর একটি শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করিলেন।

বাদশাহ আকবর কিন্তু মানসিংহের এই নূতন নীতির অনুমোদন করিলেন না। পুরাতন ভূম্যধিকারী হিন্দু-রাজন্যের সহিত বিবাদ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। হিন্দুর সহিত মিত্রতা করিয়া পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত করাই তখনকার সমীচীন উদ্দেশ্য। মানসিংহ বাদশাহের পত্র পাইয়া মত পরিবর্ত্তন করিলেন। বিপন্ন রামচন্দ্রও সময় বুঝিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে তাঁহার সহিত সন্ধি হইল। পাঠানের পক্ষ ত্যাগ করিবার সর্ত্তে সমস্ত উড়িষ্যা-রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পিত হইল। সুবর্ণরেখা নদী তাঁহার রাজ্যের সীমা হইল। অবশেষে পাঠানগণও সরণগড় এবং আলদুর্গে আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন, তাঁহারা সুবর্ণরেখা পার হইয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না, ইহাই স্থির হইল। এই সময় হিজলী তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্র হইল। পাঠানদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত মানসিংহ তাঁহাদের প্রধান প্রধান দলপতিকে বঙ্গের নানা স্থানে জায়গীর দিয়াছিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ খাজা সুলেমান, ওসমান, শের খাঁ ও হৈবৎ খাঁকে খলিফতাবাদে জায়গীর

দেন এবং তাহির খাঁ ও বাকির খাঁ তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।[১] এই খালিফাতাবাদ যে বর্ত্তমান খুল্‌নার অন্তর্গত বাগেরহাট প্রভৃতি স্থান, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। মোগল আমলে খালিফাতাবাদ একটি সরকার ছিল এবং উহা এখনকার যশোহর ও খুল্‌না জেলার অন্তর্গত। এই সরকারেব মধ্যে বাগমারা, যশোর, চিরুলিয়া, দাঁতিয়া, সলিমাবাদ, সাহস, মুড়াগাছা এবং হাবেলী খালিফাতাবাদ, এই ৮টি পরগণায় আফগানদিগের বসতি হইয়াছিল।[২] এখনও এ সব স্থানে তাঁহাদের বংশ আছে এবং বর্ত্তমান সময়ে সেই সকল বংশীয়েরা এতদঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চপদস্থ বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বাকির খাঁ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী বাগমারা বা হাবেলীতে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নাম হইতে বাগেরহাটের নাম হওয়া বিচিত্র নহে। আবুলফজল লিখিয়াছেন, দুষ্ট লোকের পরামর্শে মানসিংহ পরে সুলেমান, ওসমান প্রভৃতির জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন এবং তখন হইতে তাঁহারা ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। সে বিদ্রোহ দমন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যাহারা পবে বিদ্রোহী হয়, তাহাদিগেরই জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। আকবর-নামাতেই দেখিতে পাই, আকবরের রাজত্বের ৩৮শ বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, উড়িষ্যা বিজয়ের পর মানসিংহ প্রথম আসিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সম্মানিত হন। এই সময়ে তাঁহার সহিত কতলু খাঁর তিন পুত্র, নসিব খাঁ, লোদি খাঁ এবং জমাল খাঁ মানসিংহ কর্ত্তৃক বাদশাহের নিকট পরিচিত হন।[৩] সুতরাং এ তিন জন যে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন,

১ 'When rebels of Orissa submitted, the Rajah wisely gave Khwaja Sulaiman, Khwaja Usman, Sher Kh. and Haibat Kh. fiefs in Khalifahabad and selected Tahir K., Khwaja Baqir Ansari to accompany them'.—*Akbarnama* (Beveridge), III, p. 968.

২ Khalifatabad was a Sarker or Division of Mughal Empire which corresponds, with our modern Jessor, and the descendants of the Afghans still survive there. The principal Parganas or Fiscal Divisions in which they settled were the eight following: (1) Bagmari; (2) Jessor; (3) Chirolih; (4) Datiah; (5) Salimabad; (6) Shabosh; (7) Mungatch; (8) Haveli Khalifatabad.'—Blochmann, *Mss*; Hunter, *Orissa*, Vol. II, p. 19.

৩ *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 997.

তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে তাহাদিগকে আর বিদ্রোহিরূপে দেখিতে পাই না এবং 'বহারিস্তান' হইতে জানিতে পারিয়াছি, কতলুর তৃতীয় পুত্র জমাল খাঁ প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। উড়িষ্যা যুদ্ধকালেই জমাল খাঁর সহিত প্রতাপাদিত্যের পরিচয় হইয়াছিল। এবং মোগলের সহিত সন্ধি হওয়ার পর হয়ত মোগলপক্ষের জ্ঞাতসারেই জমাল খাঁ যশোহর সরকারে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও প্রতাপের সহিত মোগলের প্রকাশ্য বিবাদ হয় নাই।

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে প্রতাপাদিত্য বিগ্রহদ্বয় লইয়া বন্ধুবর্গ সহ যশোহরে পৌছিলেন। অর্থ দিয়া সেবাইতদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া অথবা বল প্রয়োগ করিয়া, কি ভাবে তিনি বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এমন সুন্দর গোবিন্দদেব বিগ্রহ যে কেহ অর্থের লোভে সহজে হস্তচ্যুত করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তবে বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি বল্লভাচার্য্য নামক একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়ত বিগ্রহটি কোন প্রসিদ্ধ রাজা বা জমিদারের ছিল, প্রতাপাদিত্য বলপ্রয়োগে উহা হস্তগত করিয়া, পরে অর্থ দিয়া উঁহারই সেবাইতকে প্রলুব্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বসন্ত রায় গোবিন্দদেব বিগ্রহ দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই এমন শ্রীবিগ্রহ অতীব দুর্ল্লভ পদার্থ। বিগ্রহ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সৌষ্ঠব, এমন দিব্যোজ্জ্বল নয়নভঙ্গি আর দেখি নাই। অনতিবিলম্বে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। অচিরে উড়িষ্যার যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা এই দেব-বিগ্রহের খ্যাতি দেশময় মণ্ডিত হইয়া পড়িল। 'সারতত্ত্ব তরঙ্গিণীতে' আছে :

'নীলাচল হইতে গোবিন্দকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশঃ ঘোষয়ে ধরণী ॥'

আমরা এ স্থলে অগ্রে ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, মন্দির ও তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া পরে শিবলিঙ্গের কথা বলিব। এক স্থানে ধারাবাহিক বিবরণী থাকিলে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

ধূমঘাট দুর্গ হইতে তিন মাইল উত্তরে দক্ষিণ-বাহিনী যমুনার পশ্চিম কূলে গোপালপুর নামক স্থানে গোবিন্দদেব বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দির একটি নহে, চত্বরের চারিধারে চারিটি উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ; উহার

মধ্যে কেবল মাত্র পূর্ব্ব পোতার মন্দিরটি ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, অপর তিন পোতার মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া প্রাঙ্গণ জুড়িয়া স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সে তিনটি মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ ছিল কি না, বা তাহা কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ উত্তর ও দক্ষিণ পোতার মন্দিরে অন্য বিগ্রহ থাকিতেন এবং পশ্চিম দিকে সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম গৃহ ছিল। যে মন্দিরটি দণ্ডায়মান আছে, তাহার চূড়া নাই; উহার গুম্বজ বা চূড়া ছিল কি না, তাহাও বলা যায় না। তবে মন্দিরটি দোতালা; নিম্ন তালায় পূজাগৃহ ও তাহার পার্শ্ব দিয়া সিঁড়ি আছে; উপর তালায় ঠাকুরের শয়নগৃহ ছিল। এখনও মন্দিরের যতটুকু খাড়া আছে, তাহার উচ্চতা ৩০´ ফুট হইবে। মন্দিরের ভিতরের মাপ ১৬´–৬´´×১৬´–৬´´ ইঞ্চি; ভিত্তি ৮´–৯´´; দরজার খিলান ৬´–৭´´×৫´ ফুট। পশ্চিম দিকে সদর দুয়ার; দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকেও দরজা আছে কিন্তু উত্তর দিকে কোন দ্বার নাই। মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি ও কারুকার্য্যের পরিচয় এখনও আছে। কোন শিলা বা ইষ্টক-লিপি নাই, হয়ত যাহা ছিল, তাহা নষ্ট বা অপহৃত হইয়াছে।

মন্দিরগুলির পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড দোল-মঞ্চের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।[১] এবং মন্দিরের ৮।১০ রশি উত্তরে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। যশোহরপুরীকে কাশীর সহিত তুলনা করিতে গিয়া পণ্ডিতপ্রবর যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই দীর্ঘিকাই মণিকর্ণিকার মত তীর্থ সরোবরের সহিত তুলিত হইয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটি সুবিস্তীর্ণ জলাশয়, উহার জলাশয়েরই পরিমাণ ৯৯/বিঘা; তাহা ব্যতীত পাহাড় লইয়া দীর্ঘিকার বিস্তৃতি আরও অধিক।[২] এই সুন্দর জলাশয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জলদান পুণ্যের পরিচয় দিতেছে। যশোহর-খুলনায় ইহার সহিত মাত্র খাঁ জাহানালির ঘোড়াদীঘি ও সীতারামের রামসাগর দীঘির তুলনা হইতে পারে।

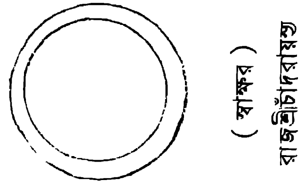
১ গোপালপুরের মন্দিরের পশ্চিম ধারে নকিপুর নিবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ বাগানবাটীতে ১৩২১ সালে একটি পুষ্করিণী খনন কালে মৃত্তিকার নিম্নে কয়েক স্থানে ইষ্টক-গ্রথিত সিঁড়ি, ভগ্ন কৃষ্ণমূর্ত্তি, কতকগুলি মাটীর আতরদান এবং একটি প্রকাণ্ড কাঁসার বাটি পাইয়াছেন।

২ 'It was a magnificent reservoir at one time but at present it is overgrown with weeds and thorns'—*Ancient Monuments*, p. 148. এই দীর্ঘিকাটি এক্ষণে কলিকাতা নিবাসী ৺শ্রীনাথ দাস উকীল মহাশয়ের সম্পত্তিভুক্ত।

গোপালপুরের নূতন মন্দিরে গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার সময় এক বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশ দেশান্তরের পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসীর সমাগমে এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের সমারোহে বিস্তীর্ণ যশোহরপুরী বহুদিন ধরিয়া আনন্দ কোলাহলে প্রমত্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, এতদুপলক্ষে লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদত্ত হয় এবং তাঁহাদের পদধূলি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন চাঁচড়ার পূর্ব্বপুরুষ যজ্ঞেশ্বর রায় ব্রাহ্মণভোজন কালে হঠাৎ ঝড় উঠিলে, বীরবিক্রমে যজ্ঞরক্ষা করিয়া প্রতাপের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বল্লভাচার্য্য উড়িষ্যা হইতে বিগ্রহের সঙ্গে আসেন এবং সেবায়েৎ নিযুক্ত হইয়া অধিকারী উপাধিতে পরিচিত হন। অধিকারী মহাশয়কে পুরুষানুক্রমে এ দেশে বাস করিতে হইলে, সমাজিক বিপত্তি উপস্থিত হইবে বলিয়া, প্রতাপাদিত্য এদেশীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন এবং তাহার ফলে অধিকারিগণ ক্রমে এদেশীয় সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। প্রতাপের জীবদ্দশায় বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃসিংহদেব চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের পতনের পর যখন বসন্ত রায়ের পুত্র চাঁদ রায় পৈতৃক রাজ্য লাভ করেন, তখন তিনি বল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্র অধিকারীকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা এখনও অধিকারী মহাশয়দিগের গৃহে আছে। উহার অবিকল প্রতিলিপি এই :

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
শরণং
৺ গোবিন্দ দেব



রাজশ্রীচাঁদ রায়স্য

স্বস্তি পূজ্যতম শ্রীযুক্ত
রাঘবেন্দ্র অধিকারী ও
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র অধিকারী
চরণেষু

প্রণামা বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ আমার অধিকার চাকলা ধুলিয়াপুরের গ্রামহায়ে শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরের সেবার্থে অজবঞ্জর খারিজ জমা ২৮৬/০

দুইসত ছেয়াসি বিঘা ভূমি মাফিক তপশিল দেবত্তর দিলাম। অতএব তোমরা ঐ ভূমি উত্থিত করিয়া উহার উপস্বত্ত লইয়া শ্রীশ্রী৺ সেবা করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম স্থখে ভোগ করিবে। ইতি সন ১০১৬ দশ শত সোলো সাল তারিখ……২১ চৈত্র…

তপশীল ভূমি…২৮৬৴

জায়

গোপালপুর	…	১০১৴	হাসনকাটি	…	৪৴	কাছিমপুর		১৩৴
দুর্গাপুর	…	২৴	ভুরলিয়া	…	৭৴	হাসনকাটির পূর্ব্ব মদমনার মধ্যে চর		১১১৴
শ্রীরামপুর	…	৪৴	বিষ্ণুপুরা	…	৪৴	ধলবাড়িয়া	…	১৴
অনন্তপুর	…	২৯৴	সোণামারী	…	৭৴	খানপুর	…	৩৴

গোপালপুরে যেখানে এক্ষণে গদাধর ঘোষের বাড়ী রহিয়াছে, ঐ স্থানে অধিকারী মহাশয়দিগের বসতি বাড়ী ছিল। প্রতাপের পতনের পর যশোহর রাজধানী শ্রীভ্রষ্ট হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই স্থন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ক্রমে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। ক্রমে গোপালপুরেরও সেই দশা হয়। তখন অধিকারীরা ঠাকুর লইয়া পরমানন্দকাটিতে আসিয়া বাস করেন। চাঁদরায়ের পৌত্র রাজা শ্যামস্থন্দরের সাহায্যে সেখানেও ৺গোবিন্দদেবের জন্য মন্দির ও দোলমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। ৺গোবিন্দদেব শতাধিক বর্ষ কাল পরমানন্দকাটিতে ছিলেন। পরে যখন বাজিতপুর পরগণা কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী লাড্ডিমোহন ও গোপীমোহন ঠাকুর খরিদ করেন, তখন পরমানন্দকাটি উক্ত পরগণার অন্তর্গত বলিয়া তাঁহারা ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহের মালিক হইতে ইচ্ছা করেন। সেই উদ্দেশ্যে ৺গোবিন্দদেবের পূজার সংকল্প তাঁহাদের নামে করাইবার জন্য অধিকারীদিগকে আদেশ দেন। কিন্তু উঁহারা কিছুতেই পীরালি সংস্রব-দুষ্ট ঠাকুর বাবুদের নামে পূজার সংকল্প করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার ফলে অধিকারীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। তখন ১২০৩ সালে (১৭৯৭ খৃঃ) অধিকারীরা ঠাকুর লইয়া পুনরায় গোপালপুরে আসিয়া বাস করেন ; চাঁদ রায়ের বংশীয় রাজাগণ ঐ সময়ে স্থরনগরের অন্তর্গত রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। ঠাকুরবাবুরা গোপালপুর

হইতে জোর করিয়া ৺ঠাকুর দখল করিবার চেষ্টা করিলে, অধিকারীরা গোবিন্দদেবকে রামজীবনপুরে রাজবাড়ীতে গুপ্তভাবে রক্ষা করেন। তখন ঠাকুর বাবুদের পক্ষ হইতে রামদুলাল ও রামচাঁদ অধিকারীর নামে ৺ঠাকুর চুরির মোকদ্দমা হয়।[১] ১২০৪ সালের ৩০শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৮) তারিখে যশোহর ফৌজদারী আদালতে এই মোকদ্দমার যে বিচার হয়, তাহার রায় হইতে জানিতে পারি যে, ৺ঠাকুরের উপর অধিকারীদের স্বামিত্বই স্থিরীকৃত হয় এবং ঠাকুর বাবুরা হারিয়া গিয়া মোকদ্দমার খরচার দায়িক হন। অবশেষে ১২৩৫ সালে রামদুলাল অধিকারীর পুত্র ও জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রগণ রায়পুর গ্রাম পত্তনী লইয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। ৺গোবিন্দদেব তখন রামজীবনপুরে ছিলেন; অধিকারীরা ঠাকুরকে রায়পুরে আনিবার প্রস্তাব করিলে রাজারা ঠাকুর আনিতে দিতে চাহেন না। তখন অধিকারীদের সহিত রাজাদের

---

১ অধিকারী মহাশয়দিগের বংশাবলী এইরূপ :

- বল্লভাচার্য্য
  - নৃসিংহদেব চক্রবর্ত্তী
    - রাঘবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
      - রামরুদ্র
        - রাধাকৃষ্ণ
          - লক্ষ্মীকান্ত
            - রামচাঁদ
              - কালীবর
                - পূর্ণচন্দ্র (দত্তক)
            - শ্রীমোহন
              - নবকুমার
  - রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
    - রঘুনন্দন
      - রামকানাই
        - কৃষ্ণপ্রসাদ
          - রামদুলাল
            - রাজচন্দ্র
              - চন্দ্রনারায়ণ
                - শিবনারায়ণ
                  - যাদবচন্দ্র
                - কমলনারায়ণ
                  - সুরেন্দ্র
                  - উপেন্দ্র
                  - যতীন্দ্র
                  - নগেন্দ্র
            - ঈশ্বরচন্দ্র
              - কৈলাসচন্দ্র
                - জ্ঞানেন্দ্র (জীবিত)

ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বারাসাতের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখে বিচার হইয়া স্থির হয় যে, ঠাকুর অতি পূর্ব্বকাল হইতে অধিকারীদের দখলে আছেন, তাহাই থাকিবে, রাজারা ইচ্ছা করিলে স্বত্বের মোকদ্দমা করিতে পারেন।[১] প্রকৃতপক্ষে আর মোকদ্দমা হয় না। আপোষ মীমাংসায় স্থির হয়, মূলে রাজারা ঠাকুরের মালিক হইলেও অধিকারীরা বংশানুক্রমে সেবায়ৎ এবং দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী। তদবধি প্রতি বৎসর ৺গোবিন্দদেবকে নুরনগর রাজবাটীতে আনিয়া মহাসমারোহে দোলের উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। নুরনগরের দোল একটি বিখ্যাত উৎসব এবং তদুপলক্ষে সেখানে প্রতিবৎসর বহুসহস্র লোকের সমাগম হইত। এইভাবে ঠাকুরের সহিত দৈন্যগ্রস্ত রাজবংশীয়দিগের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল; দোলের সময়ে ঠাকুরকে পাইয়া তাঁহারা গৌরবে দৃপ্ত এবং আনন্দে অধীর হইতেন। রায়পুরে অধিকারীদিগের বাড়ীতে গোবিন্দদেবের সুন্দর মন্দির আছে।

কয়েক বৎসর হইল, টাকীর সুবিখ্যাত মুন্সীবংশীয় জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় ধুমঘাট-বংশীপুরের স্বত্বাধিকারী হন। গত ১৩১০ সালে তিনি অধিকারীদিগের নিকট হইতে ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহ চাহিয়া লইয়া টাকীর নিজ বাটীতে রাসোৎসব সম্পন্ন করেন। নুরনগর ও কাটুনিয়ার রাজবংশীয়েরা পূর্ব্বক্ষণে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অধিকারীদিগকে নিষেধ করেন; কিন্তু তাঁহারা নিষেধ না মানিয়া, নিজের ঠাকুর তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন, একভাবে ইহাই প্রমাণিত করিবার ছলে এবং রায় যতীন্দ্রনাথের সাহায্য ও উৎসাহের বলে ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহকে টাকীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। টাকীর মুন্সীবাবুরা রাজবংশীয়দিগের জ্ঞাতি ও আত্মীয় ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বৈষয়িক অবস্থা যতই উন্নত হউক না কেন, রাজবংশীয়েরা বংশগৌরবে কোন দিনই তাঁহাদের নিকট মাথা হেঁট করিতে রাজী নহেন। অধিকারীরা

১ Extracts from the judgment of J. H. Barlow, Joint Magistrate, Baraset, dated 29. 10. 1830: 'It is clearly established that the said accused have been in possession from past times......it is ordered that the accused be acquitted from this charge without any slur on them and that the said Thakurs do remain in their possession......The said Rajahs, if they entertain any claim to the said Thakurs, are at liberty to sue in a civil court.'

রাজবংশের পূর্ব্বগৌরবের একমাত্র জীবন্ত নিদর্শন শ্রীবিগ্রহকে পরাশ্রয়ে প্রেরণ করিলে চিরদিনের মত প্রতাপাদিত্যের বংশধরগণের মাথা নীচ হইয়া যাইবে, এ জন্য এই ব্যাপারে তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। কমল নারায়ণ অধিকারী মহাশয় প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব না বুঝিতে পারিয়া, অকৃতজ্ঞের মত রাজবংশীয়দের মুখে যে কালিমা লেপন করিয়া দিলেন, তাহার ফলে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিবাদ বিদ্বেষের প্রবল বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

এই সময়ে নুরনগরে ও পার্শ্ববর্ত্তী কাটুনিয়ায় রাজবংশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বাস করিতেন, তন্মধ্যে কাটুনিয়ার রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ না হইলেও বিদ্যাবুদ্ধি ও বংশোচিত তেজস্বিতায় সকলের অগ্রগণ্য। তিনি রাজা অন্নদাতনয়ের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'বড় রাজা' বলিয়া ডাকে; কিন্তু শুধু নামে নহে, কার্য্যেও তিনি বড় রাজা। তাঁহার ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা ও কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে রাজোচিত উদারতা ও বীরোচিত কঠোরতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে তাঁহাকে রাজার মত ভক্তি করে, বীরের মত ভয় করে, আর আশ্রিতের প্রতি তাঁহার দয়া দেখিয়া নিঃস্ব প্রজা তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করে। যিনি তাঁহাকে ভাল করিয়া জানেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, কোন স্বাধীন দেশে তাঁহার জন্ম হইলে, তাঁহার যোদ্ধ-জীবন সেনাপতির উচ্চাসন অলঙ্কৃত করিত। তিনি শুধু কৃতবিদ্য নহেন, তিনি চিন্তাশীল, সুলেখক ও সুবক্তা; তিনি শুধু উদার নহেন, তিনি সরল, অমায়িক, ও অতিথিবৎসল। বহুজনে তাঁহাকে আপন জনের মত জানে; নিজের বংশগৌরব রক্ষার জন্য তিনি সতত চেষ্টিত এবং একমাত্র তাঁহারই নিকট হইতে রাজবংশের বহু পুরাতন কাহিনী জানিতে পারা যায়। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের সময়ে যখন খুল্‌নায় তাঁহার দরবার বসিয়াছিল, তখন রাজা যতীন্দ্রমোহনকেই এই জেলার প্রথম আসন প্রদত্ত হয়।[১]

৺গোবিন্দদেব বিগ্রহ সম্পর্কে যাঁহারা অধিকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে

১ রাজা বসন্ত রায়ের অধস্তন দশমপুরুষে রাজা যতীন্দ্রমোহন। সংক্ষেপতঃ তাঁহার বংশধারা এইরূপ: ১৪ বসন্তরায়—চাঁদরায়—রাজারাম—শ্যামসুন্দর—নন্দকিশোর—রাধানাথ—রামনারায়ণ—জয়নারায়ণ—অন্নদাতনয়—২৩ যতীন্দ্র, মতীন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। নন্দকিশোর রামজীবনপুরে বাস করেন এবং রামনারায়ণের পুত্রগণের সময়ে কাটুনিয়ায় রাজবাটী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সম্পূর্ণ বংশলতিকা পরে প্রদত্ত হইবে।

উদ্যোগী হন, তন্মধ্যে রাজা যতীন্দ্রমোহনই প্রধান। কিন্তু পরিণামে যখন অবস্থা বিপদ-সঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইল এবং মোকদ্দমাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় হইতে লাগিল, তখন একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই বংশগৌরব রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল ; বহু মামলা মোকদ্দমা হইল ; বহুবার জোর করিয়া রায়পুর হইতে বিগ্রহ লইয়া যাইবার চেষ্টা চলিল ; কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না। অবশেষে অধিকারীদিগের বাড়ীতে গোবিন্দ-দেবকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পুলিশ পাহারা বসিল। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শুনিয়াছি, সেই পাহারা থাকিতে থাকিতে গোবিন্দদেব ও শ্রীরাধিকা দুইটি বিগ্রহই অপহৃত হইলেন। কে কোথায় লইয়া গেল জানা যায় নাই ; কিছুদিনের মধ্যে পুলিশের চেষ্টায়ও তাহার সন্ধান হইল না। অবশেষে শুনা গেল, সেই বিগ্রহই রাজা যতীন্দ্রমোহনের হস্তগত হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে গোবিন্দদেব বলিয়া প্রচার না করিলেও লোকে সে অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি চিনিত ; যে ভাবেই হউক, প্রকৃত গোবিন্দদেবই যে রাজা-মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছেন, লোকের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। শ্রীপুর-নিবাসী বঙ্গজকুল-প্রদীপ সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহনের নিজ বাটীতেই অচিরে সুদৃঢ় প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং তথায় মহাড়ম্বরে গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা হইল। রাজার ধন রাজার হাতে ফিরিয়া আসিলে, সে বৎসরের দোলের সময়ে বহুদূর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রার সৃষ্টি করিয়াছিল।[১] তদবধি প্রতি বৎসর

১ এই সময়ে অধিকারিগণ তাঁহাদের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া খুল্‌নার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করায়, রাজা যতীন্দ্রমোহনকে দশ হাজার টাকার মুচ্‌লকা দিতে হইয়াছিল এবং সেই দোলের সময়ে তাঁহার বাটীতে কয়েক শত সশস্ত্র মিলিটারী পুলিশ বসিয়াছিল। উহাদের ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাড্‌লি-বার্ট সাহেবের সহিত কালীগঞ্জে দেখা করিয়া রাজা যতীন্দ্রমোহন অবিচলিতভাবে নিজের বংশগৌরব ও বর্ত্তমান হাঙ্গামার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিলেন, তখন ইতিহাস-রসিক সহৃদয় সাহেব সকল কথা বুঝিলেন এবং স্বয়ং কাটুনিয়া রাজবাটীতে গিয়া সমস্ত অবস্থা তদন্ত করিয়া মিলিটারী পুলিশ স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন। সশস্ত্র পুলিশ দল রাজোচিত আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়া গোবিন্দ-দোলের শোভাযাত্রার আরও শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

দোলের সময় কাটুনিয়ায় প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়, রাজবাটীর সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া প্রকাণ্ড মেলা বসে। বর্ত্তমান সময়ে কাটুনিয়ার দোলোৎসবের মত বিরাট উৎসব বোধ হয় খুল্‌না জেলার আর কোথাও হয় না। প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দদেব দেখিতে হইলে কাটুনিয়ার রাজবাটীতেই দেখিতে হইবে।[১] অধিকারী মহাশয়েরা উক্ত ঘটনার পর, ১৩১৬ সালে পণ্ডিতবর্গের পরামর্শ লইয়া নূতন গোবিন্দদেব ও রাধিকা মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া পূর্ব্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা প্রকৃত গোবিন্দদেবের কতকগুলি বৃত্তিমহলের উপস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অথচ কে সে উপস্বত্ব পাইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এ সম্বন্ধে অনেক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে প্রজারাই নিষ্কর ভোগ করিতেছেন।

প্রতাপাদিত্য যখন উৎকল দেশ হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনয়ন করেন, তখন তৎসঙ্গে রাধিকা মূর্ত্তি ছিল না। কথিত আছে ঐ মূর্ত্তি নাকি সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যে পতিত হয় এবং বহু চেষ্টায়ও তাহার উদ্ধার সাধন হয় না। বসন্ত রায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে নিজের পছন্দ মত পিত্তল নির্ম্মিত রাধিকা মূর্ত্তি গঠন করিয়া লন। প্রথম গঠিত দুই একটি মূর্ত্তি তাঁহার মনোনীত না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়; প্রবাদ এই যে, বসন্ত রায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জানিতে পারেন, উক্ত মূর্ত্তি গোবিন্দদেবের মনঃপূত হয় নাই তখন ঐ সকল পরিত্যক্ত মূর্ত্তির জন্য নূতন কৃষ্ণমূর্ত্তি গঠন করাইয়া, প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্যমধ্যে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'বেহালা প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ স্থাপিত প্রতিমূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের নিকটও ঐ মূর্ত্তি ছিল, এক্ষণে উহা বারাসাতে আছে। ইহার শ্রীকৃষ্ণ লাবণ্যবতীতে নিমগ্ন হন; এক্ষণে উক্ত রাধিকা বিধবা ব্রাহ্মণী নামে অভিহিত হন।'[২]

গোবিন্দদেব বিগ্রহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য যে একটি শিবলিঙ্গ আনিয়াছিলেন, উৎকল দেশ হইতে আনীত বলিয়া উহার নাম উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ বসন্ত রায় বেদকাশী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ স্থানে যে দুর্গের

১ [এই বিগ্রহ বর্ত্তমানে রাজা ৺যতীন্দ্রমোহনের পুত্রগণ কর্ত্তৃক বসিরহাটে আনীত হইয়াছে। —শি মি]

২ 'প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত', ৬৪ পৃ।

কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার বাহিরে উত্তর দিকে কাশীর খালের পার্শ্বে একস্থানে উৎকলেশ্বর শিবমন্দিরের প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ রহিয়াছে। ঐ স্থানে একখানি গোলাকার প্রস্তর-ফলকে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় ; উহা এই :

'নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনি-প্রতিষ্ঠিতং
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্।
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ॥'

এই শিলালিপিখানি কাটুনিয়ার রাজবংশীয় রাজা রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট ছিল।[১] প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের নাম সংযুক্ত শিলালিপি আর পাওয়া যায় নাই ; উহাতে কোন তারিখাদি না থাকিলেও ঐতিহাসিকের নিকট ইহার মূল্য বেশী ; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাও অযত্নে অপহৃত হইয়াছে। লিপিতে আছে যে শিবলিঙ্গ বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত, সুতরাং উহা যে সুন্দর ও

১ রাজা রমেশচন্দ্র এখনও জীবিত। ইনি রাজা যতীন্দ্রমোহনের জ্ঞাতি খুল্লতাত। রাজা রমেশচন্দ্রের নিকট এই শিলালিপি ছিল, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সত্যচরণ শাস্ত্রী মহোদয় প্রতাপাদিত্যের বিবরণী সংগ্রহ জন্য কাটুনিয়ায় আসেন, তখন তিনি স্বচক্ষে শিলালিপিখানির পাঠোদ্ধার করিয়া স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করেন (১ম সংস্করণ, ৬৪ পৃ)। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই লিপিটি নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের গ্রন্থে ও অন্যান্য স্থলে প্রকাশিত হয়। টাকী নিবাসী ফণিভূষণ বসু মহাশয় এক সময়ে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের স্কুল সমূহের অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্রের ভগিনীপতি এবং শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ও অন্যান্য পণ্ডিত-সমাজে দেখাইবার জন্য শিলালিপিখানি কলিকাতায় লইয়া যান, সকলকে দেখাইবার পর উহা ফণিভূষণ বসু মহাশয়ের কলিকাতার বাসাবাটীতে রাখিয়া আসেন। কিছুদিন পরে ফণিভূষণ বসু মহাশয়ের বাটী পরিবর্ত্তন করিবার কালে (সম্ভবতঃ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) উহা অযত্নের ফলে বিলুপ্ত হয়। আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উহার উদ্ধারের জন্য আমি রাজা রমেশচন্দ্রের পত্র লইয়া ফণিভূষণ বসু মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কি ভাবে লিপিখানি পাইয়াছিলেন, উহাতে কি লিখিত ছিল এবং পরে উহা তাঁহার নিকট হইতে কি ভাবে বিনষ্ট হয়, তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। যে দেশে ফণিভূষণ বসুর মত উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অনবধান বশতঃ এমন একখানি মূল্যবান শিলালিপির বিলয় ঘটে, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা যে কত সুদূরপরাহত, তাহা সহজে অনুমেয়।

বিরাট তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদকাশীর কাছারী বাটীতে যে দুইখানি ভগ্ন প্রস্তর আছে, তাহা উক্ত শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠের অংশ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ একমাত্র শিবমন্দির নহে, উহার পার্শ্বে একই প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি মন্দির থাকিতে পারে। হয়ত উহার একটিতে যে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি ছিল, তাহার নিম্নাংশ ভগ্নাবস্থায় কাছারী বাটীতে বৃক্ষতলে পতিত ছিল; আমি উহা আনিয়া দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। বেদকাশীতে শিবমন্দিরও যে খুব বড় এবং সুদৃঢ় ছিল, তাহার নিদর্শন আছে। ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সন্নিকটে কতকগুলি প্রস্তরস্তম্ভ এবং কয়েকখানি প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া আছে। মাটীর উপর যেগুলি আছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। আরও কত পাথর মাটীর নিম্নে বিলুপ্ত আছে বা অন্য লোক দ্বারা স্থানান্তরে নীত হইয়াছে, তাহা জানি না।[১] সম্ভবতঃ শিবমন্দিরটি ইষ্টক-গ্রথিতই ছিল এবং উহার স্থানে স্থানে ও বারান্দার থামে সুদৃঢ় কষ্টিপাথরের ব্যবহার হইয়াছিল। গোবিন্দদেবের মন্দিরের মত বেদকাশীর শিবমন্দিরটিও যে বসন্ত রায় নয়নাভিরাম করিয়া গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজধানী যশোহর যখন কাশীর সহিত তুলিত হয়, তখন তিনি বেদকাশী নাম দিয়া কপোতাক্ষীর অপর পারে এই নূতন সহর রচনা করেন, ও তাহার

১ উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এক্ষণে নিবারণচন্দ্র গাইন ও মহাদেব মণ্ডল মহাশয়ের জমির অন্তর্ভুক্ত। নিকটবর্ত্তী জ্ঞান মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বে একটি নিম্ন স্থানে ৭টি প্রস্তর স্তম্ভ ছিল। সেগুলি তিন হাত দীর্ঘ। একটি স্তম্ভ একটু কম দীর্ঘ অর্থাৎ ৪' ফুট ছিল। সেইটি আমি লইয়া আসিয়া নিজ বাটীতে রক্ষা করিয়াছি, সুযোগ মত উহা বিশিষ্টভাবে রক্ষা করিবার কল্পনা আছে [উহা এক্ষণে দৌলতপুরে ব্রজমোহন কলেজ গৃহে রক্ষিত আছে—শি মি]। বেদকাশী ও পার্শ্ববর্ত্তী গাবুরা আবাদ এক্ষণে কলিকাতা নিবাসী ৺শিবচন্দ্র মল্লিকের জমিদারীর অন্তর্গত। তথাকার ভূতপূর্ব্ব নায়েব বঙ্কবিহারী দত্ত মহাশয় বড় সদাশয় এবং বিদ্যোৎসাহী। তিনি আমাকে উক্ত স্তম্ভ ও বাসুদেব বিগ্রহের পাদাংশ আনিবার অনুমতি দেন এবং নিজে লোক দ্বারা উহা আমাদের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন। স্তম্ভের সন্নিকটে আমরা কর্দ্দমের মধ্য হইতে ৩'×২'-২" বিস্তৃত ও ৯" ইঞ্চি পুরু একখানি পাদপীঠও আবিষ্কার করিয়াছিলাম। ইহা ভিন্ন, জ্ঞান মণ্ডল তাঁহার বাড়ীতে গোলার পৈঠা করিবার জন্য কতকগুলি পাথর ব্যবহার করিতেছেন দেখিলাম। এমন পাথর কত জনে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহা কে জানে!

নামকরণ করেন।[১] গোপালপুরে যেমন বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা ছিল, এখানেও বসন্ত রায় একটি সুপেয় সলিলপূর্ণ এক সুন্দর দীর্ঘিকা খনন করেন। উহার জলাশয় ১১৫০´×৮০০´ ফুট। কিন্তু উহার মিষ্ট জল আর নাই, দীঘিতে লোণা ঢুকিয়া উহার জল লোণা করিয়া দিয়াছে, এই জন্যই বসন্ত রায়ের দীঘির বর্ত্তমান নাম 'লোণা দীঘি'। উহা খালাস-খাঁ দীঘি অপেক্ষা বড় ও স্বতন্ত্র। খালাস-খাঁ দীঘির কথা আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি।[২]

১ কেহ কেহ এই স্থানের নামকে বেতকাশী বলিয়া বানান করেন, তাহা ঠিক নহে। যেমন বারাণসীর অপর পারে বেদকাশী; তেমনি কাশী তুল্য যশোহরপুরীর পূর্ব্বধারে বেদকাশী। পদকর্ত্তা বসন্ত রায় যে সুকবি ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

২ ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৭৮, ৩২৬ পৃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায়ের হত্যা

প্রতাপের জন্মমাত্র জনৈক জ্যোতিষী দ্বারা তাঁহার কোষ্ঠী রচিত হয়; তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার জীবনে পিতৃদ্রোহিতা দোষ ছিল। এই কথা শুনিবামাত্র বিক্রমাদিত্য পুত্রের প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ হন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার সে বিরক্তি যায় নাই। প্রতাপের জন্মের কিছুদিন পরে তাঁহার জননীর মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্যের বিরক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়, এমন কি, পুত্রের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। অপর পক্ষে গুণগ্রাহী বসন্ত রায় রাজপুত্রের স্বকুমার তনু ও বীরোচিত মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর কোন সন্তানাদি হয় নাই;[১] প্রতাপ মাতৃহারা হইলে তিনিই শিশুর লালন পালনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রায়েরও পুত্রস্নেহ প্রতাপের উপর সমর্পিত হইল। ক্রমে বসন্ত রায় অন্যান্য পত্নীর গর্ভে বহুপুত্রের পিতা হইলেও, প্রতাপ যে তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন, সে কথা তিনি কখনও ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। বিক্রমাদিত্য আশঙ্কা করিতেন, প্রতাপের পিতৃহন্তা দোষের ফল তিনিই ভোগ করিবেন, স্বতরাং তিনি সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ থাকিতেন। বসন্ত রায় ও তাঁহার পত্নী প্রতাপের সকল দোষ ঢাকিয়া রাখিয়া তাঁহাকে পিতৃকোপ হইতে রক্ষা করিতেন এবং স্নেহাধিক্যবশতঃ প্রশ্রয় দিতেন। কার্য্যতঃ দাঁড়াইল এই, প্রতাপ প্রকৃত পিতৃস্নেহ খুল্লতাতের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সেই খুল্লতাতকেই হত্যা করিয়া তিনি ভাগ্যচক্রের ফল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

বসন্ত রায় চিরদিন অযাচিত স্নেহ-ধারায় প্রতাপকে প্লাবিত করিয়া রাখিলেও নিয়তির হাতে নিস্তার পান নাই। তিনি যতই স্নেহশীল হইয়া প্রতাপের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন, মস্তিষ্কের কেমন যেন এক বিকৃতিবশতঃ প্রতাপ ততই তাঁহার প্রতি মনে মনে সন্দেহযুক্ত হইতেন। জ্ঞাতি-বিরোধ ও সঙ্গিগণের কুপরামর্শ এই সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়া দিত। প্রতাপের প্রতি বসন্ত রায়ের পুত্রগণের অত্যন্ত জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ছিল; বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায় প্রতাপের প্রায় সমবয়স্ক

---

১ বর্ত্তমান খণ্ড, ১১৬-৭ পৃ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন এবং উঁহাদের উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা বিজাতীয় মনোমালিন্য এবং বিবাদ বিসম্বাদ চলিত।[১] প্রতাপ বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা পত্নীর পুত্রতুল্য বলিয়া গোবিন্দের মাতা তাঁহাকে সপত্নীপুত্রের মত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। উহারই ফলে পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বদা কলহ হইত। প্রতাপ মনে করিতেন, এই কলহের অন্তরালে বসন্ত রায় নির্লিপ্ত ছিলেন না। যে সকল কারণে বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের আক্রোশ জন্মাইতেছিল, এই জ্ঞাতি-বিদ্বেষ তাহার সর্ব্বপ্রথম।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইবার মূল প্রস্তাব বিক্রমাদিত্যই উপস্থিত করেন ; বসন্ত রায় বহু চেষ্টায় তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া অনুমোদন করেন, এবং সে কার্য্যে প্রতাপের মঙ্গল হইবে বুঝিয়াই নিজে অগ্রণী হইয়া উহার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রতাপ ভাবিলেন, খুল্লতাতের চক্রান্তেই তাঁহাকে দূরদেশে নির্ব্বাসিত করা হইল।

তৃতীয়তঃ, প্রতাপাদিত্য মোগল বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া আসেন। কয়েক বৎসর তদনুসারে সামন্তরাজের মতই ছিলেন এবং মানসিংহের নির্দ্দেশমত মোগল পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য উড়িষ্যায় না যাইয়াও পারেন নাই। সেই অভিযান হইতে প্রত্যাগমনের পর প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। তখন বসন্ত রায় তাঁহাকে বাধা দিলেন এবং নানামতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে ঐশ্বর্য্যযুক্ত যশোর রাজ্য হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে। প্রতাপ তাহা বুঝিলেন না ; তিনি মনে করিলেন, খুল্লতাত দেশদ্রোহী, নতুবা দেশের লোকের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবেন কেন? হয়ত তিনি প্রতাপের বলবীর্য্য পরিমাপ করিতে পারেন নাই, নতুবা মোগল শত্রু হওয়া এতই বিপজ্জনক বলিয়া মনে ভাবিলেন কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ একটা সহজ কথা বুঝিতেন ; পাঠানেরাই যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এবং পাঠানের অর্থ-সম্পদেই সে রাজ্যের সমৃদ্ধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সুতরাং পাঠানের রাজ্য ও অর্থের অধিকারী হইয়া মোগলের বশ্যতা স্বীকার করা বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য ; প্রতাপ তাহাতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বিচার করিয়া বসন্ত রায় রাজ্যের মঙ্গলার্থই প্রতাপকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। ফল বিপরীত

১ বর্ত্তমান খণ্ড, ১৩০-১ পৃ।

হইল ; প্রতাপ খুল্লতাতের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। মোগলের সহিত বসন্ত রায়ের চক্রান্তের আশঙ্কা করিয়া প্রতাপ তাঁহার প্রাণ-বিনাশেরই কল্পনা পোষণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থতঃ, এই সময়ে চাকশিরি পরগণা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইল। বিক্রমাদিত্যের বিভাগানুসারে যশোর-রাজ্যের পূর্ব্বাংশ প্রতাপের এবং পশ্চিমাংশ বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। বসন্ত রায়ের শ্বশুর কৃষ্ণরায় দত্ত ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া রাঙ্গদিয়া পরগণায় বাস করেন। চকশ্রী বা চাকশিরি তাঁহারই সম্পত্তির অন্তর্গত, সুতরাং তাহা প্রতাপেব রাজ্যমধ্যে হইলেও তাঁহার স্বাধিকারভুক্ত ছিল না। অথচ অবস্থানগুণে নদীতীরবর্ত্তী চাকশিরিতে একটি নৌ-দুর্গ স্থাপন করিয়া পূর্ব্বদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করা প্রতাপাদিত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। তিনি অন্য স্থানের বিনিময়ে চাকশিরি পরগণা চাহিলেন, বসন্ত রায় তাহা প্রত্যর্পণ করিবার পথ পাইলেন না, বিশেষতঃ তাঁহার পুত্রগণ ও শ্যালকেরা বিরোধী হইয়া পড়িলেন। প্রতাপের যখন যাহা মাথায় ঢুকিত, তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। অবিরত চেষ্টা চলিতে লাগিল, বারংবার খুড়ার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দ রায় প্রভৃতির চক্রান্তে কিছুতেই চাকশিরি পাওয়া গেল না। এই সময় হইতেই প্রবাদ হইয়া রহিয়াছে : 'সারা রাতি ঘুরি ফিরি, তবু না পাই চাকশিরি'। প্রতাপের ক্রোধ সপ্তমে চড়িল ; তিনি খুল্লতাতকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। গুপ্তভাবে সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চমতঃ, এমন সময়ে একদা বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ তিথি উপস্থিত হইল। সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, গোঁড়া হিন্দু বসন্ত রায় তাহা মানিতেন। জ্যেষ্ঠা পত্নীই প্রকৃত ধর্ম্মপত্নী ; সে পত্নী প্রতাপের নিকট ধূমঘাট দুর্গেই অবস্থান করিতেন। বসন্ত রায় প্রত্যেক যাগযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধাদিতে জ্যেষ্ঠা পত্নীকে নিজ বাটীতে লইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এবার উভয় পক্ষে এমন মনোমালিন্য চলিয়াছিল যে, গোবিন্দ রায়ের মাতার চক্রান্তে বসন্ত রায় জ্যেষ্ঠা পত্নীকে আনিলেন না বা নিমন্ত্রণ করিলেন না। কেবল মাত্র প্রতাপাদিত্যকেই নিমন্ত্রণ করা হইল। ইহাতে সেই জ্যেষ্ঠা পত্নী বা যশোহরের মহারাণী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। সপত্নী-বিদ্বেষ এই ঘটনার মূল কারণ মনে করিয়া, তিনি চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে দুঃখের কথা প্রতাপাদিত্যকে জানাইলেন।

প্রতাপ একে খুল্লতাতের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তাহাতে মাতার এই অবমাননা কিছুতে সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতিশোধ লইবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন। কলহ পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল; সুতরাং এবার প্রতাপ নিরীহ ভ্রাতুষ্পুত্রের মত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি নিজে সম্পূর্ণ যোদ্ধবেশে এবং বাছা বাছা কতকগুলি সশস্ত্র শরীররক্ষী দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রাদ্ধদিনে রায়গড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার পান-দোষ ছিল, এ সময় তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানে রক্তচক্ষু হইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রলয়ের আকাশ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া রহিল।

সেই অবস্থায় যখন প্রতাপাদিত্য প্রবেশ করিলেন, তখন গোবিন্দ রায়ের আশঙ্কা হইল; সে আশঙ্কা অমূলক বলা যায় না। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ বুঝি তাঁহাদিগকে নিহত করিবার জন্যই সশস্ত্র হইয়া প্রবেশ করিতেছেন। বসন্ত রায়ের মিষ্ট সস্নেহ ব্যবহারে অনেকবার প্রতাপের রুদ্রমূর্ত্তি শান্ত হইয়াছে, হয়ত এবারও সেরূপ হইত। কিন্তু বসন্ত রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব্বেই গোবিন্দ রায় দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এক অত্যাহিত উপস্থিত করিলেন। কোন কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্বেই তিনি দোতালার বারান্দা হইতে প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া দুইবার তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর ঠিকমত লাগিলে প্রতাপের রক্ষা ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হইল, অমনি মদোন্মত্ত দৃপ্ত বীরের ক্রোধ সীমাতিক্রম করিল। প্রতাপ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছুটিয়া উঠিয়া এক আঘাতে গোবিন্দরায়কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। চারিদিকে বিষম হাহাকার রোল উঠিল।

বসন্ত রায় যেখানে শ্রাদ্ধে বসিয়াছিলেন, সে শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। প্রতাপের প্রতি তাঁহার যতই স্নেহ থাকুক এবং গোবিন্দের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য তাঁহার প্রতি যতই বিরক্তি থাকুক, বৃদ্ধকালে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নৃশংস হত্যা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না; এমন সহ্য জগতের অতি কম লোকেই করিতে পারে। বিশেষতঃ তিনি নিজে প্রবীণ যোদ্ধা এবং অসমসাহসী। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি 'গঙ্গাজল আন, গঙ্গাজল আন' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের প্রকাণ্ড তরবারির নাম ছিল গঙ্গাজল। নিকটবর্ত্তী ভৃত্য তাহা বুঝিল না, সে ভাবিল শ্রাদ্ধকালে যে গঙ্গাজল লাগে, রাজা মহাশয় তাহাই চাহিতেছেন। সে দৌড়িয়া গিয়া এক ঘটি গঙ্গাজল আনিয়া উপস্থিত করিল। বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে চিনিতেন,

তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিলেন এইবার সর্ব্বনাশ হইল। অপর পক্ষে তিনি যখন 'গঙ্গাজল' 'গঙ্গাজল' বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, তখন প্রতাপ বুঝিলেন সে কোন্ গঙ্গাজল। সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলে বহু যোদ্ধাও যাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না, প্রতাপের অস্ত্রশিক্ষা-গুরু সেই বসন্ত রায় আজ গঙ্গাজল হাতে পাইলে তাঁহার নিস্তার নাই, ইহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। এই আশঙ্কায় প্রতাপাদিত্য সদসৎ বিবেচনা করিবার অবসর না পাইয়া, হতবুদ্ধির মত দৌড়িয়া গিয়া বসন্ত রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। বহুদিনের সম্পোষিত জিঘাংসা, ক্রোধে ও মদ্যপানে চৈতন্যের লোপ এবং সর্ব্বশেষে স্বকীয় জীবননাশের অত্যধিক আশঙ্কা—এই তিনটি কারণ ভাগ্যদোষে একত্র হইয়া, তাঁহাকে তিলার্দ্ধের জন্য কিছু ভাবিয়া দেখিতে দিল না, তিনি হঠকারিতা ও কৃতঘ্নতার একশেষ দেখাইয়া নিতান্ত দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের মত পিতা হইতেও যিনি তাঁহার আপন জন, সেই পিতৃতুল্য খুল্লতাতের হত্যাসাধন করিলেন। এইবার তাঁহার কোষ্ঠীর ফল ফলিল; এই দিন হইতে তাঁহার রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িল।[১] ইহার পর তিনি বাহুবলে আরও রাজ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি

১ বসন্ত রায়ের হত্যার তারিখ সম্বন্ধে নানা মত আছে। সবগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ মত এই, চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপ-কন্যার বিবাহকালে বসন্ত রায় জীবিত ছিলেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' এই প্রসঙ্গে বসন্ত-চরিত্রের অনেক চিত্র দেওয়া হইয়াছে। সে বিবাহ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে হয়। সুতরাং বসন্তের হত্যাও ১৬০২ অব্দে হয়। ঘটককারিকায় আছে:

'যুগযুগ্মেষু চন্দ্রে চ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্য নামাসৌ জায়তে নৃপতির্ম্মহান্॥'

অর্থাৎ ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃষ্টাব্দে বসন্ত রায় হত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে মানসিংহের আক্রমণ ঘটে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে আক্রমণের অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যার প্রমাণ আছে। সুতরাং রামচন্দ্রের বিবাহকালে বসন্ত রায় জীবিত ছিলেন না এবং রামচন্দ্রের জীবন রক্ষার জন্য তিনি প্রতাপের শত্রু হইয়াছিলেন, একথা সত্য বলিয়া ধরিতে পারি না। আমাদের মতে ১৫৯৪-৫ অব্দে বসন্তের হত্যা সাধিত হয়। এই সিদ্ধান্তের অন্ততঃ তিনটি কারণ দিতে পারি। প্রথমতঃ, যখন জেসুইট পাদরিগণ ১৫৯৯ হইতে ১৬০৩ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন, তাঁহারা যশোর রাজ্যের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সকল দিক ভ্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কোথাও বসন্ত রায়ের রাজ্যাংশের উল্লেখ করেন নাই, অথচ চাঁদখাঁ চকের মধ্যে যে সগরদ্বীপে তাঁহাদের একটি প্রধান আড্ডা হয়, তাহা বসন্ত রায়েরই সম্পত্তিভুক্ত ছিল। সুতরাং তাঁহাদের আগমন অর্থাৎ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বে সমস্ত রাজ্য প্রতাপাদিত্যের করায়ত্ত

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। 'সারতত্ত্বতরঙ্গিণীতে' আছে :

"রাজ্যলোভে হ'য়ে মূঢ় নিদারুণ চিত
কাটি খুল্লতাত মাথা পাপে হইল হত।"

এই নৃশংস হত্যার যে কোন কারণ থাকুক না কেন, ইহা প্রতাপ-চরিত্রকে দুরপনেয় কলঙ্কে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এবং এখনও তদ্বংশীয়েরা 'খুড়া কাটার গোষ্ঠী' বলিয়া লোক-সমাজে নিন্দিত হন।

বসন্ত রায়কে হত্যা করিবার পর প্রতাপাদিত্য কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কোন গুরুতর অপকর্ম্মের পর সকল লোকের যেরূপ তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। ইহার পর তিনি অন্য কাহাকেও হত্যা করিয়াছিলেন বা কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। ঘটককারিকায় আছে—'নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা,' অর্থাৎ প্রতাপ কর্ত্তৃক গোবিন্দ ও চন্দ্র দুই ভ্রাতা নিহত হইয়াছিলেন। এ কথা সত্য নহে। আমরা দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর বসন্ত-পুত্র চন্দ্র বা চাঁদ রায় কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার

হইয়াছিল ও বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, রামরাম বসুর গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রবাদ হইতে জানা যায়, বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণ হিজলীর ঈশা খাঁ মছন্দরীর শরণাপন্ন হন। সেই ক্রোধে প্রতাপ হিজলি আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন; সেই যুদ্ধে বা পরে ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়। সে মৃত্যু যে ১৫৯৫ অব্দের পরে হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (৩৫-৬ পৃ)। তৃতীয়তঃ, বসন্ত রায়ের হত্যার পর যখন তৎপুত্র কচু রায় দিল্লী যান, তখন তিনি অল্পবয়স্ক। কুলাচার্য্যগণের মতে তখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর।

'বর্ষদ্বাদশমাপন্ন স্তীব্রধীর্লক্ষণান্বিতঃ।
উপগম্যাতিদুঃখেন দিল্লীশ্বরসমীপতঃ॥'

যখন তিনি কচু বনে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন, তখন তাঁহার বয়স বড় বেশী ধরিলও ১৫।১৬ বর্ষের অধিক নহে, অথচ মানসিংহ যখন যুদ্ধার্থ আসেন, তখন কচু রায় মহাবীর এবং কূটবুদ্ধিবলে মানসিংহকেও 'নীতিসার বাক্য' শুনাইতেছেন। সুতরাং তখন তাঁহার বয়স ২৩।২৪ বর্ষের কম নহে। মানসিংহের আগমন কাল ১৬০২-৩ অব্দে ধরিলে কচু রায়ের দিল্লী যাত্রার সময় ১৫৯৫ অব্দের পরে হইতে পারে না। অতএব বসন্ত রায়ের হত্যা ১৫৯৪-৫ অব্দেই হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে নিখিলনাথ রায়ের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।—'প্রতাপাদিত্য', মূল ১২১-৩ পৃ।

প্রদত্ত সনন্দ ও দানপত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—'গোবিন্দ রায়ের মস্তক কাটিল এবং তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়া বসন্ত রায়ের কাটা মুণ্ড লইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।' গোবিন্দের গর্ভবতী স্ত্রীর কথা অন্যত্র নাই। তাই বলিয়া বসু মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। স্বামীর হত্যাকালে হয়ত তিনি সম্মুখে পড়িয়া ক্রোধান্ধ বীরের উন্মুক্ত কৃপাণ হইতে রক্ষা পান নাই। কথা সত্য হইলে, গোবিন্দের হত্যা অপেক্ষাও এই হত্যা আরও নৃশংস এবং মহাপাতকের কার্য্য। প্রতাপের পাপ-চরিত্র সমর্থন করিবার কোন উপায় থাকে না। কিন্তু একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না।

প্রতাপাদিত্য গোবিন্দ ভিন্ন বসন্ত রায়ের আর কোন পুত্রকে নিহত করেন নাই। সম্ভবতঃ অনেকেই এ সময়ে স্থানান্তরে ছিলেন। বসু মহাশয়ের মতে বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ৭ পুত্র জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাঘব রায় জ্যেষ্ঠ।[১] রাণী বা তাঁহার রেবতী নাম্নী এক দাসী রাঘবকে কচুবনে লুকাইয়া প্রতাপের হস্ত হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এ জন্য পরে তাহার নাম হয়—কচু রায়। এই কচু রায়ই আগ্রায় গিয়া মানসিংহকে লইয়া আসেন, এবং প্রতাপের পতনের পর যশোরের সামন্ত-রাজ হইয়া 'যশোহরজিৎ' উপাধি লাভ করেন। খুল্লতাতের হত্যার পর তাঁহার স্ত্রীগণের উপর প্রতাপ কর্ত্তৃক যে সব পাশবিক অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলিয়া 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র গ্রন্থকার নবীন বয়সে স্বীয় লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রবাদের সঙ্গে অনেক অতিরঞ্জিত গল্প জড়িত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু সে প্রবাদও তান্ত্রিকভক্ত প্রতাপাদিত্যের নামে তেমন কোন অস্বাভাবিক গল্পের সৃষ্টি করে নাই।

রায়গড় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য রক্ষি-সৈন্য দ্বারা তাহার পাহারা ঠিক রাখিয়া এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহের সাময়িক ব্যবস্থা করিয়া আসেন। তিনি ধুমঘাটে পৌঁছিলে, মাতা মহারাণী সংবাদ শুনিয়া হতচৈতন্য হইয়া পড়েন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না; যাহাকে তিনি স্তন্য

---

১ বসন্ত রায়ের ১১ পুত্রের মধ্যে ৭ জন জীবিত ছিলেন। অপর ৪ জনের মধ্যে গোবিন্দ নিহত হন। অবশিষ্ট তিন জন সম্ভবতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় কালগ্রাসে পতিত হন। চণ্ডীদাস ও নারায়ণদাসের অকাল মৃত্যুর কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১১৬ পৃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দিয়া পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই আজ তাঁহার দেবতুল্য স্বামীকে হত্যা করিয়া আসিয়াছে, এ শোক ও ক্ষোভ সহ্য করা যায় না। আকাশ অনেক দিন হইতে ঘনাচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু এমন ভীষণ প্রলয় আশঙ্কিত হয় নাই। আজ মহারাণীর সপত্নী-বিদ্বেষ আর নাই, প্রতাপের প্রতি পুত্রস্নেহও কোথায় চলিয়া গেল, জাগিয়া উঠিল শুধু সতী রমণীর অতুলনীয় পতিভক্তি। বিলাপ, আর্ত্তনাদ ও ভর্ৎসনার বেগ অচিরে বিলুপ্ত হইলে, সতীর অপূর্ব্ব তেজ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এত বড় প্রতাপশালী মহাবীর যে প্রতাপ, তিনি আজ দেবী-প্রতিমার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া, নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। অনুতাপের পার নাই। ভুল অনেকের হয়, তাঁহার জীবনেও হইয়াছিল, এমন ভুল কদাচিৎ দেখা যায়। (এই জাতীয় ২।১টি ভুল করিয়া মহাবীর আলেকজেণ্ডর নিজ চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।) অবশেষে বসন্ত রায়ের ধর্ম্মপত্নী সহমরণের জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রতাপ মহারাণীকে না জানাইয়া খুল্লতাতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে পারেন নাই। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, প্রতাপ বসন্ত রায়ের কাটামুণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। পুরোহিত দ্বারা সেই মুণ্ড আনাইয়া মহারাণী তৎসহ চিতারোহণ করিলেন। যখন মহাসমারোহে চিতার আগুন জ্বলিল, তখন মহারাণী প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন যে, 'তাহার স্ত্রী পুত্র অন্ত্যজগ্রস্ত হইবে'। এই উক্তির সত্যতা কি এবং কোথায় কি ভাবে চিতা জ্বলিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে প্রতাপের পতনের পর তাঁহার স্ত্রীপুত্র জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছিল, ইহাই মাত্র প্রবাদ আছে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধি-বিগ্রহ

প্রতাপাদিত্যের জীবনের উদ্যোগ-আয়োজনের কথাই এতক্ষণ আমরা বলিয়াছি। এইবার আমরা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কর্ম্মময় জীবন ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিব। এখন হইতে প্রায় দশ বৎসর কাল তাহার প্রকৃত যোদ্ধ-জীবন—সে জীবন অতি বড় কার্য্য-তৎপরতা এবং ঘটনা-বহুলতায় পরিপূর্ণ। জ্ঞাতি-বিরোধ এবং আত্মকলহই আমাদের দেশের প্রকৃত ব্যাধি। প্রতাপ যদি এই ব্যাধির প্রকোপে প্রপীড়িত না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গের ইতিহাস হয়ত নূতন করিয়া লিখিত হইত। বাল্য হইতে বসন্ত রায় যে তাঁহার পিতা অপেক্ষাও তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল ছিলেন, তাহা সত্য; তিনিও যে সেই অযাচিত অপরিমিত স্নেহের মূল্য কিছুই বুঝিতেন না, তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বসন্ত রায়ের আদেশ ও উপদেশ গুরু-বাক্যের মত পালন করিতেন। কিন্তু গোবিন্দ রায় প্রভৃতি বসন্তের পুত্রগণ সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছিলেন; আর তাঁহাদের কয়েকজন আত্মীয় ও অমাত্য উভয় পক্ষের বিরোধ ঘটাইবার জন্য সর্ব্ববিধ নীচতা ও কূটমন্ত্রের অবতারণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। উহাদের মধ্যে রূপরাম বা রামরূপ বসু সকলের অগ্রণী; সাধারণতঃ সকলে তাহাকে রূপবসু বলিয়া জানিত। তিনি বসন্ত রায়ের ভ্রাতা বাসুদেব রায়ের জামাতা;[১] কিন্তু সকলে ইঁহাকে বসন্ত রায়ের নিজের জামাতা বলিয়াই মনে করিত। ইনি পৃথ্বীধর বসুবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন যদুনন্দনের পুত্র। যদুনন্দন মাল্‌খানগর হইতে আসিয়া আঁধারমাণিকের সন্নিকটবর্ত্তী মালঙ্গ পাড়ায় বাস করেন। তথা হইতে তৎপুত্র রূপরাম বসু ঠাকুর 'যশোহরের

---

১ কৃষ্ণদাস বা বিদ্যাধর ব্যতীত বসন্ত রায়ের আরও দুই ভ্রাতার কথা দেহেরগাঁতির ঘটক-কারিকায় উল্লিখিত আছে। ঐ দুইজনের নাম যদুনাথ ও বাসুদেব রায়। ১০৮ পৃষ্ঠায় কারাপাড়ার কারিকা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এ অংশ অস্পষ্ট বলিয়া বাদ দিয়াছি। তবে বিশেষ মনোযোগ করিলে সেখানেও বাসুদেব রায়ের নাম পড়া যায়। পৃথ্বীধর বসু হইতে রূপরাম পর্য্যন্ত ধারা এইরূপ: ১১ পৃথ্বীধর—১২ দেবীবর—১৩ গঙ্গাধর—১৪ যদুনন্দন—১৫ গোপীনাথ ও রূপরাম; রূপরামের বংশধরেরা এখনও টাকীর নিকটবর্ত্তী সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।—'বঙ্গীয় সমাজ', ১৯৯-২০০ পৃ।

রাজবংশের আশ্রয়ে লক্ষণকাটি গ্রাম বৃত্তি পাইয়া যশোহরবাসী হইয়াছিলেন।' ধূমঘাট দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বে রূপরামের দীঘি এখনও আছে। রূপবসু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। তবে তিনি গোবিন্দ প্রভৃতিকে সর্ব্বদা কুপরামর্শ দিয়া উদ্রিক্ত করিতেন এবং প্রতাপের প্রত্যেক কার্য্যের দোষ ধরিয়া তাঁহার কু-অভিসন্ধি বুঝাইতেন। গোবিন্দ একে কিছু স্থূলবুদ্ধি হঠকারী লোক, তাহাতে আবার রূপবসুর কু-মন্ত্রণা। উহার পরিণাম বিষময় হইয়াছিল এবং জ্ঞাতি-বিদ্বেষ একেবারে শেষসীমায় দাঁড়াইয়াছিল। ইহারই ফলে উভয় পক্ষের ভুল ধারণার জন্য প্রতাপ কর্তৃক সপুত্রক বসন্ত রায়ের হত্যার মত একটা গুরুতর কাণ্ড হইয়া গেল। খুল্লতাতের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি আর কোনও অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু রূপবসু সেখানেই যবনিকার পতন হইতে না দিয়া, দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনুতপ্ত প্রতাপ হয়ত জ্ঞাতি ভ্রাতাদিগের উপর অত্যধিক অনুগ্রহই দেখাইতেন, কিন্তু রূপবসু তাহা করিতে দিলেন না। তাঁহার চক্রান্ত যে কেবল প্রতাপ-চরিত্রকে লোক-সমাজে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে; উহা দ্বারা প্রতাপের সকল আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করিয়া দিয়াছিল।

রূপবসু কচু রায়কে লইয়া রায়গড় দুর্গ হইতে পলায়ন করতঃ উড়িষ্যায় ঈশা খাঁর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্রগণের জীবন ও রাজ্য রক্ষা করাইবার জন্য পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিয়া তুলিলেন। বসন্ত রায়ের হত্যাকালে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে চাঁদ রায় ও অন্য কেহ কেহ সম্ভবতঃ মাতুলালয়ে ছিলেন। কচু রায়ের সহিত কে কে রায়গড়ে প্রহরি-বেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে রামরাম বসুর গ্রন্থে একটি গল্প আছে, শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় ভাষার সচ্ছলতায় উহা অযথা সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। গল্পটি এই—প্রতাপাদিত্য বসন্তের পুত্রগণকে বন্দী করিয়া নিজ রাজধানীতে আনেন; রূপবসু সেই সংবাদ ঈশা খাঁর নিকট দিলে, তাঁহার সেনাপতি বলবন্ত পুত্রগণের উদ্ধার সাধনের জন্য ধূমঘাটে আসেন। প্রতাপের সহিত নিভৃতে গুপ্ত মন্ত্রণা করিবার ছলে বলবন্ত নির্জ্জন গৃহে নিরস্ত্র প্রতাপকে হঠাৎ আক্রমণ করেন। বলবন্ত প্রকৃতই বলশালী, তিনি বসন্তের পুত্রগণের জীবন দান করিবার অঙ্গীকারে প্রতাপকে ছাড়িয়া দেন। প্রতাপ সত্য পালন করিয়াছিলেন। এ গল্প আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, বলবন্তের

উল্লেখও কোথায় পাওয়া যায় না। তবে এই ঘটনায় বলবন্তের বল পরীক্ষা অপেক্ষা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সত্যবাদিতা অধিক পরীক্ষিত হইয়াছিল, ইহাই আনন্দের বিষয়।

যাহা হউক, বসন্ত রায়ের সব পুত্রই যে প্রতাপের হস্তচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। শুনা যায়, তাঁহার কয়েক পুত্র মাতুলালয়ে ছিলেন এবং চন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রতাপের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কেবল মাত্র কচু রায়ই দেখিতে পাই, প্রথমতঃ হিজলীতে ও পরে আগ্রাতে উপনীত হন। বলবন্তের দৌত্যের ফলেই হউক, অথবা রূপবসুর প্ররোচনায় পাঠানেরা শক্তি সংগ্রহ করিতেছেন এই সংবাদ শুনিয়াই হউক, প্রতাপাদিত্য ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। হিজলীর নব প্রতিষ্ঠিত পাঠান-রাজ্য বসন্ত রায়ের রাজ্যাংশের ঠিক অপর পারে। এ সময়ে পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে না পারিলে, তাঁহারা যে সুযোগ বুঝিয়া পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটু স্বপদে দাঁড়াইতে গেলেই চারিদিক হইতে কিরূপ শত্রু-বৃদ্ধি হয়, প্রতাপ তাহা বুঝিতে লাগিলেন। শুধু পাঠান শত্রু নহে, এই সময়ে মগ ও পর্টুগীজ প্রভৃতি দস্যুরাও ভাগীরথী, সরস্বতী ও রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী-পথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিতেছিল ; তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ভাগীরথীর মোহানায় সমুদ্র-কূলে অর্থাৎ সগরদ্বীপে একটি প্রধান সৈন্যাবাস স্থাপন করা প্রয়োজনীয়, ইহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। এই সগরদ্বীপের পরপারে হিজলী রাজ্য ; মোগল কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পর, অল্পদিন হইল পাঠানগণ তথায় আসিয়া দল-বদ্ধ হইতেছিলেন। সুতরাং এই হিজলী রাজ্য করতলগত করিতে না পারিলে, সগরদ্বীপের আড্ডা কখনও নিরাপদ হইবে না। পাঠানেরা সুযোগ পাইবা-মাত্র সে আড্ডা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। এ জন্য শুধু ঈশা খাঁর উপর প্রতিশোধ লওয়া নহে, মগ বা ফিরিঙ্গি দস্যুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার নিমিত্তও, সগরদ্বীপে একটি প্রধান নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র খুলিতে হইবে।

সেজন্য প্রতাপাদিত্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহোৎসাহে আয়োজন চলিতে লাগিল। নানাস্থানে সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া রায়গড় দুর্গে পাঠান হইতেছিল। অতি অল্পদিন মধ্যে নূতন নূতন রণতরী নির্ম্মিত বা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত সে সব সুসজ্জিত

করিয়া বজ্‌বজ্‌ প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হইল। রায়গড় হইতে বজ্‌বজ্‌ পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইল, তাহা এখনও আছে। এই সময়ে হাতিয়াগড় ও মেদন্মলে সেনা নিবাস হয়।[১] ধূমঘাট হইতে বাহিরের পথে অসংখ্য রণতরী আসিয়া হল্‌দি নদীর অপর পারে সমবেত হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে ফিরিঙ্গি দলপতি কাপ্তেন রডা একটি যুদ্ধে বন্দী হইয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তিপ্রদান না করিয়া নিজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ইহার ফলে, রডা চিরজীবন বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত প্রতাপের এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। নৌ-যুদ্ধে রণ-তরীতে কামান সজ্জিত করিয়া কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে রডা প্রতাপ-সৈন্যের শিক্ষাগুরু হইলেন। আয়োজন স্থির হইলে, হিজলীর যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য স্বয়ং আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে ফিরিঙ্গি রডা, সূর্য্যকান্ত, সুন্দর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য তিন দিক হইতে হিজলী রাজ্য আক্রমণ করেন ; পূর্ব্বদিকে আদাবাড়িয়ার দিক হইতে, উত্তরে হল্‌দি নদীর মোহানা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া এবং দক্ষিণে উন্মুক্ত সাগরের দিক হইতে হিজলী আক্রমণ করা হইল। শুনা যায়, এই যুদ্ধ ১৮ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। রণতরী হইতে তীরে নামিয়া দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী-সৈন্য দিনের পর দিন ভীষণ অনল-ক্রীড়া করিয়াছিল। অবশেষে প্রতাপের জয় হইল। প্রবাদ এই, যুদ্ধকালে ঈশা খাঁর পায়ে এক গোলার আঘাত লাগে, সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান সেনাপতিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন প্রতাপ যুদ্ধ জয় করিয়া শত্রু সৈন্য বিতাড়িত করিয়া দেন এবং কথিত আছে, তিনি ছয়মাস কাল সেখানে থাকিয়া রাজ্য-রক্ষণ ও রাজস্ব-সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। হিজলী রাজ্যে পূর্ব্ব হইতে অনেকগুলি সামন্ত রাজা ছিলেন ; অল্পদিনে পাঠানেরা তাঁহাদিগকে করতলগত

১ রামগোপাল রায় লিখিয়া গিয়াছেন :

'হাতিয়া গড়েতে রাজ হস্তীর মকাম
সেই হৈতে হইল হাতিয়াগড় নাম।
জগদ্দলে মেদন্মলে আদি পাট মহলে
আছিল সৈন্যের ঠাট সিন্ধু সম বলে ॥'

মেদন্মল বর্ত্তমান ২৪-পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত প্রাচীন পরগণা।

করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, বাসুদেবপুর ও মাদ্‌না ষ্টেটের প্রথম সনন্দ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।

হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন। উহার উদ্ধারের জন্য আমি বহু চেষ্টা করিয়াছি। যাহা পাইয়াছি, তাহা সামান্য এবং তাহার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। হিজলীতে পাঠান আমলের একটি প্রাচীন মস্‌জিদ্ আছে। উহারই সন্নিকটে এক প্রাচীন মুসলমান গৃহে একখানি অতি জীর্ণ পারসীক পুঁথি পাওয়া যায়। কাঁথির সুযোগ্য মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট রায়সাহেব রামপদ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় উহা কিছুকালের জন্য আমার হস্তগত হয়। উহার অতিরঞ্জিত গল্পপুঞ্জের মধ্য হইতে সংক্ষিপ্ত সার গ্রহণ করিয়া হিজলীর উৎপত্তির একটি বিবরণী পাইয়াছি। বহুমার পুত্র রহমৎ নামক এক সাহসী সর্দ্দার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমুদ্রকূলে হিজল-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এক প্রদেশে হিজলী নামক স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। পাতশাহের সেনাপতি খাঁ-খানানের নিকট হইতে তিনি জমিদারী সনন্দ পান এবং বহুদিন পরে পুত্র দাউদ খাঁর হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাউদের তাজ খাঁ ও সেকন্দর পালোয়ান নামক দুই পুত্র হয়। তাজ খাঁর অন্য নাম এক্তিয়ার খাঁ, তিনি সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হন এবং সম্মানিত বলিয়া তাঁহার মসনদ-আলি বা মসন্দরী এই সাধারণ খেতাব ছিল। ভীমসিংহ মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মচারীর চক্রান্তে সেকন্দর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৫৪ খৃঃ অঃ)। তাজ খাঁ সাধু পুরুষ, তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, তাঁহার অনুরক্ত ভ্রাতা সেকন্দরের বলগৌরবেই তাঁহার জমিদারীর বহুল বৃদ্ধি হইয়াছিল। এখন সেই বীর ভ্রাতার মৃত্যুর পর, তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, তখন তিনি নিজে কবরে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হিজলীতে যে বিরাট পুরাতন মস্‌জিদ্ আছে বলিয়াছি, উহার ফটো আমি পাইয়াছি এবং তাহার শিলালিপিরও পাঠোদ্ধার করিয়াছি। শিলালিপি হইতে জানা যায়, দাউদ খাঁর পুত্র এক্তিয়ার খাঁ কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত। সুতরাং ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ্ গঠিত হয় বলিয়া আধুনিক সময়ে যে প্রবাদ চলিতেছে, তাহা সত্য নহে। ভীমসিংহ মহাপাত্র তাজ খাঁ বা এক্তিয়ার খাঁর দেওয়ান ছিলেন। দেউল বাড় বা বাহিরিয়ামুটায় উক্ত ভীমসিংহের বংশীয়গণের প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও মন্দির আছে। ভীমসিংহের উদ্যোগে তাজ খাঁর পুত্র

বাহাদুর খাঁ রাজতক্তে বসেন। সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায়[১] ভীমসিংহের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ পাণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক তাজ খাঁর জামাতা জৈলখাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাহাদুরকে দূরীভূত করেন। জৈলখাঁ ১৫৭৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ও পরে বাহাদুর পুনরায় ১৫৮৩ পর্য্যন্ত শাসন করেন। সেই সময়ে উক্ত কৃষ্ণ পাণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক হিজলী রাজ্য প্রধানতঃ জ্বালামুটা ও মাজনামুটা এই দুই সম্পত্তিতে বিভক্ত করিয়া নিজেদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। ইহার পর আর হিজলীর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস জানা যায় না।

তবে কতলু খাঁর সময়ে যে হিজলী পর্য্যন্ত পাঠান প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫৯২ খৃঃ অব্দের পর যখন পাঠানগণ মানসিংহের সহিত সন্ধিসূত্রে সুবর্ণরেখা পার হইতে বাধ্য হন, তখনই তাঁহারা হিজলী অঞ্চল স্বাধিকৃত করিয়া বাস করেন।[২] হিজলী একটি ক্ষুদ্র পরগণা, পাঠান রাজত্ব তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। বৃদ্ধ ঈশা খাঁ জীবনের অবশিষ্ট দুই এক বর্ষ কাল এই স্থানে বাস করেন, কিন্তু তখন হইতে তৎপুত্র ওসমান প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নানা প্রদেশে ঘোর বিগ্রহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। ঈশা খাঁকে হিজলীর ঈশা খাঁ বলা সঙ্গত নহে, তিনি প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার অধিপতি কতলু খাঁ লোহানীর ভ্রাতা এবং তাঁহার প্রকৃত নাম খ্বাজা ঈশা খাঁ লোহানী। হিজলীর মসনদ আলী বংশীয় বলিলে তাজ খাঁর বংশীয়দিগকেই বুঝায়। উড়িষ্যার ঈশা খাঁ যে উক্ত তাজ খাঁর সহিত কোন প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত নহেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ঈশা খাঁ লোহানীর অবস্থান কালে হিজলী অঞ্চলে কোথায় তাঁহার রাজপাট

১ মেদিনীপুর কালেক্টরী হইতে আমি জ্বালামুটা ও মাজনামুটার Settlement Report এর নকল আনিয়াছিলাম। তাহাতে সেকন্দর পালোয়ান ও তাজ খাঁর বিবরণ আছে।—বর্ত্তমান খণ্ড, ২৭ পৃ দ্রষ্টব্য। মস্‌জিদের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, উহা তাজ খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং খ্‌জা ঈশা খাঁ লোহানি যে ঐ মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতা নহেন, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রতাপাদিত্য ঐ মস্‌জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; কারণ হিজলী বন্দরের নৌসেনাগণের উহা ধর্ম্ম উপাসনার স্থান হইয়াছিল।—নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', ১২৬ পৃ।

২ তখনও কৃষ্ণ পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক পাঠানের সামন্তরাজ রূপে থাকিতে পারেন। হয়ত ইঁহারা প্রতাপাদিত্যের আক্রমণ কালে পাঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, এজন্য প্রতাপ পুরস্কৃত করিবার জন্য তাঁহাদেরই সঙ্গে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় যে 'দুইজন প্রধান হিন্দু রাজকর্ম্মচারীর উপর রাজভার ন্যস্ত' করার কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা এই দুইজন।—শাস্ত্রী, ৮৯ পৃ।

ছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের বিজয় লাভের পর হিজলীতে একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়; মগ ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সেখানে প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনী থাকিত। এইজন্য বন্দরটি প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল, উহার কোন কোন চিহ্ন এখনও আছে।[1]

এই সময়ে প্রতাপ হিজলীতে রণতরী রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সগর-দ্বীপে নৌ-সেনার একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। তথায় জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থা হইল; ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারীরা উহার ভার লইল। ক্রমে সগর-দ্বীপ দ্বিতীয় রাজধানীর মত সমৃদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকের বসতি হইয়া গেল; মোহানার কাছে পৌষ-সংক্রান্তিতে যে মেলা বসিত, তাহাতে বহুদূর হইতে হাজার হাজার লোক আসিয়া সমবেত হইত এবং সে তীর্থক্ষেত্রের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রতাপের শাসন-কৌশলে দস্যুদিগের সর্ব্ববিধ অত্যাচার হইতে ঐ স্থান রক্ষা পাইল। সগরদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া ধূমঘাট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রণতরী দ্বারা পাহারা বসিয়া গেল। তখন হইতে ঐ দীর্ঘ জল-পথের নাম হইয়াছিল—'ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি', কারণ ঐ ফাঁড়ি ফিরিঙ্গি জাতীয় প্রধান কর্ম্মচারী দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; একটি পৃথক পরিচ্ছেদে এই ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির শাসন শৃঙ্খলা ও উপকারিতার পরিচয় দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীপথে ঢুকিয়া বম্বেটে, ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি দস্যুরা যখন তখন ফাঁড়ি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিত, তাহার ফলে কত স্থানে কত খণ্ডযুদ্ধ বাধিত, তাহা নির্ণয় করিবার কোন পন্থা নাই। মালঞ্চ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক দোয়ানিয়া খাল দিয়া দস্যুদল একবার ধূমঘাটের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ঐ দোয়ানিয়া তদবধি ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়া নামে চিহ্নিত হইয়া রহিল। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পরিচ্ছেদে এই সকল দস্যুদের পাশবিক অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি। তাহাদের ভয়ে দেশের লোক কম্পিত হইত। প্রতাপাদিত্য

১ কাঁথির সর্ব্বজনপ্রিয় জমিদার সুরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় বলেন, হিজলী বন্দরে পাথরের গাঁথুনি ছিল। এখনও উহার অনেক পাথর আছে। ঐ পাথরের একখানি তিনি নিজে তাঁহার এক আবাদে আনিয়াছিলেন। উহা এক্ষণে বুড়াঠাকুর বলিয়া স্থানীয় লোক দ্বারা পূজিত হইতেছে। হিন্দুর মত পাথর পূজক জাতি আর নাই।

সুকৌশলে সগরদ্বীপ হইতে শিবসার মোহানা পর্য্যন্ত নানা স্থানে দুর্গ সংস্থাপন করিয়া, অসংখ্য রণতরী দ্বারা এই অত্যাচার হইতে নিজের রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য উত্তর দিকে যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া অন্য রাজ্য-রক্ষারও হেতু হইয়াছিলেন। প্রতাপের বলবীর্য্যে দেশের যদি অন্য কোন উপকার না হইয়া থাকে, তবু এই দস্যুদের দমন করিয়া তিনি দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যশোর রাজ্যের পূর্ব্বসীমা পার হইয়া বরিশাল অঞ্চলে, এবং এমন কি, যশোহর জেলার উত্তরাংশেও অনেক স্থানে সমাজের গাত্রে দস্যুদিগের অত্যাচারের কলঙ্করেখা এখনও আছে, কিন্তু তাঁহার নিজ রাজ্যে সুন্দরবনের উত্তরাংশে কোথায়ও তেমন কোন পরিবাদ নাই। ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাস্তবিকই বরিশাল প্রদেশে এই সময় এই সকল দস্যুর উৎপাত কিছু বেশী হইয়াছিল। এই সময়ে বসুবংশীয় কন্দর্পনারায়ণ রায় চন্দ্রদ্বীপ বা বাক্‌লার রাজা; তিনি প্রসিদ্ধ বারভুঞার অন্যতম এবং মহাপরাক্রান্ত নৃপতি। ঘটকেরা তাঁহাকে 'মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথ মহাশূরঃ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বরিশালের নিকটবর্ত্তী কচুয়ায় তাঁহার রাজধানী ছিল; ঐ স্থান প্রবল নদীর কূলবর্ত্তী বলিয়া অবিরত মগ ও ফিরিঙ্গিরা রাজধানীর উপর আক্রমণ করিত; এজন্য কন্দর্পনারায়ণ তথা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া, নানা পরিবর্ত্তনের পর লোকালয় মধ্যবর্ত্তী মাধবপাশায় স্থাপন করেন এবং বহুসংখ্যক যুদ্ধতরী ও কামান প্রস্তুত করিয়া নদীমুখে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিতেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত দেশের শান্তি রক্ষার উপায়ান্তর নাই, ভুঞা রাজগণ এক্ষণে তাহা বুঝিলেন। এজন্য সাধারণ স্বার্থের খাতিরে পরস্পরের মত-পার্থক্য বা দ্বেষ-হিংসা বিলুপ্ত রাখিয়া, পত্র-বিনিময় দ্বারা সন্ধি-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। 'কন্দর্প ও প্রতাপ উভয়েই বীর ও সমধর্ম্মী; ত্বরায় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল।'[১] উভয়ই বঙ্গজ কায়স্থ এবং উভয় বংশের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে রক্ত-সম্বন্ধও ছিল। যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বাক্‌লা সমাজই বঙ্গজ কায়স্থকুলের সর্ব্বপ্রধান সমাজ ছিল এবং তাহার সমাজপতি ছিলেন কন্দর্প ও তাঁহার পিতা। অচিরে উভয় বীরের মধ্যে

১ রোহিণীকুমার সেন, 'বাকলা', ১৭০ পৃ।

কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। শক্রনাশের জন্য পরস্পর সাহায্য করিবেন, স্থির হইল। উভয়ের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য কন্দর্পের পুত্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহ স্থিরীকৃত হইয়া রহিল, শুধু পুত্র কন্যা উভয়ে শিশু বলিয়া বিবাহ কয়েক বৎসর স্থগিত রাখার পরামর্শ হইল।

এমন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগত পাঠান দল বাক্‌লা আক্রমণ করিয়া বসিল। কন্দর্পনারায়ণ নামে মাত্র মোগলের সামন্তরাজ ছিলেন, ইহাও তাঁহাদের আক্রোশের বিষয় হইল। ঘটককারিকায় এই প্রসঙ্গে জনৈক গাজীর সহিত যুদ্ধের কথা আছে ; মাধবপাশা রাজধানীর কাছে 'গাজীর দীঘি' নামে একটি জলাশয় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শক্রনাশকারী পাঠান সর্দ্দারেরা 'গাজী' উপাধি লইতেন। এখানে কোন্ পাঠান সর্দ্দার আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। যিনি বা যাঁহারাই আসুন, হোসেনপুর নামক স্থানে তাঁহাদের সহিত কন্দর্পনারায়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এ সময় প্রতাপাদিত্য সৈন্য দিয়া কন্দর্পকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পাঠানেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিলেন (১৫৯৬)।

শুধু পাঠান নহে, এই সময়ে আরাকাণী মগেরা রাজ্যজয় করিতে করিতে অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া বাক্‌লা রাজ্যে উপনীত হইল। প্রতাপও সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সৈন্যদল সাজাইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর মগগণ রণে ভঙ্গ দিয়া প্রতাপ ও কন্দর্পের সহিত সন্ধি করিল। কারণ, এই সময়ে মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গি দলের বিষম বিবাদ চলিয়াছিল। প্রতাপও এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। মগ ও ফিরিঙ্গি উভয় শক্র দলবদ্ধ থাকিলে তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠা দুষ্কর। ভেদ-নীতি ব্যতীত এ ক্ষেত্রে সফলতার প্রত্যাশা নাই ; এইজন্য মগরাজের সহিত সন্ধি-সূত্রে বন্ধুত্ব করিয়া ফিরিঙ্গি দস্যু-দিগকে দমন করাই ভুঞা রাজদ্বয়ের উদ্দেশ্য হইল। তখন পর্টুগীজ ফিরিঙ্গিগণের বিরুদ্ধে উভয় পক্ষে পরস্পর সাহায্য করিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। মগরাজ সন্ধির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, প্রতাপও রাজধানীতে ফিরিলেন। এই সময়ে তিনি বাসুকিগোত্রীয় সেন নরপতিগণের হস্ত হইতে কয়েকটি পরগণা অধিকার করিয়া লন, সে কথা আমরা পরে বলিতেছি। এই সময়ে চাকশিরিতে সত্বরতার সহিত দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। রাজ্য রক্ষাকল্পে সে দুর্গ তাঁহার হস্তগত থাকা যে কত প্রয়োজনীয়, প্রতাপাদিত্য তাহা বিশেষরূপ বুঝিলেন,

তাঁহার খুল্লতাত পুত্রগণের প্ররোচনায় এই স্থান তাঁহাকে না দিবার কল্পনা করিয়া প্রতাপাদিত্যের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য কি ভাবে ব্যর্থ করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিয়া লইলেন। যিনি বঙ্গের স্বাধীনতালাভের পথে অন্তরায়, যিনিই হউন না কেন, তিনি যে প্রতাপের পরমশত্রু, তাহা বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

এই সময়ে (১৫৯৬) হঠাৎ কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র তখন মাত্র ৬ বৎসর বয়স্ক। রাণী পুত্রের অভিভাবিকাস্বরূপ বাক্‌লা শাসন করিতে লাগিলেন। তবে গুরুতর বিষয়ে তিনি প্রতাপাদিত্যের পরামর্শ লইতেন। রামচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তখন হইতে উভয় পক্ষের আত্মীয়তা ও সৌজন্যের বিনিময় হইতেছিল। বাক্‌লা রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করিবার কল্পনা প্রতাপাদিত্যের ছিল, এমন কলঙ্কও তাঁহার নামে আছে। তাহা হইলে এ সময়ে স্ববলে বাক্‌লা জয় করা বোধ হয় তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত না; কন্যার বিবাহের পর জামাতাকে চোরের মত হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকারের পিপাসা প্রতাপের মত বীরের থাকিতে পারে না। আর রামচন্দ্রকে হত্যা করিলেই যে বাক্‌লা করতলস্থ হইবে, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? পার্শ্ববর্ত্তী বিক্রমপুরের কেদার রায় তখন প্রবল পরাক্রান্ত ভুঞা; তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যের ঠিক সমকক্ষ না ধরিলেও কোনক্রমে তদপেক্ষা হীনবল বা নিম্নপদস্থ বলা যায় না। রামচন্দ্রের মাতা কেদার রায়ের শরণাপন্ন হইলে, বাক্‌লার সৈন্য কেদারের বাহিনীতে যোগ দিলে, প্রতাপের পক্ষে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া, সে রাজ্য অধিকার করা যে সহজ নহে বরং বড়ই কঠিন, তাহা অন্য কেহ না বুঝিলেও যশোরেশ্বর বুঝিতেন।

কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর, বাক্‌লার তত্ত্বাবধান প্রসঙ্গে শ্রীপুরের প্রসিদ্ধ ভুঞা মহাবীর কেদার রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল। এই সময়ে আরাকাণী মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গিদলের বিবাদ চলিতেছিল; সে বিবাদের কথা আমরা পরে বলিতেছি। বাক্‌লাতে যখন প্রতাপ ও কন্দর্পের সহিত মগরাজের সন্ধি হয়, তখন কেদার রায় প্রবল পরাক্রান্ত। তাঁহার অধীন অনেক ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ ও সেনাপতি ছিল। ডোমিঙ্গ কার্ভালো উহার অন্যতম।[১]

১ 'Du Jarric mentions that Carvalho was born in Montargil (Portugal) and was previously in the service of Kedar Rai.'—Campos, *Portuguese in Bengal*, p. 68.

উহার উৎপাতে মগেরা অনেক স্থলে বিড়ম্বিত হইত। এজন্য কেদার রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করা মগরাজেরও প্রয়োজনীয় ছিল। অপর পক্ষে, মগেরা তখন খুব শক্তিশালী, সন্ধি হইলে তাহারা আর বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবে না এবং বাক্‌লা, শ্রীপুর ও যশোহর এই তিন রাজ্যের প্রধান হিন্দু ভুঞা একত্র সম্মিলিত হইয়া আরাকাণের পক্ষভুক্ত থাকিলে, দুর্দ্ধর্ষ ফিরিঙ্গি দস্যুরাও দেশমধ্যে কোন উৎপাত করিতে সাহসী হইবে না। এই প্রকার ভেদনীতির সাহায্যে যে উভয় দলকে দমিত রাখিয়া স্ব স্ব রাজ্যে শান্তি স্থাপন করা যাইতে পারে, প্রতাপ সবিস্তর ভাবে তাহা কেদার রায়কে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কেদার রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সন্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া বোধ হয়।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, অত্যল্প কাল পরে এই সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছিল, তখন প্রতাপাদিত্য বিপুল বাহিনী সাজাইয়া লইয়া স্বয়ং কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কেদার পরাজিত হইয়া প্রতাপের 'চরণতলে অস্ত্র সমর্পণ করেন।'[১] এ কথার কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রতাপ ও কেদার উভয়ই তখন বঙ্গের প্রধান বীর, তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রবল যুদ্ধ হইয়া থাকিলে প্রবাদে, গল্পে বা অন্ততঃ ঘটকের পুঁথিতে তাহার খবর থাকিত। সেরূপ কিছু নাই। ঘটকেরা লিখিয়াছেন বটে :

'জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্।
আসমুদ্র-করগ্রাহী বভুব নৃপ-শার্দ্দূলঃ॥'

প্রতাপের যশোর-রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'আসমুদ্র-করগ্রাহী' হওয়া বিশেষ কথা ছিল না; তিনি বাস্তবিকই দক্ষিণ দেশীয় দস্যু-দুর্ব্বৃত্ত দমন করিয়া সমুদ্র-বক্ষে বা নদীপথে বৈদেশিক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতেন। তিনি অনেক ক্ষুদ্রবৃহৎ ভূপতিগণকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য কথা। কিন্তু তন্মধ্যে কেদার রায় ছিলেন না; থাকিলে সে কথা গল্পগুজবে বা গ্রাম্য কবিতায়ও আত্মরক্ষা করিত। সুতরাং শাস্ত্রী মহোদয়ের এই যুদ্ধাভিযান সম্বন্ধীয় কাল্পনিক বর্ণনা সমর্থন করিতে পারিলাম না। 'বাঙ্গালা বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার'—রামরাম বসু মহাশয়ের এই অতিশয়োক্তির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

১ 'প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত', ৯১ পৃ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

খৃষ্টান্ পাদ্‌রীগণ

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে সব পাদরীগণ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গে আসেন, তন্মধ্যে জেস্যুইটগণই প্রধান। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ইগ্নেসিয়াস লয়োলা (Ignatius Loyola) নামক এক স্পেনদেশীয় ব্যক্তিদ্বারা জেস্যুইট বা যীশু-সম্প্রদায় গঠিত হয়। নানা উপায়ে জগতের সর্ব্বদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারাদি নানা প্রণালীতে লোক-সেবা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। দুঃসাহসিক সৈন্য দলের মত এই সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশে দেশে ঘুরিতেন এবং, সদসৎ যে কৌশলে প্রয়োজন, রাজ্যমধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন।[১] শত বৎসরের মধ্যে জগতের এমন কোন দেশ ছিল না, যেখানে ইঁহাদের প্রচারকার্য্যের ভিত্তি পত্তন হয় নাই। পাদরীগণ সেনাদলের মত শাসন মানিয়া একমতে চলিতেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষের মত তাঁহাদেরও সর্ব্বময় কর্ত্তার নাম জেনারেল। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে এই সম্প্রদায়ের সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তাঁহারই নামে কলিকাতায় এক কলেজ আছে। ১৫৭৬ অব্দে ফাদার ভাজ ও ডিয়াজ্ নামক দুই জন পাদরী বঙ্গে আসিলেও তাঁহারা আকবর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শিকরীতে যান। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দেই ইঁহাদের প্রকৃত প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময়ে নিকলাস্ পাইমেণ্টা নামক একজন পাদরী জেস্যুইট সম্প্রদায়ের ভারতীয় পরিদর্শক (Visiteur) রূপে গোয়া নগরীতে ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চারি জন পাদরী বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তন্মধ্যে ফ্রান্সিস্ ফার্ণাণ্ডেজ (Francisco Fernandez) এবং ডোমিনিক সোসা (Domingo de Souza) কোচিন হইতে ১৫৯৮ সনের ৩রা মে তারিখে বঙ্গে রওনা হন এবং মেলকিওর ফন্‌সেকা (Melchior da Fonseca) ও এন্‌ড্রু বাউয়েস (Andre Bowes) পর বৎসর সেই দিকে যাত্রা করেন।

১ 'No religious community could produce a list of men so variously distinguished; none had extended its operation over so vast a space; yet in none had there ever been such perfect unity of feeling and action. There was no region of the globe, no walk of speculative or of active life in which Jesuits were not to be found.'—Macaulay, *History of England*, Vol. II, p. 208. *See also*, D'orsey, J. D., *Portuguese Discoveries, Dependencies and Missions*, pp. 95-100.

এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ্ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি ঐ বৎসরই পাইমেণ্টার নিকট লাটিন ভাষায় কয়েকখানি পত্র লিখেন।[১] ঐ সকল পত্র অবলম্বনে পাইমেণ্টা ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ বা জেনারাল ক্লড একোয়াভিবার (Claude Aquaviva) নিকট বঙ্গীয় মিশন সম্বন্ধে পর্টুগীজ ভাষায় যে সব পত্র লিখেন, ১৬০২ অব্দে লিস্‌বন হইতে উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পিয়ারে ডু জারিক (Pierre Du Jarric) নামক একজন ফ্রান্সবাসী গ্রন্থকার ঐ সকল পত্র ও অন্যান্য বিবরণী হইতে, এশিয়ায় খৃষ্টধর্ম্মের অবস্থা সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় এক বিরাট ইতিহাস লিখেন।[২] দক্ষিণ ফ্রান্সের বোঁর্ডো নগরী হইতে ১৬০৮-১৬১৪ খৃষ্টাব্দে তিন খণ্ডে উক্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়। উহার তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা তাহার সারমর্ম্ম এখানে প্রকটিত করিব। এই ইতিহাসে স্পষ্টতঃ প্রতাপাদিত্যের নাম না থাকিলেও, তিনি চ্যাণ্ডিকানের অধীশ্বর এবং বাক্‌লার রাজপুত্র রামচন্দ্রের ভাবী শ্বশুর, এই পরিচয় হইতে প্রতাপাদিত্যকে বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। চ্যাণ্ডিকান ও যশোহর-ধুমঘাট যে অভিন্ন তাহা আমরা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি।[৩] তদনুসারে এখানেও চ্যাণ্ডিকানের পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে যশোহর নাম ব্যবহার করিব।

১ 'A Portuguese edition of the letter was published at Lisbon in 1602. Fernandez was born in 1550, entered university of Alcala in 1570, arrived in Goa 1575 and died in 1602.'—Beveridge, *Bakarganj*, p. 447.

২ Pierre Du Jarric was born at Toulouse in 1565, was for 15 years Professor of Theology in that town, died in 1666. তাঁহার পুস্তকের নাম L'Histoire des Choses plus memorables advenues taut des Indes Orientales &c. সংক্ষেপতঃ উহাকে Histoire des Indes Orientales বা পূর্ব্ব ভারতীয় ইতিহাস বলা যায়। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মূল ফরাসী হইতে উহার অনুবাদ করিয়া 'প্রতাপাদিত্যের সভায় খৃষ্টান পাদরী' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ ১৩২৮, আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছেন। নিখিলনাথও উহার ২৯-৩০ ও ৩২-৩৩ অধ্যায়ের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—'প্রতাপাদিত্য', ৪০৭-৪৭৫ পৃ দ্রষ্টব্য। [অধ্যাপক সরকার কিছু সংস্কারান্তে উক্ত প্রবন্ধ ১৩৫৫, আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন। উহা বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল—শি মি]

৩ বর্ত্তমান খণ্ড, ১৫০ পৃ দ্রষ্টব্য।

উক্ত চারিজন মিশনরী সর্ব্বপ্রথমে কোচিন হইতে হুগলীর (Gullo) পথে চট্টগ্রামে আসেন এবং তথা হইতে ডিয়াঙ্গায় গিয়া অবস্থান করেন। পর্টুগীজ-পল্লীমাত্রেরই সাধারণ নাম ছিল ব্যাণ্ডেল (Bandel) বা বন্দর। হুগলীর কাছে পুরাতন ফিরিঙ্গি-পল্লীর নাম এখনও ব্যাণ্ডেল এবং ডিয়াঙ্গাকেও ফিরিঙ্গি-বন্দর বলিত, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৭৮ পৃ)। ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা যখন পথে হুগলীতে আসিয়া পৌছেন, তখনই প্রতাপাদিত্য তাঁহাদিগকে যশোহরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া পাঠান। কিন্তু তখন তাঁহারা সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। পরে ফার্ণাণ্ডেজ ডিয়াঙ্গা হইতে যখন শুনিলেন, যে রাজা ঐ কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তিনি সোসাকে যশোহরে পাঠাইয়া দেন। সোসা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে যাত্রা করিয়া হুগলীর পথে অক্টোবর মাসে যশোহরে পৌছেন। যশোহর হইতে তিনি ফার্ণাণ্ডেজকে স্বয়ং তথায় আসিবার জন্য পত্র লিখেন। ফার্ণাণ্ডেজের নিজ লিখিত বিবরণী হইতে আমরা এই প্রসঙ্গে জানিতে পারি: 'অক্টোবর মাসে ফাদার ডোমিনিক আমাকে লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে রাজার সহিত একটা বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্য আমার চাঁদেকান যাওয়া আবশ্যক, কারণ রাজার (মত) পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তাহাই করিলাম। যখন রাজা জানিলেন যে আমি পৌছিয়াছি, তিনি তাঁহার একজন প্রধান ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার আগমনে তিনি অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। পরদিন ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন এবং নিজ পরিত্রাণ (*Salut*) সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন।'[১] প্রতাপাদিত্য কি ভাবে এই সকল নবাগত বৈদেশিক মিশনরীগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি একজন স্বাধীন রাজার মত কি ভাবে রাজ্য-মধ্যবর্ত্তী সকল বিষয়ের সন্ধান লইতেন এবং সবদিকে দৃষ্টি রাখিতেন, এই ঘটনা হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ফার্ণাণ্ডেজের ব্যবহারে ও বাক্য-কৌশলে তুষ্ট হইয়া তিনি রাজ্যমধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য আজ্ঞাপত্র প্রদান করেন।[২] অনতিবিলম্বে

১ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কৃত অনুবাদ, 'প্রবাসী', ১৩২৮, আষাঢ়, ৩২২ পৃ।

২ 'Fernandez himself went to Chandican in October, 1599, and got

ফার্ণাণ্ডেজ যশোহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে শ্রীপুরে ও পরে ডিয়াঙ্গাতে পৌঁছেন এবং ফাদার ফন্‌সেকাকে আবশ্যক কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য বাক্‌লার পথে যশোহরে পাঠাইয়া দেন।

ডু জারিকের বিবরণী হইতেই জানা যায়, বাক্‌লা, শ্রীপুর ও যশোহর তখনকার প্রধান তিনটি হিন্দুরাজ্য। চাকরী, বাণিজ্য প্রভৃতি নানা কার্য্য-ব্যপদেশে এই তিন স্থানেই বহু পর্টুগীজ ও অন্যান্য খৃষ্টানগণ আসিয়া বাস করিতেছিল। তাহারা কোন কোন সময়ে দুইচারি বর্ষের মধ্যে মিশনরীর মুখ দেখিত না বা ধর্ম্ম উপাসনার কোন সুযোগ পাইত না। ফাদার ফন্‌সেকা বাক্‌লায় পৌঁছিলে উহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইল, রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। তখন বালক রামচন্দ্র বাক্‌লার রাজা, তাহার বয়স মাত্র ৮।৯ বৎসর। তবুও তাহার বয়সের অতিরিক্ত বুদ্ধি, রাজোচিত গাম্ভীর্য্য ও সৌজন্য দেখিয়া জেসুইট পাদরী একান্ত মুগ্ধ হইলেন। রাজসভায় ফন্‌সেকা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। প্রতাপাদিত্যের কন্যার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাব তখন সকলের জানা ছিল। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় যাইবেন?' তখন ফন্‌সেকা উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার ভাবী শ্বশুরের রাজ্যে যাইব। আশা করি, আপনি আমাকে এই রাজ্যমধ্যে গীর্জ্জা নির্ম্মাণ ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনুমতি দিবেন।' রামচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, 'ইহা আমারও অভিপ্রেত, কারণ আমি আপনাদের অনেক সদ্গুণের বার্ত্তা শুনিয়াছি।' তখনই পাদরীকে যথারীতি আজ্ঞাপত্র প্রদান করা হইল। উহার সঙ্গে দুইজন লোকের আহারাদির ব্যবস্থাসহ রাজ্য মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার অনুমতিও থাকিল।[১] ফন্‌সেকা তখন বাক্‌লা হইতে নদীপথে দুইধারে মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, ২০শে নভেম্বর তারিখে ধূমঘাটে পৌঁছিলেন।

সেখানে তিনি ফাদার সোসাকে দেখিতে পাইয়া পরম সুখী হইলেন। স্থানীয় পর্টুগীজেরা তাঁহাকে খুব অভ্যর্থনা করিল। পরদিন তিনি প্রতাপাদিত্যের বারদুয়ারী দরবারে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বেরিঙ্গান জাতীয় একপ্রকার কমলা লেবু উপহার দিলেন। এগুলি অতি সুন্দর এবং এদেশে পাওয়া যায় না।

---

letters-patent from the king authorising him to carry on the mission.'—Beveridge, *Bakarganj*, p. 174.

১ Beveridge, *Bakarganj*, p. 31.

রাজা পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমাদরে গ্রহণ করিলেন। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইচ্ছামতীর কূলে পর্টুগীজদিগের পল্লী ছিল, সেখানে এখনও মৃত্তিকার নিম্নে বহু সংখ্যক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। ফন্‌সেকা ঐ স্থানে একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে ফন্‌সেকা গোয়াতে পাইমেণ্টার নিকট যে পত্র লিখেন তাহা হইতে আমরা পাই: 'তিনি আমাদিগকে এত মান্য করিলেন যে, আমাদিগকে দেখিবামাত্র নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া মাথা নত করিলেন। ইহার কারণ এই যে, এদেশের লোকেরা ব্রহ্মচর্য্যকে (chastetė) অত্যন্ত ভক্তি করে এবং ইনি, আমরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করি শুনিয়া, আমাদের সম্বন্ধে অতি উচ্চ মত পোষণ করিয়াছেন। আমাদের বাসার কাছে একটা বড় জায়গা আছে। আমরা রাজার কাছে সেটি চাহিলাম, কারণ যাহাদিগকে আমরা খৃষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস করাইলে, তাহাদিগকে অতি সহজে সাহায্য করিতে ও ধর্ম্মপথে রাখিতে পারিব। তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এ সম্বন্ধে একখান ফর্ম্মাণ শীঘ্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, ঐ বাড়ীতে যে সব হিন্দু (অর্থাৎ নূতন খৃষ্টানেরা) বাস করিবে, তাহারা যে কর দিত, তাহা আমাদিগকে দিবে।'[১]

এই সনন্দ পাইবামাত্র গীর্জ্জা নির্ম্মাণের কার্য্যারম্ভ হইল। রাজানুগ্রহ লাভ করিলে রাজ্যমধ্যে অর্থ-সংগ্রহ বা কার্য্য-সাধনের ব্যাঘাত হয় না; বিশেষতঃ বহু পর্টুগীজ তখন সৈন্যদলে ও নানা বিভাগে চাকরী করিতেছিল। তাহারা সানন্দে প্রচুর অর্থ আনিয়া দিল; স্বকীয় ধর্ম্মের জন্য সকল জাতিই উন্মুক্তহস্ত হইয়া থাকে। রাজাও যথেষ্ট মালপত্র দিয়া সাহায্য করিলেন। পাদরীগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় অতি দ্রুতভাবে কার্য্য চালাইয়া প্রায় একমাস কাল মধ্যে গীর্জ্জা প্রস্তুত করা হইল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষভাগে ফন্‌সেকা যশোহরে আসেন। সেই বৎসর ডিসেম্বর মধ্যেই গীর্জ্জার কার্য্য শেষ হয়। ফন্‌সেকার পত্রেই আছে:

'বঙ্গদেশে জেসুইটদিগের সর্ব্বপ্রথম গীর্জ্জা এইখানে প্রস্তুত হয় এবং ইহাকে

১ 'প্রবাসী', ১৩২৮, আষাঢ়, ৩২২ পৃ (অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অনুবাদ)। [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—শি মি]

যীশুর গীর্জ্জা নাম দেওয়া হইল। পোর্টুগীজদিগের সাহায্যে এই গীর্জ্জা খুব জাঁকজমক সহকারে সাজান হইল এবং ১লা জানুয়ারীতে খুব ধুমধামের সহিত উপাসনা করা হইল। চারিদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল।.........

'এই গীর্জ্জা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজা সভাসদের এক প্রকাণ্ড দল লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জ্জার সাজসজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। খুব ভক্তির সহিত গীর্জ্জা-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং যখন প্রধান চ্যাপেলটির নিকট আসিলেন, তখন জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জন্য একখানা চেয়ার আগে হইতে প্রস্তুত রাখা ছিল, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাঁহাকে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি, কার্পেটেও নহে। তিনি শুধু সিঁড়ির উপর একখানা ছোট মাদুরে বসিলেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। গীর্জ্জার বেদীর উপর যে সব দুর্ল্লভ দ্রব্য ছিল, এবং অন্যান্য জিনিষ যাহা দেখিলেন, তাহা সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিলেন, যাহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে।'[১]

কিন্তু সে পাথরের গীর্জ্জা আর প্রস্তুত হয় নাই। তবে অল্প সময় মধ্যে যে ইষ্টক-রচিত গীর্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও খুব সুন্দর ছিল বলিয়া জানা যায়। উহার গঠন-কৌশল অপেক্ষা সাজসজ্জার পারিপাট্য যে বেশী ছিল, তাহা মিশনরীদিগের কথা হইতে বুঝা যায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী গীর্জ্জা খোলা হইল, সে দিন প্রতাপাদিত্য দেখিয়া গেলেন। 'পরদিন রাজপুত্র[২] গীর্জ্জার সাজসজ্জা দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যত হিন্দু, ছোট হউক বড় হউক, গীর্জ্জা দেখিয়া গেল, কারণ ইহার জাঁকজমকের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হইত। পনের দিনের বেশী ধরিয়া এইরূপ হইতে লাগিল।'[৩] সে সুন্দর গীর্জ্জা আর নাই। বর্ত্তমান ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যুধিষ্ঠির সর্দ্দারের ভিট্টা বাড়ীর পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি এক্ষণে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। লোকে সে জঙ্গল কাটিতে চায় না, কাটিতে গিয়া কে নাকি

১ Du Jarrics, *Historie &c*, p. 832-34 (অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অনুবাদ)।

২ এই রাজপুত্র যে উদয়াদিত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৩ অধ্যাপক যদুনাথের অনুবাদ, 'প্রবাসী', ১৩২৮, আষাঢ়, ৩২৩ পৃ।

নির্ব্বংশ হইয়াছিল। ভয়ে কেহ নিকটে বাস করিতেও চায় না। গীর্জ্জার সংলগ্ন প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রাঙ্গণ ও সমাধিস্থান ছিল। ঐ সমাধি-ক্ষেত্র সে সময়ে ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। ইহারই নিকটে পর্ট্‌গীজদিগের ব্যাণ্ডেল বা পল্লী ছিল। সমাধি-স্থানে অন্ততঃ ৪০টি ইষ্টকরচিত কবরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি কবর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। গীর্জ্জার কাছে কোরমাণ সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। উহার মধ্যেও পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ গোর ও মনুষ্যাস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।[১] মুসলমানের কবর উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ হইবার নিয়ম আছে, খৃষ্টানের তেমন কিছু নিয়ম নাই। সুতরাং কবরগুলি যে খৃষ্টানের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একজন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী সহৃদয় লেখক এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহাই উল্লেখ করিতেছি :

'The graves which I examined are lined with brick and it was explained to me that the skeletons when exhumed were noticed not to conform with Moslem custom, in as much as they did not lie north and south. This means that those buried here were not adherents of the Musalman faith, and it therefore follows that they must have been Christians. It might be urged that perhaps they are the resting place of those killed in battle and deposited in the earth at random. This argument is, however, not convincing, as it is improbable that they would have been interned in brick-lined graves. Such being the case, Iswaripur is not only of interest to the Hindus for Shrine to Kali, and to the Moslems for the well-prepared Tenga Masjid, but it is hallowed with sacred memories for Christians in general and Catholics in particular, as *the site of the first Church created in Bengal.*'[২]

---

১ ঈশ্বরীপুরে ডাক্তার নিরঞ্জভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয় নিজ গৃহে এই অস্থি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিয়াছি। সে অস্থি যে মনুষ্যাস্থি তাহাতে সন্দেহ নাই।

২ P. Leo Faulkner, District Superintendent of Police, Khulna, wrote in an article headed, '*Where Pratapaditya Reigned*' in the Calcutta Review, 1920. pp. 186-7.

বাস্তবিক ইহাই বঙ্গদেশে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সর্ব্বপ্রথম গীর্জ্জা।[১] কেহ কেহ বলেন ইহা জেস্যুইট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম গীর্জ্জা হইতে পারে, তদ্দ্বারা যে তখন বঙ্গদেশে অন্য গীর্জ্জা ছিল না তাহা বুঝায় না। সে গীর্জ্জা হুগলীর নিকট থাকিবার সম্ভব, কারণ জেস্যুইট মিশনরীগণ ব্যাণ্ডেলে আসিয়া তথায় খৃষ্টানদিগের একটি প্রধান আড্ডা দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন কোন উপাসনা-গৃহ তথায় থাকিতে পারে; কিন্তু যে ইষ্টক-রচিত বিহার ও গীর্জ্জা ব্যাণ্ডেলকে এখনও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব দর্শনীয় স্থান করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয় নাই। ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা এখনও অভগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে এবং তাম্রফলকে প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রদর্শন করিয়া জানাইয়া দিতেছে যে, উহাও যশোহর-গীর্জ্জার মত একই বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।[২] এক্ষণে প্রশ্ন এই, যশোহরের গীর্জ্জা যখন ডিসেম্বর মাসে নির্ম্মিত হয়, তখন কোন্‌টি অগ্রে কোন্‌টি পরে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? তদুত্তরে বলা যায়, যশোহরের গীর্জ্জা প্রথম গীর্জ্জা বলিয়াই উহা যীশুখৃষ্টের পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত হয়, এবং উহা যে প্রথম, তাহা ডু জারিক স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন।[৩] সুতরাং এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রাচীন যশোহর যে কেবল হিন্দুর পীঠস্থান, মুসলমানের মস্‌জিদের জন্যই

১ 'From the work of Pierre du Jarric, who was also a Jesuit, we learn that Ciandeca was the first Church in Bengal, Chittagong the second and Bandel the third.'—Beveridge, *Bakarganj*, p. 33.

২ ব্যাণ্ডেল সম্বন্ধে Mr. Campos লিখিয়াছেন: 'It is the oldest Christian convent and Church in Bengal being founded in 1599, the year when Monoel Tavares, in virtue of a *farman* from Akbar, established the great Portuguese Settlement in Hoogly.'—*Portuguese in Bengal*, p. 228; Manrique, *Itinerario* (in Bengal, Past and Present, 1916, vol. XII, p. 290). এখন ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জার পশ্চিম তোরণে তাম্রফলকে লেখা আছে, 'Founded, 1599' এবং বিহারের পশ্চিম গেটের উপর প্রস্তরফলকে বড় বড় পুরাতন অক্ষরে '1599' লিখিত আছে। চট্টগ্রামে ডিয়াঙ্গায় যে গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয়, তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল (বর্ত্তমান খণ্ড, ১৭৮ পৃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। তিনটি গীর্জ্জাই যে একই বৎসরে গঠিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

৩ 'The (Bandel) Convent was dedicated to the Augustinian Saint, St. Nicholas of Tolentino, and the attached Church to our Lady of Rosary.' —Campos, pp. 288-9.

বিখ্যাত তাহা নহে; ইহা খৃষ্টানদিগেরও এতদ্দেশীয় আদি ধর্ম্মপীঠ বলিয়া চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে।

সে পবিত্র পীঠের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য কি কেহ নাই? যে স্থানটিতে প্রাচীন গীর্জ্জার ভগ্নাবশেষ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেখানে কোন গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করা হউক বা না হউক, স্থানটি অবিলম্বে কোন স্তম্ভফলক দ্বারা চিহ্নিত ও স্মরণীয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন কীর্ত্তি-রক্ষণবিভাগের দৃষ্টি কি এদিকে পড়িবে না? এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার জন্য স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের যে সহানুভূতি নাই, তাহা নহে; তবে খৃষ্টানদিগেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কার্য্য করা উচিত। অনেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা মিশনরী খুল্‌নায় থাকেন, তাঁহারা এবং বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি আরও অনেকে ঈশ্বরীপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন; অক্লান্ত-কর্ম্মী বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয় সকল পরিদর্শকেরই দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করিতে কখনও বিরত হন না। তাঁহারা কেহ কেহ একবার সামান্য উদ্যোগ করিলেই অনায়াসে প্রস্তাবিত প্রস্তর-ফলক রক্ষা করিতে পারেন। ফক্‌নার সাহেব আমাদের সহিত একমত হইয়া এই গীর্জ্জা সম্বন্ধে যে সুমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। কলিকাতার সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ জেসুইট ধর্ম্মযাজক ফাদার হোষ্টেন (Rev. H. Hosten, S. J.) এই জাতীয় ঐতিহাসিক লুপ্ত রত্নের সমুদ্ধারকল্পে যে অক্লান্ত শ্রম করিতেছেন, ব্যাণ্ডেলের প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কারের জন্য[১] যেরূপ একাগ্র চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সুধীসমাজে সুপরিচিত। তিনিই পুরোহিতের মত অগ্রণী হইয়া ঈশ্বরীপুর দর্শন করতঃ গীর্জ্জার স্থান নির্দ্দেশ ও স্মারকস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া পাদরীরা যশোহরে পরম সুখে বাস করিতেছিলেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। গীর্জ্জা নির্ম্মাণের পর প্রায় দুই বৎসর কাল এইরূপ সদ্ভাব ছিল। ১৬০০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারীর প্রথমভাগে গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠার দিনে উহা যেমন করিয়া সাজান হইয়াছিল, পর বৎসর (১৬০১) ঠিক ঐ তিথিতে পুনরায় ঐরূপ একটি বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজাজ্ঞায় যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং

১ **Hosten, H.—'A *Week at the Bandel Convent, Hugli*', in Bengal Past and Present, 1915, pp. 36-120.**

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সম্ভবতঃ সংগ্রামাদিত্য [১]) একত্র হইয়া উৎসব-দিনে গীর্জ্জা দেখিতে আসিয়াছিলেন। পাদরীদিগের পত্রে আছে, 'রাজা নিজে অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ সঙ্গে লইয়া এটি দর্শন করিলেন এবং সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া, পাথরের গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমাদিগকে যে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহা দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ফলতঃ রাজা পাদরীদের প্রতি এত স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে কোন প্রার্থনা পূরণে তাঁহার অতিমাত্র সুখ হইবে, এরূপ বোধ হইতে লাগিল।'[২] পাদরীরা জানাইলেন, একজন পর্টুগীজের একখানি জালিয়া নৌকা দেনার জন্য এক ব্যক্তি আটক করিয়াছিলেন। রাজার আদেশে তাহা মালিককে প্রত্যর্পিত হইল। এমন কি একজন হিন্দু রাজার নিকট বহু টাকার জন্য ঋণী ছিল, সে গিয়া পাদরী-দিগকে ধরিল এবং তাঁহাদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া দেনা হইতে অব্যাহতি পাইল। এ সব ঘটনা হইতে বিশেষ সদ্ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যশোহরে জেসুইটদিগের উপাসনা ও প্রচারকার্য্য সুন্দরভাবে চলিতেছিল। এমন সময়ে সন্দ্বীপ লইয়া এক ভীষণ গোলযোগ বাধিল এবং তাহার ফলে যশোহরের গীর্জ্জা গেল এবং পাদরীদিগকেও দেশান্তরিত হইতে হইল। সে কথা আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত করিতেছি।

১ উদয়াদিত্যের দুইটি সহোদর, অনন্ত রায় ও সংগ্রাম রায়। এই দুইজনের কেহ জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হন। (১১৪-১৫ পৃ দ্রষ্টব্য)

২ অধ্যাপক সরকারের অনুবাদ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

কার্ভালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম

চট্টগ্রাম ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যস্থানে সন্দ্বীপ একটি প্রধান স্থান। উহার অবস্থান, সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৭৭-৭৮ পৃ) ডু-জারিকের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, 'এই দ্বীপ কেদার রায় নামক একজন বঙ্গাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সে অধিকার ছিল না, কারণ মোগলেরা বলপূর্ব্বক উহা দখল করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি জানিলেন যে, পর্টুগীজেরা উহা দখল করিল, (সে কথা পরে বলিতেছি), তিনি উহা একান্ত ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাহাদিগকে দিলেন এবং ঐ দ্বীপে তাঁহার যে কোন স্বত্ব থাকিতে পারিত, তাহা সমস্তই পর্টুগীজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।'[১] মোগলেরা সন্দ্বীপ হস্তগত করিবার পরও কেদার রায় দাবি ছাড়েন নাই। কার্ভালো তখন তাঁহার অধীন সেনাপতি, প্রধানতঃ নাববিভাগের জনৈক অধ্যক্ষ। সন্দ্বীপ দখল করিয়া তথায় পর্টুগীজদিগের বাসভূমি নির্দ্দেশ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে এই জাতির প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির অনেক পথ খুলিবে, কার্ভালো তাহা বুঝিতেন। এইজন্য তিনি ১৬০২

১ এই অংশ মূল old French ভাষায় এইরূপ আছে : 'Ceste Isle appartenoit de droiet a un des Roys de Bengala, qu'on appelle Cadaray : mais il y auoit plusieurs annees qu'il n'en joussoit pas a cause que les Mogores s'en estoient emparez par force. Or quand it sceut que les Portugais s'en estoient saisis, comme nous dirons bien tost, it la leur donna de fort bonne volunte renoncant en leur faveur a tous les droiets qu il y pouuoit pretendre.'—Du. Jarric, *Histoire* & part IV. p. 848. Campos, *Portuguese in Bengal*, p. 68, *note* ; নিখিলনাথের 'প্রতাপাদিত্য' ৪২৩ পৃ। নিখিলনাথের উদ্ধৃত অংশে বহুসংখ্যক বর্ণাশুদ্ধি আছে এবং তাহার অনুবাদ মূলানুগত হয় নাই। Mr. Campos লিখিয়াছেন, 'The passage referring to Kedar Rai has been mistranslated by (Babu) Nikhil Nath Ray in his প্রতাপাদিত্য'। পরে আরও কয়েক স্থানে এইরূপ ভুল হইয়াছে। উপরোক্ত ফরাসী অংশের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ এই : This island belonged by right to a king of Bengal, who was called Cadaray : but for several years he could not enjoy it, because the Moguls took by force. But when he *knew* that the Portuguese had seized it as we shall tell you shortly, he gave it to them *with great willingness* giving up in their favour all the rights which he could maintain in the island.

খৃষ্টাব্দে সুযোগ মত কেদার রায়ের অসংখ্য রণতরীর সাহায্যে ঐ দ্বীপ আক্রমণ করিয়া দখল করিলেন। যখন কেদার রায় উহা জানিতে পারিলেন,[১] তখন কার্ভালোর প্রার্থনামত স্বচ্ছন্দচিত্তে ঐ দ্বীপের শাসনভার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কার্ভালো দ্বীপটি দখল করিয়া বসিবামাত্র কেদার রায়ের সহিত একপ্রকার সম্বন্ধ রহিত করিলেনই; পরন্তু স্থানীয় প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। দ্বীপবাসী মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তখন কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট সাহায্য চাহিতে না গিয়া, চট্টগ্রামের পর্টুগীজ-দিগের নিকট হইতে সাহায্য চাহিলেন। তত্রত্য পর্টুগীজ সেনাপতি ম্যানোয়েল ডি মাটোস্ (Manoel de Mattos) ৪০০ সৈন্য লইয়া কার্ভালোর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া উভয়ে একযোগে সন্দ্বীপের মালিক হইয়া বসিলেন। এই কথা শুনিয়া মোগলেরা কেদার রায়ের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ তাঁহারা ভাবিলেন কেদার রায় ভিন্ন এমন দুঃসাহসিক কার্য্য কেহ করিতে পারে না। কার্ভালোর বীরত্ব-খ্যাতি তখনও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। সুতরাং মোগল পক্ষ হইতে কেদার রায়ের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

এদিকে পর্টুগীজেরা অনেকদিন হইতেই আরাকানী মগ ও বাঙ্গলার ভুঞা-দিগের অধীন হইয়া বাস করিবার কালে, স্বাধীনভাবে দস্যুবৃত্তির পথ পাইতেছিল না। তাহারা সন্দ্বীপ অধিকার করিবার পর হইতে চারিদিকে অত্যাচার আরম্ভ করিল। এই সময়ে তাহারা নানা নদীপথে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণভাগে

১ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কেদার রায় স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়া সন্দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন ('কেদার রায়', ৪০-৪১ পৃ)। সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কার্ভালো কেদারের রণতরীর সাহায্যে সন্দ্বীপ দখল করিয়াছিলেন, ঐ সংবাদ পাইয়া কেদার রায় সম্ভবতঃ পুরস্কার স্বরূপই সন্দ্বীপের শাসনভার কার্ভালোকে অর্পণ করেন। মূল বিবরণীতে 'জানিবার' (sceut) কথা আছে, তিনি উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধজয় করিলে 'জানিবার' কথা থাকিত না। Purchas, *Pilgrimes*, Part IV, Book V, p. 575 হইতে পাই: 'The Mogols with the conquest of Bengala had possessed Sundiva. Cadarai still continuing his title, *under colour whereof*, Carvalius and Manes, two Portugals, conquered it in 1602.' এখানেও কেদার রায়ের স্বত্বরক্ষার ছলে কার্ভালো প্রভৃতি সন্দ্বীপ দখল করেন, ইহাই আছে।

আসিতে লাগিল এবং সুন্দরবনের মধ্যে যেখানে লোকের বসতি পাইত, সেখানেই লুটপাট করিয়া ঘোর উৎপাত করিত। তাহাদের অত্যাচারের প্রণালী আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। সন্দীপ অঞ্চল হইতে প্রতাপের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হরিণঘাটার মোহানা পথে বলেশ্বর নদে এবং পরবর্ত্তী মর্জ্জালের মোহানা দিয়া শিবসা নদীতে আসিতে হইত। ডু-জারিক প্রভৃতি ঐতিহাসিক পর্টুগীজদিগের সহিত রাজাদের যে সকল বড় যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই কতক আভাস দিয়াছেন, কিন্তু নদীপথে দস্যুদিগের সহিত প্রতাপের রণতরী সমূহের যে অবিরত কত যুদ্ধ হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই। শুনা যায় মর্জ্জালের মধ্যে তিনি পর্টুগীজদিগকে এক প্রকার সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে শিবসার মোহানায় কালীর খালের কূলে প্রকাণ্ড শিবসা দুর্গ নির্ম্মিত হয় ; আমরা উহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি (১৯৮-৯ পৃ)। পর্টুগীজদিগের অত্যাচারের সংবাদে শুধু প্রতাপ নহেন, শ্রীপুরের অধীশ্বর কেদার রায় এবং আরাকানরাজ মানরাজগিরি[১] (পর্টুগীজদের ভাষায় Xilimxa বা সেলিম শা) একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আরাকানরাজই সর্ব্বপ্রথমে পর্টুগীজদিগকে আশ্রয় দেন, উহারা তাঁহার আশ্রিত বা বাধ্য ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা তাঁহার রাজ্যের উপরই অধিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। শুধু তাহাই নহে, উত্তরে চট্টগ্রাম ও দক্ষিণে পেগু অঞ্চলে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ফিরিঙ্গিরা বড়ই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টা করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে বীরবর মানরাজই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। তিনি এই জন্য জালিয়া, কার্ত্তুস[২] প্রভৃতি

১ 'In 1599 A. D. the King of Burma sent two ambassadors with presents to Manrajagiri, King of Arakan, requesting his aid against the king of Pegu.'—Chittagong Hill Tracts Gazetteer (R. H. Sneyd Hutchinson), 1909, p. 28. তাঁহার প্রকৃত নাম মানরাজগিরি, উহাই অপভ্রংশে 'মেংরাজগি' হইতে পারে। বাদশাহ সেলিম শাহ বা জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি গর্ব্বভরে সেলিম শা উপাধি ধারণ করিতে পারেন, ইহা বিচিত্র নহে। কারণ পর্টুগীজদিগের পরাজয়ের পর পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার অসীম ক্ষমতা হইয়াছিল। তখন কেদার রায় নির্জ্জিত বা নিহত এবং প্রতাপাদিত্যের পতনাবস্থা আসিয়াছিল।—নিখিলনাথ, ৬০ পৃ টীকা।

২ কাতুর বা কার্ত্তুস্ একপ্রকার ৪০।৫০ হাত দীর্ঘ যুদ্ধতরণী, উহা দাঁড়দ্বারা বাহিত হইয়া জল-যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ ইহার সহিত ইংরাজী কাটার cutter শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে।

নানা জাতীয় ১৫০খানি যুদ্ধজাহাজ কামানাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মগরাজের সহিত কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। সন্দীপ মোগলদিগের অধীন ফতেহাবাদ সরকার ভুক্ত ছিল বলিয়া, কেদারের সাহায্যে কার্ভালো কর্ত্তৃক সে স্থান অধিকার করিবার কালে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই। দ্বীপ অধিকার করিয়া যখন কার্ভালো স্বতন্ত্রভাবে চারিধারে উৎপাত করিতে লাগিয়া একটি তৃতীয় পক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেশের শান্তিরক্ষার জন্য ভুঞাদিগের সহিত মগরাজার পূর্ব্বসন্ধি অক্ষুন্ন থাকিল। আরাকাণের অধিপতি সাহায্য চাহিবামাত্র কেদার রায় তাঁহার জন্য একশত খানি কোশা নৌকা সজ্জিত করিয়া শ্রীপুর হইতে প্রেরণ করিলেন।[১] এ সময়ে

১ 'Kedar Rai also joind the king of Arakan and sent hundred Cosses from Sripure to help him in the attack.'—Campos, p. 69. ডু-জারিকের মূলগ্রন্থে ফরাসী ভাষায় এইস্থলের বর্ণনা আছে : 'It auoit aussi du coste de Siripur cent casses, qui sont d'autres vaisseaux de ce pays la, que le Cadaray luy fournissoit. Car ils s'estoiet tous deux liguez pour cet effet : de maniere qu'en tout il y auoit quelqnes deux cent cinquante voiles.'—'প্রতাপাদিত্য', মূল ৪২৫ পৃ, এই স্থানটির অনেকগুলি কথা শুদ্ধভাবে মুদ্রিত হয় নাই। যথাযথ অনুবাদ করিলে এইরূপ হয় : He had also on the coast (side) of Sripure one hundred cose (কোশা নৌকা) which are other vessel of that country furnished him by Cadaray (কেদার রায়). Because they both formed leagues for that purpose : so that in all there were some 250 ships. এখানে He বলিতে যে আরাকাণরাজকে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্ভালোর নাম আগে, পরে, নিকটেও নাই। তবুও নিখিলনাথ এইস্থানে অনুবাদ ভুল করিয়া কেদার রায় কার্ভালোকে একশত কোশা নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, এইরূপ লিখিলেন কেন, বুঝিয়া পাইলাম না (৬১ পৃ, মূল ৪৫১ পৃ)। তিনি যে স্থলে এই কথা বলিতেছেন, তাহারই নিম্নে পার্কার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে নিম্নলিখিত স্থান উদ্ধৃত করা হইয়াছে : 'Hereat the King of Arakan was angry, that without his leave they had made themselvs Lords of that which is challenged to belong to his protection, Fearing that by this means and the fortification of Sirium he should finde Portugals unneighbourly neighbours. He sent therefore a fleet of a hundred and fiftie frigates or little galleys with fifteene oares on a side and other greater furnished with ordanance and Cadry (which they say was true

প্রতাপাদিত্য কোন সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন কিনা তাহার উল্লেখ নাই; তবে তাঁহার রাজ্য একটু দূরবর্ত্তী বলিয়া তিনি কোন সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেও তাহা আসিবার পূর্ব্বে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়া গেল। আরাকাণী বহর অগ্রসর হইলে, ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে ডিয়াঙ্গার সন্নিকটে এক জল-যুদ্ধ হইল। তাহাতে মাটোস্ আহত হইলেন এবং আরাকাণীরা জয় লাভ করিয়া কয়েকখানি শত্রুর জাহাজ ধরিয়া লইয়া গিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। ইহাই প্রথম যুদ্ধ।

দুইদিন পরে কার্ভালো কতকগুলি জালিয়া, পশ্‌তা, কার্ত্তুস প্রভৃতি যুদ্ধ-জাহাজ সহ মাটোসের সহিত মিলিত হইয়া, অকস্মাৎ প্রবল বেগে আরাকাণী-দিগকে আক্রমণ করিলেন। সন্দ্বীপের নিকট সমুদ্রের জল রক্তাক্ত করিয়া যে ভীষণ যুদ্ধ হইল, তাহাতে অবশেষে পর্টুগীজেরা জয় লাভ করিল। বহু মগ বীর নিহত হইল, তন্মধ্যে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা সিনাবাদী অন্যতম। তিনি মানরাজের পিতৃব্য। ফিরিঙ্গিদিগের ভয়ে মগেরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন আরাকাণরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া নিজরাজ্যবাসী পর্টুগীজ স্ত্রীপুরুষের উপর নির্ম্মম শাস্তি বিধান করিলেন। তাঁহার প্রতিহিংসায় চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইল। মগ-ফিরিঙ্গির এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে হইয়াছিল।

এতদিন জেস্যুইট পাদরীগণের প্রচার কার্য্য সুন্দরভাবে চলিতেছিল। এই গণ্ডগোলে তাঁহারা এবার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফাদার ফার্ণাণ্ডেজ যশোহর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডিয়াঙ্গাতে ছিলেন এবং তথায় জেস্যুইটদিগের একটি গীর্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত দ্বিতীয় যুদ্ধের পর আরাকাণীদিগের অত্যাচারকালে, তিনি কয়েকটি বিপন্ন বালক বালিকার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে বিষমভাবে প্রহৃত হন এবং একটি চক্ষু হারাইলেন। উহারই ৩।৪ দিন পরে, ১৪ই নভেম্বর তারিখে কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হইল। লোকসেবা-রত পুণ্যাত্মা ধর্ম্মযাজক অকালে দস্যু হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।

lord of it) sent a hundred Cosse from Siripur to help him.'—Purchas, *Pilgrimes*, IV, Book V. p. 515. নিখিলনাথের এই ভুল যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('কেদার রায়', ৪৪ পৃ) ও Dr. Radha Kumood Mukhopadhaya (*Indian Shipping*, p. 216) উভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবিকল নকল করিয়াছেন।

তাঁহার সহচর ফাদার বাউয়েসও কণ্ঠপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পাদরীগণের সাঙ্গপাঙ্গ কতক সন্দ্বীপে ও কতক শ্রীপুর, বাকলা ও যশোহরে পলাইয়া গেল।

আরাকাণ-রাজ পুনরায় প্রায় সহস্রখানি রণতরী সংগ্রহ করিয়া ভীমবেগে সন্দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। মহাবীর কার্ভালো ১৬ খানি মাত্র জাহাজ লইয়া সমগ্র আরাকাণী বহর ধ্বংস করিয়া দিলেন। রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের সেনাপতিদিগকে স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া অপমানিত করিলেন।[১] কিন্তু পর্টুগীজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে কি হয়, তাহাদের জাহাজগুলি ক্ষতবিক্ষত ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। কার্ভালো দেখিলেন, সে জাহাজ লইয়া মগদিগের পুনরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না, কিন্তু তিনি যাইবেন কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভু কেদার রায় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, গত যুদ্ধে তিনি আরাকাণের পক্ষেই সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন কিনা সন্দেহ। তবুও শ্রীপুর অতি নিকটে, এবং সেখানে জাহাজগুলি মেরামত করিবার সুযোগ হইতে পারে, এই আশায় তিনি শ্রীপুরেই আসিলেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কার্ভালো দ্বীপ পরিত্যাগ করা মাত্র দলে দলে ফিরিঙ্গি ও অন্যান্য খৃষ্টান্‌ অধিবাসীরা সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া বাক্‌লা, শ্রীপুর ও যশোহর প্রভৃতি নানা স্থানে আশ্রয় লইতে চলিল এবং আরাকাণীরা আসিয়া দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। এই সময়ে ফাদার নূনেস্‌ (Father Blasio Nunes) ও আরও তিনজন পাদরী সন্দ্বীপে একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও যশোহরে আসিলেন ; কারণ ঐ স্থানে ভিন্ন অন্য সকল স্থানে তাঁহাদের আবাস বিনষ্ট হইয়াছিল।[২] প্রতাপাদিত্য এখন পর্য্যন্তও ফিরিঙ্গি পাদরীদিগের প্রতি কোন অত্যাচর করেন নাই।

১ Du Jarric, *Histoire*, part IV, p. 860.

২ 'The Portuguese with the native converts of the place, therefore, evacuated Sandwip and transported all their possessions to Sripur, Bakla and Chandecan, whereupon the king of Arakan at last become master of it. Carvalho *curiously enough* stayed with thirty frigates in Sripur which was the seat of Keder Rai. The Jesuit father Blasio Nunes and three others, who had begun building a Church and a residence in Sandwip,

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেদার রায়ের সেনানী কার্ভালো কর্ত্তৃক সন্দীপ অধিকারের সংবাদ বঙ্গের রাজধানী রাজমহলে পৌছিলে, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের আয়োজন হইতেছিল। মানসিংহ তখন শুধু কেদার রায় নহেন প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধেও সৈন্য-চালনার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু আপাততঃ সন্দীপ উপলক্ষ্য করিয়া অনতিবিলম্বে শ্রীপুর আক্রমণ না করিলে, ভুঞাগণ সম্মিলিত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় শীঘ্র মন্দা রায়কে একশত কোশা নৌকা বা রণতরী লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলেন। সন্দীপ ছাড়িয়া আসিয়া কার্ভালো যখন ত্রিশখানি জীর্ণ তরী সংস্কারের জন্য শ্রীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই মন্দা রায় আক্রমণ করিলেন। কেদার রায় উপস্থিত স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য কার্ভালোর অযাচিত সহায়তা পরিত্যাগ করা সমীচীন বোধ করিলেন না। তাঁহার যুদ্ধ-তরণী সমূহ কার্ভালোর সহিত যোগ দিল। শ্রীপুরের পথে কালীগঙ্গার মধ্যে মন্দা রায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মন্দা রায়ও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। 'কার্ভালো প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের জাহাজশ্রেণী ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য শমন-সদনে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মন্দা রায়ও নিহত হন, তিনি গোলাদ্বারা আহত হইয়া জাহাজ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। কার্ভালোও একটি তীর বিদ্ধ হইয়া আহত হন। কয়েক দিবস পরে আরোগ্য লাভ করিয়া কার্ভালো শ্রীপুর হইতে গোলি বা গুলু [হুগলী] নামক পর্টুগীজ দিগের উপনিবেশে গমন করেন।'[১]

এক্ষণে প্রশ্ন এই, কেদার রায় যে কার্ভালো দ্বারা এত উপকৃত হইলেন, তাঁহাকে তিনি সাহায্য দিলেন না কেন? সাহায্য পাইলে বা পাইবার আশা থাকিলে কি কার্ভালো অনিশ্চিত সাহায্যের প্রত্যাশায় হুগলীর মত দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতেন? তখনও তাঁহার জীর্ণ তরণীগুলির সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হয়

abandoned their new ventures and repaired to their residence at Chandecan which was the only one left to them, all the others having been destroyed.' —Campos, *Portuguese in Bengal*, pp. 71-2. কেদার রায়ের সহিত কার্ভালোর কোন সম্ভাব ছিল না বলিয়াই তাঁহার শ্রীপুরে আসা আশ্চর্য্যের বিষয়। এই জন্যই 'curiously enough' লেখা হইয়াছে।

১ নিখিলনাথ রায় কৃত ডু-জারিকের গ্রন্থের অনুবাদ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৪৫৫ পৃ।

নাই। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, কেদার রায় প্রকাশ্যভাবে কার্ভালোকে আশ্রয় দিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে আরাকাণরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে না। তখনও উভয় পক্ষের সন্ধি অব্যাহত ছিল। তবে মোগলেরা উভয়েরই সাধারণ শত্রু, এজন্য মোগলের আক্রমণ-কালে কেদার, তাঁহার পূর্ব্বতন ভৃত্য কার্ভালো স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে যে সাহায্য করিতেছিলেন, তাহা গ্রহণ না করিয়া পারেন না। বিশেষতঃ সন্দীপের স্বত্ব লইয়া যখন মোগলের সহিত বিবাদ, সে সন্দীপের সমস্ত স্বত্ব যখন কার্ভালোকে সমর্পিত হইয়াছিল, তখন মোগলশত্রুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে কার্ভালো ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর আবার কেদার রায় তাঁহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রহিলেন। কারণ মোগলেরা এবার পরাজিত হইয়া ছাড়িবে না, অচিরে পুনরাক্রমণ করিবে; সে অবস্থায় কার্ভালোকে আরও অধিক দিন আশ্রয় দিয়া, বাড়ীর নিকটবর্ত্তী সন্দীপাধিপতি মগ-রাজের সহিত শত্রুতা করা কোন ক্রমে বুদ্ধিসঙ্গত নহে। তাই কার্ভালো হুগলী গেলেন, সেখানেও সাহায্য মিলিবে কি না স্থিরতা ছিল না।

হুগলীতে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানেই পর্টুগীজদিগের উপনিবেশ। ব্যাণ্ডেল এখনও একটি প্রধান স্থান। সেখানে যাইতে হইলে হুগলীর নিকট দিয়া যাইতে হয়। তথায় মোগলের একটি নবগঠিত ক্ষুদ্র দুর্গ ও ৪০০ সৈন্য ছিল। ফিরিঙ্গি বা দেশীয় খৃষ্টান্‌গণ নদীপথে যাইবারকালে এই মোগল সৈন্যেরা তাহাদের উপর অগণিত অত্যাচার করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে নূতন এক প্রকার শুল্ক আদায় করিয়া লইত। কার্ভালো ৩০ খানি জালিয়া জাহাজ লইয়া গঙ্গাপথে যাইবার সময় মোগলেরা দুর্গস্থিত কামান হইতে তাহাদের উপর অনল বর্ষণ করিত লাগিল। অবশেষে কার্ভালো অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ৮০ জন সৈন্যসহ জলে ঝাপাইয়া তীরে উঠিলেন এবং দুর্গ আক্রমণ করিয়া সমস্ত মোগলসৈন্য শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন, কেবল একজন মাত্র লোক কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। এ সময়ে কার্ভালোর বীরত্ব-খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার নাম শুনিলে লোক ভয়ে আতঙ্কিত হইত।

এই ঘটনার পর, কার্ভালো হুগলীতে বা ব্যাণ্ডেলে গিয়া কি করিলেন, কিছুই জানা যায় না। এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে যশোহরে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ব্যাণ্ডেলে তখন পর্টুগীজ

ও দেশীয় খৃষ্টানে পাঁচ হাজার লোক ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে পারে এমন যথেষ্ট সৈন্য বা জাহাজাদি বা প্রচুর যুদ্ধোপকরণ ছিল না। সুতরাং সেখানকার সাহায্যবলে সন্দীপ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, এমন কল্পনা কার্ভালোর হইল না। এমন সময়ে যশোহরের নিমন্ত্রণ আসিল, নিরাশ্রয় উপায়ান্তর-বিহীন কার্ভালো তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে ভাগ্যে যাহাই থাকুক। আশানুরূপ কোন সুযোগ জুটিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাই তিনি যশোহরে আসিলেন।

ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যার প্রস্তাবিত বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দিতেছি। সেখানে আমরা দেখাইব, কি ভাবে রামচন্দ্র শ্বশুরের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কি ভাবে তাঁহার উপর শত্রুতা সাধন করিবেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। আরাকানের সহিত বাক্‌লারই প্রথম সন্ধি হয়, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় সেই সন্ধিতে যোগ দেন। ডু-জারিক হইতে জানিতে পারি যে, 'মগরাজা সোনদ্বীপ অধিকার করিবার পর বাক্‌লা রাজ্যের কিছু দখল করিয়া চাঁদেকান রাজ্য [যশোহর] জয় করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।'[১] সম্ভবতঃ আরাকাণরাজ কর্ত্তৃক বাক্‌লার সমুদ্রকূলবর্ত্তী কোন স্থান অধিকৃত হইবার পর, রামচন্দ্র পুনরায় তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাহাকে যশোহররাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উদ্রিক্ত করেন। নতুবা নিকটবর্ত্তী শ্রীপুরের উপর কোন আক্রমণের কথা উঠিল না, বাক্‌লারও বেশী কিছু দখল করা হইল না, শুধু চাঁদেকানের উপর আক্রোশ পড়িল কেন? সন্দীপের যুদ্ধে কেদার রায়ের মত প্রতাপাদিত্য কোন সাহায্য পাঠান নাই বলিয়াই কি এই আক্রোশ?

প্রতাপাদিত্যের এই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। তিনি মোগলের বিপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন; মানসিংহ সমর-বাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেদার রায় আত্মরক্ষায় মহাব্যস্ত; তাঁহার নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই।

১ অধ্যাপক সরকারের অনুবাদ, 'প্রবাসী', ১৩২৮, আষাঢ়, ৩২৩-৪ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র. শি মি]

জামাতা রামচন্দ্র, তিনিও শত্রুরূপে পরিণত। এমন সময়ে বাকলার সাহায্য-বলে বলী হইয়া, যদি সন্দীপ-বিজয়ী মগরাজ দক্ষিণ দিক হইতে প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করেন, তবে রাজ্যরক্ষার উপায় কি? একদিকে মানরাজ ও অন্যদিকে মানসিংহ, উভয়ই দিগ্বিজয়ী মহাশত্রু, প্রতাপের মানরক্ষার উপায় কি? মোগলের সহিত সন্ধি হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে স্বাধীনতার ঘোষণা ও আত্মমর্য্যাদা—সকল গৌরব, সকল আশা—একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হয়। তাহা কিছুতেই হইবে না। আবার আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অধিকাংশ নৌবহর দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলে, উত্তর দিকের আক্রমণ নিবারণ করা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বতন মিত্র আরাকাণরাজের সহিত সন্ধি করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। সন্দীপ রক্ষা করাই মগরাজের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাহার প্রধান ভয় কার্ভালো হইতে। সে কার্ভালোকে কোন প্রকারে হস্তগত এবং অন্ততঃ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে, আরাকাণের সহিত সন্ধি হইতে পারে। নতুবা সন্ধির প্রস্তাবও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর নিতান্তই যদি আরাকাণরাজ আক্রমণ করিয়া বসেন, তাহা হইলেও কার্ভালো হাতে থাকিলে একটা গত্যন্তর হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই বিপদ-সঙ্কুল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, প্রতাপাদিত্য ন্যায়ান্যায় বিচারের অবসরমাত্র না পাইয়া কার্ভালোকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল, ডু-জারিকের বিবরণীর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

'চাঁদেকানের রাজা (অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য) দেখিলেন যে এত প্রবল শত্রুকে তিনি একলা বাধা দিতে পারিবেন না, এবং তজ্জন্য কুটিল নীতিদ্বারা নিজ বন্ধুদিগকে (অর্থাৎ পোর্ত্তুগীজ) ধ্বংস করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার পথ বাহির করিলেন। তিনি জানিতেন যে, আরাকানের রাজা কার্ভালোর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিনি (অর্থাৎ প্রতাপ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং কার্ভালোকে বন্দী করিয়া তাহার মস্তক পাঠাইয়া মগ রাজাকে তুষ্ট করা এবং এই উপায়ে নিজ রাজ্য রক্ষা করিবার ফন্দি করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ভালোর নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, তাঁহার নিকট আসিয়া মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিলে, তিনি তাহার অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন।

'কার্ভালো চাঁদেকানের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিল যে, এইরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিলে, কৃতজ্ঞ রাজা তাহাকে সৈন্যবল দিয়া সোনদ্বীপ উদ্ধারে

সহায়তা করিবেন। তিনখান রণসজ্জায় পূর্ণ বড় জাহাজ, ছয়খান কাটার এবং পঞ্চাশখান জালিয়া ও একদল সাহসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া সে চাঁদেকানে আসিল।

'রাজা তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া, একটা জরীর পোষাক ও বহুমূল্য ঘোড়া উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনদিনের মধ্যে মগরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য আবশ্যক সব (দ্রব্য, সৈন্য ও নৌকা) দিবেন। কিন্তু ১৫ দিন পর্য্যন্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে মগরাজের সহিত সন্ধি করিলেন যে, কার্ভালোর মাথা পাঠাইয়া দিবেন আর মগরাজ চাঁদেকান আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন।

'অপর পোর্ত্তুগীজগণ, বিশেষতঃ পাদরীগণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া কার্ভালোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিল, যেখান হইতে সে রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা রাজার সহিত কথা চালাইতে পারিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল জনরব উঠিল যে রাজা কার্ভালোকে হত্যা করিবেন। কিন্তু কার্ভালো এরূপ করিতে সম্মত না হইয়া, নিজের কয়েকজন কাপ্তেনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজাকে দেখিবার জন্য [যশোরে] গেল। তথায় তিন দিন পর্য্যন্ত রাজদর্শনের উপায় হইল না এবং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল। তিন দিন পরে রাজার চক্রান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ভালোকে কয়েকজন পোর্ত্তুগীজসহ রাজবাড়ীতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে শেষ দরজা দিয়া ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী লোকদিগকে বাহিরে রাখা হইল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অপমানের সহিত তাহাদিগকে ঘুঁষি মারিয়া, পায়ে লোহার বেড়ী পরান হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ভালোকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইল; সঙ্গে রাজার একজন সেনানী ও ৪ জন রক্ষী সৈন্য। তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে কার্ভালো ও অপর কয়েকজন পোর্ত্তুগীজকে লইয়া চলিয়া গেল। এই বন্দিগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে কি কি (অত্যাচার ও যন্ত্রণা) সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কতদিন বন্দিভাবে কাটাইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। (৮৬৩-৬৪ পৃ)।

'তাহার পর চাঁদেকানের অপর পোর্ত্তুগীজগণ এই সংবাদ পাইয়া কি

প্রতীকার করিবে স্থির করিতে পারিল না ; ভাবিল রাজা কার্ভালোর উপর চটিয়া আছেন, আমরা ত নির্দ্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না। কিন্তু স্থানীয় পোর্ত্তুগীজ উপনিবেশের (সাধারণ নাম বান্দেল অর্থাৎ বন্দর) [অর্থাৎ ধূমঘাটস্থ গীর্জ্জার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান] নিকটবাসী মুসলমানগণ ফিরিঙ্গিগণের মহাশত্রু ছিল ; তাহারা ঐ সংবাদ আসিবার রাত্রেই পোর্ত্তুগীজদিগের বাড়ী ও সম্পত্তি লুট ও দগ্ধ করিতে লাগিল। ....পরদিন রাজা কার্ভালো ও অন্যান্য পোর্ত্তুগীজদিগের জাহাজগুলি অধিকার করিলেন, এবং তাহাদিগকে কারাগারে ফেলিলেন, সেখানে তাহারা অশেষ দারিদ্র্য ও কষ্ট ভোগ করিল ; তাহাদিগকে ধরিবার পরই দু'জনের মাথা কাটিয়া ফেলা হইল এবং আর দুজনকে বর্শার আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল।

'ফাদারদিগকে বন্দী করা হইল না বটে, কিন্তু তাঁহারাও কষ্ট ভোগ করিলেন। রাজা সন্দেহ করিলেন যে, কন্‌ফেশনের সময় তাঁহারা বন্দী পোর্ত্তুগীজদিগকে গোপনে উপদেশ দিতেন যে, তাহারা যেন রাজাকে তাহাদের স্বাধীনতার মূল্য (ransom) না দেয়। এজন্য গুপ্তধন ও অস্ত্র অন্বেষণ করিতে আসিয়া, পাদরীদের বাড়ী উলট্‌পালট্ করা হইল। অবশেষে রাজা রাগে বলিলেন যে, পাদরীরা সকলে (তখন চাঁদেকানে ৪ জন ফাদার ছিলেন) তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাউক এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ যেন সেখানে না আসে।

'এইরূপে একমাস কাটিল। অবশেষে বন্দী পোর্ত্তুগীজগণ তিন সহস্র পার্দো (এগার হাজার টাকা) দণ্ড দিয়া খালাস পাইল। ফাদারেরা একেবারে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া চীন-জাপানে গেলেন, এবং এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রায় লোপ পাইল।' (৮৬৫-৬ পৃ)'[১]

এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম গীর্জ্জা ও পর্টুগীজ দিগের আবাস গৃহ সকল অগ্নিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়া ভূমিসাৎ করা হয়। সেই অবস্থায় উহাদের কতক ভগ্নাবশেষ এখনও আছে, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ডু-জারিকের বিবরণী হইতে দেখা গেল, কার্ভালো প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক বন্দী ও অপমানিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা কতদিন কারাগারে ছিলেন, 'তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদিগকে হত্যা

১ [অধ্যাপক সরকারের অনুবাদ, 'প্রবাসী', আষাঢ়, ৩২৪-৫ পৃ—পরিশিষ্ট দ্র. শি মি]

করা হয়।' ইহা পাদরীদিগের অনুমান মাত্র। বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিস্তার পাইয়াছিল, বা পলাইয়া গিয়াছিল কিনা অথবা সকলেই নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছিল কিনা, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। বিশেষতঃ অচিরে যখন পাদরীদিগকেও দেশত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তখন কার্ভালো বা তাঁহার সঙ্গীদিগের শেষ দশা সম্বন্ধে তাঁহারা কোন সাক্ষ্যই দিতে পারেন না। সুতরাং কার্ভালোর হত্যা সম্বন্ধে তাহাদের অস্পষ্ট অনুমান কখনও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পাবি না। বিশেষতঃ যখন এগার হাজার টাকা দণ্ড দিয়া পর্টুগীজ বন্দীরা খালাস পাইল দেখিতেছি, তখন সেই মুক্তি-প্রাপ্ত পর্টুগীজ দলে যে কার্ভালো ছিলেন না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? প্রতাপাদিত্য নৃশংস বা রক্তপিপাসু হইতে পারেন; তাঁহার চরিত্রের সে অভিযোগ হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতে চাহি না। সেই বিষম সঙ্কটময় যুগে বিদ্রোহী রাজন্যগণের মধ্যে কে-ই বা তেমন অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন? তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র স্বজাতীয় সমধর্ম্মী বীরেন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিয়া নিজের বাটীতে কেমন করিয়া তাঁহাকে নৃশংসের মত হত্যা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু তবুও যদি প্রতাপাদিত্য কার্ভালোকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের রাজধানীতে খুন করিয়া থাকেন, সে খুনের যতই রাজনৈতিক কারণ থাকুক, তজ্জন্য প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের কলঙ্ক নিশ্চয়ই দুরপনেয়। তিনি যে শেষ জীবনে হতমান হইয়া বন্দী ও পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় অশেষ কষ্টভোগ করিয়া ছিলেন, সে কষ্ট যদি তাঁহার পিতৃব্য-হত্যা বা এই জাতীয় আশ্রিতের হত্যার প্রায়শ্চিত্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।[১] তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৎকর্ত্তৃক কার্ভালোর হত্যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যের খাতিরে আমরা তাঁহাকে দোষী করিতে পারি না। যে ক্ষেত্রে দেশীয় প্রবাদ বা জনশ্রুতি এ বিষয়ে নানা মত পোষণ করে, সেখানে কার্ভালোর

১ 'Carvalho, the gallant captain of the Portuguese was at Chandican and the King of Chndican who was then at Jasor sent for Carvalho and had him murdered to ingratiate himself with the King of Arracan'. —Beveridge, *Bakarganj*, p. 178.

'Not long after, Raja Pratapaditya a cruel monster as Beveridge calls him expiated his crimes in an iron cage in which he died.' —Campos, *Portuguese in India*, p. 73.

স্বজাতীয় লেখকের অনর্থক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতাপাদিত্যের উপর নরহত্যার অপরাধ আরোপ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

আরও কথা আছে। ঐতিহাসিক জগতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহোদয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধিৎসা সর্ব্বত্র একবাক্যে প্রশংসিত। তিনি ফ্রান্স হইতে 'বহারিস্তান' নামক যে সমসাময়িক ঘটনা সম্বলিত হস্তলিখিত পারসীক পুঁথির সমস্ত পৃষ্ঠাগুলির আলোক-চিত্র হইতে অবিকল প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি প্রতাপ-চরিত্রের এই অপবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন : 'বহারিস্তানের পুঁথির ১৬৮খ পৃষ্ঠা স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে এই অপবাদ মিথ্যা। ঐ স্থলে লেখা আছে যে, ইস্‌লাম্ খাঁ প্রতাপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাশিম খাঁর সুবাদারীর প্রায় শেষাংশে[১] মুঘলেরা যখন চাঁটগাঁয়ের মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভুলুয়া হইতে অগ্রসর হয়, তখন ঐ মগরাজা সমস্ত ফিরিঙ্গিদিগকে বন্দী ও হত করিতে চেষ্টা করেন এবং কাপ্তান ডোর-মশ কার্ভালোর অধীনে ফিরিঙ্গিগণ মগপক্ষ ত্যাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডোরমশ শব্দকে ডো-আমো পড়া যাইতে পারে, ইহা (ডোমিঙ্গ) Portuguese, Domingos শব্দের ফার্সী অপভ্রংশ।'[২] আমরা যে কার্ভালোর কথা বলিতেছি, তাহারও নাম ডোমিঙ্গ। সুতরাং এক নামে দুই কার্ভালো না থাকিলে, এবং দুইজনই উচ্চপদস্থ বা কাপ্তান জাতীয় না হইলে ঐতিহাসিকের এই নূতন তথ্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কাজেই কার্ভালোকে যে প্রতাপাদিত্য হত্যা করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

এতক্ষণ আমরা বৈদেশিক গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে তাহার স্বজাতীয় ফিরিঙ্গি সৈন্য, তাহাদের দলপতি এবং এমন কি, পাদরীগণের উপর প্রতাপাদিত্য কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, প্রতাপের সৈন্যদলে, গোলন্দাজ ও নৌ-বিভাগে অনেক পর্টুগীজ জাতীয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্নেহ এবং অনুগ্রহের অংশভাগী হইয়াছিলেন, এবং এই অত্যাচারের সময়ে তাঁহাদের উপর প্রতাপ

১ ইস্‌লাম্ খাঁ ১৬০৮ হইতে ১৬১৩ পর্য্যন্ত এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ ১৬১৩ হইতে ১৬১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গে সুবাদারী করেন।

২ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক ৭-৮ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র. শি মি]

কিছুমাত্র বিরূপ হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। পাদরীগণও যখন প্রথম আগমন করেন, তখন প্রতাপ ও তাঁহার পুত্রগণ পরম সমাদরে তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সর্ব্ববিধ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া তাহাদের দ্বারা গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এমন কি তদপেক্ষাও সুন্দর পাথরের গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করাইবার জন্য পাদরীগণকে প্রণোদিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন এমন সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তখন হঠাৎ একমাত্র আরাকাণের আক্রমণ ভয়ে, তাঁহার মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল, প্রকৃতি উল্টাইয়া গেল, তিনি অতিরিক্ত ভাবে উদ্রিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এই সকল আশ্রিত বৈদেশিকের উপর অমানুষিক ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইহা কি সম্ভবপর? এমন করিয়া কি মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হয়, স্বাভাবিক উদারতা ভাসিয়া যায়? কখনই নহে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা হইয়াছিল। তাহা কি?

ফিরিঙ্গি দস্যুদলের অত্যাচার কাহিনী আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রতাপকে অবিরত বিব্রত থাকিতে হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল ঘটনা বা সকল খণ্ডযুদ্ধের কোন ধারাবাহিক বিবরণ দিবার পন্থা নাই। তবে এই দস্যুদলের উৎপাতে যশোহরবাসী বণিকগণ এবং সাধারণ প্রজাকুল যে সর্ব্বদা নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহা সত্য কথা। এইজন্য রাজা এই ব্যাপারে প্রজামণ্ডলীর সাহায্য পাইতেন; সম্ভবতঃ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কয়েকটি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে দস্যুদলের অত্যাচারের চিত্র জ্বলন্ত ভাষায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাদ হইতে লিখিয়া গিয়াছেন: 'যে সময়ে দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে বৈর-নির্য্যাতন স্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল, সেই সময় কার্ভাল্‌হো নামক একজন পর্টুগীজ জল-দস্যু-নায়ক চট্টগ্রাম (?) হইতে পলায়ন করিয়া যশোহর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধ বশবর্ত্তী যশোহর নগরের প্রজা সাধারণ সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে পথিমধ্যে নিহত করে; ইহার মৃত্যু সংবাদ ধূমঘাটস্থিত মহারাজের নিকট রাত্রিকালে নীত হয়।'[১] ইহা যদি সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে হয়ত হুগলী হইতে ধূমঘাট যাইবার পথে, প্রাচীন যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে কোথায়ও কার্ভালোর হত্যা সাধিত

---

১ 'প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত', ৯৩-৯৪ পৃ।

হয়।[১] তাহা হইলে দেখা যায়, যদিই যশোহরে কার্ভালোর হত্যা হইয়া থাকে, তাহা প্রতাপ কর্ত্তৃক হয় নাই, তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্য কর্ত্তৃক হইয়াছিল। হয়ত ঐ জন্য ফিরিঙ্গি নৌ-সেনার সহিত দেশীয় লোকের ঘোর সংঘর্ষ হয় এবং তাহার ফলে প্রতিহিংসা পরায়ণ ফিরিঙ্গিরা রাজধানী উপকণ্ঠে প্রজাবর্গের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে; তাহাতেই উদ্রিক্ত হইয়া প্রতাপ ফিরিঙ্গিদিগকে বন্দী করেন ও পাদরীদিগকে দেশান্তরিত করেন। তবে তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া যে-দুর্ব্বৃত্ত কার্ভালো বা তাহার সঙ্গিগণের হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তিনি তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই হত্যাকারী কে? প্রবাদ হইতে তাহাও জানা যায়। তাহার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ নাই, তবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সহিত কতটুকু সংশ্রব তাহাই বিচার্য্য হইতে পারে। আমরা সকল ঘটনা বিশ্বাস না করিলেও, সমসাময়িক দেশীয় ইতিহাসের অভাবে প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে ছিন্নভিন্নভাবে কার্ভালো সম্বন্ধে যে গল্প শুনিতে পাই, তাহা এস্থলে বাদ দিতে পারি না। সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার পাঠকবর্গ গ্রহণ করিবেন।

আমরা প্রথম খণ্ডে (৩য় সং ৪৩৬ পৃ) বিবৃত করিয়াছি যে, লাউজানির প্রসিদ্ধ মুকুট রায়ের এক পুত্র ছিলেন কামদেব। তিনি শিশুকালে গাজী সাহেবের অত্যাচারে মুসলমান হইয়া যান এবং পিতৃবংশের পতনের পর নিজে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে চারঘাট নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি সেই প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনীয় রমণীয় স্থানে মুসলমান ফকিরের বেশে, চিরকুমার হিন্দু সন্ন্যাসীর মত বাস করিয়া সঙ্গোপনে সাধন ভজন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল ঠাকুরবর। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ না থাকিলেও ধর্ম্মপ্রাণতা ও নির্ম্মল চরিত্রের গুণে যোগনিরত সাধুর মত সর্ব্বজাতীয় লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চারঘাটে এখনও তাঁহার দরগা ও সমাধিস্থান আছে।[২] তথায় নিত্য সকালে

১ 'Du Jarric adds that the news of Carvalho's murder at Jasor reached Chandican on the following midnight, which may give us some idea about the distance of the two places.'—Beveridge, p. 178. এ কথা ঠিক নহে। কোন দুর্ব্বৃত্ত অপরাধী কর্ত্তৃক হত্যা সাধিত হইলে সে সংবাদ প্রথমতঃ বহুক্ষণ গুপ্ত রাখিবারই চেষ্টা হয়। তাহাতে ১০।১২ মাইল দূরেও সংবাদ যাইতে দীর্ঘ সময় লাগিতে পারে।

২ এই মস্‌জিদটি ছোট হইলেও সুন্দর, উহার ভিতরের পরিমাণ ১৯'-৩"×১৯'; একটিমাত্র

মুসলমান সেবায়ৎ কর্ত্তৃক পুষ্প-বিল্বপত্রে সংক্ষেপে তাহার পূজা হয়। এই ঠাকুরবর সাহেব প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক এবং উদার-হৃদয় নৃপতির মত তিনিও হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমে অবস্থিত চারঘাট একটি প্রসিদ্ধ মোহানা, যশোর-রাজ্যের উত্তরদিকের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। সেখানে প্রতাপকে সময় সময় আসিতে হইত; কথিত হয়, ঠাকুরবরও কখনও কখনও ধূমঘাটে যাইতেন।

হ'রে শুড়ি বা হরি শৌণ্ডিক নামক এক ব্যক্তি এই ঠাকুরবর সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। হরির পূর্ব্বনিবাস কাচদহে, সে অতি দরিদ্র এবং বাল্যকালেই পীর সাহেবের কৃপালাভ করিয়া যৌবনে ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করে। ঐশ্বর্য্যের ফল যাহা হয়, হরি শৌণ্ডিক ধনশালী বণিক হইয়া অতিরিক্ত গর্ব্বিত হয় এবং পরে পীরের সহিত বিবাদ করিতে গিয়া তাঁহার অভিশাপেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখনও গোবরডাঙ্গার নিকট যমুনার অপরপারে, মাঠের মধ্য দিয়া "হ'রে শুঁড়ির রাস্তা" নামক একটি প্রশস্ত পথের চিহ্ন আছে; লোকে এখনও উহা চিনিতে পারে এবং আমাকে তাহা দেখাইয়া দিয়াছিল। ঐ রাস্তা 'গৌড়বঙ্গের' প্রাচীন রাস্তা হইতে বাহির হইয়া চারঘাটে যমুনার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং চারঘাটে যাইবার উহাই একমাত্র সদর রাস্তা এবং হ'রে শুঁড়ির কীর্ত্তি। 'গৌড়বঙ্গের রাস্তা'র কথা আমরা পরে বলিব। সেই পথ দিয়াই মানসিংহ আসিয়াছিলেন।

হ'রে শুঁড়ি বলিলে যাহা বুঝায়, হরি শৌণ্ডিক তাহা ছিলেন না; তিনি রীতিমত ধনশালী খ্যাতনামা বণিক। তাঁহার পণ্যভারাক্রান্ত ডিঙ্গা নানা দিগ্-দেশে প্রেরিত হইত। চারঘাটে মাটীর নিম্নে এক সময়ে তাম্রপাতযুক্ত প্রকাণ্ড নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল। হরির কয়েকখানি পণ্য-তরী কয়েকবার পর্টুগীজ দস্যুদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কার্ভালো নিজে বা তাহার দলভুক্ত অন্যে এই দস্যুতা করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। ইহার জন্য প্রতিহিংসা লইতে হরি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত; ধূমঘাটে রাজদরবারে বণিক বলিয়া তাহার কিছু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল; কার্ভালোকে যশোহরে আসিবার

গুম্বজ; চারি কোণে চারিটি মিনারেট এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে দুইটি দরজা আছে। দক্ষিণদিকে দরজার উপর একটি ইষ্টক-খচিত ক্ষুদ্র হস্তিমূর্ত্তি এখনও হিন্দু সংস্রব বুঝাইয়া দেয়। পূর্ব্বদিকের দরজার উপর দুইখানি আরবী ইষ্টক-লিপি আছে। উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই।

জন্য নিমন্ত্রণ করিতে যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার মূলে হরির কোন চেষ্টা ছিল কি না বলা যায় না। কার্ভালো যখন যমুনা পথে যশোহরে আসিতেছিলেন, তখন প্রাচীন রাজবাটীতে গুপ্তভাবে তাঁহাকে বা তাঁহার দলভুক্ত কয়েক জন কাপ্তেনকে হরি শৌণ্ডিকের লোকেরা হত্যা করিয়াছিল, ইহাই প্রবাদের সার মর্ম্ম। দুর্ব্বৃত্ত বণিক ন্যায়ান্যায় যাহাই করুক না কেন, তাহার আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বিচলিত হন, এবং স্বহস্তে তাহাকে নিধন করিয়া শাস্তিবিধান করেন। কথিত আছে, হরি ধনদৃপ্ত হইয়া ঠাকুরবরকে মানিত না বলিয়া, পীরসাহেব স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য উদ্রিক্ত করেন। ধীরভাবে বিচার করিয়াই হউক বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, প্রতাপ হরি শৌণ্ডিককে নিধন করিলে, তাহার পরিবারবর্গ রাজভয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। এখনও চারঘাটের উত্তর দিকে যমুনা হইতে বহির্গত চালুন্দিয়া নদীর মোহানার কাছে একটি গভীর স্থানকে লোকে "হরে' শুঁড়ির দহ" বলিয়া থাকে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্রের বিবাহ

বাক্‌লার অধীশ্বর ৺কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল; পুত্রকন্যা উভয়ে তখন নিতান্ত শিশু বলিয়া বিবাহ হয় নাই; এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬০২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে রাণী পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিয়া দিনস্থির করেন; কারণ, এসময়ে প্রতাপের কন্যা বিমলা বা বিন্দুমতীর[১] বয়স দ্বাদশ বর্ষ হইয়াছিল; সাধারণতঃ তদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি ছিল না। রামচন্দ্রেরও বয়স তখন ১৩।১৪ বৎসর মাত্র। রাণী বিধবা হওয়ার পর এই তাঁহার প্রথম আনন্দোৎসব; সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিনি যথেষ্ট ব্যয়ের আয়োজন করিলেন। মাধবপাশা হইতে যশোহর বহু দূরের পথ; নৌকা যান ব্যতীত যাতায়াতের অন্য পন্থা নাই। সুতরাং বিবাহ-যাত্রার জন্য বহুসংখ্যক নানা জাতীয় সুন্দর সুন্দর নৌকা সুসজ্জিত হইল; বরপাত্র ও তাঁহার সহযাত্রীদিগের জন্য ২।১ খানি মহলগিরি প্রভৃতি সুন্দর তরণী প্রস্তুত রহিল; আবশ্যক মত কয়েকখানি কামানযুক্ত সুদীর্ঘ কোশা নৌকাও সঙ্গে

১ ঘটকারিকায় প্রতাপের কন্যার নাম বিন্দুমতী বলিয়াই লিখিত হইয়াছে:

'যশোহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপযেমে নৃপোত্তমঃ॥'

তদনুসারে শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিলনাথ বিন্দুমতী নামই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের উভয়ের অনুবর্ত্তন করিয়া রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত 'বঙ্গের শেষবীর' নামক উপন্যাসে এবং ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে ও এই সম্পর্কিত আরও বহু পুস্তকে বিন্দুমতী নামই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবাদ-মুখে ও অনেক স্থলে এই নাম শুনিতে পাওয়া যায়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে'ও বিভা বা বিভাবতী নাম গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সতর্ক ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখক বাখরগঞ্জ-কীর্ত্তিপাশা-নিবাসী ৺রোহিনীকুমার সেন মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন: 'মাধবপাশার রাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় বলেন যে, রামচন্দ্রের পত্নীর নাম বিমলা। প্রতাপাদিত্য-প্রদত্ত যৌতুক-ভূমি তৎকন্যা বিমলার নামেই প্রদত্ত হইয়াছে।'—'বাকলা', ১৭১ পৃ। তদনুসারে তিনি স্বীয় পুস্তকে বিমলা নামই গ্রহণ করিয়াছেন। যৌতুক দিবার দানপত্রে যদি প্রকৃতই বিমলা নাম থাকে, তবে তাহাই গ্রাহ্য। আমরাও তাহাই করিলাম। বিমলার অন্য নাম বিন্দুমতীও থাকিতে পারে। আমরা পূর্ব্বে তাহাই ধরিয়াছি (১১১ পৃ)।

চলিল। অবশেষে অসংখ্য সামাজিক ও লোকলস্কর সঙ্গে লইয়া বাক্‌লার রাজপুত্র রামচন্দ্র মহাসমারোহে বিবাহার্থ যশোহর যাত্রা করিলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। রামমোহন মল্ল নামক একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ বীর রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষী সৈন্যবর্গের অধিনায়ক ছিলেন।[১] বর্ত্তমান উজিরপুরের সিংহ-রায়গণ এই রামমোহনের বংশধর।[২]

এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরও স্নেহের পুত্তলী কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ; তিনি এ সময়ে দূরবিস্তৃত সমৃদ্ধ রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা; তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের সমস্ত প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও মোগলের আক্রমণ ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক ও যুদ্ধার্থী থাকিতে হইত, তবুও তাঁহার জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত সময়ে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তিনি যশোহরে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ কোন বিবরিণী দিতে গেলেই তাহা কাল্পনিক না হইয়া পারে না। সুতরাং ঐতিহাসিককে শুধু আভাস মাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, দুইটি বিশিষ্ট ও কুলীন-প্রধান ভুঞা রাজপরিবারের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই বিবাহ উৎসব প্রকৃতই রাজোচিত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ঘটকদিগের বংশকারিকা হইতে জানিতে পারিয়াছি (২১১ পৃ), প্রতাপাদিত্য প্রথম যে কন্যার বিবাহ দেন, সে জামাতা কুলীন হইলেও রাজবংশীয় নহেন এবং তিনি উপগ্রহবৎ যশোহরেই বাস করিতেন। এবার প্রতাপ পরমকুলীন রাজা রামচন্দ্রকে বিনা পণে কন্যা সম্প্রদান করিবার অবসর পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। বহুদূর হইতে সমাগত উভয় পক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনায় এবং পান-ভোজনের বিপুল আয়োজনে সে আনন্দ ফুটিয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ বিবাহের পর বরপক্ষের সামাজিকগণ অধিকাংশই মর্য্যাদানুরূপ সম্মান লাভ করিয়া বাক্‌লায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; কেবলমাত্র রামমোহন প্রভৃতি সামন্ত শরীর-রক্ষী সৈন্য লইয়া কিছুকাল রামচন্দ্রের সহিত যশোহরে ছিলেন। এমন সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রামাই ঢুঙ্গী নামক একজন নরসুন্দর জাতীয় ভাঁড় রামচন্দ্রের বরযাত্রিদলের

---

১ 'মল্লকুলোদ্ভবো মল্লো রামনারায়ণঃ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবল-সমন্বিতঃ॥'—ঘটককারিকা

২ 'বাকলা', ২৯৪ পৃ।

সঙ্গে ছিল। ভাঁড়ামি তাহার ব্যবসায়; সে নানা ভঙ্গিতে রঙ্গরসে সকলকে মোহিত করিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইত।[১] বিবাহের আসরে সে অনেক ভাঁড়ামি করিয়া হাস্যরসের আমদানী করিয়াছিল; ভাঁড় বলিয়া অনেকে তাহার অনেক রঙ্গ সহ্য করিয়াছিল। অবশেষে সে মাত্রা ছাড়াইল। এক দিন সে শ্মশ্রুগুম্ফ কামাইয়া স্ত্রীবেশে অন্দর মহলে ঢুকিল এবং মহারাণীর সহিতও রসিকতা করিতে ছাড়িল না। হঠাৎ তাহার কোন রহস্যে মহারাণী দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করিলেন; অবশেষে যখন জানা গেল যে, সে ছদ্মবেশী পুরুষ লোক, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাত্রিকালে সেই ঘটনা প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর করিলেন। সুন্দরবনের সেই দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রতুল্য নরপতি মহারাণীর কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; হয়ত তিনি সে সময় অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট বা সুরাপানে অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, জামাতা রামচন্দ্র এ জন্য দোষী, তাই রুক্ষকণ্ঠে হুকুম দিলেন, রামচন্দ্র ও রামাই ভাঁড় উভয়েরই গর্দ্দান লইতে হইবে। কথাটা তখনই অন্দর মহলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; লোকে ভাবিল, রাজার হুকুম, ইহা নড়িবে না। মহারাণী ব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তিনি এত আশঙ্কা করেন নাই। এ সময়ে রামচন্দ্র শয়নঘরে ছিলেন, বালিকা বিমলা মায়ের নিকট হইতে সর্ব্বনাশের সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া স্বামীকে জানাইল। রামচন্দ্র অল্পবয়স্ক যুবক, তিনি প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতে তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্যের এমন ক্রোধ যে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া একটু পরে নিভিয়া যাইত এবং তাঁহার স্নেহার্দ্র হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিত, উদয়াদিত্য তাহা জানিতেন। কিন্তু রামচন্দ্রের তাহাতে প্রত্যয় হইল না। তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া অবশেষে যুবরাজ কৌশল করিয়া তাঁহার পলায়নের পথ সোজা করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র গোপনে সদলবলে নৌকায় উঠিলেন, এবং চৌষট্টি দাঁড়যুক্ত নিজ তরণীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে সেই রাত্রিতেই

১ রাজদরবারে বিদূষক রাখা এদেশীয় চিরন্তন প্রথা। আকবরের সভায় বীরবল এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের আস্পর্দ্ধার কথা সর্ব্বজনবিদিত। সেই ভাবে রামাই ভাঁড় কন্দর্পনারায়ণের সময় হইতে রাজসভায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল। বালক রামচন্দ্রকে সে কিছুমাত্র ভয় করিত না।

স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন।[১] তাঁহার সেই দ্রুতগামী কোশা নৌকাতে কামান সজ্জিত ছিল। যখন তাঁহারা নিরাপদে বাহিরে বড় নদীতে পড়িলেন, তখন কামানে অগ্নি সংযোগ করা হইল; তোপধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়া রাত্রিশেষে প্রতাপাদিত্য বুঝিলেন, রামচন্দ্র পলাইয়া গেলেন। তিনি তখনই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। সম্ভবতঃ তাঁহার সংবাদবাহক রামচন্দ্রের নৌকা ধরিতে পারে নাই, অথবা পারিলেও রামচন্দ্র শ্বশুরের ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিতে সম্মত হন নাই।[২]

ব্যাপারটা এই মাত্র। ইহার ফলে কিন্তু প্রতাপের স্কন্ধে কলঙ্কের ডালি চাপিয়াছে। অনেকেই মনে করেন, তিনি জামাতার হত্যা সাধন করিয়া তাঁহার

১ ঘটককারিকায় আছে (উহার ব্যাকরণদোষ অবশ্য উপেক্ষণীয়) :

'শ্রুত্বা সকল-সংবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।
চতুঃষষ্টিদণ্ডযুতা নৌরানীতা মহামতিঃ ॥
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতা।
তস্যারোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকায়ুধং ॥
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালীকধ্বনিভির্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শক্রপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ ॥'

এইরূপ চৌষট্টি দাঁড়ের সশস্ত্র সুন্দর রণতরী তখন বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইত। রামচন্দ্র ও তৎপুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ নৌযুদ্ধে বিখ্যাত ছিলেন।—*History of Indian Shipping*, pp. 217-8.

২ গল্পটিকে আরও জাঁকাল করিবার জন্য এরূপ কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের লোকেরা নদীমধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ফেলিয়া পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু রামমোহন মল্ল চৌষট্টি দাঁড়ের সেই প্রকাণ্ড নৌকা উহার উপর দিয়া টানিয়া পার করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপের লোকে যে কখন পথ বন্ধ করিবার সময় পাইল এবং কামানযুক্ত সুদীর্ঘ রণতরী মল্লবর কিরূপে টানিয়া পার করিয়া দিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার সাধ্য আমাদের নাই। কোন্ নদীতে পড়িয়া রামচন্দ্র তোপধ্বনি করিলেন, তাহাও তর্কস্থল হইয়াছে। ভৈরব-তীরবর্ত্তী আধুনিক যশোহর সহরকে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রণীত 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাসে লিখিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র ভৈরববক্ষ হইতে যে তোপধ্বনি করেন, তাহাতে প্রতাপের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু ধূমঘাট হইতে ভৈরবের দূরত্ব অন্ততঃ ৫০।৬০ মাইল হইবে। গত ২৫ বৎসরে উপন্যাসখানির বহু সংস্করণ পার হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সাধারণ ভ্রমটি সংশোধিত হয় নাই। ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়। উক্ত উপন্যাসে ভৈরবস্থলে যমুনা বা ইছামতী হওয়া উচিত।—'বৌঠাকুরাণীর হাট', ১১শ পরিচ্ছেদ, নূতন সংস্করণ, ৭৩ পৃ দ্রষ্টব্য।

রাজ্য বা সমাজাধিপত্য দখল করিবেন, ইহাই তাঁহার কল্পনা ছিল; রামাই ঢুঙ্গির ঢঙ্গটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, রামচন্দ্রকে খুন করার উদ্দেশ্য তাঁহার পূর্ব্ব হইতে মনে মনে ছিল। ইহার উত্তরে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক; প্রথমতঃ, হিন্দুর ছেলে প্রতাপ কি এতই রক্ত-পিপাসু পাষণ্ড ছিলেন যে, বিবাহান্তে বালিকা কন্যাকে বিধবা করিয়া জামাতা খুন করিতে উদ্যত হইবেন? দ্বিতীয়তঃ, সেই উদ্দেশ্যই যদি থাকিত, তবে ববযাত্রিগণ যশোহরে পৌছান মাত্র বিবাহের পূর্ব্বাহ্ণে রামচন্দ্রকে খুন করা তাঁহার পক্ষে কি অসম্ভব হইত? প্রতাপাদিত্যের কি একটু বুদ্ধি-কৌশলও ছিল না? তৃতীয়তঃ, সত্যসত্যই যদি তিনি রামচন্দ্রকে হত্যা করিবেন বলিয়া মনে ভাবিতেন, তবে কি রামচন্দ্র পলায়নের পন্থা পাইতেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহার হুকুম তামিল করিবার লোক কি পুরীর মধ্যে ছিল না? চতুর্থতঃ, কন্যার মঙ্গল, মাতা যেমন দেখেন, অন্যে তেমন দেখে না; মহারাণী রামাই ভাঁড়ের উপর অসন্তুষ্টা হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণও ছিল; জামাতার প্রতি তাঁহার আক্রোশ হইতে পারে না; প্রতাপাদিত্য রাক্ষস হইলেও মহারাণীর তেমন কোন অপবাদ ছিল না; সম্মুখে জামাতাব হত্যার উপক্রম হইলে, তিনি কি কোন প্রকার প্রবোধ বা কাতর প্রার্থনা দ্বারা তাহা রদ্ করিতে পারিতেন না? পঞ্চমতঃ, প্রতাপের সে সংকল্প যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভাবী আত্মীয়তার প্রত্যাশায় বাক্লা রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন না এবং প্রয়োজন হইলে কন্দর্পের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ববলে দেশ অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেন। যে ভাবেই আমরা দেখিতে চেষ্টা করি, প্রতাপাদিত্য একেবারে মূর্খ বা একান্ত দস্যু-প্রকৃতিক না হইলে জামাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইতেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দৈবদোষে হঠাৎ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া তিনি চরিত্র কলঙ্কিত ও জীবন ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। নতুবা যাঁহার দান-ধর্ম্মের শুভ্র যশোরাশি দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিল, পুত্র-প্রতিম জামাতার হত্যা সাধনের নারকীয় প্রবৃত্তি তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত হইতে পারে না।

ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্য রামাই ভাঁড়ের সঙ্গে রামচন্দ্রেরও হত্যার হুকুম চীৎকার করিয়া দিতে পারেন; এ কথা হয়ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মানসিক এই জাতীয় কোন সংকল্প জাগিয়াছিল বলিয়া

ধরিতে পারি না। অনেক পিতা ঘটনাচক্রে ক্রোধান্ধ হইয়া রুক্ষকণ্ঠে পুত্রের মৃত্যুর আজ্ঞা দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র থাকে এবং যাহারা সে হুকুমের ভাষা শুনে, তাহারাও সত্য বলিয়া উহা ধরিয়া লয় না। তাই মনে হয়, এইরূপ এক প্রকার রাগত ভাষায় প্রতাপ জামাতাকে হত্যা করিবার কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা মৌখিক ক্রোধের চিহ্ন মাত্র। সে শব্দে অন্দর মহল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও, প্রতাপাদিত্য নিজ আদেশ প্রতিপালিত হওয়াইবার জন্য আর কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। রাত্রিশেষে তিনি যখন কামানের শব্দে জানিলেন যে, রামচন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন, তখন তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন এবং নিশ্চয়ই নিজে অনুতপ্ত হইয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টায় কোন কাজ হয় নাই। তখন তিনি জামাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'যম জামাই ভাগিনেয় কখনও আপনার হয় না।'

অনেক সহৃদয় লেখক প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধীয় এই নারকীয় প্রবাদ সত্য বলিয়া ধরিতে পারেন নাই। রোহিণীকুমার লিখিয়া গিয়াছেন, 'বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপের ন্যায় চরিত্রে এই সকল কথা কতদূর সত্য জানি না। শত্রুপক্ষ হইতে প্রতাপের সম্মান খর্ব্ব করিবার জন্য হয়ত মিথ্যা রটনা মাত্র। তাঁহার এই লোকাতীত প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিঙ্মণ্ডল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাশি অবলোকন করিয়া ঈর্ষাপরবশ শত্রুগণ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ মানসে প্রতাপের নামে অনর্থক এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিমা ঢালিতে চেষ্টা করিয়াছিল।'[১] শুধু এই একজন লেখক নহেন, বহুজনে মনে করেন, বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রগণের ষড়যন্ত্রে প্রতাপের সহিত তাঁহার জামাতার বিবাদ সৃষ্টি করিবার জন্য, রামাই ভাঁড়কে প্ররোচিত করিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু ঘটনার এই কারণ আমরা মানিয়া লইতে পারি না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ইহার ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে বসন্ত রায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায় প্রতাপহস্তে নিহত হন। কচু রায় এ সময় আগ্রা বা রাজমহলে ছিলেন; চাঁদ রায় প্রভৃতি বসন্তের অন্য পুত্রগণ কোথায় কি ভাবে ছিলেন, ঠিক জানা

১ 'বাকলা', ১৭৩ পৃ।

যায় না। যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের কোন ষড়যন্ত্র করিবার সাহস বা সুযোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, রামচন্দ্র নিরাপদে মাধবপাশায় পৌঁছিয়া শ্বশুর বা পত্নীর সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত করিলেন; তিনি উঁহাদের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারিতেন না। শ্বশুরের প্রতি তাঁহার ক্রোধের কারণ ছিল; কিন্তু যে বালিকা স্ত্রী একান্ত পতিব্রতার মত হয়ত পিতার বিরাগভাজন হইয়াও, স্বামীর জীবন রক্ষার হেতু হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি বিরূপ হওয়া রামচন্দ্রের পক্ষে অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক ভিন্ন কিছু নহে। রামচন্দ্রের সে বার যশোহর-যাত্রাই কেমন অমঙ্গল-সূচক ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন মাধবপাশায় পৌঁছিলে নিরুদ্বেগ হইবেন, কিন্তু বিধির চক্রে নূতন বিপদ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে আরাকাণের রাজা হঠাৎ বাক্‌লা আক্রমণ করিয়া কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ডু-জারিকের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, 'আরাকাণ-রাজ পর্টুগীজদিগের হস্ত হইতে সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া গর্ব্বে আত্মহারা হইয়াছিলেন; এক্ষনে বঙ্গের অন্যান্য সকল রাজ্য দখল করিয়া লইবার মতলব করিয়া তিনি অকস্মাৎ বাক্‌লা রাজ্যের উপর পতিত হইলেন এবং অনায়াসে অধিকার করিয়া লইলেন, কারণ তথাকার রাজা তখন দেশে ছিলেন না এবং তিনি তখনও অল্পবয়স্ক।'[১] সম্ভবতঃ সন্দ্বীপের যুদ্ধকালে পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধি অনুসারে বাক্‌লা বা যশোহর হইতে কোনও সাহায্য না পাইয়া আরাকাণ-রাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বাক্‌লার সমুদ্রকূলবর্ত্তী কতকাংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন এবং প্রতাপের রাজ্যাক্রমণের উপক্রম করিতেছিলেন। এমন সময়ে রামচন্দ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে, সমুদ্র-সংলগ্ন কতকাংশ আরাকাণ-রাজকে দিয়া সন্ধি করা হয়, তখন হইতে ঐ সকল স্থানে মগেরা

১ Du-Jarric tells us : 'The King of Arracan was proud of having taken the island of Sundwip from the Portuguese ; and desiring now to pursue his design of conquering all the kingdoms of Bengal, he suddenly threw himself upon that of Bacola, of which he possessed himself without difficulty as the King of it was absent and still young.'—Beveridg e *Bakarganj*, p. 34.

'The King of Arracan having .....added Sundwiva and kingdome of Baccala intended to annex Chandecan to the rest of his conquest.'—Purchas, *Pilgrimes*, Pt. IV, Book V, p. 514 ; 'প্রতাপাদিত্য,' ৭০ পৃ।

আসিয়া বসতি আরম্ভ করে। বিশেষতঃ এবার রামচন্দ্র শ্বশুরের শত্রু হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য মগরাজকে উত্তেজিত করেন এবং সম্ভবতঃ এজন্য তাহাকে সাহায্য দিতে উদ্যোগী হন। এই সময়ে যশোহরে কার্ভালোর আগমন ও তাঁহার কারারোধ ঘটে, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্ম-রক্ষার জন্য প্রতাপাদিত্যকে কিরূপ কূটনীতির আশ্রয় লইতে হয়, তদ্ভিন্ন গত্যন্তর ছিল কি না, তাহা ঐ ঘটনা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। কূটনীতি কখনই ধর্ম্মানুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে সব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, রাজন্যবর্গের পক্ষে অবস্থাবিশেষে উহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

রামচন্দ্র বীরপুরুষ ছিলেন। ঘটকদিগের মুখে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা আর ধরে না। উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি প্রাপ্ত-বয়স্ক হন, তখন ভুলুয়াধিপতি দুর্দ্দান্ত লক্ষ্মণমাণিক্যকে স্ববলে ধরিয়া আনিয়া মাধবপাশায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। চিরকালই জানিতাম, বীরের মর্য্যাদা বীরপুরুষেই জানেন; কিন্তু রামচন্দ্র তাহা জানিতেন না। তাঁহার বীরত্বে কোন মার্জ্জিত উদারতার পরিচয় পাই নাই, নতুবা রাম লক্ষ্মণে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইলে, উভয়েরই রাজশক্তির গৌরব বাড়িত। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে নৃশংসের মত নিহত করিয়া স্বীয় কাপুরুষতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। এ ঘটনা পরে ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেও তাঁহার প্রতি প্রতাপাদিত্যের বিরক্তি বা অশ্রদ্ধার কারণ ছিল।

যশোহর হইতে পলায়ন করিয়া আসিবার পর, রামচন্দ্র বহুদিন মধ্যে বিবাহিতা পত্নীর কোন সংবাদ লন নাই এবং এমন কি, তাঁহার প্রেরিত পত্রবাহকের মুখেও কোন সংবাদ দেন নাই। অবশেষে বিমলা এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করিলেন। বিবাহের চারি পাঁচ বৎসর পরে তিনি স্বামি-সন্নিধানে যাইবার জন্য পিতার নিকট অভিলাষ জানাইলেন। প্রতাপাদিত্য জামাতার প্রতি বিরক্ত থাকিলেও কন্যার দুঃখে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ছিলেন। বিশেষতঃ এ সময়ে তাঁহার জীবনের বেলা শেষ হইয়া আসিতেছিল; পূর্ণ যুবতী রাজ-নন্দিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও তিনি ব্যথিত হইতেছিলেন। তিনি কন্যার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন; এমন কি, নিজেই উদ্যোগী হইয়া অপরিমিত ধন-রত্ন ও ভূমিবৃত্তি যৌতুকস্বরূপ দিয়া উপযুক্ত লোকজন ও সাজ-সরঞ্জাম সহ নৌকাযোগে কন্যাকে

পাঠাইয়া দিলেন।[১] উদ্বিগ্ন যশোহর-পুরী সাশ্রুনেত্রে সে দৃশ্য দেখিল। যদি রাজা রামচন্দ্র পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বা তাঁহার পিতার মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না ; এজন্য প্রকাশ্যে সকলকে জানান হইল যে, রাজপুত্রী কাশী যাত্রা করিলেন। বাস্তবিকই যদি তিনি এবার স্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত না হইতেন, তাহা হইলে যশোহরে ফিরিয়া না আসিয়া কাশী যাইতে পারেন, এমন সমস্ত ব্যবস্থা স্থির ছিল।

যথাসময়ে রাজপুত্রীর তরণীসমূহ মাধবপাশার সন্নিকটে আসিয়া পৌছিল। বিমলার আশা ছিল, রাজা রামচন্দ্র সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন, কারণ তিনি ত স্বামীর চরণে কোন অপরাধ করেন নাই, স্বামীও ত তখন পর্য্যন্ত অন্য বিবাহ করেন নাই। ঘটকেরা তাঁহাকে 'মহামতি' বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। বিমলা আসিয়াছেন, সে সংবাদ রটিল ; কিন্তু সংবাদ পাইয়াও রামচন্দ্র তাঁহার কোন সংবাদ লইলেন না। মাধবপাশার অদূরে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, যেখানে ক্ষুদ্র নদীর কূলে বিমলা স্বামি-দেবতার কৃপাকাঙ্ক্ষা করিয়া দিনের পর দিন মর্ম্মকষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তথায় রাজা রামচন্দ্র না আসুন, বধূমাতাকে দেখিবার কৌতূহলে প্রজাকুল ব্যাকুল হইয়া দলে দলে আসিতে লাগিল। জনসমাগমে সেখানে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল। সে হাটের নাম হইল, 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট।' কত ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুক রাজপত্নীর দর্শন লাভ করিয়া রিক্তহস্তে ফিরিতেন না ; কত দীন দুঃখী বধূমাতার চরণধূলি লইতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে আশাতিরিক্ত দান করিতেন। দান-মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইলে, লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং তত দীর্ঘকাল নৌকায় বাস করাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখন বিমলা সেই স্থান হইতে একটু দূরে সারসী গ্রামের নিকট নৌকা রাখিয়া, তীরের উপর তাম্বু খাটাইয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র যে কৃপা করিয়া বিমলাকে দেখিতে আসিবেন, সে দুরাশা গেল ; তিনি যে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, কোন প্রকারে পদতলে আশ্রয় দিবেন, সে

১ 'Afterwards Pratapaditya relented and sent his daughter to Ram Chandra and the place where she landed, near Madhabpasha, is still called *Badhu Mata Hat*, or the Bride's Market, as a market was established there in her honour.'—Beveridge, *Bakarganj*, p. 77.

ভরসাও বিগতপ্রায় ; যশোহর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নাই ; স্বামীর চরণপ্রান্ত ত্যাগ করিয়াই বা লাভ কি ; এইরূপ চিন্তায় দিন কাটিতে লাগিল। অবশেষে রাজমাতা সমস্ত বার্ত্তা শুনিয়া বধূকে আনিবার জন্য পুত্রকে আদেশ করিলেন। তৎপরে কি হইল, তাহা সিদ্ধহস্ত রোহিণীকুমারের সুন্দর সংযত ভাষায় বলিতেছি : 'রামচন্দ্র জননীর আদেশ পালনের কোন উদ্যোগ করিলেন না। ইহাতে রাজমাতা নিতান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া, পুত্রবধূকে স্বভবনে আনিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার নৌকায় গমন করিলেন। শ্বশ্রূকে সমাগতা দেখিয়া রাজমহিষী বিমলাদেবীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি অবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক সুবর্ণ থালা তাঁহার চরণ প্রান্তে রাখিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজমাতা বহুমূল্য 'অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদন্ত নির্ম্মিত পেটিকা বধূর হস্তে দিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিলেন। বধূর ভ্রমর-কৃষ্ণ পক্ষ্ম-পংক্তি অশ্রু নিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ; পরে মহা সমারোহে বধূকে লইয়া রাজরাণী মাধবপাশায় প্রত্যাগতা হইলেন।'[১]

কয়েকদিন পরে রামচন্দ্র পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ-দুহিতা তখন নিজের চরিত্রগুণে রাজ্যেশ্বরের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহারই গর্ভে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিনারায়ণ ও বসুদেব নামক দুই মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কীর্ত্তিনারায়ণ রাজা হন ; তিনি মহাবীর এবং নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।[২] তিনি মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গিদিগকে বিতাড়িত করিয়া ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন।

১ 'বাকলা', ১৭৫ পৃ। প্রতাপ-কন্যা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া কাশী চলিয়া যান নাই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস উপন্যাসই, উহাতে ঐতিহাসিক বিশেষ কিছু নাই।

২ চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ-কুলকারিকায় আছে :

'কীর্ত্তি নারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেকশূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ-সৈনিকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বানতাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গীর পুরাধীশো নবাবো যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ॥'

কীর্ত্তির পরে বসুদেবনারায়ণ রাজত্ব করেন। প্রতাপ-দৌহিত্র বসুদেব নিজ পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—প্রতাপনারায়ণ ; তাঁহারই বর্ত্তমান নিঃস্ব বংশধরেরা কাজে না হইলেও, অন্ততঃ নামে, এখনও চন্দ্রদ্বীপের রাজা ও সমাজপতি বলিয়া সম্মানিত।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম মোগল-সংঘর্ষ : মানসিংহ

পাঠান রাজত্বের অবসানে সমরবিজয়ী মোগলেরা বঙ্গের স্বামিত্ব লাভ করিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২৫ বৎসরের মধ্যে এদেশকে শাসনতলে আনিতে পারেন নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে যখন দেশময় তুমুল বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন সুদক্ষ সেনানী টোডরমল্ল বিদ্রোহী জমিদারবর্গের কতককে নির্জ্জিত ও কতককে বশীভূত করিয়া বঙ্গীয় রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন; কিন্তু হিসাব শুধু কাগজেই থাকিল, আগ্রা হইতে অর্থ আসিয়া বঙ্গের যুদ্ধব্যয় চালাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বিংশ বৎসরের মধ্যে এদেশ হইতে কপর্দ্দকমাত্রও রাজকোষে প্রেরিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহস্থল। খাঁ আজম বা শাহাবাজ খাঁ আসিয়া অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। তখন আসিলেন বাদশাহ আকবরের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি রাজা মানসিংহ। তিনি ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৪ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। ইহার মধ্যে ১৫৯৮-৯ অব্দে তিনি বাদশাহের আদেশে একবার মাত্র দাক্ষিণাত্য জয় করিতে গিয়া বঙ্গে অনুপস্থিত ছিলেন। ১৬০০ অব্দে তিনি পুনরায় এদেশে আসিয়া চারি বৎসর কাল প্রবল প্রতাপে কার্য্য চালাইয়া[১] ১৬০৪ খৃঃ অব্দে স্ব-ইচ্ছায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৬০৫ অব্দে আকবরের মৃত্যুর পর যখন তৎপুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ হন, তখন তিনি মানসিংহকে রাজধানীর চক্রান্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য পুনরায় তাঁহাকে বঙ্গের শাসন-কার্য্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার মানসিংহ ৮ মাস কাল মাত্র আগ্রা হইতে দূরে ছিলেন, সে সময় তিনি রাজমহল ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে কোথায়ও অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তিনি বঙ্গের স্বাস্থ্যকে বড় ভয় করিতেন,[২] বিহার ছাড়িয়া সহজে বঙ্গে আসিতে চাহিতেন না; বিশেষতঃ উক্ত ৮ মাসের কতকাংশ যাতায়াতে গিয়াছিল, অবশিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানে যোগ দেওয়া যায় না। সুতরাং ১৬০৪

১ 'He is reported to have ruled extensive dominions in which he was practically almost independent with great prudence and justice.' —Smith, *Akbar*, p. 245.

২ Stewart, *History of Bengal*, p. 205.

খৃষ্টাব্দই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বঙ্গ শাসনের শেষ বৎসর ; উহারই মধ্যে তাঁহার সহিত প্রতাপাদিত্যের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

মানসিংহ ১৫৯২ খৃঃ অব্দে কিরূপে উড়িষ্যা জয় করেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তৎপরে ১৫৯৫ অব্দে তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন।[১] ঐ বৎসরই তিনি ভূষণার বিদ্রোহ দমন জন্য স্বীয় পুত্র দুর্জ্জন সিংহের অধীনে একদল সৈন্য পাঠান। এই সময়ে ভূঞারাজগণ পাঠানের সহিত যোগ দিয়া মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার ঈশা খাঁর পুত্র পাঠান সর্দ্দার সুলেমান এবং শ্রীপুরের কেদার রায় উভয়ে আসিয়া যুদ্ধ করেন। সুলেমান নিহত ও কেদার রায় পরাজিত হইলে ভূষণা অধিকৃত হয়। সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওসমান পাঠান বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন। কুচবেহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুরায়ের সহিত বিরোধ করিয়া মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন। রঘুরায় কত্রাভুর ঈশা খাঁ ও মাশুম খাঁ কাবুলীর সহিত যোগ দিয়া প্রবল হইলে পুনরায় দুর্জ্জন সিংহ প্রেরিত হন। বিক্রমপুরের ৬ ক্রোশ দূরে ঈশা ও মাশুম বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া যে যুদ্ধ করেন, তাহাতে দুর্জ্জন সিংহ প্রাণত্যাগ করেন।[২] কিছুদিন পরে মাশুম খাঁ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ঈশা খাঁ বশ্যতা স্বীকার করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহকে কন্যাদান করতঃ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।[৩]

এইরূপে উত্তরবঙ্গ কতকটা শাসনাধীন করিয়া মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহ বঙ্গের সুবাদার হন। কিন্তু কয়েকদিন মধ্যে অকস্মাৎ আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, জগতের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র মহাসিংহ পিতৃপদ পাইলেন।[৪] কিন্তু বঙ্গের

১ কালে এই সমৃদ্ধ সহর আকবরনগর নামে অভিহিত হইত। রাজমহলে এখন জঙ্গল-মধ্যে মানসিংহের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

২ *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 1093-4. রামনাথ বারেট প্রণীত 'ইতিহাস-রাজস্থান' হইতে নিখিলনাথের পুস্তকে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া দুর্জ্জয় সিংহ মারা পড়েন, সে কথা ঠিক নহে। আবুল ফজলের গ্রন্থ অধিকতর প্রামাণিক।

৩ *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 1130.

৪ *Ibid*., III, p. 1151.

মসনদ বালকের জন্য নহে। শাসনের শিথিলতা দেখিবামাত্র বঙ্গীয় ভূঞাগণ পুনরায় ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ওসমানের অধীন দুর্দ্দান্ত আফগানেরা ভদ্রকে বাদশাহী সৈন্যকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া পুনরায় উড়িষ্যা দখল করিয়া লইলেন। শ্রীপুরের কেদার পরাক্রান্ত নৃপতির মত শাসন করিতেছিলেন ; ভূষণার মুকুন্দরাম পুনরায় মাথা তুলিলেন ; বাক্‌লার রামচন্দ্র তখনও নাবালক, প্রতাপাদিত্যের তত্ত্বাবধানে তাঁহার রাজ্য নিরাপদ ছিল। সকলের মধ্যে প্রতাপাদিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া শিরোত্তোলন করিলেন। এইবার তিনি সত্যসত্যই প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এইবার মহাসমারোহে নূতন করিয়া রাজতক্তে বসিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের মত এক বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল ; কত সমধর্ম্মী রাজন্য ও জমিদার, কত সহৃদয় আত্মীয় স্বজন আসিয়া আনন্দোৎসবে ও পরামর্শ-সভায় যোগ দিলেন। বহুদিন ধরিয়া যশোহরপুরী আনন্দলহরীতে আত্মহারা হইয়া রহিল। স্বাধীনতা ঘোষণা করা কত বিপদ-সঙ্কুল এবং মোগল শত্রু কত সমর-নিপুণ, প্রতাপ সকলকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন ; সকলে সমবেত না হইলে দেশমাতৃকার সমুদ্ধার হইবে না, প্রতাপের পরাজয়ে প্রতাপের কি হইবে ? হইবে দেশের সর্ব্বনাশ, ইহাই যেন সকলে বুঝিয়া যান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়ে প্রতাপ কল্পতরু হইয়া অপরিমিত অর্থ লুটাইয়া দিয়াছিলেন (২৪৬ পৃ) এবং দানের স্রোতে সকলের ভক্তিপ্রীতি সমাকর্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, প্রতাপাদিত্য এই সময়ে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন। কোনও রাজার পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার এমন নিদর্শন আর নাই। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় আমি বহু বৎসর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেও এই মুদ্রার একটিও দেখিতে পাই নাই, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫৫ পৃ)। এজন্য কোন প্রকার চেষ্টা, অনুসন্ধান, অর্থব্যয় বা সময়ক্ষেপে কাতর হই নাই। লোকমুখে শুনি, প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ মুদ্রা ছিল। চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ, গোলাকার বা ডিম্বাকার প্রভৃতি নানা আকারের মুদ্রার কথা জানি, কিন্তু অন্য কেহ ত্রিকোণ মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ মুদ্রা থাকা বিচিত্র নহে ; তিনি ত্রিকোণ মন্দির, ত্রিকোণ পুকুর বা পুষ্পাধার রচনা করিয়াছিলেন (১৪১-২ পৃ) ; বিশেষত্বের জন্য বা তান্ত্রিকতার খাতিরে তিনি ত্রিকোণ মুদ্রাও প্রস্তুত করাইতে পারেন। তাঁহার পতনের পর এদেশে

মোগলেরা এরূপভাবে তাঁহার কীর্ত্তিস্মৃতি বা স্বাধীনতার চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছিল যে, সে সময়ে হয়ত বিশুদ্ধ রৌপ্যের মুদ্রাগুলি কতক লুণ্ঠিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল, কতক লোকে ভয়ে বাহির করিতে না পারিয়া গলাইয়া গহনা গড়িয়াছিল বা মাটীর গর্ত্তে পুতিয়া রাখিয়াছিল। হয়ত কোনদিন দৈবাৎ এরূপ মুদ্রা বাহির হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তবুও যতদিন তাহা চক্ষে না দেখিব, ততদিন তাহার অস্তিত্বে আস্থা করিতে বা অন্যকে বিশ্বাস করিবার জন্য বলিতে পারি না।

সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে এই মুদ্রার কথা প্রচার করেন। তিনিও মুদ্রা দেখেন নাই ; তিনি যে খোঁড়গাছির রাজা রাজেন্দ্রনাথের মুখে উহার কথা শুনিয়াছিলেন, তিনিও নিজে মুদ্রা দেখেন নাই। রাজা মহাশয় রামনগর নিবাসী বাণী সরকার নামক জনৈক কায়স্থ মহাশয়ের নিকট এই মুদ্রার কথা শুনেন। বাণী সরকার নুরনগরে যে-মুদ্রা স্বচক্ষে দেখেন, তাঁহার সম্মুখ পৃষ্ঠে 'শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য' এবং পরপৃষ্ঠে 'বজৎ সিক্কা বছিমো জরবে বাঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দ্দাল।'—এইরূপ লেখা ছিল। যদি ইহা সত্য হয়,[১] তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রথম পৃষ্ঠা বাঙ্গলা অক্ষরে এবং পর পৃষ্ঠা ফার্সী অক্ষরে সেই ভাষায় লিখিত ছিল। 'জরবে' (টাঁকশাল) শব্দের পর নিশ্চয়ই স্থানের নাম লেখা ছিল, কিন্তু উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। এই টঙ্কশালা বা টাঁকশাল কোথায়, তৎসম্বন্ধেও বহু অনুসন্ধান করিয়াছি। সম্ভবতঃ সুন্দরবনের আধুনিক ১৪৬নং লাটে রায়মঙ্গল দুর্গের মধ্যে এই টাঁকশাল ছিল, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২০৭ পৃ)। ধুমঘাটে বহু অনুসন্ধান করিয়াও টাঁকশালের নিদর্শন পাই নাই। হয়ত মোগলের ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় রাজধানী হইতে দূরে দুর্ভেদ্য গুপ্ত স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। প্রতাপাদিত্যের

১ উক্ত ব্যক্তির মুখের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তদ্বিষয়ে স্বয়ং রাজা রাজেন্দ্রনাথও সন্দিহান ছিলেন। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি কথাগুলি নিজ লাইব্রেরীর 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক পুস্তকের একটি পৃষ্ঠায় অবিকল টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। সে লেখাটি ২৯।১২।১৯১৮ তারিখে আমি তাঁহারই সম্মুখে পড়িয়া লইয়াছিলাম। উহাই প্রতাপের মুদ্রা সম্বন্ধে এখনকার মত প্রথম ও শেষ প্রমাণ। রাজা রাজেন্দ্রনাথ এক্ষণে পরলোকগত। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ অংশ নকল করিয়া স্বীয় পুস্তকে (৭১ পৃ) প্রকাশ করেন, উহা হইতে নিখিলনাথের গ্রন্থে (১৫৫ পৃ) ও অন্যান্য নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছে।

রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার পিতা ও তাঁহার নিজ রাজত্বকালে স্থলেমান কররাণীর পুত্র দায়ুদের নামাঙ্কিত পাঠান মুদ্রাই অধিক চলিত। আমি ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে মুদ্রার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কয়েক স্থলে দায়ুদের মুদ্রাই পাইয়াছি ; এমন কি যশোহরের উত্তর ভাগে বারবাজার প্রভৃতি স্থানেও এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহাতে দিল্লীর স্থরবংশীয় পাঠান বাদশাহগণের অনুকরণে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীদাউদসাহী' বলিয়া লিখিত আছে[১] দায়ুদ শাহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াই এই মুদ্রা প্রচলন করেন, প্রতাপাদিত্য উহার অনুকরণ করিবেন, বিচিত্র কি ?

শুধু রৌপ্যাদি ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাকেই যে মুদ্রা বলে, তাহা নহে ; প্রাচীনকালে রাজা স্বীয় নামাঙ্কিত পোড়া মাটির (terracotta) মুদ্রার ব্যবহার করিতেন। তবে উহা অর্থরূপে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত না। মাটির মুদ্রা রাজকীয় পত্রাদির সঙ্গে সংযোজিত হইয়া অন্যত্র প্রেরিত হইত। ঐ মুদ্রায় একটি ছিদ্র থাকিত, তন্মধ্য দিয়া লৌহ-তার দ্বারা পত্রাদি বাঁধিয়া গালা দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ মুদ্রা সঙ্গে থাকিলে, পত্রের উপর বিশ্বাস বাড়িত। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ পোড়া মাটির মুদ্রার প্রচলন ছিল। শ্রীহর্ষের গ্রন্থে এবং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকে এই মুদ্রার উল্লেখ আছে। কিছুদিন হইল বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন নালন্দার খনন কালে এইরূপ বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কামরূপাধিপতি নালন্দার সর্ব্বাধ্যক্ষ শীলভদ্রকে এইরূপ মুদ্রাযুক্ত পত্র লিখিতেন। সম্প্রতি প্রতাপের ধূমঘাট দুর্গের পরিখাপার্শ্বে এইরূপ একটি পোড়া মাটির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।[২] মুদ্রাটি চেপ্টা, ডিম্বাকার ; পরিমাণ ২″ × ১$\frac{৩}{৪}$″ ইঞ্চি ; আধ ইঞ্চির কিছু বেশী পুরু। এক কোণে একটু সরু হইয়া গিয়াছে, সেখানে তার দিয়া বাঁধিবার ছিদ্র আছে। উহার দুই পৃষ্ঠাতেই কিছু কিছু লেখা আছে, তাহা সম্পূর্ণ পড়া যায় না। একপার্শ্বে 'সং ১৬ মাঘ দিনে ৬ গুহস্থ প্রতাপাদিত্য' এইরূপ কিছু অস্পষ্ট লেখা আছে। উহা হইতে মনে হয়, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে ৬ই মাঘ তারিখে এই মুদ্রা ব্যবহৃত হইতেছিল। বোধ হয় এই জাতীয় মুদ্রাগুলি

১ এইরূপ যে দুইটি মুদ্রা আমার নিকট আছে, তাহার দুইটিরই ফটো প্রকাশ করিলাম।

২ এই মাটির মুদ্রাটি Archaeological Departmentএর স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্থপণ্ডিত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মহোদয় ধূমঘাট হইতে লইয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রস্তুত থাকিত না, আবশ্যক মত কাঁচা অবস্থায় উহার উপর যথেচ্ছ তারিখ ও স্বাক্ষরাদি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ পুড়াইয়া লইয়া পত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত। স্বাধীন এবং পরাক্রান্ত নৃপতিগণ এইরূপ মুদ্রা নিয়ত ব্যবহার করিতেন; প্রতাপাদিত্য ভারতের সেই চিরন্তন রীতির অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ে এবং পরবর্ত্তী দুই এক বৎসরের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের নিজ শাসিত রাজ্যও বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণ-দিকের ত কথাই নাই; প্রতাপাদিত্য 'সুন্দরবনের বাঘ' বলিয়া খ্যাত; সমস্ত সুন্দরবন তাঁহার করায়ত্ত এবং তাঁহার রাজত্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঘটকেরা তাঁহাকে 'আসমুদ্রকরগ্রাহী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব দিকে বলেশ্বর নদ তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল, কিন্তু উহা পার হইয়াও তিনি কয়েকটি পরগণা হস্তগত করিয়াছিলেন। বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর চকশ্রী বা চাকশিরি তাঁহার দখলে আসে এবং চাকশিরিতে তিনি একটি প্রধান নৌ-দুর্গ স্থাপন করেন। উহার বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে দিয়াছি (২০৮-১০ পৃ)। চাকশিরির পূর্ব্ববর্ত্তী পরগণাগুলি এই সময়ে দ্বিগঙ্গা সেনবংশীয় মদনমোহনের অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া পৈতৃক সম্পত্তিভুক্ত ১৪টি পরগণার বৃত্তি ভোগ করিতেন।[১] সুতরাং প্রতাপাদিত্যের মত পরাক্রান্ত ব্যক্তির সে সব পরগণা দখল করিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। উক্ত ১৪ পরগণার নাম—কাশেমপুর,

১ দ্বিগঙ্গা-নিবাসী বাসুকি-গোত্রীয় কায়স্থকুলতিলক কিঙ্কর সেন পাঠান আমলের শেষভাগে একজন পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ ভুঞা কিঙ্কর বলিয়া খ্যাত। ইনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় ১৮ পর্য্যায়ভুক্ত কুলীনদিগের একজাই করিয়া সমাজে অশেষ সম্মানিত হন। তিনি নবাব সরকার হইতে যে ১৪ পরগণার সনন্দ পান, উহাই তাঁহার পুত্র মদনমোহন ভোগ করিতেছিলেন। মদনমোহন প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। প্রতাপের পতনের পর ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁ মদনের পুত্র শ্রীনাথের সহিত কতকগুলি পরগণার বন্দোবস্ত করেন। শ্রীনাথের পৌত্র রুদ্রনারায়ণ রায়ের-কাটিতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে তৎকর্ত্তৃক ৺সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং যে কিঙ্কর সেনকে মুর্শিদ কুলি খাঁ নির্য্যাতিত করেন বা সম্ভবতঃ যাঁহার গড়কাটা বাড়ীর চিহ্ন চন্দননগরের সন্নিকটে এখনও আছে, সে কিঙ্কর সেন এই ভুঞা কিঙ্কর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।—'বাকলা', ২৩ পৃ, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (কালীপ্রসন্ন), ৪৮ পৃ; 'বাসুকি-কুলগাথা', ৮-১৩ পৃ। রুদ্রনারায়ণের অধস্তন রাজবংশীয়েরা বরিশাল হইতে খুলনার কয়েক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তদ্বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব।

শিবপুর, তপ্পে রুদ্রপুর, বনগ্রাম, মধুদিয়া, সুলতানপুর, সোন্ধারকুল,[১] আবদুল্যা-পুর, ইব্রাহিমপুর, রাজোর, সেলিমাবাদ, নাজিরপুর, হাবেলী ও চিরুলিয়া। ইহার মধ্যে চিরুলিয়া ব্যতীত আর ১৩টি পরগণা প্রতাপাদিত্যের অধিকারে আসিয়াছিল। উহার মধ্য হইতে তিনি বনগ্রাম পরগণা স্বীয় প্রিয়তম ভাগিনেয় লক্ষ্মণ ঘোষকে প্রদান করেন[২] এবং হাবেলী পরগণা বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে প্রদত্ত হয়। তদবধি ভবানী ও তাঁহার স্বামী পরমানন্দ রায় এই পরগণায় অর্থাৎ বর্ত্তমান বাগেরহাটে বাস করেন।[৩] কিছুদিন পরে যখন স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ে প্রতাপাদিত্য 'কল্পতরু যজ্ঞ' করেন, তখন জানকী-বল্লভ সরকার নামক জনৈক বৈদ্যবংশীয় কর্ম্মচারী বিশেষ দক্ষতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত কতকগুলি গুরুতর কার্য সুসম্পন্ন করেন বলিয়া প্রতাপের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ সুলতানপুর-খড়রিয়া ও বেলফুলিয়া পরগণার জমিদারী সনন্দ পাইয়াছিলেন।[৪]

পশ্চিমদিকে ভাগীরথী নদীই প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল, তবে দক্ষিণাংশে তিনি হিজলী জয় করিয়া লওয়ায় সমুদ্রের নিকট দিয়া তাঁহার রাজ্য উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কলিকাতার অপরপারস্থ সাল্‌খিয়া প্রভৃতি দুই একটি স্থান তাঁহার ভাগীরথী-বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের কেন্দ্র হইয়াছিল। বসন্ত রায়ের হত্যার পর যশোর রাজ্যের পশ্চিম-ভাগে তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যমুনা নদীর দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান ২৪-পরগণা জেলার সমস্ত অংশ তাঁহার করতলগত ছিল। তিনি হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান হুগলীর মোগল ফৌজদারের কবল হইতে সবলে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। জগদ্দলে

১ বর্ত্তমান বরিশাল জেলার হাবেলী সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত শ্যামরাইল, পোণাবালিয়া প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন সোন্ধারকুল পরগণা গঠিত হইয়াছিল।—'বাকলা', ২৭০ পৃ।

২ ইনি প্রতাপের ভগিনীপতি গোবিন্দ ঘোষ লস্করের পুত্র। ১০৮ পৃ দ্রষ্টব্য।

৩ গাভ বসুবংশীয় পরমানন্দ বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করেন ও পরে প্রতাপ কর্তৃক অর্জ্জিত হাবেলী পরগণার জমিদারী যৌতুক পাইয়া বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী কাড়াপাড়ায় আসিয়া বাস করেন এবং তখন হইতে 'রায়' উপাধি হয়। তৎপূর্ব্বে তিনি যশোহর রাজধানীর নিকট পরমানন্দকাটিতে বাস করিতেন।

৪ 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩২৩, ২৩০ পৃ।

তাঁহার যে দুর্গ ছিল, উহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি (১৯৯ পৃ)। কথিত আছে, যমুনার উত্তরে বর্ত্তমান নদীয়া জেলার কতক স্থানও প্রতাপাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই সময়ে কুশদ্বীপ বা কুশদহ পরগণা পাণ্ডিত্য-গৌরবে নবদ্বীপের সহিত সমকক্ষতা করিত। এই পরগণা তখন বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গা অঞ্চল হইতে রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; কুশদহ পরগণা এক্ষণে যশোহর, নদীয়া ও ২৪-পরগণার মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই পরগণার অধীশ্বর ছিলেন কায়স্থ কুলভূষণ কাশীনাথ রায়। কথিত আছে, দাযুদ খাঁর সহিত মোগলের সংঘর্ষকালে কাশীনাথ মোগল পক্ষে যোগ দিয়া সৈন্যাধ্যক্ষরূপে অসাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন করেন। বাদশাহ আকবর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'রাজা সমরসিংহ' এই গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন তিনি জলেশ্বরের সন্নিকটবর্ত্তী যমুনাবেষ্টিত চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ বা চৌবেড়িয়ার দুর্গ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তদীয় মন্ত্রী রাজা সতীশের চক্রান্তে কুলি খাঁ যখন বঙ্গের মোগল শাসনকর্ত্তা (১৫৭৭-৭৮) তখন তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।[১] তখন তাঁহার রাজ্য ইছাপুরের চৌধুরী বংশের কৃতী পুরুষ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের হস্তগত হয়।[২] মহারাজ প্রতাপাদিত্য কুশদ্বীপের রাজস্ব দাবি করিয়া কিরূপে সসৈন্যে আক্রমণ করেন ও সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে প্রতাপপুর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি (১৪২ পৃ)।

১ এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-রথী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' প্রণয়ন করেন। এখন চৌবেড়িয়ার সে দুর্গ বা রাজপ্রাসাদের কিছু নাই। নীলকরদিগের সময়ে অনেক প্রাচীনকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের মালমসলা পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এখন চৌবেড়িয়ার রাজার বাগান, ফুলবাড়ী, সেহালা পাড়া প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র প্রাচীন নিদর্শন রহিয়াছে। এখন চৌবেড়িয়া বঙ্গভাষার কৃতী লেখক ও নাট্যকার রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। কাশীনাথের প্রসঙ্গে 'নদীয়া-কাহিনী', ২২-২৩ পৃ, ও 'কুশদ্বীপ-কাহিনী', ৭-৮ পৃ দ্রষ্টব্য।

২ এড়ু মিশ্রের কারিকায় উল্লেখ আছে, ইছাপুরের হড়চৌধুরীগণ কুশদ্বীপের অধিকার লক্ষ্মণ সেনের নিকট হইতে পান।

প্রতাপাদিত্য যখন এইরূপ বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার সহিত সপ্তগ্রামের ফৌজদারের বিবাদ বাধে। কিন্তু তখন তাঁহার নৌ-বাহিনী এরূপ সুব্যবস্থিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, ফৌজদার চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ত্রিবেণী হইতে যমুনাপথে যশোহরের দিকে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রতাপ রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন জন্য তাঁহার সুযোগ্য কর্ম্মচারীদিগকে প্রেরণ করেন। বঙ্গীয় রাজন্য ও জমিদারবর্গ যাহাতে তাঁহার নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য একমত হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে যাহাতে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তি-প্রীতির সমুদ্রেক হয়, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বত্র উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই দৌত্যকার্য্যের অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁহার পরমবন্ধু শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। তিনি যেমন মিষ্টভাষী ও সুবক্তা, তেমনই সাহসী, অক্লান্তকর্ম্মী ও কূটনীতি-বিশারদ। যখন যেভাবে কোন গুরুতর কার্য্যভার তাঁহার স্কন্ধে সমর্পিত হইত, তখন তিনি প্রাণপণে উহা সম্পন্ন না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে যখন প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা বিজ্ঞাপিত করিয়া রাজতক্তে বসেন, তাহারই প্রাক্‌কালে প্রতাপের অনুচরগণ দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া, অভিষেক উপলক্ষ্যে যশোহরে পদার্পণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। শুধু রাজা বা জমিদারবর্গ নহেন, জন-সংঘকে উদ্‌বুদ্ধ করাই দূতগণের প্রধান কার্য্য ছিল। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বক্তৃতার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতেন। তিনি নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে রাজমহলে উপনীত হন। মোগলেরা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য কিরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, তৎপক্ষে তাঁহাদের শক্তি বা অভিসন্ধি পরীক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সম্ভবতঃ এই সময়ে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য রাজমহল ত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তখন শের খাঁ নামক এক ব্যক্তি কোন এক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।[১] তিনি শঙ্করের প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত জানিয়া

১ আমরা 'আকবরনামা' বা অন্য কোন বিবরণী হইতে শের খাঁ কে বা তিনি কি করিতেন, সেরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এমন কি, তিনি হুগলীর ফৌজদার, বা রাজমহলের কোন উচ্চকর্ম্মচারী, তাহাই জানিতে পারি নাই। সুতরাং এই শের খাঁর ঐতিহাসিকতা স্থাপন করিতে পারিতেছি না।

ঘটনাক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। 'শের' শব্দে ব্যাঘ্র বুঝায়, এই জন্য তখন এক প্রবাদ উঠিল :

'শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে খেলো বাঘে
অন্য লোক আর কোথায় লাগে ?'

যাহা হউক, শঙ্কর কিন্তু বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি অচিরে কারারক্ষিগণকে বশীভূত করিয়া রাজমহল হইতে পলায়ন করেন। তজ্জন্য শীঘ্রই ক্রোধান্ধ শের খাঁর সহিত প্রতাপের সেনাদলের সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে মোগল পক্ষ পরাজিত হইল, প্রতাপের দুর্দ্ধর্ষ রণতরী সমূহ শত্রুদিগকে রাজমহল পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইহারই জন্য জনশ্রুতি আছে, প্রতাপাদিত্য রাজমহল পর্য্যন্ত রাজ্য জয় করেন। যাহা হউক, ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার ক্ষমতা এবং বীরত্বখ্যাতি যে শেষ সীমায় পৌঁছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সেই অসীম ক্ষমতার বার্ত্তা প্রায় দেড় শত বৎসর পরেও কবির লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভাগ্যবান কবির ভাষার মাহাত্ম্যে তাহা এখনও বঙ্গের ঘরে ঘরে অনুরণিত হইতেছে। কবিবর ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন :

'যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী ;
ষোড়শ হল্‌কা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।'

দৈববল ব্যতীত কেহই সেরূপ অসাধারণ বলশালী হইতে পারে না, ইহাই লোকের ধারণা ছিল এবং দৈববল হারাইয়াই প্রতাপের পতন হইয়াছিল, ইহাই পরিণামে সপ্রমাণ করিবার জন্য কত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক তাঁহাকে দমন করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা মোগল বৃত্তিভোগীরা সকলেই বুঝিয়াছিলেন ; এই জন্য তাঁহার দৌর্জ্জন্যের সংবাদ নানা মুখে নানা ভাবে বাদশাহের রাজধানীতে পৌঁছিতেছিল।

কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে রূপরাম বসু কচু রায়কে লইয়া আগ্রায় ছিলেন। কিন্তু যশোহরের আরজী ভাল ভাবে বাদশাহের গোচরীভূত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কথিত আছে, এই সময়ে কচু রায় উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া সুন্দর ভাবে ফারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন।[১] যখন বঙ্গ হইতে প্রতাপের দৌর্জ্জন্যের কাহিনী আসিতেছিল,[২] তখন তাঁহার সাক্ষ্য সেই কাহিনীর প্রধান সমর্থক হইল। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে' আছে : 'অনন্তরমিন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং সমধিগচ্ছন্ কচুরায়েণাপি ইন্দ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্য গোচরীকৃতং। অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ যথা মানসিংহ ভবান্ মহতা সৈন্যেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং দুরাত্মনং ঝটিতি বদ্ধা সমানয়তু।' এই আদেশ পাইয়া মানসিংহ বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া মহাড়ম্বরে বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঘটকেরা বলিয়াছেন যে, মানসিংহের আক্রমণের পূর্ব্বে বাদশাহ বঙ্গাধিপ প্রতাপের বিনাশ জন্য 'দ্বাবিংশতিতমখানান্ প্রেষয়ামাস সত্বরং' অর্থাৎ ২২ জন আমীরকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। কয়েকটি কারণে একথা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না।[৩] প্রথমতঃ, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যখন মানসিংহ উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহ নিবারণ জন্য ব্যাপৃত ছিলেন, তখন প্রতাপ অনুগতভাবে কিছুদিন তাঁহার সাহায্যই করিয়াছিলেন, কোন অসদ্ভাব করেন নাই। শেষ দুই তিন বৎসর প্রতাপ রাজ্য বিস্তার করিবার সময়ে প্রকাশ্যভাবে মোগলের সহিত বিবাদ করেন নাই। সুতরাং এ সময়ে আমীরগণের আসিবার কারণ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ১৫৯৯ অব্দে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয় জন্য বঙ্গ ত্যাগ করিলে প্রতাপ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, ওসমান উড়িষ্যা দখল করেন এবং দেশময় তুমুল বিদ্রোহ হয়। ঐ সময়ে মানসিংহের পুত্র ও প্রতিনিধি জগৎসিংহের মৃত্যু হওয়াতে, বৎসরের মধ্যে মানসিংহকে ফিরিয়া আসিয়া সেরপুরের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত করিতে হয়। এই বৎসর মধ্যে বাদশাহ যদি ২২ জন

১ রামরাম বসু, 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১), ১৪৪ পৃ।

২ 'ক্ষিতীশবংশাবলী', ৪র্থ পরিচ্ছেদ (নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ২৯২ পৃ)।

৩ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', ১৫৮-৯ পৃ।

আমীরকে ভার দিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে একক মানসিংহের তত ব্যস্ত হইয়া ফিরিবার আবশ্যক হইত না। তৃতীয়তঃ, কোন এক জনকে বিশেষ ভার না দিয়া ২২ জনকে এক সঙ্গে বা ভাগে ভাগে পাঠাইবার কোন যুদ্ধরীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারপ্রাপ্ত কেহ আসিলে ২২শ জনের নাম হইত না। চতুর্থতঃ, ধূমঘাটে টেঙ্গা মসজিদের কাছে ১২ জন ওমরাহের কবর আছে। অথচ যুদ্ধ সেখানে হয় নাই। পরাজিত আমীরদিগের শবদেহ দূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া সযত্নে নিজ রাজধানীতে এবং প্রধান মস্‌জিদের পার্শ্বে কবর দিবার উদ্যোগ বা প্রবৃত্তি প্রতাপাদিত্যের হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অপর পক্ষে আমীরগণ মানসিংহের নেতৃত্বে তাঁহারই সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধান্তে যখন রাজধানী দখল করেন, তখন উঁহাদের শবদেহ আনিয়া সমাধিস্থ করিয়া যান। সুতরাং 'ক্ষিতীশবংশাবলীতে' এবং 'অন্নদামঙ্গলে' যেমন আছে, তাহাই সত্য :

"বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় ল'য়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল।"

১৫৯৯ অব্দের শেষ ভাগে সেরপুর আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাজিত করিবার পর মানসিংহ রাজধানীতে গিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন আকবর তাঁহাকে সাত হাজারী মন্‌সবদারী প্রদান করিয়া সমস্ত ওমরাহের শীর্ষদেশে স্থান দেন।[১] এইবার প্রতাপাদিত্যের বিবরণ পৌঁছিল, এবং মানসিংহ বিংশ সহস্র রাজপুত সৈন্যের অধীশ্বর হইয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসিলেন। কথিত আছে, আসিবার কালে তিনি বারাণসীধামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি কামদেব ব্রহ্মচারী নামক একজন তেজস্বী সন্ন্যাসীর জ্ঞানবৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সন্ন্যাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাঁহার পূর্ব্ব নাম কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যের সরকারে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন (২২৬-৭ পৃ)। মানসিংহ গুরুর নিকট লক্ষ্মীকান্তের কথা শুনিয়া বঙ্গে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং প্রবাদ আছে, লক্ষ্মীকান্ত তাঁহাকে গুপ্তভাবে সংবাদ দিয়া সাহায্যও করিয়াছিলেন, নতুবা মানসিংহ তাঁহাকে বহু পরগণার মালিক করিয়া যাইতেন না। লক্ষ্মীকান্তের জীবনী ও বংশকথা পরে আলোচনা করিব।

১ *Ain.* (Blochmann), p. 341 ; Stewart, '*History of Bengal*', pp. 213-4.

১৬০০ খৃঃ অব্দে মানসিংহ কাশী হইতে রাজমহলে পৌঁছিলেন এবং এবার বঙ্গদেশকে প্রকৃতভাবে শাসন-তলে আনিবার জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় ২৫ বৎসর হইল পাঠানেরা পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গে মোগল-শাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মোগলেরা রক্ততর্পণ করিয়া যে রাজ্য জয় করিয়াছে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভুঞাগণের পরাক্রমে সে নূতন রাজ্য বুঝি অঙ্গুলির অন্তরাল হইতে হস্তচ্যুত হয়। তাই আকবর তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিকে সর্ব্ববিধ ভারার্পণ করিয়া পুনরায় বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। রাজ্যলাভ বা রাজস্ব সংগ্রহ হউক বা না হউক, পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা কখনও আকবরের স্বভাবগত ছিল না। অজস্র অর্থবৃষ্টি করিয়া তিনি রাজপুতনার রাজ্য চাহেন নাই, রাজপুতের বশ্যতা মাত্র চাহিয়াছিলেন। বঙ্গজয় হউক বা না হউক, সে কথা পরে দেখা যাইবে ; বঙ্গীয় ভুঞাগণ বিদ্রোহী হইয়া যাহাতে উত্তোলিত মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়, যে কোন প্রকারে তাহাই করিতে হইবে। আর সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মানসিংহই একমাত্র সমর্থ কর্ণধার। তিনি তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়াছিলেন ; সাতহাজারী মন্সবদারের উচ্চ সম্মান যাহাতে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ণ দুই বৎসর ধরিয়া এই চেষ্টা চলিল। বিহারের সর্ব্বত্র এবং বঙ্গের যতদূর পর্য্যন্ত সম্ভব, শাসনশৃঙ্খলা ও রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। সুখ-বিলাসে সমভ্যস্ত সিংহরাজ নিম্নবঙ্গের আবহাওয়াকে বড়ই ভয় করিতেন, কিন্তু তবুও সেখানে যাইতে হইবে। নৌ-সেনাপতি মুণ্ডা রায় কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মানসিংহ জলপথে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেদার রায় সে সন্ধিমত কার্য্য না করায় পুনরায় তিনি কিল্‌মক্ নামক আর এক সেনানী প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে প্রতাপাদিত্যকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আবশ্যক হইলে কেদারের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, কিছুতেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিবেন না, এই ভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া যশোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কচুরায় ও রূপরাম তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন।

রাজমহল হইতে মানসিংহ কোন্ পথে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পথও দুইটি ; এক পথ মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া সোজা দক্ষিণমুখে,

অন্য পথ বর্দ্ধমান ঘুরিয়া। যে পথেই তিনি আসুন, জলঙ্গীর তীরবর্ত্তী চাপড়া নামক স্থানে তিনি ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা আছে।[১] বর্দ্ধমানের পথে চাপ্‌ড়ার দূরত্ব দুইশত মাইলের অধিক ; মুর্শিদাবাদের পথে ঐ দূরত্ব ১২৫ মাইলের বেশী হইবে না। সুতরাং প্রথম কথা এই যে, মুর্শিদাবাদের পথই সোজা এবং সেই পথে সৈন্য চলাচলের মত রাজবর্ত্ম ছিল। দ্বিতীয় কথা, ছাপঘাটির মোহানার কাছে ভাগীরথী পার হওয়া যত সোজা, নিম্ন দিকে হুগলীর কাছে তত সোজা নহে। প্রতাপাদিত্যের সুদক্ষ রণবাহিনী যে ত্রিবেণীর নিকটে তাঁহার পারের পথে বাধা দিতে পারে, সে আশঙ্কা অবশ্য মানসিংহের ছিল। সুতরাং নিম্নদিকে আসিয়া তিনি ভাগীরথী পার হইবার মতলব করেন নাই। তৃতীয়তঃ, তিনি যদি বর্দ্ধমানেই আসিবেন, তাহা হইলে উল্‌টা দিকে পূর্ব্বস্থলী ও নবদ্বীপের মাঝে গঙ্গা পার হইয়া[২] চাপড়ার অপর পারে যাইবেন কেন? ভবানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার খাতিরেই কি বিরাট বাহিনী লইয়া অতদূরে যাওয়া যায়?[৩] বিশেষতঃ নবদ্বীপের নিকট জলঙ্গী ভাগীরথীতে মিশিয়াছে ; উহার দক্ষিণে কাল্‌নার নিকট পার হইলে একবার পার হইলেই চলে ; বর্দ্ধমান হইতে বৈকুণ্ঠপুর, সাঁতগাছি প্রভৃতি প্রাচীন স্থান দিয়া কাল্‌না পর্য্যন্ত পুরাতন রাস্তা ছিল। কিন্তু সে পথে না আসিয়া মানসিংহ একবার ভাগীরথী ও একবার জলঙ্গী এই দুই নদী পার হইবার জন্য চাপড়ায় গেলেন কেন? যাহা হউক, যেদিক হইতে দেখা যায়, মানসিংহ বর্দ্ধমানের পথে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ভারতচন্দ্র শুধু বিদ্যাসুন্দর গল্পের অবতারণা করিবার জন্য তাঁহাকে সেই পথে আনিয়াছিলেন।[৪]

১ 'চাপড়াখ্যগ্রামসমীপবর্ত্তিনদীতটে তৎসৈন্যং সমাজগাম।'—'ক্ষিতীশবংশাবলী'।

২ 'উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা। কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥ পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।'—'অন্নদামঙ্গল'। 'এই সময়ে ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেন।'—'নদীয়া-কাহিনী', ৯, ৩৬৬ পৃ। এইজন্য পূর্ব্বস্থলী হইতে ভাগীরথী পার হইয়া নবদ্বীপে আসিতে হইত।

৩ 'মজুমদার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে, বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে।'—ভারতচন্দ্র।

৪ নিখিলনাথ লিখিয়াছেন—'ভারতচন্দ্র তাহাকে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হওয়ার যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। উহা কেবল বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য।'—'প্রতাপাদিত্য' ১৫৯ পৃ।

রাজমহল হইতে গঙ্গার ধার দিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ সূতীর নিকট ভাগীরথী শাখা পার হইয়া জঙ্গীপুরের মধ্য দিয়া সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, ঐ পথ দিয়া মানসিংহ সসৈন্যে আসিলেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ঐ রাস্তাকে এখনও 'বাদশাহী সড়ক' বলে[১] এবং উহাই প্রকৃত 'গৌড়বঙ্গের রাস্তা'। ভাগীরথীর পূর্ব্বপার দিয়া এই পথ নদীয়ার মধ্যে জলঙ্গীর কূলে আসিয়াছিল। জলঙ্গী তখন প্রবলা নদী; সে অঞ্চলে ভাগীরথী ভিন্ন অন্য কোন নদী তেমন প্রশস্ত, গভীর বা বাণিজ্যবহুল ছিল না। মানসিংহকে সৈন্যসহ এই নদী পার হইতে হইবে। তিনি চাপড়ার পরপারে পৌছিয়া উহারই আয়োজন করিতে ছিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি যে সব স্থানের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন, তথা হইতে সকল লোকজন ও রাজারা ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন।[২] সুতরাং স্থানীয় লোকের নিকট হইতে পার হইবার পক্ষে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি হাতী ও উটের গাড়ীতে চড়াইয়া কতকগুলি নৌকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিরাট বাহিনীর পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

এমন সময়ে ভবানন্দ সমাদ্দার নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার প্রতিভাসম্পন্ন সুকুমার মূর্ত্তি দেখিয়া মানসিংহ মুগ্ধ হইলেন। বিশেষতঃ যখন কোন জমিদার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন নাই, তখন সাহস করিয়া ভবানন্দ আসিলে, এবং যে কোন ভাবে হউক বাদশাহী সৈন্যদলের সাহায্য করিতে চাহিলে মানসিংহ পরিতুষ্ট হইলেন। ভবানন্দ তখন হুগলীতে কানুনগো দপ্তরে মুহুরীগিরি চাকরী করিতেন, তখনও তিনি কানুনগো হন নাই।[৩] চাকরী হিসাবে মুহুরীগিরি বিশেষ কিছু না হইলেও তখনকার দিনে উহাতে পয়সা ছিল এবং পৈতৃক সম্পত্তি ও পূর্ব্বতন আয় হইতেও

১ Hunter, *Statistical Accounts*, Vol. IX, p. 143.

২ 'যত্র যত্রোবাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলায়ঞ্চক্রিরে রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদ্বভূবুঃ' —অর্থাৎ মানসিংহ যেখানে যেখানে আসিলেন, সেখান হইতে সকল লোক পলাইল, রাজারা কেহ সাক্ষাৎ করিলেন না।—'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং'; 'প্রতাপাদিত্য', মূল ২৯২ পৃ।—শি মি

৩ 'Bhoveaund, a Bramin, was a Mohirer in the Hughly Canongoe Duptar and got himself appointed to the Zemindary of Pergunnah Bugwan, Nuddea. &c, 14 Mehals in room of Hurryhoo and Cassinaut Chowdry.'—Rouse, Boughton, *Landed Property of Bengal*. 'প্রতাপাদিত্য', ১৬১ পৃ; এই Hurryhoo অন্নদামঙ্গলের হরি হড় নয়ত? কাশীনাথ ভবানন্দের পিতামহ।

ভবানন্দ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। বাগোয়ানে তাহার বাড়ী ছিল, উহা বেশী দূরবর্ত্তী নহে ; দেশের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল, সে কথা পরে বলিতেছি। ভবানন্দ বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বাদশাহী সৈন্য নিরুদ্বেগে পার হইল। কিন্তু এই সময় চৈত্রমাস ; অকস্মাৎ এক দৈব বিপদ ঘটিল। সৈন্য-সামন্ত পার হইয়া চাপড়ায় আসিতে না আসিতে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং সাতদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত চলিল। উহাতে কত নৌকা ডুবিল, হাতী ঘোড়া ভাসিয়া গেল, সাজসরঞ্জাম ও রসদাদি নষ্ট হইল, আশ্রয়হীন সৈন্যদলের অপরিসীম কষ্ট হইল। তাহারা জোর করিয়া আশ্রয় জুটাইল, ভবানন্দও যতটুকু সাধ্য, তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রধান অভাব হইল খাদ্যের ; সেপক্ষেও ভবানন্দ তাহাদের প্রধান ভরসাস্থল হইয়াছিলেন। তিনি নিজ গৃহে গোবিন্দদেব বিগ্রহের সহিত রাধিকা প্রতিমার বিবাহ দিবার উৎসব কবিবেন বলিয়া যথেষ্ট খাদ্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই দিয়া মানসিংহের সৈন্যদিগের উদর-তৃপ্তি করিলেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও অবিরত ভারে ভারে সেই সকল খাদ্য নৌকাযোগে আনিয়া লুটাইয়া দেওয়া হইল। যে নৈবেদ্য গোবিন্দদেবের পূজায় লাগিল না, তাহাই মানসিংহের পূজায় দিয়া ভবানন্দ স্বীয় ভাগ্যলক্ষ্মীকে সুপ্রসন্ন করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে ভবিষ্যতে বহু পুরস্কার দিবেন বলিয়া কত আশ্বাস দিলেন ; এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সত্বরতার সহিত সৈন্য-চালনাই জয়-লাভের মূলমন্ত্র।

এইবার আমরা ভবানন্দের পরিচয় দিয়া লইব। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট-নারায়ণের অষ্টাদশ পুরুষ কাশীনাথ নদীয়ার অন্তর্গত কাকৃদি পরগণার জমিদার ছিলেন এবং বাগোয়ানের অন্তর্গত আন্দুলবাড়িয়ায় তাঁহার নিবাস ছিল। দৈবদোষে তিনি রাজকোপে পতিত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার বিষয় রাজেয়াপ্ত হয়। তখন তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া জাতিমানের ভয়ে নিকটবর্ত্তী হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার নামক এক বৈষয়িক ব্রাহ্মণের আশ্রয় লন। যথাকালে তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া কালে ঐ পুত্রটিকে নিজের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন। পুত্রের নাম রামচন্দ্র ; তিনি সমাদ্দারের উত্তরাধিকারী বলিয়া লোকে তাহাকে রাম সমাদ্দার বলিয়া ডাকিত। কালে রামচন্দ্রের চারিটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে দুর্গাদাস

জ্যেষ্ঠ। এই দুর্গাদাস পরে ভবানন্দ নাম পান এবং হুগলীর কানুনগো দপ্তরের মুহুরী পদ হইতে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে কানুনগো পদে উন্নীত হন; তখন তাঁহার উপাধি হয়—মজুমদার। এইরূপে দুর্গাদাস সমাদ্দার ভবানন্দ মজুমদার বলিয়া পরিচিত। সুবিধাবোধে আমরা সর্ব্বত্র তাঁহাকে সেই ভবানন্দ নামেই অভিহিত করিব। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভবানন্দ অপর তিন ভ্রাতাকে ফতেপুর, কুড়ুলগাছি ও পাট্‌কাবাড়ী এই তিনটি বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া, নিজে বাগোয়ানের অধিকারী হইয়া তদন্তর্গত বল্লভপুরে সৌধনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

ভবানন্দের বাল্যজীবন ঐতিহাসিকের নিকট তমসাচ্ছন্ন। কেহ কেহ বলেন, হুগলীর ফৌজদার এক সময়ে জলঙ্গীপথে যাইবার সময় তাঁহার নিকট হুগলীর পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই উদীয়মান বালকের উত্তরে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে হুগলী লইয়া গিয়া সংস্কৃত ও ফারসী এই উভয় ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত করেন। আবার এমনও শুনা যায়, রাম সমাদ্দার স্বয়ং বালক পুত্রটিকে লইয়া গিয়া প্রতাপাদিত্যের পিতার রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং তথায় ভবানন্দ রাজানুগ্রহে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেন। যশোহর-রাজবংশের কুলগত প্রবাদ হইতে জানা যায়, দুর্গাদাস বালককালে যশোহরে যান এবং প্রথমতঃ দেবসেবার পুষ্পচয়ন ও তত্ত্বাবধানের কার্য্যে ব্রতী হন। ক্রমে তিনি রাজপরিবার-ভুক্ত সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ বসন্ত রায় ও তাঁহার পত্নীগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দেবসেবার তত্ত্বাবধান কার্য্যে ও নিজ চরিত্র-মাধুর্য্যে তিনি রাণীদিগের নিকট হইতে 'রাণীয়ান বৃত্তি' লাভ করেন। যশোহরের নিকটবর্ত্তী দেবনগর, দুধলী প্রভৃতি এখনও রাণীবৃত্তি বলিয়া খ্যাত।[১] ঐ সম্পত্তি ভবানন্দের অধস্তন কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয়েরা ভোগ করিতেন বলিয়া কথিত হয়। তবে প্রতাপের পতনের পর অনেকগুলি জমিদারী উঁহারা ক্রমে লাভ করেন; তন্মধ্যে উক্ত সম্পত্তি কি ভাবে অর্জ্জিত হয়, তাহার কোন লিখিত বিবরণী পাই নাই। যশোহরে থাকিতে বোধ হয় দুর্গাদাসের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ভবানন্দ হয়। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের হত্যাকালে তিনি ঘটনাক্রমে প্রতাপাদিত্যের বিরক্তিভাজন হন ও পরে যশোহর ত্যাগ করিয়া হুগলীর

১ সতীশচন্দ্র রায়, 'বঙ্গীয় সমাজ', ১৫১ পৃ।

কানুনগো দপ্তরে মুহুরী হন। এই সময়ে মানসিংহ আসেন ও তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

ভবানন্দের প্রথম জীবন যে যশোহরে অতিবাহিত হয়, কয়েকটি কারণে উহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আমরা এখানে ধীরভাবে উহার আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ, প্রবাদ এমনভাবে শতমুখে তাঁহাকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে যে, ভবানন্দের নাম করিবামাত্র বঙ্গবাসীর মনে এক স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের চিত্র প্রকটিত হয়। পাঠান রাজত্বের প্রাক্কালে যেমন উত্তর-ভারতে কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র, মোগল আমলের প্রারম্ভে তেমনই বঙ্গদেশে এই ভবানন্দ শত্রুকে ডাকিয়া আনিয়া দেশের পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছেন। এই প্রবাদ বা সর্ব্বজনজ্ঞাত অপবাদের হেতু কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, যশোহর রাজসরকারে চাকরী না করিয়াও কেহ তখন দেশের শত্রু বলিয়া গণ্য মোগলদিগকে সাহায্য করিলে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া কলঙ্কিত হইতে পারেন। তদুত্তরে বলা যায়, মানসিংহকে এমন সাহায্য ত কত লোকেই করিয়াছিলেন; চাঁচড়ার পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাপ চাঁদ রায় এইরূপ একজন সাহায্যকারী; অপবাদটা ভবানন্দের স্কন্ধে এত অধিক চাপিল কেন? তাঁহার গল্পই বা এত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল কেন?[১] কোন অকাট্য প্রমাণ না থাকিলেও ভবানন্দের সর্ব্বত্র-প্রচারিত অপবাদ তাঁহার যশোহর-বাসের অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত 'রাণীয়ান্ বৃত্তি' একটি প্রধান সন্দেহের বিষয়। তৃতীয়তঃ, সামান্য মুহুরীগিরি চাকরীতে যতই পয়সা থাকুক এবং পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ পাইয়া তাঁহার অবস্থা যতই সচ্ছল হউক, উহা হইতে তাঁহার এমন সঙ্গতির পরিকল্পনা করা যায় না, যাহাতে তিনি ৭ দিন ধরিয়া মানসিংহের বিরাট বাহিনীর আহার যোগাইতে পারেন। নিশ্চয়ই মুহুরীগিরির পূর্ব্বে তাঁহার অন্য আয় ছিল। চতুর্থতঃ, 'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে' উল্লিখিত আছে যে, মজুমদার কিছু পূর্ব্বে 'লক্ষ্মীপ্রতিময়া সহ গোবিন্দপ্রতিমায়া বিবাহমহোৎসবং কারয়িতুং' বহুবিধ ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহা দ্বারা

---

১ শাস্ত্রী, 'প্রতাপাদিত্য' ১৩৯ পৃ; 'For a time Pratapaditya defied the great Akbar, and the conquest of his Kingdom was ultimately effected by Raja Man Singh chiefly through the treachery of Bhovananda Majumdar, who had been in the service of Pratapaditya as a pet Brahmin boy.'—Vidyabhushan, Dr. Jogendranath, *Hindu Castes and Sects*, p. 183.

মানসিংহের সৈন্যদলের আতিথ্য রক্ষা করেন। এই ব্যাপারে একটি সন্দেহ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উড়িষ্যা হইতে আনীত গোবিন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা জন্য ক্রমে ক্রমে কতকগুলি লক্ষ্মী বা রাধিকা প্রতিমা প্রস্তুত করান হয় (২৭০ পৃ), তন্মধ্যে কয়েকটি বসন্ত রায়ের অপছন্দ হওয়াতে রাজ সরকারের কর্ম্মচারীরা উহা লইয়া যান ; সম্ভবতঃ ভবানন্দ ঐরূপ একটি বিগ্রহ পাইয়া যশোহরের অনুকরণে গোবিন্দদেব বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া উহার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী এইরূপ একটি রাধিকা মূর্ত্তি লইয়া গিয়া বারাসতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বসন্ত রায় যথেষ্ট সাহায্য করেন ; যদি ঘটনা সত্য হয়, সে সাহায্যে ভবানন্দ বঞ্চিত হন নাই। পঞ্চমতঃ, মানসিংহ চাপড়ায় পৌঁছিয়া ভবানন্দকে যশোহরে যাইবার পথঘাটের মানচিত্র ও বিবরণী লিখিয়া দিতে বলেন ; তদনুসারে 'মজুমদারঃ সবিশেষং সর্ব্বং লিখিত্বা সমর্পয়ামাস'[১]—অর্থাৎ সমস্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন ; উহা হইতে সিংহরাজা নিজের গতিবিধি ও সেনা নিবেশের ব্যবস্থা স্থির করিয়া লন। যখন মোগল সৈন্যের কুচ আরম্ভ হয়, তখন অশ্বারোহী ভবানন্দ সেনাপতির পাশে পাশে পথের পরিচয় দিতে দিতে যাইতেছিলেন :

"আগে পাছে দুই পাশে দু'সারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোহর-নগর ॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥"—ভারতচন্দ্র

যশোহর সম্বন্ধে এইরূপ বিশিষ্ট লিখিত বিবরণী দেওয়া একজন অপরিচিত লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানসিংহ যাঁহার নিকট 'অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া' সদুত্তর পাইতে পারেন, যশোহর সহরের সকল বিষয়ের সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। ভবানন্দের যশোহরে চাকরী করা অস্বীকার করিলেও, সে স্থানে তাঁহার বারংবার যাওয়া অস্বীকার করা যায় না। রাজসরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ব্যতীত তখন কেহ বারংবার সেই সুদূর সুন্দরবনের রাজধানীতে যাইত বলিয়াও মনে হয় না। যাহা হউক, সংক্ষেপতঃ আমাদের বিশ্বাস এই, সপ্তগ্রামে কানুনগো দপ্তরে চাকরি করার পূর্ব্বে তিনি যশোহরে ছিলেন এবং হয়ত

১ 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্' (বার্লিন-সংস্করণ) ; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ২৯৩ পৃ।

বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর প্রতাপের সহিত অসদ্ভাব বশতঃ বা রূপবসুর চক্রান্তে যশোহর ত্যাগ করেন। এমনও কথিত আছে, তিনি কচু রায়ের সঙ্গে আগ্রা বা রাজমহলেও গিয়াছিলেন, কিন্তু ততদূর আমরা বিশ্বাস করি না।

বর্ষা থামিবামাত্র মানসিংহ চাপড়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই ঝড়ে প্রতাপাদিত্যের নৌ-বিভাগেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ফিরিঙ্গি রডা প্রভৃতি সেনানীর অধীন কয়েকখানি জাহাজ যমুনার মুখে গঙ্গায় ছিল; মানসিংহের পথরোধ উহাদের উদ্দেশ্য। উক্ত ঝড়ে উহার কতগুলি জাহাজ মগ্ন হয় এবং সৈন্যগণ বিপন্ন হইয়া পড়ে। যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহারা রায়গড়ের দিকে প্রস্থান করিল। কচু রায় যখন সঙ্গে ছিলেন, তখন মানসিংহ সর্ব্বপ্রথমে রায়গড় অধিকার করিবার জন্যও যাইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা ছিল। সুতরাং নৌ-বাহিনীদ্বারা সে দিক সংরক্ষিত হইল।

মানসিংহ দ্রুতগতিতে রাণাঘাটের সন্নিকটে চূর্ণী পার হইয়া চাকদহে পৌঁছিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বাদশাহী সড়ক বা 'গৌড়বঙ্গের' পুরাতন রাস্তায় আসিতেছিলেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই রাস্তায় সৈন্য চলাচল করিত। চাকদহ হইতে সেই রাস্তায় ঘোড়াগাছা, সুবর্ণপুর, লাউপালা ও ফতেপুর দিয়া জাগুলিয়ায় পৌঁছিলেন। জাগুলিয়া একটি প্রধান পল্লী, তথা হইতে বাদশাহী সড়ক সোজা দক্ষিণে বারাসত পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহ সম্ভবতঃ সে রাস্তায় না গিয়া আর যে একটি ক্ষুদ্র পথ দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে হাবড়ার দিকে গিয়াছিল, বিলের মধ্য দিয়া সেই রাস্তা উচ্চ করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে অগ্রসর হইলেন। সৈন্যদল শ্রীকৃষ্ণপুরের মধ্য দিয়া হাবড়া ডান দিকে রাখিয়া বর্ত্তমান মছলন্দপুর ষ্টেশন বা রাজবল্লভপুরের নিকট পৌঁছিল; হ'রে শুঁড়ির যে রাস্তা চারঘাটে গিয়াছিল, এই রাস্তা তাহার সহিত মিশিয়াছিল। মাঠের মধ্য দিয়া উভয় রাস্তার চিহ্ন আছে এবং সাধারণ লোকে এখনও উহা চিনাইয়া দিয়া থাকে। এখন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে সুন্দর সরল পথ মছলন্দপুর হইতে বাদুড়িয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহার অধিকাংশই মানসিংহের নবগঠিত 'গৌড়বঙ্গের রাস্তা'র উপর দিয়া গিয়াছে। অজানা অচেনা নিম্ন-বঙ্গে ত্বরিত গতিতে পথ রচনা করিতে করিতে বিরাট মোগলবাহিনী কেমন করিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সব পুরাতন কাহিনীর চিন্তা লইয়া আমি মানসিংহের এই রাস্তায় বহু মাইল পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি।

মানসিংহ কোথায়ও থামেন নাই বা কোথায়ও তাঁহাকে বাধা দেওয়া হয় নাই। যমুনার মুখে, ত্রিবেণীতে বা চারঘাটে, যমুনা-ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে তাঁহাকে নৌপথে বাধা দিবার স্থান ছিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল যখন পদব্রজে চলিতেছে সংবাদ পাওয়া গেল, তখন রণতরী সমূহ সরিয়া গিয়া বসন্তপুরের সন্নিকটে যমুনার মধ্যে অবস্থিতি করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মোগল সৈন্যদলে অশ্বারোহী প্রধান সম্বল এবং পদাতিক সংখ্যা কম। সে পদাতিকগণ সিক্তবাত নিম্নবঙ্গে, সুন্দরবনের জল কর্দ্দমের মধ্যে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। এই-জন্য, মানসিংহ যখন নৌপথে আসিতেছেন না, তখন তাহাকে পথে বাধা দেওয়া হইল না, রাজ্যমধ্যে নিরুদ্বেগে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, সে প্রদেশে মোগল-সৈন্য বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সুখবিলাসী মানসিংহ ক্রমেই প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু অগ্রসর না হইয়া উপায় নাই। মছলন্দপুর ছাড়িয়া তাঁহাকে কোলসূর ও সিমুলিয়ার মাঝে পদ্মা-নদী পার হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানেও কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থানেব লোকজন শত্রুভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া ইছামতীর পূর্ব্বপারে আশ্রয় লইতেছিল।

মানসিংহ যখন চাকদহ হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন প্রধান প্রধান জমিদার ও প্রতাপাদিত্যের কিল্লাদারদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বপক্ষভুক্ত করিতেছিলেন। এই সময়ে যাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাদশাহী ফৌজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাঁচড়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ, ভবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাবরাম বা মুকুট রায় সর্ব্বপ্রধান (২৫৫ পৃ)।[১] তিনি যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তে প্রধান কিল্লাদার। তিনি সৈন্য ও রসদ পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার পূর্ব্বগৃহীত চারি পরগণা বহাল রহিল। অন্যান্য রাজন্যবর্গের মধ্যে নলডাঙ্গা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রণবীর খাঁ[২] এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্তবাগীশ যে মানসিংহের দরবারে সম্মানিত হইয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৪৩ পৃ)। কিন্তু সে ঘটনা মানসিংহের যশোহর যাওয়ার সময়ে, কি প্রত্যাগমনকালে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

১ Westland, *Jessore*, p. 45.
২ Mukherji, A.C., *Naldanga Raj Family*, p. 51.

মানসিংহ এ সময়ে কোন প্রকার কূটনীতি বাদ দেন নাই। প্রতাপের পক্ষীয় যাহাকে যাহাকে তিনি পক্ষচ্যুত করিয়া আনিতে পারেন বা যাহার যাহার নিকট হইতে প্রতাপের গূঢ় মন্ত্রণার সন্ধান লইতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষ্মীকান্তের সন্ধান করিয়াছিলেন;[১] কেহ কেহ বলেন, তিনি রূপরাম বসুর কৌশলে গুপ্তভাবে তাঁহার নিকট কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি যশোহরের সমীপবর্ত্তী হইলে, লক্ষ্মীকান্ত গোপনে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন।[২] শুধু যোগ দেওয়া নহে, যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে কি আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীকান্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়া দেন। তদ্দ্বারা মোগল সৈন্যের জীবন রক্ষা হয়। এইরূপে বিশ্বাসঘাতকদিগের অনুগ্রহে চারচক্ষু মানসিংহ সম্মুখীন কার্য্যক্ষেত্র নখদর্পণে দেখিতে দেখিতে সদর্পে অগ্রসর হন। সমুদ্রগামিনী নদী যেমন পার্শ্ববর্ত্তী শাখা সমূহ হইতে জলধারা পাইয়া ক্রমে প্রশস্ত হইতে হইতে অগ্রসর হয়, সামন্ত রাজন্যবর্গের সেনাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সেইরূপ মানসিংহের সৈন্যসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিরাট মোগল-বাহিনী বাস্তবিকই যেন অজগর সর্পের মত যশোর রাজ্যে প্রবেশ করিল।

দ্রুতবেগে কুচ করিয়া মোগল-সৈন্য বাদুড়িয়া হইতে ক্রমে বসিরহাট ও টাকী অতিক্রম করিয়া হাসনাবাদে আসিয়া পৌঁছিল। উহারই সম্মুখে বুড়নহাটি দুর্গ। বুড়নহাটির নাম এখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন নদীর বাঁকে উহা সুন্দর স্থান ছিল। সেখানে একটি সাময়িক দুর্গও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হাসনাবাদের সন্নিকটে মোগল সৈন্যের গতিরোধের জন্য সামান্য সংঘর্ষ হয় ও তাহাতে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। যেখানে ঐ সংঘর্ষ হয়, তাহারই বর্ত্তমান নাম লস্করপুর। মানসিংহের সঙ্গে যে ২২ জন সেনানীর অধীন ২২টি লস্কর বা সৈন্যের দল আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত যুদ্ধের স্মরণার্থ লস্করপুর নাম হওয়া বিচিত্র নহে। ঐ স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি পুষ্করিণী খনন কালে রাশি রাশি মনুষ্যাস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যুদ্ধ-মৃত সৈন্য ব্যতীত সাধারণ লোককে তেমন রাশীকৃত

১ কেহ কেহ বলেন, পাটুলির জমিদার শুভ্রমণির সহায়তায় লক্ষ্মীকান্তকে সন্ধান করিয়া বাহির করা হয়, উহার পুরস্কার স্বরূপ শুভ্রমণি রাজা উপাধি ও জমিদারী প্রাপ্ত হন।—'কলিকাতা, সেকালের ও একালের', ৬৬-৮ পৃ।

২ 'বিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, ২৭৩ পৃ—'প্রতাপাদিত্য' প্রবন্ধ (চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)।

করিয়া একস্থানে কবর দেওয়া হয় না। বুড়নহাটি ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে গিয়া মোগল সৈন্য কালিন্দী পার হইয়াছিল। বসন্তপুরের পশ্চিম দিয়া এখন যে বিশালকায়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ কালিন্দী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তখন তাহার সে মূর্ত্তি ছিল না। তখন কালিন্দী বিশীর্ণা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মাত্র। মানসিংহ অনতিবিলম্বে এই কালিন্দী খাল পার হইয়া বসন্তপুরে ছাউনি করিলেন। একটু দূরে দক্ষিণ দিকে সরিয়া কালিন্দী পার হইলে, ইচ্ছামতীর বক্ষ হইতে রণতরী সমূহের কামানশ্রেণী কোন বাধা দিতে পারে না। এখন যে স্থানটিকে বাগ্ বসন্তপুর বলে, সেই স্থানে প্রায় দুই মাইল জুড়িয়া মোগল শিবির স্থাপিত হইয়াছিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি

মানসিংহ কালিন্দী পার হইয়া বসন্তপুরে ছাউনি করিলেন, কারণ তাঁহার আর অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। সেই স্থানে তিনি আসিয়া দেখিলেন, চারিধারে প্রতাপাদিত্যের বিভিন্ন প্রকারের সৈন্যসমূহ ঘনীভূত মেঘমালার মত সমবেত হইতেছে। মোগল শিবিরের দক্ষিণ দিকে মুকুন্দপুরের গড়-বেষ্টিত দুর্গ। ইহাই যে যশোর-রাজ্যের প্রথম ও প্রাচীন রাজধানী, তাহা আমরা পূর্ব্বে স্থির করিয়াছি (১৫৭ পৃ)। রাজধানীর সে পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ-প্রাকারের উপর সারি সারি কামানশ্রেণী সুসজ্জিত। পার্শ্ববর্ত্তী বারকপুর ও পরবাজপুর প্রভৃতি স্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসমূহ সমবেত হইতেছিল। বসন্তপুরের উত্তর কোণ হইতে যমুনা নদী ৩।৪ মাইল মাত্র পূর্ব্বদিকে গিয়া পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া একেবারে ধূমঘাট দুর্গের পাদদেশে পৌছিয়াছিল। আজকাল যমুনা একটি শীর্ণকায়া খালের মত হইলেও উহার উভয় পার্শ্বে প্রায় একক্রোশ বিস্তৃত খাত এখনও পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় দিতেছে। সেই যমুনা তখন মোগল শিবির হইতে একটু দূরে সমকোণ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ব দিক জুড়িয়া ছিল এবং উহার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের ঘন-সন্নিবিষ্ট রণতরী সমূহের অনলবর্ষী তোপ-শ্রেণী তীর লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ছিল ; মাস্তুলে মাস্তুলে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য চিহ্নিত পতাকা উড়িতেছিল।

সুতরাং এই স্থানেই যে যুদ্ধ হইবে, তাহা মানসিংহের বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না। মোগল-সৈন্য যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্ব লুণ্ঠনাদি দ্বারা উৎসন্ন হইয়াছে। বসন্তপুরের দক্ষিণ হইতে ধূমঘাট পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজধানীর পঞ্চক্রোশী সহর বলিলে চলে। মোগল সৈন্যকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিলে, প্রজাকুল ব্যাকুল হইবে। মোগলদিগের কালিন্দী পার হইবার সংবাদ পাইবামাত্র বহু প্রজা শত্রুভয়ে যথাসর্ব্বস্ব সঙ্গে লইয়া মুকুন্দপুর ও ধূমঘাটের দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এই জন্য মানসিংহ আসিতে না আসিতে প্রতাপের সৈন্যজাল তাঁহাকে তিন দিক হইতে বেড়িয়া ধরিল। মানসিংহ সহসা যুদ্ধার্থ আক্রমণ করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি শত্রু সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে এবং বনোদ্যানের

অন্তরালে লুক্কায়িত শত্রু-সেনার একটা পরিমাণ ঠিক করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। কোথায় বারুদপূর্ণ সুড়ঙ্গ খনিত হইয়াছে এবং কি কি প্রকার কূট যুদ্ধে বঙ্গীয় সৈন্যগণ সুদক্ষ, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। মোগলের সমগ্র বাহিনী আসিয়া পৌছিতেও কয়েক দিন লাগিয়াছিল। বিরাট মোগল বাহিনীতে না থাকিত এমন ব্যবস্থা নাই। হাটবাজার বা হাসপাতাল ত সঙ্গে চলিতই, এমন কি আমোদ প্রমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থাও বাদ পড়িত না। বিশেষতঃ মানসিংহ নিজে মোগল সংস্পর্শে থাকিতে থাকিতে



রাজা মানসিংহ

বিলাসিতার চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার মরণকালে ১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৬০ জন চিতারোহণ করিয়াছিলেন।[১] যুদ্ধাভিযানে যাইয়াও তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ব্যাপার ভুলিতেন না ; এ সব বিষয়ে তিনি বিলাসী বাদশাহের উপযুক্ত সহচর ছিলেন। সেনাপতি ও আমীরগণের জেনানা-মহল সঙ্গে চলিত এবং সুযোগ মত লুণ্ঠন জুটিলে অনেকেই সে মহলের স্ত্রী-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। যানবাহন ও রসদাদি সম্বলিত সমগ্র সৈন্যদলের শিবির সন্নিবেশ করিতে একটু

১ *Ain*. (Blochmann), p. 341.

বিলম্ব হওয়ারই কথা। তন্মধ্যে মানসিংহ প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রতাপাদিত্যের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

মোগল-দূত একগাছি শৃঙ্খল ও একখানি তরবারি লইয়া প্রতাপাদিত্যের দরবারে উপস্থিত হইল এবং রাজার যাহা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া সদর্প-প্রশ্ন করিল। প্রতাপের আদেশে নকীব কেশব ভট্ট[১] দম্ভভরে তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, উহা যেন রাজপুতবীর তাঁহার প্রভুর শ্রীচরণে পরাইয়া দেন। আর মানসিংহ যে মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া পতিত ও কলঙ্কিত হইয়াছেন, সে কথাও বাদ পড়িল না। দূত যথাসময়ে এই সংবাদ আনিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে যুদ্ধসম্বন্ধীয় সাজ সরঞ্জাম আরব্ধ হইল। মানসিংহ চৈত্র মাসে রাজমহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হন বলিয়া বোধ হয়। যশোহরে আসিতে প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং সম্মুখে বর্ষাকাল। বর্ষা আসিলে সুন্দরবন অঞ্চল জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাইবে; শুষ্কদেশবাসী মোগল-সৈন্যের পক্ষে তখন নিম্নবঙ্গে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সিক্তস্থানে বাস ও আবিল জল পান করিয়া শুধু যে রোগ পীড়া হইবে, তাহা নহে; সর্পভয় এবং মশক ও জলৌকার উৎপাতই তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। অতএব যত সত্বর সম্ভব যুদ্ধ শেষ করিয়া প্রস্থান করিতে হইবে।

বসন্তপুর ও শীতলপুরের পূর্ব্বভাগস্থ প্রান্তরমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইল। হাব্‌সি ও তুর্কীসৈন্য উভয় পার্শ্বে রাখিয়া মহাবীর মানসিংহ স্বীয় ২০ হাজার রাজপুতসৈন্য সহ মধ্যস্থলে রহিলেন; সামন্তরাজগণের প্রেরিত ও অন্যভাবে সংগৃহীত সৈন্যসমূহ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। প্রতাপের পক্ষে যমুনার তীর দিয়া সামন্ত ও সেনানীবর্গ ছাউনি করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উড়িষ্যার গণপতি নরেন্দ্র, কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ, খোজা কমল, ঢালী সর্দ্দার মদন মল্ল ও কালিদাস রায়, কুকীসৈন্য সহ রঘু এবং দক্ষিণদিকে বারকপুরের কাছে অশ্বসেনাপতি প্রতাপসিংহ দত্ত প্রভৃতির নাম করা যায়। পশ্চাতে নদীর কূলে প্রতাপ, তাঁহার প্রধান সেনাপতি সূর্য্যকান্ত এবং শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য

১ নকীব কেশব ভট্টের যে স্থানে বাসস্থান ছিল, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী সেই স্থানকে এখন লোকে নকীবপুর বা নকীপুর বলে।

যোদ্ধৃগণের পটমণ্ডপ সজ্জীভূত হইয়াছিল। উভয়পক্ষের কামান সকল সম্মুখ ভাগে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারই ধ্বনির সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল।

ঘটকেরা বলেন তিন দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ হয়, প্রথম দুই দিনে মানসিংহ পরাজিত ও তৃতীয় দিনে তিনি বিজয়ী হইয়া প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন। এই ঘটকের পুঁথির ভিত্তির উপর 'ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত' ও ভারতচন্দ্রের কবিতা রচিত হইয়াছিল ; পুঁথির কথা প্রবাদে বিজড়িত হইয়া দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল; আধুনিক গ্রন্থকারগণ সকলেই পুঁথির মতের অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটকের যে পুঁথি শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রকাশিত করেন, তাহাও ঘটনার বহু পরে লিখিত। ঐ পুঁথিতে অনেকস্থলে অম্বররাজ মানসিংহকে 'জয়পুরাধীশ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে হয় এবং জয়পুর শহর মানসিংহের বংশধর জয়সিংহ কর্ত্তৃক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।[১] সুতরাং পুঁথিখানি ঘটনার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে লিখিত বলিয়া ধরা যায়। ঘটকেরা কেহ যুদ্ধের দর্শক-সাক্ষী নহেন বা চাক্ষুষ প্রমাণের উপর পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্য কোন সমসাময়িক বিবরণী দেখিয়া যদি তাঁহারা লিখিতেন, তাহা হইলে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, এমন কথা গ্রন্থিত হইত না। আমরা 'বহারিস্তানের' লেখকের চাক্ষুষ প্রমাণ হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন নাই, বন্দী করিয়াছিলেন ইস্‌লাম খাঁ এবং সেও ৫।৬ বৎসর পরে। পর পরিচ্ছেদে সে কাহিনী বিবৃত হইবে। এই অবস্থায় ঘটকের কাহিনী বিশ্বাস করিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খুঁটিনাটি বর্ণনা বা সজীব চিত্র দেওয়া চলে না। পূর্ব্বের আয়োজন ও শেষফল হইতে যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়া লওয়া যায়, আমরা তাহাই দিব এবং পাঠকগণ তাহাতে আপাততঃ তৃপ্তিলাভ করিবেন।

এই মাত্র বলিতে পারি, মানসিংহের সহিত প্রতাপ-সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এ যুদ্ধ একদিনে শেষ হয় নাই বা এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। যুদ্ধ কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং বসন্তপুর হইতে ধূমঘাট পর্য্যন্ত নানাস্থানে

১ ইঁহার নাম সেবাই জয়সিংহ, ইনি অম্বর-রাজবংশের কৃতীপুরুষ। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে জন্ম এবং ১৭৪৩ অব্দে মৃত্যু হয়। তিনিই জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা, এবং দিল্লী, জয়পুর ও কাশীর মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় খ্যাতি লাভ করেন।

বিষম সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। অগ্নি-যুদ্ধে মোগল সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; পর্টুগীজ কর্ম্মচারীদিগের অধীন গোলন্দাজেরা সুকৌশলী ও অসমসাহসী ছিল। বঙ্গীয় ঢালী সৈন্যগণ সাহসের বলে অদ্ভুত রণ-ক্রীড়া দেখাইত; বিশেষতঃ আদিম পার্ব্বত্য জাতিদিগের দ্বারা প্রতাপ যে কুকীসৈন্য গঠন করিয়াছিলেন, তাহারা জল-কর্দ্দমে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কোন ক্লেশ বোধ না করিয়া, অসাধারণ সহিষ্ণুতার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিত। প্রতাপের হস্তিসৈন্য অনেক বেশী ছিল; মুক্ত প্রান্তরে মোগল অশ্বারোহী অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইলেও তাহারা বনে জঙ্গলে কর্দ্দমাক্ত স্থলে হস্তিসৈন্যের আক্রমণের বিপক্ষে



কুকী সৈন্য

কিছুই করিতে পারিত না। অপর পক্ষে মোগলের সৈন্যসংখ্যা খুব বেশী। কাব্য বা প্রবাদের অতিরঞ্জন মানিয়া লইলে, প্রতাপের ৫২ হাজার ঢালী, ৫১ হাজার ধানুকী, ১০ হাজার অশ্বারোহী এবং ১৬০০ হস্তী ছিল। ইহা ব্যতীত 'মুদ্গর প্রাস্-হস্ত' অর্থাৎ দণ্ডধারী শড়্‌কীওয়ালা অনিয়মিত সৈন্যও ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে ৫২ হাজার ঢালী ও ৫১ হাজার ধানুকী, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ লোক,

কিম্বা একজাতীয় কতক অন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা স্থির করা যায় না। পৃথক্ পৃথক্ ধরিলে প্রতাপাদিত্যের পদাতিক সংখ্যাই লক্ষাধিক বলিতে হয়। কিন্তু তত বিশ্বাস হয় না, কারণ ৪।৫ বৎসরের মধ্যে ঐ সংখ্যা কমিয়া ২০ হাজার মাত্র হইতে পারে না।[১] যাহা হউক, প্রতাপের সৈন্য যাহা ছিল, মানসিংহের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। রূপরাম, কচু রায় প্রভৃতির চেষ্টায় সে সংখ্যা আরও বাড়িতেছিল, অনেকে প্রতাপের দল ছাড়িয়া কচু রায়ের দলে মিশিতেছিল। যতদূর জানা যায়, ভৃত্য ও বাহকের হিসাব ধরিলে, মানসিংহ সর্ব্বসমেত প্রায় তিনলক্ষ লোক লইয়া যশোহরাক্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্বদেশ সেবার এক নূতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, উদ্‌যাপন করিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহার সেই ব্রতের সঙ্গে আত্মপ্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা যোগ দেওয়াতে তাঁহার সাধনাকে স্বার্থ বিমুক্ত পবিত্র দেশ-হিতৈষণা বলা যায় না। কিন্তু তবুও তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, এবং সে চেষ্টা সফল হয় নাই। উহার প্রধান কারণ, তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিশ্বাস-ঘাতকতার কাহিনীতে পূর্ণ। এই যুদ্ধের সময়ও প্রতিদিন তাঁহার পক্ষীয়েরা মোগল শিবিরে আশ্রয় লইতেছিল। ইহার মধ্যে একজনের নাম গণপতি নরেন্দ্র, ইনি উড়িষ্যার একজন সামন্ত নৃপতি। তিনি যেখানে ছাউনি করিয়াছিলেন, তাহারই নাম রাখা হয়—গণপতি। শীতলপুরের পার্শ্বে এখনও গণপতি গ্রাম আছে। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিল, তাহাতে উভয় পক্ষের অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছিল। মানসিংহের সৈন্য অধিক এবং তাহা নানা মতে বাড়িতেছিল; প্রতাপের সৈন্য কম এবং যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকতার জন্যও তাহা কমিতে-ছিল। প্রতাপ জিতিয়া জিতিয়া হারিতেছিলেন, মানসিংহ প্রথমতঃ হারিলেও নিত্য নূতন স্থান দখল করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। মানসিংহ প্রতাপকে চিনিতেন এবং অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উড়িষ্যাভিযানে প্রতাপের বীরত্বের কথা তাঁহার মনে ছিল। তিনি যশোহরের যুদ্ধে বঙ্গীয় বীরের অসাধারণ সমর-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে মহাবীর, বীরের মহত্ত্ব বুঝিতেন।

---

১ ইস্‌লাম খাঁর শাসনকালে আব্দুল লতীফ্ নামক এক ব্যক্তি দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে আসেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের 'যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ সাত শত নৌকা বিশহাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য' ছিল। —'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

যুদ্ধান্তে তিনি জয়লাভ করিলেও বীরত্বের সম্মান রাখিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি মিবারাধিপতি প্রতাপসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। স্বদেশসেবাব্রত প্রতাপাদিত্যকে তিনি খাঁচায় পুরিয়া লইয়া গেলে, বাস্তবিকই রাজপুত-চরিত্রের অবমাননা করা হইত। তাহা তিনি করেন নাই; কিন্তু তবুও কলঙ্কের ডালি কেন তাঁহার স্কন্ধে চাপিল, তাহা কিছুতেই খোঁজ করিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

সকল তথ্যের সার সংগ্রহ করিয়া আমরা এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়া নানা স্থানে কয়েকটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আমরা তিন দিনের যুদ্ধ উল্লেখ করিতে পারি। প্রথম যুদ্ধ বসন্তপুরের সন্নিকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির হয় না। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহারই সন্নিকটে ভীষণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই সর্ব্বপ্রধান; ইহাতে সম্ভবতঃ সূর্য্যকান্ত ও মদন মল্ল প্রভৃতি নিহত এবং শঙ্কর আহত অবস্থায় ধৃত হন। এই যুদ্ধে মানসিংহ জয়লাভ করিয়া পরদিন মুকুন্দপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তখন সন্ধির প্রস্তাব করিলেও প্রতাপাদিত্য স্বীকৃত হন নাই, এজন্য মোগল সৈন্য দ্রুতবেগে কুচ করিয়া ধুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হয়। এযুদ্ধে মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধ্যে মামুদ অন্যতম। সম্ভবতঃ তাঁহারই নামানুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পক্ষেও ফিরিঙ্গি রডা প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমরাহদিগের শবদেহ টেঙ্গা মস্‌জিদের পার্শ্বে লইয়া সমাহিত করা হয়। সন্ধি হওয়ার পর 'সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল'।[১] রামরাম বসু এইরূপ ভাবে অন্তরঙ্গতার কথা বলিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লওয়ার কথা বলেন নাই। তবে সে কথা রচিল কে?

উভয় পক্ষেরই সন্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। মানসিংহ দেখিলেন,

১ রামরাম বসু, 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র', ১ম সং, (১৮০১), ১৪৮ পৃ: [নিখিলনাথ, মূল ৬২ পৃ—শি মি]

বর্ষাকাল সমাগতপ্রায় ; তৎপূর্ব্বে সৈন্যদিগকে সুন্দরবন হইতে স্থানান্তরিত না করিলে ব্যাধির প্রকোপেই তাহার অধিকাংশ মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। বিশেষতঃ তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তিনি যে সেনাপতি কিল্‌মক্‌কে শ্রীপুরের কেদার রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সৈন্যসহ শ্রীপুরে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন।[১] অচিরে সৈন্যসহ গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এজন্য প্রতাপাদিত্যের সহিত সত্বর সন্ধি করিতে হইল। এদিকে প্রতাপও তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের মৃত্যু এবং বন্ধুবান্ধবের কৃতঘ্নতার জন্য নিতান্ত বিপন্ন ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুর্দ্দিন দেখিয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়াছিল। বসন্ত রায়ের মধুর চরিত্র তখনও লোকের স্মৃতিপথে ছিল এবং তাঁহার নৃশংস হত্যার বার্ত্তা তখনও কেহ ভুলিতে পারে নাই। সেই বসন্ত রায়ের প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র কচু রায়কে মোগলসৈন্যের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া, অনেকেরই সহানুভূতি তাঁহার দিকে গিয়াছিল। কচু রায় যাহাতে পৈতৃক রাজ্য পান, শত্রুমিত্র সকলেরই তাহাই অভীপ্সিত ছিল। জ্ঞাতি-বিরোধই প্রতাপাদিত্যের পতনের কারণ হইয়াছিল।

আরও দুই-একটি ঘটনায় প্রতাপের প্রতি তাঁহার প্রজারা শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিল। ঘটকেরা বলিয়াছেন, মানসিংহের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন একদিন প্রতাপাদিত্য সুরামত্ত অবস্থায় দ্যূতক্রীড়া করিতেছিলেন ; এমন সময় এক বৃদ্ধা ভিখারিণী বারংবার ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল ; তখন তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধার স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিবার হুকুম দিলেন, সে আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। আবার কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্য একদিন প্রত্যূষে যখন সুরামত্ত অবস্থায় দরবারে আসিতেছিলেন, তখন এক মেথরাণী অনাবৃতবক্ষে সম্মার্জ্জনী হস্তে তাঁহার সম্মুখে পড়িল, তিনি সেই অপদৃশ্য দেখিয়া উহার স্তনদ্বয় কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। নানা ভাবে রূপান্তর হইলেও মূল ঘটনাটি অসত্য বলিয়া বোধ হয় না। মোট-কথা এই, তিনি লঘু পাপে একজন অসহায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। মোগলদিগের বড় বড় বাদশাহের আমলে তাঁহাদের এইরূপ নৃশংসতার কত শত সহস্র গল্প আছে, কত পাঠক ভিন্সেণ্ট

১ *Akbarnama* (Takmilla), Elliot, Vol. VI, p. 111.

স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকের গ্রন্থ পড়িতে গিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুরাজা প্রতাপের পাপকে কোন মতে লঘু বলিয়া মনে করা যায় না। হিন্দুর শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অবমাননা বা তৎপ্রতি নৃশংসতার মত পাপ আর নাই। হিন্দুর নিকট স্ত্রীলোকমাত্রেই বিশ্বজননীর অংশভূত; উহার প্রতি অত্যাচার হইলেই প্রকৃত ধর্ম্মগ্লানি হয়, উহার জন্য ভগবতী কখনও ক্ষমা করেন না। তিনি সেরূপ অত্যাচারীকে যুগে যুগে ভীষণ শাস্তি দিবার জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। রাবণ বা শুম্ভনিশুম্ভ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে প্রতাপ ক্ষমার্হ নহেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ সুরাপানের দোষে পিতৃব্য হত্যাদি কয়েকটি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন; তাহার পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল, দেবতার অনুগ্রহে তাঁহার উন্নতি হয়; সুতরাং যখন তিনি নৃশংস ও অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন তাঁহার সে দেবানুগ্রহ থাকিতে পারে না। লোকের এই বিশ্বাস হইতেই এক গল্পের সৃষ্টি হইল। একদিন প্রতাপ দরবার গৃহে রাজকার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময়ে ভগবতী প্রতাপের ষোড়শী কন্যার রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি কন্যাকে প্রকাশ্য দরবারে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 'দূর হও' বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন; মাতাও 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতাপের প্রতি বিমুখী হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।[১] তাই কবির লেখনী-মুখে ফুটিল—'বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপাদিত্য হারে'। বিমুখী হওয়া শুধু কথার কথা নহে, মাতা যশোরেশ্বরী সত্য সত্যই মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। 'পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া, তাঁহারে অকৃপা করি।'

এইজন্য প্রবাদ আছে, মাতা যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া মন্দির সমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন। একথা আমরা একেবারেই বিশ্বাস করি না। সে বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (১৪৩-৪৪ পৃ)। মাতা যেরূপ ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তেমনই আছেন। তবে প্রতাপের ঔদ্ধত্য ও নৃশংস চরিত্রে ভগবতীর অকৃপা হইয়াছিল, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

১ এই গল্পটিও ঘটক-কারিকায় অন্যভাবে বর্ণিত আছে। যুদ্ধকালে রাত্রিতে যখন 'মধুপানান্নরাধীশঃ হতচিত্তোঽতিবিহ্বলঃ' হইয়া অন্দরে কেলীমন্দিরে ছিলেন, তখন এক ষোড়শী সুন্দরী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে ভ্রষ্টা স্ত্রী মনে করিয়া রুষ্ট ভাষায় গালি দিয়া তাড়াইয়া দেন।

প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। লিখিত কোন বিবরণী না থাকিলেও সে সন্ধির মর্ম্ম এইরূপ বলিয়া বোধ হয় :

১ রাঘব বা কচু রায় পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর রাজ্যের ছয় আনা অংশ পাইয়া যশোহরের প্রাচীন রাজধানীতে অধিষ্ঠান করিলেন এবং তাঁহার উপাধি হইল, 'যশোহরজিত'।[১] রায়গড় দুর্গ পূর্ব্ববৎ তাঁহার অধিকারে আসিল।

২ প্রতাপাদিত্য যশোর রাজ্যের ৷৷৵ আনা অংশ এবং স্বোপার্জ্জিত অন্যান্য বহু পরগণার মালিক হইয়া, মোগল বাদশাহের সামন্তরাজ বলিয়া পরিচিত হইতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্ত দুর্গ বা রণতরী সমস্তই রহিল ; কেবলমাত্র স্বাধীনতার চিহ্ন—পতাকা ও স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবার আদেশ হইল।

৩ উভয়পক্ষের বন্দীদিগকে বিনাপণে ফেরত দেওয়া হইল। কথিত আছে, মানসিংহ পণ্ডিতবীর মহাপ্রাণ শঙ্করের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বাদশার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করিব না,' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্ত করিয়া দেন।[২]

এই সন্ধি প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য। আকবরের শাসনকালে তাঁহার সামন্ত রাজগণকে বাদশাহের সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহাকে কন্যা বা ভগিনী সম্প্রদান করিতে হইত। এইভাবে উপহারপ্রাপ্ত মহিলাদিগকে ডোলার কন্যা বলিত। মানসিংহের পিতৃস্বসাকে আকবর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভগিনীর সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। মানসিংহ ধর্ম্মে হিন্দু থাকিলেও বিলাসপ্রিয়তা ও হাবভাবে মোগলদিগের ঘৃণিত অনুকরণ করিয়াছিলেন।

---

১ ঘটকের পুঁথিতে অনেকস্থলে রাঘব রায়ের নামোল্লেখ না করিয়া 'রাজা যশোহরজিৎ' বলিয়া লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

২ শঙ্করের বংশধর শাস্ত্রী মহাশয় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন : 'তিনি (শঙ্কর) সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গঙ্গাবাস উপলক্ষে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী বারাশাত গ্রামে সপুত্রে আসিয়া বাস করেন।'—'প্রতাপাদিত্য চরিত', ১৬১-২ পৃ। যশোহর-ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে শঙ্করহাটি গ্রামে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর আবাস ছিল, এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। শঙ্করহাটির হাট প্রসিদ্ধ ছিল।

এইরূপে তিনি আকবরের এত প্রিয়পাত্র হন যে, বাদশাহ তাঁহাকে ফর্জাণ্ড (Farzand) বা পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন।[১] তিনিও বাদশাহের অনুকরণে অনেক দেশের বহু জাতির মধ্য হইতে স্ত্রীগ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার ১৫০০ স্ত্রী জীবিত ছিল। কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বশ্যতা স্বীকার করিলে মানসিংহ তাঁহার ভগিনীকে (পদ্মেশ্বরী) বিবাহ করেন।[২] কথিত আছে এই পদ্মেশ্বরীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধরই এখন জয়পুরের রাজা।[৩] এইরূপ ভাবে প্রবাদ আছে, মানসিংহ প্রথমবার শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের সহিত সন্ধি করিবার সময় তাঁহাব কন্যা বিবাহ করেন। অম্বরের শিলাদেবীর বাঙ্গালী পুরোহিতগণের বংশাবলীতে ইহার উল্লেখ আছে।[৪] প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও এইরূপ একটি গল্প আছে। কিন্তু উক্ত বংশাবলীতে বা ঘটককারিকাদি গ্রন্থে প্রতাপের কোন কন্যা সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করিবার কথা পাওয়া যায় না। প্রতাপের দুইটি মাত্র কন্যা; স্বশ্রেণীভুক্ত কায়স্থ-বংশেই তাহাদের বিবাহের কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে (১০৮ পৃ)। কিন্তু রামরাম বসু লিখিয়া গিয়াছেন: 'প্রতাপাদিত্য তাঁহার ডোলার এক সুন্দরী কন্যা আপন কন্যা প্রচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহরাজার পুত্রের সহিত।'[৫] এ উক্তির কোন মূল আছে বলিয়া মনে হয় না, থাকিলেও সম্প্রদত্ত কন্যাটি প্রতাপাদিত্যের নিজের কন্যা নহে। যশোহরে আসিবার সময়ে সিংহরাজার সহিত তাঁহার কোন পুত্র আসিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তাঁহার পুত্র হিম্মত সিং, দুর্জ্জন সিংহ ও জগৎ সিংহ ইতোপূর্ব্বেই (১৫৯৭-৯৯) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।[৬]

---

১ *Ain.* (Blochmann), p. 339.

২ *Akbarnama*, Vol. III, p. 1068.

৩ 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস', ১৩৯ পৃ।

৪ 'যদি রাজা মানসিংহজী উঁকী বেটী মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী।' অর্থাৎ 'মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন।'—নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৫০৮-১০ পৃ। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কোন বিশেষ কারণ না দর্শাইয়া এই ঘটনা 'সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য', এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।—'কেদার রায়', ৫৭ পৃ। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিবাহ স্বীকৃত হইয়াছে।—৪৪৭ পৃ।

৫ রামরাম বসু, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', ১ম সং, ১৪৪ পৃ; নিখিলনাথ, মূল ৬২ পৃ।

৬ *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, pp. 1093-4, 1151. ১৫৯৭ অব্দে হিম্মৎ

সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইবার পর, মানসিংহ সর্ব্ববিধ কার্য্য মিটাইয়া রাঘব রায়কে উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষী-সৈন্য ও শিরোপা দিয়া যশোহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত শাক্ত। যুদ্ধান্তে সন্ধি হইবামাত্র তিনি মাতা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া মহাসমারোহে পূজা করিলেন এবং তাঁহার আশীর্ম্মাল্য লইয়া যশোহর ত্যাগ করিলেন। এ দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতীয় লোকের নিকট একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোহর হইতে যাইবার সময় যশোরেশ্বরী দেবী প্রতিমা লইয়া গিয়াছিলেন। এ কথা যে সত্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে।[১] তবে এ কথা সত্য যে, মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে যাইবার সময় একটি দেবী প্রতিমা সঙ্গে লইয়া যান এবং উহা স্বীয় রাজধানী অম্বরনগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে প্রতিমা সেখানে আছে এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পূজা করাইবার জন্য মানসিংহ যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-দিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখনও অম্বরে পূজারি আছেন। এক্ষণে বিচার্য্য এই, উক্ত প্রতিমাখানি তিনি কোথা হইতে লইয়া গিয়াছিলেন?

প্রথমতঃ, যশোহর হইতে যশোরেশ্বরীকে লইয়া যাওয়ার কথা, ঘটককারিকায় নাই, 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী'তে নাই, এমন কি 'অন্নদামঙ্গল' বা রামরাম বসুর গ্রন্থেও নাই। তবে এ প্রবাদের উৎপত্তি কোথায়? বরং রামরাম বসু যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন: 'লোকে বলে যশোরেশ্বরী ঠাকুরাণী। তিনি অদ্যাপিও আছেন।'[২] এ হইল ১৮০১ খৃঃ অব্দের কথা এবং স্বশ্রেণীর কায়স্থ পণ্ডিতের লেখা। বাস্তবিকই যশোরেশ্বরী দেবী এখনও আছেন, এবং

উদরাময়ে ও দুর্জ্জন যুদ্ধে মারা যান। ১৫৯৯ অব্দে বঙ্গে আসিবার পথে আগ্রায় জগৎ সিংহের মৃত্যু ঘটে।

১ মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহোদয় যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই জানেন। আমরা অন্যান্য যুক্তির সহিত সংক্ষেপে তাহারই সারমর্ম্ম এখানে প্রকটিত করিব। যিনি জয়পুর হইতে এই বিষয়ে নিখিলনাথকে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি জয়পুর মহারাজার কলেজের অধ্যাপক এবং বসন্ত রায়ের বংশধর নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়। উভয়ের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

২ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য,' মূল ৪৬ পৃ।

ঈশ্বরীপুরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। ক্রমে তাঁহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইতেছে। প্রবাদের সহিত এই কথার সামঞ্জস্য করিবার জন্য লোকে বলে, মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে লইয়া গেলে, কচু রায় তৎপরিবর্ত্তে অন্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। সে কথা টিকিত, যদি মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া লইতেন এবং পথে অন্ততঃ ১৬০৬ অব্দের পূর্ব্বে প্রতাপের মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ১৬০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য সদর্পে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং প্রতাপের মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬০৬ অব্দে কচু রায় নিজ অংশের রাজ্যভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায়কে দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রতাপের মত ভক্ত শাক্তবীর জীবদ্দশায় কখনও স্বীয় উপাস্য দেবতা দিয়া সন্ধি করিতেন না এবং মানসিংহ বলপ্রয়োগে লইতে গেলে, প্রতাপের মরণ না হইলে দেবীকে লওয়া যাইত না। মানসিংহ ১৬০৪ অব্দে বঙ্গে কার্য্যত্যাগ করিয়া আগ্রায় চলিয়া গিয়াছেন, পরে ১৬০৬ অব্দে তিনি ৮ মাসের জন্য বঙ্গে যাতায়াত করিলেও যশোহরে আর আসেন নাই। সুতরাং মানসিংহ যে যশোহর হইতে দেবী-প্রতিমা লইয়া যান নাই, ইহা নিশ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ, অম্বরে যে দেবীমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাকে লোকে সল্লাদেবী বা শিলাদেবী বলে। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন : 'শিলাময়ী নামে, ছিল তাঁর ধামে অভয়া যশোরেশ্বরী।' অর্থাৎ শিলাময়ী এবং যশোরেশ্বরী যেন অভিন্ন। উত্তরে বলা যায়, যশোরেশ্বরী যে শিলাময়ী বা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই ; তাঁহার নামও শিলাময়ী হইতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে শিলাদেবী বা সল্লাদেবী হইবেন, এমন কথা নাই।

তৃতীয়তঃ, প্রতাপাদিত্যের উপাস্য দেবতা কালিকামূর্ত্তি। ভারতচন্দ্রেও আছে, 'যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী' ; যশোরেশ্বরী মায়ের রৌপ্য কোশায় লিখিত আছে 'শ্রীকালী' (১৪৬ পৃ)। যশোরেশ্বরী মূর্ত্তি মুখমাত্রাবশিষ্টা লোল রসনা কালীমূর্ত্তি। অথচ অম্বরের সল্লাদেবী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি। দেবী প্রতিমা সমস্তই বিশ্বমাতার বিভিন্ন মূর্ত্তি হইলেও, শাক্ত উপাসকের ইষ্ট মন্ত্র ও ইষ্ট দেবতা একমাত্র হন, সময়ে বিভিন্ন মূর্ত্তি হন না। সুতরাং অম্বরের সল্লাদেবী প্রতাপাদিত্যের উপাস্য দেবী নহেন।

চতুর্থতঃ, প্রতাপাদিত্যের উপাস্য যশোরেশ্বরীর মুখখানি মাত্র আছে, তদ্ভিন্ন হস্তপদ কিছুই নাই। তাহার নিম্নাংশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডে গঠিত

পিণ্ডমাত্র। পীঠমূর্ত্তি অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি ঈশ্বরীপুরে গিয়া একবার সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন, তেমন মূর্ত্তি কেহ স্থানান্তরে লইতে চায় না বা লইয়া যায় না। অপর পক্ষে শিলাদেবী ক্ষুদ্রকায়া সুন্দর দুর্গামূর্ত্তি; ভক্তিমান মানসিংহ উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সাধ করিয়া লইয়া গিয়া অম্বরে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ, সল্লাদেবীকে যে মানসিংহ লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সত্য। জয়পুর অঞ্চলে এখনও প্রবাদ আছে 'আমেরকা সল্লাদেবী লিয়া রাজা মান।' বাঙ্গালী পদ্ধতিতে তাঁহার পূজা হয়; যে পুরোহিতেরা পূজা করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ বাঙ্গালা দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমপুরবাসী এবং পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখন তাঁহার বংশধরগণ রাজপুত ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করিয়া তদ্দেশীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। জয়পুরী ভাষায় লিখিত উঁহাদের একটি বংশাবলী আছে।[১] তাহার একস্থলে দেখিতে পাই: 'পাছে উঠানে কেদার কায়ত কো রাজ ছো। সো রাজা বাজৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতাকা প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী।······অর মাতা নেঁলে আয়া। আর বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো অর উঠা স্যূঁ কুঁচ করি আয়া।' অর্থাৎ 'অনন্তর ঐ দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল। তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাঁহাকে (কেদারকে) কেহই জয় করিতে পারিত না।······মাতাকে লইয়া

১ কমলাকান্ত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১০ পুরুষ হইয়াছে। (১) কমলাকান্তের পুত্র (২) রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌমের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার এক কন্যা বঙ্গদেশ হইতে আনীত রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান (৪) সন্তোষরাম। সন্তোষের পুত্র (৫) বিদ্যাধর, সওয়াই জয়সিংহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি অশেষ শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। তাঁহারই নক্সা অনুযায়ী জয়পুর নগরী নির্ম্মিত হয়। বিদ্যাধর হইতে একটি বংশধারা এইরূপ: ৫ বিদ্যাধর—৬ মুরলীধর—৭ লছমীধর—৮ বংশীধর—৯ শিওবক্‌স—১০ সূরজ বক্‌স (জীবিত)। জয়পুর মহারাজার কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল ৺মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহোদয় বিদ্যাধরের জীবনী লিখিয়া প্রথমে 'এডুকেশন গেজেটে' ও পরে ১৩১১ সালের 'সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন।—'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', ২৪৬-৫৫ পৃ।

আসিলেন। এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।'[১] আবার জয়পুর রাজস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার রামনাথ বারেট মহাশয় 'ইতিহাস-রাজস্থান' নামক এক হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার একস্থলে আছে :

'প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্য চড়াই কী। বহ জাতি কা কায়স্থ থা, ঔর সাল্লামাতা নামী দেবী কা উস্‌কে ইষ্ট থা ; মানসিংহজী কী লঢ়াইকে সমাচার স্থনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্র কী ঔর ভগ্ গয়া। ঔর মন্ত্রীসে কহ গয়া যদি হো সকে তো মেরী পুত্রী মানসিংহজীকো দে কর সন্ধি কর লেনা ; মন্ত্রীনে ঐসা হী কিয়া। মানসিংহজীনে প্রসন্ন হৌ কর কেদার কো বাদসাহ কা পাদসেবী বনা কর উস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবীকো আম্বের লে আয়ে।'[২]

ইহার বঙ্গানুবাদ এই : প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া মানসিংহ কেদারের রাজ্য আক্রমণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, শিলামাতা নামে তাঁহার ইষ্টদেবী ছিলেন। মানসিংহের যুদ্ধের কথা শুনিয়া নৌকায় সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করেন। এবং মন্ত্রীকে বলিয়া যান যে যদি সম্ভবপর হয়, তবে আমার কন্যা মানসিংহকে দিয়া যেন সন্ধি করিয়া লন। মন্ত্রী তাহাই করিলেন। মানসিংহ প্রসন্ন হইয়া কেদারকে বাদশাহের পাদসেবী (সামন্তরাজ) করিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। এবং সল্লাদেবীকে আম্বেরে লইয়া যান।

বংশাবলী ও 'ইতিহাস-রাজস্থান' ইহার কোনখানিকে আমরা অপ্রামাণিক বলিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত সবগুলি কারণ একত্র সমালোচনা করিয়া আমরা অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত সন্ধি করার পর কেদারের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাঁহার দেহান্ত ঘটিলে, মানসিংহ শ্রীপুর হইতে শিলাদেবীকে অম্বরে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে লইয়া যান নাই। যশোরেশ্বরীর যে দেবী-প্রতিমা এক্ষণে ঈশ্বরীপুরে নিত্য পূজিত হইতেছেন, তিনি প্রামাণিক প্রাচীন পীঠ মূর্ত্তি।

১ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য' (নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পত্র), মূল ৫০৭-১০ পৃ।

২ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য' (নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পত্র), ৫০৩-০৪ পৃ; 'ইতিহাস রাজস্থান', ১০৩-০৪ পৃ।

মানসিংহ যশোহর হইতে পুনরায় স্থল-পথেই রাজমহল ফিরিয়া আসেন এবং তথা হইতে রণতরী সজ্জিত করিয়া শ্রীপুরের কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করেন। শ্রীনগরের যুদ্ধে[১] কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হইলে, তিনি তথা হইতে কেদারের ইষ্টদেবতা শিলাদেবীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৬০৪)। এই সময়ে আকবরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে স্বীয় ভাগিনেয় সেলিম-পুত্র খসরুর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মানসিংহ ব্যস্ততার সহিত আগ্রা যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি ভবানন্দকে বাগোয়ান, মহৎপুব, নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, বয়সা ও মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণা এবং গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর, এই ৫ খানি পরগণা ও হাতিয়াগড়ের কতকাংশের জমিদারী প্রদান করেন। ভবানন্দ তাঁহার সঙ্গেই আগ্রায় যান, এবং আকবরের মৃত্যু জন্য বৎসরাধিক কাল অপেক্ষা করিয়া উক্ত ১৪ পরগণার জমিদারীর ফরমাণ বা সনন্দ এবং নহবৎ, ডঙ্কা, নিশানাদি সম্মানসূচক দ্রব্যসহ স্বদেশে আসেন (১৬০৬)। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় উক্ত সনন্দ বর্ত্তমান আছে। ঐ একই বৎসরে লক্ষ্মীকান্তেরও জমিদারী সনন্দ প্রদত্ত হয়। ইহারা উভয়েই পরে কানুনগো প্রভৃতি কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া মজুমদার উপাধি পান। তখন এইরূপ আর একজন মজুমদার ছিলেন—জয়ানন্দ; ইনি বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ এবং মানসিংহের অনুগৃহীত। বাঙ্গালার অধিকাংশ তখন এই তিন মজুমদারের হস্তে পড়িয়াছিল, এই জন্য 'তিন মজুমদারের বাঙ্গালা ভাগ' করিবার একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।[২] মানসিংহের সঙ্গে যে সব হিন্দুস্থানী সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহাদের কেহ কেহ সুন্দর স্থান ও স্বচ্ছন্দ জীবিকার ভরসায় বর্ত্তমান যশোহর-খুল্‌নার স্থানে স্থানে বাস করেন। এখনও সামটা, চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে পাঁড়ে, মিশ্র ও ত্রিবেদী বংশীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেছেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সুলেখক বীরেশ্বর পাঁড়ে এই বংশীয়। সবিশেষ বিবরণ পরে দিব।

১ যুদ্ধজয়ের পর মানসিংহ এই শ্রীনগরের নাম রাখিয়াছিলেন, ফতেজঙ্গপুর। উহার একাংশ এখনও নগর বলিয়া কথিত হয়। 'নগরের কেবল শ্রীটুকু নাই।'—আনন্দনাথ রায়,'বারভুঞা', ৯৯ পৃ।

২ 'কলিকাতা, সেকালের ও একালের', ৫৬ পৃ।

দ্বা ত্রিং শ প রি চ্ছে দ

দ্বিতীয় মোগল-সংঘর্ষ : ইস্‌লাম খাঁ

আকবরের মৃত্যুর পর (১৬০৫) জাহাঙ্গীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া দেখিলেন, বঙ্গে তখনও বিদ্রোহের শান্তি হয় নাই। এই সময়ে রাজা মানসিংহ আগ্রায় থাকিয়া নানা চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুদিনের জন্য পুনরায় বঙ্গে পাঠাইয়া দেন এবং আট মাস যাইতে না যাইতে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন। সে স্বল্পকালের মধ্যে যে তিনি রাজমহল ত্যাগ করিয়া বিশেষ কোন কার্য্য করেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩৩২ পৃ)। মানসিংহকে এবার ডাকিয়া আনিবার হেতু ছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, এই সময়ে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা শের-আফগানকে খুন করিয়া তাঁহার পত্নী মেহেরউন্নিসাকে হস্তগত করা জাহাঙ্গীরের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রাজপুতবীরের দ্বারা যে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন। সুতরাং কুতবউদ্দীনকে বঙ্গের নবাব করিয়া পাঠান হইল। শের-আফগানের সহিত সংঘর্ষে কুতব ও শের উভয়ে নিহত হইলেন। তখন মেহেরউন্নিসা আগ্রাতে নীত হইয়া কয়েক বৎসর পরে নুরজাহান নামে জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী এবং প্রকৃত রাজ্যেশ্বরী হইয়াছিলেন (১৬১১)। এদিকে কুতবের মৃত্যুর পর বিহারের শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁকে বঙ্গের নবাব করিয়া পাঠান হইল।[১] কিন্তু বৎসরাধিক কালের মধ্যে কুলি খাঁ মৃত্যুমুখে পড়িলে, ইসলাম খাঁ বঙ্গের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হইলেন (১৬০৮)।

ফতেপুর-শিক্‌রিতে এক মুসলমান পীর ছিলেন—সেখ সেলিম চিস্তি। তাঁহার প্রতি আকবর বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহারই বরে তিনি প্রথম পুত্র লাভ করিয়া উক্ত মহাপুরুষের নামানুসারে তাঁহার নাম রাখেন—সেলিম। ইসলাম খাঁ উক্ত সেখ সেলিমের পৌত্র, তাঁহার প্রকৃত নাম সেখ আলাউদ্দীন। ১৫৭০ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি জাহাঙ্গীরের এক বৎসরের ছোট, এবং উভয়ে

১ ইনি বঙ্গের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা খাঁ আজমের পুত্র, ইঁহার পূর্ব্বনাম সামসুদ্দীন খাঁ—*Tuzuk-i-Jahangiri* (Rogers), Vol. I, p. 144.

শৈশবে একত্র প্রতিপালিত হন বলিয়া অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। বাদশাহ হইয়াই জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ইসলাম খাঁ উপাধি দিয়া দুহাজারী মন্সবদার করেন। তিনি যেমন সাহসী, তেজস্বী, তেমনই সচ্চরিত্র, এমন কি কোন মাদক দ্রব্য পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না।[১] জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, আকবর যেমন মানসিংহকে পুত্র (ফর্জন্দ) বলিতেন, জাহাঙ্গীরও তেমনই তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং পাটনার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কুলি খাঁর মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম খাঁকে চার-হাজারি মন্সবদার করিয়া বঙ্গের নিজাম বা নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞতার জন্য কত জনে কত কথা বলিলেন, কিন্তু বাদশাহ তাহা শুনিলেন না। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, প্রতিভা বয়সের অপেক্ষা না করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। সে ধারণা সফল হইয়াছিল।

ভুঞাদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ তখনও অধিকৃত হয় নাই। মানসিংহ আসিয়া কতজনকে পরাজিত করিলেন, সন্ধি ও সৌহৃদ্য করিলেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা জলের উপর রেখার ন্যায় অচিরে তিরোহিত হইল। আকবর ও মানসিংহ শান্তি-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন ; কেহ বশ্যতা স্বীকার করিবামাত্র যুদ্ধে বিরত হইতেন। অবশ্য বিদ্রোহী দেশকে শাসন তলে আনিবার উহাই প্রথম পন্থা। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে সে পন্থা পরিত্যক্ত হইয়া রণ-নীতি আরব্ধ হইল , সামদানের স্থলে ভেদ ও দণ্ড নীতির প্রবর্ত্তন হইল। জাহাঙ্গীরের নবাবেরা বঙ্গীয় ভুঞাদিগকে সমূলে উৎপাটিত ও উৎসন্ন করিবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ আবার তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি এক মহাপ্রাণ সাধু ফকিরের পৌত্র হইলে কি হয়, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া তিনি কঠোর-প্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ভগিনীকে বিবাহ করায় রাজ-দরবারে তাঁহার একটা প্রতিপত্তি ছিল।[২] বাদশাহের প্রিয়পাত্র বলিয়া তিনি কঠোর নীতির বলে বঙ্গীয় রাজন্যবর্গকে নিষ্পেষিত করিয়া গিয়াছিলেন।

---

১ *Tuzuk-i-Jahangiri* (Rogers), Vol. I, pp. 208-9.

২ আবুল ফজলের এই ভগিনীর নাম লাড্‌লী বেগম ঃ উহার গর্ভে ইসলাম খাঁর যে পুত্র হয়, তাহার নাম হুশঙ্গ।—*Ain.* (Blochmann), p. 493 ; *Tuzuk.*, Vol. I, p. 173. হুশঙ্গই পরে ইকরাম খাঁ উপাধি পান।—*Tuzuk.*, Vol. II, p. 73.

এই সময়ে ইসলাম খাঁর সঙ্গে বঙ্গের দেওয়ান হইয়া আসিয়াছিলেন—আসফ খাঁ ; ইনি নুরজাহানের ভ্রাতা। আবদুল লতীফ নামক আহ্‌মদাবাদবাসী এক ব্যক্তি আসফ খাঁর অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে তখনকার বঙ্গের অবস্থাদি সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়।[১] বহারিস্তান নামক এক পারসিক গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে আরও অধিক সংবাদ পাওয়া যায় ; সে কথা আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার গ্রন্থকার মীর্জা নথন (মীর্জা সহন)[২] ইসলামের সেনানীবর্গের অন্যতম। আমরা এস্থলে মীর্জা নথন ও তাঁহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গে আসিব।

মীর্জা নথন আলাউদ্দীন ইস্পাহানী, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে, শিতাব খাঁ উপাধি পান, তাঁহার ছদ্ম নাম ঘাইবী ; এজন্য তাঁহার গ্রন্থের পুরা নাম— 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী'। ইহার পিতা ইহ্‌তামাম্ খাঁ (পূর্ব্বনাম মালিক আলি) আকবরের সময়ে কোতোয়াল বা শান্তি-রক্ষক সেনানী ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত আগ্রায় তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইসলাম খাঁর সময়ে তিনি

১ এই পারসিক পুঁথি হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যায়, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহোদয় তাহা ১৩২৬ আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। এখানে উহার সারোদ্ধার করিব। [কিছু সংস্কারান্তে উক্ত প্রবন্ধ অধ্যাপক সরকার পুনরায় 'শনিবারের চিঠি,' ১৩৫৫, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশ করেন। উহা পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হইল।—শি মি]

২ [অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বহারিস্তানের প্রথম পাঠোদ্ধারান্তে 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক সংখ্যায় 'প্রতাপাদিত্যের পতন' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থাকারের নাম 'মির্জা সহন' বলিয়া বলেন। নূতন পাঠোদ্ধারান্তে উক্ত প্রবন্ধ পুনরায় 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করেন, উহাতে 'মির্জা নথন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে তদনুযায়ী 'মীর্জা নথন'ই গ্রহণ করা হইল। এই প্রবন্ধ পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে Dr. M. I. Borah বহারিস্তানের ইংরাজী অনুবাদ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। উহার ভূমিকায় তিনি বলেন ; 'Sir Jadunath Sarkar...... calls the author as Mirza Saban which I believe is a misreading of the name Nathan. The manuscript is quite clear and there is very little room for doubt to call it otherwise. But the dots over the letters *nun* and *ta* are put so close to one another that one may easily be led to read it *sa*. Besides this we have definite evidence from the Assamese sources *e.g. Purani Asam Buranji, Kamrupar Buranji* and others, where he is often referred to as Mirza Nathan.'—শি মি]

একহাজারী মন্সবদারী পাইয়া বঙ্গীয় নওয়ারার মীর বহর হইয়া আসিয়াছিলেন।[১] পুত্র মীর্জা নথন তাঁহার সহকারী ছিলেন। বহারিস্তান বলিতে বসন্তের রাজ্য বুঝায়, উহাদ্বারা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত করে। এই গ্রন্থে ১৬০৮ হইতে ১৬২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ও মোগলাধিকৃত উড়িষ্যার বিশেষ বিবরণ আছে। উহার অধিকাংশ ঘটনা গ্রন্থকারের স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা; সুতরাং প্রামাণিক বলিয়া ধরা যায়, যদিও সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা করিতে হইবে যে বিজেতার পক্ষ হইতে লেখা বলিয়া উহা পক্ষপাতিতার হাত এড়াইতে পারে নাই। পুস্তকখানি চারি খণ্ডে অর্থাৎ দপ্তরে বা বাবে বিভক্ত। প্রত্যেক দপ্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ভাগ বা দস্তান আছে। প্রথম খণ্ডে ইসলাম খাঁর শাসন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম ইসলাম-নামা। সেই অংশই আমাদের প্রয়োজনীয়। উহার ৫ম দস্তানে ইসলামের সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ, ১০ম দস্তানে যশোহর ও বাক্‌লা আক্রমণ, প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও পতন এবং রামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার বর্ণিত হইয়াছে।[২]

নবাব ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রাজমহলে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঐ বৎসরের শেষ ভাগে প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী রাজকুমার সংগ্রামাদিত্যকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া রাজমহলে নবাবের সহিত দেখা করিলেন। প্রতাপাদিত্য

১ 'Ihtimam Khan was raised to the rank of 1,000 personal and 300 horse and made *Mirbahar* (admiral) and was appointed to charge of the *nawara* of Bengal.'—*Tuzuk*, Vol. I, p. 144.

২ অধ্যাপক সরকার মহাশয় প্যারিস হইতে এই গ্রন্থের যে হস্তলিখিত পুঁথির সমগ্র আলোক-চিত্র (rotograph) আনিয়াছেন, তাহা ৬৫৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এবং উহার প্রতিপৃষ্ঠায় ২১ লাইন করিয়া আছে। পুঁথিখানি গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত এবং ১৬৪১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উহা যে তাঁহার হস্তে ছিল, স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী টিপ্পনী হইতে তাহা জানা গিয়াছে। এই পুঁথির অন্য কোন প্রতিলিপি অন্য কোথায়ও আছে কিনা জানা যায় নাই। "The Bibliotheque Nationa'e of Paris possesses the only copy of it known to exist in the world. Its number is 'Gentil 42-supplement 252' and it is described on p. 356 (Entry no. 617) of E. Blochet's catalogue des Monacsrits persans, Bibliotheque Nationale, tome premiere (Paris, 1905)." অধ্যাপক সরকার মহাশয় এই পুস্তকের কতকাংশের বিবরণ বেহার ও উড়িষ্যা রিচার্চ সোসাইটির জর্ণালে (১৯২১) এবং কতক ১৩২৭ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—শি মি]

পুত্রের সঙ্গে নূতন নবাবের জন্য কয়েকটি হাতী এবং নানাবিধ বহুমূল্য উপহার-দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন ; এবং প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেও গিয়া দেখা করিবেন, একথাও পত্রে লিখিত ছিল। মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া প্রতাপাদিত্য যে মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সংগ্রামাদিত্যকে পাঠাইয়া নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করান তাহারই বাহ্য নিদর্শন। সংগ্রাম তখন বালক, নবাব তাহার সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। প্রতাপাদিত্যকে স্বয়ং আসিয়া দেখা করিবার জন্য লিখিয়া দেওয়া হইল। যে দুর্দ্ধর্ষ ভুঞাদিগের দমনের জন্য ইসলাম খাঁ বদ্ধপরিকর, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অন্যতম। সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আবদুল লতীফেব ভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানিতে পারি, এই সময়ে 'প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাঁহার যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য' ছিল।[১]

১৬০৮ ডিসেম্বর মাসের শেষে নবাব সদলবলে রাজমহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাদশাহী নওয়ারায় চড়িয়া তাঁহারা গঙ্গাপথে গোয়াশ পরগণার[২] উত্তর সীমান্তে পৌছিলেন। যেখানে নবাব পৌছিলেন, উহারই অপর পারে বুড়ুল নদীর মোহানা ও রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শরদহ নামক স্থান। ইহা একটি পুরাতন রাজপথের খেয়াঘাট। এখান হইতে একটি রাস্তা একদিকে গোয়াশের মধ্য দিয়া মুক্‌সুদাবাদের কাছে গৌড় বঙ্গের বাদশাহী সড়কে মিশিয়াছিল এবং অপর দিকে পদ্মা পার হইয়া পুঁটিয়া দিয়া ঘোড়াঘাটের সর্ব্বত্র যাওয়া যাইত। নবাব এইস্থানে পদ্মা পার হইবার সময়ে ভূষণার সত্রাজিৎ রায়ের ভ্রাতা কয়েকটি হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতেও সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি স্বয়ং শীঘ্র আসিয়া দেখা

১ 'আবদুল লতীফের ভ্রমণ'—'প্রবাসী', ১৩২৬ আশ্বিন, ৫৫২ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

২ গোয়াশ সহর এক্ষণে গঙ্গাতীর হইতে দক্ষিণে বহুদূরে অবস্থিত। গোয়াশ ভৈরব নদের প্রাচীন খাতের পার্শ্বে, উহার সন্নিকটে ইসলামপুর নামক একটি স্থানও আছে। ইসলাম খাঁ কখনও গোয়াশে আসিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। আসিতে হইলে অনেক ঘুরিয়া ভৈরব নদ দিয়া আসিতে হইত। রেণেলের ৬নং ম্যাপে মুর্শিদাবাদ হইতে গোয়াশ, শরদহ ও পুটিয়া দিয়া ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা অঙ্কিত আছে।

করিবেন। নবাব সত্রাজিৎকেও স্বয়ং আসিতে আদেশ করিলেন এবং ভুঞাদ্বয়ের আগমনের অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী আলাইপুর গ্রামে প্রায় দুইমাস কাল অপেক্ষা করিলেন। এইস্থানে থাকিবার কালে নবাব ইহ্‌তামাম্ খাঁর অধীন বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা এবং তোপখানার মহলা (review) পরিদর্শন করিলেন। ১৬০৯ অব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এইস্থানে কাটিয়া গেল। তবুও প্রতাপাদিত্য বা সত্রাজিৎ আসিলেন না। তখন নবাব পুনরায় উত্তর দিকে কুচ (march) আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদূরে ফতেপুর নামক স্থানে পৌছিয়া পুনরায় একমাস অপেক্ষা করিলেন। সেখানে সত্রাজিৎ ১৮টি হাতী উপহার দিয়া দেখা করিলেন। ৩০শে মার্চ্চ পুনরায় সেখান হইতে কুচ চলিল। পথে অন্যান্য ভুঞাগণ উপহার দিয়া গেলেন।

আরও একটু উত্তর দিকে আত্রেয়ী নদীর তীরে, বর্ত্তমান নাটোরের ১৫ মাইল উত্তরে বজ্রপুর নামক স্থানে ২৬শে এপ্রিল তারিখে সেখ বদীর সহিত প্রতাপাদিত্য আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ৬টি হাতী, নানা মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপহার দিলেন।[১] বহারিস্তান হইতে আমরা জানিতে পারি, এই সাক্ষাৎকালে 'ইসলাম খাঁ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট কথাবার্ত্তা কহিতে থাকিলেন। তাহার পর এই সর্ত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন যে, দেশে ফিরিয়া [তিনি] তাঁহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটি প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন, তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদশাহী সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন এবং বর্ষাশেষে স্বয়ং আরও একশত নৌকা (একুনে পাঁচ শত), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দল খাঁ [আড়িয়াল খাঁ] নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটির জমিদার মুসা খাঁ মসনদ-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।'[২]

---

১ 'লতীফের ভ্রমণ'—'প্রবাসী', ১৩২৬, ৫৫৩ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

২ 'প্রতাপাদিত্যের পতন'—'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক, ২ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

প্রতাপাদিত্যের মত পরাক্রান্ত ভুঞা এইভাবে সাহায্য করিলে, নবাবের পক্ষে ভাটি রাজ্যের সমস্ত রাজন্যবর্গকে করতলস্থ করা সহজ হইবে। ভেদ-নীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বীকারোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের জমিদারী পুরস্কার দিলেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর এই রাজ্য নামে মাত্র মোগলদিগের অধিকারে আসিয়াছে, শাসনাধীন হয় নাই। এক্ষণে প্রতাপের স্বাধীনতার বিনিময়ে তাঁহাকে এই দুই রাজ্য প্রদত্ত হইল এবং তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তি বহাল রহিল। শুধু ইহাই নহে, 'সুবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে [নানাবিধ] খেলাৎ, রত্নখচিত ছোবা, তিনটা হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদশাহের পক্ষ হইতে নক্কাড়া উপহার দিলেন।' উহাই লইয়া প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

মোগলের খেলাৎ এবং সামন্ত রাজের খেতাব লইয়া প্রতাপাদিত্য দেশে ফিরিলেন ; কিন্তু সে প্রতাপ আর নাই। উড়িষ্যাভিযানের সময় হইতে আমরা প্রতাপাদিত্যের যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়া আসিয়াছি, সত্য সত্যই যাহার 'ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ' হইয়াছিল, সে প্রতাপাদিত্য আর নাই। এখন তাঁহার বয়সও প্রায় ৫০ বৎসর ; জ্ঞাতি-বিরোধ, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি অকালে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। মানসিংহের সহিত রণরঙ্গই তাঁহার বীরজীবনের শেষ প্রকৃষ্ট পরিচয়। নবাব দরবার হইতে বিদায় লইয়া যখন তিনি যশোহরে আসিতেছিলেন, তখন শুধুই ভাবিতে লাগিলেন, 'করিলাম কি ? স্বাধীনতা ঘোষণার এই কি শেষ ফল ? বঙ্গে যে স্বাধীনতার উন্মেষ করিবার জন্য যৌবনকে বার্দ্ধক্যে পরিণত করিলাম, তাহার পরিণাম কি এই ?' যতই ভাবিতে লাগিলেন, নবাবের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি ততই কমিতে লাগিল। এক প্রকার কাপুরুষতা আসিয়া তাঁহার পতনশীল প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। তিনি গৃহে ফিরিলেন, বর্ষা চলিয়া গেল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি মত নবাবকে কোন সাহায্য পাঠাইলেন না। কারণ তাঁহার সাহায্যে অন্য ভুঞাদিগকে দমন করিয়া অবশেষে যে মোগলেরা তাঁহাকে ছাড়িবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন।

নবাব ঘোড়াঘাট হইতে সৈন্য পাঠাইয়া, কত্রাভুর মুসা খাঁ ও ভাটির অন্যান্য

ভুঞাদিগকে পরাস্ত ও বশীভূত করাইলেন। ওসমান খাঁ পরাজিত হইয়া বকাই নগর দুর্গ ছাড়িয়া শ্রীহট্টের দিকে পলাইয়া গেলেন। ভূষণার মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ পূর্ব্বেই আসিয়া মোগল পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে শুধু ভুঞা-বিদ্রোহ নহে, আরাকাণী মগ ও সিবাষ্টিন গঞ্জালিসের অধীন পর্টুগীজ দস্যুরা পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। নবাব বুঝিলেন, গৌড় বা রাজমহল প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া এই সকল ভীষণ শত্রুর কবল হইতে রাজ্যরক্ষণ করা চলে না। তাই তিনি বুড়িগঙ্গা তীরবর্ত্তী ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই ঢাকানগরীর উৎপত্তির প্রথম কারণ। তথায় লালবাগে এখনও ইসলাম খাঁর দুর্গ ও প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। যেমন বিদ্রোহ-সঙ্কুল দেশ, তেমনই প্রতাপশালী নবাব। প্রতাপ যথাসময়ে প্রতিজ্ঞা মত সৈন্য সাহায্য পাঠান নাই বলিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকায় গিয়া বসিবার পূর্ব্বেই যশোহর বিজয়ের জন্য বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিয়া গেলেন।

'বহারিস্তান' হইতে জানা যায়,—"ইসলাম খাঁর এই সব বিজয়ের পর প্রতাপের চৈতন্য হইল। তিনি পূর্ব্ব অপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া নিজপুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ৮০ খানা রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং ক্ষমা চাহিলেন। ইসলাম খাঁ রাগে আজ্ঞা দিলেন যে মীর-ইমারৎ (গৃহনির্ম্মাণের অধ্যক্ষ) ঐ ৮০ খানা নৌকায় কাঠ, খড়, ইট, পাথর বহিয়া বহিয়া ঐগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলুক।[১] তাহার পর ইনাএৎ খাঁর[২] অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল, অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক-আন্দাজ, ৩০০ রণপোত এবং অনেকগুলি তোপ দিয়া তাঁহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। মুসা খাঁ ও অন্যান্য বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্যসহ বাদশাহী অভিযানে যোগ দিল। ঠিক এই সময়ে অপর একদল বাদশাহী সৈন্য বগলার [বাক্‌লার] জমিদার (কন্দর্পের পুত্র) রামচন্দ্রকে জয় করিবার জন্য সৈয়দ

১ সম্ভবত এই সময়ে ঢাকায় যে দুর্গ ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহারই আবশ্যক কার্য্যে প্রতাপের প্রেরিত নৌকাগুলি লাগান হইয়াছিল।

২ ১৬০৯ অব্দের প্রারম্ভে ঘিয়াস খাঁ বা ইনাএৎ উল্লা, ইসলাম খাঁর অনুরোধক্রমে জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ইনাএৎ খাঁ এই সম্মানিত উপাধি এবং দুই-হাজারী মনসব্‌দারী পান।—*Tuzuk.*, Vol. I, pp. 158, 160.

হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। আর ২০০০ বর্ক-আন্দাজ ও ৪০০ নৌকা অনেকগুলি ওম্‌রাসহ উসমান [ওসমান] খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য 'বার সিন্দুর' নামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান।"[১] রামচন্দ্র যে প্রতাপাদিত্যের জামাতা এবং ওসমান খাঁর সহিত তাঁহার সখ্য থাকিতে পারে, ইহা নবাবের বিদিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।[২] কতলুর পুত্র জমাল খাঁ প্রতাপাদিত্যের অধীন সেনানী ছিলেন।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইনাএৎ খাঁ ঘোড়াঘাট হইতে কুচ করিয়া স্থলপথে অগ্রসর হন। তাঁহার প্রধান সহকারী হইয়াছিলেন, ইহ্‌তামাম্ খাঁর পুত্র মীর্জা নথন। ইনিই বহারিস্তানের গ্রন্থকার। ইনাএৎ হইলেন স্থলসৈন্যের কর্ত্তা এবং মীর্জা নথন নওয়ারা ও তোপ বিভাগের অধিনায়ক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়াবা ও আগ্নেয়াস্ত্র সমূহ মীর-বহর ইহ্‌তামাম্ খাঁর অধীন ছিল এবং তিনি এই সময়ে আলাইপুরের সন্নিকটে পদ্মাবক্ষে ছিলেন। ইনাএৎ ঐ স্থানে আসিয়া পদ্মা পার হইয়া, কুচ করিয়া মহৎপুর বাগোয়ানে উপস্থিত হইলেন। মীর্জা নথনও ভাতুড়িয়ার জমিদার পীতাম্বরকে (৩৪ পৃ) পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া পদ্মাতীরে পৌছিলেন এবং তথায় পিতার নিকট হইতে রণতরী ও তোপ লইয়া গঙ্গা হইতে জলঙ্গী ও জলঙ্গী হইতে ভৈরব নদে পড়িয়া তত্তীরবর্ত্তী বাগোয়ানে আসিয়া প্রধান সেনাপতি ইনাএতের সহিত মিলিত হইলেন। ইনাএৎ এইস্থানে মীর্জা ও অন্যান্য ওমরাহের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এই বাগোয়ান বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের আবাসস্থল। মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে যান, তখন ভবানন্দ তাঁহাকে সাহায্য করিয়া কি ভাবে মহৎপুর বাগোয়ান প্রভৃতি ১৪ পরগণার জমিদারী লাভ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সময়ে তিনি মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী মাটীয়ারিতে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল জমিদারের মত বাস করিতেছিলেন। তিনি মোগলদিগের বিশেষ অনুগৃহীত ও

---

১ 'প্রবাসী', ১৩২৭ কার্ত্তিক, ২-৩ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

২ এই সময়ে প্রতাপের কন্যা বিমলা বাক্‌লায় গিয়া গৃহীত হইয়াছেন। সুতরাং এখন রামচন্দ্রের বৈরীভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না।

বশীভূত। এই জন্য ইনাএৎ তাঁহারই জমিদারীর মধ্যে বাগোয়ানে আসিয়া কিছু কাল আড্ডা করিয়াছিলেন। ভবানন্দ যে এবারেও মোগলদিগকে নানাবিধ নৌকা ও সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর যখন এই কথা ইসলাম খাঁর কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি ভবানন্দকে হুগলীর কানুনগো পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মজুমদার উপাধি দিয়াছিলেন।

'তাহার পর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দিকে সকলে অগ্রসর হইলেন। পথে শিকার চলিতে লাগিল।'[১] বাগোয়ান হইতে বিরাট মোগল বাহিনী ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদী দিয়া বর্ত্তমান কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে পৌছিল। পথি-মধ্যে মাটীয়ারিতে ভবানন্দ ঘাটোয়াল জমিদারের মত মোগল সৈন্যদলকে সৎকৃত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের নিকটে যেখানে মাথাভাঙ্গা নদী চূর্ণী নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্ব্বমুখে ইচ্ছামতী বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া মোগল সৈন্য ও নওয়ারা ক্রমশঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা নদীপথ বাহিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। পরে বনগ্রাম পার হইয়া মোগল সৈন্য প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া পৌছিল। এই স্থানে যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমের নিকট প্রতাপ-সৈন্যের সহিত মোগলদিগের প্রথম যুদ্ধ হইল।

১ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক, ৩ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ যুদ্ধ ও পতন

প্রতাপাদিত্যের শেষ পতন যে ইসলাম খাঁর সময়ে হয়, মানসিংহের হস্তে নহে, বহারিস্তান তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ১২০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত রামরাম বসুর বিবরণীও বহারিস্তানের বৃত্তান্তের অনুগামী। বসু মহাশয় প্রচলিত প্রবাদ এবং পুরাতন পারসীক গ্রন্থ হইতে নিজের পুস্তক লিখেন। তিনি যে বহারিস্তানেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন, এমন কোন কথা নাই। হয়ত 'রাজনামা' প্রভৃতি অন্য পারসীক গ্রন্থও ছিল, এবং দৈবক্রমে উহা পুনরায় বহারিস্তানের মত ঐতিহাসিকের গবেষণার গণ্ডীতে পড়িতে পারে। যাহা হউক, রামরাম বসুর মোটামুটি সমর্থনে বহারিস্তানের প্রামাণিকতা বাড়াইয়া দিয়াছে। বসু মহাশয়ের গ্রন্থে ইসলাম খাঁ প্রসঙ্গে যাহা আছে, তাহা এই : 'কতক কাল পরে সিংহরাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌছিয়া তাহার পরলোক হইল।[১] এ সমাচার দিল্লী পৌছিলে আপনে ওজির এছলাম খাঁ চিস্তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়া হেন্দোস্থানের তিন হিসা ফৌজ সাতে লইয়া থানাবথানা মারপিট করিয়া সরবসর আসিয়া সালিখার থানায় পৌছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতি মধ্যে একদিন কমল খোজার মরণের খবর পৌছিয়াছে, ইহাতে রাজা ব্যস্ত ছিলেন।'[২] ইসলাম খাঁ স্বয়ং আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন কি না, এখানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার হস্তে যে প্রতাপের শেষ পতন ঘটে তাহা বেশ বুঝা যায়। আর খোজা কমল যে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুই কিরূপে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহারও আভাস এখান হইতে পাই। সুতরাং বহারিস্তানের বিবরণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়। উহাতে মোগল সৈন্যের সহিত প্রতাপ-সৈন্যের যুদ্ধবৃত্তান্ত যেরূপ খুঁটি-

---

১ ১৬০৬ খৃঃ অব্দে শেষবার মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া যে কাশীতে পরলোকগত হইয়াছিলেন, সে কথা সত্য নহে। তাঁহার মৃত্যু আরও ৫।৭ বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যে ঘটিয়াছিল।

২ রামরাম বসুর গ্রন্থ, ১ম সংস্করণ (১৮০১), ১৪৮-৯ পৃ ; নিখিলনাথ, মূল ৬২ পৃ।

নাটির সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উহার বঙ্গানুবাদ হইতে যুদ্ধবিবরণী উদ্ধৃত করিলেই চলিবে। শুধু স্থানের বা লোকের পরিচয় দিবার জন্য স্থানে স্থানে টিপ্পনী সংযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত অংশ-গুলি অধ্যাপক সরকার মহোদয়ের বঙ্গভাষায় লিখিত বহারিস্তানের সারসংগ্রহ হইতে গৃহীত হইল।[১]

যখন ৮০খানি রণপোত লইয়া প্রতাপাদিত্যের তৃতীয় পুত্র সংগ্রামাদিত্য ঘোড়াঘাটে গিয়া ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন নবাব ক্রোধান্ধ হইয়া যশোহর আক্রমণের জন্য ইনাএৎ খাঁকে হুকুম দিলেন, ইহা আমরা জানিয়াছি। কিন্তু তৎপরে সংগ্রামাদিত্যের কি দশা হইল, তাহা জানিতে পারি নাই। সংগ্রাম বয়সে বালক এবং দূতের মত সংবাদ-বাহক, সুতরাং তাঁহাকে যে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তাঁহার মুখেই প্রতাপের কাছে মোগল আক্রমণের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। যে ভাবে হউক, মোগল-সৈন্য পদ্মা পার হইবামাত্র, প্রতাপাদিত্য খবর পাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পদ্মা হইতে জলঙ্গীতে পড়িলে মোগল-বাহিনীর যশোহরে আসিবার দুইটি পথ ছিল ; প্রথম, জলঙ্গী হইতে ভাগীরথীতে পড়িয়া পরে ত্রিবেণীর নিকট যমুনায় প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইত ; দ্বিতীয়, জলঙ্গী হইতে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা বাহিয়া কৃষ্ণগঞ্জের কাছে ইচ্ছামতীতে প্রবেশ করা যাইত ; পূর্ব্বে বলিয়াছি, মোগল সৈন্য দ্বিতীয় পথে আসিতেছিল। কিন্তু যে পথেই আসিত, যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল দিয়া যাইতে হইতই। এজন্য উহারই সন্নিকটে প্রতাপের পক্ষ হইতে নূতন দুর্গ রচিত হইল। ঐ সঙ্গমস্থলকে 'টিবির মোহনা' বলে, উহার একটু উত্তর দিকে সাল্‌খী নামক একটি নদী ইচ্ছামতী হইতে বাহির হইয়া গিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে কপোতাক্ষীতে পড়িতেছিল। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে উহ'র গতি দেখান আছে। এ নদী এক্ষণে ইচ্ছামতীর কাছে মজিয়া গেলেও কপোতাক্ষীর মোহানা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেগবতী

১ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক, ১-৮ পৃ ; [এবং 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭-১৪২ পৃ। এই উদ্ধৃতিতে 'সহন'-কে 'নথন' করা হইল এবং অধ্যাপক সরকারের প্রথম পাঠোদ্ধারের পরিবর্ত্তিত অংশগুলি পাদটীকায় উল্লিখিত হইল। গ্রন্থকার সতীশচন্দ্রের টিপ্পনীগুলি বড় তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া হইল। পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

আছে। সে মোহানার অপর পারে কাটিপাড়া গ্রাম, আধুনিক ম্যাপে উহার নাম Chalkia Gang, কিন্তু সাধারণ সকল লোকে সাল্‌খী বলিয়া জানে। ইচ্ছামতীর সহিত সাল্‌খীসঙ্গমকে মুসলমান লেখক সাল্‌খাথানা বলিয়াছেন। সেই স্থানে মোগল-সৈন্যের সহিত বঙ্গীয় সেনার প্রথম সংঘর্ষ হয়।

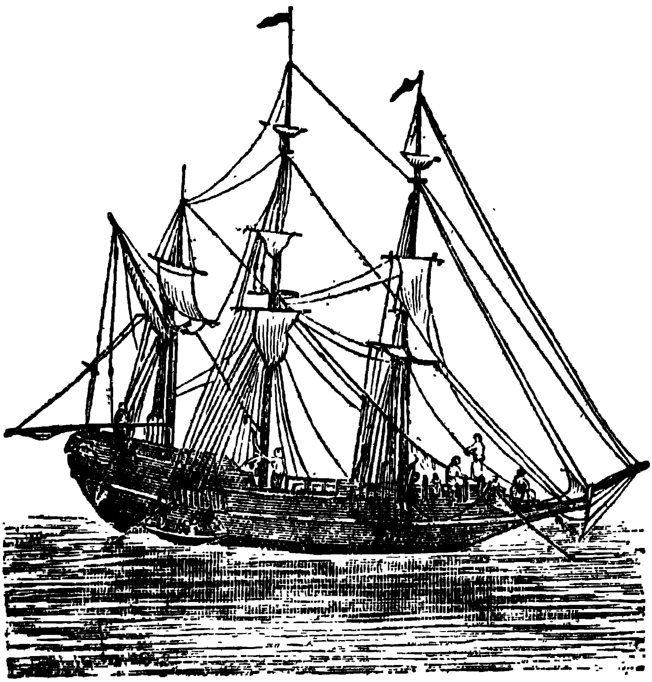
প্রতাপাদিত্য মোগল পক্ষের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র নিজের সমগ্র রণবাহিনীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ লইয়া স্বয়ং রাজধানীর রক্ষার্থ ধূমঘাট দুর্গে রহিলেন, অপরভাগ লইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাল্‌খার থানার কাছে শত্রু-পথে বাধা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। উদয়াদিত্যের অধীন ৫০০ রণতরী, ৪০টি হস্তী, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং কয়েক সহস্র ঢালী বা পদাতিক সৈন্য সাল্‌খার মোহানায় পৌঁছিল। এই সময়ে যুবরাজ উদয়াদিত্য বয়স্ক যুবক (তাঁহার বয়স ২২।২৩), এবং তিনি চরিত্রগুণে সর্ব্বজনপ্রিয়। অজানিত অগণিত শত্রুসেনাকে পথের মাঝে প্রথম বাধা দেওয়াই কৃতিত্ব এবং সাহসিকতার পরিচায়ক। প্রতাপাদিত্য অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিয়া নিজের পথ কণ্টকিত করেন নাই। উদয়াদিত্য যে প্রধান সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন, বহারিস্তান তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার দুইজন প্রধান সহকারী ছিলেন, দুইজনই প্রসিদ্ধ বীর; খোজা কমল হইলেন নৌ-সেনার অধিনায়ক এবং কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রভৃতি স্থল-সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। রণতরী সমূহ ফিরিঙ্গি ও পাঠান জাতীয় গোলন্দাজদিগের তত্ত্বাবধানে অনলবর্ষী তোপমালায় সজ্জিত ছিল। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং অবশিষ্ট কয়েক শত রণতরী ও নানাজাতীয় সৈন্যদল লইয়া যশোহর-দুর্গে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কালিদাস রায়, বিজয়রাম ভঞ্জ, বীরবল্লভ বসু[১] প্রভৃতি সেনানীবর্গ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইহা ব্যতীত কতক নৌ-বল পূর্ব্বদেশীয় আক্রমণ নিবারণের জন্য চাকশিরি ও কপোতাক্ষ-কূলে ছিল।

উদয়াদিত্য টিবির মোহানার একটু দক্ষিণ দিকে, চারঘাটের দক্ষিণে, ইচ্ছামতীর পশ্চিম পারে, 'একটি উচু দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে জল

১ সাঁইহাটির নিকটবর্ত্তী শোভনালী গ্রামে সেনাপতি বীরবল্লভের গড়কাটা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। উঁহার বংশীয় বসুগণ এক্ষণে শোভনালী এবং চাঁপাফুল গ্রামে বাস করিতেছেন।

দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন।' উহার পূর্ব্বপার্শ্বে ইচ্ছামতী নদী, দক্ষিণে একটি প্রশস্ত খাল এবং উত্তর পশ্চিমে 'গভীর পরিখা কাটিয়া তাহা ঐ নদী ও খালের সঙ্গে যোগ করিয়া জলে পূর্ণ করা হইয়াছিল। প্রতাপের [উদয়ের] সৈন্য দুর্গে এবং নৌকাগুলি ইচ্ছামতীর নদীতে আশ্রয় লইয়াছিল।'[১]

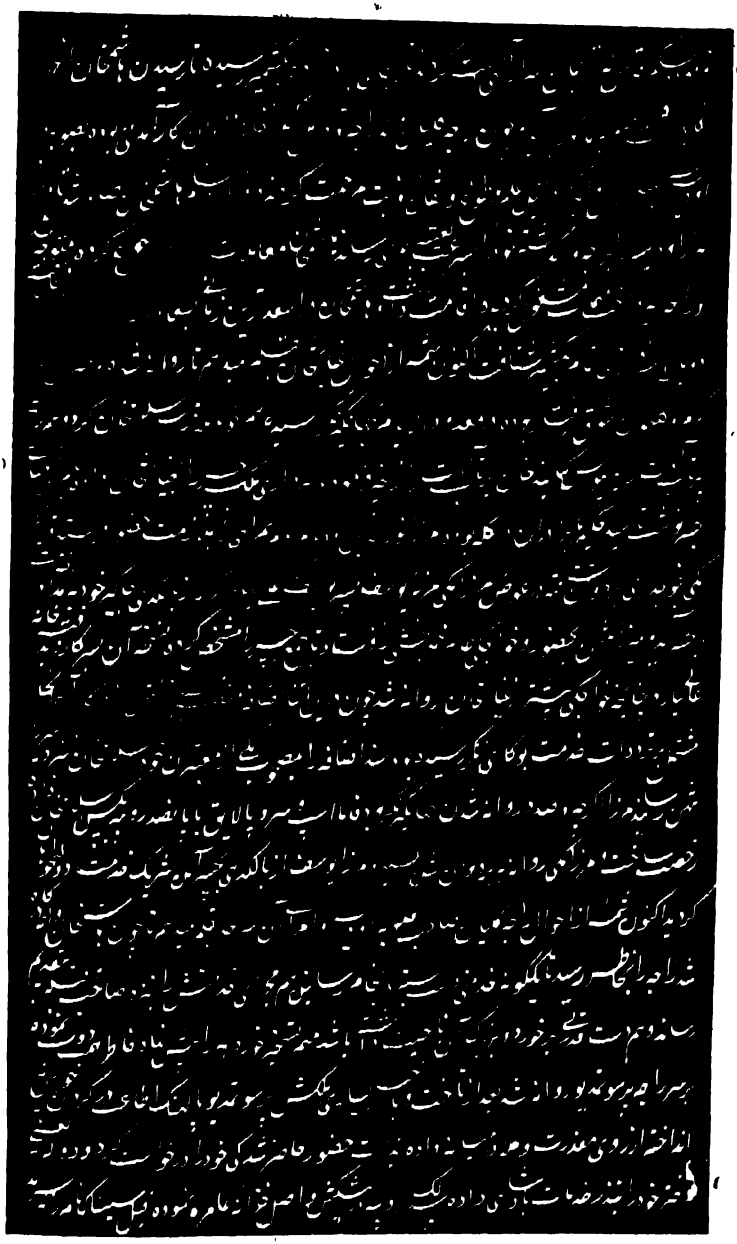
মোগলেরা সাল্‌খাতে আসিয়া যখন অদূরে প্রতাপাদিত্যের অসংখ্য রণতরণী দেখিতে পাইলেন এবং উদয়ের দুর্গ নির্ম্মাণের সংবাদ পাইলেন, তখন অনতি-বিলম্বে যুদ্ধ প্রণালী স্থির করিয়া লইলেন। "এইরূপ স্থির হইল যে, মুঘল সৈন্য



'ঘুরাব' রণতরী

নদীর দুই পাড় দিয়া কুচ করিয়া শত্রু দুর্গের দিকে অগ্রসর হইবে, মধ্যে নদী বাহিয়া নওয়ারা চলিবে এবং তীরের বন্দুক ও তোপ হইতে সাহায্য পাইবে।

১ এই খাল ও পরিখার খাতচিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানটির 'বড়গড়িয়া' নাম দুর্গের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।



বহারিস্তানের ৫৭ (খ) পৃষ্ঠা



ফৌজদারের আবাস বাটী, মীর্জানগর



চাঁচড়ার শিবমন্দির

প্রথম দল এই পাড়ে [ইচ্ছামতীর পূর্ব্বকূলে] প্রধান সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর অধীনে রহিল। দ্বিতীয় দল মির্জা নথনের অধীনে রাতারাতি অপর পাড়ে (অর্থাৎ [ইচ্ছামতীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী] দুর্গের দিকে) পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের সহিত অর্থাৎ তাহার নিকটবর্ত্তী পাড় ঘেষিয়া, নওয়ারার এক এক অংশও চলিতে থাকিবে।

"পরদিন কুচ আরম্ভ হইল। কিন্তু উদয়াদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন না। মুঘল সেনাপতিদ্বয় প্রত্যেকে দশখানা নৌকা পাহারার জন্য অগ্রে রাখিয়া, অপর নৌকাগুলির মাল্লাদিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহারা নামিয়া শত্রু দুর্গের পাশে [ইচ্ছামতীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে] দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করুক। এই কাজ অর্দ্ধেক হইয়াছে, এমন সময়ে উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আক্রমণ করিলেন। খোজা কমল তাঁহার অগ্রবর্ত্তী বিভাগের সেনাপতি, এবং ঐ খোজার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোশা, ভলিয়া,[১] পাল, ঘুরাব (floating battery, gun-boat), মাচোয়া, পশ্‌তা ও জলিয়া (galliot) জাতীয় নৌকা ছিল। [আমরা এই সকল নৌকার যথা সম্ভব বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি, ২১৫-১৬ পৃ। এখানে শুধু তৎকালের সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ জাহাজ ঘুরাব এবং দ্রুতগামী 'বলিয়া' বা ভাউলিয়া জাতীয় ক্ষুদ্র তরণীর ছবি দেওয়া গেল।] অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে চলিল। জমাল খাঁ পদাতিক ও হাতী লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে থাকিলেন।[২] মহাশব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপর মুঘল নৌকা সাজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধ্যে সমস্ত শত্রু-আক্রমণের চাপ ঐ বিশখানি বাদশাহী নৌকার উপর পড়িল। কিন্তু তাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুঝিল, মুখ ফিরাইল না।

"খোজা কমলের ঘুরাবগুলি এবং ২ খানা 'পিয়ারা' নৌকা [২১৬ পৃ] মিলিয়া দশ খানা বাদশাহী নৌকাকে ঘিরিয়া ইনাএৎ খাঁর দিকে [ইচ্ছামতীর পূর্ব্বতীরে] যে দুর্গ তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার পাড়ের নীচে তাড়াইয়া[৩]

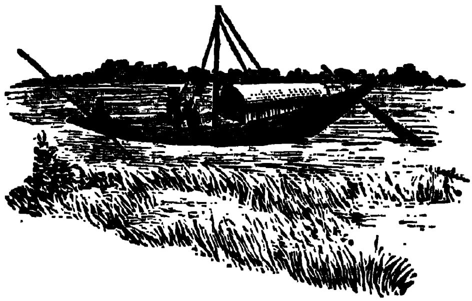
---

১ [অধ্যাপক সরকার প্রথম (১৩২৭) পাঠে 'বলিয়া' উল্লেখ করেন। —শি মি]

২ 'প্রবাসী'র প্রবন্ধে অনেক স্থলে হয়ত অনবধানতা বশতঃ একই ব্যক্তির সম্বন্ধে 'করিল' ও 'করিলেন' এই দুই প্রকার ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে। আমি উদ্ধৃত অংশে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া সম্মানাত্মক ক্রিয়াপদই দিয়াছি।

৩ ['তাড়াইয়া' কথাটি প্রথম পাঠে ছিল না। —শি মি]

লইয়া গেল। তীরস্থ মুঘল সৈন্য ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া, একখানা ঘুরাব ও একখানা 'পিয়ারা' কাড়িয়া লইল। যুবরাজের



'বলিয়া'[১] বা ভাউলিয়া জাতীয় নৌকা

সৈন্য ও মাল্লাগণ নিজ ঘুরাবগুলি নঙ্গর করিয়াছিল, এজন্য[২] তাহাদের লইয়া পলাইতে পারিল না। এখন মুঘল তীরন্দাজগণের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল (অর্থাৎ এই জলযুদ্ধ স্থলসৈন্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হইল)। নদীর অপর পাশে [পশ্চিম কূলে] মির্জা নথনের দশখানি অগ্রগামী নৌকাও শত্রুরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তীর হইতে মির্জা, লক্ষ্মী রাজপুত,[৩] শাহবেগ[৪] এবং অপর নেতারা নিজ নিজ অনুচরসহ তীর চালাইয়া শত্রু মাল্লাদিগকে বাধা দিতে এবং পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন।

"এইরূপ অগ্রসর হইয়া মির্জা নথন এরূপ স্থলে আসিয়া পৌছিলেন যে, খোজা কমলের নৌ-বল তাঁহার পিছনে এবং উদয়াদিত্যের নৌ-বল তাঁহার অগ্রে ও

১ [অধ্যাপক সরকার দ্বিতীয় পাঠে 'ভলিয়া' বলিয়াছেন।—শি মি]

২ ['এজন্য' কথাটি প্রথম পাঠে ছিল না। —শি মি]

৩ লক্ষ্মী রাজপুত কে, তাহা জানা যায় না। ইনি রাজপুত বংশীয় কি না, সন্দেহ স্থল। সম্ভবতঃ কুচবেহারে যে লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সময়ে বশ্যতা স্বীকার করেন, তিনিই প্রতাপের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

৪ শাহবেগ সম্ভবতঃ আলি খাঁ কোলাবীর পুত্র। আলি খাঁ মুনেম খাঁর অধীন সেনানী ছিলেন। *See, Ain.* (Blochmann), pp. 438, 442.

পাশে রহিল ; সুতরাং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়ারা বিশৃঙ্খল এবং মাল্লাগণ হতভম্ব হইয়া পড়িল। যখন উদয়াদিত্যের নৌ-বাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শত্রুকে আক্রমণ করিবার এমন কি আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের গুলিতে খোজা [কমল] মারা গেলেন। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস কাহারও রহিল না। জমাল খাঁ [তখনও] তীর হইতে নিকটবর্ত্তী মুঘলদের উপর তীর ও কামান চালাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু উদয় পলাইলেন।"[১]

এইস্থানে প্রথম যুদ্ধ শেষ হইল। অধ্যাপক সরকার মহাশয় যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রীস্‌দেশীয় ইতিহাসের সালামিশের যুদ্ধে[২] পারসীক নৌ-বলের মত, বাস্তবিকই যশোহরের নৌ-বাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই তাহার বিশৃঙ্খলা এবং পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণ নদীর উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ তীরভূমি হইতে মোগল তীরন্দাজ ও বন্দুকধারিগণের অব্যর্থ লক্ষ্য বাছিয়া বাছিয়া প্রতাপের সেনানীবর্গকে শমনসদনে পাঠাইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৭০ পৃ) মোগলেরা স্থলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে। সাল্‌খার যুদ্ধ নামে জলযুদ্ধ হইলেও তাহা স্থলেই মিটিয়াছিল। স্থানের সঙ্কীর্ণতার জন্য কোন পক্ষের জলযানই নাবিকতার বাহাদুরি দেখাইতে পারে নাই। বিস্তীর্ণ নদীর প্রসারিত বক্ষে যদি বাস্তবিকই উভয় পক্ষে নৌ-যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে মোগল পক্ষীয়েরা কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিত না। সর্ব্বোপরি, সেনাপতি কমল খোজার পতনে সকল আশা বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুই যে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই নির্ভীক বিমল চরিত্র পাঠান[৩] সেনাপতি বিগত ২৫।২৬ বৎসর কাল একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত প্রাণপণে প্রতাপাদিত্যের সেবা করিয়াছেন। ধূমঘাট দুর্গের তিনিই প্রথম দুর্গাধ্যক্ষ, তাঁহারই নামানুসারে কপোতাক্ষী দুর্গের নাম হইয়াছিল—গড় কমলপুর। এখনও প্রতাপনগরের পার্শ্বে গড় কমলপুর নামক

১ 'প্রবাসী,' ১৩২৭, কার্ত্তিক, ৩-৪ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

২ এই যুদ্ধ পারস্যাধিপতি জারাক্‌সিসের সহিত গ্রীকদিগের হয় (৪৮০ খৃঃ পূঃ); ইহাতে গ্রীক সেনানীগণের যুদ্ধ-কৌশলে পারস্যাধিপের পরাজয় ঘটে।

৩ ইঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।—১৩৫, ১৯৭ পৃ দ্রষ্টব্য।

স্থান প্রতাপ ও কমলের অচ্ছেদ্য বন্ধনের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। যে কোন গুরুতর কার্য্যে কমল খোজা গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিয়া জয়যুক্ত হইতেন।[১] কোন প্রকার স্বার্থ পিপাসা, কাপুরুষতা বা সত্যাপলাপ তাঁহার পবিত্র চরিত্রকে কলঙ্কিত করে নাই। তাঁহারই পতনে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হইল; যুদ্ধের সংবাদ অপেক্ষা কমলের মৃত্যুবার্ত্তা প্রতাপের হৃদয়ে অধিকতর ব্যথা দিয়াছিল। তিনি একান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আমরা দেখাইয়াছি, যশোরেশ্বরীর আবির্ভাবের মূল কারণ কমল খোজা। আবার রামরাম বসু প্রভৃতি তাঁহার মৃত্যু প্রসঙ্গে যশোর-রাজলক্ষ্মীর অন্তর্ধান বিষয়ক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন।[২] সে গল্পের কোন মূল্য নাই থাকুক, কমলের মরণের সঙ্গে সঙ্গে যশোর-রাজ্যের শেষ পতনের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

যুদ্ধে পরাজয় হইলে এবং পরাজিত উদয় পলায়নপর হইলেও যে যুদ্ধ থামিয়া গেল, তাহা নহে। আরও কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পলায়নপর যশোহরের নওয়ারা এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী মোগলদিগের নওয়ারা ও স্থল-সৈন্যের মধ্যে বিষম যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই স্থলে বহারিস্তানের বর্ণনা হইতে সংক্ষেপ করিয়া কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"শত্রু নৌ-বলের পরাজয়ের পর সমস্ত বাদ্‌শাহী ও বাধ্য জমিদারদের নওয়ারা যশোহর-নওয়ারা লুঠ করিতে লাগিয়া গেল, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সেনাপতির কথা কেহ শুনে না। শুধু ৪ খানি কোসা ও ২ খানি অপর নৌকা উদয়ের পিছনে তাড়া করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল এমন একখানি 'পিয়ারা', ৪ খানি ঘুরাব এবং ফিরিঙ্গিপূর্ণ একখানি মাচোয়া— এই ৬ খানি নৌকা প্রভুভক্তি দেখাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং বাদশাহী নৌকার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।...পরে যখন পাড় দিয়া মির্জা নথন ও অন্যান্য সৈন্য নিকটে পৌঁছিল এবং এই শত্রু নৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া পরাস্ত করিল, তখন বাদ্‌শাহী পশ্চাদ্ধাবনকারী নৌকার মধ্যে ৪ খানি উহাদের লুট করিতে

---

১ রামরাম বসু লিখিয়াছেন, 'প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহুমেল দিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল।' উহাতে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার কথাই বুঝা যায়। তবে প্রথম যুদ্ধ ৭ দিন ধরিয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ স্থল।—[প্রতাপাদিত্য, মূল ৬২ পৃ—শি মি]

২ রামরাম বসু, ১ম সং, ১৪৯-৫০ পৃ; [নিখিলনাথ, মূল ৬২-৩ পৃ।—শি মি]

ব্যস্ত হইল। দুই খানি মাত্র কোসা—(মির্জা নথনের নিজস্ব নৌকা, তাহার একখানিতে মহমুদ খাঁ পানী, অপরখানিতে মির মুহম্মদ লোদী মির-বহর নেতা) —মির্জাকে দেখিয়া লজ্জার খাতিরে উদয়ের নৌকার পিছু পিছু চলিতে লাগিল। নদীকূল দিয়া মির্জা ও তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য উদয়কে ধরিবার আশায় দৌড়াইতে লাগিলেন। শত্রু নৌকা সকলও পিছনে গুলি চালাইতে চালাইতে পলাইতে লাগিল।"

ক্রমে নদীর এক সংকীর্ণ অংশে[১] যখন উদয়াদিত্যের মহলগিরি তরণী প্রায় ধরা পড়িবার উপক্রম হইল, তখন তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া একখানি দ্রুতগামী কোশার উপর লাফাইয়া পড়িলেন[২] এবং কোশার প্রভুভক্ত মাল্লারা বায়ুবেগে নৌকা চালাইল। মোগল সৈন্য যুবরাজের অতুল সম্পত্তিশালিনী মহলগিরি লুঠ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সেই অবসরে উদয়ের প্রাণরক্ষা হইল। "মির্জা নথন দুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে পাড় বহিয়া আরও কিছুদূর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাঁহার কোসা নাই, কোনই ফল হইল না। যশোহরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২ খানি নৌকামাত্র পলাইয়া গেল, অপর সবগুলি (তোপসহ) ধরা পড়িল। উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমাল খাঁ হাতীগুলি সঙ্গে লইয়া দুর্গ হইতে পলাইয়া গেলেন। মির্জা নথন পরিখা পার হইয়া দুর্গে ঢুকিয়া বিজয়ের ভেরী বাজাইলেন। মুঘলগণ সেইখানেই রাত কাটাইল।"

১ ['যে স্থলে পলায়নপর নৌকাগুলির অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।'—*Baharistan-i-Ghaybi* (Borah), Vol. I, p. 129.—শি মি]

২ বহারিস্তানের বর্ণনায় পাই যে, 'উদয় দুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া মহলগিরি হইতে নিজ কোশায় উপর লাফাইয়া পড়িলেন।' যদি কথা সত্য হয় (এবং অবিশ্বাস করিবারও কারণ দেখি না), তবে এই দুইটি স্ত্রী কাহারা? তাহারা কি উদয়ের বিবাহিতা স্ত্রী? তাহা বিশ্বাস হয় না। প্রথমতঃ উদয়ের দুই স্ত্রী ছিল কিনা সন্দেহ স্থল; থাকিলেও প্রতাপাদিত্যের নবযুবতী পুত্রবধূরা যে ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক স্বামীর সহিত রণক্ষেত্রে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তবে এই দুই রমণী কি তাঁহার রক্ষিতা উপপত্নী? বিচিত্র নহে। তখনকার দিনে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত যোদ্ধৃজীবনে ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত প্রতাপ ইহার কোন সংবাদই রাখিতেন না। উপন্যাসে কিন্তু উদয়কে একটি স্ত্রৈণ যুবক বলিয়াই চিত্রিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, চরিত্রের অধঃপতন যে রাজনৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পরদিন সেখান হইতে কুচ করিয়া ইনায়েৎ খাঁ (কয়েকদিন মধ্যে)[১] বুড়ন দুর্গে পৌছিলেন। বর্ত্তমান হাসনাবাদের দক্ষিণে যেখানে বুড়নহাটি (রেণেলের পুরাতন ১নং ম্যাপে Burronhutty) নামক স্থান আছে, উহাই বুড়ন দুর্গ। এখন সেখানে কোন দুর্গচিহ্ন নাই এবং সুন্দরবন প্রদেশে মৃন্ময় দুর্গের চিহ্ন বেশী দিন থাকে না। বিশেষতঃ এই স্থানে নীলকরদিগের একটি কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাতন সকল নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের পর মীর্জা নথন অসুস্থ হইয়া রণতরীতে শায়িত ছিলেন। তাঁহার স্থলসৈন্যগণ কুচ করিয়া পূর্ব্বেই বুড়নে পৌছিয়াছিল। তাঁহার পৌছিবার পূর্ব্বে ঐ সকল সৈন্যেরা "বুড়নে গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চারি হাজার কৃষক-স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের দাসী করিল।"[২] তাহাদের উপর আরও কি পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃ বর্ণিত না হইলেও অনুমেয়। মোগল সৈন্যের গতিপথের দুইধারে এইরূপ অত্যাচারে সকল লোকে একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইত। এই অত্যাচার হইতে দেশের নিরীহ প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপাদিত্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শুধু যে সাধারণ সৈনিকেরা সেনাপতির অজ্ঞাতসারে এইরূপ কার্য্য করিত, তাহা নহে; অনেক সময় সেনাপতিরাও অংশভাগী হইতেন। ইনায়েৎ খাঁ বাগোয়ান পৌছিবার সময়ে একদল সৈন্য পাঠাইয়া বাঘাগ্রাম লুঠ করাইয়াছিলেন। "বিজয়ী মোগল সেনাপতি এইস্থান হইতে কতকগুলি সুন্দরী স্ত্রীলোক ধরিয়া আনিয়া বাঁদীতে পরিণত করিল।"[৩] যশোহরেও মোগলের এমন অত্যাচারের কথা আমাদিগকে পুনরায় বর্ণনা করিতে হইবে। যাহা হউক, এবার মীর্জা নথন বুড়নে পৌছিয়া যখন ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন, তখন "হতভাগিনীদিগকে সেনা-নিবাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মুক্তি দিলেন

১ বুড়ন দুর্গ ও তাহার অবস্থান সম্বন্ধে ২০০-০১ পৃ দ্রষ্টব্য। বহারিস্তানের হস্তলিখিত পুঁথিতে এই দুর্গের নাম বুড়ন ও বুধন উভয়ই পড়া যায়।

২ [প্রথম বার অধ্যাপক সরকার 'দাসী'র স্থলে 'বিবস্ত্র' লিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পাঠে (১৩৫৫) উহা 'দাসী' বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু বহারিস্তানের পরবর্ত্তী পংক্তিতে আছে, 'The un-godly soldiers had stripped these helpless people of all their clothings.'—*Baharistan-i-Ghaybi* (Borah), Vol. I, pp. 130-31.—শি মি]

৩ [*Baharistan* (Borah), Vol. I, p. 125 ; 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ—শি মি]

এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রের সাহায্য করিয়া নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন।"[১] এ ব্যবস্থা শুধু শাসন-নীতির সমর্থক নহে, ইহা মীর্জা নথনের মহত্ত্বেরও পরিচায়ক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাক্‌লার অধিপতি রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সৈয়দ হকিমকে পাঠান হইয়াছিল। "তাঁহার সীমান্তের দুর্গ মুঘলেরা জয় করিয়া যখন দেশমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা পুত্রকে বলিলেন, 'যদি তুই সন্ধি না করিস্‌, আমি বিষ খাইয়া মরিব।' তখন রামচন্দ্র মুঘল সেনানীর সহিত দেখা করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম খাঁ এই জয়-সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্রকে ঢাকা লইয়া গিয়া নজরবন্দ করিয়া রাখিলেন এবং সৈয়দ হকিমকে হুকুম দিলেন যে, দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনাএৎ খাঁর সাহায্য করুক। শত্রুজিৎ রামচন্দ্রকে ঢাকায় পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া যশোহর-অভিযানে যোগ দিলেন।"[২] সম্ভবতঃ রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা, এই কথা জানিয়া, তিনি কিছুতেই শ্বশুরকে কোন সাহায্য না করিতে পারেন, এইজন্য প্রতাপের পরাজয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঢাকায় আটক রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আর কোনও অপব্যবহার করা হয় নাই, ইহা

১ [এমন কি, মীর্জা নথন নিজস্ব বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন: 'As no other kind of cloth was available there, Mirza Nathan gave all of them according to their need, wrappers, drawers, bed-sheets and similar wearing apparel of his own.'—*Baharistan* (Borah), Vol. I, p. 131—শি মি]

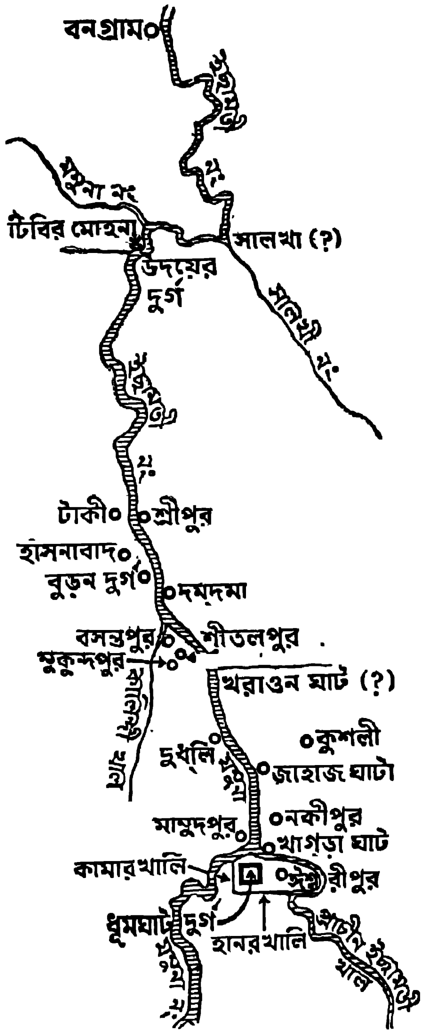
২ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক, ৫ পৃ ['শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ—শি মি]। ভূষণার মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ সর্ব্বদাই মোগল শাসকের সহিত শঠতা করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। শত্রু দেখিলেই পদানত হইতেন এবং ফাঁক পাইলেই মাথা তুলিতেন। এ বিদ্যায় পুত্র পিতাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আবদুল লতীফের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখিতে পাই, সত্রাজিৎকে 'ওরফে শাহজাদা রায়' বলা হইয়াছে ('প্রবাসী', ১৩২৬, আশ্বিন, ৫৫২ পৃ)। উহা হইতে বুঝা যায়, তিনি কিরূপে মোগল প্রভুর পাদসেবী হইয়া নাম কিনিয়াছিলেন। তাঁহারই ভ্রাতা ইসলাম খাঁর নিকট প্রতাপের দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন (প্রবাসী, ঐ)। তিনিই আবার রামচন্দ্রকে ঢাকায় লইয়া নবাবের নজরবন্দ রাখিয়া আসিয়া, প্রতাপের বিরুদ্ধে যশোহর যাত্রা করিলেন। এই বিষম দেশদ্রোহিতার চরম ফল পিতা পুত্র উভয়ে ভোগ করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎই যশোহরের অন্তর্গত নবগঙ্গাতীরবর্ত্তী সত্রাজিৎপুরের ও তথাকার সিংহ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। স্থানান্তরে সে বংশের বিবরণ দিব।

সত্য কথা। রামচন্দ্র শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এইবার প্রতাপাদিত্য বিশেষ বিপন্ন। প্রথম যুদ্ধে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি খোজা কমল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার নৌ-বলের অর্দ্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। জমাল খাঁ যুদ্ধান্তে হস্তী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু কত্‌লু খাঁর বিলাসী পুত্রকে বিশ্বাস নাই। মোগল পক্ষের প্রধান সেনাপতিরা অক্ষত দেহে প্রবল সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক রণ-তরণী লইয়া পঞ্চক্রোশী যশোহর নগরীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আবার বাক্‌লা-বিজয়ী সৈয়দ হকিম বাহিরের পথে আসিয়া রাজধানীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ হইতে শীঘ্রই আক্রমণ করিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালার যে সকল ভুঞা-রাজার একনিষ্ঠ মাতৃভক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একে একে পরাজিত ও পদানত হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের বলবৃদ্ধি করিতেছেন। একক তাঁহাকে সকলের বিপক্ষে যুঝিতে হইবে। তাহা কি সম্ভবপর? অসাধ্য সাধন করিবার বয়স বা উদ্যম আর নাই। জ্ঞাতি-বিরোধ তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়াছে, গৃহ-শত্রুতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিতেছে। প্রচণ্ড মোগল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া আর কি তিনি জয়লাভ করিতে পারিবেন? অল্প বল লইয়া অসংখ্য শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে রণ-নীতি বদলাইতে হয়। তখন অব্যবস্থিত সমর-প্রণালী (Guerilla Warfare) ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু তজ্জন্য পার্ব্বত্য-প্রদেশ চাই, নিম্নবঙ্গে সুন্দরবনে তাহা হয় না। তবে উপায় কি? সময় পাইলে প্রতাপ আরও দক্ষিণে একটা স্থানে অন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সুন্দরবনের দুর্গম বনান্তরালে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কোন প্রকারে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবেন।[১] এজন্য কৌশলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া অন্ততঃ কিছু সময়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রতাপ তাহারও চেষ্টা করিলেন, তিনি স্বয়ং বুড়নে গিয়া ইনায়েতের নিকট সে প্রস্তাব করিলেন। মীর্জা নথনের পিতা

১ আড়াইবাঁকীর দোয়ানিয়ার উত্তর ভাগে আধুনিক ১৭৩ নং লাটে যেখানে নৌ-সেনানীর আড্ডা ছিল (২০৪ পৃ) সেইখানে প্রতাপাদিত্য নূতন দুর্গের স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

ইহ্‌তামাম্ খাঁর সহিত তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। সে পরিচয় দিয়া মীর্জার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাব করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু ধূর্ত্ত মোগল সেনাপতি তাঁহার অবস্থা ও উদ্দেশ্যের গুপ্ত সংবাদ লইয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। মোগল সৈন্য কুচ আরম্ভ করিল এবং "তিন দিন পরে খরাওন্‌ঘাট পৌঁছিল।" এই খরাওনঘাট কোথায় ?



মোগলবাহিনীর গতিপথ ও যশোহরের যুদ্ধক্ষেত্র

হাসনাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরীপুর পর্য্যন্ত এখন কোন স্থানে খরাওনঘাট দেখি না। ইহা যমুনার উপর কোন পারঘাটা বা খেয়াঘাট হইতে পারে। বুড়ন দুর্গ হইতে কুচ করিয়া নিশ্চয়ই ইনায়েতের সৈন্য বসন্তপুরের অপর পারে পৌঁছিয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখনও কালিন্দী ক্ষুদ্র খাল বা সংকীর্ণ নদী মাত্র। উহা পার হইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, বিশেষতঃ নওয়ারা সঙ্গেই ছিল। পরে মোগল-সৈন্য বসন্তপুর, শীতলপুর, গণপতি প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ মানসিংহের যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যমুনার পশ্চিম পারে পৌঁছিল। ইহারই অপর পার হইতে মহব্বৎপুরের গড় আরম্ভ হইয়াছে (১৯৫ পৃ)। এই স্থানে যমুনা বাঁক ফিরিয়া ঠিক দক্ষিণ বাহিনী

হইয়াছে। এই স্থানে পারের জন্য খেয়াঘাট ছিল, তাহাই বোধ হয় খরাওন-ঘাট।

এই স্থানে আমরা বহারিস্তানের অনুবাদের ভাষা অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানের নামগুলি আধুনিক নামের সহিত মিলাইয়া লইব। মোট বিষয়টি ঠিক মূলানুগত থাকিবে। এই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। প্রথমতঃ, মীর্জা নথন বোধ হয় নদীর বাম ও দক্ষিণ ভাগ উল্‌টা করিয়া লিখিয়াছেন। নদীর গতি সমুদ্রের দিকে ধরিয়া আমরা নদীর বাম দক্ষিণ ঠিক করি, কিন্তু বহারিস্তানে তাহা করা হয় নাই। হয়ত গ্রন্থকার দুর্গ হইতে উত্তরমুখী হইয়া দেখিবার বেলায় যেমন দেখিয়াছেন, সেইভাবে লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ধূমঘাটের নিম্নে প্রবাহিত যমুনাকে বহারিস্তানে ভাগীরথী বলা হইয়াছে এবং পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত ইচ্ছামতীর বিমুক্ত ধারাকে কাগরঘাটা (রেণেলের ম্যাপে Cogregot) বলা হইয়াছে। কাগরঘাটা খাগড়াঘাট হইবে। তৃতীয়তঃ, পাঠকদিগের মনে রাখিতে হইবে, টিবির মোহানায় যমুনা ও ইচ্ছামতী মিশিয়াছে এবং ধূমঘাটের নিম্নে বিমুক্ত হইয়াছে। পথে টিবি হইতে বসন্তপুর পর্য্যন্ত নদীর নাম ইচ্ছামতী, বসন্তপুর হইতে ধূমঘাট পর্য্যন্ত সেই একই ধারার নাম যমুনা। 'যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমে' ধূমঘাট দুর্গ স্থাপিত হয়। সেখানে যমুনা শাখা পশ্চিমমুখে এবং ইচ্ছামতী পূর্ব্ব মুখে গিয়া উভয়ে পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে (১নং) দেখিতে পাই, এই সঙ্গম স্থানের পূর্ব্বকূলে, ইচ্ছামতী নদীর উত্তর পাড়ে কাগরঘাট বা খাগ্‌ড়াঘাট নামক স্থান ছিল। বহারিস্তানে ইহারই নামানুসারে ইচ্ছামতীকেই 'খাগ্‌ড়াঘাটের খাল' বলা হইয়াছে। এখন খাগ্‌ড়াঘাট আর একটু পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে সরিয়াছে, কিন্তু খাগ্‌ড়াঘাট আছে এবং তাহা ৺যশোরেশ্বরীর বৃত্তির অন্তর্ভূত। কিন্তু তখন নকীপুরের দক্ষিণে খাগ্‌ড়াঘাট ছিল।

প্রতাপাদিত্য যখন দেখিলেন, এবার মানসিংহের মত হিন্দুরাজা আসেন নাই যে তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য হইবে; এবার আসিয়াছেন যে মোগল সেনাপতি তাঁহার সহিত কোন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি ধূমঘাটেই যুদ্ধ হইবে বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাবকালে ইনায়েৎ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "আমি কুচ আরম্ভ করিয়া যশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি

হইব। সেখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।” প্রতাপ এই অতিথির সৎকারের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার দুর্গ-প্রাকারের উপর সারি সারি কামান ছিল; পরিখার বাহিরে নদী সঙ্গমের উপর প্রকাণ্ড উচ্চ বুরুজখানায় কয়েকটি প্রকাণ্ড তোপ প্রতিষ্ঠিত থাকিত, সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ নদীর উন্মুক্ত বক্ষ ঐ তোপ শ্রেণীর অনল-বর্ষণের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। ইহারই নিম্নে নদীবক্ষে কামানযুক্ত অসংখ্য রণতরী সজ্জিত হইল। ইহা ব্যতীত দুর্গমধ্যে যথেষ্ট হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রহিল। এবার প্রতাপ জীবনের শেষ চেষ্টা করিবেন। সেইভাবে সৈন্য ও সেনানীবর্গকে নব বলে উৎসাহিত করিলেন। একমাত্র কথা, সকলেই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে, ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’ ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। ফল মানুষের হস্তে নহে। সত্যই যদি রাজ্যলক্ষ্মী যশোরেশ্বরী দেবী সন্তানের প্রতি অকৃপা করিয়া অন্তর্ধান হন, তবে রাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি ?[১]

তখন বৈশাখ মাস (এপ্রিল, ১৬১০) ইনায়েৎ খাঁ বুড়ন হইতে কুচ করিয়া আসিয়া দক্ষিণবাহিনী যমুনার ডান পাড়ে অর্থাৎ পশ্চিম তীরে ছিলেন। তিনি সেখান হইতে নদীতীর দিয়া দক্ষিণ মুখে সসৈন্যে কুচ আরম্ভ করিলেন। মীর্জা নথন রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টি ও শিলা পতন অগ্রাহ্য করিয়া যমুনা পার হইয়া উহার পূর্ব্বতীরে অর্থাৎ বাম পাড়ে পৌছিলেন। “পরদিন প্রাতে দুই দল শত্রু-দুর্গের

১ অবিলম্ব সরস্বতী ৺মায়ের বাড়ীতে নিত্য চণ্ডী পাঠ করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৪৯ পৃ)। এই সময়ে একদিন চণ্ডীপাঠ কালে পর পর তিন বার দুষ্ট পাঠ মুখ হইতে বাহির হওয়ায়, তিনি প্রমাদ গণিয়া চণ্ডীপাঠ বন্ধ করিয়া উঠিলেন। স্থির করিলেন, মাতা বিমুখী হইয়াছেন, প্রতাপের আর রক্ষা নাই। তখন মায়ের অকৃপার কারণ পরীক্ষা করিবার জন্য হাত চালক দিয়া একটি শ্লোক বাহির হইল :

‘শুম্ভস্ত্রিলোকবিজয়ী নিহতো নিশুম্ভঃ।
সংগ্রামমূর্দ্ধনি ময়া মহিষাসুরোঽপি ॥
সাঽহং সুরাসুরনরার্চ্চিতপাদপদ্মা।
কীটোপমেন মনুজেন কৃতাপমানা ॥’

—নিখিলনাথ, ‘প্রতাপাদিত্য’, মূল ৩৬৯ পৃ

কীটসম তুচ্ছ নর অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য স্ত্রীলোকের অবমাননা করিয়া (বৃদ্ধার স্তনকর্ত্তন করিয়া) মাতাকে রুষ্ট করিয়াছিলেন। এই মাতার অকৃপাই প্রতাপের পতনের কারণ বলিয়া অনুমিত হইল।

দিকে অগ্রসর হইল ; মধ্যে বাদ্‌শাহী নওয়ারা চলিতে লাগিল। যমুনার মোহানায় যে স্থানে প্রতাপের নৌ-বল খাঁড়া ছিল, তাহারা বাদ্‌শাহী নওয়ারা ও ডাঙ্গার সৈন্যদলের গোলাগুলি সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। বাদশাহী নওয়ারা মোহানা পর্য্যন্ত পৌছিয়া আর আগাইতে পারিল না, কারণ দুর্গ [ও বুরুজখানা] হইতে অজস্র অগ্নি বর্ষণ হইতেছিল। [যমুনার পশ্চিম-বাহিনী শাখা] নদী সম্মুখে পড়ায় ইনায়েৎ খাঁ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু মির্জা নথন, লক্ষীরাজপুত ও অন্যান্য সেনানীরা [যমুনার বাম পাড় অর্থাৎ পূর্ব্বকূল বাহিয়া মোহানার কাছে ইচ্ছামতীর পূর্ব্বমুখী শাখা অর্থাৎ বহারিস্তানের খাগ্‌ড়াঘাটের খালের] কাগরঘাটার খালের ধার পর্য্যন্ত পৌছিয়া ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে শুধু ৪০ জন অশ্বারোহী এবং ১০টি হাতী। দুর্গ হইতে গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল ; অনেক মুঘল সৈন্য মরিল। কিন্তু মির্জা নথন হাতীর উপর লোহার বর্ম্ম আচ্ছাদনরূপে ফেলিয়া,[১] জনকত অতি সাহসী ও ভক্ত অনুচরসহ হাতীকে খালের মধ্যে নামাইয়া দিলেন। দুর্গরক্ষকগণ তাহার দিকে কামান ফিরাইল আর সেই অবসরে মির্জা নথনের পূর্ব্ব আদেশ মত, বাদশাহী নওয়ারাও অবাধে বা অল্প বাধায় জোর করিয়া মোহানা পার হইয়া [যমুনা] নদীতে ঢুকিল এবং দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। শত্রু-পক্ষ দুই দিকে মন দিতে পারিল না। [বিষম যুদ্ধ বাধিল ; বহুক্ষণ যুদ্ধের পর] প্রতাপের নওয়ারাও বাদশাহী নৌকার কাছে পরাস্ত হইল এবং মির্জা নথনও খাল পার হইয়া শক্ত জমিতে পৌছিয়া হাতী ছুটাইয়া দুর্গদ্বারের দিকে গেলেন। বাদ্‌শাহী নৌ-বলের মধ্যভাগও সেখানে আসিয়া পৌছিল। মহাযুদ্ধ চলিল ; হতাহতে

১ [অধ্যাপক সরকারের দ্বিতীয় পাঠোদ্ধারে 'হাতীর উপর লোহার বর্ম্ম আচ্ছাদনরূপে ফেলিয়া', এই কথাগুলি নাই। মুদ্রণ প্রমাদেও ইহা বাদ পড়িতে পারে ; কারণ, নদী পার হইবার বর্ণনায় ইহার উল্লেখ না থাকিলেও ঠিক তাহার পূর্ব্বেই আছে : "...he (Nathan) thus instructed his own fleets :—'When I cross the canal on the back of the elephants by covering them with steel armour, you all shoot forth with your boats into the river'..."—*Baharistan* (Borah), Vol. I, p. 135. ইহার টিপ্পনীতে M. I. Borah লিখিয়াছেন : 'The word in the Ms. is written *hila*, but the proper reading is *Chilta* which means a coat of mail or any armed covering.' —*Same*, vol. II, p 822. '৪০' স্থলে '২০০' অশ্বারোহীর কথাও লিখিয়াছেন।—শি মি]

স্তূপ গঠিত হইতে লাগিল।"[১] বঙ্গীয় সৈন্য বহু মূল্যে জীবন বিক্রয় করিল ; যাহারা স্বচক্ষে প্রতাপের সমর-ক্রীড়া দেখিয়াছিলেন, তাহারাও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, প্রতাপ রণভঙ্গ দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মীর্জা নথন তখন যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বলিয়া নকারা ও ভেরী বাজাইলেন। যশোহরের বীর্য্য-প্রতিভা নিষ্প্রভ হইল ; এইখানেই প্রতাপের রণ-নাট্যের শেষ যবনিকা পতন।

পরাজিত পিতা পুত্র যশোহর-দুর্গে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তখন মোগলের অত্যাচার ভয়ে চারিদিকে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। মাতা যশোরেশ্বরী অন্তর্ধান করিয়াছেন বলিয়া গুজব রটিয়াছে। এমন সময়ে দুর্দ্দৈব দেখিয়া জমাল খাঁ প্রতাপকে ছাড়িয়া খাগড়াঘাটে মোগল পক্ষে যোগ দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার সে শেষ নির্ম্মম দৃশ্য প্রতাপ দেখিলেন। তিনি পাঠান-দিগেরই স্বত্বের দাবি লইয়া বিংশাধিক বর্ষকাল যুদ্ধ করিয়াছেন। ভাবিয়া আসিয়াছেন, মহাবীর ওসমানের মত জমাল খাঁও বুঝি পাঠানের মুখ রক্ষা করিবেন, কিন্তু সে আশাও গেল। এদিকে বাক্‌লা হইতে সৈয়দ হকিমের মোগল-বাহিনী নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। আর যুদ্ধ করিতে গেলে প্রজা রক্ষা হইবে না, সব যাইবে। সুতরাং সকলের পরামর্শ মত প্রতাপাদিত্য "আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিলেন ; নচেৎ বৃথা সৈন্য বধ হইবে এবং সমস্ত রাজ্য লুঠ হত্যা ও অত্যাচারে ছারখার হইবে।" তিনি আকবরী নীতির সহিত পরিচিত ছিলেন ; বশ্যতা স্বীকার করিলে সন্ধি হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিতেন। কিন্তু শত্রুদিগকে ছলে বলে কৌশলে যে কোন রূপে সমূলে উৎখাত করিবার যে নূতন নীতি ইস্‌লাম খাঁ প্রবর্ত্তিত করিতেছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই আত্মসমর্পণের মন্ত্রণা স্থির করিলেন। যুদ্ধান্তে মোগল সৈন্য-সমূহ ইচ্ছামতীর অপর পারে খাগড়াঘাটে ছাউনি করিয়া রহিল। "প্রতাপ একখানি কোসায় চড়িয়া তথায় পৌঁছিলেন, সঙ্গে দুইজন মন্ত্রী। তিনি বিনীত ভাবে ইনাএৎ খাঁর তাম্বুর বাহিরে দাঁড়াইয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। খাঁ তাঁহাকে মান্য করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা করিলেন।"[২]

১ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক, ৬-৭ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

২ 'প্রবাসী', ঐ, ৭ পৃ।

এমন প্রবল শত্রুকে হস্তগত করিতে পারিলে, তাঁহার যে উন্নতির পথ সোজা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

"স্থির হইল যে বাদশাহী সৈন্য খাগড়াঘাটে থাকিবে এবং ইনাএৎ খাঁ প্রতাপকে ঢাকায় সুবাদারের নিকট লইয়া যাইবেন এবং পরে তাঁহার যেরূপ আজ্ঞা, তাহাই করা যাইবে।" যাহাতে পুনরায় সন্ধি হয়, ইনায়েৎ তাহাই করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন, নতুবা প্রতাপ সহজে দেশত্যাগ করিয়া যাইতেন না। "চতুর্থ দিবসে ৪০ খানা নৌকা লইয়া ইনাএৎ ও প্রতাপ ঢাকা রওনা হইলেন।" ইনায়েৎ প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইয়া উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া গেলেন। সঙ্গে আর কে কে গিয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই।

এদিকে জ্যৈষ্ঠমাস আসিল; বর্ষা আগতপ্রায়। এজন্য মোগল সৈন্যেরা খাগড়াঘাটে ইচ্ছামতীর কূল দিয়া খড়ের ও গোলপাতার বাঙ্গালা ঘর বাঁধিয়া বাস করিল। কারণ ঢাকা হইতে ইনায়েৎ খাঁ স্বয়ং বা অন্যদ্বারা সংবাদ আসিতে আসিতে বর্ষা আসিয়া পড়িবে, তখন স্থান ত্যাগ করিবার সময় থাকিবে না, অথচ এদেশে বাস করিতে হইলেও ঘরগুলি বাসোপযোগী ভাল হওয়া চাই। এজন্য সৈন্যাবাসগুলি মনোরম করিয়া প্রস্তুত করা হইল। ইনায়েৎ খাঁর অনুপস্থিতিকালে মীর্জা নথনই প্রধান সেনানী হইয়া রহিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি বহারিস্তানে যুদ্ধ-বিবরণী লিখিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঢাকা যাইবার কালে, জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া রাখিয়া গেলেন। ইসলাম খাঁ তাঁহার উপর কি ব্যবহার করিবেন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এজন্য তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। পরিবার-বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মায়ের মন্দিরে পূজা ও প্রার্থনা করিলেন। সে করুণ দৃশ্য সহজে অনুমেয়, বর্ণনার আবশ্যক নাই। যদি ভাগ্যবশে তিনি না ফিরেন, তখন পরিবারবর্গের কি দশা হইবে, তাহাও যে চিন্তা করা হইল না, এমন নহে। তবে উদয়াদিত্য সকল ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এরূপ আশা ছিল।

যথাসময়ে ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে প্রতাপ ঢাকায় গিয়া পৌছিলেন; যথাসময়ে ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে গিয়া প্রতাপ নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইনায়েতের সহিত অন্তরালে কথাবার্ত্তা হইল, সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত

প্রতাপের জন্য অনুরোধও করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধজয় প্রসঙ্গে নিজের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়া ইনায়েৎ প্রতাপাদিত্যের অদ্ভুত রণ-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না ; কিন্তু তাহাতেই হয়ত কুফল হইল। নবাব কিছুতেই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। জয়সিংহের কথামত শিবাজী যেমন আওরঙ্গজেবের আগ্রা-দরবারে গিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন, প্রতাপের দশাও সেইরূপ হইল। "ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।[১] এবং যশোহর প্রদেশ বাদশাহী রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।[২] ইনাএৎ খাঁ ইহার প্রথম শাসনকর্তা হইলেন এবং বাদশাহী দেওয়ান পাঠাইয়া অনুসন্ধান করা হইল যে, প্রজাদের কষ্ট না দিয়া যশোহর হইতে কত খাজনা আদায় করা যাইতে পারে।"[৩]

প্রতাপাদিত্য ঢাকায় যাওয়ার পর বাদশাহী সৈন্যগণ যশোহরের উপকণ্ঠে যেখানে সেখানে পড়িয়া সময় সময় প্রজাদের ঘরবাড়ী লুঠপাট ও সর্ব্বনাশ সাধন করিত। ভয়ে প্রজাবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিল পলাইতেছিল। উদয়াদিত্য বড় বিপদে পড়িলেন। পিতার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কোন প্রকারে মোগল সৈন্যদলকে নিরস্ত ও শান্ত করিয়া রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা

১ আমরা এইস্থলে প্রমাণ স্বরূপ 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী'র প্যারি নগরে রক্ষিত পারসিক হস্তলিপির ৫৭খ পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম। এই পৃষ্ঠার প্রথমে, রাজা টোডর মল্লের পুত্র রাজা কল্যাণকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা—কাশিম খাঁকে তথা হইতে বাদশাহের দরবারে ফিরিয়া আসিবার আজ্ঞা আছে। তাহার পর, ষষ্ঠ পংক্তি হইতে মূল ফারসীর অনুবাদ এইরূপ :

'এখন ঘিয়াস (ইনাএৎ) খাঁর কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যশোহর হইতে রওনা হইয়া এবং পথ বিভাগগুলি দ্রুত অতিক্রম করিয়া, অতি অল্প সময়ে তিনি জাহাঙ্গীর নগর পৌছিয়া নিজে ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং রাজা প্রতাপাদিত্যকে পদচুম্বন করাইলেন। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে শৃঙ্খলের আজ্ঞা দিয়া, যশোহর দেশের নেতৃত্ব ইনাএৎ খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং যশোহরে নিযুক্ত ওমরাহদিগকে লিখিলেন।' [অর্থাৎ কর্ম্মচারিগণকে স্থান পরিবর্ত্তনাদির হুকুম দিলেন]—অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কৃত অনুবাদ। [*see also*, *Baharistan* (Borah), Vol. I, p. 143.—শি মি]

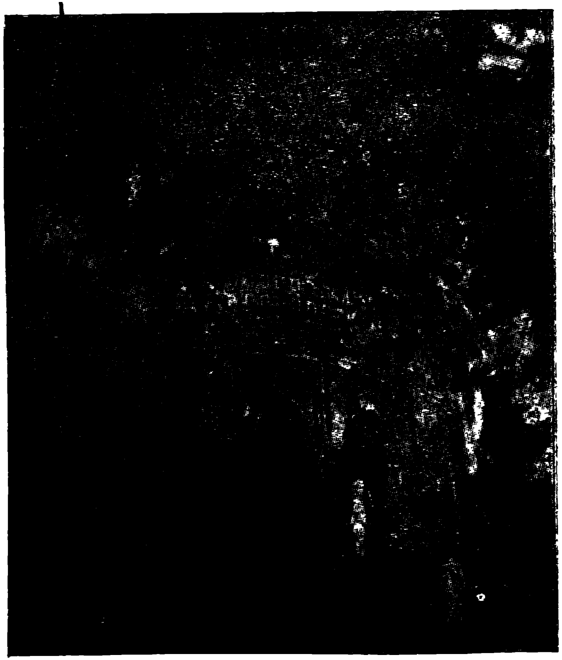
২ প্রতাপের দশ আনা অংশই বাদশাহী রাজ্য ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট ছয় আনা অংশের মালিক ছিলেন, রাঘব রায় ও তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায়।

৩ 'প্রবাসী', কার্ত্তিক, ১৩২৭, ৭ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]

করিতেন। এমন কি, এজন্য তিনি অর্থ দিয়া দুর্ব্বৃত্ত সেনানীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সময়ে, মোগল পক্ষীয় জনৈক সেনানী, মীর্জা মকীর সহিত যুবরাজের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে মীর্জা নথন ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। যাহা করিলেন, তাহার বর্ণনা বহারিস্তানের অনুবাদ হইতে দিতেছি: "সেই সময়ে উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জন্য মির্জা নথনের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন মির্জা নথন তাহদিগকে বলিলেন, 'তোমরা মির্জা মকীকে থলিয়া থলিয়া টাকা মোহর এবং রত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঁঠালের ডালি দিয়াও পুছ না! আমি কি কেহ নই? তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে।' সেই দিন দুপুর রাতে মির্জা নথন নিজ সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে এরূপ লুঠ এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই।" [বহারিস্তান, ৫৭ ক পৃষ্ঠার অনুবাদ] ইহা মীর্জা নথনের নিজের লেখা।[১] এইভাবে নিরীহ প্রজার উপর, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর যিনি বিনা কারণে অত্যাচার করিয়া সেই কথা নিজের লেখনীমুখে লোক-সমাজে ব্যক্ত করিতে পারেন, তাঁহাকে শুধু নৃশংস বলিলে চলে না। তিনি নিজের বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া স্বজাতির মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার ঈর্ষা, দ্বেষ বা ক্রোধ এত অসংযত, তাঁহার লিখিত বিবরণী যে পক্ষপাতদুষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্য চাক্ষুষ প্রমাণের অভাবে আমাদিগকে এ অংশে তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। তবে এমন ক্রোধান্ধ লোকের কলমে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র বা নীতির বিরুদ্ধে একটি কথাও লিখিত হয় নাই। ইহাও প্রতাপচরিত্রের গৌরবের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে।

অধ্যাপক সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, মীর্জা নথন প্রজাবর্গের প্রতি যে ভীষণ অত্যাচার করিলেন, সম্ভবতঃ তাহার ফলে "উদয়াদিত্য নিজের ও প্রজাদিগের প্রাণ ও মান বাঁচাইবার জন্য আবার অস্ত্র ধরিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিকের এই অনুমানই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নকীপুরের উত্তর দিকে ও মৌতলার পূর্ব্বভাগে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের নাম কুশলীর

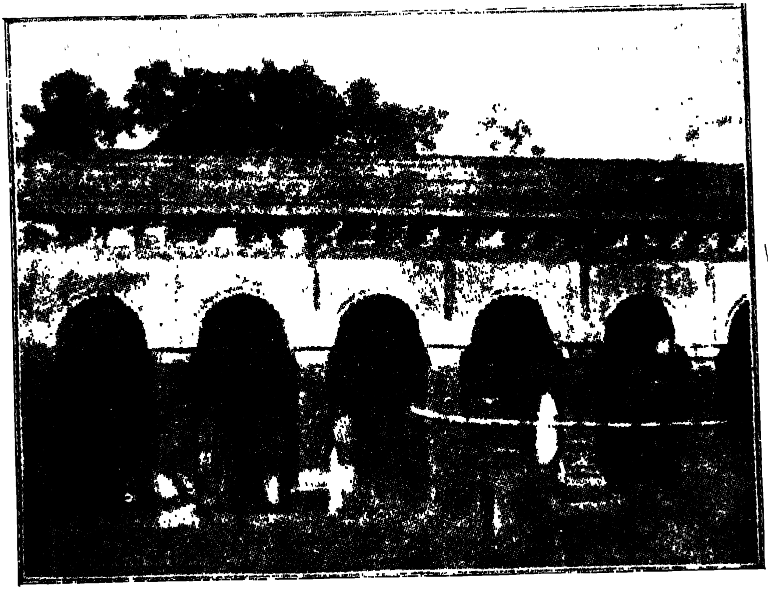
১ [*Baharistan* (Borah), Vol. I, p. 142.—শি মি]



গুঞ্জানগরের মন্দির, নলডাঙ্গা



কানাইনগরের পঞ্চরত্ন মন্দির



চাঁচড়ার দশমহাবিদ্যার মন্দির



মুড়লীর ইমামবারা

মাঠ।[১] ঐস্থানে মোগল সৈন্যের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং সেই যুদ্ধে নাকি উদয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। কুশলীর মাঠ বহু পল্লীর মধ্যস্থানে অবস্থিত। হয়ত একদা যখন ঐ সকল পল্লীর উপর মোগল সৈন্যদল লুটপাট করিতেছিল, তখনই উদয়াদিত্য প্রজাবর্গের জাতিমান রক্ষার জন্য শত্রুদিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করেন; তখন উক্ত কুশলী ক্ষেত্রে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি জীবনাহুতি দিয়া বীর কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। এই অল্প বয়স্ক যুবক স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার নিবারণ জন্য রণক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করিয়া যে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন স্মারক-লিপি থাকুক বা না থাকুক, প্রবাদপুঞ্জ চিরদিনই তাহার কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তির সংবাদ বহন করিবে। সত্যই কি অধঃপতিত বঙ্গদেশ প্রকৃত বীরের মহিমা কীর্ত্তিত ও সুরক্ষিত করিতে জানে না ?[২]

প্রতাপাদিত্য যে ঢাকা নগরীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার উদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা নাই, এই নিদারুণ সংবাদ যশোহরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে উদয়াদিত্য চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া মোগলের উপর পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। যখন তিনি আর ফিরিলেন না, তখন যশোহর-দুর্গে হাহাকার পড়িয়া গেল। উদয়ই একমাত্র আশা ভরসা স্থল; অন্য পুত্রগুলির মধ্যে অনন্ত রায়ই একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক। কখন কিভাবে অনন্তের জীবনান্ত হয়, জানি না; তবে মৃত্যুকালে তাঁহার একটি শিশুপুত্র মাতুলালয়ে ছিল। অন্য পুত্রগণের মধ্যে এই সময়ে কয়জন জীবিত ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, উদয়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিবামাত্র দুর্গমধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এইবার মোগল সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লইবে, লুঠপাট করিবে, আরও কত কি অত্যাচার করিবে,

১ কুশলী ক্ষেত্রে যে বহুবার রণক্রীড়া হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে। ঐ মাঠে এখনও কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ষণ কালে গোলাগুলি পাইয়া থাকে। উহার কয়েকটি শ্রীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয় 'সাহিত্য পরিষদে' উপহার দিয়াছিলেন।

২ যশোহর রাজবংশীয় কেহ কেহ কুশলী ক্ষেত্রের মাঠে উদয়াদিত্যের নামে একটি স্মারক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন। আশা করি শীঘ্রই তাঁহারা সে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া অগ্রসর হইবেন। পাশ্চাত্য স্বজাতি-প্রেমিকের চেষ্টায় অজ্ঞাতনামা কারাবন্দীদিগেরও জন্য গগনস্পর্শী কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের দেশের বাদল, পুত্ত বা উদয়াদিত্যের মত বীরপুত্রের স্মৃতি রক্ষা কল্পে কোন প্রস্তর-লিপি পর্য্যন্ত নাই।

বলা যায় না। বিশেষতঃ শেষকালে উদয়াদিত্য যেভাবে অসংখ্য সৈন্য অসিমুখে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যে মীর্জা নথন প্রভৃতি নৃশংসতার চরম সীমা দেখাইবেন, তাহা ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল হইল। কেবল প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পূর্ব্বের অভিসন্ধি অনুসারে বিপৎকালে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। দুর্গের ভিতরের পরিখায় (১৬০ পৃ) পূর্ব্ব হইতে একখানি আবৃত নৌকা প্রস্তুত ছিল। মহারাণী অন্যান্য স্ত্রী-পরিবার ও শিশু-সন্তানসহ সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে ঐ খাল বাহির হইয়া গিয়াছিল, তথায় একটি গুপ্তদ্বার ছিল। উহা খুলিয়া দিলে নৌকাপথে পলায়ন করা যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ ভিতরের খাল গিয়া বাহিরের যে বিস্তীর্ণ পরিখায় মিশিয়াছিল, তাহার নাম কামারখালি; উহা অল্প দূরে গিয়া যমুনায় মিশিয়াছিল। যমুনা-প্রবাহের প্রবল উচ্ছ্বাসে কামারখালি তখন প্রশস্ত নদীতে পরিণত হইয়াছিল। এখনও তাহার খাত বর্ত্তমান যমুনার খাত অপেক্ষাও প্রশস্ত আছে।

অবিলম্বে গুপ্তদ্বার উন্মোচিত হইল। রাজপরিবারবর্গের জীবনবাহিনী তরণী সেইপথে বাহিত হইয়া বাহিরে কামারখালিতে পড়িল। সেইখানে তরণীর তল-দেশ বিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইল। পরিবারবর্গ ও শিশু-সন্তানসহ যশোহরের মহারাণী জাতি-মান রক্ষা করিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মোগলের হস্তে সতীত্ব-ধর্ম্ম জলাঞ্জলি না দিয়া, প্রকৃত রাজপুত-ললনার মত যশোহর-পুরীর কুল-লক্ষ্মীগণ যমুনাজলে জীবনাঞ্জলি দিলেন। এইবার যশোর-রাজলক্ষ্মী প্রকৃতভাবে অন্তর্হিত হইলেন। ধূমঘাট দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে জহর-ব্রতের চিতাচুল্লীর মত সেইস্থান এখনও প্রদর্শিত হয়। মহারাণী শরৎকুমারীর নামে এখনও তাহার নাম 'শরৎখানার দহ'।[১]

একদিক হইতে মহারাণীর তরণী বাহির হইয়া গেল, অন্যদিক হইতে অনতি-বিলম্বে হল্লারবে মোগলেরা দুর্গাক্রমণ করিলেন। বিশিষ্ট বীরগণের মধ্যে যাঁহারা দুই একজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত

১ মুসলমানেরা সম্মানিত ব্যক্তিকে যেমন খাঁ বা খান্ বলেন, সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে তেমনি 'খানা' উপাধি দেন। মহারাণী শরৎকুমারীকে মোগলেরাই সম্ভবতঃ শরৎখানা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

ছিলেন। কিন্তু আর সকলেই ছিলেন প্রাণ বা ধনরত্ন লইয়া পলায়নের জন্য ব্যস্ত। সুতরাং বীরগণের স্বল্প চেষ্টায় কোন ফল হইল না। প্রবাদ আছে, গুপ্তজয় নামক প্রতাপের এক ভাগিনেয় শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১] মোগলেরা দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া তাহার অধিকাংশ ভূমিসাৎ করিলেন; যাহা অবশিষ্ট ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক অবনমনের ফলে তাহা সব ভূগর্ভস্থ হইয়াছে, এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। সেনানীবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাঁহারা ধনরত্ন বা দেববিগ্রহ যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা লইয়া যশোহরের শ্মশান-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন, এবং অরাজক দেশের নানাস্থানে গিয়া পরগণা দখল করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বংশের সহিত প্রতাপের সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিলে, দেশ যে কেমন করিয়া 'প্রতাপময়' হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিতে পারিব।

আর প্রতাপ? তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জাহাঙ্গীর-নগরের কঠোর কারাগারের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মোগলের প্রবল শত্রু এবং সে শত্রুর দমন করিতে মোগলকে বহুকাল ধরিয়া বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে—এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে বীর একজন প্রধান সেনাপতির অমায়িক ব্যবহারে ও আশ্বাস-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া সন্ধির প্রত্যাশায় নিজে ঢাকা পর্য্যন্ত আসিয়া নবাবের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হাতে পাইবামাত্র অবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা যে ইসলাম খাঁর পক্ষে কোন ক্রমেই সমীচীন হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইসলাম খাঁর তখন 'মারি অরি পারি যে প্রকারে'—নীতির অনুসরণ করিয়া আগ্রা-দরবারে খ্যাতিলাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন নুরজাহানের প্রেম-লালসায় অন্য সকলদিকে নজরশূন্য; বিশেষতঃ আবুল ফজলের ভগিনীপতি ইসলাম খাঁর কার্য্যপ্রণালীর বিচারকও কেহ তাঁহার দরবারে ছিল না। প্রতাপকে কিছুদিন কারাগারে রাখিয়া ইসলাম খাঁ তাঁহাকে

১ 'বিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, ২৭৫ পৃ। যশোহর দুর্গের পতনের পর গুপ্তজয় নাকি পাগল অবধূতের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং লোকে তাঁহার উদাস প্রাণের মাতৃসঙ্গীত শুনিয়া চমকিত হইত। 'নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, মাতুল আশ্রয়, তাহাতেও মা, করিলে নিরাশ্রয়'—ইত্যাদি দুই একটি গানের উল্লেখ এখনও লোকে করিয়া থাকে।

লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ঢাকা হইতে নৌকা যোগে আগ্রায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু সেখানে তিনি পৌছেন নাই, পৌছিলে সে কথা 'তুজুকে' বা জাহাঙ্গীরের আত্মবিবরণীতে স্থান পাইত। কিন্তু তাহা নাই। সুতরাং পথে কোথায়ও প্রতাপের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রবাদ এবং এপর্য্যন্ত প্রকাশিত সকল গ্রন্থ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পথে যাইতে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।[২] তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রতাপের কাশীপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। হিন্দুর চক্ষে ইহাও তাঁহার ভক্তি-সাধনা ও ধর্ম্মপ্রাণতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সকলের ভাগ্যে কাশীতে মৃত্যু ঘটে না। কথিত হয়, তিনি নিজেই যে চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, সেই ঘাটে গিয়া তাঁহার গঙ্গাস্নান করিবার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং তিনি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বা তীরে উঠিয়া ভক্ত সাধকের মত প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গ-ধামের অধিকারী হন।[৩] এই ঘাটের উপরই তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত কালিকামূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত উত্তুঙ্গ দেবমন্দির তখনও কাশীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল।[৪] বিক্রমাদিত্যের পরিকল্পনায় প্রথম যশোর-

১ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর পুত্র হুসঙ্গ নানাজাতীয় বন্দী ও লুটের সামগ্রী লইয়া আগ্রায় আসেন, সে সঙ্গে প্রতাপ ছিলেন না।—*Iqbalnama*, p. 69 ; *Tuzuk*., Vol. 1, p. 269 ; *Riaz*., p. 179 ; 'প্রবাসী' ১৩২৭, কার্ত্তিক, ৭ পৃ, [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]। সম্ভবতঃ প্রতাপ ১৬১১ অব্দে অন্য কাহারও সঙ্গে প্রেরিত হন। প্রতাপ পথে অনাহারে মরিলে 'ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে'—ভারতচন্দ্রের ঐ উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

২ 'অথ বৃদ্ধস্য পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বমভবৎ'—'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত'।

৩ কেহ কেহ বলেন 'প্রতাপাদিত্য গরলগর্ভ অঙ্গুরীর লেহনে পথিমধ্যে কাশীতে আত্মহত্যা করেন।'—'কলিকাতা, সেকালের ও একালের', ৮৬ পৃ।

৪ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীর কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৪৫ পৃ)। পূর্ব্বোল্লিখিত আবদুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানিতে পারি, 'প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা শ্রীহরি কাশীতে একটি অতি উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহা রাজা মানসিংহের মন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। জাহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হুকুম দেন, কিন্তু মানসিংহের মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়।'—'প্রবাসী', ১৩২৬, আশ্বিন, ৫৫৩ পৃ [পরিশিষ্ট দ্র.—শি মি]। অধ্যাপক সরকার মহোদয় প্রতাপের পিতার নাম প্রথমে পৃথ্বী বা ভারতী পড়িয়াছিলেন, পরে আমার পত্রোত্তরে জানাইয়াছেন যে উহা 'শ্রীহরি' বলিয়াও পড়া যায় এবং তাহাই ঠিক। শ্রীহরির নামের পাঠান্তর সম্বন্ধে ৬০ পৃ দ্রষ্টব্য।

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমেই উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যের বিলয় হইলেও বঙ্গের সে বীর-পুত্রের রণ-প্রতাপের প্রতিষ্ঠা চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিবে। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুতে বঙ্গাদিত্য অস্তমিত হইল। তিনিই বঙ্গের শেষ বীর।[১]

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ও উদ্দেশ্য আমরা নানা প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সমালোচনা করিয়াছি।[২] এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ মাত্র দুই একটি কথা বলিব। প্রতাপ রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহী বলিয়া ব্যাখ্যাত হন। কিন্তু অরাজকতার যুগে বিদ্রোহী কাহাকে বলিব? দেশবাসী রাজন্যবর্গ যখন আত্ম-রক্ষার জন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান, তাহারা বিদ্রোহী, না যাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং যাহারা পররাজ্য স্ববলে অধিকার করিবার জন্য চেষ্টিত, সেই মোগলেরা বিদ্রোহী? আত্ম-রক্ষায় প্রতাপের জীবনের আরম্ভ; লবণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পাঠানের পক্ষ সমর্থন করা সেই জীবনের পরবর্ত্তী সাধনা। দেশ তখন শতধা বিচ্ছিন্ন, মাৎস্য-ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজিত; তজ্জন্য শান্তি বা মতের ঐক্য কোথায়ও ছিল না। প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে, আত্ম-প্রাধান্য বা একাধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে তাঁহার বুদ্ধির ভুল হইয়াছিল কিনা, তাহা বিচারের বিষয়। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, প্রজার বলে এবং ভৌমিকগণের রাজকোষের সাহায্য-ফলে তৎকালীন দেশের শত্রু মোগলকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিয়া স্বাধীনতা স্থাপন করা চাই।[৩] সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া তিনি পদে পদে অনেক ভুল করিয়াছিলেন। তেমন ভুল অনেকের হয়, সকল দেশের ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। সেই সকল ভুল তাঁহার ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। বসন্ত রায়ের হত্যা এই জাতীয় একটি প্রধান ভুল; তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই জ্ঞাতি-

---

১ প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় ও ওসমান খাঁ এই তিন জন ভুঞাই দেশের স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। তন্মধ্যে প্রতাপের পরাজয়ের ৬ বৎসর পূর্ব্বে কেদার রায়ের এবং তিন বৎসর পরে ওসমানের পতন হয়। ওসমানের শেষ পরাজয় পূর্ব্ববঙ্গে হইলেও তাঁহাকে উড়িষ্যার ভুঞা বলিয়া ধরাই সঙ্গত। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যই বঙ্গের শেষ বীর। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত 'বঙ্গের শেষ বীর', ৺যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'বঙ্গের বীর পুত্র' উভয় গ্রন্থই প্রতাপাদিত্য-বিষয়ক।

২ ১৭শ পরিচ্ছেদ (১৬৬-৭১ পৃ) দ্রষ্টব্য।

৩ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', ৫৩০-৩১ পৃ।

বিরোধ ও আত্মকলহের সৃষ্টি। 'ছিদ্রেষু অনর্থা বহুলীভবন্তি।' যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই অনুগতদিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতা তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কারণ, তিনি যে স্বাধীনতা লাভের নূতন মন্ত্র প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাঁহার সাধনার ফল চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইলেও, কোথায়ও স্থায়ী হইতে পারে নাই। দেশ, কাল ও পাত্র তাঁহার আদর্শের মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর মুখে কবি বলাইয়াছেন :

"নহে বহুদিন গত, শুনি, বঙ্গদেশে
প্রতাপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর,
তেজস্বী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ , করিলা প্রয়াস
স্থাপিতে স্বাধীন-রাজ্য। বিপুল বিক্রমে
পরাজিল বাদশাহী সেনা বহুবার।
বিজিত বিধ্বস্ত কিন্তু হ'ল অবশেষে ;
রাজ্য-সংস্থাপন হ'ল আকাশ-কুসুম।"[১]

ইহাই প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তেজস্বিতা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পতন হইল কেন, তাহাই প্রশ্ন। গুরুদেব রামদাস স্বামী তাহার উত্তর দিয়াছেন :

"বলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা,
শুন গূঢ়তত্ত্ব তা'র। তেজোবীর্য্যগুণে
প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনতা লাভে ,
কিন্তু তা'র জাতি, দেশ না ছিল প্রস্তুত ;
জ্ঞাতিবন্ধু বহু তা'র ছিল প্রতিকূল,
তাই হ'ল ব্যর্থ চেষ্টা। মূঢ় সেই নর,
দেশ, কাল, পাত্র মনে না করি' বিচার,

১ কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শিবাজী' মহাকাব্য, ১৫০ পৃ।

একা যে ছুটিতে চায় ; চরণস্খলনে
নাহি রহে কেহ ধরি' উঠাইতে তা'রে ॥"[১]

ভাগ্যদোষে প্রতাপের চরণ স্খলিত হইয়াছিল এবং তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। চেষ্টাতেই মানুষের পুরুষকার, ফল সর্ব্বত্রই ভাগ্যায়ত্ত। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে প্রতাপ যে নূতন মন্ত্র উদ্গীত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্‌যাপনে নিজের অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীর-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়াছে। দেশবাসী তাঁহাকে চিনিবে কি ?

১ ঐ, ১৬২ পৃ, এই প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইবার অনুপযুক্ত নহে। 'He (Pratap) began his career as a rebel, who fought for his own aggrandisement; but when he was backed by the cause of the Pathans and their military services, he inaugurated a patriotic movement that helped him on to be the master of the situation. But the country was not ripe for such an enterprise. Pratap flourished in a rude age and had to raise up a backward people. A hard task indeed! Besides, being maddened by temporary success, he could not form any clear idea of the heavy responsibilities of the leader of a commonwealth. He committed political blunders that hastened his fall. So he failed and his cause failed too, never to rise again But the noble and unselfish aims of a patriotic leader invest his achievements with the halo of undying glory and renown.' —[*Pratapaditya, the cause he fought for*, in 'The Student', Sept., 1915.—শি মি] কিন্তু বৈদেশিক লেখক এ কথার সমর্থন করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন : 'He was a brave man, that is certain sure, but in my considered opinion he was a buccaneer on filibustering intent rather than a patriot actuated by motives disinterestedly pure.' (Mr. P. Leo Faulkner in 'Calcutta Review', 1920 p. 188.) এই প্রশ্নের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যই আমার বহুবর্ষব্যাপী সন্ধানের ফল এই গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছি। সম্ভবতঃ অনুকূল বা বিরুদ্ধ কোন বিশিষ্ট মতই বিচার করিতে বাদ পড়ে নাই। আদ্যোপান্ত পাঠের পর পাঠকবর্গ স্বীয় স্বীয় মত স্থির করিয়া লইবেন।

বিরোধ ও আত্মকলহের সৃষ্টি। 'ছিদ্রেষু অনর্থা বহুলীভবন্তি।' যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই অনুগতদিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতা তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কারণ, তিনি যে স্বাধীনতা লাভের নূতন মন্ত্র প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাঁহার সাধনার ফল চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইলেও, কোথায়ও স্থায়ী হইতে পারে নাই। দেশ, কাল ও পাত্র তাঁহার আদর্শের মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর মুখে কবি বলাইয়াছেন :

"নহে বহুদিন গত, শুনি, বঙ্গদেশে
প্রতাপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর,
তেজস্বী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ; করিলা প্রয়াস
স্থাপিতে স্বাধীন-রাজ্য। বিপুল বিক্রমে
পরাজিল বাদশাহী সেনা বহুবার।
বিজিত বিধ্বস্ত কিন্তু হ'ল অবশেষে,
রাজ্য-সংস্থাপন হ'ল আকাশ-কুসুম।"[১]

ইহাই প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তেজস্বিতা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পতন হইল কেন, তাহাই প্রশ্ন। গুরুদেব রামদাস স্বামী তাহার উত্তর দিয়াছেন :

"বলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা,
শুন গূঢ়তত্ত্ব তা'র। তেজোবীর্য্যগুণে
প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনতা লাভে,
কিন্তু তা'র জাতি, দেশ না ছিল প্রস্তুত ;
জ্ঞাতিবন্ধু বহু তা'র ছিল প্রতিকূল,
তাই হ'ল ব্যর্থ চেষ্টা। মূঢ় সেই নর,
দেশ, কাল, পাত্র মনে না করি' বিচার,

১ কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শিবাজী' মহাকাব্য, ১৫০ পৃ।

একা যে ছুটিতে চায় ; চরণস্খলনে
নাহি রহে কেহ ধরি' উঠাইতে তা'রে ॥"[১]

ভাগ্যদোষে প্রতাপের চরণ স্খলিত হইয়াছিল এবং তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। চেষ্টাতেই মানুষের পুরুষকার, ফল সর্ব্বত্রই ভাগ্যায়ত্ত। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে প্রতাপ যে নূতন মন্ত্র উদ্গীত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্যাপনে নিজের অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীর-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়াছে। দেশবাসী তাঁহাকে চিনিবে কি ?

১ ঐ, ১৬২ পৃ ; এই প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইবার অনুপযুক্ত নহে। 'He (Pratap) began his career as a rebel, who fought for his own aggrandisement ; but when he was backed by the cause of the Pathans and their military services, he inaugurated a patriotic movement that helped him on to be the master of the situation. But the country was not ripe for such an enterprise. Pratap flourished in a rude age and had to raise up a backward people. A hard task indeed ! Besides, being maddened by temporary success, he could not form any clear idea of the heavy responsibilities of the leader of a commonwealth. He committed political blunders that hastened his fall. So he failed and his cause failed too, never to rise again But the noble and unselfish aims of a patriotic leader invest his achievements with the halo of undying glory and renown.' —[*Pratapaditya, the cause he fought for*, in 'The Student', Sept., 1915.—শি মি] কিন্তু বৈদেশিক লেখক এ কথার সমর্থন করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন : 'He was a brave man, that is certain sure, but in my considered opinion he was a buccaneer on filibustering intent rather than a patriot actuated by motives disinterestedly pure.' (Mr. P. Leo Faulkner in 'Calcutta Review', 1920 p. 188.) এই প্রশ্নের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যই আমার বহুবর্ষব্যাপী সন্ধানের ফল এই গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছি। সম্ভবতঃ অনুকূল বা বিরুদ্ধ কোন বিশিষ্ট মতই বিচার করিতে বাদ পড়ে নাই। আদ্যোপান্ত পাঠের পর পাঠকবর্গ স্বীয় স্বীয় মত স্থির করিয়া লইবেন।

প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত সময়ের নির্ঘণ্ট

১৫৫৬-১৬০৫	বাদশাহ আকবরের রাজত্ব।
১৫৬৩-১৫৭২	স্থলেমান কররাণী বঙ্গের শাসনকর্ত্তা।
১৫৬০-৬১	গৌড়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম।
১৫৭২-৭৩	স্থলেমানের জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদের রাজত্ব।
১৫৭৩-৭৬	দায়ুদ খাঁ রাজা ছিলেন। ১৫৭৬, আকমহল যুদ্ধ ও দায়ুদের মৃত্যু।
১৫৭৪	যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ১৫৭৫, গৌড়ের ধ্বংস।
১৫৭৭	যশোর রাজ্যের প্রথম সনন্দ ও বিক্রমাদিত্যের রাজত্বারম্ভ।
১৫৭৬-৭৯	হোসেনকুলি খাঁ বঙ্গের মোগল স্থবাদার।
১৫৭৮	প্রতাপাদিত্যের আগ্রা গমন। ১৫৭৭-৯, টোডরমল্ল সাম্রাজ্যের উজীর।
১৫৮০	বঙ্গে জায়গীরদারদিগের বিদ্রোহ।
১৫৮০-৮২	টোডরমল্ল বঙ্গের স্থবাদার। ১৫৮২, রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত।
১৫৮২	যশোর-রাজ্যের সনন্দ লইয়া প্রতাপাদিত্যের প্রত্যাগমন।
১৫৮২-৮৪	খাঁ আজম্‌ বঙ্গের স্থবাদার।
১৫৮৩	বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু।
১৫৮৪	প্রতাপের রাজ্যাভিষেক।
১৫৮৪-৮৭	শাহবাজ খাঁ বঙ্গের স্থবাদার।
১৫৮৭	ধূমঘাটে দুর্গ নির্ম্মাণ, যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব ও উদয়াদিত্যের জন্ম।
১৫৮৯-৯৮	মানসিংহ বঙ্গের স্থবাদার। ১৫৯৫, রাজমহলে রাজধানী।
১৫৯২-৯৩	প্রতাপাদিত্যের উড়িষ্যাভিযান ও গোবিন্দদেব বিগ্রহাদি লইয়া প্রত্যাগমন।
১৫৯৫	বসন্ত রায় ও গোবিন্দ রায়ের হত্যা এবং হিজলী বিজয়।
১৫৯৬	বাকলার কন্দর্পনারায়ণের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধি, হোসেনপুরের যুদ্ধে পাঠানের পরাজয় এবং কন্দর্পের মৃত্যু।
১৫৯৮-৯৯	মানসিংহের দাক্ষিণাত্য গমন। জগৎসিংহের মৃত্যু, বালক মহাসিংহ বঙ্গের স্থবাদার।
১৫৯৯	প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা ঘোষণা। খৃষ্টান্‌ পাদরীগণের আগমন।

বঙ্গের প্রথম গীর্জ্জা নির্ম্মাণ। মানসিংহের প্রত্যাগমন ও সেরপুরের যুদ্ধে ওসমানের পরাজয়।

১৬০০ মানসিংহ আগ্রায় গিয়া সাত-হাজারী মন্সবদার হন এবং বহু সৈন্য লইয়া রাজমহলে আসেন।

১৬০২ রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপ-কন্যার বিবাহ ও রামচন্দ্রের পলায়ন। কার্ভালো কর্ত্তৃক সন্দ্বীপ অধিকার এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে আরাকাণ রাজের পরাজয়।

১৬০৩-০৪ মানসিংহের যশোহর আক্রমণ, প্রতাপের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি। কেদার রায়ের হস্তে মোগল সেনানী মন্দারায় ও কিল্‌মকের পরাজয়। মানসিংহের শ্রীপুর যাত্রা। কেদারের পরাজয় ও হত্যা। সুবাদারী ত্যাগ করিয়া মানসিংহের আগ্রায় প্রত্যাগমন।

১৬০৫ আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ।

১৬০৫-০৬ আটমাসের জন্য মানসিংহ বঙ্গে পুনঃপ্রেরিত হন।

১৬০৬-০৭ কুতুব্‌উদ্দীন্ বঙ্গের সুবাদার।

১৬০৭-০৮ জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বঙ্গের সুবাদার।

১৬০৮-১৩ ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবাদার।

১৬০৮ প্রতাপাদিত্যের সহিত ইসলাম খাঁর বজ্রপুরে সাক্ষাৎ ও সন্ধি।

১৬০৯ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন।

১৬০৯-১০ মোগল সেনানী ইনায়েৎ খাঁ ও মীর্জা নথন প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। সালিখার যুদ্ধে উদয়াদিত্যের পরাজয় ও খোজা কমলের মৃত্যু। ধূমঘাটের নৌ-যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় ও ঢাকায় গমন।

১৬১০-১১ ঢাকায় বন্দী থাকিবার কিছুদিন পরে প্রতাপ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আগ্রায় প্রেরিত হন। পথে বারাণসীতে মৃত্যু। বয়স ৫০ বৎসর।

১৬১২ ওসমান খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু।

১৬১৩ ইসলাম খাঁর মৃত্যু।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি বংশ

কৃষ্ণনগর রাজবংশ॥ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবানন্দ মজুমদার এই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শাণ্ডিল্যগোত্রজ ভট্টনারায়ণের ২০শ অধস্তন বংশধর এবং কেশরকুনী গাঁঞিভুক্ত সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের নিকট হইতে ১৪ পরগণার সনন্দ প্রাপ্তির পর, ভবানন্দ বাগোয়ান-বল্লভপুর হইতে মাটিয়ারিতে প্রাসাদতুল্য আবাসবাটি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন।[১] মৃত্যুকালে তিনি মধ্যম পুত্র গোপালকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। গোপালের সময় শান্তিপুর, শাহাপুর, ভালুকা, কুশদহ, উখড়া প্রভৃতি কয়েকটি নূতন পরগণা অর্জ্জিত হয়। গোপালের পুত্র রাজা রাঘব মাটিয়ারি হইতে জলঙ্গী কূলবর্ত্তী রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা রাঘবের পুত্র রাজা রুদ্ররায় রেউই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণনগর করেন, কারণ ঐস্থানে বহু সংখ্যক কৃষ্ণোপাসক গোপের বাস ছিল। রুদ্ররায়ের সময় জমিদারী হইতে প্রভূত আয় হইত। তিনি বাদশাহকে ২০ লক্ষ টাকা কর দিতেন। তাঁহারই সময়ে কাঙ্গড়া শোভিত বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ, সুন্দর চক ও নহবৎখানা প্রস্তুত হয়। রুদ্ররায় প্রসিদ্ধ সিদ্ধশ্রোত্রিয় কাণ্ডারী বংশীয় কুমুদ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশকে ইষ্টগুরু নির্ব্বাচন করেন। রঘুনাথের পূর্ব্বনিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্গত সারলগ্রামে।[২] সারলের কাণ্ডারীগণ পাণ্ডিত্য গৌরবে ও ধর্ম্মসাধনায় বঙ্গের সর্ব্বত্র সম্মানিত। রুদ্ররায়ের পর তৎপুত্র রামজীবন ও রামকৃষ্ণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। রামকৃষ্ণই সভাসিংহের বিদ্রোহ জন্য বর্দ্ধমান রাজকুমার জগৎরায়কে আশ্রয় দেন। ইহার পর রাম-

১ ভবানন্দ অন্নপূর্ণার উপাসক ছিলেন। তিনি কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন বলিয়া প্রবাদ আছে।—উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'চরিতাভিধান', ৩২৪ পৃ।

২ সারল বা সারুলিয়া গ্রাম যশোহর জেলায় নলদীর নিকটবর্ত্তী এবং নবগঙ্গার উপর অবস্থিত। ইহা কাণ্ডারী বংশের আদিস্থান। 'বাচস্পত্য-অভিধান' প্রণেতা তারানাথ তর্কবাচস্পতির পিতামহ এই সারল পরিত্যাগ করিয়া অম্বিকা-কাল্‌নায় বসতি স্থাপন করেন। রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশও রুদ্ররায়কে শিষ্য করিয়া নদীয়ার অন্তর্গত কাঁদবিলায় বাস করেন। তথা হইতে তাঁহার বংশধরেরা এক্ষণে ধর্ম্মদহ, বাহিরগাছি, বাগআঁচড়া ও সিমলা প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

জীবনের পুত্র রঘুরাম কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইলে, তৎপুত্র সুবিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যলাভ করেন (১৭২৮), ইনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে 'রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি পান। ভবানন্দের সময় হইতে তাঁহার রাজ্য ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পশ্চিম সীমা ভাগীরথী নদী এবং পূর্ব্ব সীমা বলেশ্বরের পারে ধুলিয়াপুর।[১] সে রাজ্যের পরিমাণ ফল ৩৮৫০ বর্গ-ক্রোশ। যশোহর-খুল্‌নার অধিকাংশ উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৭৮২), তৎপুত্র শিবচন্দ্রের সময় হইতে নদীয়া-রাজ্য ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া শিবপৌত্র গিরিশচন্দ্রের সময়ে জমিদারীর পরিমাণ ৮৪ পরগণা স্থলে ৫।৭ খানি পরগণা দাঁড়ায়। গিরিশচন্দ্রের পুত্রসন্তান ছিল না, শ্রীশচন্দ্র তাঁহার দত্তক পুত্র। তিনি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। ১৮।১৯ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র রাজা সতীশচন্দ্র কিছুকাল রাজত্ব করেন। ইনি পানাসক্ত, অকর্ম্মণ্য শাসক কিন্তু তাঁহার দত্তক পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র বুদ্ধিমান ও সুশাসক বলিয়া খ্যাত। তিনি দীর্ঘকাল রাজতক্তে থাকিয়া পরলোকগত হইলে, তৎপুত্র সর্ব্ব-জনপ্রিয় কৃতবিদ্য মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রাজ্যলাভ করেন (১৯১১)। দিল্লী-দরবার হইতে তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদত্ত হয়।

বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত এই রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ভবানন্দ যেমন হিন্দুর নিকট হইতে মোগলের হাতে স্বদেশকে অর্পণ করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার অধস্তন বংশধর কৃষ্ণচন্দ্রও তেমনি, মোগলের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া, বৈদেশিক ইংরাজকে দিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হয়, তাহার অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন। ভবানন্দের কার্য্যের পুরস্কার তাঁহার ফরমাণে পাওয়া যায়, তাঁহার ১৪ পরগণা লাভের এবং কানুনগো পদ প্রাপ্তির সনন্দ এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে জীর্ণ অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে ; আর

১ 'রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিম সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গা পার ॥'—ভারতচন্দ্র, 'কালিকামঙ্গল'
এখানে বলেশ্বর নদীকেই বড়গঙ্গা বলা হইয়াছে।—'সম্বন্ধ নির্ণয়', ৭২৩-২৪ পৃ।

চক্রান্তকারী কৃষ্ণচন্দ্রের পুরস্কার চিহ্ন কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে সদর্পে প্রদর্শিত হইতেছে। সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবামাত্র দেখা যায়, সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড

ভট্টনারায়ণের অধস্তন বংশ

২০ ভবানন্দ মজুমদার
|
গোপাল
|
রাজা রাঘবরায়
|
রাজা রুদ্ররায়
|
রাজা রামজীবন — রাজা রামকৃষ্ণ

রাজা রামজীবন
|
রাজা রঘুরাম
|
রাজরাজেন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র [অগ্নিহোত্রী, বাজপেয়ী] (১৭২৮-১৭৮২)
|
রাজা শিবচন্দ্র (১৭৮২-১৭৮৮)
|
রাজা ঈশ্বরচন্দ্র (১৭৮৮-১৮০২)
|
রাজা গিরিশচন্দ্র (১৮০২-১৮৪১)
|
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র [দত্তক] (১৮৪১-১৮৫৮)
|
রাজা সতীশচন্দ্র (১৮৫৮-১৮৭০)
|
রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র [দত্তক] (১৮৭০-১৯১১)
|
৩৩ মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র [বর্ত্তমান মহারাজ]

পুরাতন কামান সযত্নে রক্ষিত হইতেছে; উহার পার্শ্বে লেখা আছে: 'Plassey Gun Presented by Lord Clive, 1757'. দেশদ্রোহী ভবানন্দ যে রাজ্য পত্তন করেন, তাঁহার উপযুক্ত বংশধর কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তাহার চরমোন্নতি হয়। তদবধি, কি জানি কিসের ফলে, ক্রমেই সে রাজ্যের পতন হইতেছে; কোথায় পরিণতি, কে জানে? অর্জ্জন করিবার বেলায় অতি কম রাজ্যই খাঁটি ধর্ম্ম উপায়ে উপার্জ্জিত হয়, শুধু নদীয়া রাজ্যের কথা নহে। কিন্তু আনন্দের বিষয়, এই রাজ্যের রাজ্যাধিকারিগণ অধিকাংশেই অজস্র দানে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং শিল্প-সাহিত্যের সমুন্নতি কল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার সুন্দর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর সম্বলিত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণের অসংখ্য সনন্দ, শুধু নদীয়া জেলায় নহে, যশোহর-খুল্‌নার বহুস্থানে বহুগৃহে এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।[১] আমি স্বচক্ষে ঐরূপ বহু দলিল দেখিয়াছি। শান্তিপুরের সূক্ষ্মবস্ত্র[২] এবং কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল দেশের মধ্যে অতুলনীয়। ভারতচন্দ্রের কবিতা, রামপ্রসাদের গান ও রসসাগরের সরসভাষা বঙ্গে অসামান্য প্রসারলাভ করিয়াছে। শিল্প-সাহিত্যে, পাণ্ডিত্যে, স্থাপত্যে এবং এমন কি, কথোপকথনের ভাষার স্বরভঙ্গিতে, নদীয়া এখন পর্য্যন্ত যশোহর-খুল্‌না প্রভৃতি জেলার আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে।

ব ড়ি শা র সা ব র্ণ চৌ ধু রী ব ং শ॥ মানসিংহের আক্রমণের পর তাঁহার অনুগৃহীত 'তিন মজুমদারের' বঙ্গ ভাগ করিয়া লওয়ার একটা গল্প আছে। এই তিন মজুমদার—ভবানন্দ, জয়ানন্দ ও লক্ষ্মীকান্ত। ভবানন্দ মজুমদারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; জয়ানন্দ মজুমদার হুগলী জেলার বাঁশবাড়িয়ার 'মহাশয়' উপাধিধারী রাজবংশের আদিপুরুষ, তাঁহার সহিত আমাদের ইতিহাসের

২ 'নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যে যে ব্রাহ্মণ রাজদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য নহেন। রাজজ্ঞাতিগণও সুব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন।'—লালমোহন বিদ্যানিধি, 'সম্বন্ধ নির্ণয়', ৫৭৩ পৃ।

২ Imperial Gazetteer হইতে জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেবল মাত্র শান্তিপুর হইতে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার (১৫০,০০০ পাউণ্ড) সূক্ষ্মবস্ত্র বিলাতে প্রেরিত হইত।—'নদীয়া কাহিনী', ৭১ পৃ।

বিশেষ সম্বন্ধ নাই। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, সে পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি (২২৬-৭ পৃ)। ইনি সাবর্ণ গোত্রজ কনৌজাগত বেদগর্ভের বংশে ১৮শ পুরুষ। হুগলী জেলার উত্তরাংশে গোঘাটা-গোপালপুরে লক্ষ্মীকান্তের পিতা কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় (বা ঘটকদিগের ভাষায় 'জীয়ো' গাঙ্গুলী) বাস করিতেন। একমাত্র পত্নী ভিন্ন তাঁহার সংসারে আর কেহ ছিল না। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াও তিনি সন্ন্যাসীর মত অনাসক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কথিত আছে, তিনি পত্নী পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচারী বেশে বর্ত্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে[১] এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ইষ্টসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে রুগ্ন শয্যায় শায়িত তৎপত্নী পদ্মাবতী তাঁহাদের একমাত্র সন্তান—এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রহ্মচারী পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি সংসার ছাড়িবার পথ খুঁজেন, সংসার যে তাঁহাকে ছাড়ে না, তিনি এখন কেমন করিয়া এই সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের লালন পালন করিবেন। এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি টিকটিকির ডিম্ব উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, উহা হইতে লালাজড়িত এক শাবক বাহির হইয়া নিশ্চল হইয়া রহিল; এমন সময় কোথা হইতে এক মক্ষিকা আসিয়া সেই লালা ভক্ষণ করিতে লাগিল; অমনি শাবকটি মুক্ত হইবামাত্র মক্ষিকাটিকে ধরিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এ দৃশ্য দেখিয়া বৈরাগ্য-বিহ্বল কামদেবের দিব্যজ্ঞান জন্মিল; তখন 'নারদপঞ্চরাত্র' নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের একটি শ্লোক তাঁহার মনে পড়িয়া গেল :

'কাকঃ কৃষ্ণীকৃতো যেন, হংসশ্চ ধবলীকৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন, তেন রক্ষা ভবিষ্যতি ॥'

অর্থাৎ যিনি কাককে কৃষ্ণবর্ণ, হংসকে ধবল এবং ময়ূরকে নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন। প্রবাদ এই, ব্রহ্মচারী সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের রক্ষার ভার শ্রীভগবানের উপর সমর্পণ করিলেন, একটু কাগজে উক্ত শ্লোকটি লিখিয়া নিদ্রিত শিশুর বুকের উপর রাখিলেন, এবং সজল নেত্রে উত্তরীয়

১ ঐস্থানকে সেকালে 'ফকিরের ডাঙ্গা' বলিত।

মাত্র সম্বল করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।[১] তিনি কাশীধামে গিয়া দণ্ডী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। মানসিংহ যখন সসৈন্যে বঙ্গে আসিবার পথে কাশীধামে কয়েকদিন ছিলেন, তখন দৈবাৎ একদা তেজঃপ্রদীপ্ত কামদেব ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং পরে তিনি তাঁহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুদেবের সহিত কথা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পান এবং গুরুর অনুরোধে তাঁহার পুত্রের সন্ধান করিবার জন্য স্বীকৃত হন।

এদিকে লক্ষ্মীকান্ত প্রতিবেশীদিগের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া বয়স্ক হইলে, বসন্ত রায়ের সহিত কালীঘাটের সম্বন্ধসূত্রে প্রতাপাদিত্যের রাজসরকারে প্রবেশ করেন। ১৫৭০ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীকান্তের জন্ম হয়;[২] তাহা হইলে মানসিংহের আক্রমণ কালে তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর। তিনি ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে রাজসরকারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে অসামান্য প্রতিভাবলে দেওয়ানের পদ লাভ করেন। মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে পরিচিত হইয়া, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে সিংহরাজাকে কি সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর লক্ষ্মীকান্ত একজন প্রধান ভূস্বামী হন। মানসিংহ তাঁহাকে জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচ পরগণা এবং হাতিয়াগড় পরগণার কতকাংশের সনন্দ আনিয়া দেন।[৩] এ সনন্দ ১৬১০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সনন্দ পাইলেও সমস্ত জমিদারী স্ববলে আনিতে প্রায় দুইপুরুষ লাগিয়াছিল। লক্ষ্মীকান্ত গোপালপুরে বাস করেন; তৎপুত্র গৌরহরি নিমতা-বিরাটি বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার পৌত্র কেশবচন্দ্র মজুমদার মুর্শিদকুলি খাঁর সময় বাঙ্গালার দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মচারী (জমিদার) ছিলেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি পান। জমিদারীর সুবন্দোবস্তের জন্য তিনি উহার কেন্দ্রস্থলে বড়িশায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি

১ সূক্ষ্মানুসন্ধিৎসু সুলেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎপ্রণীত 'কলিকাতা, সেকালের ও একালের' নামক বিরাট গ্রন্থে (৬৫ পৃ) লিখিয়াছেন যে, তিনি কামদেবের বংশীয় বড়িশা নিবাসী হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরীর পুত্র সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর নিকট প্রাপ্ত কামদেবের স্বহস্তলিখিত আত্মবিবরণী সম্বলিত একখানি জীর্ণলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতে এই সার সংগ্রহ করিলাম।

২ 'বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২৬৪ পৃ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ১৫২ পৃ।

৩ 'কালীক্ষেত্র দীপিকা', ৭৮ পৃ।

এই বংশ বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী নামে খ্যাত হইয়াছে। কেশবের পুত্র শিবদেব বিখ্যাত ব্যক্তি ; তিনি অত্যন্ত দানশীল, সদাশয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। যে কেহ তাঁহার নিকট প্রার্থী হইলে, কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। এইরূপে তিনি সকলের সন্তোষ বিধান করিয়া সন্তোষ রায় নামে সুপরিচিত হন। তিনি চারিমেলের বিশিষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দিয়া বড়িশায় বসতি করান, এবং কলিকাতা অঞ্চলে তিনিই সমাজপতি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি লক্ষ বিঘা জমি দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি (৮৭ পৃ) বসন্ত রায় কালীঘাটে মায়ের জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, সন্তোষ রায় শেষ জীবনে ঐ মন্দির ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান বিরাট মন্দিরের কার্য্যারম্ভ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে উহার কার্য্য শেষ হয় (১৮০৯)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আওরঙ্গজেবের পৌত্র বঙ্গাধিপ আজিম উশ্বানকে ১৬০০০৲ টাকা নজর দিয়া যে আদেশ পান, তদনুসারে সাবর্ণ-চৌধুরীবংশীয় রামচাঁদ, মনোহর ও রামভদ্র রায় চৌধুরীর নিকট হইতে কলিকাতা ক্রয় করেন। এই বংশীয়গণ এক্ষণে একপ্রকার হীনভাবে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বড়িশা গ্রামে বাস করিতেছেন।

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার [জন্ম ১৫৭০, মৃত্যু ১৬৪৯]
- রামরায়
  - জগদীশ
    - বিদ্যাধর
      - রামচাঁদ [১৬৫৮-১৭৩২]
        - কৃষ্ণচাঁদ
        - কালীচরণ
          - গঙ্গানারায়ণ
            - ভৈরব [১৮৫৭]
    - রঘুদেব
      - বাসুদেব
        - মনোহর
- গৌরহরি বা গৌরী রায়
  - শ্রীমন্ত
    - রাধাকৃষ্ণ
    - কেশবরাম রায় চৌধুরী [১৬৫০-১৭১৬]
      - রামদেব
        - রামভদ্র
      - শিবদেব বা সন্তোষ রায় [১৭১০-৯০]

শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বংশ॥ প্রতাপাদিত্যের মহামন্ত্রী ও সুহৃদ্বর শঙ্কর কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ হইতে ১৮শ পুরুষ। দক্ষ হইতে ১১শ ধনঞ্জয়ের বংশ বলিয়া ইহাদিগকে 'ধনের চাটুতি' এবং ধনঞ্জয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দেবাই-এর ধারা বলিয়া ইহাদিগকে 'দেবাই গোষ্ঠী' বলে। দেবীবরের বিভাগ অনুসারে ইহারা পণ্ডিতরত্ন মেল। দক্ষ হইতে ধারা এইরূপ: ১ দক্ষ— সুলোচন— বাসুদেব— মহাদেব— মহানন্দ— সামন্ত— লৌলিক— অরবিন্দ (বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত কুলীন),—তৎসুত আহিত—ত্র্যাকর— ১১ ধনঞ্জয়— রঘুপতি— সিদ্ধেশ্বর— সর্ব্বানন্দ—১৫ দেবাই— ভবানীদাস— ১৭ গোপাল। দেবাই বা দেবনাথ চট্টের পৌত্র গোপাল চক্রবর্ত্তী বারাসাতে বাস করিতেন। তাঁহার ছয়টি পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শঙ্কর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। শঙ্কর যে নিতান্ত নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ যুবকের মত যশোহরে গিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। পাঠানের পতন ও মোগলের উত্থান এই সন্ধিকালে দেশের সর্ব্বত্র যখন অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার মন্ত্রণা লইয়া প্রতাপাদিত্যের সহচর হন এবং পরে তাঁহাকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় কালে শঙ্কর বন্দী হন। পরে মানসিংহ যখন প্রতাপের সহিত সন্ধি ও সদ্ভাব স্থাপন করেন, তখন শঙ্কর মুক্ত হইয়া প্রতাপের কার্য্যত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, তখন তিনি মানসিংহের অনুগ্রহে ভূমিবৃত্তি লাভ করিয়া বৃদ্ধকালে বারাসাতে আসিয়া নিরাশ জীবন অতিবাহিত করেন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, সুতরাং বারাসাতে ফিরিয়া আসিবার কালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসরের কম নহে। প্রভাবতী প্রভৃতি নানা কাল্পনিক নামে শঙ্করের বীরপত্নীর শৌর্য্য-খ্যাতি বহু আধুনিক কাব্যোপন্যাস হইতে বঙ্গীয় পাঠককে চমকিত করিয়াছে। সেই পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিনটি পুত্র হয়—রামভট্ট বা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মধুসূদন ও বাসুদেব। ক্রমে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং অনেকে বারাসাতের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর, বালী, হাওড়া, বেলঘরিয়া, মহেশতলা, মানকর ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের বিস্তৃত বংশাবলী আমার নিকট থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার স্থান নাই। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ধারা মাত্র দেখাইতেছি। শঙ্করের অধস্তন দশম পুরুষে পরমশ্রদ্ধেয় সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত

'দেবাই গোষ্ঠী'

- ১৭ গোপাল চক্রবর্ত্তী
  - ১৮ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী
    - ১৯ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য
      - ২০ কাশীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার
      - বিশ্বেশ্বর [দক্ষিণেশ্বর]
        - রামকিশোর
        - ২১ নীলকণ্ঠ ন্যায়বাগীশ [দক্ষিণেশ্বর]
          - ২২ প্রাণবল্লভ
          - মনোহর [ভঙ্গ]
          - ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়
            - ২৩ রামকানাই
              - ২৪ রামচন্দ্র
                - ২৫ নবকুমার
                  - ২৬ ক্ষেত্রনাথ
                    - ২৭ সত্যচরণ শাস্ত্রী
                    - মন্মথ
                    - ফণী
      - পুরুষোত্তম [বারাসাত]
      - ২০ কৃষ্ণদেব [বারাসাত]
        - ঘনশ্যাম
          - দুর্গারাম
            - অভয়াচরণ [মহেশতলা]
        - ২১ সীতারাম
          - ২২ কালীচরণ
            - দেবীচরণ
            - ২৩ বিশ্বনাথ
              - ঠাকুরদাস [হাওড়া]
                - গোপাল
                  - নগেন্দ্র
              - গোবিন্দ [বর্দ্ধমান রাজবাটীর সভাপণ্ডিত]
              - ২৪ মাধব
                - ২৫ নারায়ণ
                  - ২৬ বিমলাচরণ
                  - কমলাচরণ
            - রাজীব
        - ঈশান
    - মধুসূদন
    - বাসুদেব
  - শিব, কন্দর্প, দুর্গা প্রভৃতি আরও পঞ্চ ভ্রাতা

আছেন। আধুনিক সময়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রতাপাদিত্যের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করেন ; তাই তাঁহার ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত বহুমত এক্ষণে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। শুধু প্রতাপ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ নহে, তিনি শিবাজী, ক্লাইভ, আলেকজেণ্ডার প্রভৃতির জীবনী লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল এই বংশোজ্জ্বলকারী ব্রাহ্মণবীর ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা, আচারনিষ্ঠা এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত অনুসন্ধিৎসা লইয়া ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও শ্যাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ সমূহ পরিদর্শন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে ঐতিহাসিকের জন্য এক নব যুগের অবতারণা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণেশ্বরবাসী। বারাসাতেও শঙ্করের বংশীয়েরা বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে শঙ্কর হইতে ৮ পুরুষ নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।[১] তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারি যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই অসাধারণ বলশালী ছিলেন, এবং যে কার্য্যে গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা এবং একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কা লি দা স রা য় চৌ ধু রী॥ প্রতাপাদিত্যের ঢালী সর্দ্দার কালিদাস রায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৩০ পৃ)। প্রতাপের ঢালী সৈন্যের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং এই জাতীয় পদাতিক সৈন্যই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। প্রায় প্রত্যেক রণস্থলে কালিদাস কখনও মদনমল্লের সহকারিরূপে, কখনও প্রধান সামন্তের মত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। সেইজন্য তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন কি, ভারতচন্দ্রের কবিতায় যে 'যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী' বলিয়া বর্ণনা আছে, সেখানে কালিকাদেবীকে না বুঝাইয়া এই সেনাপতি কালিদাস রায়ের কথা বলা হইয়াছে, কোথায়ও কোথায়ও লোকে এমনও অর্থ করিয়া থাকেন।[২]

---

১ ইনি রাঁচি Secretariatএ একজন প্রধান কর্ম্মচারী। চিরদিন বিদেশে থাকিলেও বংশ-গৌরবের জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। ইনিই আমাকে অতি বিস্তীর্ণ বংশতালিকা প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। যশোহরের ইতিহাসের সঙ্গে শঙ্করের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহার বংশীয়গণের কাহিনী আমার বিষয়ীভূত নহে।

২ এই সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া ১৩১০ সালের 'ভারতী' পত্রিকার পৌষসংখ্যায় 'সেনাপতি কালী' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা দ্রষ্টব্য। প্রতাপের পতনের ১৫০ বৎসর পরে লিখিত ভারতচন্দ্রের কবিতায় আছে : 'যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী', ঘটক-কারিকায় দেখিতে

অবশ্য সে অর্থের কোন সার্থকতা নাই। তবে কালিদাস একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন, একথা সত্য। কথিত আছে, মানসিংহের আক্রমণ কালে তিনি যশোহর-দুর্গ-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রতাপের পতনের পরও তিনি জীবিত ছিলেন, এবং যখন দেখিলেন বঙ্গীয় সৈন্যরা বিনষ্ট ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, সর্ব্বত্র মোগলেরা ঘোর অত্যাচার করিয়া দখল করিয়া লইল, তখন কালিদাস যশোহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মভূমি সেখহাটি গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে সেখহাটি একটি বিখ্যাত স্থান। ইহার বিশেষ পরিচয় আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেন রাজত্বের ইতিহাস প্রসঙ্গে দিয়াছি।[১] সেখহাটি বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত এবং সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। কালিদাসের উর্দ্ধতন বংশীয়গণ কয়েকপুরুষ ধরিয়া এই সেখহাটিতে বাস করিতেছিলেন। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় দত্তবংশীয় মৌলিক কায়স্থ। সিদ্ধমৌলিকগণের যে ত্রিশটি প্রধান সমাজ আছে, তন্মধ্যে বিঘাটিয়া অন্যতম; এখানকার কন্ধীশ গোত্রীয় দত্তগণ প্রসিদ্ধ।[২] বিশ্বেশ্বর দত্ত এই বিঘাটিয়ার দত্তগণের বীজপুরুষ বলিয়া উক্ত হন। বিশ্বেশ্বর হইতে ৮ম পুরুষ জনার্দ্দনের দুই পুত্র ছিলেন, শ্রীরাম ও কানাইদাস। শ্রীরাম চেঙ্গুটিয়া পরগণার জমিদার হন, তখন তাঁহার রায় চৌধুরী উপাধি হয়। তিনি তাঁহার ভ্রাতা কানাইদাসকে জমিদারীর অংশ দেন নাই। কানাইদাস বাদশাহ হুসেন শাহের আমলে তহশীলদারের কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি পান। কালিদাস এই কানাইদাস মজুমদারের পুত্র দুর্গাদাসের কনিষ্ঠ সন্তান।[৩]

পাই: 'সেনাধিপতিরূপা সা যশোহর-সুরক্ষকা', 'সারতত্ত্বতরঙ্গিণী'তে লিখিত হইয়াছিল: 'যুদ্ধে যার সেনাপতি আপনি কালিকে'—এই সব উক্তি একত্র করিয়া দেখিলে কালী বলিতে মাতা কালিকাদেবীকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু কালিদাসের বাসস্থান বিভাগদি প্রভৃতি স্থানে এবং বড়গাতির গুরু-ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ঐ ভারতচন্দ্রের কবিতায় সেনাপতি কালিদাসেরই কথা বলা হইয়াছে। ইহা অতিরিক্ত স্তাবকতা মাত্র—সত্য বলিয়া ধরিতে পারি না।

১ ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৪০-৫২ পৃ।

২ 'কায়স্থ-কারিকা', উপক্রমণিকা, ১৬ পৃ।

৩ এই দত্তবংশ চিরদিনই বংশমর্য্যাদায় উচ্চ। তাঁহারা কুলীনের সঙ্গে ব্যতীত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন না। নড়াইলের নিকটবর্ত্তী উজিরপুরের রাজা কেশব ঘোষ শ্রীরাম রায় চৌধুরীর সমসাময়িক। তিনি ধনসম্পদে প্রবল ও গর্ব্বিত হইলেও বংশ গৌরবে হীন ছিলেন, তিনি শ্রীরামের

কালিদাস আজীবন সৈনিক পুরুষ। শিশুকালে তিনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। তখন লেখনী অপেক্ষা বংশযষ্ঠি পরিচালনাই তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। প্রাচীন বঙ্গে লাঠিই আত্মরক্ষা বা পরপীড়নের প্রধান সম্বল ছিল। এখন যেমন লাঠি 'ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুরভীত বাবুবর্গের হস্তের শোভা বর্দ্ধন করে এবং কুকুর ডাকিলেই সে ননীর হস্তগুলি হইতে খসিয়া পড়ে,'[১] পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তখন ইহারই বলে গৃহস্থের মানমর্য্যাদা ও ধনধান্য রক্ষিত হইত। দেশ ও সমাজ উভয়েরই শাসন ভার লাঠির উপর ন্যস্ত ছিল। ক্ষুদ্র লাঠিয়ালদলের সর্দ্দার কালিদাস লাঠির শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া বিখ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার সামর্থ্যে কুলায় নাই; চেঙ্গুটিয়া, ইশফপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি সকলই প্রতাপাদিত্যের করতলগত হইয়াছিল। হয়তঃ সেই সময়ে প্রতাপ কালিদাসের খ্যাতি শুনিয়া গুণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে স্বকীয় ঢালী সৈন্যের একজন প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালিদাস চিরদিন বিশ্বস্ত ভক্তের মত তাঁহার অধীন থাকিয়া, বহু যুদ্ধে স্বীয় অসামান্য বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সে বীর্য্যবত্তার বিশেষ গল্পকাহিনী সেখহাটি অঞ্চলে প্রচলিত নাই, কারণ তাঁহার যোদ্ধৃজীবন সে স্থান হইতে বহু দূরে সমাহিত হইয়াছিল।

প্রতাপের পতনের পর কালিদাসের ঢালী সৈন্য কতক তখনও অবশিষ্ট ছিল; তিনি তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ লইয়া আসিয়া, সেই বিপ্লবের যুগে বিস্তীর্ণ ইশফপুর পরগণা দখল করিয়া বসেন। এই পরগণা তখন ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত এবং ইহার রাজস্ব ২,৫৮,০২৫ দাম বা ৬,৪৫০৲ টাকা।[২] বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার আয়ও পরে বর্দ্ধিত হয়। চাঁচড়ার রাজা মহাতাবরাম রায়

কন্যা বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন; যখন তাঁহাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না, তখন তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য শ্রীরামের পক্ষীয় লোকে এক কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সম্মতি দেন। তখন সেই 'আশমানী কুদ্‌রতী (অর্থাৎ অত্যধিক অহঙ্কারী) রাজা কেশব ঘোষ' অসংখ্য লোক লস্কর সহ মহাসমারোহ করিয়া সেখহাটি আগমন করেন। শ্রীরাম রায় একটি পুরুষ ছেলেকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া দেন। ক্রোধান্ধ কেশব বহুবার এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু লাঠিয়ালের বলে চেঙ্গুটিয়ার জমিদার প্রতিবারই তাঁহাকে পরাস্ত ও নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১ বঙ্কিমচন্দ্র, 'দেবী চৌধুরাণী', ১৫৮ পৃ।

২ *Ain-i-Akbari* (Jarrett), Vol. II, p. 132.

বহুবার তাঁহার হস্ত হইতে এই পরগণা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কালিদাস তাঁহার সকল আক্রমণ নিরাকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ঢাকার সুবাদার কাশিম খাঁর নিকট বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সন্তুষ্টিসাধন করিয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর সম্বলিত ইশফপুর পরগণার সনন্দ লাভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার 'রায় চৌধুরী' উপাধি হয় এবং সাধারণের নিকট তিনি রাজা বলিয়া পরিচিত হন। সনন্দ গ্রহণের পর কালিদাসের জীবদ্দশায় চাঁচড়ারাজ ইশফপুর লাভের জন্য আর কোনও চেষ্টা করেন নাই। মহাতাবের পুত্র কন্দর্পের সময় (১৬১৯-১৬৪৯) ইশফপুর কালিদাসের বংশীয়গণের করায়ত্ত ছিল। বহুদিন পরে কন্দর্পপুত্র মনোহর রায় উহা অধিকার করিয়া লন।[১]

পরগণা দখল করিয়া কালিদাস রায় তদন্তর্গত ভৈরব-তীরবর্ত্তী বিভাগদি গ্রামে আবাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে এই বিভাগদি গ্রামের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং ইহা অতি প্রাচীন গ্রাম। কালিদাস এই স্থানে আসিয়া গড়কাটা বাড়ী, বাসোপযোগী অট্টালিকা এবং মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া উহা রাজধানীর মত করিয়া লন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এখানে হীনভাবে বাস করিলেও তাঁহার বাসভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে যদিও কোন মন্দির বা অট্টালিকা দণ্ডায়মান নাই, তবু নানাস্থানে রাশি রাশি ইষ্টকস্তূপ, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও গড়ের চিহ্ন পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার খনিত প্রাচীন জলাশয় এখনও 'মঠবাড়ীর দীঘি' বলিয়া খ্যাত। বিভাগদি হইতে পূর্ব্ব নিবাস সেখহাটি যাইবার জন্য তিনি জলপ্লাবিত প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে দশ বার মাইল দীর্ঘ উন্নত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। সেখহাটির সহিত কালিদাসের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তথায় তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তখনও বাস করিতেন। তাঁহারই সময়ে পুষ্করিণী খননকালে তথায় ভুবনেশ্বরী দেবীর অপূর্ব্ব পাষাণ-প্রতিমার আবিষ্কার হয় এবং কালিদাসই তাঁহার প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন।[২]

১ Westland, *Jessore*, pp. 45-6.

২ ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তির বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ডে (৩য় সং ২৪৫-৫১ পৃ) দেওয়া হইয়াছে। এমন সুন্দর দেববিগ্রহ বোধ হয় যশোহর খুল্‌নায় আর নাই। ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহাসিক, প্রসিদ্ধ ডাঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ এই মূর্ত্তির ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সেখহাটি এক্ষণে নড়াইলের জমিদারের হস্তগত হইলেও ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার সংকল্প কালিদাসের বংশীয়গণের নামে হয়।

কালিদাস রায়ের দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষে রামবল্লভ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ও বাণী নামক এক কন্যা এবং দ্বিতীয় পক্ষে রামনারায়ণ প্রভৃতি ছয় পুত্র ও এক কন্যা। এই সকল পুত্রকন্যাগণের বিবাহ দ্বারা তিনি নানাশ্রেণীর প্রধান প্রধান কুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 'গোষ্ঠীপতি' আখ্যা পান। বালী সমাজের ১৯ পর্য্যায়স্থ প্রকৃত মুখ্য গোস্বামী বা গোসাঞিদাস ঘোষ ইছাপুর হইতে আসিয়া দাঁতিয়া পরগণার জমিদার কুমিরা নিবাসী প্রথিত নামা রুক্মিণীকান্ত মিত্রচৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া উক্ত কুমিরায় বাস করিতেছিলেন। কালিদাস স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা বাণীসুন্দরীকে উক্ত গোসাঞিদাসের জ্যেষ্ঠ পৌত্র প্রকৃত মুখ্য রামদেব ঘোষের সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাদিগকে সপরিবারে আনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাঘুটিয়া গ্রামে বসতি করান এবং মৌজে বাণীপুর (কন্যার নামানুসারে) ও মৌজে হরিশপুর মৌরসী মোকবরী গাতি যৌতুক দেন।[১] এই রামদেব বাঘুটিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে প্রায় শতাধিক ঘর হইয়া সুপ্রশস্ত বাঘুটিয়ার বিভিন্ন পাড়ায় বাস করিতেছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে বাঘুটিয়ার ঘোষ মহাশয়দিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীচরণ প্রভৃতি দেশমান্য মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।[২] আমরা পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ দিব। রাজা কালিদাসই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত ঘোষ বংশীয়গণ আজিও তৎপ্রদত্ত যৌতুক-সম্পত্তি খারিজা তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

---

১ ইশফপুর পরগণার সঙ্গে এই সম্পত্তি চাঁচড়া রাজের হস্তগত হয়। কিন্তু ইংরাজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উহা খারিজা তালুক বলিয়া বন্দোবস্ত হয়। উহা যশোহর কালেক্টারীর ২০নং তৌজিভুক্ত। তালুকের রাজস্ব ২১৯ টাকা হইতে এক্ষণে ২৩৪৵১০ দাঁড়াইয়াছে। এই বাণীপুর তালুকের মধ্যে কিসমৎ বাঘুটিয়া (মৌজে বাঘুটিয়া ব্যতীত), কন্দনপুর (বিভাগদির প্রকৃত নাম), মধ্যপুর, সিঙ্গেড়ী, বিছালী ও মাদারবেড় ছিল।

২ রামদেব হইতে প্রবল মুখ্যের প্রধান ধারা এইরূপ: ১৯ গোস্বামী—২০ ভরত—২১ রামদেব—২২ রামেশ্বর—২৩ হরেকৃষ্ণ—২৪ ব্রজকিশোর—২৫ চণ্ডীচরণ—২৬ কৃষ্ণচরণ—২৭ হরিচরণ প্রিয়নাথ ও রাজেন্দ্রকুমার। হরিচরণ ও প্রিয়নাথের বংশ নাই। রাজেন্দ্রের পুত্র অমরেন্দ্র প্রভৃতি। হরেকৃষ্ণের ২য় পুত্র রাজকিশোর—২৫ বাঞ্ছারাম—২৬ দুর্গাচরণ—২৭ কালীপ্রসন্ন—২৮ দেবপ্রসন্ন প্রভৃতি। চণ্ডীচরণ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার মত সম্মানিত হইতেন।

কক্ষীশগোত্রীয় দত্ত-বংশ

- বিশ্বেশ্বর দত্ত, সাং বিঘাটিয়া
  - দিগম্বর
    - কামেশ্বর
      - মথুরানাথ
        - সনাতন
          - রামদেব দত্ত
            - জনার্দ্দন দত্ত
              - শ্রীরাম রায়চৌধুরী [সাং সেখহাটি]
                - গন্ধর্ব্বরায়
                  - গৌরীচরণ
                    - রামচন্দ্র
                      - রামসন্তোষ
                        - প্রাণবল্লভ
                          - রূপরাম
                            - রামনৃসিংহ
                              - গোবিন্দচন্দ্র
                                - কেশবলাল রায়চৌধুরী উকীল ও যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান
                      - রামরুদ্র
                        - শিবরাম
                          - দেবীপ্রসাদ
                            - রঘুনাথ
                              - হরানন্দ
                      - বিনোদরাম
                        - গঙ্গারাম
                          - নীলমণি
                            - আনন্দচন্দ্র
                              - পরেশনাথ
                                - প্রিয়নাথ রায়চৌধুরী
              - কানাইদাস মজুমদার
                - দুর্গাদাস
                  - কেশবরাম
                  - কালিদাস রায়চৌধুরী [সাং বিভাগদি]
                    - রমাবল্লভ
                      - বাণেশ্বর
                        - গঙ্গারাম
                          - দ্বারকানাথ
                            - কৈলাসচন্দ্র
                    - কীর্ত্তিচন্দ্র
                      - হরিরাম
                        - কাশীনাথ
                          - চন্দ্রকুমার
                            - প্রিয়নাথ
                              - মহেন্দ্রকুমার [সাং বিভাগদি]
                          - গঙ্গাধর
                            - পরেশনাথ
                              - হীরালাল
                                - অমূল্যরতন [সাং বিভাগদি]
                    - ৯ পুত্র

কালিদাস স্বীয় কনিষ্ঠ কন্যাকে মাহিনগর সমাজের ২১ পর্য্যায়স্থ কোমল মুখ্য রামদেব বসু মহাশয়ের সহিত বিবাহ এবং নিয়মিত বৃত্তি দান করিয়া বিভাগদি গ্রামে তাঁহার বসতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বর্ত্তমান সময়ে বিভাগদির বসুগণ উক্ত রামদেব বসুর অধস্তন বংশধর।[১] কালিদাস পৌত্রীর সহিত বাগাণ্ডা সমাজের প্রকৃত মুখ্য ২১ পর্য্যায়স্থ যাদবেন্দ্র বসুর বিবাহ হয়। তিনি উঁহাকে বাসের জন্য জঙ্গলবাধাল গ্রামে ও ইশফপুর পরগণার অন্তর্গত তেঘরি নামক একখানি গ্রাম ভোগোত্তর স্বরূপ নিষ্কর দান করেন। যাদবেন্দ্র ও তাঁহার সহোদরগণের বংশ হইতে জঙ্গলবাধালের স্বনামখ্যাত বসু মহাশয়েরা প্রায় ৪০ ঘর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহারা সাত আট পুরুষ তথায় বাস করিতেছেন। বিভাগদি ও জঙ্গলবাধালের বসুগণ অনেকেই এখনও কালিদাস প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। তিনি অন্যান্য স্থানের কায়স্থদিগকেও মহাত্রাণ দিয়াছিলেন।

কালিদাস অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন; নিকটবর্ত্তী বড়গাতি, শিঙ্গিয়া, সেখহাটি, দেয়াপাড়া, ভুগিলহাট ও শোলপুর প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রামের অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও কালিদাস প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগদখল করিতেছেন। বড়গাতির জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত কালিদাস রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন; পরে তাঁহারই বংশধরগণ বাঘুটিয়ার ঘোষ বংশের গুরুকুল। কালিদাস অত্যন্ত দাতা বলিয়া খ্যাত; তিনি যাগযজ্ঞ উপলক্ষে দীনদুঃখীদিগকে অজস্র দান করিতেন। মানুষ থাকে না, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি থাকে, কালিদাস নাই, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

বিজয়রাম ভঞ্জ চৌধুরী॥ বিজয়রাম মহাবীর এবং প্রতাপাদিত্যের একজন সেনাপতি বলিয়া ভঞ্জ-বংশ এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ অতি পুরাতন বংশ। এরূপও কথিত আছে যে, ভঞ্জদিগের আদি স্থান রাজপুতানায়, তথা হইতে তাঁহারা উড়িষ্যায় ও পরে ময়ূরভঞ্জে রাজার মত বাস করেন। সেখান হইতে কে কখন বঙ্গদেশে আসেন, তাহা জানা যায় নাই, তবে মুসলমান বিজয়ের প্রায় শতবর্ষ পরে কুবের ভঞ্জ দক্ষিণবঙ্গে

১ এই বংশের একটি ধারা এইরূপ: কোমলমুখ্য ২১ রামদেব—২২ নিধিরাম—২৩ রামরাম ২৪ গোরাচাঁদ—২৫ কো-মু-গদাধর—২৬ শশিভূষণ (রায়সাহেব)—২৭ যতীন্দ্র, খগেন্দ্র, বিনয়।

হাতিয়গড়ের অন্তর্গত বহড়ু গ্রামে বাস করেন, এরূপ জানা যায়। কুবেরের পুত্র কাকুৎস্থ, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুত্রদ্বয় মকরন্দ ও বিদ্যাধর। মকরন্দের কোন অধস্তন বংশধর কলাধর ও মালাধর দুই ভ্রাতায় খড়রিয়া, সুলতানপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী পাইয়া প্রথমতঃ মৌভোগ গ্রামে ও পরে তাঁহাদের বংশধরগণ নলধায় বাস করেন। সে ইতিহাস পরগণার বিবরণী প্রসঙ্গে পরে দিব। বিদ্যাধরের প্রপৌত্র বা তাঁহার অধস্তন কোন বংশধর হাওড়া জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর (সম্ভবতঃ শ্রীরামপুব কায়স্থপাড়া) হইতে উঠিয়া আসিয়া খাঞ্জে গ্রামের অপর পারে বর্ত্তমান হাসনাবাদের সন্নিকটে বোলতলা নামক স্থানে বাস করেন। তদ্বংশীয় হরিহর ভঞ্জ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। হরিহরের পুত্র যাদবেন্দ্র বিক্রমাদিত্যের সময় রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং পরে প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে তিনি তাঁহার কোষাধ্যক্ষ বা রাজস্ববিভাগীয় দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে সমাসীন হন। তখন তিনি বোলতলা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামতীর পূর্ব্বপারে বর্ত্তমান কালীগঞ্জের চারি মাইল উত্তরে নল্‌তা গ্রামে বসতি করেন।

যাদবেন্দ্র এই স্থানে আসিয়া দীর্ঘিকা খনন ও প্রাচীর বেষ্টিত আবাস-বাটিকা নির্ম্মাণ করেন। এখন অসংখ্য পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা ও সিংহদ্বারের তোরণ-প্রাচীর তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যাদবেন্দ্র কৃষ্ণভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন; তিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব রায় বিগ্রহের জন্য নিজ বাটীতে যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহার পোতা পর্য্যন্ত মৃত্তিকা নিম্নে বসিয়া গেলেও মন্দিরটি দুইবার বজ্রাঘাত সহ্য করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং তন্মধ্যে শ্রীবিগ্রহের নিত্য পূজা হইতেছে। ঐ পূজা নির্ব্বাহের জন্য ৩০০/ তিন শত বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর আছে; বৈশাখ, কাত্তিক ও মাঘ মাসে নিত্য কীর্ত্তন হয়। সে সম্পত্তির আদায়ের ব্যবস্থাদি পুরোহিতগণই করেন। ৺কৃষ্ণদেব রায়ের মন্দিরটি দোতালা; উহার নিম্নতলার বাহিরের মাপ ৩০´-৬″ × ২৬´ ফুট এবং দোতালার গর্ভমন্দির ১৪´-৫″ × ১৪´-৫″। এখনও মন্দিরটি রীতিমত মেরামত না করিলে আর দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। কৃষ্ণদেবের দোল উৎসবের জন্য যে সুন্দর দোলমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও আছে। ভঞ্জগণ জামদগ্ন্য গোত্রীয় এবং ভট্টপল্লীর বৈদিক ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহাদের গুরু।

যাদবেন্দ্রের পুত্র বিজয়রাম বিপুল বপু এবং অদ্ভুত দৈহিক বলের পরীক্ষা দিয়া প্রতাপের শরীররক্ষী সৈন্যদলের সর্দ্দার হইয়াছিলেন (২৩২ পৃ)। তিনি

ভঞ্জচৌধুরী-বংশ

- শ্রীহরি বা হরিহর ভঞ্জ
  - অভিরাম
  - রাম
  - যাদবেন্দ্র
    - রাজারাম [চাল্‌তাবাড়িয়া]
    - বিজয়বাম ভঞ্জচৌধুরী
      - (১) কৃষ্ণপ্রসাদ
      - শিবনারায়ণ
        - রামহরি
          - গৌরহরি
            - লোকনাথ
              - নীলকান্ত
          - তারিণী
            - শ্যামাচরণ
              - দীনদয়াল
        - শ্রীদাম
          - বংশীবদন
            - গোপাল প্রভৃতি
        - দর্পনারায়ণ
          - প্রতাপ নারায়ণ
            - শীতল
              - যতীন্দ্র
      - রামদেব
        - পুত্র [?]
          - শ্রীনাথ
            - বিহারীলাল
              - হরিচরণ
          - জানকী
            - হারাণ
              - শ্রীশ

- (১) কৃষ্ণপ্রসাদ
  - জগন্নাথ
    - কাশীনাথ
      - বিশ্বনাথ
        - গোপীনাথ
          - চিন্তামণি [পোষ্য]
  - কালাচাঁদ
    - গোলক
      - প্রাণকৃষ্ণ
        - উত্তম
          - আশুতোষ
  - রামলোচন
    - রাজবল্লভ
      - অমূল্যকৃষ্ণ
        - অবনী
        - জিতেন্দ্র
        - মাণিক
        - জহর

দশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বিজয়রাম শেষ যুদ্ধ পর্য্যন্ত প্রতাপ-সৈন্যের অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোষাধ্যক্ষ বা তাঁহার পুত্র কখনও কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন নাই। দিলে প্রবাদ তাঁহাকে অব্যহতি দিত না; আজ যে বিজয়রামের বীরত্ব-খ্যাতি যশোহর অঞ্চলে গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে, তাহা হইত না। প্রতাপের পতনের পর, বিজয়রাম চতুঃপার্শ্বস্থ বাজিতপুর পরগণা দখল করিয়া বসেন এবং পরে নবাব সরকার হইতে উহার জমিদারী সনন্দ এবং বংশানুক্রমিক চৌধুরী খেতাব লাভ করেন। বিজয়রাম হইতে ভঞ্জচৌধুরীগণ সাত আট পুরুষ নলতায় বাস করিতেছেন এবং তাঁহারা স্বশ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি-বৃত্তি দিয়া তথায় বাস করাইয়াছেন। কালে গোষ্ঠীবৃদ্ধি ও জ্ঞাতি-বিরোধবশতঃ ভঞ্জ জমিদারগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। সমগ্র বাজিতপুর পরগণার মাত্র ৶০ তিন আনা অংশ এক্ষণে তাঁহাদের বহু সরিকের হস্তগত আছে; অবশিষ্ট জমিদারীর ৸০ বার আনা অংশ সাতক্ষীরার জমিদারবাবুদিগের এবং এক আনা অংশ শ্রীপুর নিবাসী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের হইয়াছে। ইংরাজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় যে সব জমিদারের সহিত প্রথম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশীবদন ভঞ্জ চৌধুরী অন্যতম। যশোহর-ধূমঘাট লাটেরও কতকাংশ তাঁহারই সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এজন্য ঐ অংশের নাম বংশীপুর লাট। সে লাট এক্ষণে টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্বত্বাধীন হইয়াছে। ভঞ্জ-বংশের বংশলতিকা এইরূপ: বিদ্যাধর, তৎপুত্র পূর্ণানন্দ, তৎপুত্র বিন্যাসচন্দ্র, তৎপুত্র জয়রাম ও প্রভুরাম; জয়রামের পুত্র চূড়ামণি, তৎপুত্র দুর্গাদাস; এই দুর্গাদাস বা তৎপুত্র হরিহর বোলতলায় বাস করেন।

র ঘু না থ রা য়॥ ঘটকারিকায় যে 'প্রচলিত রঘু'[১] নামক প্রতাপাদিত্যের সেনাপতির কথা আছে, তিনি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসেন নাই।[২] তাঁহার নিবাস

১ 'সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ রঘুঃ প্রাচ্যপতিস্তথা।'

—ঘটককারিকা, নিখিলনাথ, মূল ৩১৪ পৃ।

২ এই পুস্তকের ২৩০ পৃষ্ঠায়, [২য় সং ২৩৬ পৃ] রঘু পূর্ব্বদেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা সত্য নহে। পূর্ব্বে এ সংবাদ জানিতে পারি নাই।

সৌপায়ন গোত্রীয় নাগ-বংশ

৮ রাজা রাজবল্লভ নাগ [শৈলকূপা]
|
৯ গোবিন্দ
|
১০ রঘুনাথ রায় [প্রতাপ-সেনানী]
|
১১ রামনারায়ণ
[সাং বাগ্‌চুলী]
|
১২ হরিরাম
|
১৩ কালীচরণ [সাং বাগ্‌চুলী] — ভবানী [সাং ঘুড়্‌কা] — চণ্ডীচরণ রায় [সাং বালিয়াপাড়া]

চণ্ডীচরণ রায়
|
১৪ রামকান্ত রায়
|
১৫ ব্রজকুমার রায়
|
১৬ রামধন রায়
[সাং রায়বাগুলাট]
|
১৭ নবীন — বিশ্বম্ভর রায় [রায়বাহাদুর] — কেশব

বিশ্বম্ভর রায়
|
১৮ অবলা — ক্ষিতীশ — খগেশ — রমেশ

ছিল, যশোহর জেলার অন্তর্গত শৈলকূপায়। তিনি সৌপায়ন গোত্রীয় নাগবংশীয় বারেন্দ্র কায়স্থ। এই নাগ বংশ খুব পুরাতন। কান্যকুব্জান্তর্গত কোলাঞ্চনগর হইতে আগত শৈলকূপার বারেন্দ্র নাগ-বংশ অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। যদুনন্দন কৃত 'ঢাকুরী' হইতে জানা যায়, শিবরায় নাগ শৈলকূপার অধিবাসী। তৎপুত্র কর্কট ও জটাধর নাগ বল্লাল সেনের সমসাময়িক ও সমাজবন্ধনে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কর্কট তারাউজলিয়া[১] পরগণার অধীশ্বর হইয়া শৈলকূপায় ছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা জটাধর সোণাবাজ পরগণা পাইয়া বরেন্দ্রভূমিতে স্বগ্রামে উঠিয়া যান। কথিত আছে, বল্লালের প্রতি বিরক্ত হইয়া নন্দী, চাকী, দাস কুলীনেরা শৈলকূপায় নাগরাজগণের আশ্রয়ে আসিয়া বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলবিধি প্রণয়ন করেন।[২] রাজা কর্কট নাগ হইতে বংশধারা এইরূপ: ১ কর্কট—২ সতী—৩ বসুধারা—৪ বিভা—৫ শুক্লাম্বর ও শুভঙ্কর, শুক্লাম্বর শৈলকূপায় থাকেন এবং শুভঙ্কর পার্শ্ববর্ত্তী নাগপাড়ায় উঠিয়া যান,—৬ শুক্লাম্বরের পুত্র গরুড়ধ্বজ,—৭ তৎপুত্র কালিদাস রায়,—৮ তৎপুত্র রাজা রাজবল্লভ। ইনি মুসলমান রাজসরকার হইতে জায়গীর ও রাজোপাধি লাভ করেন। যদুনন্দনের 'ঢাকুরী'তে আছে:

'কালিদাস পুত্র রাজা রাজবল্লভ হইল
মুন্‌সেফ জানিয়া পাত্‌সা রাজ-টীকা দিল।'

[মুন্‌সেফ অর্থ—জায়গীর]

এই রাজবল্লভের পৌত্র রঘুনাথ রায় প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক ও দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন (২১১ পৃ)।

'প্রতাপ আদিত্য রাজা বঙ্গ-অধিপতি।
পূর্ব্ব খণ্ডে ছিলেন তাঁর রঘু সেনাপতি॥

১ *Ain-i-Akbari* (Jarrett), Vol. II, p. 133. তারাউজলিয়া, Taraojiyal পরগণা মামুদাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত, উহার রাজস্ব ছিল ৩৯১,৩৬৫ দাম। এই পরগণার কতকাংশ অন্য পরগণার সামিল হইয়া গিয়াছে, কতক এই নামে বর্ত্তমান যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলার সীমাভুক্ত রহিয়াছে।

২ কালীপ্রসন্ন সরকার, 'কায়স্থ-তত্ত্ব,', ৯৫ পৃ; 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্য কাণ্ড, ২৪৩-৪৫ পৃ।

মানসিংহ হস্তে যদা প্রতাপ পড়িল।
মহাযুদ্ধে রঘুবীর প্রাণ বিসর্জ্জিল॥
বিষয় বিভব মঠ পর হস্তগত।
দেবালয় মসজিদে হৈল পরিণত॥'[১]

রঘুবীরের মৃত্যুর পর তাঁহার জমিদারী পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা মানসিংহের সময়ে হয় নাই—সম্ভবতঃ ঐ কার্য্য ইসলাম খাঁর সেনানী ইনায়েৎ খাঁর আদেশে সাধিত হয়। তখন রঘুর পুত্র 'রাজাহীন রায়' রামনারায়ণ শৈলকুপা পরিত্যাগ করিয়া বাগ্‌তুলী গ্রামে (বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত) গিয়া বাস করেন। তথা হইতে ক্রমে এই বংশ (রঙ্গপুর) কাকিনা, (পাবনা) ঘুড়্‌কা, (নদীয়া) বালিয়াপাড়া, (যশোহর) উর্দ্দিঘড়ী বা উদাস প্রভৃতি নানা স্থানে বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বালিয়াপাড়ার ধারায় রঘুবীর হইতে ৮ম পুরুষে কায়স্থকুল-গৌরব রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় জীবিত আছেন। ইনি স্বজাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং জরাগ্রস্ত হইলেও নড়াইল হাটবাড়িয়ায় কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র ধরিলে, রঘু হইতে দশ পুরুষ হইয়াছে। রায়বাহাদুর এক্ষণে নদীয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য গবর্ণমেণ্ট উকীল।

সবাই ঢালী ও সুন্দর মল্ল॥ সে এক যুগ ছিল, যখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও ঢালী বা মল্ল প্রভৃতি খেতাবে অস্ত্রশস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। সবাই এবং সুন্দর যে উভয়ে সহোদর এবং বন্দ্যঘটী বংশীয় ১৭শ প্রসিদ্ধ কুলীন চতুর্ভুজের পুত্র, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৩০ পৃ)। সবাই যশোহর জেলার আল্‌তাপোলের বাঁড়ুয্যে বংশের আদি পুরুষ; তাঁহার একটি বংশধারাও আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (২৪৪-৫ পৃ)। সবাইএর প্রপৌত্র মথুরেশের এক পুত্র নন্দকিশোরের ধারা আমরা কতক দেখাইয়াছি; মথুরেশের অন্য পুত্র শ্রীরামের ধারা এই:

২২ শ্রীরাম—২৩ গোপাল—২৪ রাধাকান্ত—২৫ রামনিধি—২৬ রামনারায়ণ —২৭ রামচাঁদ—২৮ শিবচন্দ্র—২৯ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, ইনি 'গ্রীক

১ বিশ্বম্ভর রায় (রায়বাহাদুর), 'নাগবংশ, ঢাকুর', ১৪-১৫ পৃ।

ও হিন্দু' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সম্মানিত উচ্চ রাজকর্ম্মচারী।

সবাই বাঁড়ুয্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর মল্ল প্রতাপাদিত্যের একজন সেনানী। সম্ভবতঃ আমরা তাঁহার তীরন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক যে সুন্দরের কথা বলিয়াছি (২৩১ পৃ), তিনি ও সুন্দর মল্ল অভিন্ন ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সুন্দর বা তাঁহার পুত্র বিষ্ণুচরণ সিদ্ধান্ত ভৈরবকূলে সেনহাটি আসিয়া বাস করেন। কাঞ্জারি ও কাটানি বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ-সূত্রই তাঁহাদের সেনহাটি আসিবার কারণ। বিষ্ণুচরণ সিদ্ধান্তের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি হইলে, যে পাড়ায় তাঁহারা বাস করেন, তাহার নাম হইয়াছে 'সিদ্ধান্তপাড়া'। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা মুকুন্দপুরের রায় মহাশয়দিগের গুরু; তাঁহারা যে এক সময়ে যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে বাস করিতেন, ইহা দ্বারা উহা প্রমাণ করে। সেনহাটির সিদ্ধান্ত-বংশ আদ্যোপান্ত পণ্ডিতের বংশ এবং বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ পরিবারের গুরুবংশ। বিষ্ণুচরণের পৌত্র নারায়ণ তর্কালঙ্কার প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। নারায়ণের পৌত্র কৃষ্ণদেবের সময় মুকুন্দপুর রায়বংশীয় জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক ১৬৫৭ শকে (১৭৩৫ খৃঃ অঃ) যে শিব-মন্দির নির্ম্মিত ও পুষ্করিণী খনিত হয়, উহা এখনও আছে। উহার সংস্কারাদির ব্যয় সেই বংশীয় লক্ষ্মণচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি এখনও বহন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হরিনাথ বেদান্তবাগীশ অসাধারণ পাণ্ডিত্যশালী হইয়া বর্দ্ধমানরাজের বিজয়-চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে সমাসীন ছিলেন। আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতাম এবং তাঁহার স্নেহের গুণে ও চরিত্রমাধুর্য্যে একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি সুন্দরের বংশধারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বীয় বংশ-গৌরব সম্বন্ধে 'সুন্দরঃ সিদ্ধান্তশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতো বংশো বলিগণৈঃ' এইরূপ একটি শ্লোকাংশ আবৃত্তি করিতেন, এখন আর তাহা উদ্ধারের পন্থা নাই।

সেনহাটি সিদ্ধান্ত-বংশ

[বন্দ্যঘটি থাকে ১০ মকরন্দের পুত্র দাশরথির বংশে ১৭শ পুরুষ চতুর্ভুজ বিখ্যাত কুলীন]

- চতুর্ভুজ
  - লোহাই
  - সবাই [ঢালী]
  - সুন্দর [মল্ল]
    - বিষ্ণুচরণ সিদ্ধান্ত [সাং সেনহাটি]
      - শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য
        - (১) নারায়ণ তর্কালঙ্কার
        - রামদেব তর্কবাগীশ
          - রমাবল্লভ
            - কাশীশঙ্কর
              - গঙ্গাধর ন্যায়ভূষণ
                - গোকুল
                  - গণপতি
                - পদ্মলোচন বাচস্পতি [সুলেখক]
          - রামদুলাল
            - রামগোবিন্দ
              - শম্ভুনাথ
                - তিলক
                  - কৃষ্ণনাথ
                    - প্রমথ
        - রামচন্দ্র
          - বিষ্ণুকান্ত
            - হরিদেব
              - গৌরমোহন
                - হারাণ
                  - গোপাল
                    - মহেন্দ্র
                - কন্যা = তারকনাথ ভট্টাচার্য্য [সাং বড়গাতি]
                  - মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য [ডাক্তার][1]

---

১ ইনি এখন কাশীবাসী। মোক্ষদাচরণ 'যশোহর-কাহিনী' সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। এজন্য তিনি অনুসন্ধিৎসা লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণও করিয়াছিলেন। সে অসম্বদ্ধ ও অনিয়মিত চেষ্টায় বিশেষ ফল হয় নাই। তাঁহার সংগ্রহের কতক খাতাপত্র আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রমাণাভাবে আমি তাহার প্রায় কিছুই ব্যবহার করিতে পারি নাই। তবুও আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

(১) নারায়ণ তর্কালঙ্কার

- নারায়ণ তর্কালঙ্কার
  - রুদ্রদেব
    - কৃষ্ণদেব
      - বিশ্বনাথ
        - রামশরণ
          - রামসন্তোষ
            - গোবিন্দ
              - অক্ষয়
                - নরেন্দ্র
                  - অজিত
            - মহিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
              - সতীশ
                - মনোরঞ্জন প্রভৃতি
      - জগন্নাথ
      - রামজীবন
        - কালীকিঙ্কর
          - রামসুন্দর
            - অভয়াচরণ
              - বসন্ত প্রভৃতি
            - হরিনাথ বেদান্তবাগীশ
              - ভবনাথ
              - কুলদা
      - রামগোপাল
        - জন্মেজয়
          - মথুরানাথ
            - শীতলচন্দ্র
              - নগেন্দ্র প্রভৃতি
      - শিবরাম

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যশোহর-রাজবংশ

পূর্ব্বে আমরা একাদশ পরিচ্ছেদে (১০৭-১৫ পৃ) প্রতাপাদিত্য পর্য্যন্ত যশোহর রাজবংশের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিয়াছি। প্রতাপের পতনের পর এই বংশের কিরূপ পরিণতি হইয়াছিল, তাহাই এখানে দেখাইব। পূর্ব্বলিখিত সেই 'বংশকথা' দৃষ্টিপথে রাখিয়া এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে হইবে। প্রতাপাদিত্যের ছয়টি পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়াদিত্য সম্মুখ-যুদ্ধে পতিত হন, তাহা আমরা জানি। দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায় সম্ভবতঃ পিতার জীবদ্দশায় রোগশয্যায় প্রাণ-ত্যাগ করেন; তিনি চিররুগ্ন বলিয়া যুদ্ধাদির কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার একটি শিশুপুত্র মাতামহ গোপালদাস বসুর বাটীতে বসুরহাটে ছিল; এই পুত্রের নাম বিজয়াদিত্য। প্রতাপের পতনের পর বসু মহাশয় যশোহর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া ঢাকায় যান; তথায় বিজয়াদিত্য তাঁহারই আশ্রয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হন। ইদিলপুরের কারিকা হইতে জানিতে পারি, এই বিজয়াদিত্যের সহিত মৌলিক রাহা বংশীয় মদন রায়ের কন্যার বিবাহ হয়। রুদ্র রাহা হইতে ধারা এইরূপ: রুদ্র রায়—দুর্গাবর—গোবিন্দ—পরমানন্দ—মদন রায়। 'দানং সৎ বিজয়াদিত্য প্রতাপাদিত্য পৌত্র।'[১] এই কন্যার বা অন্য স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় কিনা জানা যায় নাই। প্রতাপের তৃতীয় পুত্র সংগ্রামাদিত্য সংগ্রাম ভালবাসিতেন এবং রাজনৈতিক দৌত্যকার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন। সম্ভবতঃ প্রতাপ ঢাকায় যাইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধকালে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের এই তিন পুত্র নাগকন্যা মহারাণী শরৎকুমারীর গর্ভজাত।

ঘোষকন্যার গর্ভে প্রতাপের আরও তিন পুত্র হয়; রামভদ্র, রাজীব ও জগদ্বল্লভ। শেষোক্ত দুইজন বালক মাত্র, তাঁহারা মাতৃসঙ্গে জলমগ্ন হন। রামভদ্রের অন্য নাম প্রতাপ-ভীম; তিনি বালক হইলেও সাহসী ও বলশালী ছিলেন। মহারাণীর পলায়নের পর মোগলেরা দুর্গাক্রমণ সময় তিনি বলদর্প দেখাইতে গিয়া বন্দী হন;[২] প্রবাদ আছে তাঁহাকে পরে বলপূর্ব্বক মুসলমান

---

১ 'রাহাবংশকারিকা' (কাড়াপাড়ায় সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথি), ৫ পৃ।

২ 'বিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, ২৭৯ পৃ।

ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় এবং 'তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে পাটনা নগরের এক সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ মুসলমানবংশের অন্তর্গত।'[১] প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা ভূপতি রায়ের পুত্র মুকুটমণি যুদ্ধকালে পলায়ন করিয়া বর্ত্তমান বাগেরহাটের অন্তর্গত উৎকূল গ্রামে আশ্রয় লন, তথায় তাঁহার বংশ আছে। এই বংশীয় রায় চৌধুরীগণ এক্ষণে সাত ঘর তথায় বাস করিতেছেন; তবে তাঁহারা এক্ষণে এমন হীন দশায় পতিত যে শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া, কেবল মাত্র উদরান্নের চিন্তায় দিন যাপন করিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী রঘুনাথপুরে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত ৺কালীবাড়ী এবং শিলাময় কৃষ্ণচন্দ্র ও পিতলের রাধিকা বিগ্রহ আছেন। ৺কালিকা দেবীর মূর্ত্তি নাই, ঘটে পূজা হয়। আঁধারমাণিকের ভট্টাচার্য্যগণ এখনও এই বংশের গুরু। মুকুটমণির পৌত্র বৈদ্যনাথ হইতে এই বংশের একটি শাখা এখানে প্রদর্শিত হইতেছে :

বৈদ্যনাথ—হরিদেব—ভৈরবচন্দ্র—জগন্নাথ—রাজকুমার, দণ্ডী ও নন্দ; নন্দ এবং তৎপুত্র নলিনী ও শশী জীবিত আছেন। রাজকুমারের পুত্র শ্রীশ ও ভূপেশ এবং দণ্ডীর পুত্র সুরেন্দ্র এখনও বংশ-প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

মানসিংহের সহিত প্রতাপের সন্ধি হইবার সময়ে, রাঘব রায় তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর-রাজ্যের ছয় আনা অংশ দাবি করেন; উহা না দিবার কারণ ছিল না। তবে লক্ষ্মীকান্তকে কালীঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি দেওয়ার প্রয়োজন হইল; কারণ লক্ষ্মীকান্ত বাল্যকালে কালীঘাটেই প্রতিপালিত এবং বয়স্ক হইয়া তথায় বসতি করেন। লক্ষ্মীকান্তকে সন্তুষ্ট না করিলে মানসিংহের যে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় না। উঁহাকে কয়েকটি পরগণা দিতে গেলে রাঘবের রাজ্যাংশ পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। সুতরাং তাঁহাকে প্রতাপের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটি পরগণা দিতে হইল। পূর্ব্বে কালিন্দীর খাল প্রতাপের নিজ অংশের পশ্চিম সীমা ছিল, এক্ষণে যমুনা নদী পশ্চিম সীমা হইল। যমুনার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগের নাম হইল ধুলিয়াপুর পরগণা; পরে কালিন্দী-স্রোত প্রবল হইয়া ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিল; তখন যমুনা ও কালিন্দীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ধুলিয়াপুর এবং কালিন্দীপারে পার-ধুলিয়াপুর হইল। উভয় পরগণা রাঘবের হস্তে পড়িল। যমুনার উত্তরে বর্ত্তমান কালীগঞ্জের নিকট যে বাজিতপুর পরগণা (২২৮ পৃ) ছিল, তাহাও

১ সতীশচন্দ্র রায়, 'বঙ্গীয় সমাজ', ১৮৬ পৃ।

রাঘবকে প্রদত্ত হইল। এই বাজিতপুরের উত্তরাংশেও তাঁহার রাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। কালে সেই অংশের নাম হয় সরফরাজপুর পরগণা। তাহার কথা আমরা পরে বলিব। এই সকল পরগণার অধিকারী হইয়া রাঘব রায় কিছু দিন যশোহরের পুরাতন রাজধানীতে রাজত্ব করেন।

রাজা বসন্ত রায়ের চারিটি বিবাহ ও এগারটি পুত্র। তন্মধ্যে প্রথমা পত্নী ঘোষকন্যাব কোন সন্তান ছিল না। বসু দুহিতার ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীরাম অকালে মৃত্যুমুখে পড়েন ; তখন সে পক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ ; তিনি প্রতাপ হস্তে নিহত হন। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে আমরা কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ রমাকান্তের বিশেষ সন্ধান পাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময় তিনি চাঁদ রায় প্রভৃতির সহিত বাগেরহাট অঞ্চলে সিংহগাতি গ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। তথায় ব্রাহ্মণ-রাঙ্গদিয়ার পূর্ব্ব সীমায় খলসী গ্রামের সন্নিকটে 'রমাকান্ত রায়ের পুকুর' নামক একটি পদ্মসমাকীর্ণ জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণরায় দত্তের কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একজনের দুই পুত্র, চণ্ডীদাস ও নারায়ণ। চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে পরলোকগত হন। নারায়ণের বংশ ছিল, কিন্তু তাঁহারা নগণ্য। অপর দত্ত কন্যার গর্ভজাত তিন পুত্র, তন্মধ্যে রাঘব বা কচু রায় জ্যেষ্ঠ, চন্দ্রশেখর বা চাঁদ রায় মধ্যম এবং রূপ রায় কনিষ্ঠ। রূপ রায়ের বিশেষ পরিচয় জানি না। তাহা হইলে বসন্ত রায়ের মাত্র তিন পুত্রের সহিত পরবর্ত্তী ইতিহাসের সম্পর্ক আছে : রাঘব রায়, চাঁদ রায় ও রমাকান্ত রায়।

এই তিন জনের মধ্যে রাঘব ও চাঁদ রায় সহোদর ভ্রাতা এবং তাঁহাদের মধ্যে সৌহৃদ্য ছিল। রমাকান্ত বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার সহিত অপর দুইজনের কোন সৌহৃদ্য বা সহানুভূতি ছিল না। সুতরাং রাঘব রায় রাজা হইলে চাঁদ রায় ভ্রাতার সহিত মিশিলেন এবং পৈত্রিক রাজ্যের অংশীদার হইতে পারিলেন ; কিন্তু কয়েক বছর পরে যখন চাঁদ রায়ের রাজত্বকালে রমাকান্ত যশোহরে আসিলেন, তখন চাঁদ রায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। এই জন্য তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ চিরদিন রাজোপাধিতে বঞ্চিত রহিলেন। রাঘব ও চাঁদ রায় ছত্রধারী রাজা বলিয়া পরিচিত ; চাঁদ রায়ের বংশীয়দিগের কোন রাজ্যাংশ থাকুক বা না থাকুক, তাঁহারা এখনও সকলেই এ দেশীয় লোকের নিকট রাজা বলিয়াই সম্মানিত হন। রমাকান্তের ধারায় সে সম্মান নাই।

রাঘব রায় রাজা হইয়া আর শান্তি পান নাই। তিনি রাজ্য পাইলেন বটে,

কিন্তু লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত না। তাঁহার 'যশোহরজিৎ' উপাধি মাত্র সার হইল। সকলই স্পষ্টতঃ বা পরোক্ষে তাঁহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া বিদ্রূপ করিত এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তিনিও দেখিলেন, যশোহরের যে বলবীর্য্য বা সমৃদ্ধিশোভা ছিল, তাহা যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে ; বাস্তবিক কয়েক বৎসর হইতে বারংবার মোগল শক্রর আক্রমণ ভয়ে যশোহর সমাজের প্রধান প্রধান সামাজিকগণ রাজধানীর উপকণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দিকে ইছামতীর কূলে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইতেছিলেন ; নিম্নজাতীয় লোকেরা আসিয়া তাঁহাদের আবাসস্থানে বসতি করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহের আক্রমণের সময় হইতে যশোহরে কেমন এক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আরব্ধ হইয়াছিল ; উহার ফলে দেশের শোভা ও স্বাস্থ্য ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছিল। প্রতাপাদিত্যও মানসিংহের বিরাট বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিগৃহীত হইয়া অকালে বার্দ্ধক্য-দশায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। এ নূতন কথা নহে, গত ইয়োরোপীয় তিন বৎসরব্যাপী মহাসমরের পর জর্ম্মান সম্রাট কাইজার কিরূপে হঠাৎ পক্ককেশ বৃদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। বিশেষতঃ প্রতাপ প্রধান সেনানীগণের পতনে এবং শঙ্করের মত বন্ধুর বিচ্ছেদে একান্ত কাতর ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িতেছিলেন ; তাহার ফলে, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আমোদ-প্রমোদ সবই দেশ হইতে অন্তর্ধান করিতেছিল। আর সকল লোকে দেশের এই পরিবর্ত্তন ও দুরবস্থার জন্য প্রকাশ্যে বা অন্তরালে কচু রায়কেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়া অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিত। সে সকল কথা শুনিতে বা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তিনি নিজেও দেশের দশা দেখিয়া স্বকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না বা জীবনে কোনো আশা ভরসা আসিল না। অবশেষে তিনি তিন চারি বৎসরের মধ্যে রাজ্যের প্রতি একেবারে বিরক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায়কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, নিজে আঁধারমাণিক গ্রামে গুরুগৃহে আশ্রয় লইলেন। তথায় তিনি শেষ জীবন কাটাইবার জন্য নদীকূলে যে গড়বেষ্টিত আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়া এক সময়ে নিকটে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিলেও,[১] এখনও

১ আঁধারমাণিকের উত্তর পার্শ্বে যে নীলকুঠি ছিল, তাহা হইতে ইট লইয়া রুদ্রপুরের সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ বাটীতে ব্যবহার করেন। সীতানাথের পুত্র যতীন্দ্রনাথ এক্ষণে ব্যারিষ্টার।

তাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ ভিট্টা এবং বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। উহার দক্ষিণ দিকে একটি শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল এবং সে মন্দিরের ইটগুলি কারুকার্য্যখচিত ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়।[১] নদীর কূলে তিন দিকে গড়বেষ্টিত আর একটি স্থানে একটি গোল পুকুরের পশ্চিম পাড়ে কালীমন্দিরের ভগ্ন গৃহ আছে। এই স্থানটিকে মঠ-বাড়ী বলে। ছোট গোল পুকুরটির সম্পূর্ণ তলদেশে শালকাঠ বিছান ছিল।[২]

ইস্‌লাম খাঁর সময়ের আক্রমণের পূর্ব্বেই, সম্ভবতঃ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে, চাঁদ রায় রাজা হন। প্রতাপের ঢাকায় গমন ও তাঁহার পরিবারবর্গের জলমগ্ন হইয়া মরিবার পর, সম্ভবতঃ ইনায়েৎ খাঁর অনুমতিক্রমে, চাঁদ রায় আসিয়া কিছুদিন ধূমঘাটে বাস করেন। এই সময়ে তিনি ১৬১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মাতা যশোরেশ্বরী ও গোপালপুরের গোবিন্দদেব বিগ্রহের সেবা-ব্যবস্থার জন্য অধিকারীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেবোত্তর সম্পত্তির সনন্দ দেন। গোবিন্দদেব সংক্রান্ত সনন্দের নকল আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (২৬৪-৫ পৃ); অপর সনন্দ এখন আর পাইবার উপায় নাই, কারণ পূর্ব্বতন অধিকারিগণ ঈশ্বরীপুর অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ হইলে একেবারে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। উহার বহু বৎসর পরে বর্ত্তমান অধিকারীরা এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের বিবরণ পরে দিব। গোবিন্দদেব সম্পর্কিত সনন্দ হইতে জানা যায়, চাঁদ রায় মাত্র নিজ অধিকারভুক্ত ধূলিয়াপুর চাকলার মধ্যে ২৮৬৶ বিঘা জমি দেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, মোগলদিগের সহিত বন্দোবস্তসূত্রে চাঁদ রায় উক্ত পরগণার অধিকার লাভ করেন। চাঁদ রায় ধূমঘাটে বাস করিবার সময়, আনুমানিক ১৬২০ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের জন্য ধূমঘাট জলপ্লাবিত হয় এবং ঐ সময় দুর্গটি বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ায় চাঁদ রায় তথা হইতে চলিয়া যান। অবনমিত এবং জলপ্লাবিত দুর্গচত্বর তখন হইতে 'চাঁদ রায়ের দীঘ্' বা দীঘি নামে আখ্যাত হয়। চাঁদ রায় এখান হইতে আঁধারমাণিকে কচু রায়ের বাটীতে চলিয়া যান। কচু রায় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না।

---

১ এই ভগ্ন স্তূপের মধ্যে আঁধারমাণিকের ডাক্তার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি কষ্টিপাথরের ছোট শিবলিঙ্গ পান, উহা তাঁহাদের বাড়ীতে নিত্য পূজিত হইতেছেন।

২ আঁধারমাণিকের পার্শ্বে এখন আর ইছামতী নদী নাই; উহার প্রাচীন খাত বাওড়ের নদী নামে কথিত এবং তাহা মাসকাটার খাল নামে বাদুড়িয়ার সন্নিকটে ইছামতীর প্রবাহে মিশিয়াছে।

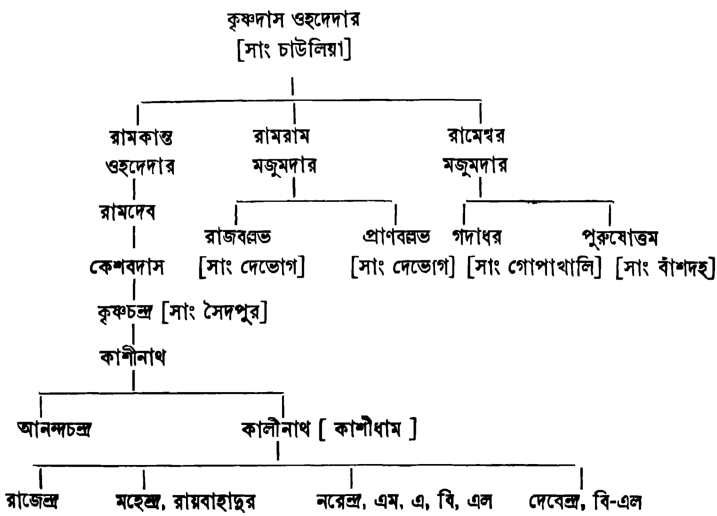
কচু রায়ের রাজত্বকালে চাঁদ রায় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কিছুদিন হালিসহরের সন্নিকটে যমুনাবক্ষে নৌকায় বাস করিতেছিলেন; তখন তিনি কৃষ্ণচন্দ্র দাস ওহদেদার নামক এক মৌলিক কায়স্থ সন্তানের পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। এইরূপ অপসম্বন্ধের কথা শুনিয়া কচু রায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। পরে রূপরাম বসুর বহু চেষ্টায় কচু রায়ের ক্রোধমোচন এবং বহু অর্থ ব্যয়ে ওহদেদার বংশের সমাজ সমন্বয় হয়। এই সমন্বয় ব্যাপারটা এই বংশের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। এই ওহদেদার কন্যার গর্ভজাত সন্তানেরাই বর্ত্তমান যশোহর রাজবংশীয়। গুজব রটিয়াছিল যে চাঁদ রায় ভ্রাতার অনুমতি না লইয়া ধীবরকুলে বিবাহ করিয়াছেন। ওহদেদারগণ ধীবব নহেন, তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ।[১] মুসলমান রাজত্বে রাজস্ব বিভাগে চাকরী করিয়া

---

১ 'বঙ্গীয় সমাজ', ২৯৭-৮ পৃ। ইদিলপুরের কারিকা হইতে দেখিতে পাই, এই বংশীয়েরা চাঁদশিয়ার দাস বলিয়া খ্যাত, কারণ এই বংশের এক উৰ্দ্ধতন পুরুষ, অরবিন্দ দাস, চাঁদশিয়ায় বাস করিতেন। অরবিন্দ হইতে কৃষ্ণদাস পর্য্যন্ত ধারা এইরূপ :

১ অরবিন্দ—২ শিবদাস—৩ শম্ভুদাস—৪ গজপতি—৫ সূর্য্যদাস—৬ ভবানন্দ—৭ জানকী নাথ—৮ কৃষ্ণদাস ওহদেদার। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার এই বংশের কৃতীপুরুষ। কৃষ্ণদাস হইতে তাঁহার বংশাবলী দিতেছি :

চাঁদ রায়ের শ্বশুর বংশ



উঁহাদের 'ওহদেদার' ও মজুমদার উপাধি এবং বেশ পয়সাকড়ি হইয়াছিল; তাঁহারা মৎস্যজীবীদিগকে টাকা দাদন দিতেন, এই জন্যই ঐরূপ নিন্দাবাদের সৃষ্টি। সমন্বয়ের পর কৃষ্ণদাস ওহদেদার, চাঁদ রায়ের রাজত্বকালে দাসকাটির পার্শ্ববর্ত্তী চাউলিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। তথা হইতে তদ্বংশীয়েরা ক্রমে সৈদপুর, দেভোগ, গোপাখালি, বাঁশদহ, টাকী, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

চাঁদ রায় অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।[১] তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া মোগল সরকারে রীতিমত রাজকর পাঠাইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাঁহার সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানা যায় না। এইমাত্র জানা যায়, যখন ধূমঘাট ও ঈশ্বরীপুর বাসের অযোগ্য ও বনাকীর্ণ হইয়া উঠে, তখন মোগল ফৌজদার সে স্থান ত্যাগ করেন এবং কিছুকাল জাহাজঘাটার অট্টালিকায় বাস করেন। চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজারাম অল্প বয়সে রাজা হইয়া পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করেন। কথিত আছে, এই সময়ে নদীয়া রাজবংশের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি স্থাপিত হয় এবং তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর গিয়া যৌতুক দান করিয়া আসেন। রাজারাম আঁধারমাণিকের নিকটবর্ত্তী রুদ্রপুরে বাস করিতেন। ইঁহার দুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দর।

কালীনাথ ওহদেদার বারাণসীর সরকারী হাসপাতালে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে রাজেন্দ্র ও মহেন্দ্র ডাক্তার এবং নরেন্দ্র ও দেবেন্দ্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল। রাজেন্দ্র ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ডাক্তারী পড়িয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথই বংশের মুখোজ্জ্বলকারী। মহেন্দ্রনাথ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অব্দে লাহোর মেডিকাল কলেজ হইতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া L. M. S. পরীক্ষা পাশ করেন। ইনি সর্ব্ববিধ অস্ত্রচিকিৎসায় এবং চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে শ্রীনগর, বারাণসী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান কম্পাবাসে চাকরী করিয়া যশস্বী হন এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৯৩ অব্দে 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। অল্পদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' ১২০-২৫ পৃ দ্রষ্টব্য।

১ ১৮৪৩ অব্দের ৬ই এপ্রিল নদীয়ার স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর জেমস্ গর্ডন ক্যাম্পবেল সাহেবের নিকট নদীয়ার ১৮২৩ নং তৌজিভুক্ত লাখিরাজের স্বত্ব সম্বন্ধে যে মোকদ্দমা চলিয়াছিল, উহার ফয়সালা হইতে জানিতে পারি যে, ঐ মোকদ্দমায় ১০১৫ সালে ১৬ই মাঘ তারিখে লিখিত চাঁদ রায়ের প্রদত্ত সনন্দের বেজাবেতা নকল দাখিল ছিল। তাহা হইলে ১৬০৯ অব্দের জানুয়ারীতে চাঁদ রায় রাজা ছিলেন, বুঝা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজারাম পরলোকগত হইলে[১] উভয় ভ্রাতায় রাজ্য লইয়া কলহ আরম্ভ করেন। তখন আত্মীয় স্বজন এবং কর্ম্মচারিগণও দুইদিকে পক্ষভুক্ত হন। অবশেষে এই মীমাংসা হয় যে, নীলকণ্ঠ জ্যেষ্ঠ বলিয়া জমিদারীর নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ শ্যামসুন্দর সাত আনা অংশ পাইবেন। রাজারামের সময়ে ধূলিয়াপুর, পার-ধূলিয়াপুর, বাজিতপুর ও সরফরাজপুর এই চারি পরগণার জমিদারী ছিল। বিরোধ মিটিবার পর শ্যামসুন্দর প্রধানতঃ দক্ষিণাংশের জমিদারী পাইয়া, সেই দিকে কোন স্থানে গিয়া বাস করিবার জন্য যাত্রা করেন। আসিবার কালে পথে খাঞ্জের উত্তরে শোলপুর গ্রামে তিনি এক বৎসরকাল তাঁবুতে বাস করেন এবং পরে ধূলিয়াপুরের অন্তর্গত রামজীবনপুরে আসিয়া বসতি নির্দ্দেশ করেন। এই গ্রাম নুরনগরের সন্নিকটে অবস্থিত। তখন মোগল ফৌজদার নুরউল্যা খাঁ ঐ স্থানে আসিয়া নিজ নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুকাল বাস করেন। সে কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বলিব।

কিছুদিন পরে যখন মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের নবাব হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে তেরটি চাকলায়[২] বিভক্ত করিয়া সেইগুলি পঁচিশটি জমিদারী ও তের জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন, তখন শ্যামসুন্দর জমিদারের তালিকাভুক্ত না হইলেও, তাঁহার ক্ষুদ্র জমিদারী রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নূতন প্রথানুসারে তিনি মন্‌সবদার নিযুক্ত হইয়া কিছু জায়গীর পান। সে সময়ের মন্‌সবদারগণ দেশের সীমান্ত-জমিদারগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন; তাঁহাদিগকে পাঁচ শত সেনা রাখিতে হইলেও নিজেরা হাজারী নামে খ্যাত ছিলেন।[৩] শ্যামসুন্দর দক্ষিণবঙ্গের মন্‌সবদার হইলেন, তাঁহার পুত্র নন্দকিশোরও ঐ পদ পাইয়াছিলেন। ফৌজদার নুরউল্যা খাঁর সময়ে রামভদ্র রায় তাঁহার দেওয়ান

১ রাজারাম ১০৯৪ সালে বা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে খোঁড়গাছির কৃষ্ণদেব বিশারদকে যে ভূমি দান করেন, তাহার সনন্দের প্রতিলিপি আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (৯২ পৃ)। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে সভাসিংহের বিদ্রোহ হয়, তখন নুরউল্যা খাঁ মীর্জানগর হইতে সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন। নুরউল্যা নুরনগর ত্যাগ করিয়া মীর্জানগরে আসিবার পূর্ব্বে শ্যামসুন্দর রামজীবনপুরে যান। সুতরাং আনুমানিক ১৬৯০ অব্দে রাজারামের মৃত্যু হয়।

২ 'Chakla was in existence in Akbar's time, but its development as an administrative unit was the work of Murshid Quli Khan.'—Ascoli, *Early Revenue History*, p. 25.

৩ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল', ৪৮৬, ৫০০ পৃ।

ছিলেন। ইনি এড়ুগুহবংশীয় সপ্তদশ পুরুষ, বাক্‌লার অন্তর্গত কাঁচাবালিয়ায় তাঁহার আদিম বাস। তথা হইতে আসিয়া তিনি প্রথমতঃ নুরনগরের পার্শ্ববর্ত্তী রুথুনপুরে (বর্ত্তমান নাম রতনপুর) গড়কাটা বাড়ীতে বাস করেন, পরে তথা হইতে বিথীরী গ্রামে উঠিয়া যান। উভয় স্থানের বাটী এখনও 'রায়ের গড়' নামে পরিচিত।[১] রামভদ্র রায় সুদক্ষ কর্ম্মচারী, অকর্ম্মণ্য ফৌজদার ত তাঁহার হাতের তলে ছিলেনই, মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত রাজ্য বন্দোবস্ত করা বিষয়ে রামভদ্র, নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দরের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন বলিয়া, রাজারা নিজ অধিকৃত পরগণাগুলি হইতে কতকগুলি মৌজা লইয়া আমীরাবাদ পরগণার সৃষ্টি করেন, এবং উহা রামভদ্রকে বৃত্তি দান করেন। রামভদ্রের বংশধরেরা এই সম্পত্তি এখনও ভোগ করিতেছেন।

কচু রায়ের সময়ে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রমাকান্ত চাকশিরির সন্নিকটে খানপুরে বাস করিতেন। বসন্ত রায়ের আমল হইতে এখানে একটি রাজবাটী

নয় আনীর বংশ-লতিকা

রাজা বসন্ত রায়
- রাঘব রায়
- চন্দ্রশেখর বা চাঁদ রায়
  - রাজারাম
    - (১) নীলকণ্ঠ
    - শ্যামসুন্দর, মন্‌সব্‌দার [রামজীবনপুর]
- নারায়ণ
  - রামচন্দ্র
    - পুরুষোত্তম
      - মকুন্দরাম
        - মণি
- রমাকান্ত

১ 'বঙ্গীয় সমাজ', ২২৯ পৃ।

(১) নীলকণ্ঠ
- মুকুন্দদেব [খোঁড়গাছি]
  - কৃষ্ণদেব
    - গোবিন্দদেব
      - নৃসিংহদেব [দত্তক]
        - বৈকুণ্ঠদেব [দত্তক]
          - রাজেন্দ্রনাথ [দত্তক]
            - গিরীন্দ্রনাথ
            - রবীন্দ্রনাথ
      - রঘুদেব [দত্তক]
        - শ্রীকণ্ঠ [দত্তক]
          - বরদাকণ্ঠ
            - যতীন্দ্রমোহন
            - শৈলেন্দ্রমোহন
- নবনীত
- ব্রজকিশোর
- (২) ব্রজমোহন [মাণিকপুর]

(২) ব্রজমোহন [মাণিকপুর]
- হরিদেব
  - আনন্দচন্দ্র
    - ঈশ্বরচন্দ্র
      - যজ্ঞেশ্বর
        - নলিনী
        - পুলিন
    - প্রসন্নচন্দ্র
      - দক্ষিণাপ্রসাদ
        - সুচারুচন্দ্র
    - গিরিশচন্দ্র
      - প্রভাত
      - ফণিভূষণ
- যুগলকিশোর
  - গৌরচন্দ্র
    - চন্দ্রকুমার
      - ললিতকুমার
        - অনন্ত
        - অশ্বিনী
        - শরৎ

সাত আনীর বংশ-লতিকা

- শ্যামসুন্দর
  - শ্রীকৃষ্ণ
  - কৃষ্ণকিঙ্কর
    - হরেকৃষ্ণ
      - বৈদ্যনাথ [রামনগর]
        - ক্ষিতিনাথ
          - নগেন্দ্রনাথ
            - নৃপেন্দ্র
            - রবীন্দ্র
    - প্রাণকৃষ্ণ [রামনগর]
      - দেবনাথ
        - সুরথনাথ
          - পূর্ণেন্দু [দত্তক]
      - কালীকুমার
        - যোগীন্দ্র
      - প্রতাপনাথ
        - নৃপেন্দ্র
      - প্রসন্ননাথ
        - মণীন্দ্রনাথ
        - ফণীন্দ্রনাথ
  - নন্দকিশোর [রামজীবনপুর]

কাটুনিয়া রাজবংশ

- শ্যামসুন্দর, মন্‌সব্‌দার [রামজীবনপুর]
  - নন্দকিশোর, মন্‌সব্‌দার
    - রাধানাথ
      - রামনারায়ণ
        - জগদীশনারায়ণ [কাটুনিয়া]
          - সিতাংশুভূষণ
            - হিমাংশুভূষণ [দত্তক]
        - জয়নারায়ণ [কাটুনিয়া]
          - অন্নদাতনয়
            - যতীন্দ্রমোহন
            - মতীন্দ্রমোহন [২৬৮ পৃ]
            - শৈলেন্দ্র
            - গুণেন্দ্র
            - জ্ঞানেন্দ্র
        - ব্রজেন্দ্রনারায়ণ [কাটুনিয়া]
          - রমেশচন্দ্র

রাজ্যাংশবঞ্চিত রমাকান্তের ধারা

- রাজা বসন্ত রায়
  - রমাকান্ত [ফতুল্যাপুর]
    - গোপীনাথ
      - রামশঙ্কর
        - কীর্ত্তিচন্দ্র
          - বৈদ্যনাথ
            - রামগোপাল
              - শ্রীনাথ
                - নবকৃষ্ণ
                - যাদবকৃষ্ণ [প্রফেসর, জয়পুর]
        - গৌরাঙ্গচন্দ্র
          - শিবনাথ
            - প্রতাপ
              - জগদীশ
              - অখিল
              - নৃসিংহ
            - বিপিন
              - নন্দ
            - প্রিয়
              - মনোমোহন
              - রমণীমোহন
          - রামকুমার
            - বৈকুণ্ঠ
              - অশ্বিনী
          - হরচন্দ্র
            - কিশোরী-মোহন
              - কৃষ্ণকিঙ্কর
                - কালিদাস
                - হরিদাস
                - গৌরদাস
            - রাইমোহন
              - কেদার
              - সতীনাথ

ছিল। এখনও দক্ষিণ খানপুরে একটি স্থানকে 'হাতীর বেড়' বলে, এবং উহার পশ্চিমপাড়ায় এক প্রকাণ্ড পুরাতন দীঘির নাম 'রাজবাড়ীর দীঘি'। দীঘির পূর্ব্বপার্শ্বে অট্টালিকার নিদর্শন না থাকিলেও যেখানে সেখানে ইষ্টকাদি পাওয়া যায়, এবং উহা বসন্ত রায়ের বংশীয় ছত্রধারী রাজাদের আদিম নিবাস বলিয়া কথিত হয়। প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র মুকুটমণিও পলায়ন করিয়া এইখানে আসিয়াছিলেন, পরে মগের উৎপাতে উৎকূল গ্রামে উঠিয়া যান। এই খানপুরের

নিকটে কত সময়ে কত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এখনও ঘোষের হাটের উত্তরে 'রণভূম' গ্রাম, পার-মধুদিয়ার পশ্চিমে 'রণজিৎপুর' স্থান এবং পীলজঙ্গের সন্নিকটে 'রণের মাঠ' নামক প্রান্তর প্রাচীন রণ-কাহিনীই স্মরণ করাইয়া দেয়। রমাকান্ত এই খানপুরের বাটী হইতে সপরিবারে যশোহর যান, কিন্তু চাঁদ রায় ভ্রাতাকে রাজ্যাংশ দিলেন না; অধিকন্তু যশোহরের সন্নিকটে, এমন কি, আঁধারমাণিকে গুরুবংশের আশ্রয়েও বাস করিতে দেন নাই। তখন বর্ত্তমান সাতক্ষীরার অন্তর্গত ফতুল্যাপুরের জমিদার বাঁশদহনিবাসী নন্দকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহাকে আশ্রয় দেন। নন্দকিশোর বিন্ গুহবংশীয় ১৮শ পুরুষ এবং বাক্‌সা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ে পুঁড়া-খোঁড়গাছি, বাঁশদহ, শিবহাটি প্রভৃতি গ্রামগুলি ইছামতীর একটি শাখার উপর অবস্থিত সুন্দর স্থান ছিল।

নুরউল্যা খাঁর নুরনগর ত্যাগ করিবার পর নীলকণ্ঠের পুত্র মুকুন্দদেব সেই অঞ্চলে কোথাও গিয়া বাস করিবার জন্য উদ্যোগী হন। তখন পুঁড়া, খোঁড়গাছি প্রভৃতি স্থানের বঙ্গজ কায়স্থগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া খোঁড়-গাছিতে বসতি করান। তদবধি নয় আনা অংশের রাজধানী খোঁড়গাছিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেওয়ান রামভদ্র রায়ের পুত্র রুদ্রদেব নানাস্থানে বাস পরিবর্ত্তন করিয়া অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পুঁড়ায় আসিয়া বাস করেন। মুকুন্দদেব ও রমাকান্তের বাস-গৌরবে উৎসাহিত হইয়া রুদ্রদেব পুঁড়া-খোঁড়গাছি অঞ্চলে বঙ্গজ কায়স্থের এক প্রধান সমাজ স্থাপন করেন, তাহার সমাজপতি বা গোষ্ঠিপতি হইলেন মুকুন্দদেব এবং নায়েব গোষ্ঠিপতি হইলেন রুদ্রদেব রায়। ইহাতে আর এক গোলমাল বাধিল। এতদিন টাকীর বড় চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণই নায়েব গোষ্ঠিপতি ছিলেন; রুদ্রদেবের অভ্যুদয়ে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সাত আনী তরফের শ্যামসুন্দরের বংশধরগণকে গোষ্ঠিপতি নির্ব্বাচিত করিয়া নিজেরা নায়েব গোষ্ঠিপতি হইলেন। এইরূপে যশোর-রাজ্যের মত যশোহর-সমাজও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। উত্তরকালে বহরমপুরের সেনবংশীয় দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত টাকীর বড় চৌধুরীবংশীয় স্বনামখ্যাত রামকান্ত মুন্সীর সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া বহু অর্থব্যয়ে নায়েব গোষ্ঠিপতি হন, তখন রামকান্তী ও কৃষ্ণকান্তী দুই দলের সৃষ্টি হওয়ায় যশোহর সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার রামদাস সেন এই কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতু-

প্পৌত্র। পুঁড়ার রামভদ্র রায়ের বংশধর নিখিলনাথ রায় ডাক্তার রামদাসের জামাতা। নিখিলনাথ প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনে বহু চেষ্টা ও গবেষণা করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

রাজা নীলকণ্ঠের চারি পুত্র, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র ব্রজমোহন নয় আনী বিষয়ের পনর পাই ভাগী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত খোঁড়গাছি না গিয়া নুরনগরের অন্তর্গত মাণিকপুরে বাস করেন। তদ্বংশীয়গণ এখনও সেখানে বাস করিতেছেন। রাজা মুকুন্দদেবের ধারায় তাঁহার প্রপৌত্র নৃসিংহদেব হইতে রাজেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তিন পুরুষ দত্তক পুত্র ছিলেন। অতি অল্প দিন হইল প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়সে রাজা রাজেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি সজ্জন, ভক্তিমান ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তৎপুত্র রাজা গিরীন্দ্রনাথ এক্ষণে সব্ রেজেষ্টারী চাকরী করিতেছেন। তিনি বংশগৌরব রক্ষার জন্য একান্ত অনুরাগী; তাঁহার রাজোচিত সদাশয়তা ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হন।

সাত আনীর অংশে শ্যামসুন্দর হইতে তাঁহার প্রপৌত্র রামনারায়ণ পর্য্যন্ত সকলে রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। রামনারায়ণের সময় পার্শ্ববর্ত্তী কাটুনিয়া গ্রামে বাটী পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়, এবং তাঁহার পুত্রগণই তথায় বাস করেন। মধ্যম পুত্র জয়নারায়ণের পৌত্র রাজা যতীন্দ্রমোহনের কথা বিশেষ-ভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৬৮ পৃ)। যতীন্দ্রমোহনের মধ্যম ভ্রাতা মতীন্দ্র রামনগরে বাস করিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজা রমেশচন্দ্রের কথা আমরা বেদকাশীর শিলা-লিপি সম্পর্কে পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৭১ পৃ)। এখন শুধু নয় আনী বা সাত আনী উভয় তরফের অংশীবর্গের রাজা নামই আছে; সে বিষয় সম্পদ বা প্রবল প্রতিপত্তি কিছুই নাই, ছিন্নভিন্ন শতবিভক্ত সরিকী সম্পত্তির ভাগ যাহা কিছু যাহার ভাগ্যে পড়িয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। তবু তাঁহারা রাজা,—বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নৃপতির অশেষ কীর্ত্তিকাহিনীর স্মৃতি লইয়া গৌরবান্বিত। ভাগ্য চিরদিন সমান থাকে না; কিন্তু ভাগ্যবানের বংশধর হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়।

মাতা যশোরেশ্বরীই যশোহর-রাজবংশের ভাগ্যদেবতা। এই পীঠমূর্ত্তি যতদিন জাগ্রত থাকিবেন, ততদিত শত ভাগ্য-বিপর্য্যয়েও এই বংশের বিনাশ নাই। এই পীঠদেবতা কতবার জাগিয়া বিলুপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু একেবারে

অন্তর্হিত হন নাই। কতবার কত রাজাকে জাগাইবার জন্য ইনি জাগিয়াছেন, আবার সে সব রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূপ্রোথিত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন। সুন্দরবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে মাতার আবির্ভাব-তিরোভাব সম্পন্ন হইয়াছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

যেমন প্রতাপাদিত্যের পতন হইল, অমনি এক আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিল ; পীঠস্থান ধুমঘাট ক্রমে ক্রমে জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িল। শুধু মোগল ফৌজদার বা রাজবংশধরগণ নহেন, সাধারণ বাসিন্দারাও ঈশ্বরীপুর ছাড়িয়া নানাস্থানে পলাইয়া গেল। প্রতাপাদিত্যের সময়ের সেবাইত অধিকারিগণ আর ঈশ্বরীর পূজা করিতে পারিলেন না ; প্রথমতঃ যমুনার পরপারে মামুদপুরে থাকিয়া পূজা করিয়া যাইতেন, শেষে সেখান হইতে গোপালপুর ও পরে পরমানন্দকাটিতে গিয়া বাস করিলেন এবং তথা হইতে নিত্য অশ্বপৃষ্ঠে একবার আসিয়া মায়ের চরণে পুষ্প দিয়া যাইতেন। অবশেষে তাহাও সম্ভবপর রহিল না, গ্রাসাচ্ছাদনের অসংস্থান হইল, দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মায়ের নিত্যপূজা কত বৎসরের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ঈশ্বরীপুরে ডাকাইতের আড্ডা হইল, মাতা ডাকাইতের পূজা লইতেন। সময়ে সময়ে দুঃসাহসিক ভক্তগণ দূরস্থান হইতে আসিয়া মায়ের পূজা দিয়া যাইতেন। এখনও মায়ের বাড়ীর সন্নিকটে সর্দ্দার উপাধিধারী কয়েকঘর মুসলমান কতকগুলি নিষ্কর জমির অধিকারী হইয়া বাস করিতেছেন। লোকে বলে, উঁহারাই সেই আমলের বাসিন্দা এবং উঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দস্যু-বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। বেশীদিন আর তাঁহাদের সে ব্যবসায় ভাল লাগিল না। তাঁহারাই নির্জ্জন-প্রবাস ত্যাগ করিবার জন্য অন্য লোক আনিয়া বসাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রবাদ এই, এমন সময় বর্ত্তমান অধিকারীদিগের এক পূর্ব্বপুরুষ, জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ধান্য সংগ্রহের জন্য দৈবাৎ এ অঞ্চলে আসেন, সর্দ্দারগণ প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাকে এখানে বসাইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ঘটনা হয়।

এদিকে দেশেরও অবস্থা একটু ফিরিতে লাগিল। এই সময়ে শ্যামসুন্দরের পুত্র নন্দকিশোর নুরনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। জয়কৃষ্ণও খুব কর্ম্মদক্ষ, বুদ্ধিমান ও কৌশলী লোক ; কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা ক্রমান্বয়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বিঘা জমির উপর দখল বিস্তার

করিয়া প্রবল প্রতাপে বাস করেন। তাঁহাদের বাটীর ত্রিমহল অট্টালিকা, সিংহদ্বার ও পুষ্করিণী এখনও বর্তমান। জয়কৃষ্ণের প্রপৌত্র বিষ্ণুরাম বা তৎপুত্র বলরামের সময়ে ইংরাজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এই সময়ে অধিকারী মহাশয়দিগের নিষ্কর তালুকের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে: উক্ত বন্দোবস্তের আমলে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী এখানে তদন্তে আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, দখলী দেবোত্তরের পরিমাণ স্পষ্ট করিয়া পঞ্চান্ন হাজার বিঘা না বলিয়া একটু কেমন অবজ্ঞাচ্ছলে হাজার পঞ্চান্ন বিঘা বলা হয়। সাহেব নাকি তজ্জন্য মাত্র এক হাজার পঞ্চান্ন বিঘা জমি দেবোত্তর সাব্যস্ত করিয়া বাকী জমি বাজেয়াপ্ত করিবার রিপোর্ট দেন। মোট কথা, তদন্তের সময় দলিলের অভাবে সম্পত্তির পরিমাণ কম করিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। এই বলরামই ৺মায়ের মন্দির এক প্রকার নূতন করিয়া গঠন করেন এবং পরে নাট-মন্দির নির্ম্মিত হয়। নাট-মন্দিরের গাত্রে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যে স্মারক-লিপি আছে, তাহা এই:

‘ধরাগ্ন্যদ্রিধরামানে শাকে শ্রীকালিকাপুরীং।
নির্ম্মায় চৈতলী চট্টবংশপৌরন্দরো মহান্॥
বলরামো ক্ষিতিসুরঃ সমর্প্যাকিঞ্চনে ময়ি।
বিভবঞ্চাপি তৎসেবামানন্দভুবনং যযৌ॥
তদগ্রজসুতঃ শ্রীমান্ কালীকিঙ্করঃ ভূসুরঃ।
লিলেখৈতদরিরসসিন্ধুচন্দ্রমিতে শকে।’

[ধরা=১, অগ্নি=৩, অদ্রি=৭, অরি=৬, রস=৬, সিন্ধু=৭, চন্দ্র=১] অর্থাৎ ১৭৩১ শাকে (১৮০৯ খৃঃ অঃ) চৈতলী চট্টবংশীয় পুরন্দরের সন্তান বলরাম বিপ্র এই কালিকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া মায়ের সেবা ও সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র কালীকিঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গগত হন। কালীকিঙ্কর ১৭৬৬ শাকে (১৮৪৪ খৃঃ) এই লিপি সংযুক্ত করেন।

বাঙ্গালা লিপিতে ইহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, উহার অবিকল প্রতিলিপি এই:

‘বঙ্গাব্দ বারো শ শোল শাল পরিমাণ,
শ্রীমহাকালিকাপুরী করি সুনির্ম্মাণ,

চৈতলীয় চট্টবংশ পুরন্দর সন্তান,
ক্ষিতিসুর বলরাম মহামতিমান,
যে কিছু বিষয় সেবা অধমে অর্পিএ
আনন্দে আনন্দধামে আছেন বসিএ।
তাহার জ্যেষ্ঠের সুত শ্রীকালীকিঙ্কর ;
বার শ একান্ন শালে লিপি ততঃপর॥'

বর্ত্তমান অধিকারিগণ কাশ্যপগোত্রীয় চট্টবংশীয়। দক্ষ হইতে জয়কৃষ্ণ পর্য্যন্ত বংশসূত্র এইরূপ : দক্ষ—সুলোচন—মহাদেব—হলধর—নারিদেব—লালো—গরুড়—শ্রীকণ্ঠ—বাঙ্গাল (আদি কুলীন)—কীত বা কীর্ত্তিচন্দ্র—নৃসিংহ—আভো—তপন—চৈতলী (ইনি বংশের মূল)—রঘু—পুরন্দর (বল্লভী মেল ভুক্ত)। এই জন্য জয়কৃষ্ণ চৈতলীর ধারায় পুরন্দরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ১ পুরন্দর—২ জগন্নাথ—৩ জানকী—৪ নীলকণ্ঠ—৫ নারায়ণ—৬ রামজীবন ; ইহার দশ পুত্র, তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনিই প্রথম চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত দোগাছি-পাটভাঙ্গা হইতে ঈশ্বরীপুরে বাস করেন।

এক্ষণে বংশ-তালিকার ১৪ পর্য্যায়ের প্রায় সকলেই জীবিত আছেন। তন্মধ্যে মথুরানাথ সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে প্রবীণ এবং শ্রীশচন্দ্র দেশে বিদেশে সুপরিচিত। আজকাল শ্রীশচন্দ্র অধিকারী ঈশ্বরীপুরের প্রাণ। তিনি সরল ও অমায়িক, সুবক্তা ও ভক্তিমান, দয়ার্দ্রচিত্ত এবং অক্লান্তশ্রমী। এমন অতিথি-বৎসল এবং সেবাপরায়ণ লোক বড় বিরল। একবার ঈশ্বরীপুরের সীমান্তবর্ত্তী হইলে বা তাঁহার দৃষ্টির গণ্ডীতে পড়িলে, সরকারী উচ্চকর্ম্মচারী বা সাধারণ তীর্থযাত্রী, স্বদেশী বা বিদেশী, হিন্দু বা মুসলমান, যিনিই হউন না, কেহই তাঁহার আতিথেয়তার হাত এড়াইতে পারেন না, একদিন অতিথি হইলে বহুদিনেও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। কিসে ঈশ্বরীপুরকে বড় করিবেন, প্রতাপের কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিয়া মাতা যশোরেশ্বরীর পীঠস্থানের গৌরব-বর্দ্ধন করিবেন—ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বোধ হয়। সে উদ্দেশ্যে তিনি অসাধ্য সাধন করিতেও প্রস্তুত ; চরিত্রগুণে এবং সকল চেষ্টায় ঐকান্তিকতার পরিচয় দিয়া তিনি সকলকে মোহিত করিয়া রাখেন। গত দুই বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যে প্রাণপাত করিয়া বুভুক্ষু ও আতুরের সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম সে অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। তাঁহারই

কাশ্যপগোত্র চট্ট-বংশ

- ৭ জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় [বাস, ঈশ্বরীপুর]
  - ৮ কমলাকান্ত
    - ৯ রামগোবিন্দ
      - ১০ বিষ্ণুরাম
        - ১১ দেবীপ্রসাদ
          - ১২ কালীকিঙ্কর
            - ১৩ কৃষ্ণ
            - হরি
            - বামাচরণ
              - ১৪ অনুকূল
                - ১৫ অনঙ্গমোহন
              - আশুতোষ
        - ১১ বলরাম
          - ১২ রামকুমার
            - ১৩ ঈশান
          - বিশ্বনাথ
            - ১৩ দ্বিজবর
              - ১৪ মথুরানাথ [বা যোগীন্দ্র]
            - কৃপানাথ
              - যতীন্দ্র
                - গিরীন্দ্র
                - হরেন্দ্র
              - সুরেন্দ্র
                - অবিনাশ
                - কাশীনাথ
          - ভৈরবচন্দ্র
            - জ্ঞানচন্দ্র
              - ১৪ শ্রীশচন্দ্র
                - কালিকানন্দ
                - বিমলানন্দ
                - প্রভৃতি

চেষ্টায় ঈশ্বরীপুরে পোষ্টাফিস হইয়াছে, দাতব্য ডিস্পেন্সারী বসিয়াছে, রাস্তাঘাট ভাল হইয়াছে, মায়ের মন্দিরসংলগ্ন গৃহাদির সংস্কার হইয়াছে, উহার দোতালার একটি ঘরকে তিনি আমাদের উপদেশে ছোটখাট যাদুঘরে পরিণত করিয়া তথায় প্রতাপের কীর্ত্তিচিহ্নসমূহ কুড়াইয়া রাখিয়া আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন; আর যমুনার ক্ষীণ স্রোতের বাঁধ কাটিয়া ঈশ্বরীপুরের যাতায়াতের পথ খোলসা করিতে গিয়া কত স্বার্থপরায়ণ বন্ধুবও চক্ষুঃশূল হইতেছেন। আবার কি যমুনা কূল ছাপাইয়া জলভারে ভাসিবে? আর শত সহস্র দূরাগত তীর্থযাত্রী আনিয়া মায়ের মন্দিরে কোলাহল তুলিবে? সে দিন কি আর আসিবে?

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যশোহরের ফৌজদারগণ

প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ যশোর-রাজ্য শাসনের জন্য বাদশাহী ফৌজসহ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন ; আকবরের সময় হইতে এইরূপ প্রত্যন্ত রাজ্যে কতকগুলি পরগণা একত্রযোগে একজন বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও স্বার্থশূন্য সেনাপতির শাসনাধীন করিয়া রাখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।[১] ইহাকে ফৌজদার বলিত। ইনায়েৎ খাঁ যশোহরের প্রথম ফৌজদার। এই সময়ে চাঁদ রায় পৈতৃক রাজ্যাংশের অধিকারী ছিলেন ; ইনায়েৎ খাঁ তাঁহাকে ধূমঘাটে আসিয়া বাস করিবার সম্মতি দেন। শেষ যুদ্ধে প্রতাপের দুর্গ ও রাজবাটীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়, চাঁদ রায় আসিয়া সেই ভগ্ন দুর্গসংলগ্ন বাটীতে বাস করেন। ইনায়েৎ খাঁ স্বয়ং টেঙ্গা মসজিদের নিকটবর্ত্তী 'হামামখানা' নামক গৃহে বাস করিতেন। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি (১৬২-৩ পৃ)। তখন উহা দোতালা সুন্দর গৃহ, উহার পোতা মাটী হইতে অনেক উচ্চ ছিল, এখন বাড়ীটি বসিয়া গিয়াছে। ঐ গৃহের নিম্নতলে হামামখানা বা স্নানাগার ও তোষাখানা প্রভৃতি ছিল এবং উপর তালায় বাস করা যাইত। ইনায়েৎ কতদিন যশোহরে ছিলেন, জানা যায় না। তবে ১৬১৮ অব্দে যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা আমরা জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী হইতে জানিতে পারি। যশোহরে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, এবং তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন ও মদ্যসেবনে কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া একেবারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অবস্থায় আগ্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২] সম্ভবতঃ যশোহরে যে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, তাহার ফলে তিনি ও চাঁদ রায় উভয়ে ধূমঘাট পরিত্যাগ করেন।[৩] এখনও বর্ত্তমান কালীগঞ্জের পূর্ব্ব-

১ *Ain-i-Akbari* (Jarrett), Vol. II, p. 40.

২ "He appeared so low and weak that I was astonished. 'He was skin drawn over bones' or rather his bones, too, had dissolved." বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাহার শরীরের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া চমকিত হন।—*Tuzuk* (Rogers), Vol. II, pp. 43-4.

৩ মেজর Smyth এই বিপর্য্যয়কে মহামারী বলিয়াছেন। 'A pestilence shortly afterwards broke out, in which thousands perished ; the place became

দক্ষিণ দিকে গড়ের ধারে ইনায়েৎপুর নামক একটি গ্রাম তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে।

ইনায়েতের অব্যবহিত পরে কে ফৌজদার হইয়া আসেন, তাহা জানা যায় না। তবে কিছুদিন পরে যিনি আসেন, তাঁহার নাম সরফরাজ খাঁ। ইনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা আজিম খাঁ বা খাঁ আজমের (১৫৮২-৮৪) চতুর্থ পুত্র। ইঁহার পূর্ব্ব নাম মীর্জা আবদুল্যা।[১] জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তা হন এবং সেই কার্য্যে যশস্বী হইয়া ১৬১৭ অব্দে বাদশাহের নিকট তিন হাজারী মন্সব ও সরফরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন।[২] পরবৎসরও তিনি খেলাত ও সম্মান-ভারাক্রান্ত হইয়া গুজরাটে পুনঃ প্রেরিত হন। ১৬২২ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গে আসেন। সম্ভবতঃ তৎপরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে যশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান হয়। এ সময়ে চাঁদ রায় আঁধারমাণিকে থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন।

সরফরাজ খাঁ বড় অর্থপিপাসু ছিলেন, তিনি প্রজার সুখ-শান্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিরূপে তাহাদের অর্থশোষণ করিতে পারেন, তাহারই জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি গৌড়ের যশঃ হরণকারী যশোহরের ধনসমৃদ্ধির গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলেন, যশোহরের ফৌজদারী চাকরীতে বেশ অর্থাগম হয় বলিয়াই আগ্রা, দিল্লীর আমীরেরা শরীরের দিকে না চাহিয়া সুন্দরবনে আসিতে চাহিতেন। সরফরাজ শাসনকার্য্য যত করিতে পারুন বা না পারুন, সকল কার্য্যে অগ্রণী হইয়া বাক্য-কৌশলে উপরওয়ালাকে বশীভূত রাখিয়া অর্থসংগ্রহের

---

depopulated and is now the abode of tigers and wild animals.'—Smyth, Ralph, *Report of the 24-Pergunnahs* (1857) : Hunter, *Statistical Accounts*, Vol. I, p 118.

১ *Ain.* (Blochmann), pp. 328, 492. খাঁ আজমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জা সাম্‌সি যখন বঙ্গের সুবাদার হন (১৬০৭-০৮), তখন তাঁহার উপাধি ছিল জাহাঙ্গীরকুলি খাঁ।

২ ইনি বঙ্গাধিপ নবাব সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪১) নহেন। তিনি নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র।—*See, Tuzuk.*, Vol. I, p. 149. এই নামের নানাবিধ বানান দেখিতে পাই। তুজুকে Sar-faraz, India office-এর হস্তলিখিত পুঁথিতে Saraf-raz আছে। হাণ্টার সাহেব উহা হইতে Sarfraz করিয়াছেন।—*Statistical Accounts*, Vol. I, p. 243. বাঙ্গালাতে ইংরাজী Saraf-raz হইতে সর্পরাজপুর পর্য্যন্ত হইয়াছে।—*Tuzuk.*, Vol. I, p. 413. সর (মাথা) ও আফ্‌রাজ (উন্নত করা) এই দুইটি শব্দ হইতে সরফরাজ কথা হইয়াছে।

পথ দেখিতেন। শূন্যগর্ভ প্রগল্‌ভতাকে এখনও লোকে 'সরফরাজী' করা বলিয়া থাকে। যশোহরের ধনদৌলতের কথা তিনি একাকী শুনেন নাই, বহুদিন হইতে মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি দস্যুরা সেই লোভে এই দেশের উপর পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কতশত খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নিরস্ত রাখিয়াছিলেন। এখন প্রতাপ নাই, চাঁদ রায় স্থানান্তরিত এবং তাহার দস্যুদমনের ক্ষমতাও ছিল না। অথচ ঘটনাক্রমে সেই সব দস্যুরা আবার নূতন করিয়া মাথা উঁচু করিয়া যশোহরে আনাগোনা করিতেছিল। সরফরাজের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন! অথচ তাহাদিগকে থামাইতে না পারিলে নিজের ভাগও কম পড়ে, হয়ত যশোহরে তিষ্ঠিবার ভাগ্যও উঠিয়া যায়। এজন্য, কথিত আছে, তিনি অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া দূরবর্ত্তী রাখিতেন। সে অর্থ তাঁহাকে ঘর হইতে আনিয়া দিতে হইত না।

মগ, ফিরিঙ্গির অত্যাচার-কাহিনী আমরা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু প্রতাপের পতনের পর তাঁহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছিল, কেন তাঁহারা এই সময়ে দস্যুবৃত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিল, সংক্ষেপে সে কথা না বলিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে না। সিবাষ্টিয়াও গঞ্জেলিস টিবো (Sebastiao Gonsalves Tibau) নামক একজন অজ্ঞাতকুলশীল পর্টুগীজ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গে আসিয়া লবণের ব্যবসায়ে কিছু অর্থোপায় করে এবং দুই বৎসর পরে ডিয়াঙ্গায় ফিরিঙ্গি-হত্যার কালে আরও কয়েকজনের সঙ্গে পলায়ন করিয়া বাক্‌লায় রামচন্দ্রের রাজ্যে আশ্রয় লয় এবং দস্যুতা দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিতে থাকে। কার্ভালো যখন যশোহরে আসেন, তখন মাটোস্ সন্দীপে ছিলেন। অচিরে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী গোমেশের (Pedro Gomes) হস্ত হইতে ফতে খাঁ নামক একজন মুসলমান কর্ম্মচারী সন্দীপ দখল করেন এবং পরে পর্টুগীজদিগকে সমূলে উৎখাত করিবার আশায় দক্ষিণ শাহবাজপুরের সন্নিকটে গঞ্জেলিস্ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ফতে খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। গঞ্জেলিস্ তখন রামচন্দ্রকে সন্দীপের রাজস্বের অর্দ্ধেক দিবার অঙ্গীকারে তাঁহার সাহায্যে দ্বীপটি অধিকার করিয়া লয়। ধর্ম্ম বা সত্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।[১] অকৃতজ্ঞ গঞ্জেলিস্ অচিরে

১ স্বজাতীয় লেখক গঞ্জেলিস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,'to whom treachery and insolence were ordinary affairs.'—Campos, *Portuguese in Bengal*, p. 87. *See also*, p. 156.

রামচন্দ্রের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার অধিকারস্থ শাহবাজপুর ও পাত্‌লেভাঙ্গা নামক দুইটি স্থান অধিকার করে। এই সময়ে আরাকাণরাজের ভ্রাতা অনুপরাম ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ সন্দ্বীপে গঞ্জেলিসের শরণাপন্ন হন। কিন্তু পাষণ্ড তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করে এবং তাঁহার ভগিনীকে খৃষ্টান করিয়া বিবাহ করে। পরে তাঁহার বিধবার সহিত নিজ ভ্রাতা এণ্টনির বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলে, আরাকাণরাজ কোন প্রকারে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ভ্রাতৃবধূর উদ্ধার সাধন করেন (১৬১০)। এই সময়ে ইসলাম খাঁ ভুলুয়া সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য উদ্যোগী হন। এজন্য আত্মরক্ষার নিমিত্তও উক্ত সন্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল। মোগল সৈন্য ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলে, মানরাজ গঞ্জেলিসের নিকট নব্বই হাজার সৈন্য ও দুই শত জাহাজ প্রেরণ করেন। ধূর্ত্ত গঞ্জেলিস ঐ সকল জাহাজের কাপ্তেনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গুপ্ত হত্যা করিল এবং পরে মোগলপক্ষে যোগ দিয়া আরাকাণরাজকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। ১৬১২ অব্দে মানরাজের ও পর বৎসর ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তখন গঞ্জেলিস আরাকাণের উপকূলে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করে এবং প্রতি বৎসর এক জাহাজ চাউল দিবার অঙ্গীকারে গোয়ার শাসনকর্ত্তার সাহায্য লইয়া আরাকাণ জয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আরাকাণ তখনও প্রবল এবং রাজা শীঘ্রই সসৈন্যে আসিয়া সন্দ্বীপ জয় করিয়া গঞ্জেলিসকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং সেই সময়ে সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লন (১৬১৬), সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জেলিসের রাজত্ব ছায়ার মত অপসৃত হয়।[১]

১ Campos, *Portuguese in Bengal*, pp. 81-87; Noakhali Gazetteer, pp. 17-20 গঞ্জেলিসের পর দিলাওয়ার নামক মোগল-নওয়ারার জনৈক নেতা ঢাকা হইতে সপরিবারে পলাইয়া সন্দ্বীপে গিয়া বাস করেন এবং জঙ্গল কাটিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দস্যুবৃত্তিবলে তথাকার রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগ বা ফিরিঙ্গি কোন জাতিই বারংবার চেষ্টা করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। এইভাবে দিলাওয়ার বহু বৎসর যাবৎ এক প্রকার স্বাধীনভাবে পরম সুখে রাজত্ব করেন; এমন কি শাহসুজার শাসনকালে (১৬৩৯) তিনি পুত্র দ্বারা উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। অবশেষে (১৬৬৫-৬৬ অব্দে) সায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে তৎপ্রেরিত আবুল হাসানের আক্রমণে পরাজিত ও বন্দী হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধ দিলাওয়ার ঢাকায় নীত হইয়া কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দীন তালীশের গ্রন্থে ইঁহার বিশেষ বিবরণ আছে। 'নবনূর'

এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখিব। গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপাদিত্যের বিশেষ সম্পর্ক বা সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ১৬০৭ হইতে ১৬১৬ পর্য্যন্ত ৯ বৎসর কাল গঞ্জেলিসের প্রতিপত্তির কাল, তখন গঞ্জেলিস সন্দ্বীপের অধিপতি। ১৬০৮ হইতে প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধের গুপ্ত আয়োজনে ব্যস্ত। তখনও জামাতা রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সেই রামচন্দ্র গঞ্জেলিসের বন্ধু; সুতরাং গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপের সন্ধি হওয়া অসম্ভব। আবার সে যখন রামচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইল, তখন তাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।[১] পাদরীগণের যশোহর ত্যাগের পর তিনি আর কোন পর্টুগীজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে চান নাই।

১৬১৬ অব্দে গঞ্জেলিসের পতন হইল বটে, কিন্তু তাহার দলভুক্ত দস্যুদল রহিল। সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া তাহারা দক্ষিণবঙ্গের নদীবক্ষে ঘরবাড়ী করিয়া লইল। কোন প্রকার শাসন মানিয়া চলা তাহাদের অভ্যস্ত ছিল না, তাহারা অবাধে দস্যুতা করিয়া জীবন চালাইতে লাগিল। প্রয়োজন বড় জিনিস; প্রয়োজন বশতঃ দস্যুতাই তাহাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং জীবনের সাধনা হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে তাহারা অবিরত যশোহর অঞ্চলে আসিত। সেই সময়ে সরফরাজ খাঁ 'নবাব' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সে দেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি কতদিন তাহাদের সহিত অর্থ বিনিময়ে সম্প্রীতি রাখিয়া দেশ শাসন করিলেন; পরে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরদিকে ইছামতীর কূলবর্ত্তী পুঁড়া পরগণায় আসিয়া

(মাঘ, ১৩১২) পত্রে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের 'একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সন্দ্বীপে এখনও সেই আমলের একটি সুন্দর মস্‌জিদ্ আছে, উহাকে 'ফুলবিবি সাহেবানীর মস্‌জিদ্' বলে। মোগল স্থাপত্যানুযায়ী এই প্রাচীন মসজিদ্‌টি আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহাতে তিনটি গম্বুজ আছে। বাহিরের মাপ ৪৩´×২৬´, ভিত্তি ৫´-৬´´। চারি কোণে চারিটি মিনার আছে।

১ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থে আকবরের সময়ে গঞ্জেলিস ও অনুপরাম যশোহরে আসিয়া প্রতাপের পক্ষভুক্ত হইয়া রায়গড় দুর্গ দখল করিতে যাইতেছেন, এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত বর্ণনা আছে। (ঐ পুস্তকের ৮৭-৯ পৃ)। এ সব বর্ণনার সহিত ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য নাই। গঞ্জেলিসের দস্যুতা ১৬১৬ অব্দের পরে ঘটিয়াছিল। তখন প্রতাপাদিত্য জীবিত ছিলেন না।

বাস করিলেন।[১] এখনও পুঁড়ার নিকটে সরফরাজপুর নামে একটি গ্রাম আছে। হয়ত সেইখানেই তাঁহার অস্থায়ী কাছারী স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রদেশে বাস করিবার সময়ে তিনি পুঁড়া নামক পরগণার অস্তিত্ব লোপ করিলেন এবং কয়েকটি পরগণা হইতে কতকগুলি করিয়া মৌজা লইয়া নিজ নামে সরফরাজপুর নামক নূতন পরগণার সৃষ্টি করিলেন।[২] এই পরগণা চাঁদ রায়ের পুত্র রাজারাম ও তাঁহার বংশধরগণের হস্তগত ছিল।

সরফরাজের পর যিনি যশোহরের ফৌজদার হইয়া আসেন, তাঁহার নাম মীর্জা সাফ্‌সিকান। ইনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পারস্য রাজবংশে ইহার জন্ম। পারস্যাধিপতি শাহ্ তমাস্পের ভ্রাতুষ্পুত্র—সুলতান হোসেন মীর্জা। তৎপুত্র রুস্তম মীর্জা আকবরের সময়ে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার এবং মূলতানের সুবাদার ছিলেন। বঙ্গের নবাব শাহসুজা এই রুস্তমের জামাতা। রুস্তমের তৃতীয় পুত্র মীর্জা হুসেন সাফাবি কচ্ছের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৬৪৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে বঙ্গাধিপ শাহসুজা শ্যালকপুত্র মীর্জা সাফ্‌সিকানকে যশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান।[৩] সরফরাজপুরে বাস করা তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আরও উত্তর দিকে যেখানে ভদ্র নদী কপোতাক্ষী হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিমোহানার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই ত্রিমোহানী নামক স্থানের সন্নিকটে নিজ আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন। মীর্জার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ সেই সময় হইতে উক্ত স্থানের নাম হইল মীর্জানগর। ত্রিমোহানী হইতে পূর্ব্ব দিকে কেশবপুরে যাইবার পথে আধ মাইল দূরে রাস্তার পার্শ্বে এখন মীর্জানগরের 'নবাব-বাড়ীর' ভগ্নাবশেষ আছে। এখন যেমন মোহানার কাছে মৃত ভদ্রের খাত খুঁজিয়া পাওয়াও দুষ্কর হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। তখন ভদ্র

১ 'আইন-ই-আকবরী'তে সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত এই পুঁড়াই পরগণা বলিয়া উল্লিখিত আছে।—*Ain.*, Vol. II (Jarrett), p. 141.

২ Smyth, *Report of 24-Pergunnahs* (1857)। উহা হইতে জানি, ইছামতীর পূর্ব্বপারে বুড়ন পরগণার পশ্চিমে, বালিয়ার উত্তরে ও কলারোয়ার দক্ষিণে বর্ত্তমান সাতক্ষীরা মহকুমার মধ্যে এই পরগণা অবস্থিত। Area 4,225 sq. miles ; Revenue £4104-6s. —Hunter, *Statistical Accounts*, Vol. I, p. 240.

৩ *Ain.* (Blochmann), p. 315 ; *Riyaz.*, pp. 181, 197 ; Jessore Gazetteer, p. 158.

মঙ্গলবারের মত বিপবীতার্থবোধক, তরঙ্গসঙ্কুল প্রবল নদী। এই নদীর জলে ছায়াপাত করিয়া নবাব-বাড়ী নিশ্চয়ই ছবির মত সুন্দর ছিল।

এখন তাহাব কিছুই নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও এখন মিলাইয়া লওয়া যায় না। ভদ্র নদীর কূল হইতেই নবাব-বাড়ী আরব্ধ, প্রথমেই ভৃত্যদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পাকা ঘর, উহার মধ্য দিয়াই প্রবেশপথ ছিল। প্রবেশ করিলেই সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে দুইটি চত্বর; উভয়ের মধ্যস্থলে এবং উত্তরের প্রাঙ্গণের উত্তবে ও দক্ষিণের প্রাঙ্গণের দক্ষিণে উচ্চ প্রাচীর ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র আছে। উত্তর প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে যে তিন গুম্বজওয়ালা গৃহটিকে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব প্রকৃত বাসগৃহ মনে করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা মস্‌জিদ্‌ বলিয়া বোধ হয় এবং উহার সম্মুখস্থিত ইষ্টকগ্রথিত চৌবাচ্চাকে আমরা স্নানের স্থান না বুঝিয়া, নমাজ করিবার জন্য হস্তপদ ধৌত করিবার জলাধার মনে করি। সকল মস্‌জিদের মত উক্ত গৃহের পশ্চিমদিকে কোন দরজা নাই, বাসঘর হইলে সেরূপ হইত না। উহার পূর্ব্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণে একটি দরজা আছে। মস্‌জিদ্‌টির ভিতরের মাপ ৫০´-৪´´ × ১৪´-২´´, ভিত্তি ৩´-১০´´, গম্বুজের উচ্চতা ২২´ ছিল। উহার দেওয়ালগুলি কিছুদিন পূর্ব্বেও খাড়া ছিল। অন্য ইমারতের ইষ্টকগুলি অধিকাংশই স্থানান্তরিত হইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে কেশবপুরের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবু এখনও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে সেখানে যথেষ্ট ইষ্টক ও অনেকগুলি কবরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

মীর্জা সাফ্‌সিকানের সময়ে শাহসুজার রাজস্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব প্রবর্ত্তিত হয়; উহার ফলে পরগণা সমূহের অনেক পরিবর্ত্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং রাজারামের জমিদারী নানা কারণে সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। মীর্জা সাফ্‌সিকান ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে কার্য্য করিয়া এই স্থানেই পরলোকগত হন। তৎপুত্র সৈফউদ্দীন ফৌজদার হইয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি আওরঙ্গজেবের অধীন একজন খাঁ বা সেনাপতি ছিলেন, এমন উল্লেখ আছে।[২]

১ Westland, *Jessore*, pp 38-9.

২ *Masir-ul-Umara*, Persian Text, Vol. III, p. 478 ; *Riyaz.*, p. 197.
রিয়াজের অনুবাদক মৌলবী আবদাস সালাম বলেন, 'মীর্জার বংশও এখনও আছে'—'the

মীর্জার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি এবং আরাকাণী মগদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত ও নির্য্যাতিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন করেন। তখন মোগল ফৌজদারদিগের পক্ষে দক্ষিণবঙ্গ শাসনতলে রাখা সহজ হইয়া পড়ে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব কয়েক বৎসর মধ্যে নূরউল্যা খাঁ নামক একজন আত্মীয়কে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদার নহেন, এক সঙ্গে যশোহর, মেদিনীপুর, হিজলী, হুগলী ও বর্দ্ধমানের যুক্ত ফৌজদার ছিলেন। ইঁহার অধস্তন বংশধরেরা ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টর নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে নূরউল্যাকে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দুধভাই (foster-brother) বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই জন্যই নূরউল্যার এইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে সব সরকারের ফৌজদার নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে যশোহব প্রধান রাজ্য এবং তাহার শাসন সুসাধ্য নহে বলিয়া অন্য স্থানে সহকারী কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য চালাইয়া, তিনি যশোহরেই অধিষ্ঠান করেন। মীর্জা সাফ্‌সিকানের বংশধরগণ তখনও মীর্জানগরে বাস করিতেছিলেন, এজন্য নূরউল্যা প্রথমে তথায় আসেন না। তিনি ধূমঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী ধুলিয়াপুর পরগণা হইতে কতকাংশ বাহির করিয়া নিজ নামে নূরনগর পরগণার সৃষ্টি করেন ও তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করেন।[১] কারণ ত্রিমোহানী হইতে দক্ষিণ বঙ্গের শাসন চলে না এবং নূরনগরে বাস করিলে তথা হইতে মেদিনীপুর ও হিজলী পর্য্যবেক্ষণ করা যায়।[২] সেখানে তিনি বেশী কাল বাস করিতে পারেন

family still survives there, though impoverished.' কিন্তু সে কোন্ বংশ তাহা জানিতে পারি নাই। নিকটবর্ত্তী স্থানে মৌলবী সৈয়দ আবদুল ফজল মোলায়েম বক্‌স বাস করেন, তিনি কোন্ বংশীয় জানি না। রিয়াজের অনুবাদকের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার কথা অগ্রাহ্য নহে।

১ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে উহার পরিমাণ ফল ছিল ২৬·৭৮ বর্গমাইল, কয়েক বৎসর পরে উহার আকার অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। এই পরগণাব প্রধান নগর রামনগর ও মামুদপুব। এই রামনগর গ্রামই সাধারণতঃ নূরনগর বলিয়া পরিচিত; নূরনগর নামে কোন গ্রাম নাই।—*See*, Smyth, *Report* (1857) ; Hunter, *Statistical Accounts*, Vol. I, pp. 238-9.

২ নূরউল্যা খাঁ নূরনগরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার একটি প্রমাণ এই যে, তাহার দেওয়ান রামভদ্র রায় বরিশাল-বাসী, তিনি নূরনগরে কার্য্য করিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী রুখুনপুরে বাসাবাটী

নাই ; সে স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকা গেল না বলিয়া কয়েক বৎসর পরেই তিনি ত্রিমোহানীতে চলিয়া আসেন।

মীর্জানগরে যে নবাব-বাড়ী ছিল, তিনি তাহা হইতে এক মাইল দক্ষিণে, ভদ্র নদীর অপর পারে নিজের বাসের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করেন। উহাকে এক্ষণে 'কিল্লাবাড়ী' বলে এবং উহার দক্ষিণে তাঁহার নিজ নামে 'নূরউল্যানগর' বলিয়া একটি গ্রামও আছে। কিল্লাবাড়ী বাস্তবিকই একটি বিস্তীর্ণ দুর্গ, উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। ঐ স্থানে আঁকাবাঁকা ভদ্র নদী পশ্চিম ও উত্তরদিকের পরিখার কার্য্য করিয়াছিল, দক্ষিণদিকে যে সুবিস্তৃত পরিখা খনিত করিয়া উহার মাটি দ্বারা দুর্গটিকে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে প্রায় আট দশ ফুট উচ্চ করা হইয়াছিল, উহার নাম 'মতিঝিল' ; উহার একাংশে রাজহংস কেলি করিত, তাহাকে 'বতকখানা' বলে ; ফারসী বতক শব্দে হাঁস বুঝায়। দুর্গের পূর্ব্ব দিকে কোন পরিখা ছিল না, সেই দিকেই ছিল সদর তোরণ। দুর্গটির চারিধার নাকি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। কিন্তু এখন তাহাব বিশেষ চিহ্ন নাই। কিল্লাবাড়ী যে রীতিমত আগ্নেয়াস্ত্রে সুরক্ষিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এখানে তিনটি বড় কামান পড়িয়াছিল, উহার একটি মাত্র আছে। অপর দুইটি যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট বোফার্ট সাহেব (Mr. Baufort) লইয়া যান (১৮৫৪)। উহার একটি দ্বারা তিনি কয়েদীদিগের জন্য বেড়ী প্রস্তুত করেন এবং অপরটির দ্বারা রাস্তা মেরামতের রোলারের কার্য্য করাইয়া লইয়া অবশেষে তাহা জনৈক ভদ্রলোকের নিকট তিন টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলেন।[১] এইরূপ বুদ্ধিমান লোকের সুব্যবস্থায় আমাদের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন উড়িয়া গিয়াছে। যে ভদ্রলোক কামানটি খরিদ করেন, তিনি কে বা উহা দ্বারা কি করিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই। যেটি এখনও দুর্গের ভিতর অল্প জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, উহারই ছবি দিলাম। উহার দৈর্ঘ্য ৫'-৫" ইঞ্চি এবং নলের ভিতরের ব্যাস ৫" ইঞ্চি মাত্র।

একটি মাত্র ভগ্ন অট্টালিকা দুর্গ-বাটীর শেষ নিদর্শন রাখিয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বুঝিয়াছিলেন যে, সেটি হাবসিখানা বা কয়েদীদিগের বাসগৃহ। আমরা তাহা

করিয়াছিলেন। উঁহাদের বংশবিবরণ হইতে সে কথা জানা যায়।—'বঙ্গীয় সমাজ', ২২৯-৩০ পৃ। ভবিষ্যপুরাণেও নূরনগর বা ন্যূননগরের কথা আছে : 'উপপত্তনমেকঞ্চ নগরং ন্যূনপূর্ব্বকম্।'

১ Westland, *Jessore*, p. 39.

বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে ইহা স্নানাগার সম্বলিত বাসগৃহ। আমীর ওমারহের বাসগৃহে সর্ব্বত্রই এইরূপ হামামখানা বা স্নানের স্থান সংযুক্ত থাকিত। এমন হামামখানা ঈশ্বরীপুরে আছে, জাহাজঘাটায় আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। দুঃখের বিষয় গৃহের মধ্যে কূপ দেখিলেই লোকে উহাকে কয়েদী-নির্য্যাতনের ব্যবস্থা বলিয়া সন্দেহ করে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও তেমন ভুল কেন করিলেন, বুঝিয়া পাই না। এই গৃহটি পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ। পশ্চিম প্রান্তের ঘরটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বার, উহার মাপ ১৮´-৮´´×১৮´; পরবর্ত্তী স্নান-গৃহটি ১৮´-৮´´×১৭´; তাহার পশ্চিমে পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণে দুইটি ছোট ঘর (একটি ১০´-৩´´×১১´-১০´´, অন্যটি ১০´-৩´´×৭´) জুড়িয়া দুইটি উচ্চ চৌবাচ্চা ছিল, তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী ইষ্টকগ্রথিত ৯´ ফুট বিস্তৃত বৃহৎ ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া সঞ্চিত রাখা হইত। প্রত্যেক চৌবাচ্চা হইতে চারি পাঁচটি নল দ্বারা জল বাহির হইত, সে নল এখনও আছে। স্নান-গৃহে অর্দ্ধ মাপের জানালাগুলি এমন উঁচু করিয়া বসান যে, স্নানকালে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াইলেও বাহির হইতে দেখা যাইত না। স্নানের এত ব্যবস্থা দেখিয়াও হাবসিখানা বলিয়া সন্দেহ হয় কেন?

নূরউল্যা খাঁ তথাকথিত নবাব-বাড়ীতে বাস করিতেন বা দুর্গমধ্যে বাস করিতেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। দুর্গমধ্যে জেনানাসহ বাস করিলে বহু গৃহের প্রয়োজন, হয়ত তাহা ছিল, এখন কোন চিহ্ন নাই। ত্রিমোহানীর বাজারের নিকট সাধারণের জন্য একটি প্রকাণ্ড ইদ্‌গা বা ইমামবারা ছিল, তাহার কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।[১]

ত্রিমোহানীতে নূরউল্যা নবাবের মত বাস করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তিন হাজারী মন্সবদার এবং কয়েকটি চাক্‌লার ফৌজদার; কিন্তু দেশের লোকে তাঁহাকে বঙ্গের নবাব বলিয়া জানিত। ঢাকায় কে নবাব ছিলেন, সে খোঁজ পশ্চিম বঙ্গের অতি অল্প লোকেই রাখিত। নূরউল্যাও অপরিমিত ধনদৌলতের মালিক হইয়া নবাবী কায়দায় বাস করিতেন। ফৌজদাররূপে ধনাগমের শত পন্থা থাকিলেও তিনি নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে ও তেজারতী প্রভৃতি কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।[২] সুযোগ্য দেওয়ান রামভদ্র রায়ের উপর রাজস্ব

১ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৩১৯, অগ্রহায়ণ, ৩৩২-৩ পৃ।

২ 'Nurulla Khan, Faujdar of the chaklah of Jasar (Jessore), Hugly,

সংগ্রহ এবং হিসাবপত্রের ভার এবং জামাতা লাল খাঁর উপর সৈন্যরক্ষার ভার দিয়া নিজে এক প্রকার কৃষি ও ব্যবসায়ে এবং বিলাসব্যসনে কাল কাটাইতেন।

নূরউল্যা যোদ্ধা না হইলেও কৌশলী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রজার উপর সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদ এমন কি সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়া দিতেন এবং লোককে মিঠা কথায় বশীভূত করিতেন। বিশেষতঃ মন্ত্রণাকুশল দেওয়ানের গুণে সকল লোক তাঁহার বাধ্য ছিল। কথিত আছে, ত্রিমোহানীতে বাসের সময় নূরউল্যার পিতৃবিয়োগ হয়; মুসলমানী প্রথানুসারে যখন তিনি ৪০শ দিবসে স্বজাতীয়দিগের জন্য বিরাট ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন হিন্দুপদ্ধতিমত নিজ শাসনাধীন প্রদেশের অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে শ্লোকটি এই :

'খোদা-পাদারবিন্দদ্বয়-ভজনপরঃ পশ্চিমাস্যঃ পিতা মে।
শ্রুত্বাল্লাল্লেতি বাণীং মুরশিদ-নিকটে মর্ত্ত্যদেহং জহৌ সঃ।
খাসীমুর্গী-রহিতা কদু-কচু-ভবিতা মৎপিতুশ্চাল্‌সে খানা।
শ্রীসেখো নূরনামা গলধৃতবসনঃ শুদ্ধি সম্পাদনীয়া॥'

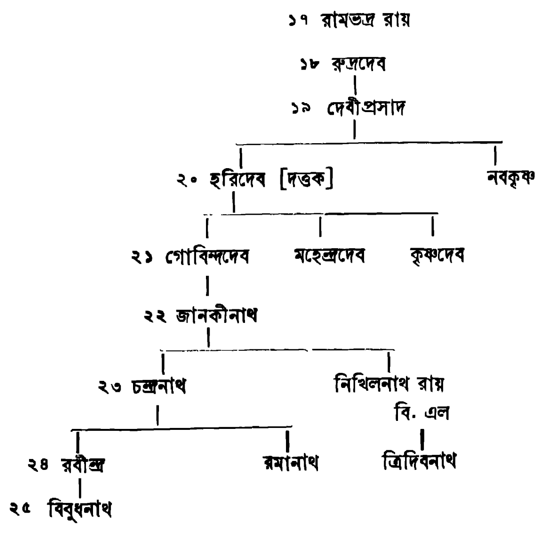
অর্থাৎ খোদার পাদারবিন্দযুগল ভজনকারী আমার পিতা মোল্লার নিকট আল্লা আল্লা বাণী শ্রবণ করিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৪০শ দিবসীয় শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে খাসীমুরগী-বর্জ্জিত সামান্য কিছু কদু-কচু-সম্বলিত (নিরামিষ) আহার যোগাড় করিয়া আমি শ্রীনূরউল্যা সেখ গললগ্নীকৃতবাসে নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সকলে সমবেত হইয়া আমার শুদ্ধি সম্পাদন করিলে কৃতার্থ হইব। কেহ কেহ 'খাসীমুর্গীসুখানা' এইরূপ পাঠান্তরের পক্ষপাতী, 'রহিতা' পাঠে ছন্দের কিছু গোলমাল হয়, 'সুখানা' (উত্তম খানা) রাখিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে, তবে সে পাঠে নিরামিষ আহারের কথা বুঝায় না। নূরউল্যা যদি খাসী মুরগী খাওয়াইবার জন্য হিন্দুদিগকে জোর করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত শ্লোক রচনার আবশ্যক বোধ করিতেন না। প্রবাদ আছে, তিনি খোলা মাঠে পৃথক্ ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য নিরামিষ

Burdwan and Mednipur, who was very opulent and had commercial business and who also held the dignity of a Sebhazari &c.'—*Riyaz.*, p. 232; 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', ২৯৩ পৃ।

আহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া ভূস্বামী জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই প্রবাদের কতটুকু সত্য বা অসত্য তাহা বলা যায় না, তবে শ্লোকটি এখনও অনেক স্থলে লোকে আবৃত্তি করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা আর কিছু না হউক, সে যুগে যে হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। নূরউল্যা যে জনপ্রিয় সুশাসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকে বলে এই কৃতিত্বের জন্য তিনি তাঁহার দেওয়ান রামভদ্র রায়ের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।[১]

কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ লাল খাঁই তাঁহার শাসনের কলঙ্ক। জামাতা লাল খাঁ

১ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেওয়ান রামভদ্র সম্ভ্রান্তবংশীয়। ইঁহার বংশধরগণ চণ্ডেশ্বর গুহের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। চণ্ডেশ্বর উচ্চ কুলীন বলিয়া খ্যাত। 'রাজ্ঞা চ পূজিতঃ সোঽপি স্বশ্রিয়ং লব্ধবান্ সুতঃ।' রামভদ্র এই চণ্ডেশ্বরের পৌত্র এড়ু গুহের ধারায় ১৭শ পুরুষ এবং পুঁড়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পুত্র রুদ্রদেব বিখ্যাত ব্যক্তি, তিনিই প্রথম পুঁড়ায় বাস করেন। রুদ্রদেবের অধস্তন কৃষ্ণদেবের সময় বিখ্যাত তিতুমীরের বিদ্রোহ ও লড়াই হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠাইয়া গুলিগোলার সাহায্যে ঐ হাঙ্গামা নিবারণ করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু নিখিলনাথ রায়, কৃষ্ণদেবের ভ্রাতা গোবিন্দদেবের পৌত্র। এখানে বংশধারা দিতেছি :



ফৌজের ভার ও অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া বড় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার পাশবিক অত্যাচারের কত কাহিনী এখনও শুনা যায়। বর্ত্তমান খুল্‌না জেলার সেনহাটী গ্রাম নিবাসী রাজারাম সরকার নামক একজন মৌলিক কায়স্থ নূরউল্যার হিসাব সেরেস্তায় একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার সুন্দরী নামে যে এক পরমাসুন্দরী বালবিধবা কন্যা ছিল, তাঁহার উপর লাল খাঁর পাপ দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি ছলে বলে তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া এক সময়ে ফৌজদারের অনুপস্থিতি কালে রাজারামকে কারারুদ্ধ করেন। তখন তাঁহার বুদ্ধিমতী কন্যা নূরউল্যার প্রত্যাগমনের আশায় লাল খাঁর প্রস্তাবে স্বীকার করিবার ভান করেন এবং কৌশলে লাল খাঁর অর্থে সেনহাটীতে পিত্রালয়ের সম্মুখে একটি বিস্তৃত গভীর জলাশয় খনন করাইয়া লন এবং তাহারই জলমধ্যে ডুবিয়া মরিয়া পাপের হাতে নিস্তার পান। পরে তাঁহার পিতাও নাকি ফৌজদারের কৃপায় মুক্তি পাইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কন্যার মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া ঐ দীঘিতে নিজেও আত্মহত্যা করেন। ঐ দীঘির নাম 'সরকার-ঝি'।[১]

এই ঘটনার পর নূরউল্যা জামাতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, তাহাকে ফৌজের কার্য্য হইতে দূরীভূত করেন।[২] একে ত নিজে যুদ্ধবিদ্যায় অনভ্যস্ত, তাহাতে উপযুক্ত সেনাপতি ও পবিচালনার অভাবে তাঁহার সৈন্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। তখন ইব্রাহিম খাঁ ঢাকার নবাব।[৩]

---

১ সরকার কন্যার সতীধর্ম্ম রক্ষার করুণ কাহিনী বহন করিয়া 'সরকার-ঝি' এখনও আছে। এখনও সে দীঘিব উত্তর পাড়ে রাজারামের বাড়ীর ঢিপি ও তাহার সম্মুখে দীঘির পাকা ঘাটের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। দীঘিটি লাল খাঁর ও তাহার প্রেরিত লোক দ্বারা খনিত হয় বলিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ। এখনও উহার জল ভাল ও গভীর, এবং তদ্দারা সেনহাটীর একটি পাড়ার জলকষ্ট নিবারণ হইতেছে। এবং যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি 'সরকার-ঝি'র প্রাচীন কাহিনী শুনেন, তাঁহারই নয়ন-কোণ অশ্রুসিক্ত হয়।—'মালঞ্চ,' ১৩২৭, ফাল্গুন, ৭৬৪-৭ পৃ।

২ কেহ কেহ বলেন, নূরউল্যার কন্যার গর্ব্তে লাল খাঁর এক পুত্র হয়, তাহার নাম বহরম খাঁ। লাল খাঁর নির্ব্বাসনের পর নূরউল্যা দৌহিত্রকে কিছু সম্পত্তি দেন। এই বহরমের পুত্র কিশোর খাঁ ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন।—'মানসী ও মর্ম্মবাণী' (অশ্বিনীকুমার সেন), ১৩২৩, পৌষ, ৫৪১-২ পৃ। সম্ভবতঃ এই কিশোর খাঁকেই ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব 'a dreadful oppressor' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—*Jessore*, p. 40.

৩ ইনি আমীর-উল ওমরা আলি মর্দ্দানের পুত্র, ইনি দ্বিতীয় ইব্রাহিম খাঁ, শাসনকাল

তাঁহার শাসনকালে বর্দ্ধমান অঞ্চলে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। চেতুয়া-বর্দ্দার[১] তালুকদার সভা সিংহ একজন সামান্য ভূম্যধিকারী ; কিন্তু তিনি বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সহিত বিবাদসূত্রে অস্ত্রধারণ করেন এবং উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁকে নিজ দলভুক্ত করিয়া মোগলদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার মানসে বিষম উৎপাত আরম্ভ করেন। কৃষ্ণরাম নিহত ও তাঁহার পরিবারবর্গ শত্রুহস্তে বন্দী হন। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎরাম স্ত্রীবেশে পলায়ন করিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং পরে তাঁহার সাহায্যে ঢাকায় গিয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সংবাদ দেন। শুনিবামাত্র নবাব ফৌজদার নূরউল্যা খাঁকে অনতিবিলম্বে সসৈন্যে গিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কঠোব আদেশ দেন। তখন নূবউল্যা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, কোথায় বা সৈন্য আর কোথায় বা সেনাপতি ও নৌ-বাহিনী ; নিজে ছিলেন সুখ-বিলাসে রত, আর 'তাঁহার সৈন্যেরা যুদ্ধ-শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল।' কুম্ভ-কর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে শুধু পতনেরই নিমিত্ত। কোন প্রকারে কিছু সৈন্য জুটাইয়া তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি রওনা হইলেন এবং হুগলীতে গিয়া যখন শুনিলেন যে বিদ্রোহীদল সেই পথে আসিতেছে, তখন ফাঁপরে পড়িয়া আত্মরক্ষার জন্য সসৈন্যে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে বিদ্রোহীরা আসিয়া হুগলী অবরোধ করিয়া বসিল, তখন ফৌজদার মহাশয় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া কোন প্রকারে নাক কান কাপড়ে জড়াইয়া রাত্রিযোগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া যশোহরে আসিলেন, পরদিন প্রাতে হুগলী দুর্গ তাঁহার যথাসর্ব্বস্বসহ শত্রুহস্তে পড়িল।[২] তাহার পর পাপিষ্ঠ সভা সিংহ বর্দ্ধমান রাজকুমারীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহার গুপ্ত ছুরিকার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৬৮৮-৯৭ খৃঃ। He was 'a book-worm and a man of peace.'—*Riyaz*, p 235.

১ Chitwa in Mandaran Sarkar—*Ain*. [Jarrett & Sarkar, vol. II, p. 155] চেতুয়াবর্দ্দা মেদিনীপুরের অন্তর্গত। ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

২ 'With a nose and two ears, clad in a rag, he (Nur-ullah) came out of the fort, and the fort of Hugly together with all his effects and property fell into the enemy's hands'.—*Riyaz*. p. 232.

তখন রহিম খাঁ নিজে 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা হিম্মৎ খাঁর সঙ্গে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং অবিলম্বে নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বর্দ্ধমান অঞ্চলে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর আদেশ দিলেন। কাপুরুষতার জন্য তিনি নূরউল্যার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত ও বিতাড়িত করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের ফৌজদারী ভার জবরদস্ত খাঁকে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি ঢাকা হইতে নৌবাহিনী সাজাইয়া লইয়া আসিয়া ভগবানগোলার সন্নিকটে রহিম খাঁকে ভীষণ ভাবে পরাজিত করিলেন। বাদশাহ যে কেবল নূরউল্যার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অকর্ম্মণ্যতা দোষে ইব্রাহিম খাঁকেও পদচ্যুত করিয়া নিজ পৌত্র আজিম উশ্বানকে সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু যখন সম্রাট-পৌত্র আসিয়া জবরদস্তের বীরত্বের কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া পিতার সহিত বঙ্গ ত্যাগ করিলেন।[১]

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নূরউল্যা খাঁ কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদারী পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন; কারণ, তিনি আরও কয়েক বৎসর কাল যশোহরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলীর ফৌজদারী সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায়। বহুকাল পরে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নূরউল্যার দুই প্রপৌত্র যশোহরের কালেক্টর সাহেবের নিকট বৃত্তি-ভিখারী হইয়া যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন।[২] উহা হইতে যেটুকু সত্যের উদ্ধার করা যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—নূরউল্যার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মীর খলিল কিছুকাল ফৌজদার ছিলেন। তৎপুত্র দায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যা নাবালক বলিয়া ফৌজদার পদ পান না এবং পরে উভয়ে বিবাদ করিয়া পরস্পরের হত্যা সাধন করেন। সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর নবাব সুজা উদ্দীনের সময় যশোহরের ফৌজদারী মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যায়। যশোহরের প্রধান প্রধান পরগণাগুলি চাঁচড়ার রাজা ও অন্যান্য

১ *Riyaz*. pp. 234-7 ; Stewart, p. 384.

২ Westland, *Jessore*, p. 40.

জমিদারের হস্তগত হইয়া পড়ায় এবং মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ঐ সব পরগণার বন্দোবস্ত হয়; সে জন্য যশোহরে কোন শাসন কেন্দ্র রাখিবার প্রয়োজন ছিল না। তখন উক্ত দায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যার দুই পুত্র হিদায়েৎউল্যা ও রহমৎউল্যা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন, তাঁহারা নবাব সরকার হইতে কোন সাহায্য পান না; বহুদিন পর্য্যন্ত চাঁচড়ার রাজার বৃত্তিতে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। পরে চাঁচড়ার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে, উভয়ে নিরুপায় হইয়া প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। যশোহরের কালেক্টরের অনুকূল মন্তব্যে উঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, প্রত্যেককে মাসিক একশত টাকা করিয়া পেন্‌সন দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সে হুকুম আসিবার পূর্ব্বেই এক জনের মৃত্যু হয়, অন্য জন মাত্র চারি বৎসর কাল বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মীর্জানগরে পরলোকগত হন। নূর-উল্যার বংশে এখন আর কেহ নাই।

ইংরাজ কোম্পানির রাজত্ব প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে যে যশোহরের ফৌজ-দারের পদ উঠিয়া গিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ মীরকাশেমের রাজত্ব-কালেও যশোহরের ফৌজদার মহম্মদ আসরফ খাঁর জায়গীর ৪১৬৬৲ টাকা ছিল বলিয়া জানিতে পারি।[১] তবে নূরউল্যার সময় হইতে ঐ সময় পর্য্যন্ত কে কখন ফৌজদার হইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবার পন্থা নাই। এখন মীর্জানগরের কিছুই নাই, কিন্তু উহা বহুদিন পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ শহর ছিল। ১৮১৬ অব্দেও যশোহরের জনৈক কালেক্টরের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, উহা তখনও যশোহরের তিনটি প্রধান নগরীর অন্যতম। ত্রিমোহানীও এক সময়ে চিনির কারবারের জন্য বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার অবশেষ নাই। কেশবপুরের সমৃদ্ধিই ত্রিমোহানীর পতনের কারণ। এখন শুধু বারুণীর মেলার সময়ে চৈত্র মাসে এখানে বহু লোকসমাগম হয়।

১ 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৫০৭ পৃ।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নলডাঙ্গা রাজবংশ

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে, ফরিদপুর জেলায় তেলিহাটি পরগণার অন্তর্গত ভাবরাসুরা গ্রামে আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন।[১] তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ হইতে ১৩শ পুরুষ। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল; তিনি দেবোপম চরিত্র ও পাণ্ডিত্য গৌরবে 'কুলপতি' আখ্যা পান। তদবধি তদ্বংশীয়েরা বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত। তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যশোহরে নলডাঙ্গার 'দেবরায়' উপাধিধারী রাজবংশ, সুতির রায় বংশ, ইত্না, মাটসিয়া, কামালপুর ও ভখালির ভট্টাচার্য্যগণ, খুলনা জেলার অন্তর্গত ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্য বংশ এবং ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুক্‌রার ভট্টাচার্য্যগণ আখণ্ডল বংশীয়। আখণ্ডলের তিন পুত্র সমধিক বিখ্যাত—তপন, প্রিয়ঙ্কর ও সন্তোষ; তন্মধ্যে প্রিয়ঙ্করের বংশে ফুক্‌রা ও ঘাটভোগের ভট্টাচার্য্যগণ এবং তপনের ধারায় নলডাঙ্গার রাজবংশের উৎপত্তি।[২]

১ প্রচলিত মত এই যে, হলধর ভট্টাচার্য্যের উপাধি ছিল 'আখণ্ডল', আখণ্ডল কাহারও নাম নহে। সে মতে হলধরই 'আখণ্ডল' ও 'কুলপতি', এই দুইটি উপাধি পাইয়াছিলেন; কুলপতি উপাধির অর্থ বুঝি, কিন্তু আখণ্ডল উপাধি কাহারও দেখি নাই এবং উহার সার্থকতা বুঝি না। প্রচলিত মতের মূল কোথায় জানি না। আমার নিকট বন্দ্যঘটী বংশের যে কুলপঞ্জী আছে, তাহা হইতে জানিতে পারি, আখণ্ডলের পিতার নাম পণ্ডিত, তাঁহার তিন পুত্র ছিল—'তৎসুতাঃ হলো আখণ্ডল কুশলকাঃ' অর্থাৎ হল, আখণ্ডল এবং কুশল নামে তাহার তিন পুত্র ছিল, আখণ্ডল যদি হলের উপাধি হইত, তাহা হইলে 'তৎসুতাঃ' স্থলে দ্বিবচন প্রয়োগ হইত। সুতরাং হলধর ভট্টাচার্য্য ও আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য দুই ভ্রাতা, তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি নহেন।

২ পূর্ব্বোক্ত কুলপঞ্জী হইতে আখণ্ডল পর্য্যন্ত ধারা এইরূপ: ১ ভট্টনারায়ণ—(আদি) বরাহ (বন্দ্যঘটী)—সুবুদ্ধি—বৈনতেয়—বিবুধেশ—সুভক্ষণ—অনিরুদ্ধ—দীক্ষিত—ধর্ম্মাংশু—দেবল—যোগী—পণ্ডিত—হল, আখণ্ডল ও কুশল। সম্ভবতঃ হলধর নিঃসন্তান। আখণ্ডলের পাঁচ পুত্র—প্রিয়ঙ্কর, সন্তোষ, তপন, চকো, মনো, তপনের তিন পুত্র—'দামো নিমো পভোক।' ঘটকেরা বিভক্তির ভয়ে কন্ প্রত্যয় করিয়া লইতেন। পভোক অর্থাৎ পভো বলিতে প্রভুরাম বা প্রভাকর এইরূপ কোন নাম হইতে পারে। পভো বা প্রভাকরের তিন পুত্র শিব, নারায়ণ ও গণপতি। শিবের পুত্র রাম এবং রামের পুত্র মাধব, বিদ্যাধর ও বিষ্ণু। মাধবের যে শুভ রাজ খাঁন উপাধি হইয়াছিল, কুলপঞ্জীতে তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখিত হইয়াছে। *'Naldanga Raj Family'* পুস্তকের

তপনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাধব নবাব সরকারে চাকরী করিয়া শুভরাজ খাঁন উপাধি লাভ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটকের নিকট কুলমর্য্যাদা পাইয়া পৃথক্ মেলভুক্ত হন। তিনি দেবীবর প্রবর্ত্তিত ৩৬ মেলের মধ্যে শুভরাজ খানী মেলের প্রকৃতি।[১] সুতবাং নলডাঙ্গার রাজবংশীয়েরা শুভরাজ খানী মেল ভুক্ত। শুভরাজের বিষ্ণুদাস হাজরা, রামচন্দ্র শিকদার প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল। উঁহারা নবাব সরকারে চাকরী করিয়া হাজরা, শিকদার প্রভৃতি উপাধি পান। বিষ্ণুদাস প্রথম জীবনে যাহাই করুন, শেষ জীবনে ধর্ম্মার্থ আত্মসমর্পণ করিয়া স্বকীয় উজ্জ্বল বংশকে আরও পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তিনিই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

গ্রন্থকার ৺অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তপনেরই পুত্রের নাম শিব, ব্যাস, বামন বলিয়াছেন (২৯ পৃ), নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও শিবকে আখণ্ডলের পৌত্র বলিয়াছেন (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২৪৯ পৃ); সুতরাং উভয়েই মধ্যবর্ত্তী একপুরুষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ নগেন্দ্রনাথ তপন পুত্র কৌতুক, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র কমলাকান্ত ভট্টাচায্য, এইরূপ নির্দ্দেশ কবিয়া বংশপরিচয় বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২৪৮, ২৫৫ পৃ)। এ বিষয়ে তাঁহাব মূল প্রমাণ কি, জানি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ কোন কুলগ্রন্থের খবর না লইয়া ৺রামশঙ্কর সেন প্রণীত ইংরাজী রিপোর্টের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া ভ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে আছে :

"Haladhar Akhandal was the leader of his sect. Santosh, Priankar and Tapan were his sons. Ram was Sib's son, and Ram's son was Madhab, surnamed Subharaj Khan"—Sen, Ram Sankar, *Report*, Appendix A, p. iii.

কিন্তু এখানেও একটি লাইন পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ শিবের পুত্র রাম, তাহা আছে, কিন্তু শিব যে কাহার পুত্র তাহা নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবাধে ধরিয়া লইয়াছেন যে, শিব তপনের পুত্র, কিন্তু ইহা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয় না। যাহা হউক, আমরা একখানি কুলপঞ্জিকার মতানুসারেই বংশাবলী লিখিলাম, এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করি না।

১ মাধব শুভরাজ খানের পিতা রাম বন্দ্যো পীতমুণ্ডী বিদ্যাধর রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া দুষ্ট হন :

'আখণ্ডল বংশে নাম মাধব বাড়ুরী
শুভরাজী খানী ছিল সে উপাধিধারী,
মাধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয়
গৌরীবর গাঙ্গ-যোগ পরেতে সে পায়।' ইত্যাদি

—'মেলমালা', লালমোহন বিদ্যানিধি, 'সম্বন্ধ নির্ণয়', ৫৯৫ পৃ

আখণ্ডল বংশ

- ১০ দেবল
  - যোগী
    - পণ্ডিত
      - ১৩ হল
      - আখণ্ডল
        - প্রিয়শঙ্কর (ফুক্‌রা)
        - সন্তোষ
        - তপন
          - দামো
          - নিমো
          - পভো বা প্রভাকর
            - শিব
              - রাম
                - মাধব শুভরাজ খাঁন
                  - ১৯ বিষ্ণুদাস হাজরা
                  - রামচন্দ্র শিকদার
                - বিদ্যাধর
                - বিষ্ণু
            - নারায়ণ
            - গণপতি
        - চকো
        - মনো
      - কুশল

প্রবাদ এই, বিষ্ণুদাস প্রবীণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভাবরাস্থরা হইতে যশোহরে বেগবতী বা ব্যাঙ্‌ নদীর তীরে ক্ষাত্রস্থনি গ্রামে আসিয়া, নদীকূলে নির্জ্জন বনের মধ্যে আসন পাতিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এখন ঐ স্থানের নাম হাজরাহাটি এবং উহার নিকটবর্ত্তী স্থান নলনটায় সমাকীর্ণ বলিয়া নলডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর একদা বঙ্গের এক স্থবাদার বা তাঁহার কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী কোন কার্য্যব্যপদেশে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ফিরিবার সময় ঐ

পথে যাইতেছিলেন। খাদ্যাদির অভাব বশতঃ দৈবক্রমে ক্ষাত্রমুনির পার্শ্বে নৌকা লাগাইয়া রসদ সংগ্রহের জন্য অনুচরদিগকে উপরে উঠিয়া অনুসন্ধান করিতে বলেন।[১] বনমধ্যে বিষ্ণুদাসের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হয়; তিনি নাকি মন্ত্রবলে নবাব-সৈন্যের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করেন। তখন রাজকর্ম্মচারী সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপ দর্শনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, তাঁহার স্থাপিত ৺কালী বিগ্রহের বৃত্তিস্বরূপ নিকটবর্ত্তী পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়া যান। উহাই নলডাঙ্গা রাজ্যের ভিত্তি।

বিষ্ণুদাসের এক পুত্র ছিল—শ্রীমন্ত। লোকে বলে এ পুত্র অকৃতদার সন্ন্যাসীর মানসলব্ধ সন্তান এবং দেবানুগৃহীত বলিয়া তাঁহার উপাধি হয়—'দেবরায়'। শ্রীমন্তের বংশধরগণ সকলেই 'দেবরায়' উপাধিধারী বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে বিশেষ দেবত্বের পরিচয় পাই না, কারণ তিনি সাধারণ বিষয়ী লোকের মত পরের উপর অত্যাচার করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। এজন্য বিষ্ণুদাস যে চিরকুমার ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করি না। মনে হয়, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার সংসার-ধর্ম্ম ছিল, পুত্র সন্তান ছিল। নবাবের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে ভূসম্পত্তি পাইয়া, তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীমন্তকে সংবাদ দিয়া আনিয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। পুত্রও সে কার্য্যে দক্ষ এবং স্বয়ং বীরপুরুষ ছিলেন। তখন পাঠানশক্তি পরাজিত, কিন্তু মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশময় সর্ব্বত্র অরাজকতা, 'জোর যার, মুল্লুক তার' ইহাই তখনকার নীতি। এই সময়ে কোটচাঁদপুর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ পাঠানজাতীয় ভূম্যধিকারীদিগের হস্তগত ছিল, তাঁহাদের বাসস্থান ছিল স্বরূপপুর গ্রামে। শ্রীমন্ত বাহুবলে তাঁহাদিগের কতককে নিহত করিয়া, অন্য সকলকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি দখল করিয়া লন।[২] এই সময়ে পাঠানদিগকে উৎখাত করিতে পারিলেই মোগলেরা খুসী হইতেন। তখন মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার এবং

---

১ এই সুবাদার নিশ্চিতই হিন্দু, তবে তিনি কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন কয়েকখানি গ্রাম দান করিবার ক্ষমতা কোন সাধারণ কর্ম্মচারীর ছিল না। সাধারণ প্রবাদ মতে এই সুবাদার মানসিংহ। কিন্তু তিনি কেদার রায়ের পতনের পর, ১৬০৩ খৃঃ ভিন্ন এ পথে যাইতেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাই না।

২ Sen, Ram Sankar, *Report on the Agricultural Statistics of Jessore (Jhenidah and Magura Sub-divisions)*, 1873, Appendix A, p. iv.

রাজমহলে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীমন্ত মামুদসাহী পরগণার অধিকাংশ দখল করিয়া সম্ভবতঃ রাজমহলে গিয়া মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে 'রণবীর খাঁ' উপাধি পান। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করিবার সময় রণবীর খাঁ কি ভাবে মানসিংহকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বর্ত্তমান নলডাঙ্গার সন্নিকটে একটি স্থানকে 'কালিকাতলা' বলে এবং ঐ স্থানে একটি পঞ্চমুণ্ডী আসন ও উহার পার্শ্বে একটি দোহা আছে। ঐ স্থানে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মাঝে মাঝে অধিষ্ঠান করিতেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মাণ্ডগিরি এবং তিনি রণবীরের দীক্ষাগুরু। কথিত আছে, ঐ স্থানের নিকটে কোন জলাশয় না থাকায় সন্ন্যাসী দীক্ষাকালে শিষ্যের স্নানার্থ মন্ত্রবলে ঐ দোহাব স্থষ্টি করেন। ঐ দোহা এখনও খুব গভীর, উহার মধ্যস্থলে এখনও ৪০ হাত জল থাকে।[১]

রণবীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীমোহনের পৌত্র চণ্ডীচরণ দেব রায় একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রীতিমত সৈন্যসামন্ত ছিল। তিনি ফিরিঙ্গি পালোয়ান এবং গোলন্দাজদিগকে নিজ সৈন্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফিরিঙ্গিরা সন্দীপ অঞ্চল হইতে তাড়িত হইয়া সমস্ত দেশীয় রাজন্যের অর্থদাস হইয়াছিল। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে নিকটবর্ত্তী এক জমিদার রাজা কেদারেশ্বরের সহিত চণ্ডীচরণের মনোবিবাদ হয় এবং তজ্জন্য তিনি বেগবতী নদীতে এক শত যুদ্ধ-নৌকা সজ্জিত করিয়া, উক্ত জমিদারের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত, ধৃত ও নিহত করিয়া, তাঁহার বাটীর গোপাল বিগ্রহ আনিয়া নলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নলডাঙ্গায়ও বিষ্ণুদাসের সময় হইতে একটি গোপাল বিগ্রহ ছিল, সেটি ছোট বলিয়া তাঁহাকে 'গালিম গোপাল' এবং নূতন আনীত বিগ্রহকে 'বড় গোপাল' বলা হয়। চণ্ডীচরণ নিজ বাটীর পূর্ব্বধারে একটি সুন্দর জোড় বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উভয় গোপালকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কেদারেশ্বরের জমিদারী দখল করিয়া লন এবং ক্রমে প্রায় সমগ্র মামুদশাহী পরগণার অধীশ্বর হন। তাঁহারই সময় 'চাক্‌লা' নামক স্থানে কাছারীবাটী নির্ম্মিত হয়, উহা এক্ষণে নড়াইলের বাবুদিগের

১ ব্রহ্মাণ্ডগিরি পরে নবগঙ্গার তীরবর্ত্তী কালিকাপুর মঠে অধিষ্ঠান করেন। সেখানে তৎকর্ত্তৃক সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রণবীর খাঁ ঐ দেবীমূর্ত্তির জন্য মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মাণ করতঃ যথেষ্ট দেবোত্তর দেন। কালিকাপুর আশ্রমের কথা পরে বলিতেছি।

ন্ধ রাজমহলে গিয়া সুবাদার শাহসুজার সহিত
রেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি
বংশের প্রথম রাজা।
ণের সময়ে সন্ন্যাসী ব্রহ্মাণ্ডগিরির আদেশে কালী
মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হয় এবং একটি সুন্দর পঞ্চরত্ন
তিষ্ঠা কবা হয়। মন্দিরে কোন লিপি নাই।
×৩৯´-৩´´। দেবীর নাম দেওয়া হইয়াছিল
ন্ধশ্বরী' বলা হয়। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র সুর-
নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহার ব্যয়
ন্দাবস্ত হয়। সেই নিয়মে এখনও নিত্যপূজা
বলি দিতে হয়, মায়ের প্রসাদে অভ্যাগতের
কর্ত্তৃপক্ষের যে প্রাণের ভক্তি ও যত্ন লইয়া কার্য্য
যেন এখন নাই। গতানুগতিকের মত কোন
মাত্র। মন্দিরটিও জঙ্গলাবৃত ও অপরিষ্কৃত হইয়া
পড়িয়াছে। এই মন্দিরে এক্ষণে যে একটি সুন্দর দুই ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তি আছে, তাহার জন্য পূর্ব্বে পৃথক্ মন্দির ছিল। নিত্যপূজিত এমন কোন গণেশমূর্ত্তি এদেশে আর নাই।[১] ১৬৮৫ অব্দে সুরনারায়ণের মৃত্যু হয়, তাঁহার ছয়টি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ রাজ্যাধিকারী হন। তিনি বিলাস-বিভ্রাটে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না, তজ্জন্য নবাব সরকারে বহু রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন কনিষ্ঠ রামদেব রায়ের প্ররোচনায় নবাবের সেনাপতি সম্সের খাঁ তাঁহার দমনার্থ আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং রামদেবকে রাজতক্তে বসাইয়া যান (১৬৯৮)। রামদেব বড় দাতা ছিলেন, তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতিকে যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান; এমন কি শূদ্র বা মুসলমান ফকিরগণও তাঁহার দানে বঞ্চিত হন নাই। রামদেবের সময়েই 'রামেশ্বরী' মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা এখনও আছে।

এই রামদেবের রাজত্বকালে রাজা সীতারাম রায়ের আবির্ভাব হয়। মামুদ-শাহী পরগণা তখন ভূষণা চাক্‌লার অন্তর্গত ছিল। সীতারাম ভূষণার অধিকাংশ

১ অতি প্রাচীনকালে এদেশে গণেশের পূজা পদ্ধতি ছিল, এখন তাহা নাই।

অধিকার করেন। তিনি যখন মামুদশাহী পরগণার পূর্ব্ব ভাগের কতকটা দখল করেন, তখন রামদেব শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন।[১] এই জন্যই নলডাঙ্গা রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তবুও রামদেবকে প্রভূত অর্থব্যয়ে যথেষ্ট সৈন্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক ও সন্দিগ্ধ থাকিতে হইত। কারণ ভবিষ্যতে দেশের ভাগ্য কি দাঁড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত। এই সব কারণে নবাব সরকারে তাঁহার দেয় রাজস্ব বহু বৎসর বাকী পড়ে।

তখন প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের সুবাদার। তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৭০৪)। তিনি কঠোর হস্তে দেশ শাসন করিতেন। তিনি বড় বড় জমিদারীর পত্তনও যেমন করিয়াছিলেন, তেমনই যাঁহারা রাজস্ব দিতেন না, তাঁহাদিগকে শাস্তিও সেইরূপ দিতেন। মুর্শিদকুলি অশক্ত বা বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে শাস্তি দিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। একটির সম্বন্ধে প্রবাদ এই, মুর্শিদাবাদে একটি খাত খনন করাইয়া তাহা পুরীষাদি নানা পূতিগন্ধময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া, উহার নাম রাখা হয়—'বৈকুণ্ঠ'।[২] রাজস্ব দিতে না পারিলে, জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কিছুক্ষণের জন্য এই বৈকুণ্ঠ-বাসের হুকুম দেওয়া হইত। বৈকুণ্ঠের ভয়ে জমিদারেরা থরহরি কম্পমান হইতেন।

রাজা সীতারামের জীবদ্দশায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে নবাব বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তিনি রামদেবকে সীতারামের পক্ষভুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অবশেষে যখন সীতারামের পতন হইল এবং তাঁহার রাজ্য নবাবের অনুগৃহীত ভৃত্যবর্গের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল, তখন রামদেবের খবর হইল। সে খবরে তিনি না গেলে, সৈন্য আসিল, বৈকুণ্ঠের ভয়ে রামদেব পলায়ন করিলেন, নবাবী ফৌজ রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া ফিরিয়া গেল।

১ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, 'রাজা সীতারাম রায়', ৯৮ পৃ। সীতারাম যে অংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করেন নাই। তাহারই মধ্যে তিনি যেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম হয় শিবনগর। সীতারামের পতনের পর তাঁহার রাজ্য নাটোরের অধিকৃত হয়। এখনও নলডাঙ্গার দক্ষিণে উক্ত শিবনগরে নাটোরাধিপতির ৬৫,০০০ টাকার সদর কাছারী আছে, উহারই পার্শ্বে কালীগঞ্জ ছিল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ রেলষ্টেশনের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া শিবনগর হইয়াছে।

২ 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৯১ পৃ; Stewart, pp. 429-30.

তখন রামদেব নিজেই মুর্শিদাবাদে গিয়া হাজির হইলেন, এবং বৈকুণ্ঠের ভয়ে সমস্ত জমিদারী ইস্তাফা দিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র দাস নামক বৈদ্য বংশীয় তাঁহার একজন সুযোগ্য আম-মোক্তার তাঁহার পক্ষসমর্থনের জন্য মুর্শিদাবাদে থাকিতেন, রামদেব যখন ইস্তাফাপত্র লিখিয়া নবাবের হস্তে দেন, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না ; পরে ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল, প্রভু-রাজ্যের ধ্বংসবার্ত্তা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ইস্তাফা-পত্রখানি ধ্বংস করিতে পারিলে বুঝি রাজ্যোদ্ধার হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের নিকট উহা দেখিতে চাহিলে, যেমন তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইল, অমনি তিনি ইস্তাফা-পত্রখানি ভাঁজ করিয়া গালের মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার শাস্তির হুকুম হইল। কথিত আছে, নবাবকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া মৃতকল্প অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়া দিল এবং পরে রামদেব তাঁহাকে পাইয়া শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইলেন। খবর শুনিয়া নবাবের দয়া হইল, তিনি রামদেবের সহিত মামুদশাহী পরগণার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন (১৭২২) ; স্থির হইল যে, রামদেব ক্রমে ক্রমে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিবেন।[১]

আখণ্ডল বংশ

১৯ বিষ্ণুদাস হাজরা
|
শ্রীমন্তদেব রায়
বা রণবীর খাঁ
|
গোপীদেব
|
রামদেব
|
রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায়
|
রাজা ইন্দ্রনারায়ণ
|
২৫ রাজা সুরনারায়ণ

১ 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৪৯৩ পৃ ; 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', ৫০৫ পৃ।

২৫ রাজা-সুরনারায়ণ

রাজা উদয়নারায়ণ, [১৬৮৫-৯৮] — রাজা রামদেব, [১৬৯৮-১৭২৭]

রাজা রামদেব →

রাজা রঘুদেব, [১৭২৮-৪৮] — রাজা কৃষ্ণদেব, [১৭৪৮-৭৩]
= রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া (ক)
= রাণী রাজরাজেশ্বরী (খ)

রাজা কৃষ্ণদেব →

(খ) মহেন্দ্রদেব রায়, ।৵৮ অংশ — (খ) রাজা রামশঙ্কর, ।৵৮ অংশ [১৭৭৩-১৮১২] — (ক) গোবিন্দদেব রায়, ৶৪ অংশ

রাজা রামশঙ্কর →

মোহনচাঁদ, [মৃত্যু, ২৪-১০-১৮১১]
|
রাজা শশিভূষণ, [১৮১২-৩৪]
|
রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায়, [১৮৫৩-৭০]
|
রাজা বাহাদুর, প্রমথভূষণ দেবরায়
[রাজ্যপ্রাপ্তি, ১৮৭৯]

কুমার পন্নগভূষণ — কুমার মৃগাঙ্কভূষণ

প্রভুভক্ত ভৃত্যের অদ্ভুত কার্য্যে বৈকুণ্ঠের শাস্তি হইতে নিস্তার পাইয়া রামদেব নলডাঙ্গায় প্রত্যাগত হইলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।[১] কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীয়গণ এখনও 'ইস্তাফা-গেলা'

১ বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগণার ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটনা আছে। সে পরগণার বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া যখন রাজা জয়নারায়ণ নবাব-দরবারে ইস্তাফা পত্র লিখিয়া দেন, তখন রাজার সুযোগ্য দেওয়ান কৃষ্ণরাম সেন ঐ পত্রে দস্তখত করিতে অসম্মত হইলে তাঁহাকে নবাবের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, এবং তথায় বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি

দাসবংশ বলিয়া খ্যাত।[১] বর্ত্তমান মহকুমা মাগুরার অপর পারে নান্দুয়ালী গ্রামে তাঁহাদের বাস। উঁহাদের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, ১১২৮ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে (অর্থাৎ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীগোপাল বিগ্রহের নামে নলডাঙ্গা হইতে দেবোত্তর পান। মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত ও জমীদারী বন্দোবস্তও ঐ বৎসর হয়। ঐ বৎসরই রামদেবের সহিত নলডাঙ্গার জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। উহার কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ বাটীতে যে শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা দেখিয়াছি। উহার গায়ে যে ইষ্টক-লিপি আছে, তাহা এই :

পঞ্চেষু তর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
নত্বা পুরারেশ্চরণারবিন্দে।
শ্রীকৃষ্ণদাসেন শিবপ্রিয়েণ
নিরমায়ি যত্নান্মঠঃ শিবস্য॥ শকাব্দ ১৬৫৫

[পঞ্চ = ৫, ইষু = ৫, তর্ক = (ষড়দর্শন) ৬, ইন্দু = ১; অঙ্কের বামা গতিতে ১৬৫৫ শক বা ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ হয়] অর্থাৎ ১৬৫৫ শকাব্দে পুরারি মহাদেবের চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া শিবভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস যত্ন করিয়া এই শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। রাজা রামদেব কৃষ্ণচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত নিষ্কিঞ্চন কর্ম্মচারী তাহা লইতে স্বীকার করেন নাই। বাস্তবিকই তাঁহার আত্মোৎসর্গ ভূমি-মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না। রাজা কিছুতেই না ছাড়িলে, কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য সামান্য ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

নির্ম্মম নির্য্যাতন ভোগ করেন। অবশেষে কৃষ্ণরামের চরিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হইয়া নবাব সে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও কৃষ্ণরামকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করেন। উহা হইতেই কীর্ত্তিপাশার বিখ্যাত জমিদারীর প্রতিষ্ঠা। প্রসিদ্ধ লেখক ৺রোহিণীকুমার সেন মহাত্মা কৃষ্ণরামেরই কীর্ত্তিমান বংশধর। নলডাঙ্গায় কৃষ্ণচন্দ্র যাহা করেন, সেলিমাবাদে কৃষ্ণরামও তাহাই করিয়াছিলেন। উভয়েই বৈদ্য সন্তান, উভয়েরই প্রভুভক্তি ও মহাপ্রাণতা দেশের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।—'বাকলা', ২৩৭-৪৩ পৃ।

১ এই বংশীয়েরা এখনও নান্দুয়ালীতে বাস করিতেছেন, বংশ-ধারা এই : শ্রীকৃষ্ণদাস—মৃত্যুঞ্জয়—শিবনাথ—শম্ভু ও জয়চন্দ্র, শম্ভুর পুত্র কাশীনাথ নিঃসন্তান। জয়চন্দ্র—কালীনাথ—জনার্দ্দন—প্রফুল্লকমল (জীবিত)।

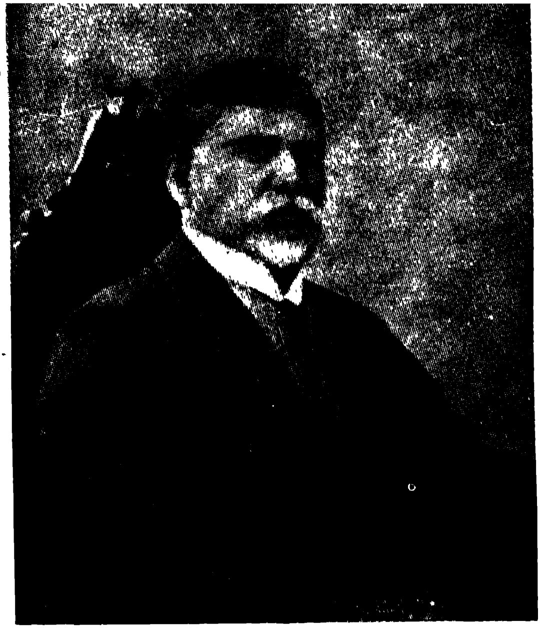
২ *Naldanga Raj Family*. p. 73.

১৭২৭ অব্দে রামদেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রঘুদেব রাজ্য পান। তিনিও পিতার মত যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করেন। ১৭৩৭ অব্দে নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে রঘুদেব একটি সরকারী তলব অমান্য করিয়া রাজ্যচ্যুত হন। কিন্তু অচিরে সরফরাজ খাঁর সময়ে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পিত হয়।[১] এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে মারহাট্টাদিগের উৎপাত, অর্থাৎ 'বর্গীর হাঙ্গামা' উপস্থিত হয়। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বর্দ্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হন, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন বর্গী সৈন্যদল অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া বর্দ্ধমানে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলে, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা চিত্রসেন পলায়নপূর্ব্বক নলডাঙ্গায় আসিয়া রাজা রঘুদেবের আশ্রয় লন। সেই সময় তিনি তৈলকুপি গ্রামের একাংশে গড়কাটা অস্থায়ী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল বাস করেন। বেগবতী নদীর অপর পারে ঐ বাড়ী, গড় ও মৃত্তিকাপ্রোথিত শিবমন্দিরের চিহ্ন এখনও আছে। তাহারই সন্নিকটে রাজা চিত্রসেন গুঞ্জানাথ শিবলিঙ্গের জন্য যে সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত মন্দির নির্ম্মাণ কবেন, তাহা এখন তাঁহার কীর্ত্তি ও স্মৃতি সজীব রাখিয়াছে।[২] চিত্রসেন পাগড়ী বদল করিয়া রঘুদেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রঘুদেবের মৃত্যু হয়।

অপুত্রক রঘুদেবের জমিদারী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেবের হস্তগত হয়। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে। মন্বন্তরের সময়ে কৃষ্ণদেব তাঁহার প্রজাবর্গের যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে রাণী রাজরাজেশ্বরীর গর্ভে মহেন্দ্র ও রামশঙ্কর নামক দুই পুত্র এবং রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়ার গোবিন্দ নামক এক দত্তক পুত্র ছিল। কৃষ্ণদেব মহেন্দ্র ও রামশঙ্করের প্রত্যেককে বিষয়ের ⅜ অংশ এবং গোবিন্দদেব রায়কে ¼ অংশ দিয়া যান। কৃষ্ণদেবের দেওয়ান ছিলেন নিকটবর্ত্তী পদ্মাবিলা নিবাসী বুধই বিশ্বাস; ইনি জাতিতে মুসলমান; লেখাপড়ায় বিশেষ সুশিক্ষিত না হইলেও বুধই বিশ্বাস বুদ্ধিমান ও

১ Westland, *Jessore*, p. 44.

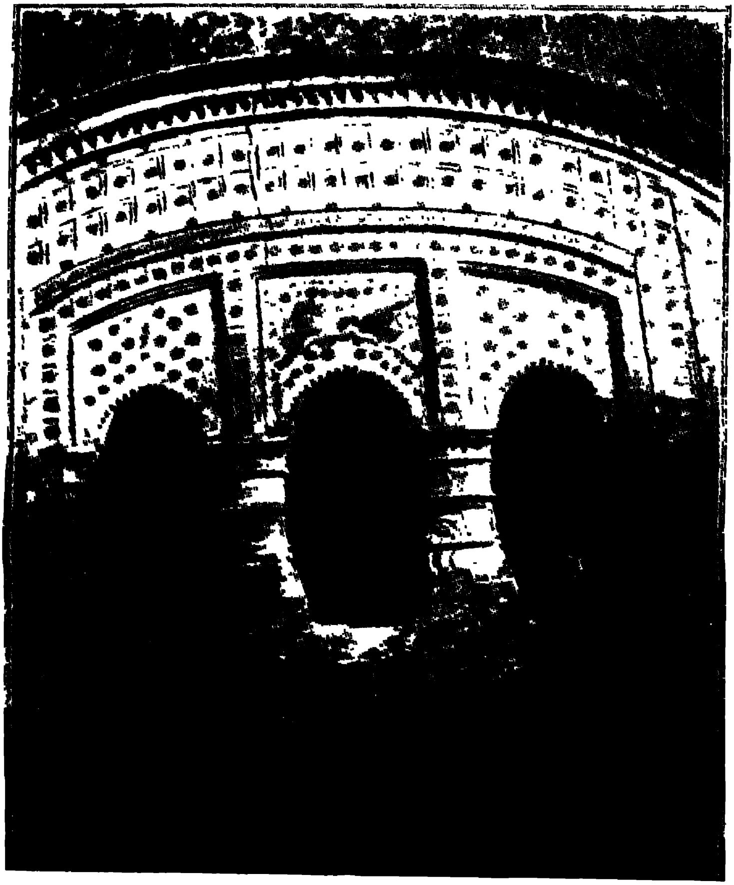
২ গুঞ্জনাথের মন্দির এক্ষণে ভগ্নদশাগ্রস্ত। মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৮×২৮´ ফুট; পূর্ব্বদিকে উহার সদর, চারিধারে উহার বারান্দা আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের বারান্দাই খোলা, সেদিকে দুইটি স্তম্ভের উপর তিনটি খিলান। বারান্দার বিস্তৃতি ৫´-৬´´। রাজা চিত্রসেন মন্দিরের সেবা ব্যবস্থার জন্য বৃত্তি দিতেন; মহারাজাধিরাজ তিলক চাঁদ বৃত্তি কমাইয়া দিলেও মহতাব চাঁদের সময় পর্য্যন্ত উহা বহাল ছিল। গুঞ্জানাথ শিবের নামে গ্রামটির নাম হইয়াছে গুঞ্জানগর।



রাজাবাহাদুর প্রমথভূষণ দেব রায়, নলডাঙ্গা



নলডাঙ্গা রাজবাটী



অভয়নগরের বড় মন্দির

সুদক্ষ কর্ম্মচারী। তিনি জমিদারীর যেমন সুব্যবস্থা করেন, নিজেও বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হন।[১] ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বুধই বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে প্রথমতঃ গোবিন্দদেব রায়ের ৵৪ অংশ, অর্থাৎ তেয়ানী জমিদারী বাটোয়ারাসূত্রে পৃথক্ হইয়া যায়। অবশিষ্ট ৷৵১৬ অংশ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এজমালী সম্পত্তি থাকিয়া পরে বিভক্ত হয়। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রবর্ত্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' নূতন নিয়মানুসারে সমস্ত রাজস্ব আদায় না হওয়ায় বঙ্গের বহু জমিদারী প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইতে থাকে। গোবিন্দদেব রায়ের তিন আনী অংশ প্রথম ১৮০০ অব্দে নিলাম হয় ও পরে বহু হাত বদলাইয়া, উহা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকারে আসে। বড় রাজা মহেন্দ্রদেবেরও নানাবিধ খামখেয়ালী অপব্যয় ও অযত্নে তাঁহার ।৵৮ গণ্ডা অংশও নিলামে চড়ে, এবং তাহাও ক্রমে নড়াইলের বাবুরা খরিদ করিয়া লন। কেবল মাত্র রামশঙ্করের ।৵৮ অংশ তাঁহার অধিকারে থাকে

১ পদ্মবিলায় এখনও বুধই বিশ্বাসের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী আছে। তাঁহার পুত্র সলিমুল্যা চৌধুরী বহুধন দৌলত পাইয়া বিলাসে আত্মবিক্রয় করেন। তিনি এক নিম্ন জাতীয় হিন্দু-রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিকা করিয়া আনেন, তখন উঁহার নাম হয়, বিবি আসরফ উন্নিসা। সলিমুল্যা ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী মুরারিদহ গ্রামে নবগঙ্গার মধ্যপর্য্যন্ত বিস্তৃত এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বিবির সঙ্গে তথায় বাস করেন। সে বাড়ী এখনও আছে এবং উহার গায়ে (সম্ভবতঃ হিন্দু-রাজমিস্ত্রীর উদ্যোগে) লিখিত আছে :

'শ্রীশ্রীরাম। মুরারিদহ গ্রাম ধাম, বিবি আসরফনেছা নাম, কি কহিব পুরীর বাখান।
ইন্দ্রের অমরাপুরী, নবগঙ্গার উত্তরধারি, ৭৫০০০ টাকায় করিল নির্ম্মাণ ॥
এদেশে কাহার সাধ্য, নদীর বাঁধিয়া অর্দ্ধ, জলমধ্যে কমল সমান।
কলিকাতার রাজচন্দ্ররাজ, ১২২৯ সুরু করি কাজ, ১২৩৬ সালে সমাপ্ত দালান ॥'

বাড়ীটি দেখিতে সুন্দর, বিচিত্র ও শক্ত; এবং নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই উল্লেখযোগ্য। সলিমুল্যার মৃত্যুর পর, বিবি যশোহর-জেলার জনৈক হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী বিশ্বেশ্বর সিংহের নিকট এই বাড়ী ও জোত জমি বন্ধক দিয়া ৪২ হাজার টাকা ধার করেন এবং উহা শোধ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন বন্ধকী সম্পত্তি বাদে সমস্ত অস্থাবর গভর্ণমেণ্টের হাতে যায়। বিশ্বেশ্বর সপরিবারে আসিয়া মুরারিদহের বাটীতে বাস করেন ও প্রায় সকলেই ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন কেবল তাঁহার অপগণ্ড পৌত্র রাজেন্দ্র লাল কনিষ্ঠা ভগিনীসহ মাতুলের তত্ত্বাবধানে তথায় বাস করিতেছেন। সম্পত্তির ॥/০ অংশ চাপালির কর মহাশয়দিগের হস্তগত হইয়াছে।

এবং তিনিই মাত্র রাজা বলিয়া পরিচিত হন। মহেন্দ্র ও গোবিন্দদেব রায়ের বংশধরগণ রাজ্যহারা হইয়া রাজা উপাধিতে বঞ্চিত হন। এখন তাঁহাদের বংশধরগণ কেবল মাত্র সামান্য দেবোত্তর ও বৃত্তি-সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া বহু পরিবারে নির্জীবভাবে নলডাঙ্গার পুরাতন ভগ্ন গৃহাবলীতে বাস করিতেছেন। আর তাঁহাদিগের পৈতৃক মামুদশাহী পরগণার ॥৴১২ গণ্ডা অংশ এক্ষণে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকৃত। উক্ত বাবুদের সম্পত্তির মধ্যে উহাই সর্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর রামশঙ্করের বংশধর।

রাজা রামশঙ্করের জীবদ্দশায় তৎপুত্র মোহনচাঁদের মৃত্যু হয় (১৮১১)। তাঁহার অল্পবয়স্কা বিধবা পত্নী রাণী তারামণির একটি শিশু পুত্র থাকে, তাহার নাম শশিভূষণ। ১৮১২ অব্দে রামশঙ্করের মৃত্যু হইলে, তৎপত্নী রাণী রাধামণি সতী-ধর্ম্ম পালন করিয়া স্বামীর চিতায় তনুত্যাগ করেন। তখন দশ মাসের শিশু শশিভূষণ রাজ্যের অধিকারী হন এবং সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে যায়। ১৮৩০ অব্দে শশিভূষণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জমিদারী গ্রহণপূর্ব্বক সুন্দর ও সুনিপুণ ভাবে প্রজা পালন করেন এবং অল্পদিন মধ্যে এক নাবালক দত্তকপুত্র রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (১৮৩৪)। পুনরায় জমিদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৫৩ অব্দে উক্ত দত্তকপুত্র রাজা ইন্দুভূষণ স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং কতকগুলি সৎকার্য্যে দান করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামশঙ্করের সময় হইতে এই বংশের রাজোপাধি এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। ইন্দুভূষণ বহু কষ্টে মুর্শিদাবাদ রাজ-দপ্তর হইতে চণ্ডীচরণের রাজ-সনন্দের প্রতিলিপি আনিয়া, উহা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নূতন খেলাত ও সনন্দ পান। তিনি ১৮৭০ অব্দে অল্প বয়সে ত্রিবেণীতে গঙ্গালাভ করিলে, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক দত্তকপুত্র প্রমথভূষণ সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু জমিদারী পুনরায় কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৭৯ অব্দে রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সম্পত্তি হস্তে লন এবং তদবধি ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল কৃতিত্বের সহিত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি ও খেলাত পাইয়া (১৯১৩) সম্মানিত হইয়াছেন। প্রমথভূষণই যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে একমাত্র সনন্দধারী রাজা।

রাজা শশিভূষণের সময় নলডাঙ্গার সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয়; তিনি সাচানি,

কনোজপুর, প্রতাপপুর ও কুশবাড়িয়ার অর্দ্ধাংশ খরিদ করেন। তৎপুত্র ইন্দুভূষণের সময় খামরাইল তালুক অর্জ্জিত হয়। রাজা প্রমথভূষণ নীলকুঠীর অধ্যক্ষ সেল্‌বী (Mr. Selby) সাহেবের আমলের নহাটা কুঠি ও সম্পত্তি খরিদ করেন।[১] রাজা ইন্দুভূষণের নাবালক অবস্থায় তাঁহার পিতামহী রাণী তারামণি দেবী রাজবাটী নলডাঙ্গা হইতে জগন্নাথপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন এবং তিনিই গুঞ্জানাথ শিবের নামে জগন্নাথপুরের নাম গুঞ্জানগর রাখেন। রাজা ইন্দুভূষণের সময় বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত ও জলাশয় খনিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে কতকগুলি হস্তী দিয়া সাহায্য করেন। রাজা ইন্দুভূষণ সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তৎপুত্র রাজা প্রমথভূষণ সুবক্তা, কৃতবিদ্য, শিল্পকুশল ও কর্ম্মদক্ষ নৃপতি। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, দেশের ও দশের কথা জানেন, দেশীয় শিল্পের সমাদর করেন এবং সর্ব্বদা নিজ বাটীতে কল কারখানা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তিনি একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল, চতুষ্পাঠী ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন; তিনি পিতার নামে যশোহর স্কুলে 'ইন্দুভূষণ' বৃত্তি এবং মাতার নামে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য 'মধুমতী' বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি মাত্র পুত্র—কুমার পন্নগভূষণ ও কুমার মৃগাঙ্কভূষণ, উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং কৃতবিদ্য।

নলডাঙ্গা রাজ্যের এক্ষণে দুইটি প্রধান বিভাগ—সদর জমিদারী ও নহাটা সম্পত্তি। উভয় সম্পত্তির সেস্ সমেত হস্তবুদ মোট আদায় ৩,০০,১৩১ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্বাদি বাবদ দেয় ১,৬২,০৩৭ টাকা; সুতরাং আনুমানিক বাৎসরিক লভ্য ১,৩৮,০৯৪ টাকা। উভয় সম্পত্তির জন্য দেয় রাজস্বাদির পৃথক্ পৃথক্ হিসাব দিতেছি: (১) সদর জমিদারী, গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৫০,৩৯৯ টাকা, ঐ সেস্ ১৪,৭৮৮ টাকা; অন্য মালেকের খাজনা ৩৬,৭৪৩ টাকা, ঐ সেস্ ২,৩৩৮ টাকা। মোট দেয় ১,০৪,২৬৮ টাকা। (২) নহাটা সম্পত্তি—গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ৩০২ টাকা, ঐ সেস্ ২০৬ টাকা; অন্য মালেকের খাজনা ৫২,২৩৩ টাকা, ঐ সেস্ ৫,০২৮ টাকা, মোট ৫৭,৭৬৯ টাকা। উভয় সমষ্টি ১,৬২,০৩৭ টাকা।

১ সেল্‌বী সাহেবের সম্পত্তি অন্য সাহেব কোম্পানির নিকট বিক্রীত হয়। রাজা প্রমথভূষণ ১৮৯২, ২৯ জুন তারিখে উক্ত সম্পত্তি E. A. Thurburn, William Lyon and John Thomas & Co.-এর নিকট হইতে ১,৬০,০০০ টাকায় খোস কোবালায় খরিদ করেন।

আজকাল সামান্য জমিদার বা তালুকদার পর্য্যন্ত দেশ ছাড়িয়া সহরে বাস করেন। প্রজারা বৎসরের মধ্যে কখনও ভূস্বামীকে দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। রাজা প্রমথভূষণ সে প্রকৃতির ব্যক্তি নহেন। তিনি বার মাস দেশে থাকিয়া প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত যশোহরকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। পরন্তু নিজের দেশকে স্নেহের কোলে টানিয়া লইয়া, তিনি প্রকৃত স্বদেশ-ভক্তের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সে আদর্শ বোধ হয় বঙ্গের সকল ভূম্যধিকারীরই অনুকরণীয়। এজন্য রাজা বাহাদুর গভর্ণমেণ্টের নিকটও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।[১]

আখগুল বিষ্ণুদাসের তপোবলে নলডাঙ্গা জমিদারীর ভিত্তি-পত্তন হইলেও সন্ন্যাসী ব্রহ্মাণ্ডগিরির কৃপাবলেই এ বংশের রাজ-শ্রী-লাভ ঘটিয়াছিল। তিনিই নলডাঙ্গার ইষ্টদেবতা ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন; এখনও নলডাঙ্গায় সর্ব্বত্র বহু প্রসঙ্গে তাঁহারই নাম কীর্ত্তিত হয়। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা না বলা হইলে এ বংশের ইতিহাস শেষ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, তিনি বহুবার নলডাঙ্গায় আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা বলা হয় নাই। এইবার তাহা বলিব। সন্ন্যাসী ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মানন্দ গিরি নবগঙ্গা তীরে আঠারখাদার অন্তর্গত কালিকাপুর আশ্রমে অবস্থান করিতেন। কখন সেখানে আসেন, অগ্রে নলডাঙ্গায় আসিয়া পরে সেখানে যান কিনা, এ সব প্রশ্নের কোন সমাধান করা যায় না। বর্ত্তমান মহকুমা মাগুরার অপর পারে প্রায় দেড় মাইল দূরে কালিকাপুর, উহা সাধারণতঃ কালিকাতলার শ্মশান বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, অতি

১ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে রাজা প্রমথভূষণকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধির সনন্দ প্রদানকালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল যে প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

'You have always been ready to help the local authorities with advice based on your ripe experience and intimate knowledge of the District to which you belong, you like the life of a country gentleman of the best type and as a resident landlord you have made good use of your opportunities and have taken an enlightened interest in the well-being of your tenantry and in the encouragement of indigenous industrial enterprises. You have well merited the higher personal title of Raja Bahadur which I hope you will long live to enjoy.' আমরাও সেই প্রার্থনা করি।

প্রাচীনকাল হইতে এই শ্মশানে একটি মঠ এবং ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার যন্ত্রাঙ্কিত শিলাখণ্ড ও কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক সময়ে রঙ্গমাচার্য্য নামে চট্টগ্রাম প্রদেশের এক সন্ন্যাসী তথায় মঠ-স্বামী ছিলেন। বহুকাল পরে যখন ব্রহ্মাণ্ড-গিরি নলডাঙ্গার অধীশ্বর শ্রীমন্ত রায় বা রণবীর খাঁকে দীক্ষিত করেন, সেই সময়ে তিনি এই কালিকাপুর মঠে বাস করেন। তখন পূর্ব্ববর্ত্তী মঠ-মন্দির হীনাবস্থায় পড়িয়াছিল। গুরুর আদেশে রণবীর কালিকাপুরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রকাণ্ড মন্দির ও সাধুদিগের বাসোপযোগী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ২৫০ বিঘা নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরি বহুকাল জীবিত ছিলেন। রাজা চণ্ডীচরণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও সুরনারায়ণ সকলেই তাঁহার শিষ্য। তাঁহারই আদেশে ইন্দ্রনারায়ণের সময় নলডাঙ্গাতে কালিকাপুরের অনুকরণে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্ম্মিত ও সুরনারায়ণের সময় উঁহার পূজার ব্যবস্থা হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ব্রহ্মাণ্ডগিরির অন্তর্ধানের পর কালিকাপুর মঠের দিকে পরবর্ত্তী রাজাদিগের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। মঠস্বামীদিগের নিযুক্ত গোমস্তাদিগের অযত্ন ও স্বার্থপরতার জন্য যেন ক্রমে উহার পূজাদির অব্যবস্থা এবং মঠের দুরবস্থা হইতে থাকে। শিলাখণ্ডখানি অপহৃত হয়, মন্দিরাদি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হয়, পূজার ঘটটি পর্য্যন্ত স্থানান্তরে নীত হইয়া কোন প্রকারে রীতি-রক্ষা হইতে থাকে। মঠের স্থানটি পর্য্যন্ত নিজের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া কত জনে লাভবান হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দৈবপ্রতিবন্ধকতায় উহা সফল হয় নাই। সকলেই কালগ্রস্ত বা নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছেন। এজন্য স্থানটি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে।

প্রায় দুই শত বর্ষ পরে, আজ সাত আট বৎসর হইল অমলানন্দ নামক একজন ব্রাহ্মণ সাধু সন্ন্যাস দীক্ষা লইবার পর স্বপ্নাদেশ অনুসারে এই স্থানে আসিয়া পুনরায় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।[১] ৺মায়ের কৃপাকটাক্ষপাতে আবার

১ অমলানন্দের পূর্ব্বনাম নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। তিনি সেই নামেই পরিচিত এবং আঠারখাদায়ই তাঁহার নিবাস ছিল। খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান গোবিন্দচন্দ্র ক্ষীরগ্রাম হইতে আসিয়া আঠারখাদার চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। এই চক্রবর্ত্তী বংশে মনোহর চক্রবর্ত্তী নামক একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। গোবিন্দের পুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র পার্ব্বতীচরণ, তৎপুত্র গোপালানন্দ ও নৃত্যগোপাল। গোপালানন্দ সন্ন্যাসী; নৃত্যগোপাল নিজ মাতুল বিমলানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা লন এবং পরে সেই গুরুরই

কালিকাপুর জাগিয়াছে। অমলানন্দ কালিকাপুর মঠের প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর নূতন পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ী কালিকা প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন। দুইটি শব-শিশু স্কন্ধে করিয়া নীলবরণী শ্যামা শিব-বক্ষে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার ভীষণা মূর্ত্তির অন্তরাল হইতে দিব্য করুণ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে।[১] আমার যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে এই ভাবের এমন মূর্ত্তি আর নাই। মূর্ত্তির উপর প্রাচীরে উৎকীর্ণ আছে :

'কৃষ্ণেণ বলভদ্রেণ গোপৈঃ কংস-জিঘাংসুভিঃ
সঙ্কেতকং কৃতং তত্র মন্ত্রনিশ্চয়কারকম্।
তদা সঙ্কেতকৈঃ সা চ সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠিতা
সিদ্ধিপ্রদা ভোগদা চ তেন সিদ্ধেশ্বরী স্মৃতা॥'

সাধুজী বলেন অতি পূর্ব্বকালে প্রাচীন মন্দিরে এই শ্লোকটি ইষ্টক-ফলকে লেখা ছিল। সে কথার মূল কি, জানি না। যাহাই হউক, সিদ্ধেশ্বরী মাতার পূজা-প্রণালী দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কালিকাপুরের মহাশ্মশানে আবার আশ্রম খুলিয়াছে ; সাধু, সন্ন্যাসী বা অভ্যাগতের আশ্রয়ের জন্য আবার সে আশ্রম উন্মুক্ত হইয়াছে। শুনিয়াছি, আধুনিক সেটেল্‌মেণ্টের নির্দ্ধারণে এই মঠের নিষ্করের কতকাংশের উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু উহার কত অংশ মায়ের ভোগে লাগিবে, তাহা জানি না। সে নিষ্কর নলডাঙ্গা রাজবংশের একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। সে দিকে রাজা বাহাদুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি ?

আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। নৃত্যগোপাল ৺শীতলা দেবীর ভক্ত সাধক। তিনি বসন্তরোগের অতি সুন্দর চিকিৎসা করেন ; তজ্জন্য তিনি মাগুরা অঞ্চলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

১ কালিকা দেবীর ধ্যানে 'কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্' অংশে শব স্থলে শর এই পাঠান্তর আছে। সেজন্য শবযুগল কর্ণভূষণরূপে মূর্ত্তিতে দেওয়া হয় না। ধ্যানান্তরে কিন্তু স্পষ্টতঃ 'বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্' অর্থাৎ মাতা দুইটি মৃত শিশুদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, এইরূপ আছে। এখানে সেই ধ্যানের মূর্ত্তি সুন্দর প্রকটিত হইয়াছে।—'বৃহৎতন্ত্রসার', ২৩৯ পৃ।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁচ্‌ড়া রাজবংশ

চাঁচ্‌ড়ার রাজ-বংশীয়েরা বাৎস্য গোত্রীয় 'সিংহ' উপাধিধারী উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ। তাঁহারা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো-কান্দী হইতে এতদঞ্চলে আসেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস গৌরবময়। সংক্ষেপে সেই কথা অগ্রে বলিয়া লইব। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুল-কারিকা হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাৎস্য গোত্রীয় অনাদিবর সিংহ অযোধ্যা হইতে আসিয়া উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত সিংহেশ্বর গ্রামে বাস করেন।[১] মোগল আমলে এই স্থান সরিফাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ফতেসিংহ পরগণা বলিয়া উল্লিখিত।[২] অনাদিবর অশেষ গুণান্বিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।[৩] অনাদিবর হইতে নবম পুরুষ ব্যাস সিংহ বল্লাল সেনের সহিত আহার-ব্যবহারে অস্বীকৃত হওয়ায় করাতের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হন। এজন্য তাঁহার নাম 'করাতিয়া' ব্যাস। তৎপুত্র বনমালী সিংহ বন কাটিয়া কান্দীতে বসতি করেন। বনমালীর পৌত্র বিনায়ক ঐ প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। পরে রাজা বিনায়কের বংশীয় ছয় জন এবং ঘোষ বংশীয় ছয় জন, এই বার জন মাত্র উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে মুখ্য কুলীন বলিয়া গণ্য হন। ক্রমে এই সব কুলীনগণ কান্দী, জেমো, পাঁচথুপী প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং এই সকল স্থান উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থান হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ বংশীয় সবিতা রায় মানসিংহের সাহায্য জন্য পুত্রপৌত্রসহ বঙ্গে আসেন এবং কিছুদিন পরে এই ফতেসিংহ পরগণার রাজা হন।[৪] সবিতা রায় যে সকল

১ 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' (নিখিলনাথ), ১৫১ পৃ।

২ *Ain.*(Jarret), Vol. II, p. 140.

৩ 'রাণা ভূপাল পুত্রশ্চ রাণা গোপাল সংজ্ঞকঃ। তস্যাত্মজোঽনাদিবরসিংহ খ্যাতো মহাবলী॥ ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ জিতেন্দ্রিয়ঃ সদাশয়ঃ। মহাধনুর্দ্ধরো বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলাধিপঃ॥ রাজকার্য্যপরিজ্ঞাতা সর্ব্বকার্য্যবিশারদঃ।'—পঞ্চাননের কুল-কারিকা, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্যকাণ্ড, ১২৭ পৃ।

৪ 'কায়স্থাবনিপালঃ শূরসয়িদান্ যুদ্ধে তথা হড্‌ডিপান্।
ফতোসিংহমুখক্ষিতারধিকৃতো জাতোহি জিত্বৈব তান্॥'
—পুণ্ডরীক-কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা

যে বিস্তীর্ণ দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (২৪৫-৬ পৃ)।

মানসিংহ যখন সসৈন্যে প্রতাপের বিরুদ্ধে আসেন, তখন মহতাবরাম তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য লইয়া গিয়া তাঁহার সাহায্য করেন (৩৫২ পৃ)। মোগলের কর্ম্মচারী হিসাবে ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল; ভবানন্দের মত তাঁহার স্কন্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতার দোষ চাপাইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রতাপের সহিত সন্ধি করিয়া যখন মানসিংহ প্রত্যাগমন করেন, সম্ভবতঃ তখনই মহতাব রাজোপাধি পান। বংশ-পরম্পরায় যেমন ক্রমে ক্রমে যশোর-রাজ্যের অধিকাংশ পরগণা মহতাবের বংশধরদিগের করায়ত্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং নূরনগর রাজবংশের পতন হইয়া গেল, তখনই তাঁহারা 'যশোহরের রাজা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। প্রতাপের পতনের পর ১৬১০ খৃষ্টাব্দে যখন ইনায়েৎ খাঁ যশোহর রাজ্যের প্রথম ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন, তখন মহতাবরামের কিল্লাদার পদ আর রহিল না এবং তাঁহার নিষ্কর জায়গীরও বন্ধ হইল। তখন ইসলাম খাঁ মহতাবের জায়গীর প্রকৃতভাবে জমিদারীতে পরিণত করিয়া দিয়া তাহার রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ৭ বৎসর এইভাবে রাজস্ব সরবরাহ করিয়া রাজত্ব করার পর মহতাব রায়ের মৃত্যু হয় (১৬১৯)।[১] তিনি পৈতৃক ৪ পরগণার জমিদার ছিলেন।

মহতাব রায়ের কন্দর্প, গোপীনাথ, মধুসূদন, শ্রীরাম ও রাজারাম এই পাঁচ পুত্রের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কন্দর্প জ্যেষ্ঠ এবং তিনিই রাজ্যাধিকারী হন। অন্য পুত্রগণের সন্তান ছিল কিনা জানা যায় না। কন্দর্প রায় ১০২৭ হইতে ১০৬৫ সাল পর্য্যন্ত (১৬১৯-৫৮) ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেন।[২] তিনি পৈতৃক আমলের চারি পরগণা ব্যতীত আর পাঁচটি পরগণা নূতন লাভ করেন—দাঁতিয়া ও ইস্‌লামাবাদ (১৬৪৩), খলিসাখালি (১৬৪৭), বাগমারা ও সাহাজাতপুর। সুতরাং তাঁহার মোট জমিদারী ৯ পরগণা। কন্দর্প রায়

---

১ 'During the last seven years of his tenure, it is recorded that he had to pay revenue on account of his lands, which apparently had not before been assessed.'—Westland, *Jessore*, p. 45.

২ ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব কন্দর্পের রাজত্ব ১৬৪৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালা ১০৬৫ সালকে ভ্রমক্রমে ১০৫৬ ধরিয়া লইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন কাগজে কন্দর্প রায়ের রাজত্ব ৩৯ বৎসর বলিয়া লিখিত আছে।

বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার সহিত সাক্ষাৎ ও উপহার প্রদান করিয়া বৰ্দ্ধিত সম্পত্তির সনন্দ গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র জমিদারকে পৃথকভাবে রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইবে না; ঐ সকল জমিদারী নিকটবৰ্ত্তী একজন প্রবল জমিদারের সামিল করিয়া দেওয়া হইত, রাজস্ব তাঁহার হস্তে দিতে হইত এবং তিনি ঐ রাজস্ব নবাব সরকারে দিতেন। অনেক সময় ক্ষুদ্র জমিদারদিগের রাজস্ব বাকী পড়িলে, তিনি বাকী টাকার জন্য জমিদারী কোবলা করিয়া লইয়া নিজেই রাজস্বের সরবরাহ করিতেন। এইভাবে অনেক জমিদারী প্রবল জমিদারের হাতে আসিত। কন্দর্পের পাঁচ পরগণাও এইভাবে অৰ্জ্জিত হয়।[১]

রাজা কন্দর্প রায় খেদাপাড়া হইতে উঠিয়া আসিয়া ইমাদপুর পরগণার অন্তর্গত চাঁচ্ড়া গ্রামে বসতি করেন। সুতরাং চাঁচ্ড়া রাজধানীর তিনিই স্থাপয়িতা। কথিত আছে, তিনি স্বপ্নাদেশে এইস্থানে আসিয়া একটি প্রাচীন ৺কালীতলার কাছে রাজধানীর স্থান নির্দ্ধারণ করেন।[২] চাঁচ্ড়া একটি সদর স্থান; উহার পার্শ্ববর্ত্তী মুড়লী প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত সহর; ভৈরব তখন বেগবান প্রবল নদ; মুড়লী হইতেই খাঁজাহান আলির দুইটি রাস্তা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ মুখে গিয়াছিল; এখনও চাঁচ্ড়া হইতে খেদাপাড়া দিয়া ত্রিমোহানী পৰ্য্যন্ত ঐ রাস্তা বর্ত্তমান আছে। ঐ রাস্তায় উত্তরমুখে আসিলে ভৈরবের অদূরে চাঁচ্ড়াই নির্ব্বাচন করিবার মত উপযুক্ত স্থান। কন্দর্প রায় যেখানে রাজধানী করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, তাহার নিকটে চাঁদ খাঁ নামক এক মুসলমান তালুকদারেরর বিস্তৃত গড় বেষ্টিত বাড়ী ছিল; তিনি অবশ্য কন্দর্প

১ প্রাচীন কাগজপত্রে পরগণা দাঁতিয়ার ইতিবৃত্ত ঠিক এইরূপ লিখিত আছে: 'সাবেক জমিদার আরজান উল্যা চৌধুরী (নগরঘাট) ৷।৴৹ আনা অংশ, পরুষরাম মিত্র ৴৹ আনা ও রুক্মিনি কান্ত মিত্র ৵৹ আনা ষোল আনা এই ৩ জনের ছিল, কন্দর্প রায়ের সামিল ছিল পরে অনেক কর বাকি পড়িলে সরবরাহ করিতে না পারিলে বাকিতে কবলা লিখিয়া দিলেন ১০৪৯ সাল।' অন্যান্য পরগণা দখলেরও এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, সবই একরকম, সুতরাং উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

২ এখনও সেই কালীতলার প্রকাণ্ড প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। তেমন পুরাতন বৃক্ষ এ দেশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। উহারই পার্শ্বে রাস্তার গায়ে যে পুকুরটি আছে, তাহার নাম কালীসাগর। বটবৃক্ষের অনতিদূরে কন্দর্প রায়ের আমলের কালীমন্দির আছে, সেখানে দেবীমূর্ত্তি না থাকিলেও ঘটে নিত্য পূজা হয়।

রায়ের অধীন স্বত্বাধিকারী, কারণ ইমাদপুর পরগণা বহুদিন হইতে ভবেশ্বরের জমিদারীভুক্ত। কন্দর্প রায় চাঁদ খাঁকে স্থানান্তরিত করিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে রাজবাটীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রত্যেক দিকে প্রায় সিকি· মাইল হইবে। উহার চারি পার্শ্বে প্রায় ৫০।৬০ ফুট বিস্তৃত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। তাহার কোন কোন অংশে এখনও জল থাকে। চাঁদ খাঁর গড়কাটা বাড়ী এখন ফলবৃক্ষের বাগান, উহার চারিধারে গড় এবং মৃত্তিকার উচ্চ ঢিপি রহিয়াছে।

প্রতাপের পতনের পর যজ্ঞেশ্বর আসিয়া মহতাবরামের সহিত যোগ দেন। তৎপূর্ব্বে শ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার বৃত্তির মহল অধিকৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৈদপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণা চাকরীর জন্য ভবেশ্বরের জায়গীর; তাঁহার মৃত্যুর পর সে চাকরীতে তৎপুত্র মহতাবই বহাল হইয়াছিলেন, সুতরাং জায়গীরও তাঁহার হয়। ইস্‌লাম খাঁ নবাবের সময় ঐ জায়গীরই জমিদারী স্বরূপ মহতাবের সম্পত্তি হইয়াছিল; সুতরাং এ সম্পত্তিতে যজ্ঞেশ্বরের কোন প্রাপ্য অংশ ছিল না। এজন্য তিনি বা তাঁহার পুত্র অংশ ভাগী হইতে পারেন নাই। তবে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসারভুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ কন্দর্প রায় যখন চাঁচ্‌ড়ায় উঠিয়া আসেন, তখন যজ্ঞেশ্বর জীবিত ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে চাঁচ্‌ড়া রাজবাটীতে কারুকার্য্যযুক্ত সুন্দর বাঙ্গালা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে তাঁহার ইষ্ট-দেবতা শ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট কাল ধর্ম্মসাধনায় কাটাইয়া দেন।

এখনও শ্যামরায় বিগ্রহ আছেন, কিন্তু সে সুন্দর জোড় বাঙ্গালা নাই। বাড়ীতে পূর্ব্ব পোতার একটি আধুনিক মন্দিরে তাঁহার পূজা হয়। চাঁচ্‌ড়া রাজ-বংশের অনেক জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের প্রদত্ত শ্যামরায়ের দেবোত্তর এখনও আছে এবং সিদ্ধ নিষ্কর স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। শ্যামরায় কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূর্ত্তি, তৎসহ রাধিকা নাই। আজ চাঁচ্‌ড়া রাজবংশের হীনদশা হইলে কি হয়, শ্যামরায়ের সেবা রাজোচিত ভাবেই চলিতেছে।[১] যজ্ঞেশ্বর এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র চাঁচ্‌ড়াতে বাস

১ ৺শ্যামরায়ের পূজায় প্রাতে ৩০ সের চাউলের নৈবেদ্য হয় এবং তদুপযোগী দ্রব্যাদি থাকে। পূজান্তে সে নৈবেদ্য ভাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী ১০।১১ ঘর ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বিতরিত হয়। বিকালে

করেন। তাঁহাদের বসতি বাটীর ভিট্টা এখনও আছে। যজ্ঞেশ্বরের প্রপৌত্র গোবিন্দ রায় চাঁচ্ড়া ত্যাগ করিয়া লাউড়ী গ্রামে এবং তৎপুত্র রামেশ্বর সাঁড়াপোলে আসিয়া বাস করেন।[১] যজ্ঞেশ্বরের বংশধরেরা এক্ষণে সাঁড়াপোল, খড়িঞ্চি, মণ্ডলগাতি ও রূপদিয়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজা কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার একমাত্র পুত্র মনোহর রায় রাজতক্তে বসেন। তিনি ১০৬৫ সাল হইতে ১১১২ সাল পর্য্যন্ত (১৬৫৮-১৭০৫ খৃঃ) ৪৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনিই এই বংশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, তাঁহার সময়ে এই রাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তিনি পৈতৃক আমলের ৯টি পরগণা ব্যতীত আর ১৫টি নূতন পরগণা অধিকৃত করেন। এই পনরটির মধ্যে রামচন্দ্রপুর (১৬৮২), চেঙ্গুটিয়া (১৬৯০), ইশপপুর (১৬৯৬) এবং মলই (১৬৯৯), এই চারিটি পরগণা খুব বড়, এবং কিসমৎ তালা, ভাটলা, শোভনা, ফলুয়া বা ফয়লা, ও শ্রীপতি কবিরাজ, এই ৫টি ক্ষুদ্র পরগণা। ইহা ছাড়া ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে কিসমৎ কলিকাতা, পাইকান, মানপুর, শিলিমপুর, পানওয়ান বা পাওনগড় ও বোরো নামক ৬টি পরগণা কিছুদিনের জন্য তাঁহার হাতে আসিয়া পরে তাঁহার পুত্রের সময় বেদখল হইয়া যায়। মনোহর রায় সাবেক ৯ ও নূতন ১৫, এই মোট ২৪টি ছোট বড় পরগণার জমিদার ছিলেন। কেমন করিয়া তিনি এই সকল পরগণা হস্তগত করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাৎকালিক দেশের অবস্থার একটু পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ পর্টুগীজ ও মগ দস্যুদিগকে পর্য্যুদস্ত ও উৎসন্ন করিয়া দেশে শান্তি আনিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার ১৬৭৯ অব্দে

/৮॥০ সের দুগ্ধ এবং সন্দেশাদি মিষ্টান্ন দিয়া ৺ঠাকুরের বৈকালিক হয়, তাহাও অতিথি ও ব্রাহ্মণগণের ভোগে লাগে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ৺শ্যামরায় বিগ্রহের জন্য যে দেবোত্তর দেন, চাঁচ্ড়াবংশের পরবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক তাহা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখন সে দেবোত্তরের পরিমাণ ২৫০০০/ পঁচিশ হাজার বিঘা। উহা এক্ষণে খুল্‌না কালেক্টরীর ৩২ বি তৌজিভুক্ত সিদ্ধ নিষ্কর।

১ সাঁড়াপোল নিবাসী রামেশ্বরের ধারা এই: যজ্ঞেশ্বর হইতে গণনা করিয়া ৪র্থ পুরুষ রামেশ্বর—তৎপুত্র ৫ রামচরণ ও রামনারায়ণ—৬ রামকৃষ্ণ—৭ বিশ্বনাথ—৮ কীর্ত্তিচন্দ্র—৯ মণীন্দ্র—১০ যতীন্দ্র প্রভৃতি এখনও সাঁড়াপোলে বাস করিতেছেন। ৫ রামনারায়ণ—৬ পঞ্চানন—৭ দুর্গাচরণ—৮ ধর্ম্মনারায়ণ—৯ কালীপ্রসন্ন—১০ সারদাপ্রসন্ন।

চাঁচ্‌ড়া রাজবংশ

অনাদিবর সিংহের অধস্তন বংশধর, বাৎস্য গোত্রীয়, উত্তর-রাঢ়ীয় কুলীন

- মাধব সিংহ
  - রাঘবরাম সিংহ [সাং জেমো, মুর্শিদাবাদ]
    - রত্নেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর সিংহ [বংশীয়গণের বাস, সাঁড়াপোল, রূপদিয়া, মণ্ডলগাতি প্রভৃতি স্থানে]
    - ভবেশ্বর সিংহ মজুমদার [সাং মূলগ্রাম, মৃত্যু ১৫৮৮ খৃঃ]
      - মহতাব বা মুকুটরাম রায় মজুমদার [মূলগ্রাম ও খেদাপাড়া, ১৫৮৮-১৬১৯]
        - রাজা কন্দর্প রায় [চাঁচ্‌ড়া, ১৬১৯-৫৮]
          - রাজা মনোহর রায় [১৬৫৮-১৭০৫]
            - রাজা কৃষ্ণরাম রায় [১৭০৫-১৭২৯]
              - রাজা শুকদেব রায় [বার আনা অংশ, ১৭২৯-১৭৪৫]
                - রাজা নীলকণ্ঠ রায় [১৭৪৫-১৭৬৪]
              - রামজীবন রায়
            - শিবরাম
            - রাজা শ্যামসুন্দর রায় [চারি আনা অংশ, ১৭৩১-১৭৫০]
              - রামগোপাল রায় [১৭৫০-১৭৫৭]
        - গোপীনাথ প্রভৃতি
      - বিনোদ রায় সিংহ [বংশীয়গণের নিবাস, খড়িঙ্কি, দেবিদাসপুর প্রভৃতি স্থানে]

রাজা নীলকণ্ঠ রায়
- রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় [১৭৬৪-১৮০২]
  - রাজা বাণীকণ্ঠ রায় [১৮০২-১৮১৭]
    - রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর [১৮১৭-১৮৮০]
      - রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ
        - কুমার ক্ষিতীশকণ্ঠ [দত্তক]
      - মানদাকণ্ঠ
        - কুমার সতীশকণ্ঠ
        - যতীশকণ্ঠ
        - নৃপতীশকণ্ঠ
      - হেমদাকণ্ঠ
- গোপীকণ্ঠ রায়
  - রুদ্রকণ্ঠ

ঢাকায় আসিয়া পুনরায় ১০ বৎসরকাল নির্ব্বিবাদে শাসন করেন। সে সময়ে দস্যুদুর্ব্বৃত্ত কেহ মাথা উঁচু করে নাই; শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল; ঢাকার সূক্ষ্মবস্ত্র ও সায়েস্তাখানী স্থাপত্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল; সর্ব্বোপরি শস্যের মূল্য অত্যন্ত সুলভ হইয়াছিল, টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছিল। শান্তিসুখে ক্রীড়া কৌতুকে লোকে যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলিয়া যাইতেছিল। ফৌজদার নুরউল্যা খাঁ কিরূপে সুখবিলাসে তৈলাক্ত নাসিকায় ঘুমাইতেছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সভাসিংহের বিদ্রোহকালে স্বল্প সৈন্য সংগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। ঐ নুরউল্যার সহিত মনোহর রায়ের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু যে মনোহরেরই সে বন্ধুত্বের প্রয়োজন, তাহা নহে; তাঁহার মত প্রবল জমিদারের সহিত সদ্ভাব না রাখিলে নুরউল্যারই তিষ্ঠিয়া থাকা দায় হইত। নুরউল্যার সাহায্যে ঢাকায় নবাব-দরবারেও মনোহরের প্রতিপত্তি হইল। নিকটবর্ত্তী সমস্ত জমিদারের মালগুজারি তাঁহার সামিল হইল। কন্দর্পের মত মনোহরও সেই সুবিধায় পরগণার পর পরগণা দখল করিতে লাগিলেন। ছোট বড় সকলকেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত। যিনি রাজস্ব দিতে পারেন, ভালই, নতুবা মনোহর রায় ধার দিয়া সময় মত টাকা

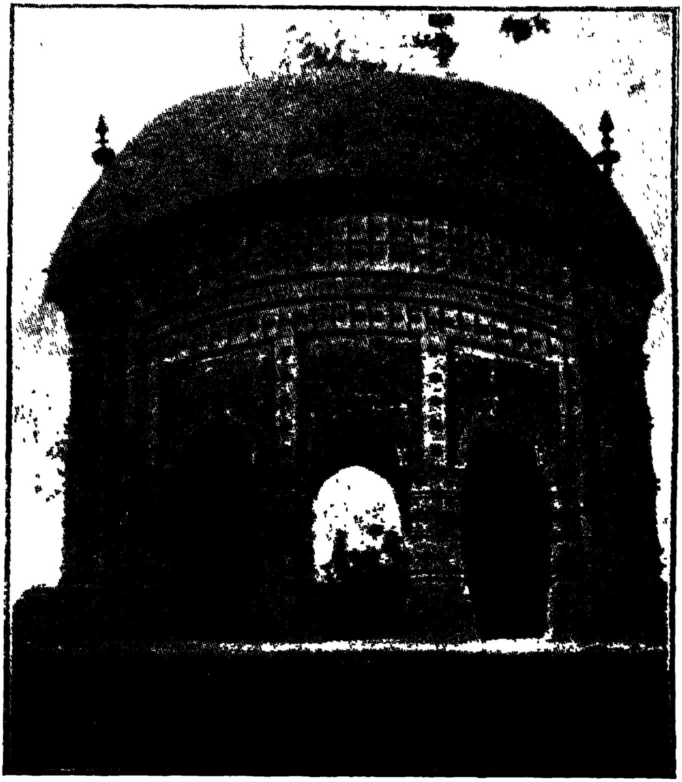
পাঠাইয়া নবাব সরকারে বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখিতেন। যাঁহারা টাকা দিতে পারিতেন না বা বিরোধ করিতেন, মনোহর নিজ হইতে তাঁহাদের টাকা দিয়া পরে নিজের নামে তাঁহাদের জমিদারীর সনন্দ লিখাইয়া লইতেন: সুতরাং যাঁহাদের সম্পত্তির উপর তাঁহার লোভ বা আক্রোশ হইত, গুপ্তভাবে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মনোহর রায় যে সকল জমিদারী দখল করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোন্‌টি ন্যায়তঃ বা কোন্‌টি অন্যায় ভাবে অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই। পরগণার প্রাচীন হিসাব খুলিলেই দেখা যায়, সমুদ্রে নদী পতনের মত জমিদারীগুলি মনোহরের করতলে পড়িয়াছিল। তিনিই চাঁচড়ার জমিদারীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা।

মনোহর যেমন নানাভাবে জমিদারীর অসম্ভব আয়বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি রাজধানীর সৌষ্ঠববৃদ্ধি কার্য্যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং দানধ্যানে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহারই সময় হইতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। তিনি রাজবাটীর পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এবং উহার পার্শ্বে 'শিবসাগর' নামক দীঘি খনন করেন। মন্দিরটির সম্মুখভাগ প্রাচীন ধরণে নানা কারুকার্য্য-খচিত। পূর্ব্বদিকে উহার সদর, সেই দিকে দীঘি। সম্মুখে প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে :

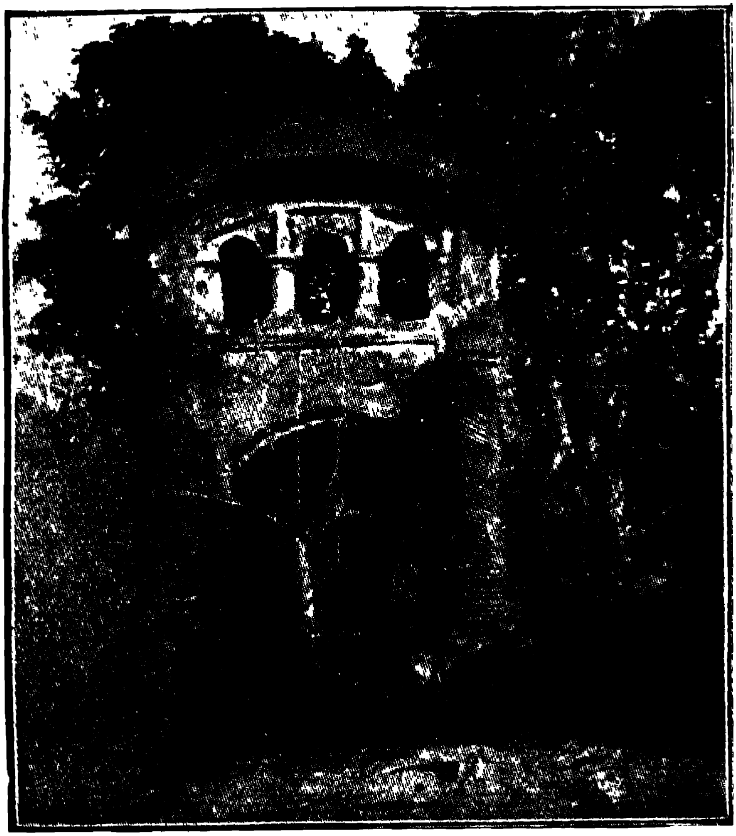
'শাকে নাগ-শশাঙ্কর্ত্তু স্মরে প্রাসাদ উত্তমঃ।
শ্রীমনোহর রায়েন নিরমায়ি পিণাকিনে॥
শুভমস্তু শকাব্দা ১৬১৮।'

নাগ=৮, শশাঙ্ক=১, ঋতু=৬, স্মর (কামদেব)=১; অঙ্কের বামা গতিতে ১৬১৮ শকাব্দা বা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ হয়। এই বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ইশপপুর পরগণা দখল করা হয়।[১]

১ পুরাতন কাগজপত্রে ঈশপপুর জমীদারীর পতন প্রসঙ্গে অবিকল এইরূপ লিখিত আছে : 'সাবেক জমিদার কালিদাস রায় ও পরমানন্দ রায় ও রামকৃষ্ণ দত্ত, রামনারায়ণ দত্ত, রামজীবণ দত্ত ইহারা ছিল। মালগুজারি মনোহর রায়ের সামিল ছিল। পরে অনেক বাকী আটকিলে সরবরাহ করিতে না পারিয়া বাকিতে কবলা করিয়া দিলেক। সাবেক জমিদারের সন্তান বেবাকদী ও শেকাটী গ্রামে বর্ত্তমান আছে।' কালিদাস রায় প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার প্রসঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার জমিদারীর কথা বলিয়াছি।



ধূলগ্রামের কৃষ্ণমন্দির



দেওয়ানবাটীর তোরণ, ধূলগ্রাম

এই সময়ে মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। যশোহর জেলার তখন তিনটি ভাগ ধরা যায় : দক্ষিণে চাঁচ্‌ড়া রাজ্য, পশ্চিমে মামুদশাহী বা নলডাঙ্গা রাজ্য, উত্তর ও পূর্ব্বে ভূষণা রাজ্য, সে ভূষণার জমিদার সীতারাম, তাঁহার কথা পরে বলিব। ভৈরবনদের উত্তরাংশ প্রায় সকলই তিনি দখল করিয়া লন। সেদিকে মনোহরেরও জমিদারী ছিল ; সীতারাম তাঁহার রাজস্বের দাবি করেন ; চতুর মনোহর রায় উদীয়মান সীতারামের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন এবং তাঁহার কন্যার বিবাহকালে সীতারামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়েই উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। ঐ সময়ে সীতারাম রাজ্যজয় কার্য্যে স্থানান্তরে ছিলেন এবং দুইমাস পরে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ সসৈন্যে যশোহরের সন্নিকটে নীলগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়কার একটি গল্প আছে। সীতারাম যখন শুনিলেন, সীতারামের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, "তখন তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'শুভদিন! কিসের দিন আর ক্ষণ? যেদিন সীতারাম রায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন চাঁচ্‌ড়ার শুভদিন বলিয়া গণ্য করা উচিত। ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান! রাজাকে যাইয়া বল, আমাকে কর প্রদান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, নচেৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।' চাঁচ্‌ড়াধিপ কর্ম্মচারীর প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া কর প্রদান করিয়া সীতারামের ক্রোধাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।"[১] এই গল্পের আবার রূপান্তরও আছে। কেহ বলেন, সীতারাম প্রবল হইয়া উঠিলে, একদা মহম্মদপুরে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া মনোহর ও নুরউল্যা এই দুই বন্ধুতে সৈন্য সহ বুনাগাতি পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, এবং সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের ব্যবস্থায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া ফিরিয়া আসেন ; তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য সীতারাম ইশফপুর পরগণার কতকাংশ দখল করিয়া সসৈন্যে নীলগঞ্জে উপস্থিত হন এবং মনোহর খাজনা দিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে ফিরিয়া যান।[২] শেষোক্ত বিবরণই সত্য বলিয়া

১ 'বান্ধব' পত্রে (জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিত) 'রাজা সীতারাম রায়' প্রবন্ধ, ১২৮১, মাঘ, ১৯৭ পৃ।

২ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (বঙ্গভাষায় প্রকাশিত), ১২৭৫, ১১ই বৈশাখ; 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', ১৩২৩, পৌষ, ৫৩৭ পৃ।

বোধ হয়, কারণ নুরউল্যার বীরত্বের কথা আমরা জানি, মনোহরের চতুরতা ভিন্ন বীরদর্পের কোন পরিচয় কখনও পাই নাই।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মনোহর রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র ছিল—কৃষ্ণরাম, শিবরাম ও শ্যামসুন্দর।[১] তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম রাজ্যাধিকারী হন; শিবরাম অল্পদিন পরে অপুত্রক মারা যান; শ্যামসুন্দর রাজ্যাংশ পাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন কোন ফল হয় না। কৃষ্ণরাম পিতার মত পরাক্রান্ত এবং কৌশলী ছিলেন। তিনি ১১১৩ হইতে ১১৩৬ সাল পর্য্যন্ত (১৭০৫-১৭২৯ খৃঃ) ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে পূর্ব্বের ২৪ পরগণা ছিল এবং তিনি ২০টি নূতন পরগণা লাভ করেন।[২] এই মোট ৪৪ পরগণার মধ্যে ১৭১৫ হইতে ১৭২৯ খৃঃ মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিসমত কলিকাতা, পাইকান প্রভৃতি ৬টি পরগণা বেদখল হইয়া যায়। সুতরাং অবশিষ্ট ৩৮ পরগণা তাঁহার দখলে ছিল। ইহাই রাজ্যবৃদ্ধির শেষ সীমা। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরামকে ইশফপুর বা যশোহর জমিদারীর সনন্দ প্রদান করেন। সে সময় ২৩টি পরগণায় ১,৮৭,৭৫৪ টাকা জমা ধার্য্য হয়। কৃষ্ণরামের বাকী পরগণা-গুলি ১৭২২ খৃষ্টাব্দের পর অধিকৃত হয় বলিয়া মনে করি।

রাজা কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শুকদেব রায় রাজা হন (১৭২৯)। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। শুকদেব দুই বৎসর মাত্র ষোল আনা সম্পত্তি ভোগ করেন, পরে উহার বিভাগ হয়।

১ ওয়েষ্টল্যাণ্ড মহাশয় শ্যামসুন্দরকে কৃষ্ণরামের পুত্র এবং শুকদেব রায়ের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া একটি মস্ত ভুল করিয়াছেন।—Westland, *Jessore*, p. 46

২ পুরাতন হিসাবপত্র হইতে এই নবলব্ধ ২০ পরগণার নাম যাহা পাইয়াছি, দখলের তারিখ সমেত তাহা দিতেছি: রাঙ্গদিয়া, রহিমাবাদ ও সৈয়দমামুদপুর (১৭১২); মাগুরা ঘোনা (১৭১৪), ভেরচি (১৭১৫); রায়মঙ্গল ও বন্দর মুকুন্দপুর (১৭১৬); শ্রীপদগহা (১৭২০), হোসেনপুর, নুরনগর, সাহস, শোভনালি, বাজিতপুর, রহিমপুর, ইসলামাবাদ, রেকাব বাজা (?), ধুলিয়াপুর, সহরতপুর, শাহাপুর ও হোসেনপুর (১৭২৬)। ইহার মধ্যে বাজিতপুর পরগণা নদীয়া-রাজের নিকট হইতে খরিদাসূত্রে পাওয়া যায়। উপরি উক্ত কয়েকটি পরগণার বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। তবে 'আইন-ই-আকবরী'তে ফতেহাবাদ সরকারে ইশফপুর, খলিফাতাবাদে তালা, বাগমারা, শ্রীপতি কবিরাজ, রাঙ্গদিয়া, সাহস, ইমাদপুর ও মল্লিকপুর এবং সপ্তগ্রাম সরকারে পানওয়ান ও শিলিমপুর প্রভৃতি নামোল্লেখ আছে—*Ain.*, Vol. II, pp. 132, 134, 141.

মনোহর রায়ের বিধবা রাণী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দরের প্রতি পক্ষপাতিনী হইয়া তাঁহাকে চারি আনা সম্পত্তি দিবার জন্য শুকদেবকে বলেন, তিনি বৃদ্ধা পিতামহীর বাক্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সমস্ত সম্পত্তির বার আনা অংশ নিজের রাখিয়া অবশিষ্ট চারি আনা অংশ শ্যামসুন্দরকে প্রদান করেন। এই বার আনা অংশের ২৯ পরগণার জমিদারীর ইশফপুর বড় পরগণা বলিয়া বার আনা সম্পত্তির নামই ইশফপুর জমিদারী এবং চারি আনা অংশে সৈদপুর পরগণার প্রাধান্য অনুসারে উহাকে সৈদপুর জমিদারী বলে। শুকদেব রায় ২ বৎসর ষোল আনা এবং ১৪ বৎসর কাল বারো আনা জমিদারী ভোগ করিয়া ১৭৪৫ অব্দে পরলোকগত হন।[১] তখনও শ্যামসুন্দর রায় জীবিত ছিলেন। রাজা শুকদেব রায়ের রাজত্বকালে তাঁহারই আনুকূল্যে রাজবাটীর সন্নিকটে চাঁচ্‌ড়া-নিবাসী দুর্গারাম বা দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক দশমহাবিদ্যা ও আরও কয়েকটি দেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও উহাদের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হয়। শুকদেব ও তাঁহার পৌত্র রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় এই সকল দেবদেবীর সেবার জন্য যথেষ্ট নিষ্কর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি। যশোহরের সন্নিকটে এই দশমহাবিদ্যার বাটী একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান এবং ইহা হিন্দুর নিকট একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

শুকদেবের পর রাজা হন তৎপুত্র নীলকণ্ঠ। তিনি অবশ্য বার আনা সম্পত্তির মালিক। তাঁহার রাজত্বকাল ১৭৪৫-৬৪, অর্থাৎ ১৯ বৎসর। তাঁহার সময়ে শ্যামসুন্দর রায় আরও ৫ বৎসর কাল চারি আনা অংশ ভোগ করেন। ১৭৫০ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামগোপাল রায় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি আরও ৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৫৭)। শ্যামসুন্দরের আমল হইতে এই সম্পত্তির রাজস্ব অনেক বাকী পড়ে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সমস্ত জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব বাদেও যুদ্ধের খরচ বাবদ যথেষ্ট টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য রামগোপালের ষ্টেট অত্যন্ত দায়িক

১ খুল্‌না জেলায় পীলজঙ্গের দক্ষিণে একটি বিখ্যাত হাট আছে, উহার নাম 'শুকদেব রায়ের হাট'। সাধারণ লোকে উহাই অপভ্রংশ করিয়া 'শুকদাড়ার হাট' করিয়া লইয়াছে। সর্ব্ববিধ গরুর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এই হাট খ্যাত।

হয়। তাঁহার সর্ব্বেসর্ব্বা নায়েব রঘুরাম ঘোষ উহার কোন কিনারা করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময় বঙ্গদেশের বিষম বিপ্লবের যুগ। আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা তখন নবাব। তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, উহা বঙ্গেতিহাসের প্রধান ঘটনা। উহারই ফলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদিগের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া পলায়ন করিবার পর ধৃত ও নৃশংসরূপে নিহত হন। তখন মীর জাফর আলি খঁা নবাবতক্তে বসিয়া পূর্ব্ব চক্রান্তের সর্ত্তানুসারে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদেরই নির্ব্বাচন মত কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী ২৪টি পরগণার জমিদারী অর্পণ করেন (১৭৫৭, ২০শে ডিসেম্বর)। ঐ সম্পত্তির মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে হুগলীর ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ সালাহ্-উদ্দীনের জায়গীর ছিল। সুতরাং তাঁহাকে উহার বদলে অন্যত্র সম্পত্তি দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন সময়ে রামগোপাল রায়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নবাব তাঁহার চারি আনার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া উহা সালাহ্-উদ্দীনের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া দিলেন।[১] চাঁচড়াসংক্রান্ত প্রাচীন কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি যে, রামগোপালের সম্পত্তির রাজস্ব ও অন্য দেনা অতিরিক্ত হইলে, তিনি '১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলকণ্ঠ রায় মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২।৶০ পণরাজী লইয়া বিক্রী কবলা করিয়া দেন। নীলকণ্ঠ রায় উক্ত ৮৭,৯৭২।৶০ পণ ও ১০,০০০৲ টাকা সেলামি মোট ৯৭,৯৭২।৶০ দিয়া উক্ত চারি আনা হিস্যা দখল করিয়া লন এবং ১১৬৫ সাল অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত (১৭৫৭, ডিসেম্বর) তাহার দখলে ছিল। পরে হুগলীর ছলাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ নবাব মীর জাফরআলি খাঁর আমলে উক্ত কিং পং সৈদপুর ওগয়রহ চারি আনা হিস্যা বেওয়ারিশ বলিয়া খেলাপ এজাহার করিয়া সন ১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮, জানুয়ারী) খামখা জবরদস্তি করিয়া দখল

১ "The East India Company received from the Nawab a grant of certain land near Calcutta and one of the Zemindars when the Nawab dispossessed in order to make this grant was named Sala Uddin Khan. His man representing that Shamsundar's property had no heirs, requested its bestowal upon himself in requital for the loss of his former Zemindari, and the Nawab not unwilling to give what was not his own bestowed upon him the four annas share of the Raja's estates."—Westland, *Jessore*, p. 46 ; Ascoli, *Revenue History*, p. 19.

করিয়া লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির হইয়া যায়।' এই বর্ণনার মধ্যে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কিছু নাই। সময়ের হিসাবও ঠিক আছে। সালাহ্-উদ্দীনের এই সম্পত্তির নাম সৈদপুর ষ্টেট এবং উত্তরকালে উহার মালিক হইয়াছিলেন হাজি মহম্মদ মোহ্সীন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কিরূপে ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

রাজা নীলকণ্ঠের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত নামক দুর্দ্দান্ত সেনানীর অধীন মারহাট্টা বা বর্গী সৈন্য বর্দ্ধমান অঞ্চল আক্রমণ করে। উহাকেই 'বর্গীর হাঙ্গামা' বলে। বর্গীর উৎপাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ প্রথমতঃ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। তখন ভয়ে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত রাজন্যবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিলেন, পূর্ব্বাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। সে সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা গঙ্গাপারে মূলাজোড়ের কাছে যেখানে গড়কাটা বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটবর্ত্তী আধুনিক রেল ষ্টেশনের নাম সাম্নে গড় বা শ্যামনগর। শুধু সেখানে নহে, বর্দ্ধমানের রাজা নলডাঙ্গায় আসিয়া দীর্ঘকাল গড়বেষ্টিত বাটীতে বাস করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া শিবনিবাসে দুর্গ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে চাঁচ্ড়ার রাজা নীলকণ্ঠও আশ্রয়ের স্থান খুঁজিতেছিলেন। তখন তাঁহার দেওয়ান বাঘুটিয়া নিবাসী হরিরাম মিত্র স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণে রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা তাঁহাকেই ভৈরবকূলে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গড়বেষ্টিত রাজবাটী নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিলেন। হরিরামের নিজেরও কোন পাকা বসতিবাটী ছিল না। এজন্য রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজের জন্যও একটি বাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন। উভয় আদেশ সাতিশয় সত্বরতার সহিত প্রতিপালিত হইল। বাঘুটিয়ার কাছে বর্ত্তমান অভয়ানগরে হরিরামের নিজের বাড়ী এবং আরও দূরবর্ত্তী ধূলগ্রামে সুন্দর এক রাজবাটী নির্ম্মিত হইল। সে এক যুগ ছিল ; তখন দেব-মন্দিরই ছিল রাজবাটীর প্রধান সৌন্দর্য্য এবং দেব-বিগ্রহই ছিল তাহার প্রধান সম্পদ। ধূলগ্রামের বাটীতে নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশটি শিবমন্দির এবং অভয়ানগরে নদীর অদূরে এক প্রাঙ্গণের চারিধার বেষ্টন করিয়া একাদশটি শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইল। দেওয়ানের বাটি বলিয়া মন্দিরের

হয়। তাঁহার সর্ব্বেসর্ব্বা নায়েব রঘুরাম ঘোষ উহার কোন কিনারা করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময় বঙ্গদেশের বিষম বিপ্লবের যুগ। আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা তখন নবাব। তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, উহা বঙ্গেতিহাসের প্রধান ঘটনা। উহারই ফলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদিগের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া পলায়ন করিবার পর ধৃত ও নৃশংসরূপে নিহত হন। তখন মীর জাফর আলি খাঁ নবাবতক্তে বসিয়া পূর্ব্ব চক্রান্তের সর্ত্তানুসারে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদেরই নির্ব্বাচন মত কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী ২৪টি পরগণার জমিদারী অর্পণ করেন (১৭৫৭, ২০শে ডিসেম্বর)। ঐ সম্পত্তির মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে হুগলীর ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ সালাহ্‌-উদ্দীনের জায়গীর ছিল। সুতরাং তাঁহাকে উহার বদলে অন্যত্র সম্পত্তি দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন সময়ে রামগোপাল রায়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নবাব তাঁহার চারি আনার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া উহা সালাহ্‌-উদ্দীনের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া দিলেন।[১] চাঁচড়াসংক্রান্ত প্রাচীন কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি যে, রামগোপালের সম্পত্তির রাজস্ব ও অন্য দেনা অতিরিক্ত হইলে, তিনি '১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলকণ্ঠ রায় মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২৷৶০ পণরাজী লইয়া বিক্রী কবলা করিয়া দেন। নীলকণ্ঠ রায় উক্ত ৮৭,৯৭২৷৶০ পণ ও ১০,০০০৲ টাকা সেলামি মোট ৯৭,৯৭২৷৶০ দিয়া উক্ত চারি আনা হিস্যা দখল করিয়া লন এবং ১১৬৫ সাল অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত (১৭৫৭, ডিসেম্বর) তাহার দখলে ছিল। পরে হুগলীর ছলাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ নবাব মীর জাফরআলি খাঁর আমলে উক্ত কিং পং সৈদপুর ওগয়রহ চারি আনা হিস্যা বেওয়ারিশ বলিয়া খেলাপ এজাহার করিয়া সন ১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮, জানুয়ারী) খামখা জবরদস্তি করিয়া দখল

১ "The East India Company received from the Nawab a grant of certain land near Calcutta and one of the Zemindars when the Nawab dispossessed in order to make this grant was named Sala Uddin Khan. His man representing that Shamsundar's property had no heirs, requested its bestowal upon himself in requital for the loss of his former Zemindari, and the Nawab not unwilling to give what was not his own bestowed upon him the four annas share of the Raja's estates."—Westland, *Jessore*, p. 46 ; Ascoli, *Revenue History*, p. 19.

করিয়া লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির হইয়া যায়।' এই বর্ণনার মধ্যে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কিছু নাই। সময়ের হিসাবও ঠিক আছে। সালাহ্-উদ্দীনের এই সম্পত্তির নাম সৈদপুর ষ্টেট এবং উত্তরকালে উহার মালিক হইয়াছিলেন হাজি মহম্মদ মোহ্সীন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কিরূপে ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

রাজা নীলকণ্ঠের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত নামক দুর্দ্দান্ত সেনানীর অধীন মারহাট্টা বা বর্গী সৈন্য বর্দ্ধমান অঞ্চল আক্রমণ করে। উহাকেই 'বর্গীর হাঙ্গামা' বলে। বর্গীর উৎপাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ প্রথমতঃ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। তখন ভয়ে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত রাজন্যবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিলেন, পূর্ব্বাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। সে সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা গঙ্গাপারে মূলাজোড়ের কাছে যেখানে গড়কাটা বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটবর্ত্তী আধুনিক রেল ষ্টেশনের নাম সাম্নে গড় বা শ্যামনগর। শুধু সেখানে নহে, বর্দ্ধমানের রাজা নলডাঙ্গায় আসিয়া দীর্ঘকাল গড়বেষ্টিত বাটীতে বাস করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া শিবনিবাসে দুর্গ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে চাঁচ্ড়ার রাজা নীলকণ্ঠও আশ্রয়ের স্থান খুঁজিতেছিলেন। তখন তাঁহার দেওয়ান বাঘুটিয়া নিবাসী হরিরাম মিত্র স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণে রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা তাঁহাকেই ভৈরবকূলে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গড়বেষ্টিত রাজবাটী নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিলেন। হরিরামের নিজেরও কোন পাকা বসতিবাটী ছিল না। এজন্য রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজের জন্যও একটি বাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন। উভয় আদেশ সাতিশয় সত্বরতার সহিত প্রতিপালিত হইল। বাঘুটিয়ার কাছে বর্ত্তমান অভয়ানগরে হরিরামের নিজের বাড়ী এবং আরও দূরবর্ত্তী ধুলগ্রামে সুন্দর এক রাজবাটী নির্ম্মিত হইল। সে এক যুগ ছিল; তখন দেব-মন্দিরই ছিল রাজবাটীর প্রধান সৌন্দর্য্য এবং দেব-বিগ্রহই ছিল তাহার প্রধান সম্পদ। ধুলগ্রামের বাটীতে নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশটি শিবমন্দির এবং অভয়ানগরে নদীর অদূরে এক প্রাঙ্গণের চারিধার বেষ্টন করিয়া একাদশটি শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইল। দেওয়ানের বাটি বলিয়া মন্দিরের

সংখ্যা একটি কম। ধূলগ্রামের বাটীটি পাকা ও সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত; উহার সুন্দর তোরণ দ্বার এখনও বর্ত্তমান আছে। অভয়ানগরের বাটীটির কাঁচা গাঁথুনি ছিল এবং উহা তেমন উচ্চ বা দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল না। উভয় বাটীই পরিখা-বেষ্টিত; একদিকে ভৈরব নদ ও অন্য তিন দিকে গড়খাই ছিল; এখনও তাহার খাত আছে। বাটী নির্ম্মাণের শেষ সময়ে রাজা আসিয়া উভয় বাটী পরিদর্শন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, রাজাদিগের অস্থায়ী নিবাস তেমন ভাল হইবার প্রয়োজন নাই, অতএব দেওয়ান যেন ধূলগ্রামের বাটীতে স্থায়ীভাবে বসতি করেন এবং রাজাদিগের জন্য অভয়ানগরের বাটীই যথেষ্ট হইবে। দেশসুদ্ধ লোকে আশ্রিতপালক রাজা বাহাদুরের উদারতা দেখিয়া মোহিত হইল।[১]

বঙ্গের সেই ভীষণ বিপ্লব ও বিগ্রহের যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া নীলকণ্ঠ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হইলেন। ইংরাজ রাজত্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তিনিই যশোহর জেলার প্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রধান জমিদার বলিয়া স্বীকৃত হন। আবার অল্পদিন মধ্যে তাঁহারই সময়ে সে জমিদারী বিলীন হইয়া যায়। এ দুরবস্থার কারণ কি, তাহাই আমরা সংক্ষেপে বিচার করিয়া লইব।

শুকদেব রায়ের সময় হইতে জমিদারীর আয় অপেক্ষা ব্যয় বাড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দীর রাজত্বকালে মারহাট্টা যুদ্ধের চাঁদা ও অসংখ্য আবওয়াবের সৃষ্টি হওয়াতে রাজস্ব পরিশোধ করিতে সকল জমিদারদিগেরই প্রাণান্ত হইতেছিল। চারি আনি হিস্যার খরিদা দখল নবাব স্বীকার না করায় অনর্থক যথেষ্ট অর্থ নষ্ট হইল। জমিদারী ষোল আনা থাকিল না বটে, কিন্তু সাজসরঞ্জাম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনেক ব্যয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল। দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পর্ব্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল। শুকদেব, নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ তিনজনই অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, দেবদ্বিজভক্ত ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মচারীবৃন্দকে নিষ্কর ভূমি দান, দেবমন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সেবার জন্য যে ভাবে অপরিমিত দেবোত্তর উৎসর্গ করিয়া

১ এই দুইটি বাটীর বিশেষ বিবরণ পরে দিতেছি। অভয়ানগরে আসিবার জন্য যেখানে রাজা সদলবলে ভৈরব নদ পার হইয়াছিলেন, অপর পারে সেই স্থানের নাম রাজঘাট। পরবর্ত্তী সময়ে দেওয়ান স্বরূপচন্দ্র মিত্র রাজঘাটে বাস করিয়াছিলেন।

গিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। চাঁচ্ড়ার নিষ্কর ভোগ না করিলে ব্রাহ্মণ কিসের ?—এইরূপ উক্তি ছিল। শুকদেবের সময় চাঁচ্ড়ার দশমহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হন ; নীলকণ্ঠের সময় অভয়ানগরের একাদশ মন্দিরের জন্য যথেষ্ট ভূমি বৃত্তি দেওয়া হয় ; শ্রীকণ্ঠ দশমহাবিদ্যার সেবা ও অতিথি সৎকারের জন্য আট সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন ; ইহা ব্যতীত বগ্‌চরের রঘুনাথ ও জগন্নাথ এবং মুড়লীর রাজরাজেশ্বরী নামক কালী বিগ্রহের জন্য ৬২০০ বিঘা নিষ্কর দেওয়া হয় ; ত্রিমোহানী, লাউজানি, মাগুরা, হরিহরনগর, মণিরামপুর, কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মহাকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়।[১] এই ভাবে অজস্র দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণ নিষ্কর দিতে দিতে জমিদারীর আয় অত্যন্ত কমিয়া গেল ; তখনও রাজা া রাজোচিত উৎসব অনুষ্ঠান ও ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে গিয়া ক্রমে একেবার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল, রাজা শ্রীকণ্ঠ রায়ের প্রকাশ্য ঋণের পরিমাণ ৩০,০০০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। তবে যে রাজা বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব দেন, তাঁহার পক্ষে এ ঋণ সামান্য বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে আয় সংক্ষেপ হওয়ায় সামান্য ঋণও ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তিন বৎসর পরে যশোহরের কালেক্টরের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে জমিদারীর বেবন্দোবস্ত নিমিত্ত রাজা একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পড়িয়াছেন। রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় 'কল্পতরু' হইয়া রাজার রাজ্য লুটাইয়া দিয়াছিলেন।

এমন সময় লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল। উহাতে পুরাতন ভূম্যধিকারীর জমিদারী থাকুক বা না থাকুক, সে বিষয়ের কোন কথা নাই ; রাজস্ব সংগ্রহের দিকেই প্রখর দৃষ্টি পড়িল। নব বিধানে নির্দ্দিষ্ট দিনে কিস্তীমত খাজানা আদায় না করিলেই জমিদারী নীলামে উঠিতে লাগিল ; এই ভাবে শ্রীকণ্ঠ রায়ের সম্পত্তি মধ্যে পরগণার পর পরগণা বিক্রীত হইয়া গেল। ১৭৯৬ অব্দে রাজস্ব বিভাগ হইতে মলই পরগণা বিক্রয় করিয়া বাকী ওয়াশীল করা হইল। দেনার দায়ে আদালত হইতে রসুলপুর পরগণা নীলাম হইল।

১ আতপুরের শিব ও চাঁচ্ড়ার ৺ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণীর কোন নির্দ্দিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি নাই। গঙ্গাতীরে আতপুরে চাঁচ্ড়ার রাজাদিগের গঙ্গাবাসের বাটী ছিল। সে সম্পত্তি সম্প্রতি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। রাজরাজেশ্বরীর বিগ্রহ এখন জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছে। রাজা বরদাকণ্ঠের সময় চাঁচ্ড়ার যোগমায়া ঠাকুরাণী এবং যশোহরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়।

পর বৎসর রাঙ্গদিয়া, রামচন্দ্রপুর, চেঙ্গুটিয়া, ইমাদপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি বাকী খাজনার নীলামে, সৈদপুর এবং ইশফপুরের কতকাংশ দেনার ডিগ্রীতে এবং অবশেষে সাহস পরগণা খোস কোবালায় বিক্রীত হইয়া গেল। তখন রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সদসৎ নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন! তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীকণ্ঠ বা গোপীনাথ নিজেরা অবশিষ্ট কতক সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া লইলেন এবং একজনের কোন অংশ বন্ধকসূত্রে বিক্রয়ের পথে উঠিলে, অন্য ভ্রাতা সরিকরূপে দাঁড়াইয়া নীলাম রদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কতকগুলি তালুক সৃষ্টি করিয়া তাহা বন্দোবস্ত করিয়া কিছু টাকা পাইলেন এবং পরে দখল না দিয়া শেষে বাকী খাজনায় উহা বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি বৃত্তি ও চাকরাণ মহল বাজেয়াপ্ত করেন; উহার জন্য গভর্ণমেণ্টের নামে আদালতে নালিশ করিয়া পরাজিত হইলেন, আব লাভের মধ্যে যথোচিত অর্থদণ্ড হইল। কিন্তু মোট কথা, কোন উপায়ে কিছু রক্ষা হইল না; ১৭৯৮-৯ অব্দে সব সম্পত্তি নানা ভাবে হস্তচ্যুত হইয়া গেল।[১] এমন সময়ে রাজা শ্রীকণ্ঠ একটি নাবালক পুত্র ও বিধবা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন (১৮০২)।

তখন কোম্পানী বাহাদুর কালেক্টর সাহেবের অনুরোধে রাজপরিবারের জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন। ১৮০৭ অব্দে রাণীর মৃত্যুর পর ঐ বৃত্তি ১৮৬৲ হইল। সে সময়ও নিঃসন্তান গোপীনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র বাণীকণ্ঠের অভিভাবক স্বরূপে বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। পরবৎসর সুপ্রীমকোর্টের মোকদ্দমার ফলে সৈদপুর পরগণার নীলাম রদ হওয়ায় বাণীকণ্ঠ জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেন এবং সরকারী বৃত্তি বন্ধ হইল। কয়েক বৎসর পরে বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিয়া ইমাদপুর পরগণার উদ্ধার হইল। গোপীনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সকল স্বত্ব ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখিয়া দিয়া যান। ১৮১৭ অব্দে তিন বৎসরের নাবালক পুত্র বরদাকণ্ঠকে রাখিয়া রাজা বাণীকণ্ঠ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে সদাশয় টুকার সাহেব (Mr. C. Tucker) যশোহরের

১ Westland, *Jessore*, pp, 99-100.

কালেক্টর। তিনি চাঁচ্ড়া রাজবংশের দুরবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই মর্ম্মব্যথিত হন এবং উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গভর্ণমেণ্টের শাসননীতির উপর কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।[১] যাহা হউক তাঁহারই চেষ্টার ফলে চাঁচ্ড়া জমিদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে যায় এবং রাজপরিবারের বার্ষিক খরচের জন্য ৬,০০০৲ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট লভ্য হইতে দেনা শোধ ও জমিদারীর উন্নতিসাধনের সুব্যবস্থা হয় (১৮১৮)। কয়েক বৎসর পরে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে ১৮১৯ অব্দের নববিধানানুসারে বে-আইনী নিলাম প্রমাণিত হওয়ায় সাহস পরগণার কতকাংশ রাজাকে প্রত্যর্পিত হয়। তদবধি পরগণা ইমাদপুর এবং সৈদপুর ও সাহসের কতকাংশ চাঁচ্ড়া রাজের প্রধান সম্পত্তি রহিয়াছে। ১৮৩৪ অব্দে রাজা বরদাকণ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জমিদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বৎসর কাল নিরুদ্বেগে সুশাসন করিয়া ১৮৮০ অব্দে পরলোক গমন করেন। রাজা বরদাকণ্ঠ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হস্তী ও নানাবিধ যানবাহনের সাহায্য দ্বারা রাজভক্তির পরিচয় দিয়া এবং বিভিন্ন সময়ে স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সরকারী সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে জমি ও অর্থ দান করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে ঢাল তরবারি খেলাত এবং 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন (১৮৬৫)।[২]

১ 'The family, from which the Raja is descended, is nearly as ancient as the district itself. At the time of the Decennial Settlement, they were possessed of nearly one-fourth of the district paying upwards of three lacs of rupees of revenue per annum to the Government. It is not for me to attempt to trace the causes which have led to the disjunction of almost all the great families of Bengal in a comparatively short space of time; whether it be owing to the policy of the Government or to accidental causes, the effect is the same, and the large possessions of ancient families have been gradually decimated and lopped off till the name only of greatness remains, which, though still cherished with the fondness of past recollection, has only a shadow for its support.'—Collector's letter to the members of the Board of Revenue, dated 8th April, 1819.

২ জসিমুদ্দিন বিশ্বাস কর্ত্তৃক ১৩০৪ সালে লিখিত 'চাঁচ্ড়া-চন্দ্রিকা' নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকে রাজবংশের কিছু কিছু পুরাতন কিংবদন্তী এবং সর্ব্বজনপ্রিয় রাজা বরদাকণ্ঠের উচ্চ প্রশংসা গীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ উত্তরাধিকারী হন। তিনি নিজে নিঃসন্তান। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মানদাকণ্ঠের চারি পুত্র ছিল: কুমার সতীশকণ্ঠ, যতীশকণ্ঠ, ক্ষিতীশকণ্ঠ এবং নৃপতীশকণ্ঠ। রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ তাঁহার জীবদ্দশায় তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার ক্ষিতীশকণ্ঠকে দত্তক পুত্র লন। রাজার মৃত্যুর পর ক্ষিতীশকণ্ঠই জমিদারীর অর্দ্ধাংশের মালিক হন এবং অপরার্দ্ধ তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত হয়। এক্ষণে মাত্র জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সতীশকণ্ঠ জীবিত আছেন। ইনি কৃতবিদ্য, সদাশয় এবং সকল সদনুষ্ঠানে উৎসাহশীল। তবে তিনিও বৎসরের অধিকাংশ সময় স্থানান্তরে বাস করেন বলিয়া চাঁচ্‌ড়ার রাজবাটী শ্রীভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

দ শ ম হা বি দ্যা ॥ দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারীই চাঁচ্‌ড়ার দশমহাবিদ্যাবাটীর মন্দির ও বিগ্রহ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চাঁচ্‌ড়া গ্রামেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজগোত্রীয় দুর্গারাম মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল, ব্রহ্মচারী হইলে তাঁহার নাম হয় দুর্গানন্দ। তিনি শিশুকাল হইতে ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন; প্রবীণ বয়সে ব্রহ্মচারীর বেশে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। কিন্তু কোথায়ও দেবী ভগবতীর দশবিধ মহামূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পান না।[১] তাই তাঁহার প্রাণের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, তাঁহার জীবনে এই সকল মহাবিদ্যার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। করুণাময়ীর কৃপাকটাক্ষে তাঁহার সাধুসংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশের বলে তিনি এই প্রস্তাব লইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দীন এবং চাঁচ্‌ড়ার রাজা শুকদেবের অনুগ্রহ লাভ করেন। একে শুকদেব ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাশয় হিন্দু নৃপতি, তাহাতে নবাবের ইঙ্গিত, সুতরাং তিনি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্রহ্মচারী উপযুক্ত সূত্রধর সংগ্রহ করিয়া নিজ বাটীর এক প্রকাণ্ড নিম্ব বৃক্ষের খণ্ড কাষ্ঠ হইতে বিগ্রহগুলি প্রস্তুত করাইলেন।

দশমহাবিদ্যার দশটি মাত্র বিগ্রহ নহে, মূর্ত্তির সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক।

---

১ শাস্ত্রানুসারে দশমহাবিদ্যা এই :

'কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'—'মুণ্ডমালাতন্ত্র'

উত্তরের পোতার প্রধান মন্দিরে পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে এই ষোলটি বিগ্রহ আছেন: গণেশ, সরস্বতী, কমলা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা ও মাতঙ্গী এবং ভৈরব। পশ্চিমের মন্দিরে কৃষ্ণ, রাধিকা, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, এবং শীতলা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পূর্ব্ব পোতায় ভোগগৃহ এবং দক্ষিণে নহবৎখানা নির্ম্মিত হইল; নহবৎখানার নিম্ন দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইবার সদর দ্বার। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেবার ব্যবস্থাও হইল। শুকদেব ও শ্যামসুন্দর উভয়ে স্বীকৃত হইলেন যে, প্রত্যেকের অধিকারভুক্ত জমিদারীতে প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে বার্ষিক একসের চাউল ও ৫ গণ্ডা কড়ি হিসাবে আদায় করিয়া লইয়া দশমহাবিদ্যার সেবার জন্য দেওয়া হইবে। শ্যামসুন্দর ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর চারি আনি অংশ মীর্জা সালাহ্-উদ্দীনের হস্তে গেলে, তিনিও অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। তৎপত্নী মন্নুজান্ খানম্ সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে, ১১৭৭ সালে তিনিও উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। চারি আনি অংশের দেয় বৃত্তি বার্ষিক ৩৫১৲ টাকা স্থির হয়; উহা ১২৪২ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৬৫ বৎসর কাল রীতিমত পাওয়া গিয়াছিল। তৎপরে হুগলীর মোতউল্যার প্রস্তাবে উক্ত বৃত্তি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ হইতে নামঞ্জুর হয়।[১] রাজা শ্রীকণ্ঠ রায়ের রাজত্বকালে ১১৮৮ সালে (১৭৮২ খৃঃ) তিনি চাউল পয়সা বৃত্তির বদলে ৬০০০⁄ বিঘা জমির দেবোত্তর সনন্দ লিখিয়া দেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সে দেবোত্তর সম্পত্তিও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

দুর্গানন্দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোমন্ত এবং পরে যশোমন্তের দুই পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র ক্রমান্বয়ে সেবায়ৎ হন। কৈলাসচন্দ্রের সময়ে দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট ঐ বৃত্তিমহল খারিজা তালুক স্বরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিছু দিন পরে তাহাও বাকী খাজনায় নীলাম হইয়া গেলে, অর্দ্ধাংশ চাঁচ্ড়ার রাজা এবং অপরার্দ্ধ নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার মহিমচন্দ্র মজুমদার খরিদ করেন। তদবধি তাঁহারা সেবার জন্য কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি দিতেন। মহিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, এখন চাঁচ্ড়া

১ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারীর পরওয়ানা দ্বারা উক্ত বৃত্তির টাকা নামঞ্জুর করা হয়।

রাজ সরকার হইতে সামান্য কিছু পাওয়া যায়।[১] কৈলাস ব্রহ্মচারী নিঃসন্তান; তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শশিভূষণের মৃত্যু ঘটিলে, কৈলাসচন্দ্র শেষ বয়সে যাবতীয় সম্পত্তি স্বীয় গুরুদেব চন্দনীমহল-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে লিখিয়া দেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত। তাঁহার ভ্রাতারা এক্ষণে দশমহাবিদ্যার সেবায়ৎ আছেন। এখন নিষ্কর সম্পত্তি ও লোন্ আফিসের গচ্ছিত টাকার সুদ বাবদ মোট বার্ষিক ৫।৬ শত টাকা আয় আছে; উহা এবং সমাগত পূজার্থিগণের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা কষ্টে বিগ্রহগণের সেবা ও অতিথি সৎকার চলিতেছে।

দুর্গোৎসবের সময় দশমহাবিদ্যার বাড়ীতে এবং চাঁচ্ড়ার রাজবাটীতে চণ্ডী-মণ্ডপে প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ করিয়া সপ্তশতী চণ্ডীও যেমন পঠিত হয়, কবিকঙ্কণ-কৃত চণ্ডী পুঁথিও তেমনি পাঠ করা হইয়া থাকে। এইজন্য রাজা শ্রীকণ্ঠ রায়ের সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যে পুঁথি লিখিত হইয়াছিল, উহা এখনও দশমহাবিদ্যার বাড়ীতে আছে। পুঁথিখানি ১১৮৪ সালের ১৮ই বৈশাখ লিখিত হয়। আর এক-খানি পুঁথি সেখানে আছে, উহার নাম শীতলা-মঙ্গল। উহা পরগণে ইমাদপুরের অন্তর্গত আম্‌দাবাদ নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ বিশ্বাস কর্ত্তৃক কবিতাকারে রচিত। উহার শেষ ভাগে আছে:

'বাণ বসু রস ইন্দু শক পরিমিত
হেনই সময় হৈল শীতলার গীত।'

অর্থাৎ ১৬৮৫ শক বা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হয়। এ পুঁথিখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

অ ভ য়া ন গ র॥ এই স্থানটি অভয়ানাম্নী বিধবা রাজকন্যার সম্পত্তিভুক্ত করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম অভয়ানগর। কথিত আছে, এখানকার একাদশটি শিবলিঙ্গের প্রত্যেকের নামে ১২০০/ বিঘা নিষ্কর দেওয়া হয়। প্রতি-দিন দেবসেবায় যাহা ভোজ্য উৎসৃষ্ট হইত, উহা পূজান্তে সিধা ভাগ করিয়া গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাটীতে রীতিমত প্রেরিত হইত এবং তদ্দ্বারা প্রায় ৩০ ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারের সংসার নির্ব্বাহ হইত। এখনও অভয়ানগরে সে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, কিন্তু নৈবেদ্য আর পান না। অভয়ানগরের রাজবাটী

১ 'ভারতবর্ষ', ১৩২৬, শ্রাবণ, ২১১ পৃ (অশ্বিনীকুমার সেনের প্রবন্ধ)।

ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু মন্দিরগুলি এখনও খাড়া আছে। ঐ প্রাঙ্গণে উত্তরের পোতার মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তন্মধ্যে যে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ছিল, তাহার ভগ্নাংশগুলি এখনও আছে। পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রত্যেকদিকে সারি সারি চারিটি ও সদর তোরণের দুইপার্শ্বে দুইটি—এই মোট একাদশটি মন্দির। অনেকগুলির মধ্যে শিবলিঙ্গ এখনও বর্ত্তমান ; এবং ২।৩টির নিত্য পূজা হওয়ার কথা, ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ নিত্যপূজা হয় না ; বৃত্তির টাকা রাজ-সরকারে খরচ লেখা পড়ে এবং এখানকার বৃত্তিভুকগণ ফাঁকি দিয়া খায়। রাজ-সরকার হইতে এদিকে দৃষ্টি নাই। যাহা হউক, মন্দিরগুলি বেশ দৃঢ় এবং বড় মন্দিরটি বড় সুন্দর ; এমন কারুকার্য্যখচিত সুন্দর মন্দির নিকটবর্ত্তী স্থানে আর নাই। মন্দিরটির বাহিরের মাপ ২৪´-৪´´×২২´-৩´´ ; ভিত্তি ৩´-৪´´ ; সম্মুখে সাধারণ পদ্ধতিমত তিনটি খিলানের পশ্চাতে একটি ৪´-৭´´ বিস্তৃত খোলা বারান্দা এবং ভিতরে গর্ভমন্দির, দুই পার্শ্বে ৩´-১০´´ বিস্তৃত আবৃত বারান্দা আছে। এই মন্দিরগুলির চতুষ্পার্শ্ব দিয়া প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, উহার ভগ্নাবশেষ আছে। প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিমোত্তর কোণে বিস্তীর্ণ পুকুর ছিল এবং পুকুরের দক্ষিণে অনেক দূর লইয়া রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ কতকগুলি বরজ ও বাগানের মধ্যে বিলুপ্ত হইবার মত হইয়াছে। এখনও অনেক স্থানে স্তূপাকার ইট আছে, আরও অনেক ইট গ্রামবাসীরা কিনিয়া লইয়া নিজ বাটীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ধূ ল গ্রা মে দে ও য়া নে র বা টী ॥ নদীকূলে দ্বাদশটি শিবমন্দির ও উহার মধ্যস্থানে সদর দ্বার ও বাঁধা ঘাট ছিল। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে উত্তরের পোতায় ৺কালীমন্দির ও দক্ষিণে নহবৎখানা ছিল।[১] ঐ প্রাঙ্গণেরই পূর্ব্ব পোতায় পূর্ব্বদ্বারী জোড় বাঙ্গালায় গোপীনাথ ও রাধিকা বিগ্রহ ছিলেন। এই

১ ৺কালীমন্দির কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, রাজা শ্রীকণ্ঠ রায়ের সময়ে যখন চাঁচ্‌ড়া রাজধানীতে 'হিমসাগর, নামক সুবিস্তীর্ণ দীঘি খনিত হয়, তখন মৃত্তিকার নিম্নে সুন্দর কালীমূর্ত্তি পাওয়া যায়। শ্রীকণ্ঠ রায় সে মূর্ত্তি চাঁচ্‌ড়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেন। কিন্তু শেষে নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে, দেবীমূর্ত্তি দেওয়ানের বাড়ীতে আসিতে চান। তখন রাজা নিজ ব্যয়ে মহাসমারোহে কালীমূর্ত্তি আনিয়া ধূলগ্রামের বাটীতে নবনির্ম্মিত মন্দিরে স্থাপনা করেন। সে মূর্ত্তি এখনও আছেন, কিন্তু রাজা শ্রীকণ্ঠ বা হরিরাম কেহই নাই, সে মূর্ত্তির মর্ম্ম বুঝিবে কে ?

মন্দিরের মাত্র সম্মুখের একটি দীর্ঘ ও প্রস্থ দেওয়াল আছে, উহার পশ্চাতের সমস্ত অংশ, কালীমন্দির ও দ্বাদশটি শিবমন্দির সব নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। গোপীনাথের জোড়বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে উত্তরদিকে একটি গৃহে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ ছিলেন, কিন্তু সে গৃহ এক্ষণে নাই। সেই দিকে একখানি খড়ের ঘরে কালীমূর্ত্তির পূজা হইতেছে। ঐ প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে দোলমঞ্চ এবং একটি প্রাচীন তমালবৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান আছে; পূর্ব্বপোতার বড় মন্দিরে রাম, সীতা ও হনুমান বিগ্রহ ছিলেন। এই বড় মন্দিরটিই এক্ষণে বিদ্যমান আছে এবং তাহারই ভিতর গোপীনাথ ও রাধিকা, এবং জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও অনেকগুলি শালগ্রাম নিত্য পূজিত হন। এই মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৩´-৬´´×২১´-৪´´; সম্মুখে তিনটি খিলানের পশ্চাতে ১১´-৬´´×৪´-১´´ পরিমিত একটি খোলা-বারান্দা আছে। গর্ভমন্দিরের সম্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকে বহু কারুকার্য্য ও জীবজন্তুর ছবি আছে। উহা হইতে তাৎকালিক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১] গোপীনাথের জোড়-বাঙ্গালার যে দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ইষ্টক-লিপি আছে :

'ক্ষিতি মুনি রস চন্দ্রে শাকবর্ষেঽতিভাগ্যাৎ
হরিহর-পদযুগ্মং শ্রীযুতং স প্রণম্য।
বৃষগত দিননাথে মিত্র-বংশোদ্ভবোঽন্ধো
রচয়তি হরিরামো গোপিকানাথমঞ্চম্॥ শকাব্দা ১৬৭১।১১।২৩'

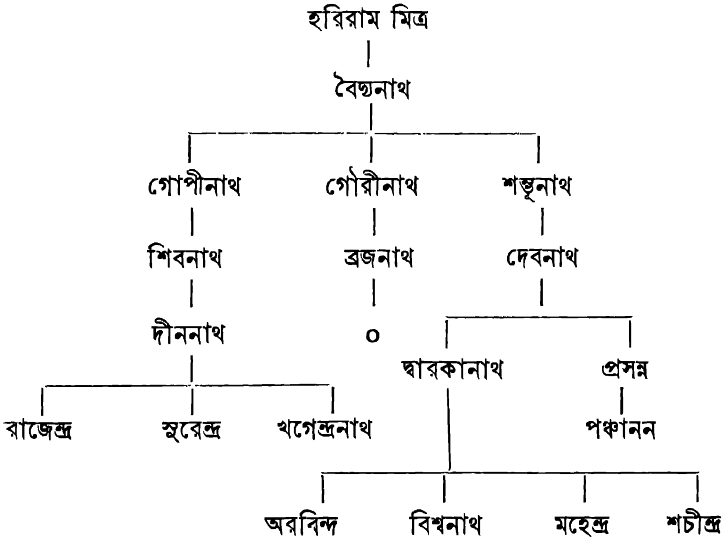
ক্ষিতি=১, মুনি=৭, রস=৬, চন্দ্র=১; অঙ্কের বামগতিতে ১৬৭১ শাক বা ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ ১৬৭১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে মিত্রবংশীয় অন্ধতুল্য হরিরাম সৌভাগ্যবশে শ্রীযুক্ত হরিহর পাদদ্বয়ে প্রণাম করিয়া গোপীনাথের এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। গোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পদপ্রান্তে লিখিত আছে :

'বাঞ্ছাপ্রদ গোপীনাথ ত্বয়ি যাচে।
চিত্তং হরিরামস্যান্তাং তব পাদে॥'

১ মন্দিরের গায়ে একদিকে উষ্ট্র, পালকী, হস্তী ও হাওদা এবং অন্যদিকে বিতাড়িত হরিণের পালের পশ্চাতে বর্শা হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে শিকারী ও তাহার পশ্চাতে কুকুর ছুটিতেছে। তাহার পশ্চাতে শিকারী পালকীতে এবং শিকারলব্ধ হরিণ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া চলিতেছে। সুন্দরবনের সান্নিধ্যের ১লা কে যে এভাবে শিকার করিতে ভালবাসিতেন, তাহা বিচিত্র নহে।

এইরূপ রাধিকার পাদপদ্মে লিখিত আছে—'যাচে তব পাদে ভক্তিং হরিরামঃ।' হরিরামের ইষ্টমূর্ত্তিদ্বয় এখনও তাঁহার ভক্তির কাহিনী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

হরিরামের বংশ দেওয়ান বংশ, পুরুষানুক্রমে তাঁহার বংশধরেরা চাঁচ্ড়া সরকারে দেওয়ানী প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন ; চাঁচ ড়া-রাজের পতনকালেও শিবনাথের পুত্র দীননাথ পেশ্‌কার ছিলেন। দীননাথের তৃতীয় পুত্র খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, সাহিত্য-পরিষদের প্রধান সেবক, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, নিজে যেমন সুলেখক, তেমনি সুরসিক ও সুগায়ক। বংশধারা এইরূপ :



উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

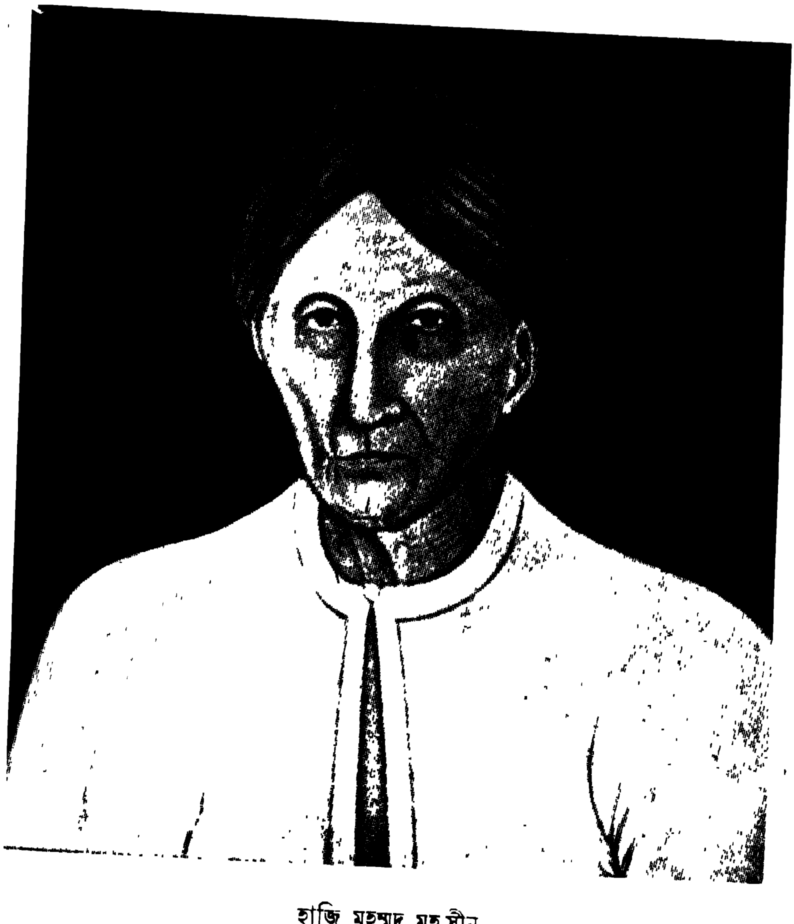
সৈদপুর জমিদারী

চাঁচ্‌ড়া জমিদারীর চারি আনা অংশ কি ভাবে মীর্জা মহম্মদ সালাহ্‌-উদ্দীনের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে উক্ত সালাহ্‌উদ্দীন কে, এবং তাঁহার সম্পত্তির পরিণামই বা কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিব। চাঁচ্‌ড়ার ইতিবৃত্তে বার আনার অবস্থা কাহিনী বলা হইয়াছে; অবশিষ্ট এই চারি আনার কথা না বলিলে চাঁচ্‌ড়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না।

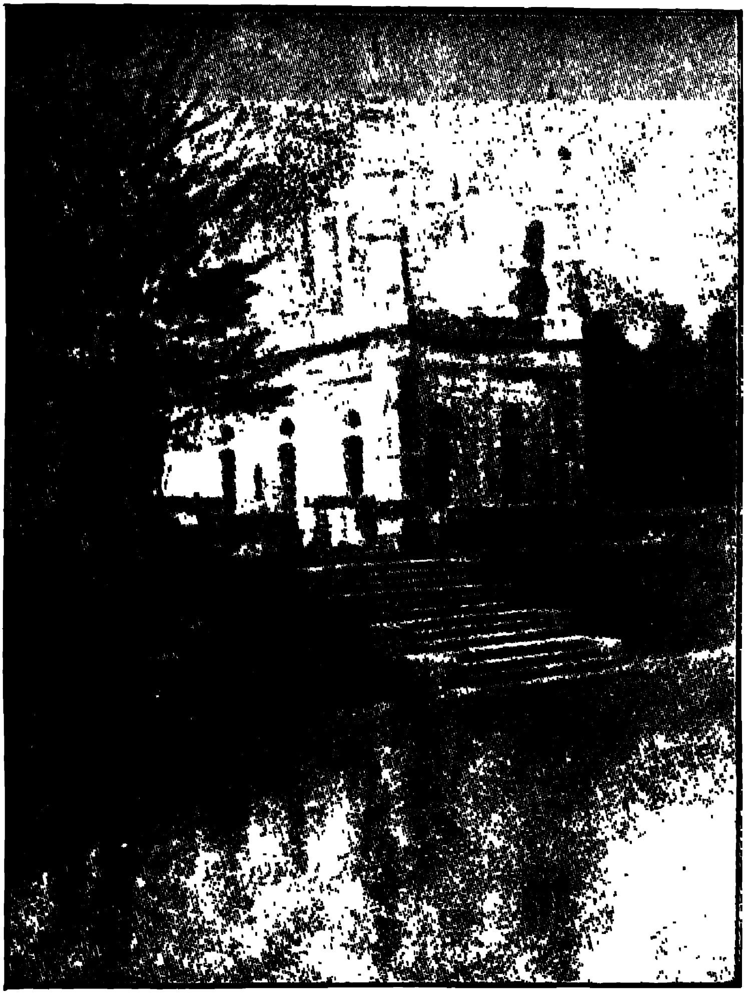
মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বঙ্গের নবাব তখন আগা মুতাহর নামক একজন পারস্য-দেশীয় ভদ্রলোক ইস্পাহান সহর হইতে দিল্লী আসেন এবং রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া কার্য্যদক্ষতাগুণে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে কিছু জায়গীর লাভ করিয়া সপরিবারে হুগলীতে আসিয়া বাস করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য গৌরব হুগলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; হুগলী তখন সমৃদ্ধ সহর এবং আগা মুতাহার তথাকার একজন প্রথম আমলের বিশিষ্ট অধিবাসী। তিনিই প্রথম হুগলীতে একটি ছোট ইমামবারা এবং নিজ বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তিনি ধীর স্থির চরিত্রবান লোক, ব্যবসা বাণিজ্যে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কিন্তু কলহপ্রিয় স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহারে সংসারে তাঁহার শান্তি ছিল না। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একমাত্র সন্তান, একটি কন্যার জন্ম হয় (১৭২২) ও তাহার নাম রাখেন মন্নুজান খানম্। এই কন্যাই তাঁহার স্নেহের পুত্তলী ছিল; মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া সেই কন্যাকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান (১৭২৯)।[১]

আগা মুতাহার হুগলী আসিবার পর, তাঁহার ভগিনীপতি আগা ফজলউল্যা এবং তৎপুত্র হাজি ফৈজউল্যাও পারস্য হইতে বঙ্গে আসিয়া হুগলী ও মুর্শিদাবাদ

১ কথিত আছে, মুতাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্যাকে একটি তাবিজ দিয়া বলিয়া যান যে, উহা যেন তাঁহার মৃত্যুর পরে ভিন্ন খোলা না হয়; খুলিলে উহার ভিতর একটি অমূল্য জিনিস পাওয়া যাইবে। মৃত্যুর পরে তাবিজের মধ্যে একখানি দানপত্র পাওয়া গেল, তদ্দ্বারা মুতাহার তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি হইতে স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া উহা কন্যাকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। —Bradley-Birt, *Twelve Men of Bengal*, p. 37.



হাজি মহম্মদ মহ্‌সীন



তেতুলিয়ার মসজিদ

উভয় স্থানে বাণিজ্য করিতেন ; পরে পিতার মৃত্যুর পর হাজি ফৈজউল্যাও হুগলীতে বাস করেন। কিন্তু তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য নানা ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। মুতাহর-পত্নী বিষয়সম্পদে বঞ্চিত হইয়া এই হাজি ফৈজউল্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই শুভ পরিণয়ের একমাত্র সন্তান—মহম্মদ মহ্‌সীন, হুগলীতে ভূমিষ্ঠ হন (১৭৩০)। এই দানবীর সাধুপুরুষের জন্মলাভে হুগলী পবিত্র হইয়াছিল।

ভ্রাতা ও ভগিনী, মহ্‌সীন ও মন্নুজান উভয়ে মুতাহারের সংসারে ফৈজউল্যার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। বালিকা মন্নুজান সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও হাজি ফৈজউল্যা তাহার পরিচালনা করিয়া সকলে সুখসমৃদ্ধিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তিনি পুত্রকন্যার জন্য আগা সিরাজী নামক একজন সুপণ্ডিত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্নুজান বৈপিতৃক ভ্রাতা মহ্‌সীন অপেক্ষা ৮।৯ বৎসরের বড় এবং মহ্‌সীনকে বড় ভালবাসিতেন। একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহ্‌সীন মুর্শিদাবাদে গিয়া কোরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ শুনা যায়, ভ্রাতা ভগ্নী উভয়ে ভোলানাথ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত বিদ্যা ও সেতার শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে মহ্‌সীনের মাতা ও পিতা উভয়ে কালপ্রাপ্ত হইলেন। এ সময়ে মন্নুজান অপূর্ব্ব সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী ; ভ্রাতা ভিন্ন তাঁহার জগতে আর কেহ রহিল না ; কিন্তু রহিল বিপুল সম্পদ, তজ্জন্য বহু জনে তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইতে লাগিল। এমন কি শত্রুতে তাঁহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল, মহ্‌সীনের কৌশলে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কিছুদিন মধ্যে হুগলীর নায়েব ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ সালাহ্‌উদ্দীনের সহিত মন্নুজানের বিবাহ হইয়া গেল। মীর্জা সালাহ্‌উদ্দীন আগা মুতাহারের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ইস্পাহান হইতে হুগলীতে আসেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে তিনি নবাব সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন এবং মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি-সম্পাদনের কালে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়া নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। তাঁহার অনুরোধে বাদশাহ মীর্জাকে খেলাত ও জায়গীর দিয়া অনুগৃহীত করেন।[১]

১ Dey, S. C., *Hooghly, Past and Present*, p. 74.

এই সময়ে তিনি মাসিক ১৫০০৲ টাকা বেতনে হুগলীর নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং মন্নুজানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১৭৫২)।

মন্নুজান কয়েক বৎসরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে দাম্পত্য জীবন সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল, তাই দানখয়রাতে তাঁহারা অনেক অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। মন্নুজান পিতার নিকট হইতে যে ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামী বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর পান, তাহার অধিকাংশই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪ পরগণা জমা দেন, তখন কতকাংশ উভয়ের সেই সম্পত্তি হইতে লওয়া হয়। ইহারই পবিবর্ত্তে সালাহ্‌উদ্দীন কি ভাবে নবাবের আদেশে চাঁচ্‌ড়া জমিদারীর বেওয়ারিশ চারি আনা অংশ দখল করিয়া লন, আমরা তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।[১] ঐ ঘটনার ৫।৬ বৎসর পরে সালাহ্‌উদ্দীনের মৃত্যু হয় (হিজরী ১১৭৬ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ)।[২]

কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মহ্‌সীন মুর্শিদাবাদ হইতে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। শৈশব হইতে তাঁহার সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম দেহ এবং সুন্দর সংযত চরিত্র ছিল। নিস্পৃহ স্বভাব এবং গভীর ধর্ম্মপ্রাণতা প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার জীবনকে ধন্য করিয়াছিল। আগা সিরাজীর মুখে মুখে সরস ভাষায় বহু তীর্থস্থানের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া তাঁহার মনে দেশ-ভ্রমণের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। দরিদ্রের মত তাঁহার আহার, ফকিরের মত বেশ এবং প্রবীণ পণ্ডিতের মত তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা। তাঁহার হস্তলিপি এত সুন্দর ছিল যে, লোকে হাজার টাকা দিয়াও তাঁহার হাতের লেখা একখানি কোরাণের পুঁথি কিনিত। ভ্রমণে বাহির হইয়া, তিনি দিল্লী হইতে আরবে গিয়া, মক্কা মদিনা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দর্শনের পর 'হাজি' উপাধিধারী হইলেন এবং পরে পারস্য, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে

১ সরকারী রিপোর্টেও আছে : 'A considerable dismemberment by *Sunnad* from original Zemindary called Jessore *alias* Yusefpur, took place, in favour of a Mussalman landholder, Sellahud-dien Mahomed Khan, including under the head of Saidpur, one-fourth of that pergunnah with the like proportion nearly of ancient painam or territorial jurisdiction of Yusefpur.'

২ ইমামবারার পার্শ্বে সালাহ্‌উদ্দীনের সমাধির উপর এই হিজরী তারিখ দেওয়া আছে।

সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। এই সময়ে পারস্যদেশে নজফ্ সহর প্রাচ্য জ্ঞানচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।[১] লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফ্উদ্দৌলা তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। অবশেষে এইভাবে ২৭ বৎসর কাল নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রায় ৬০ বৎসব বয়সে ভগিনীর একান্ত অনুরোধে হুগলীতে ফিরিয়া আসেন। আসিয়া দেখিলেন বহুদিন পূর্ব্বে মীর্জার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার ভগিনী আর বিবাহ না করিয়া হিন্দুবিধবার মত নির্ম্মল জীবন যাপন করিতেছেন; তাঁহার কোন সন্তানাদিও নাই। মন্নুজান অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে যশোহরের কাছে মুড়লীতে তাঁহার কাছারী বাটী ছিল এবং তথায় একটি সুন্দর ক্ষুদ্র ইমামবারা নির্ম্মিত হয়, উহা এখনও আছে। তাঁহার সম্পত্তির আয় বার্ষিক প্রায় ৫০ হাজার টাকা; দানশীলা মহিলা নানা সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। মহ্সীন আসিয়া ভ্রাতাভগিনীতে পুনরায় মিলিত হইয়া কয়েক বৎসর কাল স্বচ্ছন্দে কাটাইলেন। মহ্সীন তখনও অকৃতদার এবং বিবাহ করিতেও চাহিলেন না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নুজান খানম্ তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিয়া ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলেন।

হাজি মহম্মদ মহ্সীন সন্ন্যাসীর মত ত্যাগী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি ভাবিলেন, এ সম্পত্তি লইয়া কি করিবেন! অনেক ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। সাত্ত্বিক দানের অপূর্ব্ব মহিমা জগতে বিঘোষিত করিয়া উপযুক্ত পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইল। ১২২১ হিজরী বা ১২১৩ সালের ১৯শে বৈশাখ (১৮০৬) তারিখে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিয়া আরবী ভাষায় লিখিত এক তৌলত নামা বা দানপত্র লিখিয়া দিলেন। উহা জীর্ণ অবস্থায় এখনও আছে এবং উহার প্রতিলিপি হুগলীর ইমামবারার গায়ে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এখানে তাহার সারমর্ম্ম মাত্র দিতেছি:

'আমার নাম হাজি মহম্মদ মহ্সীন, পিতার নাম হাজী ফৈজুল্যা, পিতামহের

---

১ *Twelve Men of Bengal*, p. 41.

পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহানের এক অংশকে নজফাবাদ বা নজফ্ সহর বলে। এই স্থানেই মহ্সীন কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন; তাঁহার পিতা হাজি ফৈজউল্যা ইস্পাহানের অধিবাসী।

নাম আগা ফজলুল্যা, নিবাস হুগলী। আমি সজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে এই দানপত্র সম্পাদন পূর্ব্বক এই বিধান করিতেছি। যশোহরের অধীন পরগণা সৈদপুর ও শোভনাল আমার জমিদারীভুক্ত ;[১] হুগলীর ইমাম্‌বারা, ইমাম্‌বাজার ও হাট, এবং ইমাম্‌বারার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আমি। আমি উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সকল সম্পত্তির অধিকারী। আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিতেছি। আমার লিখিত বিধান অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদায় দানকার্য্য চিরকাল চলিতে থাকিবে। আমার প্রিয় সুহৃদ রজব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁকে আমি মাতোয়ালী নিযুক্ত করিলাম। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা নিম্নলিখিতরূপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কার্য্য চালাইবেন। তিন অংশ ফতেয়া, মহরমোৎসব ও ইমাম্‌বারা ও মস্‌জিদের সংস্কার কার্য্যে ; দুই অংশ মাতোয়ালী-গণের পারিশ্রমিক জন্য ; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্ম্মচারিগণের বেতন ও স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা অনুসারে মাসিক বৃত্তি দানে ও দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয়িত হইবে। কোন মাতোয়ালী কার্য্যসম্পাদনে অক্ষম হইলে, তিনি অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্ত্তী করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা আমার চরম দান-পত্ররূপে গণ্য হইবে।'[২]

বঙ্গদেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উচ্চশ্রেণীর সাত্ত্বিক সর্ব্বস্বদানের কথা আর শুনি নাই ; এক দান-পত্রের ফলে একটি সম্প্রদায়ের এমন চির-কল্যাণও বুঝি, আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। মহ্‌সীন নররূপী দেবতা।

১ মন্ন্‌জানের সময়ে তরফ শোভনাল হুগলীর ইমাম্‌বারার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পৃথক্‌ভাবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।—Westland, *Jessore*, p. 138. তখন হইতে চারি-আনীর জমিদারীর অবশিষ্টাংশ সৈদপুর নামে অভিহিত হয়, এই সৈদপুর একটি পরগণা নহে, ইহার মধ্যে সৈদপুর, ইশফপুর, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণার কিছু কিছু লইয়া এই নূতন সৈদপুর নাম গঠিত হইয়াছিল। এইভাবে বার-আনী জমিদারীকে ইশফপুর বা যশোহর জমিদারী বলিত। শোভনাল ও সৈদপুর খুল্‌না কালেক্টরীর পৃথক্ পৃথক্ তৌজিভুক্ত। উভয় একত্রযোগে সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেট্ বলিয়া কথিত হয় ; মুসলমানগণ ইহাকে ওয়াক্‌ফ জমিদারী বা ন্যাস-সম্পত্তি (Trust Estate) বলেন, সাধারণ লোকে সহজ কথায় ইহাকে চারি-আনীর জমিদারী বলেন।

২ রজব আলি ও সাকের আলি নামক দুই বন্ধুকে হাজি মহোদয় পারস্যদেশ হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইঁহারা যেমন উচ্চবংশীয়, তেমনি উচ্চশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক।

শুধু যশোহর-খুল্‌নার সর্ব্বত্র কেন, বঙ্গের সকল লোকে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিয়া থাকেন। দান-পত্র সম্পাদনের পর মহ্‌সীন ৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৮১২ খৃঃ অব্দে (১২১৯ সাল, ১৬ই অগ্রহায়ণ) হাজি মহম্মদ মহ্‌সীন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

অল্পদিন পরেই মহ্‌সীনের নির্ব্বাচিত মাতোয়ালীদ্বয় তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। যাঁহারা নূতন মাতোয়ালী হইলেন, তাঁহাদের সময়ে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান লইয়া অত্যন্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল ; তখন গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের আদেশমত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যশোহরের কালেক্টরের উপর অর্পিত হইল ; হুগলীর কালেক্টর সহকারীরূপে থাকিলেন। পূর্ব্ববৎ মূড়লীতেই সদর কাছারী থাকিল, কিন্তু কিছুদিন মধ্যে সে কাছারী-বাটী দগ্ধ হওয়ায় কাগজপত্র বিনষ্ট হয় ; তখন যশোহরের কালেক্টর টুকার সাহেব পুনরায় এই মহল জরিপ জমাবন্দী করেন (১৮১৭-১৯)। ১৮২৩ অব্দে ষ্টেটের অধিকাংশ পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় বার্ষিক আয়ও যেমন বাড়িয়া গেল, সেলামী প্রভৃতি বাবদ নগদও ৫,৭০,০০০৲ টাকা আদায় হইল। ১৮১০ অব্দের আইন মত গভর্ণমেণ্ট সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব হাতে লইলে মাতোয়ালীগণ প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইয়া পরাজিত হন (১৮৩৫)। এ পর্য্যন্ত উইলের সর্ত্তানুসারে সকল খরচ না হওয়াতে আরও প্রায় ৫ লক্ষ টাকা জমিয়া গিয়াছিল। উভয় দফায় মোট ১০,৫৭,০০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্টের হাতে সঞ্চিত হয়। ১৮৩৫ অব্দে যখন স্যার চার্লস্‌ মেটকাফ গভর্ণর জেনারাল হন, তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের প্রথম চেষ্টা হইতেছিল। তিনি স্থির করেন যে, মহসীনের সম্পত্তির উক্ত সঞ্চিত অর্থ উইলোক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে না ; ইমাম্‌বারার সংস্কারাদি খরচ বাদে ঐ টাকার যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দিয়া তিনি 'মহসীন শিক্ষাভাণ্ডার' (Mohsin Education Endowment Fund) গঠন করেন এবং উহা দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রচারের সাহায্যকল্পে হুগলীর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ মহ্‌সীন ধর্ম্মার্থ সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান ; তিনি তাঁহার উইলে স্পষ্টতঃ শিক্ষার জন্য কিছু দিয়া যান নাই। মেটকাফ্‌ মনে করিলেন, উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, উহা দ্বারা উইল-সম্পাদনকারীর অভিমত সদ্ব্যয়ই ("a pious use within the Testator's intention") হইবে। মেটকাফের ব্যবস্থায় দুইজন মাতোয়ালী স্থলে একজন হইল এবং তজ্জন্যও বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা

উক্ত ভাণ্ডারভুক্ত হইল।[১] পর বৎসর হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮৩৬)।

নূতন মাতোয়ালী সৈয়দ কেরামত আলি খাঁর সময় (১৮৩৭-৭৫) সমস্ত কার্য্য সুন্দরভাবে চলিতে থাকে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে দুইলক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে হুগলীর অপূর্ব্ব ইমাম্‌বারা নির্ম্মিত ও উহাতে প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হয় (১৮৪৮)।

ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে ভাবে মহ্‌সীন ফণ্ডের সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইতেছিল, তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ক্রমে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে লাগিল। তাঁহারা বলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় উইলকারীর অভিমত হইতে পারে না; আরবী, পারসী ভাষা এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্যই এই ফণ্ডের অর্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত। সে প্রস্তাবে ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সম্মত হইলে, তাঁহার অনুরোধমত ১৮৭৩ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক উহা মঞ্জুর করেন। তদবধি মহ্‌সীন ফণ্ড নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়া উহা হইতে বহু মাদ্রাসার সাহায্য, মুসলমান ছাত্রগণের জন্য বিশিষ্ট মহ্‌সীন বৃত্তি, ও স্কুল-কলেজের মুসলমান ছাত্রের বেতনের সাহায্যকল্পে প্রতি বৎসর বহু অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে।

গভর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থায় মহ্‌সীন ফণ্ড হইতে শিক্ষা প্রচারের সমধিক সাহায্য হওয়ায় বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের যে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান, শুধু স্বজাতিকুলপাবন দানবীর মহ্‌সীনের নিকট নহে, গভর্ণমেণ্টের নিকটও চিরঋণী রহিবেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক যুগে যে সকল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা শিক্ষা-গৌরবে হিন্দুভ্রাতৃগণের সঙ্গে যে সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার প্রধান কারণ এই সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেট; এই জমিদারী যশোহর-খুল্‌নার অঙ্গীভূত বলিয়া এই দুই জেলার নিকট তাঁহারা অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাই যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস হিন্দুর মত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও গৌরবের ইতিহাস। আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই এককালে মহসীনের বৃত্তিভুক্ ছিলেন। কলিকাতা

---

১ Clay, W. M., *Note on the Mohsin Endowment and Syedpur Trust Estate*, p. 8.

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, বর্ত্তমান বিলাতী প্রিভি কৌন্সিলের সুযোগ্য বিচারপতি, বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, সুপণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলি, বঙ্গীয় লাট কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য মহামতি স্যর আবদার রহিম, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির সভাপতি, নবাব স্যর সৈয়দ সাম্‌সুল হুদা, রেজিষ্ট্রেশন বিভাগেব প্রধান কর্ত্তা, আমীন্-উল ইস্‌লাম্ প্রভৃতি, কতজনের নাম করিব, সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের শিক্ষার পথ এই মহ্‌সীনের বৃত্তি এককালে সুগম করিয়া দিয়াছিল।

মন্নুজানের সময় হইতে সৈদপুব জমিদারীর কাছারী মুড়লীতে ছিল। গভর্ণমেণ্ট উহা হাতে লওয়ার পরেও কাছারী সেখানে ছিল। সে গৃহ দগ্ধ হওয়ার পর আফিস যশোহর কালেক্টরীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ অব্দে খুল্‌না পৃথক্ জেলারূপে পরিণত হইলে, সৈদপুর ষ্টেটের সদর আফিস খুল্‌নায় উঠিয়া যায় এবং খুল্‌নার কালেক্টরই উহার এজেণ্ট হন। কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন সুযোগ্য ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। পত্তনী বন্দোবস্তের সময় মহেশ্বর-পাশা ও খালিসপুর পরগণা ব্যতীত আর অধিকাংশ মহলই পত্তনী দেওয়া হয়। এই দুই মহলের খাস তহশীলের জন্য দৌলতপুবে একটি প্রধান কাছারী আছে। সমগ্র ষ্টেটের হস্তবুদ আদায় এবং নির্দ্দিষ্ট দেয় রাজস্বাদির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ মহলানুযায়ী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :

তৌজির নম্বর	মহল	খাজানা	সেস্	মোট হস্তবুদ	গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব	সেস্	মোট
১৮৮	পরগণা সৈদপুর	১,৭৭,০৬১৲	২০,৫৪৭৲	১,৯৭,৬০৮৲	৯৩,১৬২৲	২২,৩৭৯৲	১,১৫,৫৪১৲
১৭৫	শোভনাল	৩,৫৬৫৲	৪৪৯৲	৪,০১৪৲	২,০৪৩৲	৪৯৭৲	২,৫৪০৲
৫৭১	চরভদ্রনদী	৩৪৲	৫৲	৩৯৲	৩০৲	৫৲	৩৫৲
	সমষ্টি	১,৮০,৬৬০৲	২১ ০০১৲	২,০১,৬৬১৲	৯৫,২৩৫৲	২২,৮৮১৲	১,১৮,১১৬৲

বর্ত্তমান সময়ের বাৎসরিক জমাখরচের হিসাব নিম্নে দিতেছি। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, যাবতীয় খরচ বাদে এই ষ্টেটের প্রকৃত আয় ৬৮,০৬৩৲ টাকা। তন্মধ্যে মাসিক ৫,০০০৲ টাকা হিসাবে বৎসরে ৬০,০০০৲ খুল্‌না হইতে হুগলীর

মাতোয়ালীর নিকট প্রেরিত হয়। উহা দ্বারা ইমাম্‌বাড়ীর খরচ চলে। অবশিষ্ট আয়ের টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট জমা থাকে। হুগলীর খরচের জন্য অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহা মাতোয়ালীকে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া লইতে হয়। গভর্ণমেণ্ট যখন এই ষ্টেট প্রথম হাতে লন, তখন সেস্ আদায়ের পদ্ধতি হয় নাই। তখন হস্তবুদ আদায় মোট ১,২৪,৬৮৯৲ টাকা ছিল। এখন সেস্ বাদে শুধু হস্তবুদ খাজনা আদায়ই ১,৮০,৬৬০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া ষ্টেটের আয় ৫৫,৯৭১৲ টাকা বাড়িয়াছে।

১৯২০-২১ অব্দের হিসাব

জমা		খরচ	
খাজনা আদায় (সুদ সমেত)[1]	১,৮৮,০০০৲	গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ···	৯৫,২৩৫৲
সেস্ (সুদ সমেত)	২১,৭০০৲	উপরিস্থ মালেকের খাজনা	৫৲
গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত টাকার সুদ	৪১৫৲	সেস্ ···	২২,৮৮১৲
মোট ···	২,১০,১১৫৲	সরঞ্জাম খরচ ···	১০,০১৮৲
		মোকদ্দমা খরচ ···	১,৩০০৲
		পেনসন্ হিসাবে ···	১,০৩০৲
		স্কুল কলেজে বৃত্তিদান	৪,১১৬৲
		ডিস্পেন্সারীর সাহায্য	১,২৭২৲
		খুজুরা দান ···	১০০৲
		ট্যাক্স ও খুজুরা খরচ	৪৫৲
		আদায় ও হিসাব পরীক্ষা জন্য সরকারী কমিশন	৬,০৫০৲
		মোট খরচ ···	১,৪২,০৫২৲
		প্রকৃত আয় ···	৬৮,০৬৩৲
		সমষ্টি ···	২,১০,১১৫৲

১ সুদ লওয়া বা দেওয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। স্বজাতির আচারনিষ্ঠ হাজি মহম্মদ মহ্‌সীন কখনও এ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার প্রদত্ত ন্যাস-সম্পত্তির আদায় তহ্‌শীল ব্যাপারে সুদ গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা সীতারাম রায়

আমাদের ইতিহাস বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে আসিয়া পড়িয়াছে। আকবরকে লইয়া মোগল রাজত্বের উত্থান, আওরঙ্গজেবের সময় তাহার চরম উন্নতি ও পতন। আকবরের সময় মোগল যখন বঙ্গে নূতন আসিতেছিলেন, পাঠান ও হিন্দুতে মিলিয়া তাঁহাদের গতিপথ রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন—মহারাজ প্রতাপাদিত্য, তিনি যশোহর-খুল্‌নার দক্ষিণাংশের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র। আবার আওরঙ্গজেবের সময়, মোগলেব কঠোর শাসনের প্রপীড়নে নির্জ্জীব পাঠানদলের পুনরুত্থান চেষ্টার সহায়তায়, বঙ্গে যে হিন্দু-শক্তির পুনরুন্মেষ হইয়াছিল, তাহার অন্যতম অগ্রদূত রাজা সীতারাম রায়, তিনি যশোহর-খুল্‌নার উত্তরভাগের প্রধান ঐতিহাসিক পুরুষ। উভয়ের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে, উভয়ের প্রতিপত্তির ব্যাপকতায় সমগ্র যশোহর-খুল্‌না বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাই এই উভয়ের কথাই দেশের কথা,—দেশের ইতিহাসের প্রধান অংশ। অনেক দেশের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, ঠিক একশত বৎসরের পর এক একবার জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। বঙ্গেও তাহাই হইয়াছিল—১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, ১৬৯৯ অব্দ হইতে সীতারাম স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব আরম্ভ করেন। প্রতাপের কথা বলিয়াছি, এখন সীতারামের কথা বলিব। বহু অপবাদ ও আবর্জ্জনার অন্তরাল হইতে অতিকষ্টে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের কতক উদ্ধার করা হইয়াছে, বহু উপন্যাস ও 'রচা কথা' সরাইয়া রাখিয়া সীতারামের কথা শুনাইতে হইবে।

উপন্যাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। অবিকৃত, অকৃত্রিম, কঠোর সত্য লইয়া ইতিহাস গঠিত; আর সামান্য অস্থিমজ্জার উপর কল্পনার উন্মেষে কৃত্রিম ঘটনাবলীর ঘনসন্নিবেশে উপন্যাস রচিত হয়। কঙ্করময় কঠোরই হউক, বা কোমল শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি; সে পথ আছে, তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে। উপন্যাসের পথ বহু সংখ্যক; লেখক ও পাঠকের রুচি অনুসারে, সে পথ ইচ্ছামত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প; উপন্যাসের লেখক ও পাঠক অসংখ্য,

পয়সা ও পসার উভয়ই ঔপন্যাসিকের একায়ত্ত। ইতিহাসকে অতি সহজেই উপন্যাস করা যায়, ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা রক্ষা না করিলেই উপন্যাস হইয়া পড়ে। কিন্তু উপন্যাসকে কোন মতেই ইতিহাস করা চলে না। আজকাল আমাদের দেশে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে এক জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। উহাদের নায়ক নায়িকা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, দুই একটি প্রধান ঘটনাও সত্যানুগত হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্রালঙ্কার ও পত্র-পল্লব অধিকাংশই ঔপন্যাসিক ও কাল্পনিক। এ জাতীয় গ্রন্থ দ্বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। সুখপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্যাসের আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উপন্যাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্ত্তাও কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। বঙ্গদেশের প্রকৃতিগুণে এ দেশেব লোক কিছু কাব্যপ্রবণ; এত নিরক্ষর কবি অন্যদেশে নাই; একটি কোন নূতন ঘটনা পাইলে, তাহার সহিত অপ্রাকৃত গল্প যোজনা করিয়া কিম্বদন্তীর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়, আর তথাস্তুবাদিগণ উহাকে বাস্তব সত্যের মত পূজা করেন। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও সে কিম্বদন্তীর গুরুভার হইতে সত্যোদ্ধার করা সমস্যার বিষয় হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু এ পুস্তকে কয়েকটি নামধাম ব্যতীত আব প্রায় সকলই ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্রও স্বয়ং এ বিষয়ে 'বেকসুর খালাস হইবার ভবসায় কবুল জবাব দিয়া' গ্রন্থারম্ভেই লিখিয়া গিয়াছেন,—'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই; গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' কিন্তু সে ভূমিকার কথা ভূমিকাতেই আছে, লোকে তাহা শুনে না বা মানে না, উপন্যাসের গল্পকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লয়। 'একে উপন্যাস, তাহাতে বঙ্কিমের অব্যর্থ সন্ধান, সুতরাং লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই।'[১] উপন্যাসের ফল ফলিয়াছে; রঙ্গমঞ্চে সীতারামের দৌলতে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জিত হইতেছে। অবশ্য ঐতিহাসিকতা লইয়া বিচার না করিলে, 'সীতারাম' গ্রন্থ যে সাহিত্য-জগতে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে

১ 'সাহিত্য,' ১৩০২, কার্ত্তিক (অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়)।

ইতিহাস না থাকিলেও, ইহার প্রসারের প্রভাবে ঐতিহাসিকতা মাথা তুলিতে পারিতেছে না।[১]

সীতারামের কোন প্রামাণিক লিখিত ইতিহাস নাই। রিয়াজ-উস-সালাতিন বা ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে যাহা আছে, তাহা বিকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং আত্মপক্ষ সমর্থনকারী মোগল শাসকের নিজেব কথা। সুতরাং প্রকৃত চিত্র তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপর দিকে, প্রবাদাদিতে হিন্দুপক্ষেব কথা যাহা আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহার মধ্যে এত মতবাদ এবং অবাস্তব গল্প পাওয়া যায় যে, প্রকৃত কাহিনী বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। দুষ্কর হয় বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলি শিলালিপি, সীতারামের স্বাক্ষর-সম্বলিত কতকগুলি সনন্দ, তাঁহার সহচর বা সমসাময়িকগণের বংশ-কাহিনী, দেশের গাত্রে যেখানে সেখানে সীতারামেব কীর্ত্তিচিহ্ন—এই সকল বিষয়ের সহিত তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় করিলে, সীতারামের ইতিহাসের অন্ততঃ অস্থিপঞ্জর খাড়া করা যায়। আর আমি দেশের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসংখ্য সহৃদয় বন্ধুবর্গকে বিরক্ত করিয়া চাক্ষুষ প্রমাণের বলে যাহা সংগ্রহ বা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহাও সংক্ষেপে সতর্কভাবে প্রকটিত করিব। সীতারাম সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থ বা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে

১ মৎপ্রণীত 'সীতারামের ধর্ম্মপ্রাণতা' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'ঐতিহাসিক চিত্র', ১৩১১ কার্ত্তিক।—'যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমায় মহম্মদপুরে সীতাবাম রাজত্ব করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল মাগুরার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনই তিনি একদা সীতারামের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিবাব জন্য মহম্মদপুরে যান। তখন সেস্থান বড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ সে জঙ্গলে ঢুকিয়া সকল চিহ্ন দেখিতে তাঁহার উদ্যোগ হয় নাই। তিনি তথাকার ৺রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্প-রসিক কর্ম্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ মুখোপাধ্যায় ২।৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ হইয়া মাগুবায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন। ইহাব পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল যাজপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেখানকার বৈতরণী নদী ও শৈলশ্রেণীর চিত্র তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই মহম্মদপুর ও যাজপুরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়া তিনি স্বকীয় অসামান্য প্রতিভাবলে অতুলনীয় গল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।' 'সীতারামে'র প্রাকৃতিক বর্ণনার অনেক পংক্তি স্বর্ণমুষ্টির মত মূল্যবান। রাইচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ সময় যে অসম্পূর্ণ সীতারাম গল্প লিখিয়াছিলেন, ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্য তাহা হইতে স্বীয় পুস্তকের জন্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের সাহায্য লইতে ভুলি নাই ;[১] তবুও ভুল অনেক করিতে পারি এবং তাহা সংশোধনের যোগ্য ; তবে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি, আমার চেষ্টা বা চিন্তার ত্রুটি হয় নাই।

সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। তিনি চিত্রগুপ্তের পুত্র বিশ্বভানুর বংশে জাত কাশ্যপদাস বংশীয়।[২] উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে বাৎস্য সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদ্গল্য দাস ও কাশ্যপ দেবদত্ত আদিশূরের সময় বঙ্গে আসেন ; এই পাচ ঘরই প্রধান বীজপুরুষ বলিয়া খ্যাত। কিছুকাল পরে আরও চারি ঘর আসিয়া উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণিভুক্ত হন—শাণ্ডিল্য ঘোষ, কাশ্যপদাস, মৌদ্গল্য কর ও ভরদ্বাজ সিংহ। উত্তর রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা সামাজিক সম্মান স্থির করিয়া লন। তন্মধ্যে বাৎস্য-গোত্রীয় সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ এই দুই ঘর কুলীন বলিয়া উচ্চ সম্মানিত এবং অপর সকলে মৌলিক বলিয়া পরিচিত। মৌলিকদিগের মধ্যে মৌদ্গল্য কর ও ভরদ্বাজ সিংহ সেরূপ প্রতিপত্তিশালী নহেন বলিয়া প্রত্যেকে সিকিঘর বলিয়া কথিত হন। তাহা হইলে মোট উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সংখ্যা সাড়ে সাত ঘর। পাল রাজগণের সময়ে ইঁহাদের অনেকেই বঙ্গের নানাস্থানে সিংহাসন পাতিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।[৩] তন্মধ্যে কাশ্যপদাসবংশ কুসুম্বা অঞ্চলে রাজা ছিলেন। চাঁচ্‌ড়ার রাজগণ যে বাৎস্য সিংহ বংশীয় কুলীন এবং তাঁহারা মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ অঞ্চল হইতে যশোহরে আসেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠান আমলে কাশ্যপদাসেরাও ঐ ফতেসিংহ প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। এই বংশে সীতারামের উদ্ভব।

১ মধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক 'নব্যভারতে' এবং বরদাকান্ত দে কর্ত্তৃক 'হিন্দুপত্রিকায়' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি, আই, ই ও ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত সীতারাম বিষয়ক গ্রন্থ, ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও হাণ্টারের বিবরণী, ষ্টুয়ার্টের বঙ্গেতিহাস ও গোলাম হুসেন সেলিম কৃত 'রিয়াজ-উস-সালাতিন', কালীপ্রসন্নের 'নবাবী আমল' ও নিখিলনাথের 'মুর্শিদাবাদ'—আরও অসংখ্য ইংরাজী বাঙ্গালা সাময়িক প্রবন্ধ আমার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। লেখকদিগের বিশিষ্ট মত যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

২ 'চিত্রগুপ্তাত্মজঃ শ্রীমান্ কায়স্থো বিশ্বভানুকঃ।
তদ্বংশ সম্ভূতো গোত্রঃ কাশ্যপো দাস এব চ॥'—পঞ্চাননশর্ম্ম-রচিত উত্তর-রাঢ়ীয় কারিকা

৩ নগেন্দ্রনাথ বসু—'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্যকাণ্ড, ১৪০ পৃ।

এই কাশ্যপদাস বংশে, ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন রামদাস খাঁ। বর্ত্তমান কান্দী মহকুমার অন্তর্গত খড়গ্রাম থানায় কু'নে-সিদ্ধেশ্বরী বা কুনিয়া নামক এক গ্রাম আছে, সেইস্থানে রামদাসের নিবাস ছিল। তিনি তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে একটি স্থবর্ণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্রকায় হস্তী দান করিয়া 'গজদানী' উপাধি পান। তদুপলক্ষে বঙ্গ, বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি সকল স্থানের পণ্ডিত-বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; এমন কি কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর রাজা গণেশ বা তৎপুত্র যদু পাণ্ডুয়া হইতে আসিয়া সভাশোভন করিয়াছিলেন। যেস্থানে সেই দানসাগর শ্রাদ্ধক্রিয়া স্থসম্পন্ন হয়, তাহা এখনও 'দানীতলা' নামে খ্যাত।[১] এখনও রামদাসের পরিখাবেষ্টিত দুর্গ বা সানবান্ধা রাস্তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। রামদাস যে সাতটি জলাশয় খনন করেন, তাহা এখনও আছে। তন্মধ্যে 'সর্ব্বন্ খাঁ'[২] নামক স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণ দীঘি রামদাসের জলদান পুণ্যের কীর্ত্তি-কাহিনী বহন করিতেছে। রাজা সীতারামের জলদানপ্রবৃত্তি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি।

গজদানীর পুত্র অনন্তরাম দাস দিল্লীর রাজসরকারে কানুনগো ছিলেন। কথিত আছে, দিল্লী হইতে কটক পর্য্যন্ত বাদশাহী সড়কের বঙ্গীয় অংশ তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়। অনন্তরামের দুই পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়—রামগোপাল ও ধরাধর। এই ধরাধরের ধারায় সীতারামের জন্ম হয়। ধরাধর ও তাঁহার পরবর্ত্তী ৫ পুরুষের বিশেষ উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা ক্রমশঃ ভাগ্যদোষে দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। অনন্তরাম হইতে ষষ্ঠপুরুষ হিমকর দাস মুর্শিদাবাদ জেলায় কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধিনা গ্রামে বাস করিতেন; তিনি একে মৌলিক কায়স্থ, তাহাতে নিঃস্ব, স্থতরাং কুলীনদিগের নিকট অত্যন্ত নিগৃহীত হন। চাঁচড়ার মনোহর রায় কুলীন সিংহবংশীয়; তাঁহার সমসময়ে সীতারাম প্রাদুর্ভূত হন। সীতারামের প্রতিপত্তি দেখিয়া মনোহর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিলেন, নিজে কুলীন বলিয়া সীতারামকে নীচবংশীয়ের মত ঘৃণা

১ এইস্থান এক্ষণে পরলোকগত মহাত্মা রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সাটুই নামক জমিদারীর অন্তর্গত।

২ রামদাসের মাতুল সর্ব্বানন্দ খাঁর নামানুসারে এই দীঘির নামকরণ হয়। তাঁহার প্রত্যেক দীঘিই আত্মীয়-স্বজনের নামে হইয়াছিল।

করিতেন। এই জন্যই তাঁহার আশ্রিত, যশোহরের নিকটবর্ত্তী পুঁড়োপাড়ার ঘটকগণ সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়াছেন :

"হাল চসে তাল খায় গিধিনাতে বাস
তা'র বেটা কায়েত হ'ল বিশ্বাস খাস।"

এই একান্ত নিঃস্ব, উপেক্ষিত মৌলিক হিমকরের পুত্র শ্রীরামদাস নবাব সরকারে চাকরী করিয়া 'খাস বিশ্বাস' উপাধি পান। ইহা তখনকার দিনে সম্মান-সূচক উচ্চ উপাধি এবং সীতারামও খাস-বিশ্বাসকুলসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন। 'শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুলকমলোদ্ভাসকো ভানুতুল্যঃ'। খাস-বিশ্বাসের পিতা যে একেবারে 'হাল চসা, তাল খাওয়া' নিতান্ত নগণ্য কায়স্থ ছিলেন, এমন বিশ্বাস হয় না।[১] উক্ত বর্ণনা যে কিছু বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা মানসিংহ যখন রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন শ্রীরামদাস তাঁহার নিকট হইতে 'খাস-বিশ্বাস' উপাধি লাভ করেন। তিনি সুবাদারের খাস সেরেস্তায় হিসাব বিভাগে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র অল্পবয়সে পিতার সঙ্গে রাজ সরকারে কার্য্যারম্ভ করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে ঢাকায় যান (১৬০৯)। তিনি তথায় কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া 'রায় রায়াঁ' উপাধি পান। তৎপুত্র উদয় নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীন সাজোয়াল বা তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা। সীতারাম পর্য্যন্ত বংশধারা এইরূপ :

১ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, 'সীতারাম রায়', ৩৪ পৃ। ৺মধুসূদন সরকার মহাশয় ঘটকের কবিতার দ্বিতীয় পংক্তির পাঠান্তর করিয়া 'তাহার হইল নাম বিশ্বাস খাস' এইরূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি হিমকরকে নিষ্কৃতি দিয়া হালচসা ব্যবসাটা শ্রীরামদাসে অর্পণ করিয়াছেন। একেবারে হাল ছাড়িয়া গিয়া নবাবের খাস দপ্তরে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়া বসা অসম্ভব না হইলেও সহজ ব্যাপার নহে। সরকার মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে খাস শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া খশ্‌ জাতি হইতে সীতারামের বংশের কায়স্থ হওয়া র কথা তুলিতেও ছাড়েন নাই। এ জাতীয় অদ্ভুত কল্পনার সমালোচনা অনাবশ্যক।

রামদাস খাঁ গজদানী
[আঃ ১৪০০ খৃঃ অঃ]

- অনন্তরাম
  - রামগোপাল
    - কৃষ্ণচন্দ্র
      - নন্দকিশোর
        - শিবচন্দ্র
          - রামনাথ
            - লক্ষ্মীকান্ত
              - শ্রীনাথ
                - বৃন্দাবন
                  - কৃষ্ণবল্লভ
                    - নন্দগোপাল
                      - সভারাম
                        - কুড়োরাম
                          - রাধাচরণ
                            - রামলোচন [মুন্সেফ]
                              - সত্যেন্দ্রনাথ দাস M.A., B.L. [ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট]
                                - হরেন্দ্রনাথ, B.A.
                              - চন্দ্রশেখর [ইঞ্জিনিয়ার]
                                - অমরেন্দ্র, M.A. [ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট]
                              - যদুনাথ [সবজজ]
                              - দেবেন্দ্রনাথ [Govt. Pleader, পাটনা]
                                - নৃপেন্দ্র
  - ধরাধর
    - সুধাকর
      - নীলাম্বর
        - রত্নাকর
          - হিমকর
            - শ্রীরামদাস খাস-বিশ্বাস
              - হরিশ্চন্দ্র রায়
                - উদয়নারায়ণ
                  - রাজা সীতারাম রায়
              - চণ্ডীচরণ রায়
              - বাসুদেব রায়
                - কুলচন্দ্র
                  - রসিকলাল
                    - কীর্ত্তিচন্দ্র
                      - বিশ্বনাথ
                        - হরনারায়ণ
                          - রামেশ্বর
                            - সূর্য্যনারায়ণ
                              - আশুতোষ প্রভৃতি সাং জামালপুর, মুর্শিদাবাদ
- ধনন্ত
- শিবরাম

হরিশ্চন্দ্র যখন ঢাকায় আসেন, তখন ভূষণা বারভূঞার অন্যতম মুকুন্দরাম রায়ের রাজ্য ছিল। মুকুন্দরামের পর তৎপুত্র সত্রাজিৎ মোগলের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন ; কিন্তু তিনি নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন ভূষণা সংগ্রাম সাহ্ নামক একজন মোগল কর্ম্মচারীর জায়গীর হয়। সংগ্রাম ও তৎপুত্রের মৃত্যু হইলে এই জায়গীর খাস হইয়া একজন মোগল ফৌজদারের হস্তে স্থাপিত হয়, সেই ফৌজদারের সময়ে রাজা সীতারামের অভ্যুদয়। সীতারাম ভূষণার অধিকাংশ দখল করিয়া লন এবং সেই সময় মোগল ফৌজদারের হত্যা ঘটে। সীতারামের পতনের পর সেই রাজ্য নাটোরের রাজার জমিদারী ভুক্ত হয়। সুতরাং ফৌজদারের উদয় ও বিলয় ক্ষণিক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সংগ্রামের হাত হইতেই রাজ্য সীতারামের হাতে আসিয়া পড়ে।[১] এখনও ভূষণার সর্ব্বত্র সংগ্রাম সাহের কীর্ত্তি-চিহ্ন বর্ত্তমান। সুতরাং সংগ্রামের কথা অগ্রে না বলিয়া সীতারামের কথা বলা চলে না।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহ্‌জাহান বাদশাহ হন। তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশিম খাঁকে বাঙ্গালার নবাব করিয়া পাঠান (১৬২৮)। হুগলী প্রভৃতি স্থানের পর্টু গীজ দস্যুদিগকে দমন করাই তাঁহার শাসনের প্রধান কার্য্য। এইজন্য তিনি বাদশাহের নিকট হইতে সর্ব্ববিধ সাহায্য পান। সম্ভবতঃ এই সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে রাজা সংগ্রাম সিংহ নামক একজন মন্‌সবদার বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় নওয়ারা বিভাগে অধ্যক্ষ হন।[২] কিরূপে কাশিম খাঁর

১ নাটোরের রাজত্বকালে ভূষণার এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর নিকট নিম্নলিখিত শ্লোক প্রেরণ করেন :

'পূর্ব্বৈঃ সংগ্রামসাহা নৃপতিপ্রভৃতিভিঃ পালিতা ভূষণা যা।
সীতারামেণ পশ্চাত্তদনু রসবতী রামকান্তেন চোঢা॥
সা চেদানীং সপত্নীকরযুগলগতা স্বামিহীনা বিরূপা।
কেষাং বা নানুগাসৌ ন চ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা॥'

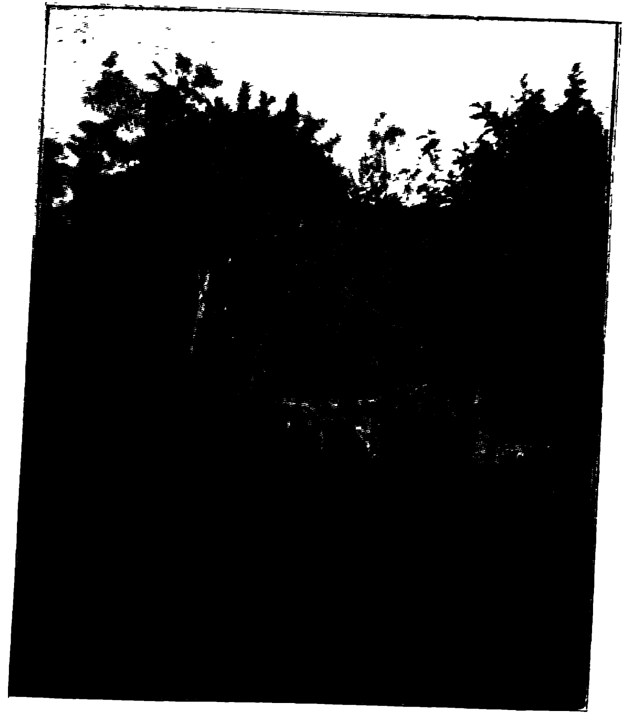
—আনন্দনাথ রায়, 'ফরিদপুরের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ৭৬ পৃ

রাণী ভবানীর স্বামী রাজা রামকান্ত ভূষণার অধিপতি ছিলেন, এজন্য রাণী ভবানী ভূষণার সপত্নী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

২ অনেক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান হয়, এই সংগ্রাম কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মুর জনৈক জমিদার। তিনি সাহসী ও রণকুশল বলিয়া নানাস্থানে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হইতেন।—*See, Tuzuk*, Vol. II, pp. 171, 193. কাশিম খাঁর সহিত ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব



কৃষ্ণজী মন্দির, মহম্মদপুর



সীতারামের বাসগৃহ, মহম্মদপুর



রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটী, মহম্মদপুর

নওয়ারা ও অসংখ্য স্থলসৈন্য সাড়ে তিনমাস কাল হুগলী অবরোধ করিয়া পর্টুগীজ-দিগকে পর্যুদস্ত ও উৎসন্ন করে, তাহা বঙ্গেতিহাসের প্রধান একটি ঘটনা। এই ঘটনার পর কাশিম খাঁর মৃত্যু হইলে, সংগ্রাম সিংহ নওয়ারা মহলের অধ্যক্ষ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে স্থাপিত হন। নবাব ইসলাম খাঁ মাসেদীর সময় যখন আসামবাসী-দিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের যুগে সংগ্রাম সিংহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সময়ে সত্রাজিৎ রায় পাণ্ডব থানাদার ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বিদ্রোহীদিগের সহিত নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়া নবাব তাঁহাকে ধৃত করিয়া ঢাকায় পাঠান, তথায় কিছুকাল কারাভোগের পর তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় (১৮৩৬)।[১] তখন সংগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদলের হস্ত হইতে ঢাকা অঞ্চল রক্ষা করিতেন। এই সময়ে তিনি নওয়ারার প্রধান আড্ডা স্বরূপ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নিজ নামানুসারে উহার নাম হয় সংগ্রামগড়। উহারই নাম পরে আলমগীরনগর হইয়াছিল।[২]

শুধু এই স্থানে নহে, পূর্ব্ববঙ্গের আরও অনেক স্থলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গড়ের নিদর্শন এখনও আছে। বরিশাল জেলায় ঝালকাটির নিকটবর্ত্তী রূপসিয়ায় এবং রাজাপুরের নিকট ইন্দ্রপাশায় দুইটি মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। রেণেলের ম্যাপে এই জেলার দক্ষিণভাগে বাউফল থানার মধ্যে এইরূপ আরও দুইটি গড় ছিল, উহার চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী সোণারকোট ও কিল্লাঘাটা নামক স্থান দুর্গস্থানের ইঙ্গিত করে।[৩] উত্তর সাহবাজপুরে মেহ্‌দিগঞ্জ থানায়

ছিল। ১৬২১ খৃঃ অব্দে যখন কাশিম খাঁকে কাঙ্গড়ার বিদ্রোহ নিবারণ জন্য পাঠান হয়, তখন তাঁহারই অনুরোধে বাদশাহ সংগ্রামকে নানাবিধ খেতাব দিয়া তুষ্ট করিয়া কাশিম খাঁর সঙ্গে পাঠান। কাশিম খাঁ নুরজাহান বেগমের ভগিনীপতি বলিয়া বাদশাহ দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। —*Riyaz*, p. 209.

১ "Having obtained clear proof of Satrajit's treachery on occasions, he (Nawab) arrested him and sent him to Dacca where he was imprisoned and afterwards executed" —Gait, *Assam*, p. 112.

২ J. A. S. B., 1907, p. 407 ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সরিফ সংগ্রামগড়ে থানাদার হইয়া আসেন। সেই সময় হইতে বাদশাহের নামে উহার নাম হয় আলমগীরনগর।—Calcutta Review, Vol LIII, p. 70 ষ্টুয়ার্ট সংগ্রামগড় না বলিয়া আলমগীরনগরই বলিয়াছেন (p. 335)।

৩ Beveridge, *Bakarganj* p. 42

গান্ধিয়া গ্রামের পার্শ্বে একটি সংগ্রাম গড় ছিল।[১] ঝালকাটি থানার 'সংগ্রামনীল' নামক গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী 'সংগ্রামনীলের খাল' কোন এক সংগ্রামের কথাই বলিয়া দেয়।[২] নলছিট নদীর কূলে সুবাদার শাহ সুজার নামে সুজাবাদ নামক দুর্গ ও দুইটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে, আমাদের মনে হয় তাহার সহিতও সংগ্রাম সিংহের কোন সম্পর্ক আছে। যাহা হউক, কাশিম খাঁর সময় হইতে প্রায় ৩০ বৎসর কাল সংগ্রাম সিংহ পূর্ব্ববঙ্গের নওয়ারা মহলের কর্ত্তৃত্বে থাকিয়া মগ ফিরিঙ্গি প্রভৃতি দস্যুদলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সত্রাজিতের মৃত্যু দণ্ডের পর তিনি ভূষণা জায়গীর প্রাপ্ত হন।[৩]

জায়গীর প্রাপ্তির পর সংগ্রাম নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিয়া, ভূষণার সন্নিকটে মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি রাজার মত রাজত্ব করিতেন, তাই সাধারণ লোকের নিকট মুসলমানী রীতিতে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল শাহ, উহারই অপভ্রংশে সাহা হইয়া গিয়াছে। সংগ্রাম এদেশে বাস কবিবার কালে এতদ্দেশীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। এ দেশে যখন বাস করিতেই হইল, তখন সমাজেব কোন উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ না করিলে চলে না। জম্বুর জমিদার সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের কেবল নিম্নেই ক্ষত্রিয়ের আসন। এজন্য প্রবাদ আছে, সংগ্রাম মথুরাপুরে আসিয়া স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করেন, 'এদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই কোন্ জাতি?' তদুত্তরে তাঁহাকে বলা হয়, 'বৈদ্যই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ জাতি।' তখন তিনি বলেন, 'হাম্ বৈদ্য' অর্থাৎ তবে আমি বৈদ্য। তখন

---

১ *Ibid*, pp. 43 and 431 : 'There is a place (in Vanden Broucke's old map) marked as the Hoek or Cape of Sancraan and from its position, I think, this must be Sangram which was an old Moghal fort in the Mendiganj thana.' ; 'বাকলা', ৮২ পৃ, 'ফরিদপুরের ইতিহাস' ৭১ পৃ।

২ এই উভয় স্থান এক্ষনে 'বাকলা'র গ্রন্থকার ৺রোহিনীকুমার সেন মহোদয়ের জমিদারীর অন্তর্গত। ইহা হইতে আনন্দনাথ রায় অনুমান করেন 'সংগ্রামসাহ একটা উপাধি মাত্র। নীলশব্দের সহিত অন্য কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পূর্ণাবয়ব করিত, যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্দ্র।'— 'ফরিদপুরেরর ইতিহাস', ৭২ পৃ। আমাদের মতে সংগ্রামই তাঁহার নাম।

৩ এই সময়ে শাহজাহান বাদশাহ। সংগ্রাম আওরঙ্গজেবের সময় জায়গীর পান, আনন্দনাথ রায়ের এই উক্তি সত্য নহে। কারণ পরে দিতেছি।

হইতে তিনি অর্থবলে অথবা (তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে,) সৈন্যবলে জোর করিয়া বৈদ্য-সমাজের সহিত ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কবিতে থাকেন এবং তাঁহাব সহিত সম্বন্ধসূত্রে 'হাম বৈদ্য' নামক এক পৃথক্ থাকের সৃষ্টি হয়। এখন সে থাকে কেহ জীবিত আছেন কিনা, জানি না। তবে সংগ্রামের সময়ে তাঁহার উৎপাতে যে বৈদ্যসমাজের অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য।[১] ৺রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কৃত 'সদ্বৈদ্যকুল পঞ্জিকা' এবং ভরত মল্লিক কৃত 'চন্দ্রপ্রভা' নামক কুলগ্রন্থে সংগ্রামের বিবাহ-সম্বন্ধগুলির পরিচয় লেখা আছে।

কবিকণ্ঠহাব 'পঞ্চসপ্ততিথৌশাকে ক্রিয়তে কুল পঞ্জিকা' অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে বা ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বীয় কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থে সংগ্রাম ও তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ কথা উল্লিখিত আছে। তাহা হইলে বলিতে পারি, তিনি সংগ্রামের পুত্রের সমসময়ে পুস্তক লিখেন। সুতরাং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে যে সংগ্রাম ভূষণা জায়গীর পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রাম সিংহ নিজকে সালাঙ্কায়ণ গোত্র-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন।[২] এদেশীয় বৈদ্য-কায়স্থসমাজে এ গোত্র নাই। ভূষণার নিকটবর্ত্তী কোড়কদি গ্রামের প্রখ্যাত ভট্টাচার্য্যগণ সংগ্রামের গুরুপদে বরিত হইতে বাধ্য হন। এখনও তাঁহাদিগের গৃহে সংগ্রাম প্রদত্ত ভূমিবৃত্তির সনন্দ আছে। যশোহর কলেক্টরীতে তৎপ্রদত্ত আরও কয়েকখানি ব্রহ্মোত্তরের তায়দাদ পাওয়া গিয়াছে।[৩] সংগ্রামের অন্য কীর্ত্তির মধ্যে মথুরাপুরে তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত একটি উচ্চ দেউল বা মন্দির বর্ত্তমান আছে। গল্প আছে,

---

১ সংগ্রাম সাহের ছয়টি কন্যা ছিল। তিনি উহাদিগের বিবাহ ধন্বন্তরি, শক্তি, প্রভৃতি গোত্রীয় প্রধান প্রধান কুলীন বংশের সহিত দেন। তিনি কিরূপে বলপ্রকাশ করিয়া কন্যা বিবাহ দিতেন, কবিকণ্ঠহারের কবিতা হইতে তাহা জানা যায় :

'দুর্দ্দৈবাশনি সম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ।
সংগ্রাম সাহতনয়া-পাণিগ্রহণ-পীড়িতঃ ॥'—৫০ পৃ

রঘুনাথের ভ্রাতা দেশত্যাগী হইয়া ছিলেন। 'হরিনাথো নিজদেশাদতিদুরমুপাগতঃ।'—৫১ পৃ।

২ সংগ্রাম বাণীবহ গ্রামবাসী শক্তি-মাধববংশীয় সদাশিব সেনের কন্যা বিবাহ করেন। সদাশিব প্রসঙ্গে কবিকণ্ঠহারে আছে : 'কন্যামেকাং ব্যুবাহ চ। সালঙ্কায়ণ-সম্ভূত সংগ্রাম সাহ ভূপতি।'—৪০ পৃ।

৩ 'ফরিদপুরের ইতিহাস', ৭৭ পৃ।

তিনি একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু একজন রাজমিস্ত্রী দেউলের চূড়া হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া সে সংকল্প পরিত্যক্ত হইয়াছিল।[১]

সংগ্রামের মৃত্যুর পব তাঁহার পুত্র কিছুকাল জায়গীর ভোগ করিয়া নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, ভূষণা অঞ্চল খাস হয়।[২] কিন্তু তখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিতেছিল, তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা শাহসুজা তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধে নিরত, দেশে তখন শাসন ছিল না। সুজা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, মীরজুম্লা নবাব হইয়া পুনবায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন (১৬৬০)। তখনও দেশে অরাজকতা রহিল, কারণ মীরজুম্লার স্বল্প শাসন কাল বিদ্রোহ-দমনেই কাটিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পব আমীর-উল-ওমরা সায়েস্তা খাঁ সুবাদার হইয়া ঢাকায় আসিলেন (১৬৬৪) এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বঙ্গ শাসন কবিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই আসিয়া মগ ও ফিরিঙ্গিদিগকে সমূলে উৎখাত কবিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত মোগল করতলে আনিলেন। দেশে আবার শাসন ব্যবস্থা হইল। ভূষণা নওয়ারা মহল হইতে বিচ্যুত হইয়া, ফৌজদারের হাতে আসিল। এই সময়ে উদয়নারায়ণ ভূষণায় সাজোয়াল হইয়া আসিয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ যখন রাজমহলে নবাব সরকারে চাকরী করিতেন, তখনই তিনি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতিপুর গ্রামে এক স্বশ্রেণীস্থ কুলীন ঘোষকন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার সেই স্ত্রীর নাম দয়াময়ী। সেই দয়াময়ী দেবীর গর্ভে উদয়নারায়ণের যে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, তিনিই সুপ্রসিদ্ধ

১ *Ancient Monuments in Bengal*, p. 224.

২ সংগ্রামের এক পুত্র রাধাকান্ত ধন্বন্তরি-আদিত্যবংশীয় কাশীনাথের কন্যা বিবাহ করেন। 'সংগ্রাম সাহ তনয়ো রাধাকান্ত ব্যুবাহ তাং।'—কণ্ঠহার, ৮৩ পৃ। সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গোপীকান্ত। সংগ্রাম যে সদাশিবের কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহার পৌত্রীর সহিত গোপীকান্তের বিবাহ হয়। 'সালঙ্কায়ণ সম্ভূত গোপীকান্তেন ভূভুজা'—৪০ পৃ। হয়ত প্রথম আমলে বহুঘরের সহিত সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া পিতাপুত্রে এক ঘরে বিবাহ করেন। 'ভূভুজা' কথা হইতে বুঝা যায়, ইনি রাজা ছিলেন এবং সংগ্রামের উত্তরাধিকারী। তবে তিনি সদাশিবের দৌহিত্র নহেন, তিনি হয়ত, সংগ্রামের পূর্ব্বপক্ষের পুত্র।

সীতারাম রায়। দয়াময়ী দেবী অত্যন্ত তেজস্বিনী রমণী ছিলেন।[১] কথিত আছে, অল্প বয়সে একবার তিনি পিত্রালয়ে থাকিবার সময় একখানি খড়্গের সাহায্যে এক ডাকাইতের দলকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।[২] যখন নবাব শাহ সুজার সহিত আওরঙ্গজেবের ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছিল, যখন নবাবের কার্য্যকারকেরা পর্য্যন্ত নানাভাবে সেই তুমুল সংগ্রামের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই যুদ্ধবিগ্রহের যুগে উদয়নারায়ণের বীরপত্নীর গর্ভে মহীপতিপুরে বীরপুত্র সীতারামের জন্ম হয়। আমরা অনুমান করি, যে বৎসর আওরঙ্গজেব সিংহাসন আরোহণ করেন, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিঞ্চিৎ প্রাক্কালে সীতারামের জন্ম হয়।[৩]

উহার পরেই উদয়নারায়ণ ঢাকায় আসেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে তহশীলদারের কার্য্যে ভূষণায় প্রেরিত হন। তখন তিনি পরিবারবর্গ আনেন নাই। প্রথমতঃ ভূষণার নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে তাহার বাসা বাটী ছিল। কিছুদিন পরে তিনি একটি ক্ষুদ্র তালুক এবং বর্ত্তমান মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী শ্যামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করিয়া লন। তখন তিনি মধুমতীর অপর পারে হরিহর নগরে নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পরিবার লইয়া আসেন। এ সময়ে সীতারামেব বয়স ১০।১২ বৎসর। এখনও হরিহর নগরে উদয়েব বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

১ এখনও মহম্মদপুবে 'দয়াময়ী তলা' নামে একটি স্থান আছে, এখানে সীতারামের সময়ে মহাসমারোহে বারোয়ারী মহোৎসব ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইত। দয়াময়ীর নামে উপযুক্ত উৎসবই বটে!

২ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, 'সীতারাম', ৫ম সং, ৩৭ পৃ।

৩ মুনিরাম রায় সীতারামের উকীল ছিলেন। মুনিরামের প্রতিষ্ঠিত ধুলজুড়ীর মন্দিরে ১৬৮৮ খৃঃ তারিখ পাওয়া যায়। সীতারাম যখন তাঁহাকে নবাব সরকারে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর ধরা যায়। তাহা হইলে খৃঃ ১৬৫৮ তাঁহার জন্মাব্দ, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। ১৬৮৮ অব্দে সীতারামের বয়স ২৫ ধরিয়া মধুসূদন সরকার অনুমান করেন যে, ১৬৬৩ অব্দে সীতারামের জন্ম হয়। কিন্তু মুনিরাম উকীল হওয়া মাত্র মন্দির হয় নাই, তাহার অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর পরে হইয়াছিল। মুনিরামের উকীল হওয়ার কালে সীতারামের বয়স ২৫ ধরিলে, ১৬৫৮ অব্দেই জন্ম ধরিতে হয়।—'নব্য ভারত', ১২৯৪, পৌষ, ৭৯৪ পৃ।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম : বাল্যজীবন ও জমিদারী

সীতারামের বাল্যজীবনের কথা কেহ লিখিয়া রাখে নাই, তহশীলদারের পুত্রের কপালে যে রাজটীকা ছিল তাহা লোকে দেখে নাই। তাঁহার জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাল কাটোয়া অঞ্চলে মাতুলালয়ে কাটিয়া যায়। তখন তিনি চতুষ্পাঠীতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। নিয়মমত বাঙ্গালা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের রীতি তখন ছিল না, তবুও লোকে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা শিখিত। সীতাবামও বেশ বাঙ্গালা জানিতেন, জয়দেব ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির পদাবলীর সুন্দর আবৃত্তি করিতে পাবিতেন।[১] তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, বহু সনন্দে তাঁহার স্বাক্ষর আছে। দেশের রেওয়াজ অনুসারে তিনি আরবী ফারসীও শিখিয়াছিলেন। উহা তখনকার রাজভাষা, রাজদরবারে কোন কার্য্য সিদ্ধি করিতে হইলে, ফারসী বা উর্দ্দুতে দখল থাকা দবকার হইত। সীতারামের তাহা ছিল। কাটোয়া হইতে ভূষণায় আসিয়া বহু সম্পর্কে মুসলমানের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তিনি উর্দ্দুতে সুন্দরভাবে কথোপকথন কবা শিখিয়া লইয়াছিলেন।

তবে সুকুমার শাস্ত্র অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রের শাস্ত্রে তাঁহার অধিকতর দখল দাঁড়াইয়াছিল। লাঠি তখন বঙ্গদেশে ধন-মান-প্রাণ রক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল; সে লাঠির শাস্ত্রে সীতারাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা সেই দিকে খুলিয়াছিল। ভূষণায় আসিবার পর হইতে অশ্বারোহণে এবং অস্ত্রচালনায় তিনি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন

---

১ এইরূপ আবৃত্তি করিবার শক্তি তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং এ বিষয়ে তিনি অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। এইরূপ এক প্রতিযোগিতায় নিজে পরাজিত হইয়া তিনি জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণকে যে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়া গিয়াছে। উহার প্রতিলিপি এই · 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীচরণেষু। আমার জমিদারী পরগণে মহিম সাহীব হোগল ডাঙ্গা ও কল্যাণপুর গ্রামে বারপাখী ও পরগণে নল্‌দীর নারায়ণপুর ও নহাটা গ্রামে আটপাখী জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জয়দেবের মুগস্থ কবিতা শুনিবার জন্য ব্রহ্মোত্তর দিলাম আপনি পুরুষানুক্রমে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভোগ দখল করুন সন ১১১৩ সাল তাং ৫ই বৈশাখ।' [ইহাতে খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দ বুঝা গেল]—যদুনাথ, 'সীতারাম', ২৩৭ পৃ।

প্রাপ্তবয়স্ক যুবক, তখন ঢাকায় রাজদরবারে আনাগণা করিতেন। গুণগ্রাহী সায়েস্তা খাঁ নানা প্রসঙ্গে তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ভূষণার নিকটে সা-তৈর পরগণায় করিম খাঁ নামক একজন পাঠান বীর বিদ্রোহী হইলে যখন ফৌজদারও তাহার দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া কয়েকবার বিফল মনোরথ হইলেন, তখন সায়েস্তা খাঁ সে সংবাদ পাইয়া কাহাকে পাঠাইবেন ভাবিতেছিলেন। সীতারাম তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে যাইবার জন্য আগ্রহ জানাইলেন। প্রতিভার পথ সহজে উন্মুক্ত হয়। নবাব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কয়েক সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া তাঁহাকেই এই দুরূহ কার্য্যে পাঠাইলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম পরীক্ষা; ভাগ্যগুণে সীতারাম এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন। করিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন; যুদ্ধ-বিজয়ী সীতারাম ঢাকায় গিয়া নবাবের নিকট প্রশংসা ও অনুগ্রহ লাভ করিলেন। দস্যুদুর্ব্বৃত্তের দমনের জন্য নবাব তাঁহাকে ভূষণাব অন্তর্গত নল্‌দী পরগণা জায়গীর দিলেন।

শুধু যে পাঠানেরা শেষ বার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন, তাহা নহে; দস্যু-দুর্ব্বৃত্ত ও চোব ডাকাইতের উৎপাতে তখন যশোহর-খুল্‌নার লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মগের অত্যাচার তখনও ছিল; এমন কি, দক্ষিণদিকের সুন্দরবন বা নিকটবর্ত্তী স্থানের ত কথাই নাই, উত্তর দিকেও তাহারা মধুমতী প্রভৃতি নদীপথে প্রবেশ করিয়া যেখানে সেখানে আড্ডা করিত, এবং গ্রামবাসীকে অস্থির করিয়া তুলিত। আমরা পূর্ব্বে ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (১৮৭ পৃ)। মাগুরা অঞ্চলে কত পরিবারের যে সামাজিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। এমন কি, ধর্ম্মদাস নামক মগ আরাকান হইতে সসৈন্যে আসিয়া গৌরী বা গড়ই নদীর কূলে খুলুমবাড়ী প্রভৃতি কয়েকখানি মৌজা দখল করিয়া স্থায়ীভাবে জায়গীর ভোগ করিতেছিল। উহাকে 'মগ-জায়গীর' বলা হইত। আওরঙ্গবেজের সময় ধর্ম্মদাস ধৃত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।[১]

---

১ 'The Jaygir was originally granted to a Mugh Rajah, named Dharm Das of Mulkh Rakhang (Arrakan) who was found in rebellion and brought a captive in the reign of Aurangzeb, who converted him to

কেবল পাঠান-বিদ্রোহ বা মগের অত্যাচার নহে, স্থশাসনের অভাবে দেশের মধ্যে চোর ডাকাইতের অত্যধিক উৎপাত হইয়াছিল। একাদোকা দূরপথে তীর্থধর্ম্মাদি করিতে কেহ যাইত না ; সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পথিকেরা গৃহস্থবাড়ীতে অতিথি হইয়া প্রাণ বাঁচাইত ; তরফের কাছারী হইতে জমিদারের বাড়ীতে খাজনা ইরশাল করাও আশঙ্কার ব্যাপার ছিল। সাধারণ গৃহস্থেরা যাহা কিছু অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহাদ্বারা সোণারূপার অলঙ্কার গড়াইয়া স্ত্রীলোকের গায়ে পরাইত, আর সন্ধ্যার পর বাসনবাটী তৈজসপত্র সিন্ধুকে বা মেঝের মধ্যে মাটীর গর্ত্তে পুরিয়া তাহার উপর বিছানা পাতিয়া নিদ্রা যাইত, সকলের শিয়রে লাটিসোটাই আত্মরক্ষার প্রধান সাধন ছিল। এই জাতীয় দুর্ব্বৃত্তদিগের নৃশংস অত্যাচার হইতে ভূষণা অঞ্চল রক্ষা করিবার স্বীকারোক্তিতে সীতারাম নবাবের নিকট হইতে নল্‌দী পরগণা জায়গীর পাইলেন। নল্‌দী পরগণার অনেক লোক দেশ ছাড়িয়া গিয়াছিল, অরাজক দেশ হইতে নবাব সরকারের বিশেষ কিছু আয়ও ছিল না। তবুও নল্‌দী একটা প্রকাণ্ড পরগণা এবং উদীয়মান যুবকের সাহস ছিল, তিনি অচিরে এ পরগণা শাসন-তলে আনিতে পারিবেন।

সীতারাম জায়গীর ত পাইলেনই, ঢাকা হইতে তিনি আরও দুইটি রত্ন পাইয়াছিলেন। এ দুইটি মনুষ্য-রত্ন চিরকাল তাঁহার কর্ম্মের সহায় ও প্রাণের বন্ধু ছিলেন। একজন মস্তিষ্কের শক্তি দিয়া এবং অন্যজন দৈহিক শক্তি দিয়া আমরণ তাঁহার সাহায্য করেন। দুইজনই তাঁহার স্বজাতীয় কায়স্থ কিন্তু তাঁহার স্বশ্রেণিস্থ নহেন। উভয়ই চাকরীর অন্বেষণে ঢাকায় গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাদের সহিত সীতারামের পরিচয় ও সদ্ভাব হয়। তিনি জায়গীর পাইবার পর উঁহাদিগকে নিজের জমিদারী সংক্রান্ত উচ্চ কার্য্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দেশে লইয়া আসেন।

সীতারামের এই মন্ত্রণাদাতা বন্ধুর নাম মুনিরাম রায় এবং অপর বীরপুরুষের নাম রঘুরাম বা রামরূপ ঘোষ।[১] উভয়ই ঘোষবংশীয় এবং সীতারামকে ধরিলে

Islamism and gave him the name of Nizam Shah'.—Sen, Ram Sanker, *Report*, p. lii. তারাউজলিয়া পরগণার একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া এই 'মগ জায়গীর' নামক পরগণার সৃষ্টি হয়। উহার মধ্যে বয়ড়া, চামতালপাড়া ও খুলুমবাড়িয়া প্রভৃতি যশোহরের মধ্যে এবং অন্য ৬ খানি মৌজা ফরিদপুরের মধ্যে পড়িয়াছে। আইন আকবরীতে তারাউজলিয়ার উল্লেখ আছে।—*Ain.* Vol. II, p. 133. এই পুস্তকের ৪৩০পৃ দ্রষ্টব্য।

১ রায় গ্রামের ঘোষ মহাশয়দিগের বংশ-লতিকায় এই ব্যক্তির এই উভয় নাম পাইয়াছি।

তিনজনের নামই রাম-সংযুক্ত। মুনিরাম কার্ণ্য-ঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ, তাঁহার পিতৃ-নিবাস খুল্‌না জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর অঞ্চলে, সেখানে এখনও তাঁহার জ্ঞাতিরা বাস করিতেছেন। রামরূপ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ, আক্‌না সমাজভুক্ত বংশজ ঘোষ; তিনি নবগঙ্গাতীরবর্ত্তী রায় গ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের পূর্ব্ব-পুরুষ। এখনও তাঁহার জ্ঞাতিগণ রায়গ্রাম, আউড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। উভয়েরই বিশিষ্ট বংশ-বিবরণ আমরা পরে দিতেছি। রামরূপ শিশুকাল হইতেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তখন জমিদার প্রভৃতি অবস্থাপন্ন লোকেব গৃহে হিন্দুস্থানী পালোয়ান থাকিতেন। রামরূপেরও পৈতৃক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। তিনি শিশুকাল হইতে নানাস্থানে পালোয়ানের নিকট কুস্তী, লাঠিখেলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় উপনীত হইলে তাঁহার দীর্ঘোন্নত বিপুল বপু দেখিলে লোকে চমকিত হইত। তিনি তখনকার লম্বা লোক অপেক্ষাও পূর্ণ এক হাত অধিক উচ্চ ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার দেহের পরিমাণ পুরা পাচ হাত এবং তদনুযায়ী মাংসল ও দৃঢ়। তিনি যখন সীতারামের সেনা বিভাগে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাকে সাধারণ লোকে মেনাহাতী বলিত। ক্ষুদ্রাকৃতি এবং ক্ষুদ্রদন্ত স্ত্রী-হস্তীকেই মেনাহাতী বলে। রামরূপকেও সেইরূপ ছোট-খাট হাতীর মত দেখা যাইত বলিয়া তাঁহারও নাম হইয়াছিল মেনাহাতী এবং এই নাম সর্ব্বসাধারণের নিকট এমন সুপরিচিত হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রকৃত নাম লোকে জানিত না। তাই তাঁহার নাম খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি চিরজীবন অকৃতদার এবং নিঃসন্তান, সুতরাং তাঁহার নিজের বংশ-ধারা নাই। এইজন্য তাঁহার পরিচয়-সূত্র এমন বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, ইহাই লইয়া লেখকদিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসের এই দুর্দ্দশা দেখিলে ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যথিত হইতে হয়।

সীতারামের ঢাকায় যাওয়ার পূর্ব্বে রামরূপ তথায় গিয়া নবাবী ফৌজে চাকরীর চেষ্টা করেন। করিম খাঁর বিদ্রোহ দমন জন্য সীতারামের অধীন যে

রঘুরামেরই নামান্তর রামরূপ, অথবা তাঁহারা দুই ভ্রাতা, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যদু-নাথ প্রভৃতি লেখকগণ সকলই রামরূপ নাম ধরিয়াছেন, আমরাও তাহাই ধরিলাম। মেনাহাতীর নামের মূল্য নাই, তাহার বীরত্ব ও প্রভুভক্তি অমূল্য পদার্থ। উহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর বর্ত্তমান রায়গ্রামী ঘোষদিগের আদি পুরুষ। সেখানে তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দির ও জোড়-বাঙ্গালা আছে।

সৈন্য প্রেরিত হয়, সম্ভবতঃ তাহার জনৈক সেনানী ছিলেন—রামরূপ এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার বীরত্বের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া সীতারাম তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। সীতারাম যে নল্‌দী পরগণার জায়গীর পাইলেন, তন্মধ্যেই রামরূপের বাড়ী, সুতরাং তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে সীতারামের সহচর হইলেন। ক্রমে তাঁহার বক্তার খাঁ ও আমল বেগ নামক আরও দুইজন মুসলমান সেনানী জুটিয়া যায়। গল্প আছে, বক্তার খাঁ একজন বিখ্যাত ডাকাইত ছিলেন; সীতারাম রামরূপের সঙ্গে ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন কালে একস্থানে নৌকা লাগাইয়া রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে অদূরে গ্রামের ভিতর ডাকাইতি হইবার শব্দ শুনিলেন; অমনি তিনি ও রামরূপ উভয়ে অসিহস্তে দৌড়িয়া গিয়া ডাকাইতদিগকে আক্রমণ করেন; তখন দস্যুদলপতি বক্তারের সহিত সীতাবামের ঘোর যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া বক্তার সীতারামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে ডাকাইত বলিয়া ডাকাইত দলেব সন্ধি-কৌশল জানিতেন, এজন্য তাহার সাহায্যে দস্যুদলন কার্য্য সহজ হইয়াছিল। আমল বেগ একজন মোগল, তিনি সম্ভবতঃ নবাবী ফৌজে কার্য্য করিতেন, সীতারামের পরামর্শে তাঁহার দলভুক্ত হন। তাঁহার বিশেষ পবিচয় জানা যায় না। তবে তিনি শত্রুসৈন্য আক্রমণকালে বড় দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন; এজন্য লোকে তাহাকে আমল বেগ না বলিয়া 'হাম্‌লা বাঘা' বলিত। সীতারামের দলে যখন মেনাহাতীই ছিল, তখন বাঘ থাকিবে না কেন?

সীতারামের আরও দুইজন সেনানী ছিলেন, তাঁহারা নিম্ন জাতীয়, এই সময়ে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই লাঠি, শড়কী প্রভৃতি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইতেন। ঐ দুই জনের নাম রূপচাঁদ ঢালী ও ফকিরা মাছকাটা। রূপচাঁদ নমঃশূদ্র জাতীয় এবং ফকিরচাঁদ মৎস্য-বিক্রেতা নিকারী ছিলেন। তখন যশোহর-খুল্‌নায় ম্যালেরিয়া প্রবেশ করে নাই; সকল লোকে স্বাস্থ্যবলে শক্তিশালী ছিল, প্রত্যেকে যথেষ্ট আহার করিত, যথেষ্ট শ্রম কবিতে বা পথ হাটিতে পারিত, তাহারা চা-কুইনাইনের অপব্যবহারে পাকস্থলীকে জালাতন করিত না। তখন দেশময় যুদ্ধবিদ্যার আলোচনা ও শিক্ষা চলিত। কেহ সে বিদ্যা শিখিয়া প্রশংসা অর্জ্জনের সুযোগ সন্ধান করিত, কেহ দেশ-বিদেশে নানা স্থানে গিয়া রাজাদিগের সৈন্যদলে চাকরী লইত, আর কেহ দস্যু-ডাকাইতরূপে পরস্বাপহরণ করতঃ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া জীবন যাপন করিত। ডাকাইত দলের মধ্যেও অনেক সৎপ্রবৃত্তির পরিচয়

পাওয়া যাইত ; কেহ বা সবলের সম্পদ লুটিয়া লইয়া দুর্ব্বল ও দুঃস্থকে বিলাইয়া দিত, কেহ বা কৃপণের অর্থ করায়ত্ত করিয়া দানধ্যানে সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত করিত। ধর্ম্ম বিশ্বাস ইহার মূলীভূত কারণ। ভারতীয় লোক-সমাজের নিম্নস্তরও ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত নহে। এদেশের দস্যুদুর্ব্বৃত্তেরা নীতিবর্জ্জিত উন্মার্গগামী হইলেও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বা ভক্তিবিহীন নহে। এজন্য ডাকাইতেরও ইষ্টপূজা আছে, তাহারা ৺কালীপূজা না করিয়া ডাকাইতি করিতে যাইত না। রামা-শ্যামা ডাকাইত কিরূপে ভূষণার অন্তর্গত কয়ড়ার কালীবাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে গল্প সে দেশের লোকে করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী পাঠককে দস্যু বলিয়া ঘৃণা করিব, কি দানবীর বলিয়া ভক্তি করিব, তাহা বুঝিয়া পাই না। এমন গল্প যশোহর-খুল্‌নায়ও অনেক আছে, তাহা প্রকাশের স্থান নাই।

দেশে যখন অরাজকতা আসে বা কু-শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সবলের কবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষার চেষ্টা বহুজনে করিয়া থাকে। সেই সঙ্গে যদি নিজের কিছু ধনদৌলত বা প্রতিপত্তি বাড়ে, অথবা অন্ততঃ বীরত্বের খ্যাতি রটে, সকলেরই সেদিকে নজর পড়ে। স্বার্থ-নির্ম্মুক্ত পরোপকার উচ্চস্তরের ধর্ম্ম ; সাধাবণ লোকের কাছে তাহা প্রত্যাশা করা চলে না। এই ভাবে যাহারা পাশ্চাত্ত্য 'নাইটের' (knight) মত বীর-ব্রতে দীক্ষিত হইত, তাহারা কেহ দস্যু ডাকাইত বলিয়া উপেক্ষিত হইত, আর কেহ হয়ত রাজা বা জমিদার বলিয়া প্রখ্যাত হইত। অনেক সময়ে ছোট আর বড় এইটুকু ভিন্ন দস্যুতে ও রাজাতে অন্য বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখা যাইত না। সীতারামের সময় ভূষণা ও মহম্মদপুর অঞ্চলে এমন অনেক দস্যু ছিল। যদুনাথ এমন অন্ততঃ বারজন দস্যুর নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১] আরও কত নগণ্য অগণ্য দুর্ব্বৃত্ত যে দেশের লোককে সর্ব্বদা প্রাণভয়ে কম্পান্বিত করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহাদের তালিকা নাই। আমরা শুধু তাহাদের অপভ্রংশ নামের সঙ্গে তাহাদের অপকারের কথাই জানি, তাহাদের ধর্ম্মভাব ও সুকীর্ত্তি-কাহিনী আমাদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া

---

১ "রঘো, রামা, শ্যামা, শুম্ভো, বিশে, হ'রে, নিমে, কালা, দিনে, ভুলো, জগা ও যেদো, এই বার জন দস্যু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।"—'সীতাবাম,' ৪৮ পৃ। বারভুঞার দেশে যে দস্যুর তালিকায়ও বার সংখ্যা পুরাইতে হইবে, এমন কথা নাই। বিশেষতঃ ইহারা সকলেই সীতারামের সমসাময়িক নহে। রামা, শ্যামা যে সীতারামের বহু পূর্ব্বের লোক তাহা বলিয়াছি, রঘো ও বিশে বিখ্যাত ডাকাইত। উক্ত বারজন সকলেই হিন্দু, কিন্তু অনেক মুসলমানও বিখ্যাত ডাকাইত ছিল।

গিয়াছে। ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলেও ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে দল বা বলের প্রয়োগ করিয়া দস্যুরা প্রবল হইয়াছিল, সীতারামও সেইরূপ দলবল জুটাইয়া ঐ সকল দস্যুদলন করিয়া আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দেশে শান্তি সংস্থাপন করতঃ প্রজাবৎসল রাজার মত সুশাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাই আমরা সেই স্বদেশীয় বীরকে এত ভক্তি কবি, প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকি; কিন্তু তিনি যাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিয়া শত্রুরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই মোগল শাসকেরা সীতারামকে দস্যুরূপেই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের স্বজাতীয় ঐতিহাসিকেরা সীতাবামকে দস্যু বলিয়াই অখ্যাত করিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি তর্জ্জমাকারী ইংরাজ লেখক সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।[১]

সীতারাম কিছুদিন পর্যন্ত অক্লান্তপরিশ্রম করিয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে দস্যুদলন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে সশস্ত্র সৈন্যসহ রাত্রিকালে গুপ্তভাবে নৌকাযোগে বিচরণ করিতে হইত। বক্তার খাঁ প্রভৃতি সেনানীগণ তাঁহাকে অনেক গুপ্তসন্ধান দিতেন ও বীরের মত সাহায্য করিতেন; তাহার ফলে দস্যুগণ সুদূর সুন্দরবন পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়াও নিস্তার পাইত না। তাঁহার চরগণ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া গুপ্ত খবব আনিত, বিপন্ন গৃহস্থ তাঁহাকে একমাত্র শরণ্য জানিয়া সকল সংবাদ দিত। সেকালে দস্যুরা পূর্ব্বাহ্নে পত্র দ্বারা সংবাদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে গৃহস্থ-ভবনে ডাকাইতি করিতে আসিত। সে বার্ত্তা কোনও প্রকারে সীতারামের লোকেব কর্ণে পৌছিলে, তাহারা যথাসময়ে আসিয়া দস্যু-দিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিত। এইরূপ নিশাক্রমণের জন্য সে সময় সীতারামকে গ্রাম্য দেবতা নিশানাথ ঠাকুরের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল।[২]

১ 'A refractory Zemindar, named Sitaram, who kept in his pay a band of robbers with whom he used to infest the roads and plunder the boats on the rivers and even carry off the cattle from the villages, setting at defiance the power of the Fouzdar'.—Stewart, *History of Bengal*, pp. 432-3.

২ এখনও অনেক পল্লীগ্রামে এই নিশানাথ ঠাকুরের আস্তানা বা বটতলা আছে, ইনি মহাদেবের কতকটা রূপান্তর, সেই ভাবে শনি মঙ্গলবারে ইহার পূজা হয়। নহাটা, নড়াইল, গঙ্গারামপুর, বেন্দা, রায়গ্রাম প্রভৃতি স্থানে নিশানাথের বটতলা আছে। কাশীর কালভৈরবের মত ইনি গ্রামের রক্ষাকর্ত্তা। মোচড়াসিংহ প্রভৃতি তাহার আরও একাদশ ভ্রাতা এবং রণরঙ্গিণী

এবং নিশানাথের পার্শ্বচরের মত তাঁহার সেনানীদিগকেও মোচড়া সিং, গাবুর ডালন প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। এই সকল ছদ্ম নামের জন্য এখন অনেককে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়াছে।

এইভাবে সীতারামেব প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যশোহর খুল্‌নার অনেক স্থল দস্যু দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে নিস্তার পাইল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক ; এবং আবশ্যক হইলেও তাহা কল্পনা-বিজড়িত না হইয়া পারে না। এইরূপে মগদস্যুরা দেশ ত্যাগ করিল, দুই একজন মাত্র এদেশীয় লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া রহিয়া গেল। দেশীয় ডাকাইতেবা কতক হত এবং কতক বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, কতক বা দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শান্ত গৃহস্থ হইল। দেশ আবার শান্তির মুখ দেখিল, আত্মীয়স্বজন নির্ভয়ে পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল, শ্রান্তপথিক স্বচ্ছন্দে দীর্ঘপথ বাহন করিয়া গৃহস্থ-গৃহে অতিথি হইতে লাগিল। স্তব্ধ নিশীথে নদীপথে আবার সারীগান উঠিল, আবার পল্লীতে পল্লীতে স্বচ্ছন্দ-জীবিকার আনন্দ-লহরী ছুটিল। হুসেন শাহের আমলে বঙ্গের লোকে বহুকাল পরে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখিয়া হুসেনী যুগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, সীতারামের আমলে ও ভূষণা অঞ্চলে প্রজাবর্গ 'সীতারামী সুখ' সম্ভোগ করিতে লাগিল। গ্রাম্য কবিরা গান রচনা করিলেন :

"ধন্য রাজা সীতাবাম বাঙ্গালা বাহাদুর
যা'র বলেতে চুরী ডাকাতি হ'য়ে গেল দূর।
(এখন) বাঘ মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে,
(এখন) রামী শ্যামী পোট্‌লা বেঁধে গঙ্গা স্নানে যাবে॥"

অল্প কথায় অবস্থার আভাস দেওয়াই যদি কবিতার কৌশল হয়, তবে এ অতি সুন্দর কবিতা। শেষোক্ত দুইটি পংক্তিতে এদেশের অবস্থা অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। প্রকৃতই প্রতি পাদক্ষেপে লোকের বাঘের ভয় ছিল ; মোগলের কঠোর শাসন, জমিদারের পীড়ন, জায়গীরদারের জুলুম, মুকদ্দাম, পাটোয়ার বা

নামে ভগিনী ছিল। ভূষণায় যে তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্দির আছে, তাঁহারও নাম রণরঙ্গিণী। সীতারাম তাঁহার সেনানীদিগকে ভ্রাতার মত দেখিতেন, 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন, এজন্য নিশানাথের সঙ্গে তাঁহার মিল ছিল।

সাজোয়াল প্রভৃতি করসংগ্রাহক কর্ম্মচারীর রাজস্ব ছাড়া বহুবিধ আবওয়াব বা বাজে শুল্ক আদায়ের জন্য প্রজাদিগকে নিংড়াইয়া রক্তশোষণ—এ সব ত প্রাত্যহিক কার্য্য! ইহার উপর দস্যু-দুর্ব্বৃত্তের আকস্মিক অত্যাচার নিরীহ পল্লীবাসীকে সর্ব্বদা রোমাঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। হিন্দুর পক্ষে তীর্থ-ধর্ম্ম অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল; ধনীরা বহু অর্থব্যয়ে সাজ সরঞ্জাম গুছাইয়া দলবল সহ নৌকা পথে তীর্থযাত্রা করিতেন বটে, কিন্তু গরিবের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এখন রামী শ্যামী প্রভৃতি সাধারণ নিঃস্ব স্ত্রীলোকেরাও পোটলা বাঁধিয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নানে যাইতে লাগিল।

এইভাবে শান্তির মুখ দেখিয়া, নল্‌দী পরগণার প্রজাবর্গ সীতারামের প্রতি সমাসক্ত হইল এবং পরগণার আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। সীতারাম রীতিমত জমিদার হইয়া বসিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভূষণার অন্তর্গত সা-তৈর পরগণার কতকাংশ তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ছিলেন, শাসন-কৌশলে তাহারও আয় বাড়িল। বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে পূর্ব্ব হইতে নল্‌দী পরগণার যে কাছারী বাটী ছিল, সেখানে তিনি মনোমত অট্টালিকা দ্বারা আবাসবাটী সুশোভিত করিলেন; এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। সূর্য্যকুণ্ড ও হরিহর নগর এই উভয়স্থানেই তিনি সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, উভয়স্থানে গড়বেষ্টিত বাড়ী ও সৈন্যাবাস স্থাপিত হইল। যুদ্ধবিদ্যা তখন সাধারণ লোকের এমন রুচিগত সহজ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছিল যে, একবার বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া দাঁড়াইতে পারিলে, দলে দলে সৈন্য আসিয়া জুটিত। সীতারামের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সীতারামের পিতৃকুল শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনিও প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন। পরে তাঁহার বৈষ্ণব-দীক্ষা হইলেও তখন তাহার শাক্ত-বিদ্বেষ ছিল না; রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে দশভুজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। হরিহর নগরে তাঁহাদের বাড়ী হইলেও তাঁহার পিতা কার্য্যোপলক্ষে ভূষণাতেই থাকেন, তথায় তাঁহাদের বাসা বাটী ছিল, সীতারাম সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন, যুদ্ধবিদ্যা শিখিতেন, জমিদারী পাইবার পরও তিনি সর্ব্বদা সেখানে যাইতেন। ভূষণা হরিহর নগর হইতে বেশী দূরবর্ত্তী নহে। বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গের কলিকাতা বা ঢাকার মত সে অঞ্চলে ভূষণাই

ছিল প্রধান সহর—সভ্যতার কেন্দ্র এবং বাণিজ্যের স্থান।[১] মুকুন্দরাম রায়ের সময়ে এই সহরের চরমোন্নতি সাধিত হয়। এখন ত ভূষণা শ্মশান! তাহার অসংখ্য কীর্ত্তি-চিহ্ন ভীষণ জঙ্গলের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও সেখানে রণরঙ্গিনী দেবীর মন্দির এবং গোপীনাথ জীউর আখড়া বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। সীতারাম প্রথম জীবন হইতে এখানে আসিয়া আনন্দোৎসব করিতেন। গোসাঁই গোরাচাঁদের গ্রন্থে আছে :

'শ্রীরণরঙ্গিনী মাই, সীতারাম যাকে পাই,
হইল দেখ রাজা রাজ্যেশ্বর।'

এই গোসাঁই গোরাচাঁদ সীতারামের সমসাময়িক। তাঁহার 'শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন বন্দনা' নামক পাঁচালী পুঁথি 'সন ১১৩২ সাল, মাহে বৈশাখ, মোকাম ভূষণা' নগরে সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সীতারামের পতনের ১২ বৎসর পরে উক্ত পাঁচালীর লেখা শেষ হয়।[২]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত সাধক কামদেব তার্কিক ও তাঁহার

১ প্রাচীন কাল হইতে ভূষণা নানাবিধ সূক্ষ্মবস্ত্র (ধুতি চাদর), কাগজ, গালা, মোম, তামা পিতল ও কাঁসার জিনিস এবং সোনারূপার কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভূষণাই খাসা বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রামপ্রসাদ লিখিয়া গিয়াছেন—'বনাত মখমল্ পটু ভুষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।' (বিদ্যাসুন্দর) ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও যশোহরের উত্তরাংশে যাহা কিছু লেখাপড়া সব ভূষণাই কাগজে হইত। এখনও গড়বেষ্টিত ভূষণা নগরীর জঙ্গলের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি স্থানকে বাজারের নামে অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। একটি স্থানকে বড়বাজার বলে, সেখানে এখনও কামার ও কাচারু নামক (কাচের চুড়ী প্রস্তুতকারী অনাচরণীয়) একজাতীয় কয়েক ঘর লোক বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রধান ব্যবসায় রাশিরাশি তামার মাদুলী প্রস্তুত করিয়া গৃহাগত ব্যাপারীর নিকট বিক্রয় করা। মুকুন্দরামের সময় ভূষণা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একটি প্রধান সমাজ হইয়াছিল। এখনও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং তেলি, মালী, কামার প্রভৃতি নবশাখ-গণের এক এক সম্প্রদায়কে ভূষণাই পটী বা থাক্ বলে।

২ গোরাচাঁদের 'সংকীর্ত্তন বন্দনা' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। উহাতে ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান ও জীবন-লীলার সুন্দর বিবরণ আছে। উহা হইতে হরিদাসের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। খুলনা জেলার সোনাই নদীর কূলে কলাগাছি বা কেড়াগাছি গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে যে তাঁহার জন্ম, তদ্বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। ঐ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ মৎ-সম্পাদিত 'দেবায়তন' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহার সারাংশ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের পুনঃ সংস্করণে গ্রন্থিত করিব। [ইহা করা হইয়াছে—শি মি]

উত্তর সাধক যাদবেন্দ্র ঘোষ ভূষণায় আগমন করেন এবং প্রথমেই তাঁহারা রণরঙ্গিনীর মন্দিরে উপস্থিত হন। গোরাচাঁদের গ্রন্থে দেখিতে পাই :

'কামদেব যাদবেন্দ্র দুই মহাজন—
শুভক্ষণে ভূষণায় হইল আগমন,
শ্রীরণরঙ্গিনী মাই মন্দিরে বসিল,
একসঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইল।
ধাওয়াধাই আইল লোক দেখিবার তরে
রূপদেখি নয়ন ফিরাইতে কেহ নাবে।
সংবাদ শুনিয়া আইল রাজা সীতারাম
যাদবেন্দ্র গান কবে হরেকৃষ্ণ নাম।'

সম্ভবতঃ এ সময়ে সীতারাম জমিদার মাত্র, তিনি তখনও রাজা হন নাই ; লোকে সেই জমিদারকেই রাজা বলিয়া সম্বোধন করিত। কামদেব ও যাদবেন্দ্র ভূষণার নিকটবর্ত্তী চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাধনাসন পাতিয়া বহুবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন মাধব বিশ্বাস নামক একজন মৌলিক কায়স্থ সংগ্রাম সাহের সময় হইতে নওয়ারা মহলের একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদার বা জমিদার ছিলেন। চম্পকদহ হ্রদের সহিত পদ্মার সংযোগ ছিল ; উহার মধ্যে তাঁহার নওয়ারা থাকিত, পার্শ্ববর্ত্তী নওয়ারাপাড়া নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল, এখনও সে গ্রাম আছে। মাধব বিশ্বাস যাদবেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাঁহাকে নিজ কন্যা ভগবতীকে সম্প্রদান করেন।[১] মাধবের গুরু কালীশরণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা রঙ্গিনী দেবীর সহিত মাধবের একান্ত অনুরোধ

১ যাদবেন্দ্র দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। তিনি পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন, মাধবের কন্যা বিবাহে কুল হারাইয়া বংশজ হইয়াছিলেন। যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ নিকটবর্ত্তী ঘোষপুরে বাস করিতেছেন। বিখ্যাত অবধূত সাধক, 'কালীকুলকুণ্ডলিনীর' গ্রন্থকার ভুলুয়া বাবা (কালিদাস ঘোষ) এই যাদবেন্দ্রের উপযুক্ত বংশধর। যশোহরের বিখ্যাত উকীল ৺উমেশচন্দ্র ঘোষ এই ঘোষপুরের ঘোষ বংশীয়। ইহারা আক্‌না সমাজের ঘোষ। বংশধারা এইরূপ : জনার্দ্দন (আক্‌না)—নৃসিংহ—কামদেব—রূপনারায়ণ—কৃষ্ণবল্লভ—যাদবেন্দ্র (যাদবানন্দ অবধূত)। মাধব বিশ্বাসেব কন্যা বিবাহ করিয়া ইহার কুল ভঙ্গ হয়। যাদবেন্দ্র—রামকৃষ্ণ—রামচন্দ্র—কৃপারাম—গোলকচন্দ্র—নীলমণি—কালিদাস (ভুলুয়া বাবা), ভুবন, ব্রজেন্দ্র, মনোরঞ্জন, সাং ঘোষপুর।

ক্রমে একইভাবে কামদেবের বিবাহ হয়।[১] তাহার বংশধরগণ এক্ষণে মহীশালা ও কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। কামদেব কুমার নদের তীরবর্ত্তী কয়ড়ার কালীবাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করেন; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সাধনপীঠে রামা শ্যামার সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। শেষ বয়সে কামদেব যখন জীবনের সাধনা শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিলেন, তখন সহস্র লোকের সম্মুখে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। কুমারের তুঙ্গ পাহাড়ের উপর কয়ড়ার কালীবাড়ী অতি অপূর্ব্ব স্থান।[২] সেখানে যাইবা মাত্র প্রত্যেকের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। উহারই অদূরে কামদেবের চিতা-স্থান প্রদর্শিত হয়। কামদেবের স্বর্গারোহণের পরও যাদবেন্দ্র অনেকদিন জীবিত ছিলেন। গোসাঁই গোরাচাঁদ তাঁহার শিষ্য হন এবং গোসাঁইজী পরে ভূষণার গোপীনাথের আখড়ার মোহন্ত হইয়াছিলেন।[৩] তখন সীতারাম গোপীনাথের মন্দিরে আসিতেন এবং হরিনাম-রসে মজিয়া যাইতেন। ক্রমে তিনি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হন এবং রাজা হইবার পর মুর্শিদাবাদের টেঁয়া গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবল্লভের বংশধরেরা এখনও মহম্মদপুরের নিকট ঘুল্লিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। বংশ কথা পরে বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সীতারাম বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কি হয়, কখনও কোন

১ কামদেবের এই বিবাহে শ্রীকান্ত (বিদ্যাবাগীশ) ও গঙ্গাধর (ন্যায়বাগীশ) নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্রীকান্তের ধারা ঘোষপুরের নিকট মহীশালা গ্রামে এবং গঙ্গাধরের ধারা কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী কুমারখালিতে আছেন। সাধককুল-গৌরব, 'তন্ত্র-তত্ত্বাদি' গ্রন্থের প্রসিদ্ধ লেখক, অসাধারণ পণ্ডিত ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয় উক্ত গঙ্গাধরের কুলপাবন বংশধর।

২ কয়ড়া প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে যশোহর জেলার মধ্যে ছিল, এখন ফরিদপুরে পড়িয়াছে। কামদেবের বংশীয়েরা কয়েক পুরুষ এই ৺কালীবাড়ীর অধিকারী ছিলেন, এখন সে সম্বন্ধ নাই। শ্রীকান্তের প্রপৌত্র রামজীবন কয়ড়ার চক্রবর্ত্তীদিগকে কালীবাড়ী দিয়া যান। সেই বংশীয় প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখন উহার সেবায়ৎ।

৩ গোসাঁই গোরাচাঁদ নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, 'মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু শ্রীযাদবানন্দ।' যাদবেন্দ্র ও যাদবানন্দ নাম অভিন্ন। যাদবেন্দ্রই গোপীনাথের মন্দিরের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি উহা গোরাচাঁদকে দেন। গোরাচাঁদের নিজ কথা এই : 'দয়া করি তেঁহ মোরে, কৃষ্ণনাম দিল করে, দিল গোপীনাথের মন্দির।' ভূষণা হইতে ১½ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে যোপের ঘাট গ্রামে গোরাচাঁদের নিবাস ছিল। তিনি অদ্বৈত-বংশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মাতুলালয়সূত্রে এদেশে আসেন। তাঁহার বংশ নাই।

হিন্দুদেবদেবীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সার্ব্বজনীন হিন্দু। অন্য প্রসঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা করিব।

সীতারামের তিনটি বিবাহের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রবাদ ঠিক রাখিয়া তাঁহার তিন মহিষীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে সীতারামের সহিত ভূষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী এক মৌলিক কায়স্থের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্নীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রী' নামে কীর্ত্তিত করিয়া তাঁহার উপন্যাসের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। সীতারাম নল্‌দী পরগণা জায়গীর পাওয়ার পর অকস্মাৎ তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত দাস-পল্‌শা গ্রামে সৌকালীন গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন সরল খাঁ ঘোষের কন্যা কমলাকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিংহ পরগণা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের একটি প্রধান স্থান। এই ফতেসিংহের কতকাংশ বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। যে অংশ বীরভূমে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে দাস-পল্‌শা গ্রাম অবস্থিত। সরল খাঁ তথাকার সর্ব্বাগ্রগণ্য কুলীন। সীতারামের পিতা মৌলিক কায়স্থ এবং আভিজাত্যে নিম্ন। এই জন্যই অবস্থা ফিরিবামাত্র উদয়নারায়ণ সীতারামের সহিত প্রসিদ্ধ কুলীনের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সরল খাঁ কন্যা সম্প্রদানকালে কমলাকে ওজন করিয়া পণের টাকা লইয়াছিলেন।[১] রাণী কমলাই হইয়াছিলেন সীতারামের প্রধানা মহিষী এবং তাঁহার গর্ভে সীতারামের প্রধান দুই পুত্র শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণের জন্ম হয়। কমলাকে বঙ্কিমচন্দ্রের নন্দা বলা যাইতে পারে।

সীতারাম তৃতীয়বার বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর নাম বা অন্য পরিচয় জানা যায় নাই। শুনা যায়, উহার গর্ভে বামদেব ও ও জয়দেব নামক দুই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। জয়দেব নাম যে সীতারামের

১ শুধু পণের টাকা নহে, সীতারাম রাজা হওয়ার পর আপন শ্বশুর সরল খাঁ ঘোষ ও আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে ফতেসিংহ পরগণা হইতে উঠাইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দিয়া রাজধানীর সন্নিকটে ঘুল্লিয়া গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। সেখানে এখনও সরল খাঁর বাটীর ভগ্নাবশেষ ও দুইটি দীঘি আছে। কথিত আছে, সরল খাঁর এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র গোপেশ্বর খাঁ ঘোষের সহিত সীতারামের কনিষ্ঠ ভগিনী রাইরঙ্গিনীর বিবাহ হইয়াছিল।—যদুনাথ, 'সীতারাম', ১৩৮ পৃ।

প্রিয়কবি কেন্দুবিল্বের কবি-কোকিলের নামে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত দুই পুত্রই অকালে মৃত্যুমুখে পড়ে। সুতরাং তাহাদের বংশ নাই। কালে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দরেরও বংশলোপ ঘটিয়াছিল। কেবল মাত্র সুরনারায়ণের পৌত্র রাধাকান্তের ধারায় কয়েকজন জীবিত আছেন এবং সীতারামেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের অধস্তন বংশধর দেবনাথ রায় মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন এখনও হরিহরনগরে বাস করিতেছেন। এই তিন বিবাহ ব্যতীত সীতারামের অন্য বিবাহ হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না ; সম্ভবতঃ হইয়াছিল, কারণ বীরপুর গ্রামে তাঁহার নওয়ারাণীর বাটীর উল্লেখ আছে। যাহা হউক, এ সব বিবাহ উল্লেখযোগ্য নহে এবং সেই মোগল যুগে মুসলমান বা হিন্দুরাজন্যবর্গের বিবাহসংখ্যা ঠিক করিয়া বলিতে যাওয়াই বাতুলতা। জেনানা মহলের পরিসর বৃদ্ধি যেন তখনকার রাজাদের ক্ষমতার নিদর্শন ছিল। সীতারামের প্রবাদে এ জাতীয় অপবাদের অভাব নাই। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আমরা সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিব না।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী

জমিদাররূপে যখন সীতারামের বিপুল প্রতিপত্তি, তখনই অল্পদিন অগ্রপশ্চাৎ তাঁহার পিতামাতা উভয়ে পরলোক গমন করেন। সীতারাম মহাসমারোহে তাঁহাদের দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।[১] এতদুপলক্ষে দূরদেশ হইতে বহু অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং বহুসহস্র ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধদিনে তাঁহার গৃহে ভোজ্য ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ভূষণা অঞ্চলে পূর্ব্বে শ্রাদ্ধদিনে ব্রাহ্মণ-ভোজনের রীতি ছিল না, সীতারামের সময়ে উহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

সীতারামের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল এবং তিনিও বিষয়কার্য্য পরিচালনায় অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের বৎসরাধিক পরে সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণের উপর জমিদারীর ভার দিয়া মুনিরাম ও রামরূপকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। কথিত আছে, তিনি গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানের পর বহুবিধ উপহার দ্রব্যসহ রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হন। নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং জায়গীরদাররূপে তাঁহার কৃতিত্বের সংবাদ বহুপূর্ব্বে বাদশাহ-দরবারে পৌছিয়াছিল। তিনি যে দক্ষিণ-বঙ্গে দস্যু দুর্ব্বৃত্তের বিদ্রোহশান্তি করিয়া নিয়মমত শাসন ঠিক রাখিতে সমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল না। যেটুকু বা বাকী ছিল, তাহা মুনিরামের বাক্-কৌশলে সম্পূর্ণ হইল। এ সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব দিল্লীতে ছিলেন না, কারণ তিনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে শেষবার দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া যান এবং এ ঘটনা তাহার ২।৩ বৎসর পরে হওয়া সম্ভবপর। এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে বাদশাহ সাধারণতঃ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অভিমত অনুসারে কার্য্য করিতেন এবং সায়েস্তা খাঁর প্রশংসাবাদে সে অভিমত দৃঢ় করিয়াছিল। যাহা হউক, যথা-সময়ে সীতারামের প্রার্থনামত তাঁহাকে 'রাজা' উপাধির পাঞ্জাসহি ফারমাণ এবং

---

১ দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের গৃহে রক্ষিত ফর্দ্দ হইতে জানা গিয়াছে যে, সীতারামের পিতৃশ্রাদ্ধে ২৮,৯৭২৲ টাকা ব্যয় হয়। এখনকার দিনে উহা অন্যূন দুইলক্ষ টাকার সমান।—যদুনাথ, 'সীতারাম', ৫ম সং, ২৩৭ পৃ।

দক্ষিণবঙ্গের আবাদী সনন্দ প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় সনন্দ পাইলে রাজাকে কিছুকাল রাজস্ব দিতে হইত না, ততদিন তাঁহাকে আবাদ মহলে প্রজাপত্তন করিয়া তাহাদিগকে রীতিমত শাসনতলে আনিতে হইত। এই সকল রাজারা মন্‌সবদারের মত প্রত্যন্ত রক্ষার ভার পাইতেন এবং সামন্ত নৃপতি বলিয়া গৃহীত হইতেন। সীতারাম ফারমাণ লইয়া সর্ব্বপ্রথম ঢাকায় গিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।[১] নবাব ইহাতে বরং সন্তুষ্টই হইলেন এবং বাদশাহী সনন্দে স্বাক্ষর করিয়া সুবাদারের সম্মতি দান করিলেন।

এই রাজোপাধির সনন্দ লইয়া যেদিন সীতারাম স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন হইতে হরিহরনগরে এক অপূর্ব্ব আনন্দোৎসব চলিল। তিনি রাণী কমলার সহিত রাজতক্তে বসিলেন, শাস্ত্রীয় বিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান হইল। পানভোজন ও আমোদ-প্রমোদের বিরাট আয়োজনে অর্থরাশি উড়িয়া গেল। উৎসব উপশান্ত হইলে, সীতারামের মনে সমস্যা উঠিল, তিনি রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্য বা রাজধানী কই? নলদী ও সা-তৈরের জমিদারী তাঁহার করায়ত্ত ছিল, এবং সে জমিদারী তিনি চারিদিকে কিছু বাড়াইয়া লইয়াছিলেন; এখন আবার নূতন আবাদী সনন্দের বলে ভাটিরাজ্য নিজবলে অধিকার করিয়া লইতে পারিলে রাজোপযোগী রাজ্য হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে রাজধানী চাই; কারণ উপযুক্তস্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে সুদৃঢ় দুর্গে সৈন্য সংগ্রহ করতঃ আত্মরক্ষা বা পররাজ্যজয়ের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, রাজনামেও যেমন কলঙ্ক হয়, অরাজক দেশে রাজত্বও বেশী দিন চলে না। তাই সীতারাম রাজধানীর উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভূষণায় ফৌজদারের বাস; হরিহরনগর সেই ভূষণার নিকটবর্ত্তী বলিয়া সেখানে তাঁহার পছন্দ হইল না; সূর্য্যকুণ্ডে পুরাতন কাছারী ছিল, অবস্থানের হিসাবে সে স্থানও তিনি মনোনীত করিলেন না; অনেক বিবেচনা করিয়া তিনি সূর্য্যকুণ্ডের সন্নিকটে বাগ্‌জানি মৌজায় স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। উহারই পার্শ্বে

১ যদুনাথ বলেন, সীতারাম দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে রাজধানী হয় এবং ১৭০৭ অব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়. সীতারামের রাজোপাধি ১৭০৪-০৭ মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সনন্দ ও শিলালিপি হইতে দেখিতে পাই, সীতারাম উহার পূর্ব্বে মহম্মদপুরে রাজধানী করিয়া তথায় ১৬৯৯ অব্দে দশভুজার মন্দির, ১৭০৩ অব্দে কানাইনগরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ১৬৯৬ অব্দে

এখনও নারায়ণপুর গ্রাম আছে ; হয়ত সেই নামই তাঁহার প্রিয় ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি রাজধানীর নাম রাখিলেন—মহম্মদপুর। এখন দুইটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উঠিতে পারে। সেখানে তিনি স্থান নির্ব্বাচন করিলেন কেন এবং হিন্দুর রাজধানীর নূতন নামই বা মহম্মদপুর হইল কেন ? বহুমতের সমন্বয় করিয়া আমি এই উভয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি।

স্থান নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রথমতঃ, মহম্মদপুরের অবস্থান অতি সুন্দর। উহার তিন দিকে বিল, একদিকে নদী, মধ্যস্থানে উচ্চ স্থল। ভূষণার দিকে অর্থাৎ প্রধানতঃ যেদিক হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা, সেই পূর্ব্বদিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখা দ্বারা দক্ষিণদিক দুষ্প্রবেশ্য করা যায়। অপর দুইদিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই। দ্বিতীয়তঃ, স্থানটি নল্‌দীর পুরাতন কাছারী সূর্য্যকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী এবং পূর্ব্ব হইতে এখানে সৈন্যাবাস ছিল। তৃতীয়তঃ, এইস্থানে একটি ভগ্নমন্দিরে সীতারামের ভাগ্যদেবতা ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলা আবিষ্কৃত হন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক মত আছে ; কেহ বলেন, সীতারাম যখন জায়গীরদার, তখন একদিন অশ্বারোহণে এই স্থান দিয়া যাইবার সময় সহসা তাঁহার অশ্ব-ক্ষুর মাটীতে প্রোথিত হয় এবং তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন একটি চক্র বা ত্রিশূল অশ্ব-ক্ষুরে ফুটিয়া গিয়াছে, তখন সেইস্থান খুঁড়িয়া ক্রমে ভগ্নমন্দির বা শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। আবার কেহ বলেন, এই ঘটনা সীতারামের আমলে না হইয়া, তাহার বহু পূর্ব্বে যখন তাঁহার পিতা সাজোয়াল হইয়া আসেন, তখন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই মতই ঠিক ; উদয়-নারায়ণই এইস্থান দিয়া ভ্রমণকালে দৈবক্রমে ভগ্নমন্দিরে এক শালগ্রাম শিলা পান এবং পরীক্ষায় স্থির হয় উহা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র। ক্রমে তাঁহার চাকরীতে উন্নতি হওয়ায় তিনি ঐ শিলাকে ভাগ্যদেবতা স্থির করিয়া হরিহরনগরে প্রতিষ্ঠিত করেন ; হয়ত সেই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হওয়ায় সে পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। উক্ত চক্র সীতারামের পিতা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবার আরও কারণ আছে। রাজধানী স্থাপনের কয়েক বৎসর পরে

গুরুপুত্রকে সনন্দ দান করেন। রাজা হইবার পূর্ব্বে এ সব ঘটনা হয় নাই। আমাদের মনে হয়, ১৬৮৭-৮ খৃষ্টাব্দে সীতারাম রাজোপাধি পান, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। তখনও সায়েস্তা খাঁ ঢাকায় নবাব ছিলেন।

সীতারাম এই শিলা হরিহরনগর হইতে আনিয়া[১] নূতন অষ্টকোণ মন্দিরে উহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে লিখিয়া রাখেন :

'লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেণ মন্দিরম্‌॥'

[তর্ক=৬, অক্ষি=২, রস=৬, ভূ=১ ; অঙ্কের বামাগতিতে ১৬২৬ শক বা ১৭০৪ খৃঃ অব্দ।] অর্থাৎ সীতারাম ১৭০৪ খৃঃ অব্দে পিতৃপুণ্যের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠাকল্পে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পিতৃদেবের সহিত এই বিগ্রহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি 'পিতৃপুণ্যার্থং' কথা বলিতেন না। আবার লক্ষ্মীনারায়ণ যদি তাঁহার নিজেরই আবিষ্কৃত ভাগ্যদেবতা হইতেন, তাহা হইলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বাগ্রে সে মন্দির নির্ম্মিত হইত এবং কানাইনগরের 'হরেকৃষ্ণ' বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-লিপিতে যেরূপ প্রাণ খুলিয়া আন্তরিক ভক্তির ভাষা ব্যক্ত করিয়াছেন, এ মন্দিরের লিপিতেও তেমন কিছু কথা থাকিত। আমরা দেখিব ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে দশভুজার মন্দির ও ১৭০৩ অব্দে কানাইনগরের বহু শিল্পকলা-সমন্বিত পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মিত হয়, এবং তাহারও পরে ১৭০৪ অব্দে কারুকার্য্য-বর্জ্জিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত রাজধানীর সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা অবস্থান কৌশলের জন্যই প্রধানতঃ স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

এখন আমরা মহম্মদপুর নামের কথা বিচার করিব। এ বিষয়ে সাধারণ মত এই, সীতারাম যখন স্থান মনোনীত করেন, তখন এ স্থলে মহম্মদ আলি বা মহম্মদ শাহ নামে এক ফকির বাস করিতেন। সীতারাম তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন না। অবশেষে অগত্যা তাঁহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন এইরূপ বলেন ; সীতারাম সে প্রস্তাবে সম্মত হন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, গল্পটিও সেইজন্য বদ্ধমূল হইয়াছে। এমন কি, মহম্মদপুর দুর্গে প্রবেশ পথের বামদিকে পদ্মপুকুরের কূলে একস্থানে মহম্মদ শাহের আস্তানা ছিল বলিয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সেখানে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কোন ইমারত বা

১ হরিহরনগর হইতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা লইয়া আসিবার সময় সেখানে উহার বদলে শ্রীধর চক্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, তাঁহার কিছু দেবোত্তরও ছিল : সে শিলা এখনও সেখানে আছেন।

মস্‌জিদ নাই। একজন সাধু ফকিরের আস্তানা সেখানে থাকিলে বা তাঁহার জন্য একটি মস্‌জিদ গঠিত হইলে, তাহাতে কি ক্ষতি হইত, তাহা বুঝিয়া পাই না। বিশেষতঃ যখন সীতারামেরও রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখি এবং তিনি প্রতাপাদিত্যের মত হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইয়া মিশাইয়া লইয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তখন মনে হয় না যে, মুসলমান ফকিরকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যই তিনি বাধ্য হইয়া মহম্মদপুর নাম রাখিয়াছিলেন। কোন একজন মুসলমান ফকির সেখানে থাকিতে পারেন, কিন্তু শুধু তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য বা বিরাগের ভয়ে নহে, পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতির প্রত্যাশায় এবং হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে সীতারাম মহম্মদপুর নাম রাখেন, ইহাই আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। শতাধিক বর্ষকাল মোগলশাসন চলিলেও পাঠানগণ তখনও শান্ত হন নাই; সাধ্যপক্ষে যেখানে সেখানে তাঁহারা বিদ্রোহী হইতেন; সা-তৈরে সীতারাম যে করিম খাঁর বিদ্রোহ দমন করেন, তিনিও পাঠান; সীতারাম যখন ক্ষমতাপন্ন রাজা হইয়া বসিলেন, তখন পাঠানেরা তাঁহার দিকে চাহিতেছিলেন; মোগলের কঠোর শাসন হইতে দেশরক্ষা করা, যেটুকু স্থানে সাধ্য, দেশীয় শাসন প্রবর্ত্তিত করা যে সীতারামের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই দূর অভিসন্ধি সম্মুখে রাখিয়া, সীতারাম অনেক পাঠানকে সৈন্যদলে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অনেকে সাধিয়া আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের সহানুভূতি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য, তিনি মোল্যাদিগের পরামর্শে রাজধানীর নাম হজরতের নামানুসারে মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন। সীতারাম তাঁহার মুসলমান সেনাপতিদিগের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দু-মুসলমান প্রজার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। সে সব উপদেশ-বাণী লোকমুখে ও ভিক্ষুকের গানে দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল।[১] গ্রাম্য কবিরা সত্যের অপলাপ করিতে জানিতেন না।

যাহা হউক, এইভাবে স্থান নির্দ্দেশ ও নামকরণের পর সীতারাম রাজধানী মহম্মদপুরে একটি মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। শুধু দুর্গ নহে, কয়েকটি সুপ্রশস্ত

১ এখনও সে সব গান দুষ্প্রাপ্য নহে। যদুনাথ স্বীয় পুস্তকে উহার ২।১টি সংগ্রহ করিয়া দিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মাগুরাঞ্চলে এই জাতীয় কবিতা খুব বেশী পাওয়া যায়, কারণ তথায়

জলাশয়, সুন্দর মন্দির ও আবাসগৃহ, এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। আমরা অগ্রে দুর্গের কথা বলিয়া পরে জলাশয় ও মন্দিরের কথা তুলিব।

মহম্মদপুর-দুর্গের নির্ম্মাণ-কৌশল পর্য্যালোচনা করিলে সীতারামের যুদ্ধনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গটি প্রায় সমচতুষ্কোণ, পূর্ব্বদিকে উহার সদর প্রবেশ-দ্বার। দুর্গটির প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য সিকি মাইলের অধিক, সুতরাং সম্পূর্ণ বেষ্টন এক মাইলের বেশী। উহা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এখনও কোন কোন স্থানের পরিখায় বার মাস জল থাকে। উত্তর ও পশ্চিম দিকের পরিখা এবং উহার প্রান্তবর্ত্তী স্থান এমন ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, সুন্দরবনের মত তাহা ভীতি-সঙ্কুল। পরিখার মাটি দ্বারা চতুর্দ্দিকে মৃন্ময় প্রাচীর রচিত হইয়াছিল, এখনও উহার অনেক ঢিপি আছে; ভিতরের খনিত পুকুরের মাটী দিয়া সবস্থানটা কিছু উচ্চ করা হইয়াছিল। উক্ত পরিখা ব্যতীত বাহিরে আরও কৃত্রিম বা স্বাভাবিক পরিখা ছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে জঙ্গলের মধ্যদিয়া কালীগঙ্গা নামক মরা নদী প্রবাহিত ছিল। পশ্চিম দিকে বিল এবং ছত্রাবতী নদীর নিশানা এখনও পাওয়া যায়। শুধু দক্ষিণ দিকে এমন কিছু জল প্রবাহ ছিল না; এজন্য সীতারাম সেদিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে এক মাইল দীর্ঘ একটি বিস্তৃত ও গভীর গড়খাই খনন করেন।[১] উহার বিস্তৃতি প্রায় ২০০ ফুট। এই নদীর মত পরিখা পার্শ্ববর্ত্তী লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে।

বহু নিরক্ষর কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইদু বিশ্বাস ও পাগলা কানাই-এর কথা আমরা পরে বলিব। সীতারামের সময়ে প্রচারিত একটি ধুয়া এই :

"শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন। দেশ গায়েতে যা হইল শুন দিয়া মন॥
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই। কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায়॥
রাজা বলে আল্লাহরি নহে দুইজন। ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক্‌গে তেমন॥
মিলেমিশে থাকা সুখ, তাতে বাড়ে বল। ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গিরা খল॥
চুলে ধরি নারী ল'য়ে চড়তে নারে নায়। সীতারামের নাম শুনিয়ে পলাইয়া যায়॥"

--যদুনাথ, 'সীতারাম', ৫ম সং, ১১২ পৃ

১ পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ জলাশয়ের জল হিন্দুরা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে ব্যবহার করেন না বলিয়া সীতারাম এই বাহিরের পরিখাটির পূর্ব্বসীমায় উত্তর মুখে এবং পশ্চিমপ্রান্তে দক্ষিণ মুখে পরিখাটিকে একটু দূর পর্য্যন্ত খনিত করিয়া জলাশয়টি উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মহম্মদপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রবল নদী মধুমতী ভূষণা প্রদেশ হইতে উহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর বা পশ্চিম দিক হইতে কোন শত্রু সৈন্য আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না এবং সেদিকে চলাচলের পথবিহীন বহুবিস্তৃত বিল ছিল। শত্রু আসিতে হইলে, ভূষণা অঞ্চল হইতে বারাসিয়া বা মধুমতী নদী পার হইয়া, পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিক দিয়া দুর্গাক্রমণ করিতে হইত। দক্ষিণ দিক হইতে প্রবেশ করিবার পথে সীতারামের প্রশান্ত জলাশয় রামসাগর। উহার উত্তর প্রান্তে প্রথম বাধা দিবার স্থান। সেখান হইতে শত্রুসৈন্য অবাধে অগ্রসর হইলে, উত্তর মুখে আসিয়া ঠিক দুর্গের সম্মুখে পড়ে, ঐ পথের ডানদিকে বাহিরের পরিখা বিস্তৃত ছিল। দুর্গের সম্মুখে সেনা নিবাস ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত রাজপথ পশ্চিম মুখে গিয়া ভিতর দুর্গেব দ্বারে পৌছিয়াছিল। বাঁকের মুখে শত্রুর সংকারের জন্য সারি সারি কামান পাতা থাকিত; যদি তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া কাহারও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য থাকে, তবে দুর্গের সদর তোরণে অর্গলবদ্ধ দ্বারের সম্মুখে ভীষণ সংঘর্ষ বাধিত।

এখন দুর্গাভ্যন্তরের ভগ্ন গৃহাদি দেখিয়া ভিতরের অবস্থা যাহা অনুমান করিতে পারি, তাহা বলিতেছি। মানচিত্র হইতে উহা সহজে বুঝা যাইবে। শ্মশানের অস্থিখণ্ড হইতে জীবন্ত মনুষ্যের অনুমান করার ন্যায় ভগ্ন স্তূপাদি হইতে সৌধ-সৌন্দর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথম তোরণ দিয়া ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে, ডানদিকে পুণ্যাহ ঘর ও পশ্চাতে কারাগার এবং বামে শরীররক্ষী সৈন্যের আড্ডা ছিল। সীতারামের পতনের পর শেষোক্ত স্থানে নল্‌দী জমিদারীর কাছারী বসিয়াছিল। আর একটু অগ্রসর হইলে, ডান দিকে মালখানা ও কানুন্‌গো কাছারী এবং বামভাগে সুবিস্তৃত গোলাবাড়ী দৃষ্টিপথে পড়িত। পরবর্ত্তী অর্থাৎ তৃতীয় চত্বরে উত্তরদিকে দশভুজার মন্দির, পশ্চিমে কৃষ্ণজীর অশেষ কারুকার্য্য খচিত অপূর্ব্ব মন্দির এবং দক্ষিণে নহবৎখানা ছিল। কৃষ্ণজীর মন্দিরের দক্ষিণ দিয়া সদর পথে অগ্রসর হইলে, বামে শিবমন্দির থাকিত। পরবর্ত্তী অর্থাৎ চতুর্থ প্রাঙ্গণে উত্তরে লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টকোণ দোতালা মন্দির, পশ্চিমে তোষাখানা[১] ও অন্যান্য গৃহ, এবং দক্ষিণের পোতায় রাজার খাস

১ তোষাখানার অট্টালিকাটি সম্পূর্ণ খিলানে গঠিত জোড়-বাঙ্গলা। মোট ৪টি গৃহে বিভক্ত; দক্ষিণ দিকের দুইটি ঘর বড, উহার প্রত্যেকটি ৩২´-৪´´×৮´-১০´´। উত্তরদিকের ঘর দুইটি ছোট, উহার প্রত্যেকটি ১৪´-৯´´×৭´-৩´´। প্রস্থদিকের ছাদের খিলানের উচ্চতা—১১´-৩´´ ইঞ্চি।

বৈঠকখানা ছিল। পরবর্ত্তী চত্বরই অন্দর মহল, উহার এখন কিছুই নাই। কেবল তাহার পশ্চাতে সাধুখাঁর পুকুর নামে একটি সুদীর্ঘ খাত আছে।[১] অন্দর মহলের প্রবেশের বামভাগে একটি ঢিপিকে লোকে 'সবিলা বেওয়ার ভিট্রা' বলে। পাঠান সৈন্যগণ সীতারামের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তিনি বাছিয়া বাছিয়া উঁহাদের মধ্য হইতে শরীররক্ষী সৈন্য লন, উঁহারা দুর্গমধ্যে বাস করিতেন। এমন কি, অন্তঃপুরের পরিরক্ষণ কার্য্যেও তিনি পাঠান সেনানীকে ভার দিয়াছিলেন। সবিলা বেওয়া ঐরূপ কোন দ্বাররক্ষকের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন। হয়ত ইহা হইতেই ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে, সীতারামের অন্তঃপুরমধ্যে গণিকাদিগের বাসা ছিল। সে অনুমান অমূলক।[২]

দশভুজার মন্দিরের উত্তরদিকে একটি সুন্দর ছোট পুকুর আছে, উহার চারিপাশ এবং তলদেশ সানবান্ধা। ঐ তলদেশে ৭।৮টি চাড়িবসান কূপ ছিল, উহা হইতে জল বাহির হইয়া পুষ্করিণীটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। এই পুকুরকে লক্ষ্মীনারায়ণেব পুকুর বা ধনাগার পুকুর বলে, কারণ প্রবাদ আছে, এই পুকুরের মাঝে সীতারামের ধনরাশি বিভিন্ন পাত্রে জলমগ্ন থাকিত। প্রবাদ অবিশ্বাস্য নহে, অনেকে বহুদিন পরেও এখানে ধনলাভ করিয়াছেন, এবং কাহারও বা বিপুল চেষ্টা বিফল হইয়াছে।[৩] এই ধনাগার পুকুরেব পশ্চিম পারে এখনও একটি দোতালা অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, লোকে বলে উহাই ছিল রাজা সীতারামের খাস বাসগৃহ।[৪] উহারই সম্মুখে পশ্চিমদিকে একটি গোলা-

১ কথিত আছে, যে বৎসর সীতারামের ভগিনীর সহিত গোপেশ্বর খাঁ ঘোষের বিবাহ হয়, সেই বৎসর এই পুকুর খনিত হয়। গোপেশ্বরের অন্য নাম সাধু খাঁ। তজ্জন্য অন্দরের স্ত্রীগণ এই পুকুরকে সাধুখাঁর পুকুর বলিতেন।—যদুনাথ, 'সীতারাম', ১৩৮ পৃ।

২ Westland, *Jessore*, p. 30, যদুনাথ, ৫২১ পৃ।

৩ এই পুকুরে এক সময়ে নলদীর নায়েবের পাচক একটি বাক্সে ৫০০ স্বর্ণ মোহর পায়। এইরূপ আরও অনেকে অর্থ পাইয়াছে। কিন্তু নড়াইলের বাবুরা '…made diligent search in the tank to find any stray treasure which might be in it.'—Westland, *Jessore*, p.31.

৪ গৃহটি দোতালা, পশ্চিমদিকে সদর, সেইদিক হইতে ফটো লওয়া হয়। নিম্নতলে সম্পূর্ণ গৃহটি তিনটি কামরা ও একটি দরদালানে বিভক্ত। পার্শ্বের দুইটি ঘর প্রত্যেকটি ২১´-৯´´×৮´-৯´´, মধ্যের ঘরটি ২৫-৬´´×৮´-১০´´ এবং দরদালান ২৫´-৬´´×৮´-১০´´; উপরের তলেও এইরূপ ছিল।

কার ইষ্টকস্তূপ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে, উহাকে তাঁহার বিলাসগৃহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু সে নর্ম্ম-গৃহে একদিন বিলাসের কি সরঞ্জাম ছিল, তাহা কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইতে হয়। ঐ স্তূপেরই শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া, যখন একদিন অপরাহ্ণে সীতারামের আবাসবাটিকার ফটো তুলিতেছিলাম, তখনই পশ্চাৎ হইতে এক বন্য বরাহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আমার জীবনান্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। অন্দর মহলের উত্তরদিকে একটি স্থানকে নয়াবাড়ী বলে; হয়ত সেখানে কোন নূতন রাণীর নূতন বাড়ী ও পুকুর ছিল। সীতা-রামের পতনের পর সেখানে নড়াইলের কাছারী বসিয়াছিল; এখন তাহা গভীর জঙ্গলের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গ-পরিখার উত্তরে প্রীতরাম সরকারের পুকুর ও মন্দির ছিল। পুকুরকে দেওয়ানের পুকুর বলে। সরকার মহাশয় সম্ভবতঃ নায়েব দেওয়ান ছিলেন। সরকারের বাটীর উত্তর দিকে নারায়ণপুর গ্রাম; তথায় দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের বাটীর ভগ্নাবশেষ জঙ্গলমধ্যে আবিষ্কার করা যায়। মন্দিরের উপর বটবৃক্ষ জন্মিয়া কালে এত বড় হইয়াছে, যে মন্দিরের ভগ্নাংশ এক্ষণে বৃক্ষশীর্ষে দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছে। দেওয়ান বাটীর পূর্ব্বদিকে কামারপাড়া ছিল। তাঁহারা সীতারামের অস্ত্রনির্ম্মাণ করিতেন। কামার বাড়ীর অনেক ভগ্নগৃহ এখনও জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। সে জঙ্গলে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি প্রাচীন কাহিনীর বার্ত্তাবহ হইয়া রহিয়াছে।

দুর্গের সিংহদ্বারের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সীতারামের ইষ্টক রচিত দোলমঞ্চ ছিল; এখন উন্মুক্ত প্রান্তর জঙ্গলাবৃত হইয়াছে, কিন্তু দোলমঞ্চ আছে এবং নাটোরের আমলে একবার সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এখনও ভাল অবস্থায় আছে। এক সময়ে পরিখা বেষ্টিত এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব ও উত্তর ধারে সেনা-নিবাস ছিল এবং মধ্যস্থলে কুচ্-কাওয়াজ্ হইত। দোলমঞ্চের দক্ষিণ-দিকে রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটী। এই বাটীটি প্রাচীর বেষ্টিত চক, উহার কতকাংশ দোতালা। উত্তরদিকে নিম্নতল দিয়া সদর পথ, পশ্চিমের পোতায় রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বপোতায় কাছারীঘর এবং দক্ষিণ-দিকের একপার্শ্বে লোকজনের বাসগৃহ ও অন্যদিকে ভোগমন্দিরাদি ছিল। পশ্চাৎ দিকে একটি পুকুর আছে। এই বাটী সীতারামের সময়ের নহে; তাঁহার রাজ্য যখন নাটোররাজ্যের অধিকৃত হয়, তখনই কাছারী বা কর্ম্মচারীদের বাস-

গৃহের জন্য রাজপুরীর মালমসল্যা দিয়া এই বাটী গঠিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, রাণী ভবানীর সময়ে তাঁহার বিধবা কন্যা অপূর্ব্ব রূপবতী তারাদেবী সিরাজ-উদ্দৌলার অত্যাচার ভয়ে কিছুকাল গুপ্তভাবে এইস্থানে বাস করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার স্বামীর নাম—রঘুনাথ লাহিড়ী। এইজন্য তিনি বহুস্থানে রঘুনাথ বা রামচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদপুরে বাস করিবার সময় তিনি এই কাছারী বাটীতে উক্ত বিগ্রহগুলি স্থাপনা করিয়া উহার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। রামসাগরের জলকর ও অন্য কয়েকটি তালুক এই বৃত্তির মহল ভুক্ত ছিল, পরে উহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

দুর্গের বাহিরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বাজার ছিল। রামসাগরের উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত চাঁদনী চকের মত নানাজাতীয় বিপণি-মালায় পরিশোভিত ছিল। দক্ষিণদিকের যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার কথা বলিয়াছি, তাহার উত্তর ধারেও বাজার ছিল, এখন উহার একটা স্থানকে 'বাজার রাধানগর' বলে। বিশেষত্ব এই ছিল যে, এই বাজারের এক এক অংশ এক এক প্রকার দ্রব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহাকে এক একটি পটী বলিত; যেমন কাইয়া পটী, কামার পটী ও কাষ্ঠঘর পাড়া প্রভৃতি। এখন দোকানপাটের চিহ্ন নাই, কিন্তু লোকমুখে নামের খবর আছে। সীতারামের সৌভাগ্যরবি সমুদিত হইলে, ভূষণাসহরকে নিষ্প্রভ করিয়া মহম্মদপুরে বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়াছিল। সেই বাণিজ্যলোভে বা রাজসরকারে চাকরির খাতিরে বহু বৈদেশিক জাতি আসিয়া জুটিয়াছিলেন। কাইয়া বা মাড়োয়ারিরা ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলেন, পাঞ্জাবীরা সৈন্যদলে ঢুকিয়াছিলেন। এখনও কাষ্ঠঘর

১ রাজসাহীর অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পরে রঘুনাথের মৃত্যু ঘটে। যৌবনে তারা অসামান্য রূপলাবণ্যে, শিক্ষাগৌরবে ও চরিত্রগুণে খ্যাত হন। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানীর উপযুক্ত কন্যা এবং একমাত্র সন্তান। ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন, রাণী ভবানী সিরাজের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তারাকে লইয়া বারাণসীধামে পলায়ন করেন।—Calcutta Review, Vol. LVI, 1873, p. 12. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন, কলঙ্কভয়ে রাণী নিজ কন্যার মৃত্যু রটনা করিয়া দিয়াছিলেন।—'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ১৭১ পৃ। মহম্মদপুরে তারার গুপ্ত-বাসের প্রবাদ এত প্রচলিত এবং রামচন্দ্র প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ঐ প্রবাদকে এত সমর্থন করে যে, কাশীধামে যাওয়ার পূর্ব্বে তারার কিছুদিনের জন্য মহম্মদপুরে বাস করিবার কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

পাড়ায় দুই একটি নিঃস্ব হিন্দুস্থানী পরিবার কোনরূপে দিনপাত করিতেছেন; এখনও দশভুজার পূজক তেওয়ারি ব্রাহ্মণেরা দুর্গমধ্যে বসতি করিতেছেন। হিন্দুস্থানীরা রাজধানী মহম্মদপুরে, কোড়কদির নিকটবর্ত্তী গন্ধখালিতে, এবং অন্যান্য নানা মোকামে বসতি করিয়া এখন স্থানীয় বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। এখনও আমাদের দেশের প্রায় সকল জমিদার-গৃহে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়গণ বল ও বিশ্বাস উভয়ের ষোলআনা পরিচয় দিয়া অর্থ ও যশঃ উভয়ই অর্জ্জন করিতেছেন।

সীতারামের রাজধানীতে তাহার ইষ্টকগৃহসমূহ অপেক্ষা জলাশয়গুলি অধিকতর স্থায়ী এবং শোভাময়। তাঁহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যস্ততার সঙ্গে রাজধানীর গৃহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল; এজন্য তাহার অধিকাংশে শিল্পকলার পরিচয় নাই। উৎকৃষ্ট মালমসল্যার পর্য্যাপ্ত সংস্থান ছিল না বলিয়া লবণাক্ত দেশের দোষে সৌধগুলি অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে ভগ্নপ্রায় ইষ্টকগৃহ শুধু হিংস্রের আবাস-ভূমি হইতেছে; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘিকাগুলি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার জলদান পুণ্যের জীবন্ত সাক্ষী রহিয়াছে; এই 'সাগরগুলির' মধ্যে রামসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুপেয় সলিলপূর্ণ। আমাদের দেশে সকল বড় জিনিষকে রামনামে আখ্যাত করা হয় (যেমন রাম দাও, বা রাম ছাগল); তেমনি ভাবে ইহার নাম হইয়াছিল রামসাগর।[১] কেহ কেহ বলেন এই নামের সঙ্গে সীতারামের নিজ নাম বা রামরূপের রামনামের সংস্রব ছিল। এ সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে। ঐ দীঘির উত্তর ধারে এক বৃদ্ধা রমণী ও সীতারাম নামে তাহার এক দরিদ্র পুত্র বাস করিত। একদিন যখন বুড়ী নিজপুত্র সীতারামকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল, তখন রাজা সীতারাম সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। একটা খেয়াল হইল, রাজা বুড়ীর বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুড়ী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, সে রাজাকে ডাকে নাই, পুত্রকে ডাকিয়াছে; তবু রাজা ছাড়িলেন না, রাজার আগমন ব্যর্থ হইতে পারে না, সুতরাং বুড়ীর যদি কিছু অভাব থাকে তাহা জানাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইল। অবশেষে বৃদ্ধা তাহার জলকষ্টের কথা বলিল। তখন বুড়ির জন্য একটি কূপ খনন করিয়া

১ Sen, Ram Sankar, *Report*, p. liii.

দিবার আদেশ হইল। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যারম্ভ হইল, কিন্তু গল্প এখানে শেষ হইল না। বৃদ্ধার লাউ গাছের তলায় কূপ খনন কালে ভূগর্ভে যথেষ্ট অর্থ-ভাণ্ডার পাওয়া গেল। তখন রাজা আদেশ দিলেন, ঐখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেনাপতি মেনাহাতী দক্ষিণ মুখে আকর্ণ সন্ধানে তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা যতদূর গিয়া পড়িবে, ততদূর পর্য্যন্ত একটি দীঘি কাটিয়া দেওয়া হইবে।[১] মেনাহাতীর তীর বহুদূরে নৈহাটি গ্রামের কাছে মধুমতীর তীরে পড়িল; উহার অভ্যন্তরে বহু ব্রাহ্মণের নিষ্কর ও কর্ম্মচারীদিগের বাড়ীঘর পড়িয়া গেল। ধর্ম্মপ্রাণ সীতারাম সে সব ব্রাহ্মণের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তাই দীঘির দৈর্ঘ্য কমিয়া গেল। তবুও যাহা থাকিল, তেমন জলাশয়, শুধু এ জেলায় কেন, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে আর নাই।[২]

রামসাগরের বিশেষত্ব এই যে, আজ ২২৫ বৎসর মধ্যেও ইহার জল সমান আছে, দামদল শৈবালের চিহ্ন মাত্র নাই, বিস্তীর্ণ হ্রদের বক্ষে স্বচ্ছ সলিলে লহরী দেখিলে চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। ইহারই উত্তরের উচ্চ পাহাড়ের উপর এক্ষণে মহম্মদপুরের গ্রাম্য পোষ্ট অফিস অবস্থিত। একদিন মনে আছে, পোষ্ট অফিসের কক্ষে বসিয়া যখন রামসাগরের বক্ষে ক্ষুদ্র বীচি-বিক্ষোভ দেখিতে দেখিতে শীকর-সিক্ত সমীর সেবন করিতেছিলাম, তখন গ্রাম্য পোষ্ট মাষ্টারের সহিত ভাগ্য-বিনিময় করিবার সাধ হইতেছিল। এখনকার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ক্ষুদ্রকায় জলাশয় সমূহ দুইবৎসরে বিশুষ্ক হইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র দেশে 'জলদুর্ভিক্ষের' সৃষ্টি করে, বিশখানি গ্রামের মধ্যেও একটি সুজলা সরসী দেখা যায় না; আর

১ বাগেরহাটে খাঁ জাহান আলির খনিত একটি দীঘির নাম ঘোড়াদীঘি। প্রথম খণ্ডে উহার বিবরণ দিয়াছি। ঘোড়াদৌড়ের জন্য ঘোড়াদীঘির মত রামসাগরের নাম তীরদীঘি হইতে পারিত। রামরূপের তীর বলিয়া দীঘির নাম রামসাগর হওয়া বিচিত্র নহে।

২ 'It is the noblest reservoir of water in the district. It is the greatest single work that Sitaram has behind him.'—Westland, *Jessore*, p. 29 ; Hunter ; *Jessore*, p 214 ; Jessore Gazetteer, p. 161. আকারে আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সাগরদীঘির সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, কিন্তু সাগরদীঘি মজিয়া গিয়াছে, রামসাগর মজে নাই। রামসাগরের জলে শৈবালাদি জন্মিতে না পারে, এজন্য সীতারাম নাকি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাম্রখণ্ড এবং পারদপূর্ণ করিয়া গাছের গুঁড়ি ইহার জলে নামাইয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছিল।

দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বের একটি রাজার জলদানকীর্ত্তি তাঁহার জনহিতৈষণার কথা ব্যক্ত করিতেছে। রামসাগরের জলাশয়-ক্ষেত্র পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইলেও এখনও ১৬০০ হাত দীর্ঘ এবং ৬০০ হাত প্রশস্ত আছে। পাহাড় লইয়া ইহার বেষ্টন ৬০০০ হাতের কম হইবে না, অর্থাৎ পরিমাণফল অন্যূন ২০০ বিঘা। জলের গভীরতা অন্যূন ১২।১৪ হাত; একবার চৈত্র মাসে যখন নৌকা লইয়া সমস্ত জলাশয়ের জল মাপিয়া দেখিয়াছিলাম, কোথায়ও ৮।৯ হাতের কম ছিল না।

রামসাগরের পশ্চিমদিকে বিলের মধ্যে আর একটি জলাশয় দেখা যায়, উহার নাম সুখসাগর। ইহাকে দীর্ঘিকা বলা চলে না, কারণ ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান, প্রত্যেক দিকে ২৫০ হাত হইবে। ইহার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপের উপর এক প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ এক্ষণে জঙ্গলাবৃত হইয়া বিষধর সর্পের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ স্থানে এক সুন্দর ত্রিতল গৃহ সীতারামের গ্রীষ্মাবাস ও আরামের স্থান ছিল। এই জন্যই ইহার সুখসাগর নাম হইয়াছে। সেখানে নাকি সীতারাম শত যুবতী সঙ্গে বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্ত করিতেন। স্থানান্তরে আমরা এ গল্পের যৌক্তিকতা বিচার করিব। সুখসাগরে ময়ুর-পঙ্খী নৌকা সজ্জিত থাকিত। বাহিরের দীর্ঘ গড়ের পশ্চিম প্রান্তে কানাইনগর গ্রাম; সেখানে সীতারাম 'হরেকৃষ্ণ' বিগ্রহের জন্য অতুলনীয় পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন; সীতারামের মন্দিরের মধ্যে সেইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উহার বিশেষ বিবরণ পরে দিব। কানাইনগরেও মন্দির সংলগ্ন দুইটি পুষ্করিণী আছে। ঐ স্থান হইতে একটু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল, হরেকৃষ্ণপুর গ্রাম। সেখানে কৃষ্ণসাগর নামে একটি অতি সুন্দর দীঘি আছে; এখন উহার জলাশয়ের পরিমাণ ১০০০´ ×৩৫০´ ফুট। জল অতি পরিষ্কৃত, ঈষৎ কৃষ্ণাভ, হয়ত সেইজন্যই ইহার নাম কৃষ্ণসাগর। কেহ কেহ বলেন, ইহার জল রামসাগর অপেক্ষাও ভাল। 'সীতা-রাম কৃষ্ণসাগর খনন করাইয়া তাহার মৃত্তিকা রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার অবসর দেন নাই; তাহা সরোবর তীর হইতে প্রতি দিকে প্রায় এক বিঘা দূরে আনিয়া চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া যে পঙ্কিল সলিলস্রোত প্রত্যেক সরোবরকেই বর্ষাকালে আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহা আর কৃষ্ণসাগরের সীমাস্পর্শ করিতে পারে নাই; তাহার জল এখনও ঝক্ ঝক্ তক্ তক্

করিতেছে।'[১] ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন, সকল পুষ্করিণী খনন কালে এই প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।[২]

সীতারামের রাজধানীর মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া গেল। রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি জন্য আয়বৃদ্ধির প্রয়োজন; রাজ্য ব্যতীত আয়বৃদ্ধি হয় না। আবার রাজ্য-বিস্তার করিতে গেলেই মোগল-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী; কারণ, দেশীয় রাজা বা জমিদার মোগলের হস্তে যতই অত্যাচারিত হউক না কেন, তাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ হইবা মাত্র তাহারা যে মোগলের পক্ষভুক্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রজার মুখের দিকে চাহিলে, সে কথা মনে থাকে না। প্রজা-বর্গকে রক্ষা করাই সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল; তিনি সেই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া রাজধানীতে অর্থসঞ্চয়, অস্ত্রসংগ্রহ ও সৈন্যবৃদ্ধি করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিয়মিত বেতনের লোভ দেখাইতে পারিলে, সৈন্য-সংগ্রহে কোন অসুবিধা ছিল না। দস্যুতার পথ বন্ধ হওয়াতে অনেকের জীবনোপায় নষ্ট হইয়াছিল; চাষ ব্যবসায়ে তাহাদের অভ্যাস বা লোভ ছিল না। তাহারা সৈন্যদলে ঢুকিবার জন্যই চেষ্টা করিত। সাধিয়া আসিয়া ইহারা অনেকে সীতারামের সৈন্যশ্রেণী পুষ্ট করিল। বেতনের সঙ্গে লুণ্ঠনের লোভ যে ছিল না, তাহা বলিতে পারি না।

অন্য প্রদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইলে, নবাব বা ফৌজদারের দৃষ্টিপথে পড়িতে হয়, আর সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়; সীতারাম তাহা করিলেন না। তিনি নিজের রাজধানীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার জন্য জমকাইয়া বাজার বসাইলেন; সেখানে আসিয়া ব্যবসায় খুলিবার জন্য নানাদেশের লোককে ডাকিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে ভূষণা ও ঢাকা হইতে যে ব্যবসায়ীরা আসিলেন, তাঁহারাই প্রধান। উভয় সহরই তখন পূর্ব্ব বঙ্গের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সূক্ষ্মবস্ত্র ও সোণারূপার কারু-শিল্পের ত কথাই নাই, এই দুইস্থানে অন্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভূষণার কথা বিশেষভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঢাকা ও ভূষণার শিল্পী আসিয়া মহম্মদপুরকে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। শিল্পীকে উৎসাহ দান রাজাদিগের প্রধান কার্য্য ছিল। এখনও আমাদের দেশে যেখানে কোন প্রাচীন রাজার

১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'সীতারাম', ৪৮ পৃ।

২ Westland, *Jessore*, p. 37.

বাসস্থানের চিহ্ন আছে, তাহারই পার্শ্বে এখনও নানাবিধ শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষ শিল্পের জন্য এখনও কোন কোন স্থান বিখ্যাত আছে, একটু খুঁজিয়া দেখিলে উহারই পার্শ্বে উৎসাহদাতা কোন পুরাতন রাজা বা জমিদারের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের যশোহর আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু উহার নিকটবর্ত্তী কালীগঞ্জের কর্ম্মকারগণ এখনও সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য দেশবিখ্যাত। তবে এখন তাঁহারা সুধার তরবারি বা সুদীর্ঘ বন্দুকের নল না গড়িয়া, ছুরি কাঁচি জাঁতি, বড় জোর রাম দা ও খাঁড়া গড়িয়া দিন কাটাইতেছেন; মুকুন্দপুরের খণ্ডিকারগণ এখন আর পর্য্যাপ্ত হাতীর দাঁত পান না, তবুও হরিণ বা মহিষের শিং দিয়া নানাবিধ সুন্দর আসবাব দ্রব্য তৈয়ার করেন। সীতারাম ঢাকা হইতে কামারগণ আনিয়া দুর্গের পাশে বসতি করাইয়াছিলেন, তাঁহারা ত সাধারণ যন্ত্রাদি বা অস্ত্রশস্ত্র গড়িতেনই, তদ্ভিন্ন রাজার ফরমাইজ মত যে বড় বড় কামান, গুলিগোলা ও সুতীক্ষ্ণ তরবারি গড়িয়াছিলেন, উহার ব্যবহার দেখিয়া মোগলেরাও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এখনও মহম্মদপুরে কামারদিগের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে; তাঁহাদের বংশধরগণ জঙ্গল হইতে সরিয়া গিয়া বাজারের কাছে বাস করিতেছেন এবং এখনও তাঁহারা নানাবিধ গৃহাস্ত্র গড়িয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। শুধু কামার নহে, নানাজাতীয় কারিকরগণ মহম্মদপুরে ব্যবসা খুলিয়া লাভবান হইতে লাগিলেন। 'কেহ বস্ত্রবয়ন করিতে আরম্ভ করিল, কেহ চারুশিল্পের আলোচনায় নিযুক্ত হইল, কেহ বা যুদ্ধোপযোগী বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিল। অল্পদিনের মধ্যে সীতারামের বাজার আর সামান্য বাজার বলিয়া মনে হইল না, শিল্পপ্রদর্শনীর সুবৃহৎ শিল্পাগার হইয়া উঠিল।'[১]

বাঙ্গালী কর্ম্মকারেরা কেমন করিয়া কামান নির্ম্মাণ করিতেন, এখনও তাহার নিদর্শন অপ্রতুল নহে। মুর্শিদাবাদে নবাব বাড়ীর সম্মুখে একটি সুবৃহৎ কামান পড়িয়া আছে, উহা বাঙ্গালীর হাতে গড়া। উহার নাম 'জাহান কোষা' বা জগজ্জয়ী, দৈর্ঘ্য ১২ হাত, বেড় ৩ হাত, মুখের বেড় এক হস্তের উপর, ওজন ২১২ মণ, উহাতে প্রতিবারে ২৮ সের বারুদ লাগিত। কামান-গাত্রে পিত্তল ফলকে লেখা আছে, উহা ১০৪৭ হিজরী বা ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে ঢাকা নগরে জনার্দ্দন

১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'সীতারাম', ৫১ পৃ।

কর্ম্মকার কর্ত্তৃক গঠিত হয়। দেশের মধ্যে এমন কত জনার্দ্দন যেখানে সেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আরও ৫০ বৎসর পরে রাজা সীতারামের সময় এমন কোন কোন জনার্দ্দন এইরূপ কত জনার্দ্দন বা জনধ্বংসী কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পর বিপ্লবে, ম্যাক্সিম কামানের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাহারা ভূগর্ভে বা অন্যভাবে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সীতারামের দুইটি প্রধান কামানের নাম ছিল, কালে খাঁ ও ঝুম্‌ঝুম্ খাঁ।[১] দুইটির এইরূপ বিশেষ নাম থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার আরও বহুসংখ্যক ছোটবড় কামান ছিল; নিকটবর্ত্তী রাজা বা জমিদারেরা উহার ভয়ে ব্যাকুল হইতেন। মহম্মদপুরের যে মালাকরগণ রাশি রাশি বারুদ প্রস্তুত করিয়া এই সকল কামানের বৃকোদর পূর্ণ করিবার খাদ্য জুটাইতেন, এখন তাঁহারা নলদী, কুলসুর, বাটাজোড় প্রভৃতি নানাস্থানে উঠিয়া গিয়া বারুদের আতস বাজী, শোলার খেলনা ও ডাকের সাজ প্রস্তুত করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন।

সীতারাম জমিদারীর সময় হইতে দস্যু ডাকাইতদিগকে দেশান্তরিত করিয়া শান্তিসংস্থাপন করিয়াছিলেন। শাসনহীন দেশে সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া, ন্যায় বিচারকে করুণার্দ্র করিয়া রাজা সীতারাম প্রজাবর্গের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনতলে নিরাপদে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার আশায় পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারী হইতে প্রজাবর্গ যখন দলে দলে তাঁহার এলেকায় আসিতে-ছিলেন, তাঁহার লোকজনেরা উহাদিগকে যত্ন করিয়া চাষবাসের জমি দিয়া উপযুক্ত স্থানে বসতি করাইতেছিলেন। তখন দেশের কপাল পুড়ে নাই; ম্যালেরিয়া রাক্ষসী মহম্মদপুরকে গ্রাস করিয়া বসে নাই। এক ধারে নবগঙ্গা ও অন্যদিকে মধুমতী, উভয়ের স্বচ্ছস্নিগ্ধ মিষ্ট সলিলের কূলে বাস করা যে কি সুখের ছিল, তাহা কল্পনা করা যায় না। উত্তরাধিকারীর অভাবে বা অন্য অসুবিধায় নিকটবর্ত্তী যে সকল জমিদারী বিশৃঙ্খল হইতেছিল, উহার তত্ত্বাবধানের ভার সহজে আসিয়া সীতারামের হাতে পড়িল। কঠোর শাসনের ফলে যে সব জমিদারীর প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া সীতারামকে জানাইলেন, তিনি সসৈন্যে

১ বাগেরহাটের সন্নিকটে খাঁ জাহানের দীঘিতে বা অন্যত্র বড় বড় কুমীরের এই সব নাম ছিল। কামানগুলিও কুমীরের মত দেখাইত বলিয়া সীতারাম তাহাদের ঐরূপ নামকরণ করেন। খাঁ উপাধি তখন হিন্দু মুসলমান অনেকের ছিল, কামানের থাকিবে না কেন?

গিয়া সহজে সে সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তিনি যে আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহাতে সুন্দরবন প্রদেশের বিশেষ কোন সীমা দেওয়া ছিল না, নবাবানুগৃহীত অন্য কোন প্রবল জমিদারের সঙ্গে বিবাদ না করিয়া তিনি যতদূর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে পারেন, তাহার বাধা ছিল না। এইরূপ নানা কারণে তাঁহার জমিদারী দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সকল ঘটনা সময়ানুক্রমে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া সুকঠিন। আমরা সীতারামের রাজ্যবিস্তারের কথঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য কয়েকটিমাত্র অভিযানের উল্লেখ করিতেছি।

সর্ব্বারম্ভে পশ্চিমদিকেই সীতারামের নজর পড়ে। নবগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকৃত ছিল এবং বিনোদপুর তাঁহার একটি আবাস-গৃহ ছিল। সেই বিনোদপুরের অপর পারে সত্রাজিৎপুর। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভূষণার বিখ্যাত ভুঞা মুকুন্দরামের পুত্র সত্রাজিৎ এইস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন। ঢাকায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের পর (১৬৩৬) তাঁহার রাজবংশ নিষ্প্রভ হয় (৫২৯ পৃ)। তৎপুত্র কালীনারায়ণ চাকলা ভূষণার অন্তর্গত রূপাপাত, পোকতানি, রকনপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণা এবং নলদীর অন্তর্গত তরফ কচুবাড়িয়ার জমিদার ছিলেন। কালীনারায়ণের পৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্রগণ সীতারামের সময় ঐ জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। সীতারাম উহা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ইহাতে নাবালকেরা জমিদারীর উপস্বত্বে বঞ্চিত হয় নাই, বরং সীতারামকে অভিভাবক স্বরূপ পাইয়াছিল। নবাবকে রাজস্ব না দিয়া সীতারামকে দিতে হইত। এই বংশের বিশেষ বিবরণ পরে দিব।

সত্রাজিৎপুরের পশ্চিমদিকেই মামুদশাহী পরগণা, উহা নলডাঙ্গার রাজার জমিদারী, তখন রাজা ছিলেন রামদেব। সেনাপতি মেনাহাতী গিয়া তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করেন। রামদেব যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই, পূর্ব্বাংশ সীতারামকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৪৭৫-৬ পৃ)। সীতারামের অধিকৃত অংশ পরে নাটোরের অধিকৃত হয়। এখনও সেইরূপ আছে।

উত্তর দিকে মাগুরার নিকটবর্ত্তী নান্দুয়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক একজন বৈদ্য জমিদার প্রবল হইয়া উঠেন। নলডাঙ্গার রাজা সুরনারায়ণের

সময় উহা তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। শচীপতি রাজা রামদেবের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজে রাজা বলিয়া প্রচারিত হন। সীতারাম শচীপতির বিদ্রোহিতার সহায় হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ; কারণ ভেদ-নীতির কৌশলে পার্শ্ববর্ত্তী প্রবল জমিদারদিগকে নিজ করতলে রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সীতারামের পতনের পূর্ব্বেই রাজা শচীপতির সকল গর্ব্ব নষ্ট হয়। এখনও নবগঙ্গার অনতিদূরে তাঁহার বাটির ভগ্নাবশেষকে 'মঠবাড়ী' এবং নদীর ঘাটকে 'রাজবাড়ীর ঘাট' বলে।[১]

উত্তরদিকে পদ্মা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীগুলি অধিকাংশই সীতারামের হস্তে আসে। এমন কি পদ্মার অপর পারে বর্ত্তমান পাবনা জেলার কিয়দংশও তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান পাক্‌সি রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে পাক্‌সিয়া, পাত্‌লাখালি প্রভৃতি গ্রামে মোট ৮২৮২ কাঠা জমি সীতারাম তাঁহার দৌহিত্রদিগের গৃহে নিজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেববিগ্রহের জন্য দেবোত্তর দিয়াছিলেন।[২]

---

১ এখন এই ঘাটে বিজয়ার দিন সকল বাড়ীর প্রতিমার ঘট বিসর্জ্জন হয়। রাজবাটীর মন্দিরে যে সকল বিগ্রহ ছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি এখনও বর্ত্তমান। ৺শ্যামরায় নান্দুয়ালী নিবাসী তারক চন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে এবং কৃষ্ণরায় ও লক্ষ্মী দেবী ঐ গ্রামের প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে পূজিত হইতেছেন। শচীপতির পুত্র কুশলরাম ও তৎপুত্র নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। নলডাঙ্গার রাজা নান্দুয়ালী পরগণা দখল করিয়া লইয়া রাজবাটীর জমি রাম-কুমার ও ব্রজকুমার রায়কে নিষ্কর দেন। উঁহারা উভয়ে নির্ব্বংশ। তাঁহাদের অংশ জগৎমোহন ও প্যারিমোহন মজুমদার প্রাপ্ত হন। ৺প্যারিমোহন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তৎপুত্র তারকনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের উচ্চ কর্ম্মচারী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার M. A., P. R. S. প্রাচীন ভারতেতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও যশোহরের গৌরবস্থল।

২ কালাচাঁদ, রাধামাধব, রাধিকা, লক্ষ্মী জনার্দ্দন, গণেশ, দশভুজা ও সর্ব্বমঙ্গলা—এই কয়েকটি দেব বিগ্রহের জন্য রাজা সীতারাম পরগণে নাজিরপুরে পাক্‌সিয়া গ্রামে ১৭॥১, পাত্‌লাখালী গ্রামে ৪৫/০ বিঘা এবং অন্য কয়েকটি গ্রামে ২০৷১, একুনে ৮২৮২ জমি নিষ্কর দেন। ১২২৫ সালে তাঁহার দৌহিত্র ভৈরবচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র সেন সেবার জন্য বিগ্রহগুলি এবং উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সীতারামের পূর্ব্বতন গুরুবংশীয় কোড়কদি নিবাসী গৌরমোহন ভট্টাচার্য্যকে সমর্পণ করেন। গৌরমোহনের দুই পুত্র, ভগবান্ ও কালাচাঁদ। ভগবান নিঃসন্তান, কালাচাঁদের দৌহিত্র ফরিদপুর-রুকুনী নিবাসী কুঞ্জলাল মৈত্র মহাশয় এক্ষণে ঐ সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহার নিকট

সীতারাম যেমন দস্যু দুর্ব্বৃত্ত দমন করিয়া নবাবের প্রিয়পাত্র হন, তেমনি নিকটবর্ত্তী পাঠান বিদ্রোহীদিগকে নির্জ্জিত করিয়া মোগল-শাসকের সহায়ক হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার রাজ্যারম্ভ হইতে তিনি পরগণার পর পরগণা অধিকার করিয়া লইয়া নবাব সরকারে সেই সকল অরাজক প্রদেশের রাজস্ব না পাঠাইলেও নবাব বিচলিত হইতেন না। এইজন্যই ফৌজদারের হত্যার পূর্ব্বে স্বাধীনতা প্রয়াসী সীতারামের বিরুদ্ধে নবাব কিছুই করেন নাই। পাঠান-শত্রু এমন ভাবে দেশ মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন ও তাঁহাদের সহযোগে দেশমধ্যে এত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল যে, মোগল শাসনকর্ত্তাদিগকে সর্ব্বদাই উঁহাদের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইত, উঁহাদের পরাজয়ের সংবাদ পাইলে তাঁহারা হাঁফ ছাডিয়া বাঁচিতেন। মহম্মদপুরের উত্তর দিকে পদ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এক প্রকার পাঠানদিগেরই হস্তগত ছিল। ঐ প্রদেশের দক্ষিণাংশে সা-তৈর পরগণা, সেখানে করিম খাঁ বিদ্রোহী হইলে, সীতারাম কিরূপে তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।[১] সা-তৈরের উত্তরে দৌলত খাঁ নামক একজন পরাক্রান্ত পাঠান পশ্চিমে গড়ই হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের মালিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসিব ও নসরৎ খাঁর নামানুসারে সেই প্রদেশ নসীবশাহী ও নসরৎশাহী নামক দুই পরগণায় বিভক্ত হয় এবং পরে উহা হইতে মহিমশাহী ও বেলগাছী নামক আরও দুইটি পরগণা বাহির হয়। এই সকল পরগণা এক্ষণে যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে।[২] এই সকল

সনন্দখানি আছে। পাবনার খ্যাতনামা উকীল রায় সাহেব তারকনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের চেষ্টায় আমি সেই জীর্ণ দলিলের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। সীতারামের বিগ্রহগুলির মধ্যে কালাচাঁদ শিলামাত্র আছেন এবং তাহাও এক্ষণে কুঞ্জলালের পুরোহিত রুকুনী নিবাসী মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে রহিয়াছেন। নিষ্কর সম্পত্তি থাকিতেও যে বিগ্রহের সেবা হয় না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

১ বোয়ালমারী হইতে ৭ মাইল দূরে, সা-তৈরের কেন্দ্রস্থলে, ধোপাঘাটা নামক স্থানে করিম খাঁর বাড়ী ছিল। এখনও সেই আমলের একটি সুন্দর মস্‌জিদ এবং বাৎসরিক মেলা ঐ স্থানকে বিখ্যাত করিয়াছে। মস্‌জিদটি পাঠান স্থাপত্যানুসারে গঠিত, মধ্যস্থলে ৪টি পাথরের থামের উপর ৯টি গুম্বজ, চারি কোণে চারিটি গাত্রসংলগ্ন মিনার। বাহিরে দেখিতে বাগেরহাটের ষাট গুম্বজের মত, তবে তদপেক্ষা অনেক ছোট, মসজিদকুড়ের মসজিদ অপেক্ষা অনেক বড়। ভিতরের মাপ ৪৫´×৪৫´ এবং বাহির ৫৫´-৬´´×৫৫´-৬´´, ভিত্তি ৫´-৩´´। এখনও ভাল অবস্থায় আছে।

২ Hunter, *Jessore*, pp. 321-5, *Faridpur*, pp. 354-5.

পরগণার অধিকার লইয়া যখন পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ হয়, তখন সেই সুযোগে উঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য সীতারামের উপর ভার অর্পিত হইয়াছিল এবং এইরূপে সীতারামের অধিকাংশ রাজ্যজয় মোগলের জ্ঞাতসারেই হইয়াছিল। নসীবশাহী জয় করিবার জন্য সৈন্য সামন্ত লইয়া তিনি পদ্মার কূলে উপনীত হইয়া কয়েকস্থানে দুর্গ সংস্থাপন করেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। বর্ত্তমান পাংসা রেল ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণে মালঞ্চীগ্রামে একটি সুবিস্তীর্ণ ভগ্ন স্তূপকে এখনও লোকে 'সীতারামের গড়' বলিয়া থাকে।[১] পাংসার পূর্ব্বগায়ে কালিকাপুরেও তাঁহার একটি দুর্গ ছিল এবং সে দুর্গের সন্নিকটে পাঠানদিগের সহিত তাঁহার এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। এমন কত দিন ধরিয়া কত যুদ্ধ চলিয়াছিল, এখন তাহা নির্ণয় করা যায় না। দেশের মধ্যে কত বিপর্য্যয়, কত ডাকাইতি ও গৃহদাহ ঘটিয়াছে যে, যদি কেহ কোন বিবরণী লিখিয়া রাখিয়া থাকেন, তাহাও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। মোট কথা, দীর্ঘ চেষ্টার ফলে নসিবশাহী প্রভৃতি সব কয়েকটি পরগণা সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ এই সকল ঘটনা সীতারামের রাজত্বের প্রথমে ১৭০২-০৪ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। যখন সীতারাম দীর্ঘকাল রাজধানী ছাড়িয়া নসীবশাহী পরগণায় ছিলেন, তখনই চাঁচ্ড়ার রাজা মনোহর রায় মীর্জানগরের ফৌজদার নুরউল্যা খাঁর সাহায্যে সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সদলবলে মহম্মদপুরের দিকে অগ্রসর হন।[২] মুড়লী হইতে সাল্‌খিয়া, বুনাগাতি দিয়া পলিতা পর্য্যন্ত

১ ঐ গ্রামে চক্রবর্ত্তী মহাশয় দিগের বাটীতে যে ৺বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ আছেন, তাঁহার জন্য সীতারাম রাধামোহন চক্রবর্ত্তীর নামে মালঞ্চী গ্রামে ১৯/ বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর দিয়াছিলেন। এখনও সে সনন্দ রাধামোহনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ৺রাসমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে আছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে রাসমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজেই সীতারামের দুর্গের ইট লইয়া নিজ বাটীতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ও অন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ঐ বাটী পূর্ব্বে পরিখা বেষ্টিত ছিল।

২ ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন, সীতারাম যখন রামপাল জয় করিতে যান, সেই সময়ে মনোহরের আক্রমণ হয়। ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মনোহরের মৃত্যু ঘটে। উহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা হওয়া সম্ভব। রামপাল জয়ের সময়ে রসদ সরবরাহ করিবার জন্য ১১১৭ সালে বা ১৭১১ খৃষ্টাব্দে সীতারাম যে সনন্দ দেন, যদুনাথের পুস্তক হইতে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। সদাশয় নৃপতিরা গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতে বিলম্ব করিতেন না। রামপাল জয়ের অব্যবহিত পরেই ঐ সনন্দ প্রদত্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস করি। তখন মনোহর জীবিত ছিলেন না।

রাস্তা ছিল ; সেই স্থানে নবগঙ্গা পার হইয়া নহাটা দিয়া মহম্মদপুর যাইবার সোজা পথ। মনোহর নিজে কখনও যুদ্ধ করেন নাই, কৌশলে পরের জমিদারী গ্রাস করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নুরউল্যা একই রকম বীর সেনাপতি, তিনি শুধু বিলাসে ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া নবাবী দর্পে পরকে চমকিত করিতেন। এই সময়ে সীতারাম মনোহরের নবার্জ্জিত ইশফপুর পরগণার জন্য রাজস্ব দাবি করিয়াছিলেন। উহা অসহ্য হওয়াতে মনোহরের একবার যুদ্ধ করিবার সাধ হইল। কিন্তু তিনি সীতারামের আয়োজনের পরিমাণ জানিতেন না ; মহম্মদপুরের বড় বড় কামান কিভাবে যুদ্ধের প্রকৃতি বদলাইয়া দিতেছিল, সে জ্ঞান তাঁহার হয় নাই। তিনি নুরউল্যার ফৌজদারী ফৌজ এবং নিজের লাঠিয়াল সৈন্য লইয়া ভৈরব পার হইলেন। এই সময়ে সীতারামের অনুপস্থিতি কালে রাজধানীর সকল ভার সুযোগ্য দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি মনোহরের গতিবিধির সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইলেন। মেনাহাতী প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি কেহই মহম্মদপুরে ছিলেন না। যদুনাথ তাঁহাদের অপেক্ষা না করিয়া, রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, নিজে কয়েকদল সৈন্য ও কতকগুলি ছোট বড় কামান লইয়া, নবগঙ্গা পার হইয়া কুল্লে-কুচিয়ামোড়ার কাছে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার বামদিকে চিত্রানদী কিছুদূরে দক্ষিণ মুখে বাঁকিয়া গিয়াছে এবং ডানদিকে ফট্‌কী নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছিল। উভয় বাঁকের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া অবাধে শত্রুসৈন্য পদব্রজে নবগঙ্গার কূলে উপনীত হইতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলে, রাজধানীর কোন আশঙ্কা হউক বা না হউক, মামুদশাহী পরগণা রক্ষা করা যায় না ; সে দিকেও যে মনোহরের নজর ছিল না, তাহা নহে। এজন্য যদুনাথ চিত্রা ও ফট্‌কীর উক্ত দুই বাঁক সংযুক্ত করিয়া দিয়া একটি খাল কাটিলেন, উহার নাম হইল 'যদুখালি' ; এখন তাহা সুন্দর নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। খাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মনোহর রায় বুনাগাতির দক্ষিণ দিকে এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে ছাউনি করিয়া বসিলেন, ঐ স্থানকে এখনও স্থানীয় লোকে 'গড়ের মাঠ' বলে, কারণ মনোহর রায় সেখানে চারিধারে গড় কাটিয়া মধ্যস্থানে উচ্চ ঢিপির উপর সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সে গড়ের চিহ্ন এবং ঢিপির কতকাংশ আছে, তবে ভূতের ভয়ে সে উচ্চস্থানে এখনও লোকে বাস করিতে চায় না। সারি সারি কামানের ভয়ে চাঁচ্‌ড়ার সেনা সরগুনা বা

স্বরসেনা গ্রামের উত্তরে অগ্রসর হইল না। স্থানটিকে কে স্বরসেনা (Sursena) নাম দিল, জানি না।

ছাউনি করিয়া থাকিবার সময়ে যে উভয় সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী দলের মধ্যে দুই একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। বরং মনে হয়, হইয়াছিল এবং তাহাতেই মনোহরের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছিল। তবে যাহাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলে, তাহা হয় নাই। যদুখালিতে পথ বন্ধ, অপর পারে কামান সজ্জিত, সীতারামের সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল—এই সব দেখিয়া মনোহর দেওয়ানের সঙ্গে একটা মিটমাট করতঃ রাত্রিযোগে সদলবলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হয়ত, উহার পর গতানুশোচনা ভুলাইবার উদ্দেশ্যে, সীতারামের সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গতা দেখাইবার ছলে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাকে চাঁচড়ার বাড়ীতে পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সীতারাম তখনও রাজধানীতে অনুপস্থিত, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিলেন না বা কোন উত্তরও দিলেন না। যখন রাজধানীতে ফিরিয়া সকল অবস্থা স্বকর্ণে শুনিলেন, তখন মনোহরের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ক্রোধান্ধ হইলেন। এই সময়ে তিনি কিরূপে সসৈন্যে ভৈরবকূলে বর্ত্তমান নীলগঞ্জের অপর পারে ঝুম্ঝুম্পুরে উপনীত হইয়া মনোহরের নিকট সংবাদ পাঠান, কি ভাবে তাঁহার প্রেরিত লোকের সহিত কঠোর ব্যবহার করেন এবং অবশেষে মনোহর বশ্যতা স্বীকার করিলে কিরূপে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি (৪৯৭-৮ পৃ)। সীতারাম সে সময়ে যেখানে আসিয়া ছাউনি করেন, এখনও ঝুম্ঝুম্পুরের সে অংশকে 'কেল্লার মাঠ' বলে।[১]

সীতারাম বহু পূর্ব্বে সুন্দরবনের আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন। উহার জন্য তাঁহাকে যেমন কয়েক বৎসর কোন রাজস্ব দিতে হয় নাই, তেমনি সে মহল হইতে আয়ও বিশেষ কিছু হয় নাই। কারণ সে অঞ্চল শাসনে রাখা সহজ নহে। কোন স্থানে প্রজা বিদ্রোহী হইলে, দূর হইতে সৈন্যদল লইয়া গিয়া শাসন করিয়া আসিতে হইত; জলের রেখার মত সে শাসনের চিহ্ন বেশী দিন থাকিত না। সুন্দরবনের মধ্যে শিবসা নদীর পশ্চিমাংশ যশোহরের ফৌজদারের শাসনাধীন ছিল; সীতারাম কেবল মাত্র উহার পূর্ব্বাংশে অর্থাৎ

১ যদুনাথ, 'সীতারাম', ৫ম সং, ৯৯, ২৪১ পৃ।

বর্ত্তমান বাগেরহাটের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সে দিকে সমুর্ব্বর আবাদসমূহের মধ্যে অবস্থিত রামপাল একটি প্রধান স্থান। ১১১৭ সালের (১৭১০ খৃঃ) প্রারম্ভে সীতারাম সংবাদ পাইলেন যে, ঐ স্থানের প্রজাবর্গ স্থানীয় জমিদারবর্গের চক্রান্তে পড়িয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। উহাদিগকে সময়মত সমুচিত শাস্তি না দিলে, শাসন রক্ষা করা যাইবে না, ইহাই ভাবিয়া সীতারাম রণ-বাহিনী লইয়া প্রস্তুত হইলেন। বর্ষান্তে এই অভিযানের জন্য মধুমতী নদী-বক্ষে বহু সংখ্যক দ্রুতগামী সুদীর্ঘ সিপ্, সৈদপুরী বড় বড় পান্‌সী ও ঢাকাই পলওয়ার, সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি লইয়া প্রস্তুত হইল।[১] সীতারাম সোজাসুজি মধুমতী নদী দিয়া দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পথে দুই পার্শ্বের জমিদারদিগকে ডাকিয়া বাজস্বের দাবি করিলেন। প্রথমতঃ নল্‌দী, তেলিহাটি ও মকিমপুর তাঁহার অধিকারভুক্ত প্রদেশ। উহা পার হইলেই বামে দক্ষিণে দুই দিকে সুলতানপুর-খড়রিয়া নামক বিস্তৃত পরগণা। উহার অধিকাংশই জলা ভূমি, তাহাতে শস্যাদি বড় কম হয়। শুধু নদীর কূলে কিছুদূর পর্য্যন্ত লোকের বসতি, তন্মধ্যেও ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প। এই পরগণার জমিদারী সনন্দ মহারাজ প্রতাপাদিত্য জানকীবল্লভ বিশ্বাস মজুমদার নামক তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বৈদ্য কর্ম্মচারীকে দিয়াছিলেন।[২] তিনি আসিয়া

১ মহম্মদপুরের উত্তরে কুমরুল গ্রাম মধুমতী হইতে বেশী দূরবর্ত্তী নহে। তথাকার রামনারায়ণ দত্ত সীতারামের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি এই অভিযানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া সীতারামের তুষ্টি সাধন করেন। তাহার ফলে সীতারাম তাঁহাকে যে নিষ্কর সনন্দ দান করেন, তাহার প্রতিলিপি এই : 'রামপাল জয় কালে তুমি খাদ্যের সরবরাহ করায় তোমার দেল পূজার জন্য তোমাকে পরগণে সা-তৈরের কুমরুল, দিঘা, বাসো, নাগরিপাড়া, হাটবাড়িয়া গ্রামহায়ে ৯৮ অষ্টনব্বই পাখি নিষ্কর শিবোত্তর দিলাম। তুমি পুরুষানুক্রমে সেবাইত রূপে দেল পূজার জন্য জমিতে দখিলকার থাকহ। ইতি সন ১১১৭ সাল ফাল্গুন।'—ইহাতে সীতারামের মোহর ও 'আসল সনদ ভোগ দখল করহ' এইরূপ স্বাক্ষর আছে।

২ জানকীবল্লভ বিষ্ণুদাশবংশীয় কুলীন বৈদ্য। প্রতাপের পতনের প্রাক্কালে জানকীবল্লভ যশোহর রাজধানী হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর শিলা লইয়া মূলঘরে আসেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জমিদারী বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠের সন্তানগণ ২।১ পুরুষ পরে এই পরগণার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে বর্ত্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত কাজুলিয়া গ্রামে বাস করেন। তথায় রাজরাজেশ্বর শিলা এখনও পূজিত হইতেছেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও মূলঘরে 'বড় বাড়ী'র বৈদ্য চৌধুরীগণের কুলদেবতা হইয়া আছেন। সবিশেষ বংশ বিবরণ পরে দিব। বৈদ্যকুলে ইহা অতি প্রসিদ্ধ বংশ।

পরগণার দক্ষিণাংশে ভৈরব নদের কূলে মুলঘর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। প্রতাপের পতনের পর সে জমিদারী সনন্দ নবাব কর্তৃক স্বীকৃত হয়। জানকীবল্লভের পৌত্র হরিনাথ সকল সরিককে বঞ্চনা করিয়া সমস্ত জমিদারী দখল করিয়া লন এবং নবাব সরকার হইতে রাজোপাধি পান। তিনি এক কুল-যজ্ঞের অনুসন্ধান করেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রপীড়িত জ্ঞাতিগণ বিরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হয় এবং তিনিও ভগ্নাশ হইয়া অল্পদিন মধ্যে গতাসু হন। তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামরাম রায় তাঁহারই মত অন্য সকলের দাবি উপেক্ষা করিয়া জমিদারীর বৃহত্তর অংশ ভোগ করেন। তিনি ৺জগদেক নাথ বিগ্রহের জন্য যে সুন্দর জোড়বাঙ্গালা মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহার গাত্রলিপি হইতে ১৫৯৩ শক বা ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ পাই। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যুর পর, জমিদারী তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত ও রামকেশব শিরোমণির হস্তে আসে। ইঁহাদেরই সময়ে সীতারাম খড়রিয়া পরগণার রাজস্ব দাবি করেন। উঁহারা দুইজনে এবং কাজুলিয়ার সরিকগণ সীতারামের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সরকারে রাজস্ব সরবরাহ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা ঠিক ভাবে জানা যায় না।

তদনন্তর সীতারাম বাগেরহাটের পথে রামপালে উপনীত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। যুদ্ধ হইয়াছিল সত্য, নতুবা তিনি স্বপ্রদত্ত সনন্দে 'রামপাল জয়' করিবার কথা উল্লেখ করিতেন না। কিন্তু সে যুদ্ধ কোথায় কি ভাবে হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। পারমধুদিয়ার কাছে 'রণভূম' বা 'রণের মাঠের' সঙ্গে ঐ সংঘর্ষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জানি না। তবে যুদ্ধ যেখানেই হউক, উহার ফলে যে সীতারাম নিকটবর্ত্তী চিরুলিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি পরগণার জমিদারীর স্বামিত্বলাভ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা। যদুনাথের পুস্তক হইতে জানিতে পারি, এই সময়ে চিরুলিয়া জমিদারীর অংশভাগী দেবকীনন্দন বসু চিরুলিয়া ত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরে যান এবং তাঁহার বংশধরগণ এখনও তন্নিকটবর্ত্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন।

এইভাবে আমরা দেখিতে পারি, সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে পূর্ব্বদিকে সে রাজ্য সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও পশ্চিমাংশে তাহা ভৈরবের দক্ষিণে যায় নাই। তাঁহার রাজ্যকে মোটামুটি উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভাগ করা

যায়। উত্তরের ভাগ জনপদাংশ ; উহা উত্তরে পাবনা হইতে দক্ষিণে ভৈরব নদ এবং পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণা হইতে পূর্ব্বদিকে মধুমতী পারে তেলিহাটি পরগণার শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণভাগ সুন্দরবনের ক্ষণস্থায়ী আবাদমহল ; উহা উত্তরে ভৈরবনদ হইতে আবাদের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে পশরনদ হইতে পূর্ব্বদিকে বলেশ্বর পারে বরিশালের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার রাজ্য ৪৪টি পরগণা লইয়া গঠিত এবং উহার হস্তবুদ্ আয় কোটি টাকার উপর। নাটোর রাজ্য সাধারণতঃ ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজারের জমিদারী বলিয়া খ্যাত। ৺মধুসূদন সরকার মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, সীতারামের জমিদারী নাটোর রাজ্যের ২/৩ অংশ ছিল। সুতরাং রাজস্ব ৩৫ লক্ষ টাকা। আর সীতারামের অর্দ্ধাংশ মাত্র জমিদারী নাটোরের গ্রাসে পড়ে, অবশিষ্টাংশ অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। সুতরাং সীতারামের জমিদারীর রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকার কম নহে। নবাবের রাজস্ব কখনও হস্তবুদ আদায়ের ২/৩ অংশের অধিক হইত না। মোট কথা, গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যাহার পতন হয়, তাহার আকারের পরিমাণ স্থির করা যায় না। রাজ্যের আয় হইতে তাঁহার সমৃদ্ধি স্বল্পকালের জন্য যতই বৃদ্ধি পাউক, তাহা অচিরে ছিন্নভিন্ন ও উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল। উহার উত্থান পতন উল্কার মত আকস্মিক এবং তাঁহার রাজ্য-সৌধ তাসের ঘরের মত ক্ষণিক।

ত্রি চ ত্বা রিং শ প রি চ্ছে দ

সীতারাম : রাজত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণতা

সীতারাম আদর্শ হিন্দু নৃপতি। তাঁহার রাজ্য যতই ক্ষুদ্র হউক, তিনি সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হিন্দু-রাজত্বের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রজা পালন করিবার সমধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজার মত তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, জনপ্রিয় লোকপালের মত তাহা ব্যয় করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধেও বলা যায় :

> 'প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
> সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥' —রঘুবংশ, ১-১৮

সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার জন্যই সূর্য্যদেব ভূমি হইতে রস গ্রহণ করেন, তিনিও প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। প্রজাদের নিকট হইতে যাহা লওয়া যায়, তন্মধ্যে যে রাজা যত বেশী পরিমাণে তাহা প্রজাদিগকে কোন না কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে বড় রাজা। রাজ্যের পরিমাণ দ্বারা রাজত্বের কৃতিত্ব সূচিত হয় না, প্রজাপালন বিষয়ক নীতির প্রকর্ষই রাজার সিংহাসনকে উচ্চ করিয়া দেয়। প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য সীতারামের যে সুদৃষ্টি ছিল, তাহাই তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল ; সেই জন্যই দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শাসন-তলে বাস করিতে ভালবাসিত। তাঁহার স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের কোন প্রামাণিক লিখিত বিবরণী না থাকিলেও যতদিন তাঁহার দেশ-হিতৈষণার চিহ্ন থাকিবে, ততদিন তাঁহার স্মৃতি কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। অশোক বা হর্ষের সঙ্গে সীতারামের তুলনা করা চলে না, কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত কেহ রাজার পর্য্যায়েই পড়ে না। আর সীতারামের মত ক্ষুদ্র রাজা মৌর্য্য-সম্রাটের বিরাট জন-হিতৈষণার গৌরব লাভ করিতে পারেন না। তবে ভাগ্যগুণে যদি তাঁহার স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা ব্যর্থ না হইত, তাহা হইলে ক্ষুদ্রাধিকারের মধ্যে তিনিও অশোক-হর্ষের মত প্রজার শোকদুঃখ নিবারণ করিয়া, তাহাদের হর্ষসুখ বিধান করিতে সমর্থ হইতেন। নীতিই মানুষকে বড় করিয়া দেখায়, কার্য্যক্ষেত্র উহার সফলতার জন্য দায়ী।

প্রজাদিগের ঐহিক পারত্রিক উভয়দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। সেই কথাই

এখন বলিব। প্রজাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার জন্য তাহাদের খাদ্য পানীয় সুলভ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর রাজত্বে টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় হইত। উহা কেবল রাজধানী ঢাকার কথা নহে; আবার তাঁহার কৃষক প্রজা যেমন বেশী, কৃষিক্ষেত্রও প্রচুর ছিল। বিশেষতঃ তিনি আবাদী সনন্দের বলে অনেক নূতন স্থল শাসনতলে আনিয়া প্রজাপত্তন করিয়াছিলেন; তাই উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শস্যের মূল্য হ্রাস হয়। এক্ষণে সে অবস্থা কল্পনা করাও দুষ্কর হইয়াছে।

রাজধানী মহম্মদপুরে মনোরম রাজ্যের সংস্থাপন করিয়া উহাকে একটি প্রধান বাণিজ্যের কেন্দ্র করা হইয়াছিল; তজ্জন্য সকল স্থানের সব রকম জিনিস এখানে আসিয়া বিক্রয় হইত। লোকে রাজধানীতে আসিলে সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সুলভে সহজে কিনিতে পারিয়া নানাবিধ বিলাস-সুখের কল্পনা করিত।

এদেশ পূর্ব্বে সম্পূর্ণ নদী-মাতৃক ছিল; নদীর কূলে ভিন্ন বসতি ছিল না। তখন লোকের জলকষ্ট ছিল না। কালে বহুস্থানে নদীর ভূমি-গঠন কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় এবং কৃত্রিম খাল নালা দ্বারা স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম হইলে, অনেক স্থলে নদী মরিয়া মজিয়া যাইতেছিল, পানীয় জলের জন্য সে সব স্থানের লোককে পুকুর বা দীঘি খনন করিতে হইত; এবং সর্ব্বত্র সম্পন্ন লোক না থাকায়, জলকষ্ট উপস্থিত হইত। সীতারাম স্বীয় রাজ্যমধ্যে সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বজন্মে জল-দান-পুণ্য-ফলে তিনি এ জন্মে রাজা হইতে পারিয়াছেন। জলদান প্রবৃত্তি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কিরূপ ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫২৫ পৃ)। এই সব নানা কারণে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে যাহাতে 'জল-দুর্ভিক্ষ' না থাকে, তাহার ব্যবস্থার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শুধু হিন্দু রাজা বলিয়াই যে কথা, তাহা নহে; এইরূপ জলদান-প্রবৃত্তি কিরূপ ভাবে পাঠান দলপতি খাঁ জাহান আলির ছিল, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছি। খাঁ জাহানের একদল বেলদার বা খনকসৈন্য ছিল; তিনি যে পথ দিয়া সমারোহে অগ্রসর হইতেন, তাহার দুইপার্শ্বে অচিরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইয়া তত্তৎস্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দিত। এখনও যশোহর-খুল্‌নায় অনেক স্থানে বড় বড় খাঞ্জালি দীঘি স্থানীয় লোকের

জীবনোপায় হইয়া রহিয়াছে। সীতারামেরও এইরূপ একদল বেলদার সৈন্য ছিল; শুনা যায়, উহাদের সংখ্যা ২২০০ এবং উহাদের নায়ক ছিলেন, পলাশবাড়িয়ার বসু-বংশের পূর্ব্বপুরুষ, কায়স্থবীর মদনমোহন বসু। এই সৈন্যদল আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিত, আর সময় পাইলে পুষ্করিণী খনন করিত।

সর্ব্বত্রই জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সীতারামের শুভাগমন ও শুভদৃষ্টি বিজ্ঞাপিত হইত। আর কিছুতে না হউক, তিনি জলদান-পুণ্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন।[১] প্রবাদ আছে, তিনি প্রতিদিন নূতন পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতেন এবং প্রত্যহ নানাস্থান হইতে এই সব খনিত জলাশয়ের জল রাজধানীতে আনীত হইত; উহার প্রকৃত কারণ পুষ্করিণী খনন কার্য্যের উৎসাহদান ভিন্ন কিছু নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে উহার মধ্যে তাঁহার বিলাসিতার স্বপ্ন দেখিত। নূতন পুকুরের জলে স্বাস্থ্য ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়, এমন কথা আমরা শুনি নাই; বরং উহার বিপরীত ফলই আমাদের অভিজ্ঞতা। সীতারাম যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহার অনেকগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া তদঞ্চলের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে। রামসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন অনেক জলাশয় এখনও নানাস্থানে আছে। মহম্মদপুর হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে বলেশ্বরপুর ও লস্করপুরে দুইটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমকোণে দেড় ক্রোশ দূরে শ্যামগঞ্জে সীতারামের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর রায়ের প্রাসাদ ছিল, তথায় এবং অদূরবর্ত্তী দিগ্‌নগরে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। সূর্য্যকুণ্ড গ্রামের 'দাসের পুকুর' এখনও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। বাশগ্রাম-বগুড়ায়ও দীর্ঘিকা এবং গড় আছে। এতদ্ভিন্ন কান্টিয়া,

---

১ জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্য মহামতি এডমণ্ড বার্ক কর্ণাট রাজগণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, সীতারামের সম্বন্ধেও ঠিক তাহা খাটে :

'These (tanks) are the monuments of real kings, who were the fathers of their people ; testators to a posterity which they embraced as their own. These are the grand sepulchres built by ambition, but by the ambition of an insatiable benevolence which not contented reigning in the dispensation of happiness during the contracted tenure of human life, had strained to extend the dominion of their bounty beyond the limits of nature and to perpetuate themselves through generations of generations as the guardians, the protectors, the nourishers of mankind.'
—[Burke, E., *Works*, 1815, Vol. IV, p. 266.—শি মি]

ঘুল্লিয়া, যশপুর, গঙ্গারামপুর, মিঠাপুর ও সিঙ্গিয়া (হাড়িগড়া) গ্রামে, নড়াইলের পূর্ব্ব-দক্ষিণে সরখলডাঙ্গায় ও হরিহর নগরে সীতারামের জলাশয় আছে।

জ্ঞানচর্চ্চা ও শিক্ষা-সৌকর্য্যের জন্যও মহম্মদপুর খ্যাত হইয়াছিল। সীতারামের রাজসভায় বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত; তিনি বহু অধ্যাপককে বৃত্তিদানে পোষণ করিতেন। তাঁহার গুরু-পুরোহিত উভয় কুলই পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মানিত। ঘুল্লিয়ার গোস্বামিগণ তাঁহার গুরুবংশীয় এবং গোকুলনগরের বংশজ চট্টোপাধ্যায়গণ তাঁহার পুরোহিতের ধারা। শেষোক্ত বংশে বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার সময় হইতে বাগ্‌জানি, ধূপড়িয়া, গঙ্গারামপুর ও বারুইখালি প্রভৃতি স্থান বহু অধ্যাপক-পণ্ডিতের নিবাসস্থল হইয়াছিল। বারুইখালি, নালিয়া, বানা, নহাটা ও বাটাজোড় প্রভৃতি স্থান পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। সীতারামের পতনের পরও এই সব স্থানের বিদ্যাগৌরব নিষ্প্রভ হয় নাই। বরং কালে বারুইখালি পাণ্ডিত্য-গরিমায় নবদ্বীপের নিম্নেই আসন পাইয়াছিল। এই স্থানে ঘরে ঘরে যে কত অসাধারণ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পলিতা-নহাটার বৈদিক ভট্টাচার্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষ ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ অনেক সময়ে সীতারামের সভাশোভন করিতেন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত কবিতা হইতে জানা যায়, তিনি সীতারামকে ইন্দ্রতুল্য রাজেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :

'ভাস্করে উদয় ভাস, উদয় নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম।
গুণেন্দ্র দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপতি, ভূষণে-ভূষিত গুণগ্রাম ॥'[১]

বহু অধ্যাপককে বৃত্তি দিয়া বিদ্যোৎসাহী রাজা মহম্মদপুরে অসংখ্য চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন। সে সকল টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। এমন কি, জ্যোতিষ বা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও বাদ পড়ে নাই। বৈদ্যকুল-প্রদীপ অভিরাম কবীন্দ্রশেখর প্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং রাজসভার অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে

১ যদুনাথ, 'সীতারাম', ৭৮ পৃ।



লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির, মহম্মদপুর



সত্রাজিৎপুরের মন্দির



রামসাগর দীঘি, মহম্মদপুর



সুখসাগর দীঘি, মহম্মদপুর

'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পাইয়াছিলেন।[১] কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন অভিরামের উপযুক্ত বংশধর[২] সীতারাম অভিরামকে যে ভূমিবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহা এখনও 'কবিরাজের তালুক' বলিয়া পরিচিত। এইরূপ আরও অনেক কবিরাজ রাজধানীতে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।

উদার নৃপতি হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি মুসলমান প্রজার শিক্ষার জন্য মৌলবীদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক মক্তব খুলিয়াছিলেন। বালকদিগের বর্ণজ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য যে সব পাঠশালা ছিল, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় লোকে তাহার শিক্ষক হইতেন। মৌলবীদিগকে হিন্দুরা বিশ্বাস ও ভক্তি করিত, রাজাও উহাদিগকে প্রয়োজন মত উচ্চ রাজনৈতিক কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন।

প্রজাবর্গের অন্নজল ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া সীতারাম প্রকৃত রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। কৈশোর কাল হইতেই তিনি ধার্ম্মিক ও ভক্তিবিহ্বল ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও রাজপ্রতিপত্তির সঙ্গে ধর্ম্মনিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠার

১ যদুক্তং রামতনু হড়-কবিশেখরেণ—

'অভিরামঃ কবীন্দ্রোঽসৌ সীতারামাদ্ধি ভূপতেঃ।
মহোপাধ্যায়পদবীং মহৎপূর্ব্বামবাপ্তবান্ ॥'

২ খুল্‌না জেলার পয়োগ্রাম নিবাসী হিঙ্গু-বংশীয় চন্দ্রশেখর সেনের পুত্র জয়রাম ফরিদপুরের অন্তর্গত খান্দারপাড়ায় বিবাহসূত্রে বাস করেন। তৎপুত্র মধুসূদন কালক্রমে বংশানুক্রমিক 'কবিরাজ' উপাধি পান। এই মধুসূদনের পুত্র অভিরাম সীতারামের সভার রাজপণ্ডিত এবং মহামহোপাধ্যায় উপাধি-ভূষিত। অভিরামের পুত্রের বংশ নাই। অভিরামের ভ্রাতা রতিরামের পুত্র শঙ্কর বাচস্পতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবিরাজ ছিলেন। ইঁহারই শিষ্য গোপাল কর 'রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ' নামক প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ-প্রণেতা। শঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র রামসুন্দর মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথের পিতামহ। বংশধারা এই :

চন্দ্রশেখর—জয়রাম—মধুসূদন—অভিরাম ও রতিরাম—রামমোহন—রামসুন্দর—রাজীবলোচন—গঙ্গাচরণ ও দ্বারকানাথ। গঙ্গাচরণের পুত্র নগেন্দ্রনাথ বি. এল (উকীল, খুল্‌না), জ্ঞানেন্দ্রনাথ কবিরত্ন বি, এ (কবিরাজ), সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ এম, এ (প্রফেসর, সিটি কলেজ) প্রভৃতি। দ্বারকানাথ—যোগীন্দ্রনাথ বৈদ্যরত্ন এম, এ, যতীন্দ্র প্রভৃতি।

অব্যবহিত পরেই তথায় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কুলদেবতা ৺দশভুজা দুর্গাদেবীর মন্দির স্থাপন করেন।[১] ঐ মন্দিরের গায়ে লিখিত ছিল :

'মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী শকে দশভুজালয়ম্।
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দিরম্ ॥'

মহী=১, ভুজ=২, রস=৬, ক্ষৌণী (পৃথিবী)=১ ; অঙ্কের বামগতিতে ১৬২১ শক বা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ হয়। মন্দিরের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। কয়েকবার সংস্কারে এই মন্দির-প্রাচীরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবুও ইহার গায়ে কিছু চিত্রকলা ছিল। তন্মধ্যে পাল্‌কীতে রাজা চলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণ যাইতেছে, এরূপ একটি ছবি দেখা যায়। লোকে বলে, ঐ রাজার ছবিটি সীতারামের নিজমূর্ত্তি। সেই ইষ্টকের ছবি ভিন্ন সীতারামের অন্য কোন চিত্র নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীতারাম তাঁহার নূতন গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দশভুজার মন্দিরের পর তিনি সেই একই প্রাঙ্গণে পশ্চিমের পোতায় কারুকার্য্য খচিত এক অতি সুন্দর জোড়-বাঙ্গালা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দিরে কোন ইষ্টকলিপি ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। জোড়-বাঙ্গালাটি এখনও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই কৃষ্ণজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াও তাঁহার সাধ মিটে নাই। তিনি পিতৃপুণ্যার্থ যেমন রাজধানীতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির স্থাপন করেন, গুরুদেবের তোষাভিলাষী হইয়া সেইরূপ কানাইনগর গ্রামে এক

---

১ ৺দশভুজার যে মূর্ত্তি ছিল, তাহা পিত্তল-নির্ম্মিত। সীতারাম স্বর্ণ-প্রতিমা গঠনেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজ-কর্ম্মকার কোন প্রসঙ্গে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে সে ষোল আনাই চুরি করিতে পারে। রাজা তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজবাটীতে প্রহরী-বেষ্টিত রাখিয়া, তাহার দ্বারা স্বর্ণ-মূর্ত্তি গঠন করাইতেছিলেন। কর্ম্মকার প্রত্যহ নিজ বাটীতে গিয়া রাত্রিযোগে সেই একই আকার প্রকারে অন্য এক পিত্তল প্রতিমা গড়িত এবং প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন রাত্রিযোগে সে প্রতিমা রামসাগরের জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতে যখন কর্ম্মকার স্বর্ণ-প্রতিমা মস্তকে করিয়া মহাসমারোহে রামসাগরে স্নান করাইতে গেল, তখন জলে ডুব দিয়া মূর্ত্তিটি বদলাইয়া লইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা শেষ হইলে যখন সে প্রকৃত ঘটনা রাজাকে বুঝাইয়া দিল, তখন তিনি তাহার সুকৌশল ও নির্ম্মাণ-চাতুরীর পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণ-প্রতিমাখানিই তাহাকে দান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এখন মহম্মদপুরে সে পিত্তলময়ী মূর্ত্তিখানিও নাই।

অপূর্ব্ব পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ৺হরেকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। কৃষ্ণজীর মন্দিরের মত এ মন্দিরও পূর্ব্বদ্বারী, উহার সদর দিকে একফুট পরিসর বিশিষ্ট একখানি কষ্টিপাথরের গোলাকার প্রস্তরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল :[১]

'বাণ-দ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রৈঃ পরিগণিত-শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ
শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুলকমলোদ্ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
ভ্রাজচ্ছিল্পৌঘযুক্তং রুচিবরুচি হরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ ॥'[২]

১ আমি এই প্রস্তরখানি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কানাইনগরের মন্দির ভগ্নদশায় পড়িলে প্রস্তরখানি খুলিয়া লইয়া ৺রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটীর মধ্যে দেবোত্তরের কাছারী ঘরে উহা রাখা হইয়াছিল। সেখানে ১৩০৯ সালের পৌষ মাসে, নায়েব গঙ্গাচরণ দাস মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি উহা দেখিতে পারিয়াছিলাম। পাথরখানি পরিষ্কৃত ও তৈলাক্ত করিয়া উহা হইতে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম। দাস মহাশয়ের পর আরও কয়েক জন নায়েবী করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, পাবনা জেলায় গয়েশবাড়ী নিবাসী নিত্যানন্দ নন্দী মহাশয় ১৩১৪ হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কাছারীর নায়েব ছিলেন। তিনি কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া যাইবার পর ঐ পাথরখানির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

২ এই সুন্দর শ্লোকটির নানাবিধ অশুদ্ধ পাঠ এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত শ্লোকটিতে কিন্তু কোন অশুদ্ধি নাই। 'পরিগণিত-শকে' স্থলে পূর্ব্বাপেক্ষিত পরিগণিত শব্দের সহিত (বামনের মতে) শক শব্দের সমাস হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের বিকৃত পাঠে 'বিশ্বাস ভাস', 'অজস্র সৌধযুক্তে' প্রভৃতি পাঠ ছিল। দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় ফলকখানি স্বচক্ষে না দেখিয়া সাহেবের অনুকরণ করিতে গিয়া 'অজস্রং সৌধযুক্তে,' 'রুচির রুচি হরে' এই অংশকে যদুপতি নগরের বিশেষণ করিয়া দেন এবং বহুকষ্টকল্পনা করিয়া 'রুচিররুচিহরে' অংশের 'সুন্দর হইতেও সুন্দর' এইরূপ অর্থ করিয়া লন ('সীতারাম', ৬২ পৃ)। নিখিলনাথ উহারই অনুবর্ত্তন করেন। প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। বিগ্রহটির নামই 'হরেকৃষ্ণ', ইহা শুদ্ধ সংস্কৃত কথা না হইলেও বিগ্রহের নাম বলিয়া অবিকল রাখা হইয়াছে। গোসাঁই গোরাচাঁদের গ্রন্থে 'শ্রীহরেকৃষ্ণ রায় স্থাপন করিল' এইরূপই আছে। এই বিগ্রহের জন্য উৎসৃষ্ট গ্রামের নাম 'হরেকৃষ্ণপুর'। 'রুচিররুচি' শব্দটি 'হরেকৃষ্ণগেহং' পদের বিশেষণ; এখানে রুচি শব্দে (স্থাপত্য) পদ্ধতি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ মন্দিরটি সুন্দর পদ্ধতিমত রচিত। মূলে 'ভ্রাজৎ' অর্থাৎ উজ্জ্বল 'শিল্পৌঘযুক্তং' এইরূপই আছে, অজস্রং কথা নাই। যদুনাথ (সরকার মহাশয়ের অনুবর্ত্তন করিয়া) 'ভ্রাজৎ স্নেহোপযুক্তং' এইরূপ পড়িয়াছেন, ইহার অর্থবোধ হয় না। বরদাকান্ত দে মহাশয় পাথরখানি

বাণ=৫, দ্বন্দ্ব=২, অঙ্গ=৬, চন্দ্র=১ ; অঙ্কের বিপরীত ক্রমে ১৬২৫ শক বা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ' সীতারামেরই বিশেষণ। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য অথবা গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের তুষ্টির জন্য, এই উভয় অর্থই প্রচ্ছন্ন আছে। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের উপাধি ছিল 'বিশ্বাস খাস', সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; তিনি জন্মলাভে সেই বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। শ্লোকটির সরলার্থ এই: সূর্য্যের মত যিনি বিশ্বাস-খাস-কুল-কমলকে প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমান্ শ্রীসীতারাম রায় স্বীয় গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের তুষ্টির নিমিত্ত ১৬২৫ শকে যদুপতি (কানাই) নগরে সমুজ্জ্বল-শিল্পরাজি-সমন্বিত সুরুচিসম্পন্ন বিচিত্র ৺হরেকৃষ্ণ-মন্দির উৎসর্গ করেন।

কানাইনগরের মন্দিরটি বাস্তবিকই সুন্দর কারুশিল্পসমন্বিত এবং সীতারামের সকল মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। পূর্ব্বদিকে উহার সদর; সে দিকে তিনটি খিলানের পশ্চাতে বারান্দা এবং পার্শ্বদ্বয়েও ঐরূপ খিলান ও বারান্দা আছে। গর্ভমন্দিরে কৃষ্ণ-রাধিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের পোতা দুই হস্ত উচ্চ এবং উহার শীর্ষদেশে চারি কোণে চারিটি এবং মধ্যস্থলে একটি, সর্ব্বসমেত পাঁচটি চূড়া আছে, এই জন্য এই জাতীয় মন্দিরকে পঞ্চরত্ন মন্দির বলে। সাধারণতঃ বঙ্গদেশের সকল উৎকৃষ্ট মন্দির এই প্রণালীতে রচিত। পূর্ব্বদিকের মন্দিরগাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কারুকার্য্যমণ্ডিত, সে দিকে প্রত্যেক দরজার উপর চতুষ্কোণক্ষেত্রে দুইটি সিংহ একটি মঙ্গল ঘট রক্ষা করিতেছে, উপরে সারি সারি ভাবে মধ্যস্থলে কৃষ্ণ বলরাম ও দুইপার্শ্বে উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সখিবৃন্দ ও নানা দেবদেবীর ছবি অঙ্কিত ছিল।[১] এ মন্দিরকে সুন্দর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিবার জন্য রাজা কোন প্রকার চেষ্টা, আয়োজন বা অর্থ-ব্যয়ের ত্রুটী করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার অপূর্ব্ব মাধুরী তাঁহার ভক্ত হৃদয়েরই সুন্দর চিত্র রচনা করিয়াছিল।

স্বচক্ষে দেখিলেও পরের মুখে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তবুও তাঁহার পাঠে 'ভ্রাজচ্ছিল্পৌঘযুক্তে' আছে, উহাদ্বারা তিনি যদুপতিনগরকে বিশেষিত করিয়াছেন।

১ 'The whole face of the building and partly also of the towers is one mass of tracery and figured ornament. * * The figures are very well done and the tracery is all very perfectly regular, having none of the slip-shod style which too often characterises native art in these districts.'—Westland, *Jessore*, 1871, pp. 44-5.

কানাইনগর হইতে এক মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বুড়া শিবের এক ভগ্ন মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। অবশ্য শিবলিঙ্গের পূজা সে মন্দিরে হয় না, নিকটবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র টিনের ঘরে উক্ত লিঙ্গের দৈনিক পূজাদি কার্য্য কোন প্রকারে সমাহিত হয়। সীতারামের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে কৃষ্ণ বিগ্রহের দোলোৎসবের জন্য যে মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও মনুমেণ্টের মত দাঁড়াইয়া আছে। দেবভক্ত নৃপতি এই সকল বিগ্রহের প্রত্যেকের সেবা ও পর্ব্বোৎসবের জন্য রাজোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য কয়েকখানি করিয়া গ্রাম দেবোত্তর দেওয়া ছিল। কানাইনগরের ব্যবস্থাই ছিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ এখানে তিনি বৈষ্ণববৃন্দের একমাত্র আরাধ্যক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের কল্পনা করিয়াছিলেন। স্থানটির নাম রাখিলেন যদুপতিনগর বা কানাইনগর ; সেই স্থানেই কৃষ্ণরাধার যুগল রূপ বর্ত্তমান ; মন্দিরপ্রাঙ্গণে বহু অনুষ্ঠানে দিবারাত্র অষ্ট প্রহর সমভাবে হরিনামানুকীর্ত্তন হইত। 'কানাইবাড়ীর কীর্ত্তন' কিছুতেই থামিত না।[১] পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত অট্টালিকার দুইটি প্রকোষ্ঠে দুই দল কীর্ত্তনওয়ালা বেতনভোগী হইয়া বাস করিতেন, এক দল বিশ্রাম করিবার সময়ে অন্য দল গান গাহিতেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ দিবানিশি ভক্তমণ্ডলীর প্রেমোচ্ছ্বাসে কোলাহলময় থাকিত। প্রাচীন বৃন্দাবনে গোপগণের বসতি ছিল ; সীতারামের নববৃন্দাবনেও গোপগণের বসতি হইল। যে পাড়ায় তাঁহারা বাস করিতেন, তাহার নাম গোকুলনগর। এখনও সেখানে কয়েক ঘর গোপের বাস আছে। কানাইনগরের হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবক গোপ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারিতেন না। কিছুদিন পূর্ব্বেও সেই নিয়ম চলিতেছিল। কানাইনগরের চতুঃপার্শ্বে যে অন্য সকল গ্রাম আছে, তাহাদের নাম শ্যামনগর, রাধানগর, মথুরানগর প্রভৃতি। তথাকার বিগ্রহগণের বৃত্তিস্বরূপ যে তিনখানি গ্রাম উৎসৃষ্ট হয়, তাহাদের নাম হরেকৃষ্ণপুর, লক্ষ্মীপুর ও বলরামপুর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই হরেকৃষ্ণপুরেই অপূর্ব্ব জলাশয়, কৃষ্ণসাগর ; উহাই কালীয় হ্রদ বলিয়া কল্পিত হইত। কানাইনগর হইতে রাজদুর্গের রাস্তা পর্য্যন্ত যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল যমুনা

১ কথাটা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও লোকে যাহা কিছু একভাবে অনবরত চলিতে থাকে তাহার সহিত 'কানাইবাড়ীর কীর্ত্তনের' তুলনা করিয়া থাকে।

নদী। রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাকে রথোৎসবে ও অন্যান্য পর্ব্বে উক্ত পরিখার তীরবর্ত্তী প্রশস্ত পথে রথারোহণে লইয়া যাওয়া হইত, পরে তিনি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী তরণীতে কল্পিত যমুনা পার হইয়া কানাইনগরে গিয়া কিছুদিন বাস করিতেন। প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও এই সকল পুরাণ-সম্মত আনন্দলীলা সীতারামের পরমভক্ত প্রজাবর্গকে সর্ব্বদা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। সীতারামের এই সকল উৎসবের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে ভক্তপ্রাণ পরম হিন্দু বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। উহার সবগুলিই যে কিছু অতিরঞ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরকালই এই জাতীয় প্রসঙ্গে রাজাদের সম্বন্ধে লোকমুখে অদ্ভুত গল্প রচিত হইয়া থাকে ; প্রামাণিক বিবরণী না থাকিলে, এই সকল গল্প কালসহকারে ক্রমেই রঞ্জিত হইয়া ইতিহাসের স্থান পূরণ করে। সীতারামের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। উক্ত প্রবাদগুলির মধ্যে কতক সীতারামের অশনবসনাদি সম্বন্ধীয়, কতকগুলি তাঁহার নৈতিক চরিত্র বিষয়ক। আমরা পৃথক্ ভাবে এই দুই জাতীয় প্রবাদের বিচার করিব। প্রথমতঃ প্রবাদ এই, সীতারাম নিত্য নূতন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিতেন, নিত্য নূতন পুকুরের জলে স্নান করিতেন, নিত্য নূতন বিছানায় শয়ন করিতেন, প্রত্যহ তাঁহার জন্য সদ্য দুগ্ধ হইতে ঘৃত মাখন দধি ক্ষীর ও অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত, তিনি কোন বাসি বা পর্য্যুষিত, অজানিতভাবে প্রস্তুত, বৈদেশিক বা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না। সামান্য অতিরঞ্জন বাদ দিয়া, আমরা এসকল কথা বিশ্বাস করিয়া লইতে পারি। এখনও অনেক এদেশীয় রাজা বা বড় জমিদারের সম্বন্ধে এসব কথা খাটে। কেবল সদ্য খনিত পুকুরের জলে স্নান করা সকলের ভাগ্যে বা সাধ্যে কুলায় না। উহার মধ্যে সীতারামের বিলাসিতা কতটুকু ছিল, তাহা পূর্ব্বে বিচার করিয়াছি। অন্যগুলির মধ্যে বিলাসিতা যেমন আছে, তাহার সঙ্গে হিন্দুয়ানী রক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধানতা ও শিল্পিগণকে উৎসাহদান, ইহাও আছে। দেশের মধ্যে যে রাজা স্বাধীন হইবার নাম করেন, তাঁহাকে শিল্প-সাহিত্যের সহায়তার জন্য তজ্জাতীয় বিলাসের প্রশ্রয় দিতে হয়। অযোধ্যার নবাব গান ভালবাসিতেন বা শুনিতে জানিতেন বলিয়া সে দেশে সঙ্গীতচর্চ্চার উৎকর্ষ ছিল, এখন তাহা নাই।

ঢাকার নবাবী প্রাসাদের উপকণ্ঠে বা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীর পার্শ্বে শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, যে সূক্ষ্ম বস্ত্র, সোনারূপার কারুশিল্প ও পুতুল গড়ার অত্যুন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণ রাজ-পরিবারের বিলাসিতা। সীতারামের দেশেও অনেক কাল পরে দস্যুর উৎপাত গেল, শান্তি আসিল, শস্যাদি সুলভ সুভিক্ষ হইল, শিল্পাদির শ্রীবৃদ্ধি হইল, ধন সম্পদ নিরাপদ হইল, এক কথায় প্রজারা সুখের মুখ দেখিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সুখের নামই সীতারামী সুখ।

দ্বিতীয়তঃ প্রবাদ এই, সীতারামের নৈতিক চরিত্র কলুষিত ছিল, কতকগুলি বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার শত শত উপপত্নী ছিল, তিনি উহাদের সঙ্গে চিত্ত-বিশ্রামের নিভৃত নিকুঞ্জে বা সুখসাগরের গর্ভস্থ দ্বিতল গৃহে বিলাস রঙ্গে মজিয়া থাকিতেন। 'দাতার মধ্যে খেলারাম, বদমায়েসে সীতারাম'[১]—এমন সব প্রবাদোক্তিও অপ্রতুল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে বহু রমণীর সংস্পর্শে আনিলেও, একটিমাত্র বিবাহিতা স্ত্রীর রূপমোহে পাগল করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। পুরুষের সেবায় রমণী পরিচারিকার নিয়োগ এদেশে নূতন নহে। মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্ত স্ত্রীরক্ষিসেনাদ্বারা পরিবৃত হইয়া দরবারে বা মৃগয়ায় যাইতেন, বারনারীকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন; তাঁহার অন্দরের বিশেষ খবর আমরা রাখি না। মোগল-কেশরী আকবরের অন্দরের খবর রাখিলেও তাঁহার বেগমের সংখ্যা বলিতে পারিব না; তিনি নৃত্যগীতে, মৃগয়ায়, মৎস্য-শিকারে, দশপঁচিশী খেলায় অসংখ্য রমণীকে ক্রীড়নক করিয়া লইতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ও আকবর উভয়ই প্রসিদ্ধ বীর ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রমণী-বর্গের সংস্রবই যে রাজার পতনের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। হয়ত সীতারামের পতনেরও অন্য কারণ ছিল। তাঁহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, তাহার ৩।৪টির উল্লেখ করিয়াছি; ইহা ভিন্ন তাঁহার উপপত্নী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা বলিতে পারি না। অন্ততঃ ছিল বলিয়া পরিচয় পাই নাই। স্ত্রীলোক সংগ্রহের

---

১ খেলারাম ঢাকার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপের একজন প্রসিদ্ধ ধনী। চাঁচড়ার মনোহর রায় নিজে উত্তর রাঢ়ীয় উচ্চ কুলীন এবং সীতারাম সেই সমাজের নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ অথচ ধন জন সম্পদে তাঁহার অপেক্ষা উন্নত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি ছিল, তাহা হইতে অনেক অপবাদের সৃষ্টি হইত।

দিকে যে তাঁহার লালসা ছিল, রাজ্য দখল করিবার সময় তিনি কাহাকেও জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছেন বা রাজবলের অপব্যয়ে কোন পরস্ত্রীকে করায়ত্ত করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই।[১] তাঁহার মৃত্যুর পরেও বন্দী পরিবারের মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরের রণক্লান্ত বীর শত যুবতী সঙ্গে আমোদ প্রমোদে দিনক্ষয় বা দেহক্ষয় করিতেন, এমন 'রচা' গল্প আমি বিশ্বাস করি না।

তাঁহার এবম্বিধ ক্রীড়া কৌতুকের সময় কখন ছিল? তাঁহাকে পরগণার পর পরগণা জয় করিয়া রাজ্য গড়িতে হইয়াছিল; দুর্গ, রাজধানী বা কামানাদি যুদ্ধাস্ত্র, সবই তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল, কিছুই সঞ্চিত ছিল না। রাজ-সিংহাসন গড়িয়া তাহাতে বসিতে না বসিতে দুর্দ্দান্ত মোগলের সহিত সংঘর্ষ বাধিল। শুধু রাজ্যের খাতিরে নহে, প্রাণের দায়ে দিবারাত্র তাঁহাকে সেজন্য ব্যাপৃত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। উহার মধ্যে তিনি দেবমন্দির গড়িয়া বিগ্রহ রচনা করিয়া, শত শত জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণতা দেখাইয়া-ছিলেন; নিজে দেবদ্বিজভক্ত সন্ধ্যাহ্নিকপরায়ণ পরম হিন্দু ছিলেন, ধর্ম্মোৎসবে ও শাস্ত্রালোচনায় যোগ দিতেন, কীর্ত্তন-রঙ্গে রাজধানী মুখরিত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। কানাইবাড়ীর অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং সংক্ষিপ্ত পনর বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে যাঁহাকে এই সকল কার্য্য করিতে হইয়াছে, তাঁহার অনিয়মিত বিলাসিতা বা ইন্দ্রিয়সেবার সময় কোথায়?

সীতারাম অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া চলিতেন, এজন্য ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অনুজ্ঞা পালনে সাধ্যপক্ষে কোন মতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। রাজার নিকট কোন বিষয়ে দরবার করিবার ইচ্ছা করিলে, প্রজারা সাধারণতঃ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে অগ্রণী করিয়া পাঠাইত। তিনিও সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের মধ্যে যখন তখন, যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, এখনও উহার

---

১ সীতারাম কায়স্থসমাজের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দৃষ্টান্ত নিজেই দেখাইবার জন্য, স্বকীয় উকীল বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় মুনিরাম রায়ের কন্যা বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। মুনিরাম আভিজাত্যে গর্ব্বিত ছিলেন, সুতরাং তাহাতে রাজী হন নাই। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না, গল্প আছে, তাঁহার পুত্র নাকি বিষপ্রয়োগে ভগিনীকে হত্যা করিয়া সামাজিক গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

শত শত জীর্ণ সনন্দ আবিষ্কৃত হইতেছে। উত্তরকালে তাঁহার দান যাহাতে বজায় থাকে, তজ্জন্য তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই।[১] এইরূপ ধর্ম্মভীরুতা হইতে সীতারামের প্রকৃত চরিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহার সঙ্গে কলুষিত চরিত্রগত অপবাদের সামঞ্জস্য হয় না। আর সর্ব্বোপরি তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। আমরা ভক্তচূড়ামণি গোসাঁই গোরাচাঁদের সমসাময়িক উক্তি অবিশ্বাস করিতে পারি না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :

'হরিনাম সংকীর্ত্তন ভজনের সার,
চিত্ত শুদ্ধ যাহে হয় আনন্দ অপার।
প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেখ রাজা সীতরাম,
দেবের সমান হইল শুনি কৃষ্ণনাম।
রাজা হঞা রাজ্য পাট সব দিল ছাড়ি,
কাঙ্গাল হইয়া আইসে গোপীনাথের বাড়ী।
শ্রীহরেকৃষ্ণ রায় স্থাপন করিল,
গৃহী হঞা বৈরাগ্য সে রাজর্ষি হইল॥'

যে রাজা গৃহী হইয়াও বৈরাগ্য-গৌরবে রাজর্ষির মত অনাসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এই ভক্তের সাক্ষ্য পাইতেছি, তাঁহাকে কেমন করিয়া বিলাসী বা ঘৃণিত কামুক বলিয়া ধরিয়া লইব ?[২] সুতরাং স্বচ্ছন্দে বলিব, 'সীতারামী সুখের'

১ সীতারামের একখানি সনন্দে আছে : 'এই ব্রহ্মোত্তর জমি যে খাস করিবে, হিন্দু গো-গোস্ত খাবে। মুসলমান শূয়ার খাবে', ইত্যাদি—যদুনাথ, 'সীতারাম,' ২৪৬ পৃ। ইহা কঠোর অশিষ্ট ভাষা বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিজের দান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। সনন্দদাতা সকল রাজন্যই এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন। আবার যিনি সনন্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, তাঁহার নিকটও 'দাসানুদাস' হইবার প্রবৃত্তি জানান হইত। শ্যামল বর্ম্মার একখানি ভূমিদান পত্রে দেখিতে পাই :

'স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো লভেচ্চ বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ॥
ময়া দত্তামিমাং ভূমিঃ যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥'

২ যে গোসাঁই গোরাচাঁদ সীতারামের সম্পর্কে এই সতর্ক মন্তব্য লিখিয়াছেন, বৈষ্ণবের কামুকতার প্রতি তিনি কি তীব্র কটাক্ষ করিতেন, তাহা তাঁহার অসংখ্য গানে ব্যক্ত হইয়াছিল। একটি গান এই :

অর্থ অন্য প্রকার। সীতারামের কামুকতার অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বাঙ্গালী স্বদেশের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে জানে না; কীর্ত্তিমানের চরিত্র বিকৃত করিয়া গল্প করিতে ভালবাসে।

'বৈষ্ণব হঞা নারী সঙ্গ যার।
সে গৌড়দেশে হয় কলঙ্ক জাতিনাশা কুলাঙ্গার॥
গৌরপ্রেম কি সহজে হয়, বৈরাগ্য যার মূলাধার।
নারীর নফর বৈরাগী নাম হাড়িমারা সে নচ্ছার॥
গোসাঁই গোরাচাঁদে বলে ফেলায়ে নয়নের ধার।
যারা মণ্ডপে পায়খানা বনায়, তাদের নাম করো না আর॥'

রাজা সীতারামের এই জাতীয় দোষ থাকিলে সীতারামের মৃত্যুর পর যখন গোরাচাঁদ গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, তখন তিনি কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষমা করিতেন না।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন

সীতারাম রাজার মত রাজা হইয়াছেন। চারিদিকে তাঁহার রাজ্য দূর-বিস্তৃত হইয়াছে। সুশাসনগুণে যেমন তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যমধ্যে শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় প্রজাবর্গ সমৃদ্ধি ও শান্তিসুখে বাস করিতেছিল। তাঁহার রাজধানী সুরক্ষিত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রাদি সমর-সজ্জার পর্য্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছে। সময় বুঝিয়া তিনি স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসী হইলেন। লোকমত তাঁহার সে প্রয়াসের অনুকূল ছিল, কারণ মোগলের কঠোর শাসন সকলেরই নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তবে কথা এই, সীতারাম ত মোগলের অধীন নগণ্য সামন্ত নৃপতি মাত্র। তিনি এতদূর পরাক্রান্ত হইবার অবসর পাইলেন কিরূপে? তিনি যখন অবাধে চারিপাশে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন, তখন মোগলের পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া হইল না কেন? এই কথার প্রকৃত উত্তর নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে বঙ্গদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা একটু সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করিয়া লইতে হইবে। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁর ঢাকা ত্যাগ করিয়া যাইবার পর হইতে ১৭১৩ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর সুবাদার হইয়া বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ২৪ বৎসর কাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র শাসন-শৃঙ্খলা ছিল না। ঠিক এই সময় মধ্যে সীতারাম রায়ের উত্থান ও প্রতিপত্তি স্থাপন সম্ভাবিত হইয়াছিল। প্রকৃত শাসন প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র অচিরে তাঁহার পতন ঘটিয়াছিল।

সায়েস্তা খাঁর পরবর্ত্তী নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে; বৃদ্ধ নবাব বা তাঁহার অকর্ম্মা ফৌজদারগণ সে বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারেন নাই। তখন বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজ পৌত্র আজিম্ উশ্বানকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নাজিম বা সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। পূর্ব্ব হইতেই নাজিম্ ও দেওয়ানের পদে পৃথক্ ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইয়া ঢাকায় আসেন।[১]

---

১ এই ব্রাহ্মণ যুবক যখন এক মুসলমান বণিক কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া ইস্পাহানে গিয়া মুসলমান হন, তখন তাঁহার নাম ছিল মহম্মদ হাদি। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বেরারের

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আজিম্ উশ্বানের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব উপস্থিত হয়। বাদশাহেরও তাহাই অভিপ্রেত ছিল; তিনি কখনও একমতের দুইজনকে একস্থানে উচ্চপদে নিযুক্ত রাখিতেন না। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকায় মুর্শিদকুলির প্রাণ বিনাশের চেষ্টা হয়, তখন তিনি দেওয়ানী সেরেস্তা মুক্‌সুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন এবং তথা হইতে রীতিমত রাজস্ব সরবরাহ করিয়া বাদশাহের প্রিয়পাত্র হন। এই সময় নায়েব নাজিম পদের সৃষ্টি হয়; ১৭০৪ অব্দে মুর্শিদকুলি দেওয়ানী পদের সঙ্গে বঙ্গ ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হন। উভয় পদের বলে তিনি ক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ঢাকায় থাকিয়া আজিম্ উশ্বান ইচ্ছা করিলেও তাঁহার কিছুই করিতে পারিতেন না। এই সময়ে মুক্‌সুদাবাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দেওয়ানের নামে মুর্শিদাবাদ হয়। প্রায় ৭০ বৎসর কাল উহা বঙ্গের রাজধানী ছিল।

ঢাকায় মুর্শিদকুলির জীবনাশঙ্কার বার্ত্তা শুনিয়া বাদশাহ আজিম্ উশ্বানের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তাঁহার রাজধানী বিহারে স্থানান্তরিত করিবার আজ্ঞা দেন। তদনুসারে তিনি কিছু কাল রাজমহলে বাস করিবার পর যখন দেখিলেন যে স্বাস্থ্যে আর কুলায় না, তখন পাটনায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং ঐ স্থানের নাম রাখিলেন আজিমাবাদ।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ রাজত্বের সকল কুটিল নীতি সমাধিস্থ হইল; যে মোগল-সাম্রাজ্যকে তিনি উন্নতির শীর্ষস্থানে তুলিয়াছিলেন, তাহা বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার চিরনিদ্রার সঙ্গে বিরাট সাম্রাজ্যের পতন আরব্ধ হইল। মোগল শক্তির প্রথম উন্মেষের যুগে যেমন যশোহর প্রদেশে প্রতাপাদিত্যের উদ্ভব, সে শক্তির পতনের প্রাক্‌কালেও তেমনি সেই প্রদেশে সীতারামের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিল, অবশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলেন। তিনি আজিম্ উশ্বানের পিতা; সুতরাং তাঁহার পাঁচবৎসরব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে আজিম্

হিসাব দপ্তরে কাজ করেন, তখন নাম হইয়াছিল জাফর খাঁ। যখন তিনি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কৃপাপাত্র হইয়া হায়দ্রাবাদের দেওয়ান হন, তখন উপাধি পাইয়াছিলেন, করতলব খাঁ। বঙ্গের দেওয়ান হইবার সময় তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত।

উশ্বান পূর্ব্ববৎ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা রহিলেন। দক্ষতাগুণে মুর্শিদকুলি খাঁরও পদগৌরবের ব্যতিক্রম হইল না, কারণ তিনি দেশ নিংড়াইয়া কর-সংগ্রহ করিতেন এবং যিনি যখন ভুজবলে দিল্লীর তক্তে বসিতেন, তিনি বেওজর তাঁহারই নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব বা পেশকস্ পাঠাইতেন। অর্থের মত মুনিবকে খুসী রাখার আর কিছুই নাই। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর আবার তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ বাধিল, বহু রক্তপাতের পর আজিম্ উশ্বান নিহত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জেহান্দর শাহ্ এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিলেন। আজিম্ উশ্বান বঙ্গ হইতে আসিবার সময় স্বীয় পুত্র ফরখ্শিয়রকে প্রতিনিধি রাখিয়া আসেন; জেহান্দরের হত্যার পর নানা চক্রান্তের ফলে তিনিই আসিয়া দিল্লীশ্বর হইলেন। ফরখ্শিয়রের সঙ্গে কুলি খাঁর বিরোধ এবং এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত হইয়া গেলেও, সম্রাট হইবামাত্র দেওয়ান তাঁহার নিকট বশ্যতার প্রমাণ দিলেন। সম্রাটও তাঁহাকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নাজিম নিযুক্ত করিয়া নানাবিধ খেলাত পাঠাইলেন (১৭১৩)। দেওয়ান ও নাজিমের পদের আবার শুভ-সংযোগ হইল। মুর্শিদাবাদেই রাজধানী রহিল।

দেওয়ানী আমল হইতে মুর্শিদকুলি কঠোরভাবে কর সংগ্রহ করিতেন; এজন্য রাজা বা জমিদারদিগকে পীড়ন করিতে দ্বিধা করিতেন না। রাজস্ব বাকী ফেলিলে তাঁহাদিগকে সাধারণ লোকের মত ধরিয়া আনিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত; সেখানে তাঁহাদের কারাযন্ত্রণা ভোগ ত ছিলই, অধিকন্তু উপযুক্ত খাদ্য পানীয়ও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইত না। ইহাতেও কর আদায় না হইলে, জমিদারী খাস হইত বা অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অর্থাগমের পথ হইত। নবাবের আজ্ঞামত বা তাঁহার জ্ঞাতসারে হয়ত এই পর্য্যন্ত হইত। কিন্তু তিনি কর সংগ্রহের জন্য যে সব প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 'তাঁহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের বিবরণী পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।'[১] এই জাতীয় কর্ম্মচারীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন—নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ। নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া, কখনও উঁহাদিগকে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া, কখনও বা কোড়া প্রহারে নির্য্যাতন করিতেন। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে খাড়া করিয়া রাখা এবং শীতকালে শীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতি শাস্তির কথাও শুনা যায়। রেজা খাঁ নাজির

১ নিখিলনাথ রায়, 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃ।

অপেক্ষাও আপনাকে অধিক জাহির করিয়াছিলেন। তিনি সৈয়দবংশীয় মুসলমান, তাহাতে আবার নবাবের দৌহিত্রীপতি, সুতরাং জাত্যভিমান্‌ ও আস্পর্দ্ধা খুব বেশী ছিল বলিয়া হিন্দুদের উপর অত্যন্ত কঠোর হইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি (৪৭৬ পৃ), তিনি পূরীষাদিপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন 'বৈকুণ্ঠ' এবং উহাতে জমিদারদিগকে নিমজ্জিত করা হইত; সে ভয়ে তাঁহারা কম্পান্বিত হইতেন। ইহা ভিন্ন কখনও বা হতভাগ্যদিগের ঢিলা ইজারের মধ্যে বিড়াল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত, কখনও বা তাঁহারা বাধ্য হইয়া লবণমিশ্রিত মেষ বা মহিষ দুগ্ধ খাইয়া উদরাময়ে কষ্ট পাইতেন। মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে এমন আরও কত গল্প শুনা যায়, সবগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে টাকা আদায়ে যে কাহারও কোন মান-সম্ভ্রম বা স্বত্ব-স্বামিত্বের দিকে লক্ষ্য করা হইত না, তাহা সত্য কথা। মুর্শিদকুলি যতই কার্য্যদক্ষ বা ন্যায়নিষ্ঠ হউন, বাদশাহ-দরবারে তাঁহার যতই সুনাম থাকুক না কেন, জমিদারদিগের প্রতি কঠোরতার জন্য দেশময় তাঁহার কলঙ্ক রটিয়াছিল। বহু জমিদার এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সামর্থ্য বা বুকের পাটা সমান ছিল না। তন্মধ্যে দুইজনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। একজন মহম্মদপুরের কায়স্থ জমিদার রাজা সীতারাম রায় এবং অন্যজন রাজসাহীর ব্রাহ্মণ জমিদার উদয়নারায়ণ রায়। ইঁহাদের মধ্যে সীতারামের বিদ্রোহ অগ্রে ঘটে এবং এ গ্রন্থে তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আজিম্‌ উশ্বান্‌ বঙ্গেশ্বর হইয়া ঢাকায় আসিবার পর তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীর আবু তোরাপ্‌কে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। পরাক্রান্ত জমিদার সীতারামের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখাই তাঁহার এক প্রধান কার্য্য ছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত তাঁহার সদ্ভাব না থাকায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ, মীর সাহেব বাদশাহের কুটুম্ব, উচ্চ সম্মানিত সৈয়দ-বংশে তাঁহার জন্ম এবং নিজেও সমসাময়িক বা সমধর্ম্মীদিগের মধ্যে বিদ্যাবত্তা ও কার্য্যদক্ষতায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।[১] এজন্য তিনি বড় গর্ব্বিত ছিলেন; সহজে

১ 'Mir Abu Turab, Faujdar of the *Chaklah* of Bhushnah, who was the scion of a leading Syed clan and was closely related to Prince Azıumu-sh-shan and the Timuride Emperors and who, amongst his contemporaries and peers, was renowned for his learning and ability, looked down upon Nawab Jafar Khan.'—*Riyaz*. (Salam), p. 266.

কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি জানিতেন আজিম্ উশ্বানই তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা ; এজন্য তিনি মনে করিতেন দেওয়ান বা নায়েব নাজিমের কোন ধার ধারিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়তঃ, মুর্শিদকুলি আজিমের নিন্দাবাদ বাদশাহের কর্ণে তুলিয়া শাহজাদার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; সুতরাং আবু তোরাপ্ও মুর্শিদকুলিকে শত্রুর মত মনে করিতেন। চতুর্থতঃ, মুর্শিদকুলি পূর্ব্বে হিন্দু-ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ; এজন্য জাত্যভিমানী আবু তোরাপ্ তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, আবু তোরাপ্ মুর্শিদাবাদের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিতেন না ; আজিম্ উশ্বানের সঙ্গে তাঁহার পত্র ব্যবহার চলিত। তবে নিজামৎ সেরেস্তা পাটনায় চলিয়া গেলে, সকল খবর সেখানে পৌছিত না।

অন্যপক্ষে দেওয়ান ভূষণার বিশেষ খবর রাখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না ; বরং সীতারাম প্রথম আমলে পাঠান বিদ্রোহীদিগকে দমন করায় মুর্শিদকুলি তাঁহার উপর খুসী ছিলেন এবং তাঁহার কথাই অধিক বিশ্বাস করিতেন। সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আবু তোরাপের অত্যাচার ও কলঙ্ককাহিনী বুঝাইয়া দিতেন। দেওয়ান অবশ্য আবু তোরাপের গোস্তাকি মাপ করিতে রাজী ছিলেন না, কিন্তু নানা রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার তাঁহার সময় ছিল না। তাই সময় বুঝিয়া আবু তোরাপ্ সেই নিভৃত এবং দুর্গম মহলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিলেন। লোকে তাঁহাকে নবাব বলিত এবং তিনিও নবাবী কায়দায় কঠোরভাবে শাসন-দণ্ড চালনা করিতেন। দেশীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, তিনি বড় অত্যাচারী ছিলেন এবং প্রজার জাতিধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন। সে সব কথা শতমুখে সীতারামের কর্ণগোচর হইত। তিনি সেই অত্যাচারী ফৌজদারকে মানিতেন না।

ফৌজদারকে অন্য কোন ভাবে মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু কর দিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু সীতারাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। ফৌজদার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, অবশেষে সীতারামের রাজসভায় লোক পাঠাইয়া বাকী রাজস্বের জন্য সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহাকে তিরস্কৃত করিলেন। সীতারামের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, অত্যাচারী মোগলকে কর দান করিবেন না। অনেক জমিদারী আপনিই

তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, কতক তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছেন, সুতরাং মোগল ফৌজদার তাঁহার নিকট রাজস্ব দাবি করিবার কে? ফৌজদারের অবস্থা বা শক্তি কি, তাহা সীতারাম জানিতেন। অন্যত্র হইতে সাহায্য না পাইলে ফৌজদার যে তাঁহার কিছুই করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বুঝিতেন। বঙ্গেশ্বর আজিম্ উশ্বান তখন দিল্লীতে, তাঁহার পুত্র ফরখ্‌শিয়র প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় ও পরে পাটনায় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, কারণ তাঁহার নিজের পরিণাম তাঁহার পিতার জয়পরাজয়ের উপর নির্ভর করিত। কোথায় কোন্ ফৌজদারের ফৌজ কম ছিল বা কোন্ ক্ষুদ্র রাজ্য শাসনভ্রষ্ট হইল, সে খোঁজ লইবার তাঁহার সময় ছিল না। সুতরাং আবু তোরাপ্‌কে একাকীই সীতারামের বিরুদ্ধাচার নিবারণের জন্য দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সীতারাম বীর ও কৌশলী যোদ্ধা, আবু তোরাপ্ তাঁহার কি করিবেন?

অজ্ঞাতনামা মুসলমান ঐতিহাসিকের 'তারিখ্-বাঙ্গালা' নামক পারসীক গ্রন্থের অনুবাদ হইতে দেখিতে পাই: 'জঙ্গল, খাল, বিল প্রভৃতির আশ্রয়ে থাকিয়া সীতারাম বাদশাহের কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে গ্রাহ্য করিতেন না, এবং নিজ জমিদারীর সীমার মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তাঁহার অনেক তীরন্দাজ ও বর্ষাধারী রায়বংশী সিপাহী থাকায় ফৌজদার ও থানাদারের লোকজনের সঙ্গে সর্ব্বদাই হাঙ্গামা বাধিত। তিনি উহাদিগকে দখল দিতেন না, অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী তালুকদারের সম্পত্তিও লুণ্ঠন করিতেন। সৈন্যসংখ্যা অল্প হওয়ায় মীর আবু তোরাপ্ এই দুর্দ্দান্ত জমিদারকে দমন করিতে অক্ষম হইলেন।'[১]

১ 'তারিখ-বাঙ্গালা' বঙ্গীয় গবর্ণর ভান্সিটার্টের আদেশে (১৭৬০-৪) রচিত হয়। গ্রন্থকারের নাম নাই। ১৭৮৮ অব্দে গ্লাড্‌উইন্ সাহেব উহার ইংরাজী অনুবাদ করেন, পরবর্ত্তী লেখকেরা উহারই সাহায্য লন। 'রিয়াজে'র গ্রন্থকারও অনেক স্থলে 'তারিখ-বাঙ্গালা' পুঁথির সাহায্য লইয়াছেন। তবে এ গ্রন্থের উক্তি অন্য বিবরণীর সহিত মিলাইয়া সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, সব কথা প্রামাণিক নহে। আমি এস্থলে কালীপ্রসন্নের অনুবাদ গ্রহণ করিলাম।—'নবাবী আমল', ৭৮ পৃ। এই ঘটনা রিয়াজে এইরূপ আছে:

'Sitaram...being sheltered by forests and rivers had placed the hat of revolt on the head of vanity. Not submitting to the Viceroy, he declined to meet the Imperial officers, and closed against the latter all the avenues of access to his tract.'—*Riyaz.*, pp. 265-6.



সীতারামের দোলমঞ্চ, মহম্মদপুর



গোপালনগরের বুড়োশিবের মন্দির, মহম্মদপুর

এইভাবে কয়েক বৎসর গিয়াছিল। অবশেষে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে যখন মুর্শিদকুলি খাঁ নাজিম হইলেন, তখন আবু তোরাপের পক্ষে শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না ; তখন তিনি গর্ব্বিত ফৌজদারকে হাতে পাইয়া তাঁহাকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। 'তারিখ্-বাঙ্গালা'য় আছে : '(আবু তোরাপ্) পরিশেষে সাহায্যের জন্য অগত্যা নবাব মুর্শিদকুলির নিকট প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু নবাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মীরসাহেব সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছেন, তিনি শৃগাল-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জঙ্গল ভূমির আশ্রয় লইতেন, তীর তরবার যোগে যুদ্ধ করিয়া ফৌজদারী সৈন্যগণকে হয়রান্ করিতেন। প্রকাশ্য স্থানে সম্মুখ যুদ্ধ দিতেন না, ফৌজদারী সৈন্যবল বেশী দেখিলে, গভীর বনভূমি ও নদীমধ্যে আশ্রয় লইতেন। সৈন্যগণ উহা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি পরক্ষণেই বাহির হইয়া লুণ্ঠনে ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। কেহই তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কখনও কাহারও হস্তে পড়িতেন না।'[১] অজ্ঞাতনামা লেখক যাহাই লিখুন, সীতারাম সময় বুঝিয়া উপযুক্ত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাকে শৃগাল-বৃত্তি বলা উচিত নহে। সীতারামের বাল্যকালে মহারাষ্ট্রদেশে শিবাজী ঐ একই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠক জানেন বুয়র যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় ডিওয়েটের এই কঠোর নীতি প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর কি বিষম দুর্গতিই করিয়াছিল। বাঙ্গলার রাজনৈতিক গগন তখন কুয়াসাচ্ছন্ন ; দিল্লীর উত্তরাধিকারঘটিত বিরোধের ফলে কে বঙ্গেশ্বর হইবেন এবং তিনি কি ভাবে আবু তোরাপ্‌কে সাহায্য করিবেন, সবিশেষ না জানিয়া ফৌজদারের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ করা সীতারামের নিকট সঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। এই জন্য তিনি অব্যবস্থিত রণ-নীতি অবলম্বন করিয়া সময় কর্ত্তন করিতেছিলেন মাত্র। ফৌজদারকে রাজস্ব দেওয়া হইবে না ; কিন্তু সে কথা তখনও তিনি মুর্শিদাবাদে রটিতে দেন নাই। সম্ভবতঃ এখন পর্য্যন্ত তাঁহার উকিল মুনিরাম যথাভাবে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন।

মীর আবু তোরাপ্ সীতারামকে দমন করিবার ভার নিজ সেনাপতি,

১ 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৭৮-৯ পৃ।

আফগানবীর পীর খাঁর উপর ন্যস্ত করিলেন। 'তারিখ্-বাঙ্গালা'য় দেখি তাঁহার অধীন দুই শত মাত্র অশ্বারোহী ছিল; হয়ত সে গণনা ঠিক নহে। সীতারামের সৈন্যবল যথেষ্ট বেশী ছিল, দুই শত সেনা লইয়া তাঁহাকে যে পরাস্ত করা যায় না; তাহা অবশ্য ফৌজদার বুঝিতেন। ফৌজদারের সৈন্য যাহাতে মধুমতী পার হইতে না পারে, তাহাই সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল। পারঘাটায় তিনি কামান পাতিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন। সীতারামের অগ্রগামী সৈন্য মধুমতী ও বারাসিয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিত এবং হরিহরনগরের দিকে যাহাতে পীর খাঁ ধাবিত হইতে না পারেন, তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিত। মধ্যে মধ্যে দুই একটি ক্ষুদ্র খণ্ড-যুদ্ধ যে না হইত, তাহা নহে, তবে তাহার কোন ইতিবৃত্ত বা বিশেষত্ব নাই। অবশেষে একদিন বারাসিয়ার কূলে অকস্মাৎ উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল, নদীর উচ্চ পাহাড় রক্তাক্ত করিয়া ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আবু তোরাপ্ স্বয়ং নিহত হন। 'তারিখ্-বাঙ্গালা' বা 'রিয়াজে'র অনুকরণ করিয়া ষ্টুয়ার্ট বলেন, আবু তোরাপ্ যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, মৃগয়ায় আসিয়াছিলেন, সীতারামের লোকেরা তাহাকে পীর খাঁ মনে করিয়া ভ্রমক্রমে নিহত করিয়া ফেলিয়াছিল।[১] একথা বিশ্বাস করি না; বারাসিয়ার তীরভূমি এমন কিছু মৃগয়ার জায়গা নহে এবং যেখানে মাঝে মাঝে বিরোধ ঘটিতেছিল, সেখানে বেশী লোকজন সঙ্গে না লইয়া আবু তোরাপ্ যে বাহির হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। রীতিমতই যুদ্ধ হইয়াছিল; সে যুদ্ধে তিনি একাকী নহেন, উভয় পক্ষের ৫।৬ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে সীতারাম ভূষণা দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ফৌজদারের নিতান্ত মৃগয়ায় যাওয়ার ব্যাপার হইলে, এত সহজে সুরক্ষিত ভূষণা দুর্গ অধিকৃত হইত না। আবু তোরাপ্‌কে প্রাণে মারা সীতারামের অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্তু যখন সেনাপতি রামরূপ তাঁহাকে নিহত করেন, তখন সীতারাম পদস্থ বীরের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; যুদ্ধান্তে তাঁহারই ব্যবস্থায় আবু তোরাপের মৃতদেহ ভূষণায় লইয়া যথোচিত সমাদরে সমাহিত করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে বহুসংখ্যক মুসলমান হত হন, তাঁহাদিগেরও সমাধির ব্যবস্থা সেই স্থানে হইয়াছিল। বারাসিয়ার তীরে এখনও যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান প্রদর্শিত হয়।[২]

১ *Riyaz.*, p. 266; Stewart, *History of Bengal*, Bangabasi edition, p. 433.

২ যদুনাথ লিখিয়া গিয়াছেন: 'এই যুদ্ধে ৬০০ শত মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ * * * মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা।'[১] ঔপন্যাসিকের কাছে উহা ছোট কথা হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট উহা বড় কথা ; আর ঐ ছোট কথার অস্থিমজ্জা না হইলে উপন্যাসের বিপুল বপুঃ গড়িয়া উঠিতে পারিত না। স্থানে স্থানে ঐ অস্থিমজ্জাকে বিকৃত করিয়া ঔপন্যাসিক নিজের হাতের গড়া মানুষটিকে যে বদলাইয়া ফেলিয়াছেন, তজ্জন্য সনাক্তদারগণ আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকার রাখে। সীতারাম ভূষণা দুর্গ দখল করিয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করিলেন, মহম্মদপুরের ভার প্রধান সেনাপতি রামরূপের উপর প্রদত্ত হইল। অন্যান্য সেনানীরা বিভক্ত হইয়া উভয় স্থানে এবং মধুমতী নদীর পাহারায় রহিলেন। আবু তোরাপের হত্যা বা ভূষণা বেদখল হইয়া যাওয়া মোগল সুবাদার কিছুতেই সহ্য করিবেন না ; সুতরাং এইবার মোগলের সঙ্গে প্রকাশ্য সমর বাধিবে, তাহা সকলে জানিতেন। এইজন্য সীতারাম ও তাঁহার সেনানীবৃন্দ নানাভাবে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও গুলি বারুদ প্রভৃতি সরঞ্জাম সংগ্রহের বিপুল ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।[২] এই সময়ে "মুসলমান ইতিহাস-লেখক তাঁহাকে (সীতারামকে) যেরূপ ভীত ও আতঙ্কযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি সেরূপ ভীত হইলে অবশ্যই সন্ধি-স্থাপনের আয়োজন করিতেন। মুসলমানকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত ; রাজ্য থাকিত, রাজদুর্গ থাকিত, রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারামের গৌরব ঘোষণা করিত ; এবং হয়ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভাতে সায়াহ্নে সশস্ত্র দ্বাররক্ষিগণ সীতারামের বংশধরদিগকে মহারাজ, রাজা বা নিতান্ত পক্ষে রায় বাহাদুর বলিয়া অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে,

---

এক সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের সমাধি-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বারাসিয়া নদীতীরে বিদ্যমান আছে।'—'সীতারাম', ৫ম সং, ১৬৭ পৃ।

১ বঙ্কিমচন্দ্র, 'সীতারাম', ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

২ এই সময়ে সীতারাম বাণকানা নদীর তীরে দিঘলিয়া গ্রামে নিজের পরিবারবর্গের নিরাপদ-বাসের জন্য একটি গুপ্ত বাটী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। একটি দীঘি ও ভূপ্রোথিত কয়েকটি ইট টালির পাঁজা এখনও সে চেষ্টার নিদর্শন রাখিয়াছে। স্থানীয় লোকে সীতারামের বাটীর দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে এখনও ভয় করে।

একটু ক্ষমা ভিক্ষা করিলে, একটু অধীনতা স্বীকার করিলে হাস্যময়ী পুরী এমন শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইত না। যিনি স্বহস্তে বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়া বাহুবলে সেই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি যে এতটুকু বুঝিতেন না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? তথাপি এতটুকু করিতেও সীতারাম সম্মত হইলেন না কেন? এইজন্যই মনে হয় যে, আত্মবংশ বা আত্ম-পরিবারকে ধন-গৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্য সীতারাম ব্যাকুল হন নাই; বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে; সীতারামের ইতিহাস পড়িতে বসিলে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-প্রণীত 'সীতারাম', ৬৯-৭০ পৃ। আমরা এ পর্য্যন্ত সীতারামের কার্য্যাবলীর যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে পাঠক মাত্রই প্রবীণ ঐতিহাসিকের এই সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

এদিকে মুর্শিদাবাদে আবু তোরাপের মৃত্যুর সংবাদ পৌছিল। অল্পদিন হইল ফরখ্‌শিয়র দিল্লীশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের মসনদে সমাসীন হইবার আদেশ পাইয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে আবু তোরাপের উপর তাঁহার বিরক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু আজ মোগল ফৌজদার নিহত হওয়ায় তাঁহার অবস্থা সমস্যা-সঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবু তোরাপ্ বাদশাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং দিল্লীর দরবারে অনেক বড় বড় আমীর তাঁহার আত্মীয়বন্ধু ছিলেন। এতদিন কুলি খাঁ ভূষণার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন, ফৌজদারের প্রার্থনামত কোন সৈন্য সাহায্য পাঠান নাই, একজন নগণ্য জমিদার মোগলের হাত হইতে ভূষণার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, এ সকল কথা দরবারে উঠিলে, মুর্শিদকুলি নিশ্চয়ই তাঁহার অমনোযোগিতার জন্য তিরস্কৃত হইবেন; আর বাদশাহের কুটুম্বের প্রতি তাঁহার মানসিক আক্রোশের কথা প্রকাশ পাইলে, অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং অতিরিক্ত কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা ব্যাপারটাকে একেবারেই চাপা দিবার জন্য দৃঢ়চিত্ত কুলি খাঁ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বীয় শ্যালীপতি বক্স আলি খাঁকে ভূষণায় ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সৈন্যসহ পাঠাইলেন।[১]

১ 'রিয়াজে' এই নামটি হাসান আলি খাঁ বলিয়া আছে। ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি সকলেই বক্স আলি ধরিয়াছেন।

মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী সমস্ত জমিদারের উপর কঠোর পরওয়ানা জারি হইয়া গেল যে, সকলেই যেন মোগল ফৌজদারকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন, কেহ যেন সীতারামকে কোন প্রকার রসদ বা সৈন্য দিয়া সাহায্য না করেন, কাহারও জমিদারীর মধ্য দিয়া যেন সেই মোগলশত্রু পলায়ন করিতে না পারে, কেহ তাঁহাকে পলায়ন করিতে দিলে তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করা হইবে।[১] জমিদার পীড়নকারী মুর্শিদকুলিকে সকলে চিনিতেন, তাঁহার কড়া হুকুম পাইয়া সকল জমিদার কম্পান্বিত হইলেন। হিন্দুরাজত্বের কল্পনা নিমেষে উড়িয়া গেল।

বিশেষতঃ নলডাঙ্গার রাজা রামদেব সীতারামের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া নবাব আরক্ত-নয়ন হইলেন। রামদেব এবার ফাঁফরে পড়িলেন; তিনি উচ্চবাচ্য না করিয়া আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি বল সঞ্চয় করিয়া অপক্ষপাত ভাবে প্রস্তুত থাকিলেন। এমন কত জমিদার যে মোগলের ভয়ে সীতারামের বিরুদ্ধাচারী, অগত্যা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিলেন, তাহা বলিবার নহে। বাঙ্গালী জাতির পতন এইভাবে হইয়াছে। বাঙ্গালীতে শত্রুপক্ষে সাহায্য না করিলে কোন যুগেই বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা দুঃসাধ্য হইত না। কর্ত্তিত বৃক্ষ সত্যই কুঠারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে যে তাহার স্বজাতীয় ভ্রাতা অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ড কুঠারের পশ্চাতে সংলগ্ন না হইলে, কুঠার কখনও বৃক্ষচ্ছেদন করিতে পারিত না। কুলি খাঁর কড়া হুকুম শুনিয়া অনেক জমিদার তদুত্তরে কাকুতি মিনতি জানাইলেন। সীতারাম তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, আত্মসম্ভ্রম লইয়া আর পিছাইবার উপায় নাই। সুতরাং পরিণাম চিন্তা করিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, যুদ্ধের জন্য ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। হয়ত তিনি যখন সহজে নানামতে রাজ্যজয় করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এতদূর কঠোর প্রতিজ্ঞা ছিল না। অবস্থার গতিকে তেজস্বী ব্যক্তিকে উগ্রতপস্বী করিয়া তুলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল হইতে দেখি, এই সঙ্কট-সময়ে সীতারাম চিত্ত-বিশ্রামের

---

১ 'The Nawab issued mandates to the Zamindars of the environs insisting on their not suffering Sitaram to escape across their frontiers, and also threatening that should the latter effect his escape across the frontiers of any one, not only he would be ousted from his Zamindari, but be punished.'—*Riyaz.*, p. 266.

প্রেম-বিলাসে মত্ত থাকায়, তাঁহার সৈন্যসামন্ত লোকজন সময় বুঝিয়া সব সরিয়া পড়িল, অবশেষে মোগলেরা আসিয়া অনায়াসে তাঁহার গ্রাস-কবলিত রাজ্য লুটিয়া লইল। ব্যাপার এত সোজা নহে। সকল যুদ্ধের খাঁটি খবর ৫০।৬০ বৎসর পরে লিখিত মুসলমানী ইতিহাসে না থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ যে ভূষণা ও মহম্মদপুরের বহু ক্ষেত্রে হইয়াছিল, স্থানিক অনুসন্ধানে এখনও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত প্রবচনে ও পাড়াগাঁয়ের কবিতায় এখনও অনেক খবর আছে। বিলাসে অনেক রাজ্যের ক্ষয় হইয়াছে, তাহা মানি; সীতারামও যে বিলাসী ছিলেন, সে কথা একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু বিলাসীর পক্ষে বশ্যতা স্বীকারই ত স্বাভাবিক হইত! সীতারাম তাহা করিলেন না কেন? নানাস্থানে যুদ্ধ হইল, সেনানীরা একে একে মরিল, রাজধানী রক্তরঞ্জিত হইয়া গেল, দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার পরও যুদ্ধ চলিল, ইহার কেন্দ্রে কোন নেতা নাই, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহার মর্ম্মরুধিরের জন্য মুর্শিদাবাদের শূল শাণিত হইতেছিল, যাঁহার প্রধান সেনানীকেও গুপ্তহত্যা করা হইয়াছিল, তিনি কিনা সুরক্ষিত দুর্গের অনতিদূরে অরক্ষিত চিত্তবিশ্রামের পর্ণকুটীরে বিশ্রম্ভালাপে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিলেন, ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? চিত্তবিশ্রামে এখন কোন রাজবাটীর শেষ চিহ্নস্বরূপ কোন ইষ্টকখণ্ড খুঁজিয়া পাওয়াও পণ্ডশ্রম হয়। সাহিত্যসম্রাট ত তাঁহার নভেলের ঐতিহাসিকতা বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী পাঠক কি সে নিষেধ শুনেন? না, নভেলী গল্পকে ইতিহাসের উপর স্থান দিয়া সীতারামের মুখে কালিমা মাখিয়া দিতেছেন? উপন্যাস ইতিহাসের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে বলিয়াই এত কথা বলিতে হইল।

বক্স আলি খাঁ যখন ফৌজদার হইয়া আসেন, তখন তাঁহার সহকারী হইয়া আসিয়াছিলেন দুইজন সেনানী,—একজন মুর্শিদাবাদের সুবাদারী সৈন্যের অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ, অন্যজন জমিদারী ফৌজের কর্ত্তা দয়ারাম রায়। এই সংগ্রাম সিংহের বিশেষ পরিচয় আমরা জানি না।[১] তবে যে সংগ্রাম সাহার

১ যদুনাথ সংগ্রাম সিংহ না বলিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ডের অনুকরণে ইহাকে সিংহরাম বলিয়াছেন। 'বিশ্বকোষে'র সীতারাম প্রবন্ধেও সিংহরাম নাম দেখি। সীতারামকে পরাজয় করিতে দয়ারাম

কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫২৯-৩২ পৃ), ইনি যে সেই সংগ্রাম নহেন, তাহা নিশ্চিত। সংগ্রাম সাহা এত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ দয়ারাম রায় বর্ত্তমান দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নাটোরের আদি পুরুষ রঘুনন্দনের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় রঘুনন্দন বাল্যে পুটিয়া-রাজ-সরকারে প্রতিপালিত, তথা হইতে সামান্য চাকরী লইয়া অল্প বয়সে মুর্শিদাবাদে আসেন (৩৪ পৃ)। সেখানে স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন। উহা হইতেই "রঘুনন্দনী বা'ড়" কথার সৃষ্টি হইয়াছে। জমিদারী বন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর সাহায্য করিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হন এবং বহু জমিদারের করচ্যুত সম্পত্তি নিজ ভ্রাতার নামে লিখাইয়া লন। সাহসে, বীরত্বে, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতায় দয়ারাম তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। নবাব যখন জমিদারদিগের নিকট হইতে ফৌজ সংগ্রহ করিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে পাঠাইবার জন্য রঘুনন্দনের উপর আদেশ করিলেন, তখন নিজের অসুস্থতা বশতঃ রঘুনন্দন এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী দয়ারাম রায়কে পাঠাইয়া দেন। বক্স আলি ও সংগ্রাম সিংহ পূর্ব্বে রওনা হইয়াছিলেন, দয়ারামের আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

বক্স আলি খাঁ নিজ সহকারী সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে ভূষণা দখল করিবার উদ্দেশ্যে পদ্মা দিয়া জলপথে যাত্রা করেন; উঁহারা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ফরিদপুর প্রভৃতি কোন স্থানে অবতরণ করিয়া স্থলপথে ভূষণার উত্তর দিকে উপনীত হন। তখন সীতারাম সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া গতিরোধ করেন; যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেও সীতারাম জয়লাভ করেন। দুর্গ দখল করিতে না পারিয়া ফৌজদারী সেনা ক্রমে ভূষণার চারিদিক ঘিরিয়া অবরোধ করে এবং পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগকে লোকজন লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে। সীতারাম বিপন্ন হইয়া দেখিলেন, ভূষণা ও মহম্মদপুর এই উভয় স্থান দখলে রাখা দুষ্কর। কিন্তু কোন উপায় স্থির হইল না।

এদিকে দয়ারাম রায় মহম্মদপুর আক্রমণের জন্য জমিদারী ফৌজ লইয়া

প্রভৃতি যিনিই আসুন, তাহারই যে রাম-যুক্ত নাম থাকিতে হয়, ইহা স্বীকার করি না। অক্ষয়কুমার, নিখিলনাথ বা কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সংগ্রাম নামই দিয়াছেন, সিংহরাম দেন নাই।

অগ্রসর হন। যত দূর বুঝা যায়, তিনি পদ্মা হইতে গৌরী নদীতে পড়িয়া লাঙ্গল-বাঁধ দিয়া কুমার নদের তীরে বরীশাটে (বীরসাত) পৌছেন।[১] বরীশাট নলডাঙ্গার রাজার মামুদশাহী পরগণার উত্তরাংশে কুমার ও বারাসিয়া নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি প্রধান স্থান। এখান হইতে উত্তরবাহী কুমার হনু নাম ধারণ করিয়া মধুমতীতে পড়িয়াছে এবং বারাসিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া মাগুরার নিকট নবগঙ্গায় মিশিয়াছে। এখন কুমারের প্রাচীন খাত শুষ্কপ্রায় হওয়ায় লোকে বারাসিয়াকেই কুমার বলে। বরীশাট হইতে দয়ারাম কোন্ পথে আসেন, ঠিক জানা যায় না। বারাসিয়া দিয়া নব গঙ্গায় পড়িয়া বিনোদ-পুরের অপর পারে ছাউনি করিতে পারেন; অথবা কুমার ও মধুমতী দিয়া ঘুরিয়া মহম্মদপুরের পূর্ব্ব সীমায় পৌছিতে পারেন। শেষোক্ত পথে আসাই অধিকতর সম্ভবপর, কারণ সেই দিকেই ফৌজদারী সেনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা। প্রবাদ আছে, মধুমতীতীরে গন্ধখালিতে যে সব ক্ষত্রিয় বাসিন্দা ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দয়ারাম মহম্মদপুর দুর্গ সম্বন্ধীয় অনেক খবর সংগ্রহ করেন, কারণ উঁহাদের সহিত মহম্মদপুরবাসী বহু ক্ষত্রিয় সৈনিক বা ব্যবসায়ীর কুটুম্বিতা ছিল।[২] গন্ধখালি ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে মধুমতীর পূর্ব্বকূলে দয়ারাম-পুর গ্রাম সম্ভবতঃ দয়ারামের ছাউনি করিয়া থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

মহম্মদপুরের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন সেনাপতি রামরূপ বা মেনাহাতী। তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি ও বীর বিক্রমের জন্য সব লোকে তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও বীরোচিত সদাশয়তার জন্য সব লোক তাঁহার বাধ্য ছিল; তিনি আজীবন অকৃতদার, সংসারে অনাসক্ত, দেবদ্বিজভক্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ—এজন্য সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। তিনি নিজেও যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা, সৈন্যসামন্ত তেমনি তাঁহার একান্ত বাধ্য, এজন্য কামান দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গ তাঁহার নিকট হইতে দখল করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সকল অবস্থা বুঝিয়া দয়ারাম গুপ্তঘাতক দ্বারা সর্ব্বাগ্রে রামরূপের প্রাণবিনাশ করিবার কল্পনা স্থির করিলেন। হতভাগ্য দেশে

১ বরীশাটের অনতিদূরে আমতৈল-নহাটায় যদুনাথের জন্মস্থান। তিনি বলেন, বরীশাটের পূর্ব্বতন নাম 'বীরসাত', দয়ারাম বহু বীর সাথে করিয়া ঐস্থানে আড্ডা করেন বলিয়া ঐস্থানের নাম বীরসাত হইয়াছিল। কথাটা অসম্ভব নহে। এখনও দয়ারামের বংশের সহিত বরীশাটের সম্বন্ধ আছে। সেখানে দীঘাপাতিয়ার একটি কাছারী আছে।

২ যদুনাথ, 'সীতারাম', ১৮৭ পৃ।

এই অপকর্ম্ম করিবার জন্য লোকের অভাব হইল না। সেনাপতি সাধারণতঃ দুর্গদ্বারবর্ত্তী গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিতেন ; প্রাতে বীরের মত সশস্ত্র হইয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন, সে সময়ে তিনি কোন লোকজন সঙ্গে লইতেন না। কিন্তু তিনি একক হইলেও সম্মুখ হইতে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচান্তে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। একদিন কুজ্ঝটিকাময় প্রভাতে যেমন তিনি উঠিয়া সম্ভবতঃ শৌচের জন্য দোলমঞ্চের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় গুপ্তঘাতকেরা পশ্চাৎদিক দিয়া আসিয়া তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া ফেলিল ; মহাবীর যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন তখন দুর্ব্বৃত্তরা তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল।[১] দয়ারাম রায় বাহাদুরী লইবার জন্য এই ছিন্ন মুণ্ড নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব সে প্রকাণ্ড মুণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন এবং তেমন মহাবীরকে সশরীরে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া গুপ্তভাবে কেন নিহত করা হইল, এইরূপ অনুযোগ করিয়াছিলেন।[২] নবাব সসম্মানে সে বীরমুণ্ড মহম্মদপুরে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ব্বেই বীরের কবন্ধ দেহের সৎকার করিয়া তাঁহার অস্থিখণ্ডসমূহ সমাধিতলে রক্ষা করা হইয়াছিল, ছিন্ন মুণ্ডও সেই স্থানে সমাহিত হয়। সীতারাম নির্ম্মিত এক উচ্চ ইষ্টক-স্তম্ভ ঐ সমাধিস্থান বিজ্ঞাপিত করিত। মহম্মদপুরের বাজার হইতে উত্তরদিকে যাইয়া কাষ্ঠঘর পাড়া হইতে যে রাস্তা পূর্ব্বমুখে ভূষণার দিকে গিয়াছে, উহারই পার্শ্বে মেনাহাতীর সমাধিস্তম্ভ ছিল। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও উহা সিক্তনেত্র দর্শকের মনে কত পুরাতন কাহিনী জাগাইয়া দিত। এখন সে স্তম্ভের চিহ্ন মাত্রও নাই।[৩] কতবার বলিয়াছি,

১ মেনাহাতীর গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কিম্বদন্তী আছে। ঘাতকেরা দোলমঞ্চের চন্দ্রাতপ কাটিয়া দিয়া তদ্দারা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া পরে অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করে। কঠিন আঘাতেও নাকি তাঁহার মৃত্যু হয় না, তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে মৃত্যু নিবারক কবচ ছিল। অবশেষে যখন অস্ত্রাঘাতে বা শূলাঘাতে অনর্গল রক্তস্রাব হইতে থাকে, তখন বীর পুরুষ তাঁহার কবচ খুলিয়া ফেলিয়া মৃত্যুর সন্ধান বলিয়া দেন।—যদুনাথ, 'সীতারাম', ১৭৮-৯ পৃ, অক্ষয়কুমার, 'সীতারাম', ৭৫ পৃ।

২ "...the nawab, seeing the huge head, said—'A man like that you should have brought alive and not killed.' He directed the head to be taken back to Muhammadpur and it was there buried and a great tomb raised over it."—Westland, *Jessore*, 1871, p. 35.

৩ আমি যখন প্রথম বার (১৯০৩ খৃঃ) মহম্মদপুর দর্শন করিতে যাই, তখনও বাজারের

আমরা বড় ইতিহাস-বিমুখ আত্মবিস্মৃত জাতি! নতুবা রামরূপের মত মহাবীরের স্মৃতিচিহ্নটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত না। আমাদের দেশের কত ধনীর কত অর্থ অপকর্ম্মের ধ্বজারোপণে ব্যয়িত হয়; এই প্রকৃত বীরের জন্য একটি স্মারকলিপি প্রতিষ্ঠা করিবার মত প্রাণ কি কাহারও নাই?

ভূষণায় থাকিয়া সীতারাম যখন রামরূপের হত্যার খবর পাইলেন, তখন তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। ভ্রাতা লক্ষ্মণের মত তিনি অকলঙ্ক-চরিত্র রামরূপের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস করিতেন। সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে সীতারামের দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল, রাজ্যরক্ষার আশা উড়িয়া গেল, তিনি অত্যন্ত বিপন্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ভূষণা ও মহম্মদপুর এই উভয় দুর্গ রক্ষা করিবার কল্পনা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কোন প্রকারে ভূষণা-দুর্গে অল্পপরিমাণ সৈন্য জনৈক সেনানীর হস্তে রাখিয়া, নিতান্ত বিপদে তাঁহাদের আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়া, তিনি তথাকার অবশিষ্ট সৈন্যসামন্তদিগকে রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া মহম্মদপুর যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। নিজেও পরে ছদ্মবেশে অতিকষ্টে মধুমতী নদী পার হইয়া রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন। সে দেশের সমস্ত পথঘাট তাঁহার নখদর্পণে ছিল।

সীতারাম যখন মহম্মদপুরে আসিলেন, তখন চারিদিকে দয়ারামের ফৌজ হল্লা করিতেছিল, ফৌজদারী সৈন্যদল ভূষণার জঙ্গলভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরের দিকে ধাবিত হইতেছিল। রামরূপের জন্য চক্ষুজল ফেলিতে ফেলিতে, তাঁহার সৎকার ও সমাধির জন্য রাজোচিত হুকুম দিয়া, বীরাগ্রগণ্য সীতারাম

উত্তরে কেঁয়েপটীতে ২।৩ ঘর ক্ষত্রিয়ের বসতি ছিল। চৌহান বংশীয় বৃদ্ধ কমলাকান্ত রায়ের বয়স তখন ৮৪ বৎসর; তিনি আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার বাটীর অনতিদূরে পূর্ব্বতন উদয়গঞ্জের বাজারে কালী-গঙ্গার খাতের উত্তরকূলে মেনাহাতীর সমাধি স্থান ও তাহার ইষ্টকচিহ্ন দেখাইয়া দেন। সমাধি স্থানের ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ অনেক কাল ছিল। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। উহা পরে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং লোকাল বোর্ডের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময় রাস্তাটি প্রায় উহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। কমলাকান্ত তাঁহার যৌবনকালে ঐ ভগ্ন সমাধি হইতে যে ইট আনিয়া নিজ বাটীতে বাহিরের প্রাচীরের কতকাংশ গাঁথিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রমণের আশঙ্কা লইয়া সীতারামের লোকে তাড়াতাড়ি করিয়া এই সমাধিস্তম্ভ গাঁথিয়াছিল বলিয়া উহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাগমনে পুরীর লোক আশ্বস্ত হইল। তখনও রাজধানীর উপর আক্রমণ হয় নাই। রামরূপের সহকারী সেনানীরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া দুর্গরক্ষার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিতেছিলেন। সীতারাম বুঝিলেন, জয়ের আর আশা নাই, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। শেষ পর্য্যন্ত বীরের মত আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্মেই মানুষের অধিকার, ফলে নহে। মোগলের কবল হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য তাঁহার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া যাহা সাধ্য, তিনি তাহা করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী কাপুরুষ জমিদারদিগের ভরসায় ছিলেন বলিয়া তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইতে চলিল। এখন কি তিনি সেই কাপুরুষতার সাগরে ভাসিয়া সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, মোগলের পায়ে শিরঃ নোয়াইয়া অসার রাজগী বজায় রাখিবেন? না, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া বীরপদবীর অনুসরণ করিবেন? ইহাই এখন একমাত্র প্রশ্ন। সকল প্রশ্নের সমাধান হইলেও, রামরূপের নৃশংস হত্যার প্রশ্নের সমাধান হয় না। রামরূপের প্রাণ যে পথে গিয়াছে, তদ্ভিন্ন সীতারামের অন্য পন্থা নাই। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী; সে যুদ্ধে নিস্তার নাই, তাহাও নিশ্চিত। সুতরাং দুর্গমধ্যস্থ আত্মীয় স্বজন, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা যাহাদের প্রাণে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, পলায়ন করিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বা কোন সুবিধা যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে অবিলম্বে রাত্রিযোগে সাধ্য-মত যান-বাহন ও রক্ষিসহ দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া বাহিরে পাঠান হইল। কে কে গিয়াছিল বা কে কে ছিল, হিসাব দিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার কতক স্ত্রীপুত্র ও নিকট আত্মীয়েরা যে নৌকাযোগে কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি। বাজমহিষীদিগের মধ্যে কে শেষ পর্য্যন্ত দুর্গপুরীতে ছিলেন, জানা যায় নাই। তবে প্রবাদ এই, একজন ছিলেন, এবং তিনি শেষ চেষ্টায় সীতারামকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।

মধুমতীর কূলে কামান পাতিয়া শত্রুর পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কুলায় নাই। সীতারামের যুদ্ধায়োজনের একটা প্রধান অভাব ছিল, তাঁহার কোন রণতরী ছিল না। দ্রুতগমনের জন্য 'বলিয়া' বা সিপ্ এবং ভারবহনের জন্য পলওয়ার বা পান্‌সী ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য কামানযুক্ত উপযুক্ত কোশা বা অন্যবিধ রণতরী ছিল না। সুতরাং শত্রুকে জলপথে মহম্মদপুরে পৌছিবার পূর্ব্বে বা মধুমতী পার হইবার সময়ে কোন বাধা দিবার সুব্যবস্থা হয় নাই। দয়ারামের সৈন্য একটু উত্তরদিক দিয়া এবং বক্স আলির

ফৌজ অনেকদূর দক্ষিণে গিয়া নদীপার হইল। নবাবের পরওয়ানা অনুসারে জমিদারেরা নৌকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সকল সৈন্য পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে এক সময়ে মহম্মদপুর আক্রমণ করিল; কয়দিন ধরিয়া কিভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার কোন চাক্ষুষ সাক্ষী নাই। সুতরাং আমি সে যুদ্ধের কোন বিবরণ দিতে পারিতেছি না। পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে; কাল্পনিক বর্ণনার জন্য ঐতিহাসিকের আবশ্যক নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সীতা-রামের বীরজীবনের শেষ নাট্যাভিনয়ের অতীব সুন্দর চিত্র দিয়া গিয়াছেন। উহার মধ্যে ভাবিবার কথা আছে।

মহম্মদপুরের দুর্গের বাহিরে যে সকল অধিবাসী বা ব্যবসায়ী ছিল, সকলেই পলায়ন করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিল; মোগল সৈন্য তাহাদের ঘরবাড়ী শূন্যপুরী অগ্নিমুখে দিতে দিতে দুর্গদ্বারে উপনীত হইল। রামসাগরের কূল হইতে দুর্গের পূর্ব্বতোরণ পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। সীতারামের গুলি বারুদের বিশেষ আয়োজন থাকিলেও মোগলেরা কামানগুলি একে একে জিতিয়া লইল, সেনানীবৃন্দ একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইল। তখন সীতারাম স্বল্পাবশিষ্ট সৈন্য-দল লইয়া দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক বাহির হন এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্দ্ধর্ষভাবে যুদ্ধ করিবার পর আহত হইয়া ধৃত হন। প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানা যায়, রাণী-দিগের মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে ছিলেন। সীতারাম ধৃত হইবার পর যখন মোগল সৈন্য বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়া সাগর তরঙ্গের মত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠপাট করিতে লাগিল, তখন নাকি দয়ারাম রায় উহাদিগকে দেবমন্দির ও অন্দর মহলের দিকে যাইতে দেন নাই। তবে তিনি নিজে কৃষ্ণজী বিগ্রহের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। লুণ্ঠনের কোন অংশ-ভাগীই তিনি হন নাই, ইহা সত্য কথা; একমাত্র সুন্দর কৃষ্ণজী বিগ্রহটি তিনি বস্ত্রাভ্যন্তরে করিয়া লইয়া প্রস্থান করেন। এখনও দিঘাপাতিয়া রাজবাটীতে এই সুন্দর বিগ্রহের সেবা চলিতেছে। 'ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক চিহ্ন কিছুই বর্ত্তমান নাই, কেবল কৃষ্ণজীর পাদপদ্মে ক্ষোদিত আছে—দয়ারাম বাহাদুর।'[১]

মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গল্প নকল করিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব সীতারামের শেষফল অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, বক্স আলি সীতারামকে

১ অক্ষয়কুমার, 'সীতারাম', ৭৮ পৃ।

সপরিবারে ও অনুচরবর্গ সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে চালান দিলেন। সেখানে সীতারাম ও দস্যুগণকে জীবন্ত অবস্থায় শূলবিদ্ধ করিয়া মারা হইল এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল।[১] 'রিয়াজে' আছে, নবাব গোচর্ম্মে সীতারামের মুখ বাঁধিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বাংশে ঢাকায় যাইবার রাস্তার পার্শ্বে শূলে চড়াইয়া দেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন।[২] 'তারিখ্-বাঙ্গালা'য় আর একটু আছে, 'নবাব সীতারামকে শূলে চড়াইবার পর সেই মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লট্‌কান হইল এবং অপরাধীব রক্ত ভূমিতে না পড়ে, এজন্য নিম্নে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। সীতারামের পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারুদ্ধ করা হইল।'[৩] এই তিনখানি পুস্তকই ঘটনার অন্যূন ৫০।৬০ বৎসর পরে লিখিত।[৪] তন্মধ্যে 'তারিখ্-বাঙ্গালা' সর্ব্বাগ্রে, 'রিয়াজ' তৎপরে এবং ষ্টুয়ার্টের পুস্তক সর্ব্বশেষে সঙ্কলিত হয়। অজ্ঞাতনামা লেখক গল্প শুনিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন, অন্য দুইজন কিছু অতিরঞ্জন করিয়া তাহা নকল করিয়াছেন। তিন জনেরই সার কথা এই যে, নবাবের আদেশে সীতারামের প্রাণদণ্ড হয় এবং তাঁহার পরিবারবর্গ যাবজ্জীবন কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন। 'তারিখ্-বাঙ্গালা'য় স্পষ্টতঃ আছে, উঁহারা মামুদাবাদেই ছিলেন, 'রিয়াজ' তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদে রাখিয়াছেন, ষ্টুয়ার্ট গোলমাল চুকাইবার জন্য তাঁহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ষ্টুয়ার্টের এ উক্তি বিশ্বাস করেন নাই। নবাব মুর্শিদকুলি জমিদারদিগের প্রতি কঠোর হইলেও সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে শূলদণ্ড দিতেন বলিয়া শুনা যায় নাই। সম্ভবতঃ বাদশাহ-দরবারে নবাব সুবিধামত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যে

---

১ 'Buksh Aly...seized Sittaram, his women, children, and accomplices, and sent them in irons to Moorsheedabad, where Sittaram and the robbers were impaled alive and the women and children sold as slaves.'—Stewart, p. 434. [1813 ed., p 383—শি মি]

২ "The Nawab enclosing Sitaram's face in cow hide had him drawn to the gallows in the eastern suburbs of Murshidabad on the high way leading to Jahangirnagar and Mahmudabad, and imprisoned for life Sitaram's women and children and companions."—*Riyaz*, (Salam), p. 267.

৩ 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৮০ পৃ।

৪ 'তারিখ্-বাঙ্গালা' (১৭৬০-৬৪), 'রিয়াজ' (১৭৮৬-৮৮), Stewart, *History*. (1813).

বিবরণ দাখিল করেন, উহারই উক্তি হইতে সীতারামের পরিণাম নির্ণীত হইয়াছে।[১]

দয়ারাম রায়ই সীতারামকে বন্দী করিয়া নিজের সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে পৌছিবার পূর্ব্বে নিজবাটী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণজী বিগ্রহ লইয়া দিঘাপাতিয়ায় যাইবার পথে তিনি বন্দী সীতারামকে নাটোর রাজবাটীর কারাগারে রাখিয়া যান। কোন্ কক্ষে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা এখনও লোকে দেখাইয়া দিয়া থাকে এবং জনরব এতদূরই রটিয়াছিল যে, সীতারাম সেই কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রকৃত কথা তাহা নহে; মুর্শিদাবাদে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দয়ারাম শীঘ্রই তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে হাজির করিয়া দিয়াছিলেন। দয়ারাম যে সীতারামের পরিবার-বর্গকে বন্দী করিয়া আনেন নাই, উহা সত্য কথা; তাহা হইলে উঁহারাও নাটোরে আসিতেন এবং রাজসাহীর জনশ্রুতি উহার সাক্ষ্য দিত। কৃষ্ণভক্ত দয়ারাম হিন্দুর স্ত্রী পরিবারের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে পারেন না। শেষ মুহূর্ত্তে সীতারামের বন্দী হওয়ার পূর্ব্বে পরিবারবর্গ সকলে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর। দয়ারাম মাত্র বীরবর সীতারামকে বন্দী করিয়া নবাব দরবারে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বীরত্বের জন্য 'রায় রায়ান' উপাধি এবং রঘুনন্দনের কৃপায় কতকগুলি জমিদারী লাভ করেন।[২]

সীতারাম নাটোর হইতে মুর্শিদাবাদে নীত হইবার পর কয়েক মাস কাল সেখানে কারাগারে ছিলেন।[৩] মুর্শিদাবাদেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সে মৃত্যু কি ভাবে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক মতামত আছে, তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য

---

১ 'The governor wrote a particular representation of all the circumstances to the Emperor, placing his own conduct in the most favourable point of view.'—Stewart, p. 434. 'As for the impaling, admitting even its truth, still it was more than the punishment which that particular Nawab ordinarily inflicted on zemindars who had fallen in arrear with their rents.'—Westland, p. 387.

২ Calcutta Review, '*The Rajas of Rajshahi*', Vol, LVI. 1873, p. 38.

৩ সম্ভবতঃ ১১২০ সালের মাঘ ফাল্গুন মাসে (১৭১৪, ফেব্রুয়ারী) সীতারাম বন্দী হন। মার্চ্চ মাসের প্রথমে তাঁহার পরিবারবর্গ কলিকাতায় ধরা পড়িয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন, সে কথা পরে বলিব। ১১২১ সালের আশ্বিন মাসে মুর্শিদাবাদে সীতারামের মৃত্যু হয়। তাহা হইলে ১৭১৪, ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কয়েক মাস তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, ধরিতে পারি।

মনে করি। (১) নবাব কর্তৃক সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়; (২) কারাগারে বিষপান করিয়া সীতারাম আত্মঘাতী হন। (৩) যদুনাথ লিখিয়া গিয়াছেন : 'কোন শালবিক্রেতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কথাই সীতারামের গুরুকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে।'[১] কিম্বদন্তী হইলেও তিনি ইহা 'বিশ্বাস-যোগ্য' বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমি গুরুকুলপঞ্জী দেখি নাই এবং এক্ষণে উহা খুঁজিয়া বাহির করিতেও পারিলাম না। তবে উহাও গল্প শুনিয়া লেখা, তাহা যদুনাথ নিজেই স্বীকার করিতেছেন; সে গল্পও কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং এ মতের উপর আমাদের কোন আস্থা নাই। দেশীয় প্রবাদানুসারে অক্ষয়কুমার প্রভৃতি দ্বিতীয় মতের পরিপোষক। কিন্তু কয়েকটি কারণে উহার সত্যতায় সন্দেহ হয় : (১) বিষাঙ্গুরীয় চুষিয়া সীতারামের মৃত্যু হইলে, পথিমধ্যে সে মৃত্যু হইতে পারিত; মুর্শিদাবাদে আসিবামাত্র তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের গুজব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, মৃত্যুর উপায় তাঁহার হাতে থাকিলে, তিনি দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেন না। (২) ধার্ম্মিক হিন্দু নৃপতি আত্মহত্যারূপ পাপকার্য্য ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। (৩) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের মতে আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধ নাই; কিন্তু মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে যথাবিধি তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।[২] সুতরাং তাঁহার মৃত্যুদণ্ড বা স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত। মৃত্যুদণ্ড হইয়া থাকিলে, তাঁহার যে শূলদণ্ড হয় নাই ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, সম্ভবতঃ মুর্শিদকুলি খাঁ সে নিষ্ঠুরতা দেখান নাই। তবে গুপ্তহত্যা হওয়া বিচিত্র নহে; সে যুগে ঘাতকের অভাব হইত না, গুরুকুলপঞ্জিকায় শালবিক্রেতার গল্প উহারই ইঙ্গিত

১ যদুনাথ, 'সীতারাম,' ৫ম সং, ১৯১ পৃ।

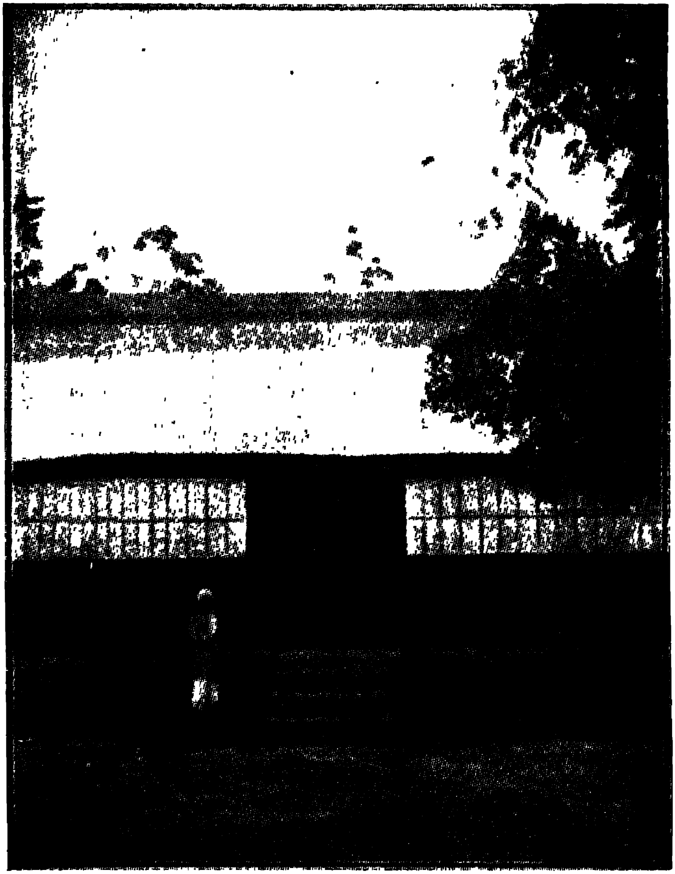
২ সীতারামের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পিতৃগুরুবংশীয় শ্রীরাম বাচস্পতিকে ভূমিদানের সনন্দ এই : 'পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত শ্রীরাম বাচস্পতি ঠাকুর শ্রীচরণেষু—পরগণে নল্‌দীর জয়রামপুর ও আঠারবাঁকা গ্রামে আমার জমিদারী তাহাতে ৺পিতা মহাশয় মুকঃসুদাবাদে ৺গঙ্গা প্রাপ্ত হন। তৎশ্রাদ্ধে ঐ দুই গ্রামের মধ্যে প্রভুরামের মুদাফতের ৷৷• আট আনা ১২/ বিঘা শ্রীশ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল। দাস ভূম্যাধিকারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে রহুন। ১১২২ সাল, ২৩শে কার্ত্তিক।'—যদুনাথ, ২৪৪ পৃ। শ্রাদ্ধস্থলে ভূমির পরিমাণ মাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল, পরে বাটী আসিয়া উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সনন্দ দিতে বিলম্ব হয়। সীতারাম আত্মঘাতী হইলে '৺গঙ্গা প্রাপ্ত হন,' সনন্দে একথা থাকিত না। আত্মঘাতীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নাই। বাচস্পতিকে ভূমিদানের যে অন্য সনন্দ আছে, তাহার তারিখ ১১২১, ২৬শে কার্ত্তিক।

করে। আবার অন্যপক্ষে সুখবিলাসী সীতারামের পক্ষে বর্ষাকালে অস্বাস্থ্যকর কারাগৃহে রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। যে ভাবেই মৃত্যু হউক, গঙ্গাতীরে তাঁহার শবদাহ ও রীতিমত শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ শ্রাদ্ধোপলক্ষে সীতারামের পুত্র গুরুদেবকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়া গিয়াছে।[১] উহা হইতে জানা যায়, সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীতারামের গুরুপৌত্র আনন্দচন্দ্র ও গৌরচরণ গোস্বামীকে এবং সীতারামের পিতৃগুরুবংশীয় শ্রীরাম বাচস্পতিকে ১১২১ সালের কার্ত্তিকমাসে (১৭১৪, নভেম্বর) শ্রাদ্ধজন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ১১২১ সালের আশ্বিনে (১৭১৪, অক্টোবর) বা তাহার কিছু পূর্ব্বে সীতারাম রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, বলিতে পারি।

বঙ্গে হিন্দু রাজন্যের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা লাভের শেষ চেষ্টা সীতারাম দ্বারা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী দ্বিশতবর্ষ মধ্যে সে চেষ্টা আর হয় নাই। জীবনের প্রথম হইতে সীতারামের সে উদ্দেশ্য ছিল কি না, জানা যায় না। তবে জমিদারী ও শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাধীনতার কল্পনা যে জাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সীতারাম জাগিতে পারেন, কিন্তু দেশ জাগে নাই। লোকে তাঁহার বশীভূত হইত স্বার্থের খাতিরে বা দস্যু-দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, দেশের জন্য নহে। শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের সময়ে দেশ যতটুকু সাড়া দিয়াছিল, সীতারামের সময়ে তাহাও দেয় নাই। শতবর্ষব্যাপী মোগল-শাসনের

---

১ গুরুদেবকে ভূমিদানের সনন্দ এই: 'আনন্দচন্দ্র গোস্বামী শ্রীচরণেষু প্রণামা আগে মুক:সুদাবাদ মোকামে ৺পিতামহাশয়ের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভূমিদানে পং নলদীর কানুটীয়া গ্রামে।• চারি পাখী ঘুল্লিয়া গ্রামে ।৶৹ পাখী বিনোদপুর গ্রামে।৶৹ পাখী ও নারায়ণপুর গ্রামে ।/৹ পাখী ভূমি দান করিলাম। ৺পিতাঠাকুরের স্বর্গার্থে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল করিতে থাকুন। ইতি ১১২১ তারিখ ২২শে কার্ত্তিক।' আনন্দচন্দ্রের ভ্রাতা গৌরচরণকেও একই তারিখে উক্ত একই স্থানে সমপরিমাণ অর্থাৎ মোট ১৷/৹ পঁচিশ পাখী জমি দান করা হইয়াছিল। এই সকল সনন্দে 'শ্রীসহি, বলরামদাস' এইরূপে মুন্সীর স্বাক্ষর আছে। মোহর ও মুন্সীর স্বাক্ষরেই কার্য্য হইত। শ্রাদ্ধকালে গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যেককে ২৫ পাখী জমি দান করা হয়, পরে শ্রাদ্ধান্তে বাটী আসিয়া সনন্দ লিখিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং মৃত্যুর সময় আশ্বিন মাসে না হইয়া উহার কিছু দিন পূর্ব্বেও হইতে পারে। যদুনাথ শ্রাদ্ধের সনন্দগুলি প্রকাশিত করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোথায় কোনখানি কি ভাবে পাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন নাই।



দশভুজার মন্দির, মহম্মদপুর



রায়গ্রামের জোড়বাঙ্গালা

কঠোর নিষ্পেষণে দেশের স্পন্দনের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। সীতারাম একক দাঁড়াইয়াছিলেন, নিজের বৈদ্যুতিক শক্তিতে লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র ; সুতরাং নবাবের একবারের চেষ্টায় তাঁহার পতন হইল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নিভিয়া গেল, প্রতিবেশিগণ সুষুপ্তির ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল ; সে অবসাদ এত বিঘোর যে, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে যখন বঙ্গের শাসনদণ্ড জাত্যন্তরে হস্তান্তরিত হইল, তখন দেশমধ্যে পূর্ব্বশাসনের বিশেষ ব্যত্যয় হইল না।

সীতারাম নাই। তাঁহার বংশ একপ্রকার নির্ব্বংশ হইয়াছে। কীর্ত্তি-চিহ্নও বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। গল্প-রসিকের মস্তিষ্কের ফলে তাঁহার ইতিহাসের উপর 'রচা কথা' স্তূপীকৃত হইতেছে। কতক অন্তর্হিত করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র। তবে সকল কথার অন্তরাল হইতে সীতারামের একটি চরিত্র-চিত্র দেখা যায় ; তিনি ধর্ম্মপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু নৃপতি ; তিনি শাসকের সহাস্য বদন বা মোগলের খেলাতের লোভে আত্মগোপন করেন নাই, নবাব বা ফৌজদারের বক্রদৃষ্টি বা রণসজ্জা তাঁহাকে দমিত বা নমিত করিতে পারে নাই ; তিনি দেশের জন্য শেষ পর্য্যন্ত বীর-ধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নিজে যশস্বী হইয়া নিজের দেশ যশোহরকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জলদান পুণ্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কীর্ত্তিকাহিনী চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীর্ত্তির পরিণাম

সীতারামের পরিবারবর্গ॥ সীতারাম যখন ধৃত হন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর শ্যামগঞ্জের বাটীতে,[১] এবং দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডে ছিলেন। তাঁহারা মহম্মদপুরে আসিবার অধিকার পান নাই। সীতারামকে বন্দী করিয়া দয়ারাম রায় প্রস্থান করিলে, বক্স আলি খাঁ ভূষণায় গিয়া ফৌজদারের কার্য্য করিতে থাকেন। মোগল সৈন্যেরা মহম্মদপুর লুট করিয়া লইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে অধিবাসিগণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াছিল। বক্স আলি যুদ্ধান্তে প্রজাদিগের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি সকল প্রজাকেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিবার জন্য পরওয়ানা জারি করিয়া দেন। সকলেই মনে করিতেছিল, হয়ত সীতারাম পুনরায় স্বরাজ্য ফেরত পাইবেন, এজন্য আশার আশ্বাসে অনেকদিন কাটাইল। সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণও হরিহরনগর হইতে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়া কিছুদিন গুপ্তভাবে ছিলেন, পরে বক্স আলির অভয়বাণী পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। শ্যামগঞ্জ বা সূর্য্যকুণ্ডের বাটীর উপর তখন কোন অত্যাচার হয় নাই। কেবল মাত্র একদল মোগল সৈন্য মহম্মদপুর দুর্গের শ্মশান-পুরীর প্রহরী হইয়া থাকিল।

সীতারামের প্রথমা পত্নীর কোন খবর নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীর মত তিনি

১ এই স্থান মহম্মদপুরের উত্তর-পশ্চিমে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও পরিখা, বিস্তীর্ণ রাজবাটির ভগ্নাবশেষ ও দীঘি আছে। লোকে বলে ১১টি চক ছিল, ভগ্নস্তূপ যেরূপ ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাতে উহা অসম্ভব বোধ হয় না। শ্যামসুন্দরের তিন স্ত্রী এবং উহাদের স্নানার্থ পার্শ্ববর্ত্তী দিগ্‌নগরে তিনটি বড় পুষ্করিণী ছিল। কোন রাণী নাকি ধান্যের চাষ আবাদ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এজন্য অন্দরের মধ্যে যে স্থানে ধান্যচাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাকে এখনও 'বিল বাড়ী' বলে। নল্‌দী পরগণার মধ্যবর্ত্তী শ্যামগঞ্জ নাটোরের অধিকারে আসে, পরে সে রাজ্যের পতন হইলে ঐ পরগণা পাইকপাড়ার রাজগণের হস্তগত হয়। তাঁহাদের নিকট হইতে নীলকর টমাস ব্রে সাহেব (Thomas Brae) পত্তনী লইয়া নীলের কারবার করেন। শ্যামগঞ্জে এখনও কুঠির ভগ্নচিহ্ন আছে। নীল বিদ্রোহের পর ব্রে সাহেব এই স্থান হাইকোর্টের উকীল প্যারিমোহন গুহের মাতা হরদুর্গা দাসীকে দরপত্তনী দেন এবং তিনি উহা ধূলবুড়ীর ইন্দুভূষণ বসু মহাশয়কে সেপত্তনী দেন। ইন্দুভূষণ অল্পমূল্যে সমস্ত সম্পত্তি স্থানীয় সাহাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

নিরুদ্দেশ হইতেও পারেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাণী কমলা অত্যন্ত অনুরক্তা এবং প্রকৃত রাজমহিষী ছিলেন; তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। সর্ব্বশেষে তিনি দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, এবং প্রবাদ আছে, তিনি জলে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু বলিতে পারা যায় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৬০৩ পৃ) শেষযুদ্ধের পূর্ব্বে একদিন রাত্রিযোগে সীতারামের পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিয়া নৌকাযোগে দূরবর্ত্তী স্থানে প্রস্থান করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কিছু ধনদৌলত ছিল। উঁহারা যে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন দপ্তর হইতে জানা যায়, মুর্শিদকুলি খাঁ কোন সূত্রে এই পলায়নের খবর পান। তাঁহার আদেশে হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানির প্রেসিডেণ্টের নিকট সংবাদ দেন যে, সীতারাম রায়ের পরিবারবর্গ ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ লইয়া কলিকাতায় গুপ্তবাস করিতেছেন; কোম্পানির লোকেরা যেন অতি সত্বর উঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করেন।[১] এ সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় নাই, তবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার মৃত্যু রটনা করা হয়। ইংরাজ কোম্পানি জাফর খাঁকে বড় ভয় করিতেন, কারণ তিনি উঁহাদের প্রতি বড়

১ "Letters and messengers from Meir Nassir, Governor of Hugly, acquaint us, that Duan Jaffurcaun has received information and believes that the Family of Seeteram, late Jemeendaree of Boosna, ly concealed in our Town (Calcutta) and pretends to suppose that they have Thirty Lacck of Rupee with them which he will demand of us for the Kings use if we conceal and protect them, Meir Nassur therefore perswades us as a friend to make diligent search and deliver them up with all that belongs to them if they are found, for Seettaram being executed by the Duans order for Murder and Rebellion all his Effects belong to the King."—Consultation No. 837 (subject, Seetaram, a fugitive landholder concealed in Calcutta), 1713-14.—Wilson, *Early Annals of the English in Bengal*, Vol. II, 1900, p. 166, 'কলিকাতা, সেকালের ও একালের,' ৪২২-২৩ পৃ। সীতারামের মৃত্যু যে ১৭১৪ অব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে হইয়াছিল, তাহা সনন্দ হইতে আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সীতারামের মৃত্যুর পরবর্ত্তী মার্চ মাসে এই ঘটনা হইলে, উহা ১৭১৫ অব্দে পড়ে, কিন্তু কোম্পানির দপ্তরে ১৭১৩-১৪ অব্দের বিবরণী মধ্যে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। সুতরাং সীতারামের মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবারবর্গ ধৃত হন।—'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস'—৩৮৭ পৃ।

বিরক্ত ছিলেন, সুযোগ পাইবামাত্র বাণিজ্য ব্যবসার সূত্রে উঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন। সুতরাং মীর নাসিরের আদেশ প্রতিপালন না করিলে, নবাব যে কোম্পানির উপর উৎপীড়ন করিবার নূতন ছল খুঁজিয়া পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য কোম্পানির লোকেরা সীতারামের পরিবারবর্গকে ধরিয়া দিবার জন্য একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন এবং সকলে মিলিয়া উঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অবশেষে কোম্পানির অধীন গোবিন্দপুরের পাটোয়ার বা গোমস্তা রামনাথের বাড়ীতে উক্ত পরিবারবর্গের সন্ধান পাওয়া গেল।[১] রামনাথ উঁহাদের সম্পর্কিত আত্মীয় ছিলেন। তৎক্ষণাৎ হুগলীর ফৌজদারের নিকট সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি সাহেব রায় নামক একজন কর্ম্মচারীকে কতকগুলি বরকন্দাজসহ কলিকাতায় পাঠাইলেন। সকলের সম্মুখে উঁহাদিগকে ধরা হইল এবং কাজির উপস্থিতিতে প্রাপ্ত জিনিসপত্র ও ধনরত্নের তালিকায় উপযুক্ত সাক্ষীর দস্তখত করান হইল, পাছে নবাব কোম্পানির লোকের উপর কোন সন্দেহ করেন। ১৭১৪ অব্দের ৫ই মার্চ তারিখে সীতারামের পরিবারদিগকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া নৌকাযোগে হুগলী পাঠান হইল; ৭ই তারিখে প্রহরীরা ফিরিয়া আসিয়া নিরাপদে পৌছাইবার সংবাদ দিল এবং মীর নাসিরের সন্তুষ্টির কথা বলিল।

মীর নাসির অবিলম্বে উঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তখনও সীতারাম কারাগারে জীবিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পিত হইবে কিনা

১ "The encouragement of 100 Rupees reward promised prevailed with two needy Persons to discover that Seeterams Family were concealed by Ramnaut, our Puttwarre, at Govindpur the men in his own House and the Weomen at another Place the President therefore sent two Trusty Servants and ten Peons along with the informers who found and brought away two Sons and a Daughter, all small Children, of Seeterams also six Women of his Family and four men Servants they also brought away Ramnaut, our Puttwarree who by concealing and harbouring them endangered vast prejudice to our affairs in Bengall for the Duan Jaffurcaun seeks all occasions possible to imbroyle all the European Traders and has lately found means to Squeeze the French and Dutch tho' we have hitherto baffled his endeavours against us."—Consultation No. 838, Fort William, 1713-14—Wilson, *Annals*, Vol. II, pp. 167.

তদ্বিষয়ে কথাবার্ত্তা উঠিয়াছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ উক্ত পরিবারবর্গের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, মুর্শিদকুলি খাঁ কাহারও পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল ; 'তিনি তাঁহার একমাত্র বিবাহিতা পত্নীতে অনুরক্ত ছিলেন।'[১] দ্বিতীয়তঃ, 'তারিখ্-বাঙ্গালা' হইতে দেখা যায়, তিনি সীতারামের পরিবারবর্গকে মহম্মদাবাদে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন ; ইহার অর্থ এই যে, সীতারামের পরিবারবর্গ নবাবপক্ষীয় লোকের দৃষ্টির অধীন হইয়া মহম্মদপুরেই ছিল। তৃতীয়তঃ, মুর্শিদাবাদে সীতারামের সম্মুখে তাঁহার পরিবারদিগের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য আচরিত হইলে, তিনি সেই সময়েই আত্মহত্যা করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই, উহার ৬।৭ মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, আমরা দেখিতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ আরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন, এবং নলডাঙ্গা ও পাইকপাড়ার রাজবংশীয়গণ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[২] সুতরাং স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদ হইতে, অবশ্য নিঃস্ব অবস্থায়, মহম্মদপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়ে হরিহরনগরে বাস করিয়াছিলেন।

এক্ষণে কথা এই, উক্ত পরিবারবর্গ কাহারা ? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেকালের কৌন্সিলের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি, ঐ পরিবারদিগের মধ্যে সীতারামের দুইটি শিশু পুত্র, একটি বালিকা কন্যা, পরিবারভুক্ত ৬টি স্ত্রীলোক এবং ৪ জন পুরুষ ভৃত্য ছিল। সীতারামের পুত্রগণের মধ্যে শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক, তাঁহারা পলায়ন করেন নাই। অবশিষ্ট দুইটি নাবালক

১ 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', ৪৭৩ পৃ, 'নবাবী আমল', ৫৭ পৃ।

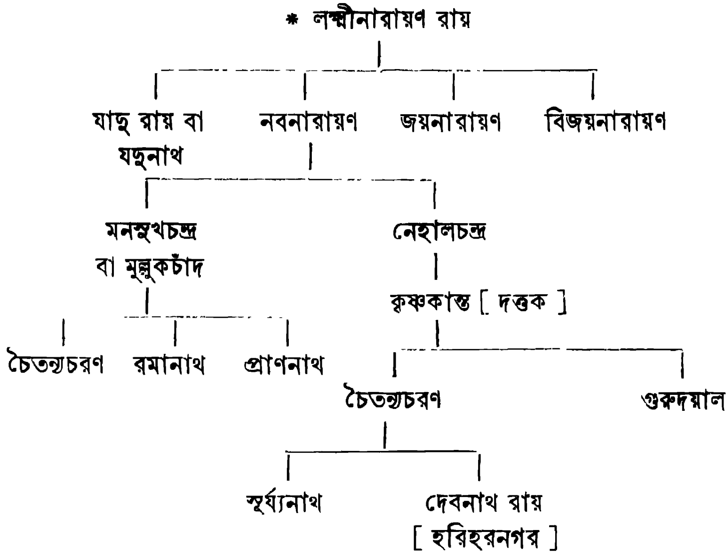
২ স্বনামখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণা ক্রয় করিবার পর সীতারাম রায়ের বংশধরগণের দুর্গতির সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগকে বার্ষিক ১২০০্ টাকা বৃত্তি দেন। সুরনারায়ণের প্রপৌত্র নবকুমারের সময় উহা ৬০০্ টাকা হয়, তাঁহার বৃদ্ধদশায়ও ৩৬০্ টাকা বৃত্তি ছিল। নবকুমারের স্ত্রীও মাসিক ১০্ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্বে নলডাঙ্গা রাজবংশীয়েরা সীতারামের পরিবারবর্গকে বৃত্তি দিতেন।—যদুনাথ, 'সীতারাম,' ২০৩ পৃ।

সীতারামের বংশাবলী

[কাশ্যপদাস বংশীয় রামদাস খাঁ গজদানীর অধস্তন]

উদয়নারায়ণ রায়

- রাজা সীতারাম রায়
  =(ক) ইদিলপুর কন্যা
  =(খ) রাণী কমলা
  =(গ) তৃতীয়া স্ত্রী
  - (খ) শ্যামসুন্দর রায়
    - আনন্দচন্দ্র
      - নিমাই রায় [নিঃসন্তান]
    - কীর্ত্তিচন্দ্র [নিঃসন্তান]
  - (খ) সুরনারায়ণ রায়
    - প্রেমনারায়ণ
      - রাধাকান্ত
        - নবকুমার [নিঃসন্তান]
        - সুন্দরমণি
        - অলকমণি
          =মহেশচন্দ্র দাস [মোক্তারপুর, যশোহর]
          - গিরিশচন্দ্র দাস
            - উমাচরণ দাস [সূর্য্যকুণ্ড, মহম্মদপুর]
              - কৃষ্ণকান্ত [দত্তক]
              - বগলা
                - কান্তিচন্দ্র
                - কিরণচন্দ্র
                - কেশবচন্দ্র
              - সুরবালা
  - (গ) বামদেব
  - (গ) জয়দেব
- * লক্ষ্মীনারায়ণ রায় [হরিহরনগর]
- কন্যা =রঘুনাথ দাস
- কন্যা =গোপেশ্বর খাঁ



পুত্র, বামদেব ও জয়দেব এবং তাহাদের এক কনিষ্ঠা ভগিনী এবং মাতা অর্থাৎ সীতারামের তৃতীয়া স্ত্রী পলায়িতদিগের মধ্যে ছিলেন। অপর পাঁচটি স্ত্রীলোক তৃতীয়া রাণীর আত্মীয়া বা পরিচারিকা হওয়া সম্ভবপর। এই বামদেব ও জয়দেবের বংশ নাই, তাঁহারা বয়স্ক হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। শ্যামসুন্দরের পৌত্র নিমাই রায় বংশহীন হইলে, তাঁহার ধারা শেষ হয়। স্বরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ রাণী ভবানীর নিকট হইতে কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পৌত্র নবকুমার নিঃসন্তান হওয়ায় সীতারামের বংশের পুরুষ-ধারা সেইস্থানে ব্যাহত হইয়াছে। নবকুমারের ভগিনী অলকমণির সহিত যশোহর-মোক্তারপুর নিবাসী মহেশচন্দ্র দাসের বিবাহ হয় ; তাঁহাদের পুত্র গিরিশচন্দ্র দাস সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র উমাচরণের শোচনীয় অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার কন্যার সন্তানেরা এখন সীতারামের শেষ নিদর্শন স্বরূপ সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে আছেন।

সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরেরা এখনও হরিহরনগরে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে দেবনাথ রায় প্রধান বটে, কিন্তু তাঁহার সামান্য সম্পত্তির আয় হইতে বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করা দুষ্কর হইয়াছে। তবুও

নদী মরে, তাহার রেখা থাকে ; অতিথি অভ্যাগত দেবনাথকেই খুঁজিয়া বাহির করে। আমরা পূর্ব্বে সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের যে বংশ-লতিকা দিয়াছি (৫২৭ পৃ), উহা হইতেই দেখা যাইবে যে রামদাস গজদানীর পৌত্র রামগোপালের ধারা মুর্শিদকুলি খাঁর সময় জায়গীর পাইয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণায় বাস করেন। তদ্বংশীয় রামলোচন মুন্সেফরূপে সরকারী কার্য্যে খ্যাতি লাভ করেন এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ বিদ্যা-প্রতিভা ও পদ-গৌরবে প্রাচীন বংশকে সমুজ্জল করিয়াছেন। সীতারামের খুল্লপিতামহ বাসুদেব রায়ের ধারা এক্ষণে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জামালপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

না টো র রা জ বং শ ও সী তা রা মে র রা জ্য॥ শুধু সীতারামের রাজ্য নহে, বঙ্গের এমন বহু জমিদারী করায়ত্ত করিয়া নাটোর রাজ্যের উদ্ভব হয় ; আবার শতাব্দ মধ্যে সেই রাজ্যের পতনারম্ভ হইলে, উহা হইতে বঙ্গের বহু জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সীতারামের রাজ্যের পরিণাম দেখিতে হইলেই আমাদিগকে সংক্ষেপে নাটোরের উত্থান-পতনের আলোচনা করিতে হইবে। কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণমণি নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। তদ্ববংশীয় মতু নামক এক ব্যক্তি মৈত্র উপাধি পান। নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ কামদেব উক্ত মতু মৈত্রের বংশধর। তিনি পুঁটিয়ার রাজা নবনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে তাঁহার অধীন লস্করপুর পরগণার বারুইহাটি মৌজার জনৈক তহশীলদার ছিলেন। কামদেবের তিন পুত্র : রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। উহারা পুঁটিয়ার রাজধানীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। উহাদের মধ্যে মধ্যম রঘুনন্দন সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি কিরূপে অল্প বয়সে পুঁটিয়ার রাজ সরকারের উকীলরূপে ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে অধিষ্ঠান করিয়া ক্রমে কার্য্যদক্ষতা গুণে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া রাজকার্য্যে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

সীতারাম কারাগারে থাকিবার সময়েই তাঁহার জমিদারী প্রত্যর্পিত হইবে, এরূপ কথা উঠিয়াছিল। এমন কি, প্রবাদ আছে, এই উদ্দেশ্যে কোন ক্রমে দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও

নাটোর রাজবংশ

- কামদেব মৈত্র
  - রাজা রামজীবন
    - কালিকাপ্রসাদ [কালু কোঙর]
    - রাজা রামকান্ত [দত্তক] =রাণী ভবানী
      - মহারাজ রামকৃষ্ণ [দত্তক]
        - রাজা বিশ্বনাথ =রাণী কৃষ্ণমণি প্রভৃতি [বড় তরফ]
          - রাজা গোবিন্দচন্দ্র [দত্তক] =রাণী শিবেশ্বরী
            - রাজা গোবিন্দনাথ [দত্তক]
              - মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ
                - কুমার যোগেন্দ্রনাথ
        - রাজা শিবনাথ [ছোট তরফ]
          - রাজা আনন্দনাথ [C. S. I.]
            - রাজা চন্দ্রনাথ
            - রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ
              - রাজা জিতেন্দ্রনাথ
                - কুমার ধীরেন্দ্রনাথ
  - রঘুনন্দন
  - বিষ্ণুরাম
    - দেবীপ্রসাদ

জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে, ঠিক জানা যায় না, অর্থও ব্যয়িত হয়, অথচ জমিদারীও পাওয়া গেল না। রঘুনন্দনের চক্রান্তে এইরূপ ঘটে বলিয়া নিন্দাবাদ আছে। বিষয় বাসনা যে রঘুনন্দনের অত্যধিক মাত্রায় ছিল এবং তিনি ছলেবলে নানাসূত্রে বহুজনের জমিদারী নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে লিখিয়া লইতেছিলেন, ইহা মিথ্যা কথা নহে। তবে সীতারামের জমিদারী পাইবার জন্য তিনি কুটিল পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই, মাত্র পরিণামফল দেখিয়া

যতটুকু অনুমান করা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর মুর্শিদাবাদে থাকিবার সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় এবং তৎপরে তাঁহার জমিদারী খারিজ হইয়া যায়। দুই বৎসর পরে, ফরখ্‌শিয়রের দস্তখতী সনন্দে দেখিতে পাই, 'সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত ভূষণা জমিদারী বিমর্জ্জিম তপ্‌শীল বেশী জমা ও পেস্‌কস্‌ প্রদান স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে।'[১]

১৭২৫ অব্দে রঘুনন্দন নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদও শীঘ্রই তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। রাজা রামজীবন ১৭৩০ অব্দে, রামকান্ত নামক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। দয়ারাম রায় দেওয়ানরূপে সমস্ত রাজ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ সম্পত্তির ।৶০ ছয় আনা অংশ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সমস্ত সম্পত্তিই ১৭৩৪ অব্দে যখন রাজা রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার হস্তে আসে। এই রামকান্তের পত্নীই স্বনামধন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামকান্তের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে, রাণী ভবানীই বিপুল রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী হন। তারা নামক একমাত্র কন্যা ব্যতীত তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান জীবিত ছিল না; দয়ারামের সহায়তায় রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল। অবশেষে রাণী যাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন, তিনিই মহারাজ রামকৃষ্ণ। বাদশাহ শাহ আমল তাঁহাকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর'—এই উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নামে মাত্র মহারাজ; কার্য্যতঃ তিনি সাধক, সর্ব্বদা জপতপ পূজাচর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, সংসার সম্পদকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। প্রকৃত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন স্বয়ং রাণী ভবানী; তিনি যেমন রাজ-নৈতিক কার্য্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, তেমনি দানশীলা, ধর্ম্মগতপ্রাণা আদর্শ হিন্দুরমণী; তিনি বঙ্গের অহল্যা বাই, দানপুণ্যে তিনি সমগ্র বঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। বিশেষতঃ সীতারামের ধর্ম্মকীর্ত্তি সুব্যবস্থিত করিয়া তিনি যশোহরবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে লেখনী পবিত্র হয়, কিন্তু সে সুযোগ

১ 'নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাস', ৫৪৫-৬ পৃ। উক্ত সনন্দের পৃষ্ঠে লিখিত আছে যে, মুর্শিদকুলি খাঁর রোবকারী অনুসারে দৃষ্ট হয় যে, ভূষণার খারিজা জমিদারী জমাবৃদ্ধি ও নজরানা স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাই তাহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জুর করা গেল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অগ্রে বন্দোবস্ত হইয়া যায় এবং পরে সনন্দ আনাইয়া দেওয়া হয়।

এখানে নাই। সীতারাম প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন তাঁহার সম্বন্ধে সেইটুকু মাত্র এখানে বলিতেছি। রামকৃষ্ণ যখন বিশাল রাজ্যকে অনিত্য ভাবিয়া উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতে বসিয়াছিলেন, তখনই এদেশে ইংরাজ-রাজত্ব আরব্ধ হয়। রাণী ভবানী তখন বিপুল সম্পত্তির যেটুকু বারাণসী প্রভৃতি বহুস্থানে দানধ্যানে, বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণে, মন্বন্তরের প্রতিবিধানে অন্নদানে ব্যয়িত করিয়া পরকালের জন্য সঞ্চয় করিতে পারেন, দুইহস্তে তাহা করিতেছিলেন। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। উহার ফলে অধিকাংশ জমিদারেরই বিষয়ের আয় অপেক্ষা রাজস্বের পরিমাণ বেশী দাঁড়ায়; রামকৃষ্ণও সময়মত সমস্ত রাজকর পরিশোধ করিতে পারেন না। সুতরাং নূতন আইন অনুসারে তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে 'লাটের কিস্তী' দিতে না পারায় তাঁহার জমিদারী ক্রমে রাজস্বের নিলামে খণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত হইয়া যাইতে লাগিল।[১] তাঁহার আমলা কর্ম্মচারী, এমন কি, ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় সর্ব্বপ্রধান; তিনি বন্ধু ও অমাত্যরূপে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়া অবশেষে শনির মত সে রাজ্যধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন।[২] নাটোরের সকল জমিদারীর কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা শুধু ভূষণার কথাই বলিব। গল্প আছে, একটি গানের জন্য মহারাজ রামকৃষ্ণ কাদিহাটি পরগণা কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন, এবং ভূষণার অবশিষ্ট অংশ তাঁহাকে ইজারা দেন (১৭৯৩); কিন্তু কালীশঙ্কর ভূষণার আয়বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রজা-

---

১ মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়ে এতই বিরক্ত ছিলেন যে, গল্প আছে, তাঁহার জমিদারীগুলি যেমন লাটে নিলামে চড়িতে লাগিল, তিনি অমনি ৺জয়কালীর বাড়ী সমারোহে পূজা ও বলি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এমন মহাপুরুষকেও কৃতঘ্ন ভৃত্যেরা ফাঁকি দিয়াছিল, ইহাই একান্ত দুঃখের বিষয়।

২ 'His officers, Amla, and even his menial servants robbed him on every side, and accumulated wealth for themselves. Among them Kalisanker Rai, the ancestor of the Narail family, was the principal. He was regarded a friend, philosopher and guide. But he was unfortunately neither a faithful friend, a good philosopher, nor an infallible guide. He was on the contrary a principle of evil introduced into the Nator Raj for its destruction.'—Mitra, Kishorichandra, '*The Rajas of Rajshahi*' (Calcutta Review, 1873, Vol. LVI, p. 15).

পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, দুইবৎসর পরে, ১৭৯৫ অব্দে মহারাজ ভূষণা জমিদারী নিজ নাবালক জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথকে রীতিমত হেবানামা (দানপত্র) লিখিয়া দিয়া দান করেন এবং ঐ বৎসরই সাধককুলগৌরব রামকৃষ্ণ 'বালির শয্যায় কালীর নাম' করিতে করিতে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন।

তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ নাবালক বলিয়া সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৭৮৬) যশোহর পৃথক্ জেলা হইয়াছিল বটে, তখন চাক্‌লা ভূষণা উহার সামিল ছিল না; ১৭৯৩ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূষণা যশোহরের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরনেষ্ট সাহেব (Mr. Earnest) যশোহর হইতে ভূষণার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, উহার রাজস্বাদি নির্দ্ধারণ ও বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজস্ব বাকী পড়িলেও কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে যাওয়ায় জমিদারী নিলাম হইতে রক্ষা পায়। কালীশঙ্করকে সময় দিয়াও তাঁহার নিকট হইতে ইজারার প্রাপ্য আদায় হয় নাই। রাজা বিশ্বনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি লোকসানের সম্পত্তি বলিয়া ভূষণা জমিদাবী গ্রহণ করিলেন না। সুতরাং উহা যেভাবে ১৭৯৯ অব্দে যশোহর কালেক্টরী হইতে খণ্ডে খণ্ডে নিলাম হইয়া গেল, তাহা দেখাইতেছি :

পরগণা	রাজস্ব	নিলামের তারিখ	খরিদ্দার
হাবেলী (ফরিদপুর)	৩৬,৬১৩৲	১৫-২-১৭৯৯	রামনাথ রায়
মকিমপুর	২৫,৩৪৭৲	২৫-২-১৭৯৯	ঐ
নসিবশাহী	১৬,৯৩৭৲	ঐ	ভৈরবনাথ রায়
সা-তৈর	৩৯,৯৬৮৲	২৮-২-১৭৯৯	শিবপ্রসাদ রায়
নল্‌দী	৬৬,৭৬০৲	২৩-৩-১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়

উল্লিখিত খরিদ্দারগণ প্রায় সকলেই বেনামদার, উহাদের নামে মাত্র অন্য ব্যক্তিরা এসব সম্পত্তি ক্রয় করেন। ইহার মধ্যে হাবেলী ফতেহাবাদ এবং নসিবশাহী পরগণা এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে ফরিদপুরের মধ্যে পড়িয়াছে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে মকিমপুর পরগণা কলিকাতা জানবাজারের জমিদার বংশের আদিপুরুষ প্রীতিরাম দাস খরিদ করিয়া লন; তাঁহারই পুত্রবধূ স্বনামধন্যা রাণী রাসমনি।

সা-তৈর পরগণা রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র পালের হস্তে যায়। অত্যধিক দেনার জন্য তিনি উহা রাখিতে না পারিয়া বিক্রয় করেন। তদবধি অর্দ্ধেক শ্রীরামপুরের গোসাঁই-বাবুরা এবং অর্দ্ধেক ফরিদপুরের সাহা-বাবুরা খরিদ করিয়া লন। গোসাঁই-বাবুদিগের কাছারী এখনও মহম্মদপুরে আছে।

নল্‌দী পরগণা সীতারামের মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্য্যন্ত গোলমালের অবস্থায় ছিল ; সীতারামের পুত্রগণ উহার কতক দখল করিতেন, নাটোর-রাজগণ যে কারণেই হউক, জোর করিয়া উহাদিগকে বেদখল করিতেন না। এমন কি, রাণী ভবানীর সময়ে এই পরগণা সীতারামের পৌত্র প্রেমনারায়ণের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইবার কথা হইয়াছিল, প্রেমনারায়ণ এজন্য কয়েকবার নাটোর রাজধানীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ফল হয় না। তবে সীতারামের পুত্র-পৌত্রগণের আমলে এই পরগণার কতক উপস্বত্ব হইতে তাঁহাদের জীবিকা চলিত। রামকৃষ্ণের সময়ে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নল্‌দী পরগণা নাটোরের জমিদারী ভুক্ত হইয়া যায়, তখন রাণী ভবানী কৃপাবশে কিছু ভূসম্পত্তি পৃথক্ করিয়া প্রেমনারায়ণের পুত্রকে দেন। সীতারামের পুত্র বা পৌত্রগণ যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও সনন্দ দেখা যায়, উহার সকল জমিই নল্‌দী পরগণার অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন ভূষণা ইজারা দিতে যাইতেছিলেন, তখন যে বাকী করের দায়ে সে জমিদারী আর বেশীদিন থাকিবে না, তাহা বৃদ্ধা রাণী ভবানী বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির সেবা নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি মৌজা পৃথক্ করিয়া একটি দেবোত্তর মহলের সৃষ্টি করেন এবং উহাই পৃথক্ করিয়া দেবসেবার জন্য উৎসর্গ করেন। ১৭৯৯ অব্দে ভূষণা খণ্ডে খণ্ডে নিলাম হইয়া গেলেও এই দেবোত্তর সম্পত্তি নিলাম হয় নাই। মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর লাখিরাজ ও দেবোত্তর মহল সমস্তই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শিবনাথের হস্তে যায়। বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারিগণই নাটোরের বড় তরফ এবং শিবনাথের ধারাই ছোট তরফ বলিয়া খ্যাত হন। বিশ্বনাথ বা শিবনাথ উভয়েই নিঃসন্তান। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পত্নী রাণী কৃষ্ণমণি যে দত্তক গ্রহণ করেন (১৮১৬), তিনিই গোবিন্দচন্দ্র নামে রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পান এবং তাঁহার

মৃত্যুর পর (১৮৩৬) তৎপত্নী রাণী শিবেশ্বরী রাজা গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাণী ভবানীর মত রাণী কৃষ্ণমণি ও শিবেশ্বরী উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং বিষয়কার্য্য পর্য্যালোচনায় সুদক্ষা ছিলেন। নাটোর রাজবংশেরই একটি বিশেষত্ব এই যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণই অধিকতর প্রতিভাশালিনী। শিবনাথের দত্তক পুত্রগণের মধ্যে রাজা আনন্দনাথ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন এবং পরে 'রাজাবাহাদুর' ও 'সি, এস, আই' উপাধি লাভ করেন। মহম্মদপুরের দেবোত্তর মহল ছোট তরফের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে মোকদ্দমার বিধানমত উহা রাণী শিবেশ্বরীর অংশভুক্ত হইয়া যায়। তদবধি তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ ও পরে গোবিন্দনাথের দত্তকপুত্র মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ঐ সম্পত্তির মালিক হন।

সী তা রা মে র কী র্ত্তি লো প ॥ প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী মহম্মদপুরের দেবোত্তর মহলের সৃষ্টি করিয়া দেব-বিগ্রহগুলির সেবার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার সময়ে দুর্গদ্বারের সন্নিকটে সুরম্য চকমিলান বাড়ী গঠিত হয় এবং উহার মধ্যে তারাদেবীর ইচ্ছানুক্রমে ৺রামচন্দ্র বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়; ঐ সময়ে কানাইনগরেও পৃথক্ মন্দিরে বলরামমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। রাণী ভবানী এই উভয় স্থানের বিগ্রহের জন্য পৃথক্ দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা সীতারামের দেবোত্তরের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জরিপ হইয়া নূতন বন্দোবস্তের তলব হয়। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্ত্তী দেবোত্তর বলিয়া রামচন্দ্রের বৃত্তির মহল বাজেয়াপ্ত হয়। এই সময়ে রাণী কৃষ্ণমণির পক্ষে মহম্মদপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির অছি ম্যানেজার ছিলেন—নড়াইলের রামরতন রায়। এই সময়ে রাজা আনন্দনাথ যখন দেবোত্তর সম্পত্তির পূর্ব্বতন মালিক বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার নূতন বন্দোবস্ত লইবার দাবি করেন, তখন রামরতন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। উহা দেখিয়া রাণী কৃষ্ণমণি রামরতনের হস্ত হইতে দেবোত্তর সম্পত্তি নিজ হস্তে লইয়া তন্মধ্য হইতে পাইকের-ডাঙ্গা, হরেকৃষ্ণপুর প্রভৃতি কয়েকখানি মৌজা মীরগঞ্জের সদর নীলকুঠির মালিক ডম্বল (Durup De Dambal) সাহেবের সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত করেন। বলা বাহুল্য, রাজা আনন্দনাথের দাবি টিকে নাই, রাজা গোবিন্দনাথের পক্ষের অনুকূলেই দেবোত্তর

সম্পত্তির বন্দোবস্ত হয়। তাই উঁহার দত্তকপুত্র সীতারামের কীর্ত্তিলোপের কারণ হইবার স্থযোগ পাইয়াছেন।

সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির মোট আয় ৮০০০৲ টাকা; তন্মধ্যে দেবসেবার জন্য ২৩০০৲ চাকরাণ, সরঞ্জাম ও মোকদ্দমা প্রভৃতির জন্য ৪২০০৲ টাকা ব্যয়িত হইত। অবশিষ্ট আনুমানিক ১৫০০৲ টাকা মাত্র ষ্টেটের লভ্যাংশ ছিল। দেব-সেবার জন্য উৎসবাদির তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব স্থিরীকৃত ছিল, তাহা এই :

দুর্গমধ্যস্থ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ও ৺দশভুজার সেবা···	১,০৩৩৲
৺রামচন্দ্র বিগ্রহের সেবা ··· ···	৬৫১৲
কানাইনগরের ৺হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা ···	৫৯৮৲
গোপালপুরের ৺বুড়াশিবের সেবা ···	৩৬৲
সমষ্টি ···	২,৩১৮৲ টাকা

১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তখন হইতে উহা একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

মহম্মদপুর রাজধানী ছিল; ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলে ইহা একটি বড় সহর, সেখানে যশোহর জেলার সদর মহকুমা স্থাপনের কথা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার পতন আরম্ভ হয়। রাজধানী গৌড়ের যাহা হইয়াছিল, মহম্মদপুরেরও তাহাই ঘটিল, এক ভীষণ মহামারীতে পুরাতন সহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যশোহর হইতে ঢাকা যাইবার যে বড় রাস্তা মহম্মদপুর দিয়া গিয়াছে, ১৮৩৬ অব্দে সেই রাস্তায় মহম্মদপুরে রামসাগর ও হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৫।৭ শত কয়েদী রাস্তার কার্য্য করিতেছিল; হঠাৎ উহাদের মধ্যে এক ভীষণ সংক্রামক জ্বর আরম্ভ হয়। অল্পদিনে ১৫০ কয়েদী কুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ঠিকাদার ও কর্ম্মচারিগণ পলাইয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা কতক ব্যাধির আক্রমণে মরিল, কতক দেশ ছাড়িয়া পলাইল। সাত বৎসর ধরিয়া ভীষণ মহামারী মহম্মদপুর জুড়িয়া বসিয়া উহাকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দিল।[১] এই ভীষণ মহামারী মহম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া ম্যালেরিয়া দস্যুরূপে যশোহরের সব

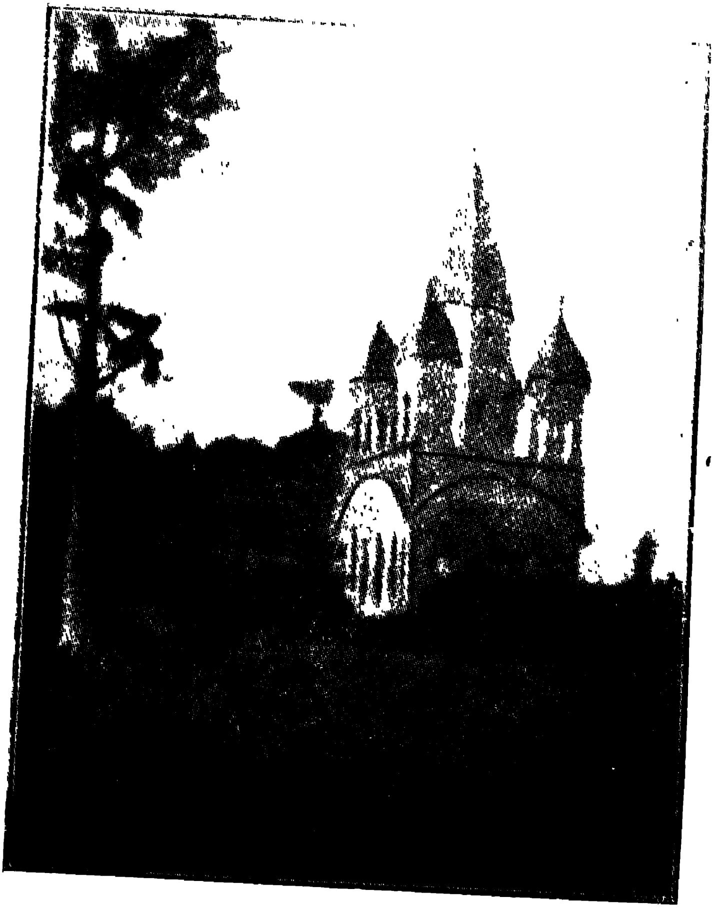
১ Hunter, *Jessore* p. 212.

পুরাতন পল্লী পরিভ্রমণ করতঃ কিরূপে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখন মহম্মদপুরের দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছি। মহামারী আসিবার কয়েক বৎসর পরে দুই চারিঘর পুরাতন অধিবাসী ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে সমৃদ্ধ সহর আর রহিল না, স্থানটি ক্রমশঃ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শূকর-ব্যাঘ্রের আবাস স্থান হইয়া পড়িল। জমিদারদিগের যে সব কাছারী এখানে ছিল, অধিকাংশই স্থানান্তরে উঠিয়া গেল। কীর্ত্তিচিহ্নগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; যাহা বাকী ছিল, শীত-বাত-বজ্রপাতে প্রায় নিঃশেষ করিল। কানাইনগরের অপূর্ব্ব পঞ্চরত্ন মন্দির কিছুদিন পূর্ব্বে রত্নহীন হইয়াছিল; ১৩১৬ সালের ঝড়ে উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় বিগ্রহগুলি রামচন্দ্রের বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। তবুও কিছুদিন ছিল; পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানীর কৃপায় পূর্ব্বোক্ত বিধানে সেবার কার্য্য চলিতেছিল; ব্যাঘ্র-শূকর-সেবিত অরণ্যানী মধ্যে তবুও প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, দূরাগত অভ্যাগতের অন্ন জুটিত, সব গেলেও সীতারামের দেব-সেবা ছিল। মহম্মদপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সীতারামের ভাগ্যদেবতার চরণে ভক্তিভরে নিত্য প্রণত হইয়া ইষ্ট প্রার্থনা করিত, অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়া চরিতার্থ হইত, দর্শক দেবায়তনে আত্মরক্ষা করিয়া প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা লইয়া এক স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিত। সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৩২৫ সালের আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে আমি জনৈক মহম্মদপুরবাসীর নিকট হইতে যে পত্র পাই, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: 'গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ী হইতে বিগ্রহগুলিকে নাটোর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের কর্ম্মচারিগণ, শিবনগরের নায়েব এবং সদর নিকাশ-নবীশ সুধন্বা বাবু প্রভৃতি মহম্মদপুর হইতে কোথায় লইয়া গিয়াছেন, তাহা কেহই এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। শুনিলাম বিগ্রহগুলির কতক বাক্সে প্যাক করিয়া ষ্টীমারে, কতক মুটিয়ার মাথায় দিয়া হাঁটাপথে লইয়া গিয়াছেন। এবং কতকগুলি নাকি মধুমতী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছে!'[১] কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, এই কালাপাহাড়ী দুষ্কীর্ত্তি

---

১ মহম্মদপুরবাসীর হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ সম্বলিত এই পত্র ও সংবাদ ১৩২৫, ৮ই আষাঢ় তারিখে 'যশোহর-পত্রে' প্রকাশিত করিয়া সত্যনির্ণয়ের জন্য ব্যাকুলতা জানাই। কিন্তু মাসাধিক মধ্যেও মৃতকল্প যশোহর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এমন কি, যশোহরের সকল সাধারণ



বনগ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দির, খুলনা



বাঘুটিয়ার মন্দির

মহারাজের মত শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইল; ভাবিলাম এ সংবাদ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু ১৩ই শ্রাবণ তারিখের 'যশোহর' পত্রে যখন সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিলাম, 'সীতারামের বিগ্রহগুলি নাটোর-রাজ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে,' তখন বুঝিতে বাকি রহিল না সীতারামের কীর্ত্তির শেষ কোথায় এবং "রঘুনন্দনী বা'ড়ে"র কোথায় পরিণতি! সত্য সত্যই কি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ স্বীয় নামে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া, মহম্মদপুর অঞ্চলবাসীর হৃৎপিণ্ড নিষ্পেষিত করিয়া, সীতারামের শেষকীর্ত্তি মুছিয়া ফেলিলেন? মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রাণী ভবানীর বংশধর, ব্রাহ্মণকুলতিলক, সমাজপতি, উচ্চশিক্ষিত, প্রবীণ সাহিত্যসেবী, কবিত্ব ও সদ্বিদ্যা-গৌরবে গৌরবান্বিত; তাঁহাকে আর বলিব কি, তবে তাঁহার মত ব্যক্তির সংস্পর্শে এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইলে আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। এই কীর্ত্তি লোপ করিয়া লাভের মধ্যে ত বড় জোর বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা। যে বংশের মহারাজ রামকৃষ্ণ বায়ান্ন লক্ষের জমিদারীর লোভ ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই বংশের দ্বিতীয় মহারাজ আড়াই হাজারের লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না! কালের কি বিচিত্র গতি!

কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরও যখন এই বিষয়ের কোন তথ্যানুসন্ধান বা প্রতিবিধান-চেষ্টায় বিরত রহিলেন, তখন বুঝিলাম যশোহরের পুরাকীর্ত্তির অন্ত্যেষ্টির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইয়াছে। 'যশোহর' পত্রের সম্পাদক মহাশয় (১৩ই শ্রাবণ) প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, একটি কীর্ত্তিসংরক্ষণ কমিটি গঠন করিয়া মহারাজের নিকট আবেদন নিবেদন চলুক, অথবা দেবোত্তর মহলের প্রজাগণ রাজস্ব বন্ধ করিয়া বিগ্রহগুলির প্রত্যর্পণ জন্য চেষ্টা করুন, কিন্তু উহার কোনটিই হয় নাই। রামচন্দ্রের সুন্দর মন্দিরে সেটল্‌মেণ্টের আফিস বসিয়াছিল, অন্য মন্দিরগুলি বন্যজন্তুর বাসভূমি হইয়াছে। সীতারামের কীর্ত্তি আর নাই।

ষট্‌ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম সম্পর্কিত কয়েকটি বংশ

সীতারামের গুরুবংশ॥ শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরদিগের মধ্যে সাত-জন হরিদাসের নাম পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বপ্রধান; তিনি এবং বড় ও ছোট হরিদাস নামক দুই 'কীর্ত্তনিয়া', আর দ্বিজ হরিদাস নামক পদকর্ত্তা—এই চারিজন সমধিক উল্লেখযোগ্য। রাজা সীতারাম দ্বিজ হরিদাসের পৌত্র কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কারণ চৈতন্যদেবের অপ্রকটের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে সীতারাম রাজা হন, তিন পুরুষে দেড়শত বৎসর পার হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায়, বৈষ্ণব সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন; ঈশান নাগর অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, 'সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে, অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে।' দ্বিজ হরিদাস মহাপ্রভুর পার্ষদ হইলে কি হয়, তিনি তদপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং তাঁহার তিরোধানের ৪৯ বৎসর পরে হরিদাসের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণবল্লভেরও বার্দ্ধক্যকালে সীতারাম দীক্ষিত হন।

দ্বিজ হরিদাস কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখটি, নৃসিংহের সন্তান এবং গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে তাঁহার বাস ছিল; এই গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায়, টেঞা-বৈদ্যপুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।[১] নরহরি দাস কৃত প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক ভক্তিগ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখিতে পাই:

> 'দ্বিজহরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে
> দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে।'

কিন্তু তখন দেহত্যাগ করা হইল না; স্বপ্নে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন ধামে যাইতে অনুমতি করিলেন। তিনি যাইবার সময়, নিজ পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে বলিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন যাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা লন। ১৪৩৮ শকে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়; তিনি নীলাচলে যাইবার পূর্ব্বে

১ 'বিশ্বকোষ', ২২ খণ্ড, ৪৮৯ পৃ।

সীতারামের গুরুবংশ

- দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য [সাং কাঞ্চনগড়িয়া]
  - গোকুলানন্দ [সাং টেঞা, মুর্শিদাবাদ]
    - কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী [সাং যশপুর]
      - কৃষ্ণপ্রসাদ
        - কৃষ্ণকিঙ্কর [সাং টেঞা]
          - কৃষ্ণজীবন
            - পরমানন্দ [দত্তক]
              - প্রাণকৃষ্ণ
                - জয়গোপাল
                  - গোপীসুন্দরী [জীবিতা]
        - আনন্দচন্দ্র
          - নন্দমোহন
            - উৎসবানন্দ
              - কৃষ্ণকিশোর
              - গৌরকিশোর
                - বিনোদীলাল
                  - ললিতমোহন প্রভৃতি [জীবিত]
        - মুরলীধর
        - গৌরচরণ
          - রাধামোহন
            - পূর্ণানন্দ
              - মাধবানন্দ
                - বালাইচাঁদ
            - লোচনানন্দ
              - কৃষ্ণসুন্দর
                - হরিলাল
          - রাধাবিনোদ
  - শ্রীদাস [সাং সাটিগ্রাম]

- বাসানন্দ
  - ভারতচন্দ্র
    - সর্ব্বানন্দ
      - ভূদেব গোস্বামী ঠাকুর, [জীবিত]
- সদানন্দ
  - নিত্যানন্দ [অন্ধ]
  - চৈতন্য

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ঘটে। বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব করিয়া তিনি সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই সনাতন ও রূপ গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন (১৪৮০-৮১ শক)। শ্রীনিবাস ১৫০৪ শক পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীজীব

গোস্বামীর কৃপায় বৈষ্ণবশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করতঃ 'আচার্য্য' উপাধি পান, এবং বহু ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। দ্বিজ হরিদাস তখন মুমূর্ষু, তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দীক্ষিত করিবার জন্য শ্রীনিবাসকে অনুরোধ করেন এবং সেই বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হয়।[১]

নিত্যানন্দ দাস কৃত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ 'প্রেম-বিলাসে' আছে :

'কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্য্য।
শ্রীমহাপ্রভুর শাখা সর্ব্ব-গুণে বর্য্য ॥
তাঁর পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস।
শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস।
পিতৃআজ্ঞায় দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস পাশ ॥

* * *

গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়।
তাঁহারে করিলা কৃপা আচার্য্য মহাশয় ॥'

—'প্রেম-বিলাস', ২০শ বিলাস, ৩৫০ পৃ

প্রেম-বিলাস 'একখানি উচ্চ দরের কাব্যেতিহাস' এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা ভিন্ন 'ভক্তি-রত্নাকর', 'নরোত্তম-বিলাস', 'অনুরাগবল্লী' প্রভৃতি গ্রন্থে হরিদাস এবং তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের প্রসঙ্গ আছে। গোকুলানন্দ টেঞা-বৈদ্যপুরে এবং শ্রীদাস সাটিগ্রামে বাস করেন। এই টেঞা-বৈদ্যপুরেই 'পদকল্পতরু' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের নিবাস ছিল। কৃষ্ণবল্লভ বাল্যাবস্থায় সম্ভবতঃ সাবিত্রী-দীক্ষার সঙ্গে আচার্য্যরত্নের কৃপালাভ করেন; পরিণত বয়সে তিনি একজন পরমভক্ত সাধক হইয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার-ভয়ে তিনি দেশত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী যশপুরে আসিয়া বাস করেন। টেঞা হইতে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, পাঠান-দস্যুদিগের হস্তে ঐ মৃত্যু ঘটে এবং সেইজন্যই বৃদ্ধ কৃষ্ণবল্লভ

১ 'গৌরপদতরঙ্গিণী', ৪৫-৪৬, ১৮৮ পৃ।

পৌত্রগণকে লইয়া পলায়ন করেন। ইহা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণবল্লভের ঋষিকল্প মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র সীতারাম দীক্ষা লইতে ব্যাকুল হন। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভের বংশে পূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতীয় শিষ্য ছিল না, এজন্য তিনি সীতারামকে মন্ত্র দিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে সীতারাম নানা কৌশলে ও আন্তরিক ভক্তিতে তাঁহাকে বাধ্য ও তুষ্ট করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং গুরুদেবের মৃত্যুর পরও তাঁহার তুষ্টির জন্য ('কৃষ্ণতোষাভিলাষ') সীতারাম গুরুদেবের নামে কানাইনগরের অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করেন।[১]

সীতারামকে দীক্ষিত করিবার পর কৃষ্ণবল্লভ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, তাঁহার নামে সীতারাম-প্রদত্ত কোন নিষ্কর-সনন্দ নাই। কৃষ্ণপ্রসাদের চারিপুত্র; তন্মধ্যে কৃষ্ণকিঙ্কর ও মুরলীধর পিতামহের মৃত্যুর পর পূর্ব্বনিবাস টেঞা গ্রামে চলিয়া যান; মুরলীধর নিঃসন্তান, কৃষ্ণকিঙ্করের বংশ এখনও আছে। আনন্দচন্দ্র সীতারামের পতন পর্য্যন্ত যশপুরে ছিলেন, পরে পূর্ব্বনিবাসে চলিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ যশপুরে থাকিয়া যান; ঘুল্লিয়া গ্রামে তাঁহার পৌত্র রাসানন্দের বাসস্থান হয়। সেখানে এখনও উঁহার প্রপৌত্র ভূদেব গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় জীবিত আছেন এবং দেশময় লোকের নিকট ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন। ১১০২ হইতে ১১২১ সাল পর্য্যন্ত সীতারাম ও তাঁহার পুত্র প্রদত্ত ভূমিদানের বহু সনন্দ আনন্দচন্দ্র ও গৌরচরণের নামে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।[২] আমি ভূদেব গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গৌরচরণের নামীয় যে দুইখানি প্রামাণিক সনন্দ দেখিয়াছি, তাহা এত জীর্ণ যে শিল্পিগণ উহা হইতে ব্লক প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি :

'ধিরাগ্রগণ্য সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত গৌরচরণ গোস্বামী সদুদারচরিত্রেষু—

১ ১৫০৪ শকের পর গোকুলানন্দ শ্রীনিবাসের শিষ্য হন। তিনি হরিদাসের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র। হয়ত তখনও কৃষ্ণবল্লভের জন্ম হয় নাই। আচার্য্য মহাশয় ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন ধরিলে ১৫৩০ শকের সমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে বালক কৃষ্ণবল্লভকে উপনীত করিলে, ১৫২০ শকে তাঁহার জন্ম ধরা যায়। তিনি যদি নব্বই বর্ষ বয়সে বা তৎপরে সীতারামকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দীক্ষার সময় আনুমানিক ১৬১০ শকে বা ১৬৮৮ খৃঃ দাঁড়ায় এবং তাহা অযৌক্তিক নয়।

২ আনন্দচন্দ্রের নামীয় ১১১৬ সালের একখানি সনন্দের প্রতিলিপি যদুনাথের গ্রন্থে আছে।—২৩৮ পৃ।

লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে সাতৌরের কানোটিয়া ওগয়রহ গ্রাম হায়তে তোমাকে ১৻৩৸ একখাদা পোনার কানি জমীবাটী ব্রহ্মোত্তর দিলাম তুমি মাফীক্ জায় জমীবাটি মজকুরাতে দখিলকার হইয়া পুত্রপৌত্রাদী ক্রমে নিষ্কর ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০২ এগারশত দুই সাল তারিখ—১৩ শ্রাবন।'

সনন্দের উপরিভাগে: 'শ্রীদুর্গা শরণম্' এবং সীতারামের নামের মোহর আছে। তাহার পার্শ্বে 'শ্রীকৃষ্ণঃ' এবং 'এক খাদা পোনারো কানি মজকুরা ইতি' এই কয়েকটি কথায় সীতারামের হস্তলিপি আছে। পূর্ব্বতন হিন্দু জমিদারগণ নিজের নাম দস্তখত না করিয়া শ্রীসহি করিতেন বা ইষ্ট দেবতার নাম লিখিয়া দিতেন। সীতারামের ইষ্টনাম 'শ্রীকৃষ্ণ' অতি সুন্দর পাকা হাতের লেখায় লিখিত। উহা সীতারামের বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। উক্ত স্বাক্ষরের পার্শ্বে মুন্সীর হস্তলিপিতে জমিবাটীর জায় আছে। যথা: 'কানোটিয়া ।৵০ খাজুরা ৶০ পাচুরিয়া ৵০ জাপকাতলা ৻৩৸০ আমগ্রাম ⁄০ আকছিডাঙ্গা ।০ মোট—১৻৩৸'

দ্বিতীয় সনন্দখানি এই:

'ধিরাগ্রগণ্য সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত গৌরচরণ গোস্বামী সদ্দার চরিত্রেষু—লিখনং কার্য্যাঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে নলদীর দীগুলিয়া ওগয়রহ গ্রাম হায়তে ৸০ বারোপাকি জমীবাটী গ্রহণে উৎসর্গ করিয়া তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। তুমি জমীবাটীতে মাফীগ্‌জায় দখিলকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে নিষ্করে ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০৫ সাল তারিখ ১৫ই বৈশাখ।'[১]

এই তারিখে সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিবার বিষয়। দলিলের উপরিভাগে মোহর ও 'শ্রীরাম শরণং' আছে এবং সীতারামের স্বাক্ষরে 'শ্রীকৃষ্ণঃ' ও 'বারো পাকিজমি ইতি' লিখিত আছে এবং পার্শ্বে জমিবাটীর জায় দেওয়া হইয়াছে।[২]

---

১ ['নলদীর দীগুলিয়া'—অনুমিত হয় ইহা মুদ্রাভ্রম এবং দীর্ঘলিয়া, বা দীঘলিয়া বা দীগুলিয়া হইবে। নলদীর অন্তর্গত 'দীঘলিয়া' নামে একটি গ্রাম আছে। মূল সনন্দখানি পুনরায় পরীক্ষা করা সম্ভব হইল না বলিয়া প্রথম সংস্করণে যেরূপ ছিল সেইরূপই রাখা হইল।—শি মি]

২ জমির পরিমাণ বুঝিতে হইলে জানা উচিত, ৩০ কানিতে এক পাখি ও ১৬ পাখিতে এক খাদা হয়। এক খাদার পরিমাণ ঠিক ২৫ বিঘা জমি। এখনও যশোহরের উত্তরভাগে এই

সে না প তি মে না হা তী ॥ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী মুসলমান নহেন, তিনি হিন্দু কায়স্থ। তাঁহার প্রকৃত নাম রামরূপ বা রঘুরাম ঘোষ। তিনি চিরকুমার এবং নিঃসন্তান, এজন্য তাঁহার নাম ও পরিচয় লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার চরিত্র এবং বীরত্বের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে শুধু তাঁহার বংশের পরিচয় দিব। রামরূপ দক্ষিণরাঢ়ীয়, আকনা সমাজভুক্ত বংশজ কায়স্থ। আকনা সমাজের আদি প্রভাকর ঘোষ হইতে বংশধারা এইরূপ : ৬ প্রভাকর—৭ প্রদ্যুম্ন—৮ বনমালী—৯ ভাস্কর—১০ অনন্ত (মহানিয়োগী)। ক্রমান্বয়ে ইঁহারা সকলেই প্রবল মুখ্য কুলীন। এই অনন্তের কনিষ্ঠ পাঁচ ভাই কুলভ্রষ্ট হইয়া পঞ্চপ্রেত আখ্যা পান। হয়ত অনন্তের কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দেরও এইরূপ কোন কারণে কুলনাশ হয়। সেজন্য অরবিন্দের ধারা কায়স্থ-কারিকায় নাই। ১০ অনন্ত—১১ অরবিন্দ—১২ স্থির ঘোষ—১৩ দেবানন্দ—১৪ মহেশ্বর ঘোষ—১৫ রামানন্দ—১৬ হরিনাথ—১৭ বিশ্বনাথ। এই বিশ্বনাথই কোন কারণে যশোহরে আসেন। তাঁহার দুই পুত্র : মহেন্দ্রনারায়ণ ও দুর্ল্লভনারায়ণ। মহেন্দ্রনারায়ণের সন্ততিগণ 'রায়' উপাধিধারী এবং তাঁহারা এখনও চিত্রানদীর কূলে নড়াইলের নিকট আউড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন এবং দুর্ল্লভনারায়ণের বংশধরগণ নবগঙ্গার তীরবর্ত্তী রায়গ্রামে বাস করিতেছেন। দুর্ল্লভের প্রপৌত্র রামরূপই সীতারামের প্রধান সেনাপতি। মহম্মদপুর অবরোধের সময় ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর রায়-গ্রামের বাটীতে একটি অতি সুন্দর জোড়-বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ৺নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পার্শ্বে একটি শিবমন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে জোড়-বাঙ্গালা ও শিবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। শিবমন্দিরে যে শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে, তাহা এই :

'ষষ্ঠবেদাঙ্গ চন্দ্রমে শাকে শ্রীশঙ্করালয়ঃ।
অকারি শঙ্করাখ্যেন ঘোষেনাপি সুভক্তিতঃ॥'
'সন ১১৩১'

ষষ্ঠ=৬, বেদ=৪, অঙ্গ=৬, চন্দ্র=১ ; অঙ্কের বামাগতিতে ১৬৪৬ শক বা

পদ্ধতিতে জমির মাপ হয় এবং তজ্জন্য 'তেরখাদা' 'ষোলখাদা', 'আঠারখাদা' প্রভৃতি গ্রামের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭ বিশ্বনাথ ঘোষ

- মহেন্দ্রনারায়ণ [আউড়িয়া]
  - রামদেব রায়
    - হরেকৃষ্ণ
      - রামমোহন
        - নীলমাধব
          - গোপীচন্দ্র
            - তারকনাথ
              - অমৃতলাল রায় বি, এ [প্রফেসর, নড়াইল কলেজ]
                - সত্যরঞ্জন বি, এ
                - জ্ঞানরঞ্জন বি, এ
- দুর্লভনারায়ণ [রায়গ্রাম]
  - রামেশ্বর ঘোষ
    - রামনাথ
      - রামরূপ [মেনাহাতী]
      - রামশঙ্কর [বড়বাড়ী]
        - ব্রজকিশোর
          - রঘুনাথ
            - হরমোহন
              - ব্রজলাল
        - রামকিশোর
          - কৃষ্ণচন্দ্র
            - লালচাঁদ
              - দ্বারকানাথ
                - হরনাথ
                - প্রসন্নকুমার [সবজজ্]
            - গিরিধর
              - সীতানাথ [ডাক্তার]
          - বদনচন্দ্র
        - রাধাকৃষ্ণ
      - শ্যামরাম [ছোটবাড়ী]

১৭২৪ খৃষ্টাব্দ। ১১৩১ সালেও ঐ একই বৎসর হয়। অর্থাৎ ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সীতারাম ও মেনাহাতীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি বড় সুন্দর, উহাতে এবং জোড়-বাঙ্গালায় যে শিল্প-কলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ঠিক সীতারামের মন্দিরের অনুরূপ এবং দেখিলে ঠিক সীতারামের শিল্পিগণ কর্ত্তৃক রচিত দেবনিকেতন বলিয়া ভ্রম হয়। জোড়-বাঙ্গালার প্রত্যেক বাঙ্গালার বাহিরের মাপ ২৮′×১১′-৫″ এবং মন্দিরের মাপ ১৪′-৪″×১৪′-৪″ ইঞ্চি। রামশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোর

কৃতী লোক ছিলেন, তিনি নাটোর রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং কার্য্যগুণে লোকের নিকট খ্যাতি এবং নিজের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। সম্ভবতঃ মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন লক্ষ্মীপাশার ৺কালীবাড়ীতে আসেন, তখনই ব্রজকিশোর তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসন কালে দশসালা বন্দোবস্তের সময় মহারাজ যে ডৌল বা রাজস্ব-হিসাব দাখিল করেন, তাহা প্রধানতঃ ব্রজকিশোরের গুরুতর পরিশ্রমের ফল। ব্রজকিশোরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকিশোরের প্রপৌত্র সীতানাথ ঘোষ বৈজ্ঞানিক ডাক্তাররূপে বহুরোগ চিকিৎসার নব নব প্রক্রিয়া ও নানাবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া অকাল-মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার পরিচয় স্বতন্ত্র স্থানে প্রদত্ত হইবে। রামকিশোরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রসন্নকুমার সবজজ্ ছিলেন, নবগঙ্গার কূলে তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্য দেখিবার যোগ্য। রামকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র বদনচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। যে বংশাবলী প্রদত্ত হইল, উহাতে তুলনার জন্য আউড়িয়া শাখার মাত্র একটি ধারা দিলাম। আউড়িয়ায়ও প্রাচীন কৃষ্ণ-বিগ্রহের জন্য আধুনিক সুন্দর মন্দির আছে।

উকীল মুনিরাম রায়॥ মুনিরাম কার্ণ্যঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। কান্যকুব্জ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষের পুত্র সুভাষিত বঙ্গজ সমাজে আদিপুরুষ। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র কার্ণ্যঘোষ হইতে বঙ্গজ ঘোষগণের একটি পৃথক্ থাক্ হইয়াছে। বসন্ত রায় কর্ত্তৃক যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, কার্ণ্যঘোষবংশীয় কয়েকজন প্রসিদ্ধ কুলীন রাজবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধসূত্রে বা অন্য প্রকার স্বচ্ছন্দ-জীবিকার প্রলোভনে টাকী-শ্রীপুরের নিকটবর্ত্তী শিবহাটিতে বাস করেন এবং প্রচুর ভূমিবৃত্তি পাইয়া 'রায়' উপাধিধারী হন। এখনও সেখানে তদ্বংশীয়েরা বাস করিতেছেন। রামভদ্ররায় ঐবংশীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহারই পুত্রের নাম মুনিরাম রায়। বংশ-ধারা এইরূপ : ১ মকরন্দ—২ সুভাষিত—৩ চতুর্ভুজ—৪ গঙ্গাধর—৫ শুভ—৬ কার্ণ্য ও কালশী ঘোষ। ৬ কার্ণ্য ঘোষ—৭ পূপী—৮ বিভাকর—৯ ভগীরথ—১০ শ্রীকণ্ঠ—১১ শুভঙ্কর—১২ ত্রিবিক্রম—১৩ শ্রীকৃষ্ণ—১৪ রামভদ্ররায়—১৫ মুনিরাম রায় প্রভৃতি।[১] শিবহাটি নিবাসী মুনিরাম চাকরীর অনুসন্ধানে ঢাকায় যান

১ 'বঙ্গীয় সমাজ', ২০৯ ও ২৯১ পৃ।

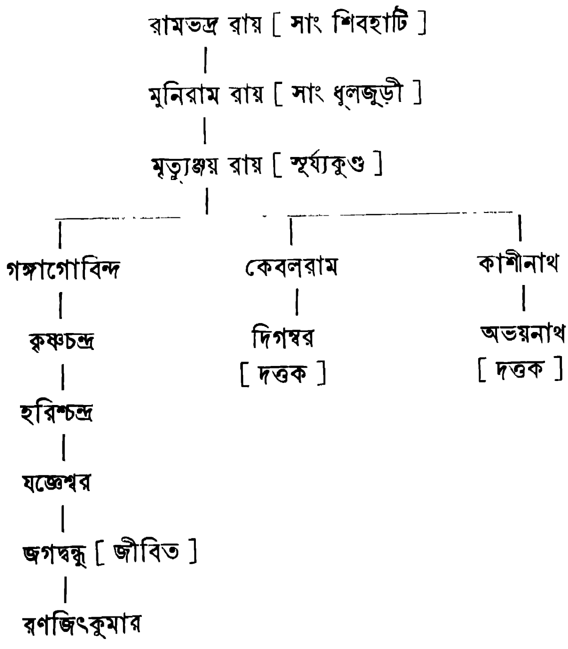
এবং তথায় সীতারামের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি নবাব সরকারে উকীল ছিলেন এবং সীতারাম জমিদার ও পরে রাজা হইলে, তিনি তাঁহার পক্ষীয় উকীলরূপে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে থাকিতেন। আইন বিষয়ে তীক্ষ্ণ প্রতিভা বোধ হয় কার্ণ্যঘোষ বংশের একটি বিশিষ্ট চিহ্ন। হাইকোর্টের জজ্‌ ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ভ্রাতৃদ্বয় মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ এই বঙ্গজ কার্ণ্যকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। মুনিরামও উকীলরূপে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। এমন কি, তাঁহার নামেই নবাব দরবারে সীতারামের পরিচয় হইত। 'কোন্ সীতারাম' এই প্রশ্ন উঠিলে 'যেস্‌কা উকীল মুনিরাম'—ইহাই উত্তর দেওয়া হইত। সীতারামের মত মুনিরামও নবাব সরকার হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং তাহারই বলে তিনি মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করেন। তথায় তিনি নিজ বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল :

'শূন্য চন্দ্র রস ইন্দৌ কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্দিরং।
ইদং কৃতিমুনিরামো রামভদ্রস্য নন্দনঃ॥'[১]

শূন্য=০, চন্দ্র=১, রস=৬, ইন্দু=১ ; উল্টাইয়া লইলে, ১৬১০ শক বা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ হয় (৫৩৩ পৃ)। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহম্মদপুর রাজধানী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে ধুলজুড়ীতে মুনিরামের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুনিরামের সহিত সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে রাজা সীতারাম তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে চান। কিন্তু উচ্চকুলীন মুনিরাম সে প্রস্তাবে রাজী হন নাই। কথিত আছে, মুনিরামের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় নাকি ভগিনীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া জাতিকুল রক্ষা করেন (৫৮৪ পৃ)। শেষ যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, মুনিরাম সীতারামের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কয়েক লক্ষ টাকা দিলে সীতারাম কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এমন কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা কেন হইল না, কেন সীতারামের মৃত্যু ঘটিল, এসব বিষয় ঐতিহাসিকের সম্মুখে সম্পূর্ণ কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম তাঁহার কন্যা

১ মধুসূদন সরকারের 'সীতারাম' প্রবন্ধ, 'নব্যভারত', ১২৯৪, ৪৭৯ পৃ।

বিবাহের প্রস্তাব করিবার পর হইতে, মুনিরাম শত্রুরূপে পরিণত হন; এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সীতারামের শোচনীয় পরিণাম ঘটে।[১] কিন্তু ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সুতরাং রঘুনন্দনকে রেহাই দিয়া মুনিরামের উপর সকল আক্রোশ চাপাইবার কারণ দেখি না। মুনিরামের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; রাণী ভবানীর শাসনকালে তিনি চাক্‌লা ভূষণার নায়েব হন এবং প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তিনিই ধুলজুড়ী ত্যাগ করিয়া কালীগঙ্গার তীরবর্ত্তী সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; তদবধি তদ্বংশীয়েরা 'সূর্য্যকুণ্ডের রায়' নামে খ্যাত। মৃত্যুঞ্জয় নিজবাটীতে শিব ও দশভুজার মন্দির স্থাপন করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ প্রবল প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে 'সূর্য্যকুণ্ডের রায়গণের' সম্পত্তির আয় ৩০ হাজার টাকা দাঁড়ায়। কিন্তু কালের কঠোর গ্রাসে সব চূড়ান্ত হইয়াছে। সূর্য্যকুণ্ডের প্রকাণ্ড বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিষয় সম্পদ উড়িয়া



১ যদুনাথ, 'সীতারাম', ১৬৫-৬ পৃ।

গিয়াছে। কাশীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র জগদ্বন্ধু এক্ষণে মহম্মদপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার সম্পত্তির আয় ৮।৯ শত টাকার অধিক হইবে না। মুনিরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনিরামের বংশে পার্ব্বতীচরণ ও রসিকলাল রায় অপুত্রক অবস্থায় ধূলজুড়ীতে বাস করিতেছেন।

দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার॥ ইনি গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণবংশীয়। যদুনাথের অন্য নাম ছিল পরমেশ্বর। সীতারামের সরকারে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইবার পর, ইনি কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া মহম্মদপুর দুর্গের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামে বাস করেন, এখনও সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাঁহার বাড়ী ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে (৫৫৬ পৃ)। সম্ভবতঃ তিনি দেওয়ানী কার্য্যে খ্যাতিলাভ করিবার পর 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন, তখন উহা বিশেষ সম্মানের উপাধি ছিল। দেওয়ান যদুনাথ যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তেমনি কর্ত্তব্যশীল ও ন্যায়বান কর্ম্মচারী ছিলেন। সীতারামের

কানুটিয়ার মজুমদার বংশ

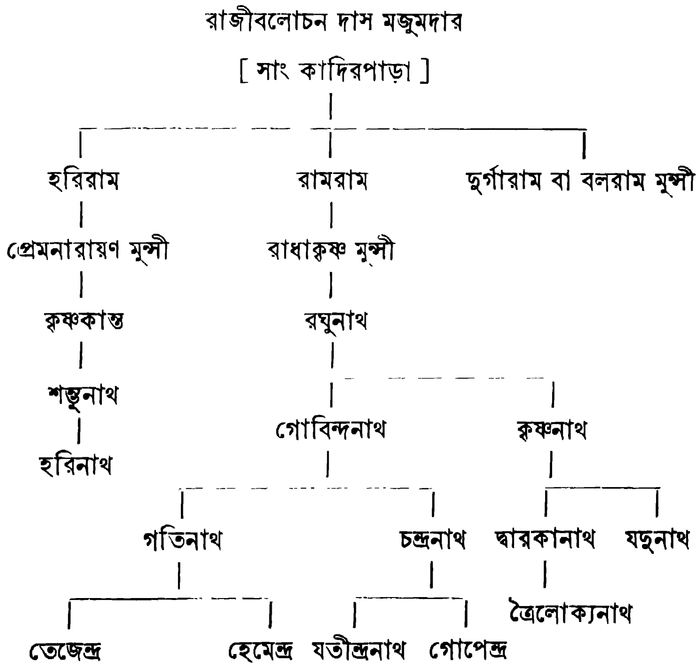
- দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার
  - গিরিধর মজুমদার
    - রামগোবিন্দ
      - কাশীনাথ
        - তারিণীশঙ্কর
          - দুর্গাচরণ
            - আশুতোষ [জীবিত]
            - শ্রীশচন্দ্র [জীবিত]
              - ক্ষিতীশচন্দ্র
      - গুরুপ্রসাদ
        - বিশ্বনাথ
          - জানকীনাথ
            - যোগেন্দ্রনাথ
              - যতীন্দ্রনাথ

অনুপস্থিতি কালে তিনিই তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতেন, আবশ্যক হইলে তিনি যুদ্ধাভিযানে রাজ্যরক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না ; সে দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (৫৬৮ পৃ)। যদুনাথের একমাত্র পুত্র গিরিধরের অন্নপ্রাশন কালে ১১১৪ সালে (১৭০৮ খৃঃ) সীতারাম ভিক্ষাস্বরূপ যে ১০ খাদা বা ২৫০ বিঘা ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাঁহার সনন্দ এখনও কানুটিয়ার মজুমদারবংশীয়-গণের গৃহে আছে। সীতারামের স্বাক্ষর-সম্বলিত ঐ সনন্দের প্রতিলিপি যদুনাথের পুস্তকে ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গিরিধরের পৌত্র কাশীনাথ ও গুরুপ্রসাদ অদূরবর্ত্তী কানুটিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও আছেন। কাশীনাথের প্রপৌত্র আশুতোষ বরীশাট কাছারীর নায়েব এবং গুরুপ্রসাদের পৌত্র জানকীনাথ ৯০ বৎসর বয়সে এখনও জীবিত আছেন।

মু ন্সী ব ল রা ম দা স॥ যখন বল্লাল সেনের সহিত বিবাদ করিয়া বারেন্দ্র কায়স্থ তিলক কর্কট ও জটাধর নাগ যশোহরের অন্তর্গত শৈলকূপা অঞ্চলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন বারেন্দ্র কুলীনত্রয় দাস, নন্দী ও চাকী উঁহাদের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে দাস কুলীনগণের বীজপুরুষ ছিলেন অত্রিগোত্রীয় নরদাস ; কেহ কেহ তাঁহাকে নরহরি বা নরদেব দাস বলিয়াছেন। তাঁহার বংশধরেরা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এবং ভাগ্যের বিবর্ত্তনে নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে শৈলকূপার একাংশে দেবতলায় বাস করেন। নবাব সরকার হইতে কালক্রমে তাঁহাদের 'মজুমদার' উপাধি হয়। বহুপূর্ব্ব হইতে শৈলকূপায় জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত ৺রামগোপাল বিগ্রহের সেবা চলিতেছিল ; এক সময়ে উহার সেবার ভার এই দাসবংশীয় ভবানন্দ বা কৃষ্ণানন্দের উপর ন্যস্ত হয়। তখন তিনি দেবতলায় নিজভবনের পার্শ্বে উক্ত বিগ্রহের জন্য যে সেবাবাড়ী নির্ম্মাণ করেন, তাহার চিহ্ন এখনও আছে। নদীতীরবর্ত্তী দেবতলায় যখন মগফিরিঙ্গিদিগের অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন কৃষ্ণানন্দের পৌত্র রাজীব লোচন সপরিবারে হনু নদীর তীরবর্ত্তী দ্বারিয়াপুর গ্রামে ও পরে কাদিরপাড়ায় সম্পত্তি পাইয়া তথায় আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। রাজীবলোচনের তিন পুত্র : হরিরাম, রামরাম ও দুর্গারাম। তিন ভ্রাতাই বিপুলদেহশালী ও অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা রাজা সীতারামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথিত

আছে, রামরাম ও দুর্গারাম অসীম সাহসের সহিত ডাকাইতদিগের আক্রমণ নিবারণ করায় সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া বিলপাকুড়িয়া নামক একখানি গ্রাম দুই ভ্রাতাকে দুগ্ধ খাইবার জন্য নিষ্কর দান করেন।[১] এই গ্রামখানি পরগণে বেলগাছির অন্তর্ভুক্ত এবং ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি পুলিস ষ্টেশনের অধীন; ঐ গ্রাম এখনও রামরামের নামীয় খারিজা তালুক বলিয়া ফরিদপুরের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ও উহা মুন্সীদিগের দখলে আছে। দুর্গারাম যখন সীতারামের দপ্তরে মুন্সী নিযুক্ত হন, তখন সীতারাম বা তাঁহার গোস্বামী গুরু মহাশয় আদর করিয়া উহাকে বলরাম বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি দুর্গারাম দাস মজুমদার মুন্সী বলরাম দাস বলিয়া খ্যাত। বলরামের হস্তলিপি যেমন সুন্দর, চরিত্র তেমনই মধুর; তিনি যেমন বিশ্বাসী, তেমনই কর্ম্মদক্ষ। সীতারাম

মুন্সী বলরামের বংশ



১ যদুনাথ, 'সীতারাম', ৬৯ পৃ।

প্রদত্ত প্রায় সকল সনন্দে মুন্সী বলরামের শ্রীসহি দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম নিঃসন্তান; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিরাম ও রামরামের বংশধরগণ এখনও মুন্সী উপাধিধারী হইয়া সম্পত্তিশালী তালুকদাব রূপে কাদিরপাড়ায় বাস করিতেছেন।

মহাত্মা নরহরি দাস হইতে বংশধারা এইরূপ: ১ নরহরি—বিদ্যানন্দ—কাশীশ্বর—কংসারি—বলাইরত্ন—৬ কৃষ্ণানন্দ—৭ জনার্দ্দন—৮ রাজীবলোচন; ইনি প্রথম কাদিরপাড়ায় বাস করেন। কাদিরপাড়ার মুন্সী বংশীয়দিগের প্রদত্ত তালিকা হইতে এই ধারা লিখিত হইল। কিন্তু বল্লাল সেনের সমসাময়িক নরদাস হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত রাজীবলোচন পর্য্যন্ত অন্ততঃ পাঁচশত বর্ষ হয়। উহার মধ্যে অন্ততঃ ১২।১৩ পুরুষ হওয়া উচিত; সেস্থলে আমরা মাত্র আট পুরুষের নাম পাইতেছি। এইজন্য মনে হয় এই তালিকার কোন স্থানে ৩।৪ পুরুষ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। রাজীবলোচন হইতে বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাক্-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ

সত্রাজিৎপুরের সিংহ বংশ॥ ইঁহারা বাৎস্য-গোত্রীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় সিংহগণ বঙ্গের যেখানেই গিয়াছেন, প্রায় সর্ব্বত্রই রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া দেশের ও সমাজের মধ্যে উচ্চ প্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত 'রাম চরিত' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গে পাল রাজগণের সময় উত্তর ও পশ্চিম রাঢ়ের অধিকাংশ এই সিংহ বংশের করায়ত্ত হয়। সেন রাজগণের সময়ে উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে এই বংশীয় কয়েকজন কৌলীন্য লাভ করেন, চাঁচড়ার রাজাদিগের প্রসঙ্গে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি (৪৮৭ পৃ)। এই উত্তর রাঢ় হইতে রাজা কেশব সিংহ দক্ষিণ রাঢ়ে আন্দুল-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন এবং তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহার কৌলীন্য ছিল না, এজন্য তদ্বংশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ মৌলিক শ্রেণীভুক্ত। উঁহারা যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানে উচ্চ কুলীনের সহিত সম্বন্ধস্থাপন এবং স্বজাতি ও সমাজ পোষণের হেতু হইয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করিয়াছেন আন্দুলের সিংহ এ দেশে সাধারণতঃ 'আন্দুলিয়ার সিংহ' বলিয়া পরিচিত। হুগলীর অন্তর্গত মহানাদ, যশোহরে পাঁজিয়া, ভেরচি ও সত্রাজিৎপুরে, খুল্‌নার মধ্যে মাগুরা ও আমাদি প্রভৃতি স্থানে এবং বরিশালের অন্তর্গত রায়েরকাটিতে আন্দুলিয়ার সিংহগণ বাস করিতেছেন।

বারভুঞার অন্যতম, ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম রায় এই বাৎস্য সিংহ-বংশীয় এবং রাজা কেশব সিংহের বংশধর। তিনি কিরূপে ভূষণায় রাজ্য স্থাপন করেন (৪২-৩ পৃ) এবং তৎপুত্র সত্রাজিৎ বা শাহজাদা রায় কিরূপে মোগলের অধীন থানাদার হইয়া কূট-নীতির প্ররোচনায় স্বীয় মরণের পথ প্রশস্ত করেন (৫২৯ পৃ), তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সত্রাজিৎ ভিন্ন মুকুন্দরামের শিবরাম প্রভৃতি আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন। সত্রাজিৎ নবগঙ্গা কূলে নিজনামে সত্রাজিৎপুর নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন (১৬৩৬); শিবরাম মধুমতী তীরবর্ত্তী ইট্‌না (ইত্‌না) গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সত্রাজিতের বংশধরেরা 'সত্রাজিৎপুরের সিংহ' বলিয়া চিহ্নিত; শিবরামের বংশধরগণ 'রায়'

উপাধিধারী আছেন ; কেহ কেহ তাঁহাদিগকে 'ইত্না‌র রায়'-বংশীয় বলিয়া ভুল করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইত্না‌র রায়-বংশীয়েরা রাহা-উপাধিযুক্ত বঙ্গজ কায়স্থ। উঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিতেছি। রাজা সীতারামের রাজত্ব-কালে শিবরাম ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উঁহাদের বংশধরগণ অনেকে সীতারামের সরকারে ও ভূষণার ফৌজদারের অধীন ঢালী সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিতেন। সীতারামের পতনের পর শিবরাম সপরিবারে ভাতুড়িয়ায় পলাইয়া যান এবং কিছুকাল পরে পুনরায় ইত্নায় আসিয়া বাস করেন। সেখানে এখন তাঁহাদের বংশ আছে।

এদিকে সত্রাজিতের প্রাণদণ্ডের পর, তাঁহার বংশের রাজগৌরব ও স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। তাঁহার পুত্র কালীনারায়ণ সিংহ তখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ; তিনি ঢাকার নবাবের অনুগ্রহে চাক্‌লা ভূষণার অন্তর্গত তরফ্ কচুবাড়িয়ার (নল্‌দী পরগণা) জমিদারী স্বত্ব ভোগদখল করিতে থাকেন। কালীনারায়ণের পুত্র রামনারায়ণ অল্পবয়সে মারা গেলে তাঁহার দুই পুত্র থাকে ; জয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রসাদ। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ বরাটের গোষ্ঠীপতি রামহরি গুহ রায়ের কন্যা সরস্বতী দেবীকে বিবাহ করেন এবং উক্ত রামহরির পুত্র রঘুদেব গুহকে তরফ্ কচুবাড়িয়ার অধীন জয়পুর গ্রাম মহাত্রাণ দান করিয়া তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। রঘুদেব প্রায়ই সত্রাজিৎপুরের বাটীতে বাস করিতেন এবং তাঁহারই যত্নে কৃষ্ণপ্রসাদ সত্রাজিৎপুরের ৺মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার জন্য একটি কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দির এখনও আছে। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে উহার জীর্ণ সংস্কার হয়, তাহাতে উহার গাত্রের কারুকার্য্যাদি একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। তবুও সে উচ্চ মন্দির তাহার গঠনসৌষ্ঠব লইয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে ; লোকে বলে, উহা এত উচ্চ ছিল যে, উহার শিখর-কলসী নহাটা হইতে দেখা যাইত। আনুমানিক ১৬২০ শকে বা ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির গঠিত হয়। প্রাচীন জমিদারী-চিঠায় পাওয়া যায়, সত্রাজিৎপুরের বাড়ীতে সিংহদ্বার, জোড়-বাঙ্গালা ও দোলমঞ্চ ছিল ; কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন নাই ; তবে রাবণের পুরীর মত যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। ১৮৭৭ অব্দের ম্যালেরিয়া মড়কে সিংহ-পরিবারের বহু জন কালগ্রাসে পতিত হন।

কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র চতুষ্টয়ের অভিভাবক স্বরূপ

রঘুদেব গুহ সত্রাজিৎপুরে থাকিয়া উহাদের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন।[১] তিনিও অল্পকাল মধ্যে ঐ বাটীতে গুপ্তশত্রুকর্ত্তৃক রাত্রিকালে গোপনে নিহত হন। এই সময়ে সীতারাম রায় একপ্রকার স্বাধীন রাজার মত পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারীগুলি হস্তগত করিতেছিলেন। তখন সিংহদিগের জমিদারীও তাঁহার হস্তগত হয় (৫৬৪ পৃ), তবে তিনি কার্য্যতঃ নাবালকগণের অভিভাবকত্ব করেন মাত্র। সীতারামের পতনের পর ঐ জমিদারী নাটোরের হাতে গেলে, সিংহ-বংশীয়েরা রাজ-সরকারে রাজস্ব দিয়া কচুবাড়িয়া জমিদারী ভোগ করিতেছিলেন। পরে ইংরাজ আমলে নাটোররাজের রাজস্ব অনাদায়ের জন্য উহা নিলাম হইলে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ খরিদ করিয়া লইয়া সত্রাজিৎপুরের সিংহদিগকে উচ্ছেদ করেন। তদবধি সিংহ-বংশ একেবারে হীনদশাপন্ন তালুকদাররূপে সত্রাজিৎপুরে বাস করিতেছেন।

এই সিংহবংশীয়েরা চিরদিনই বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অরাজক দেশে আত্মরক্ষার জন্য রীতিমত সৈন্য রক্ষা করিতেন। বর্গীর অত্যাচার নিবারিত হওয়ার বা পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সিংহগণ সৈন্য পোষণে ক্ষান্ত হন নাই। কৃষ্ণপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র কুঞ্জবিহারীর শেষকাল পর্য্যন্তও সৈন্য ছিল, বল প্রতাপ ছিল, দেশের লোকে উঁহাদিকে ভয় করিতেন। চরিত্রগত কোন বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা বংশধারায় থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণ সুযোগ না পাইলেও অনুকূল পথের অনুসরণ করে। ইংরাজ-আমলেও সিংহ-বংশীয়েরা ফৌজদারী বা পুলিস বিভাগে চাকরী করিতে অত্যন্ত সমুৎসুক এবং সে কার্য্যে অনেকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র

১ রঘুদেব নিজেও প্রভূত বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ভাগিনেয়দিগের একে বীর বংশে জন্ম, তাহাতে আবার মাতুল ক্রম পাইয়াছিলেন। রঘুদেব উহাদিগকে বীরোপযোগী শিক্ষা দিয়াছিলেন। রঘুদেবের নিজবংশের অধস্তন পুরুষেরাও বীরখ্যাতি রক্ষা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে তাঁহারাও অনেকে গবর্ণমেণ্টের পুলিস বিভাগে চাকরী করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্‌স্পেক্টর কেশবলাল গুহের নাম করা যাইতে পারে। তিনি পরে উড়িষ্যা করদ ষ্টেটে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন। বিশবৎসর পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান গ্রন্থকারকে এই ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রঘুদেব হইতে তাঁহার বংশধারা এই: রঘুদেব—রামদেব—রামরাম—মুনিরাম—নীলাম্বর ও পীতাম্বর, নীলাম্বর—মৃত্যুঞ্জয়—কেশব, বনওয়ারী ও হীরালাল।

হীরালাল সিংহ মহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি পুলিস লাইনে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অস্থায়ী পদ লাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং কার্য্যকুশলতায় সে সময়ের একজন অগ্রগণ্য কর্ম্মচারী ছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি শেষ বয়সে চরিত্রমাধুর্য্যে, অমায়িকতায়, সদালোচনায় ও পরোপ-চিকীর্ষায় পল্লীজীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বাংস্য সিংহ-বংশ

- রাজা মুকুন্দরাম রায় [ভূষণা]
  - বাজা সত্রাজিৎ রায় [সত্রাজিৎপুর]
    - কালীনারায়ণ রায়
      - রামনারায়ণ রায়
        - জয়কৃষ্ণ রায়
        - কৃষ্ণপ্রসাদ রায়

সীতারাম সিংহ | লক্ষ্মীনারায়ণ | কৃষ্ণরাম সিংহ | রামসন্তোষ | কৃষ্ণমঙ্গল | কুঞ্জবিহারী সিংহ

- সীতারাম সিংহ
  - গোপাল
    - ভারত
      - শ্যামাচরণ
        - রমাপ্রসাদ
          - রবীন্দ্র প্রভৃতি
        - দেবেন্দ্র [ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়ূরভঞ্জ]
- কৃষ্ণরাম সিংহ
  - রামজীবন
    - কৃষ্ণচন্দ্র
      - গঙ্গাগোবিন্দ
        - দ্বারকানাথ
          - রামব্রহ্ম
            - বিজয়
              - বীরেন্দ্র
- কুঞ্জবিহারী সিংহ
  - নসীরাম
    - রাধাকান্ত
    - শ্রীকান্ত[১]
      - কৃষ্ণধন
        - প্রিয়
          - হেরম্ব
      - কৃষ্ণচরণ
        - হীরালাল সিংহ
          - কন্যা [=উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল]

---

১ [ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দলিলাদি হইতে সত্রাজিৎপুরের সিংহ-বংশীয় শ্রীকান্ত হইতে অন্য একটি ধারা এইরূপ দৃষ্ট হয় · শ্রীকান্ত—উমাচরণ (মধ্যমপুত্র)—মহেন্দ্র—ললিত—নীরদ, ক্ষিরোদ, পুলিন, মণীন্দ্র (বারাকপুর); মণীন্দ্রকুমার অন্যান্য জ্ঞাতিগণসহ সত্রাজিৎপুরের মদনমোহন মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজাদি নির্ব্বাহ করেন।—শি মি]

ইত্‌নার রায় বংশ॥ মধুমতী-কূলে ইত্‌না গ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। ৬।৭ শত বৎসর এখানে লোকের বসতি আছে। ইহার পূর্ব্ব নাম ইট্‌না ; সমস্ত ঘটক-গ্রন্থে এবং দলিল পত্রে ইট্‌না নামই দেখা যায়। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এইস্থানে আখণ্ডল-বংশীয় ভট্টাচার্য্য, রাহা-বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ এবং মজুমদার-উপাধিধারী বঙ্গজ বৈদ্য-বংশ আসিয়া বাস করেন। এই তিন ঘর এখানকার প্রাচীন ভূম্যধিকারী। তন্মধ্যে বীরত্বে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গজ রাহাকুলতিলক পরমানন্দ রায় তাঁহার সমসাময়িক প্রতাপাদিত্য ও মুকুন্দরাম রায় প্রভৃতি ভুঞাগণের সঙ্গে সমপদবীতে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার কথাই এখানে বলিতেছি।

এই বঙ্গজ রাহা কায়স্থগণ শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়। তাঁহাদের বীজপুরুষ কৃষ্ণ রাহা বর্দ্ধমানে বাস করিতেন তৎপরে তদ্বংশীয় দুর্গাবর তেলিহাটি-উজানীর জমিদার বংশীয় শ্রীযুক্ত খাঁ আদিত্যকে কন্যাদান করিয়া এ অঞ্চলে আসেন। দুর্গাবরের পুত্র গোবিন্দ রাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং তিনি জীবিকার জন্য 'নীচ' ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কোন কোন ঘটককারিকায় গোবিন্দ স্পষ্টতঃ 'ঘরামি' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেশীয় প্রবাদেও আছে : 'আগে রায় ছাপ্পর বন্দ, শেষে রায় পরমানন্দ।' গোবিন্দের দুই পুত্র, কুমুদ ও পরমানন্দ। পরমানন্দ নিজ প্রতিভায় স্বীয় কুল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভূষণাধিপতি মুকুন্দরামের একজন সেনাপতি ছিলেন, সেই কার্য্যে প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ করিয়া মকিমপুর পরগণার জমিদার হইয়া বসেন। মুকুন্দ রায় ভূষণায় যে নূতন সমাজ বা পটী গঠন করেন, পরমানন্দ তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন (৫৪৩ পৃ)। মুকুন্দের পতনের পর পরমানন্দ সেই সমাজের একাংশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন এবং ইত্‌নাকে তাহার কেন্দ্র করিয়া বহু বঙ্গজ কুলীন আনয়ন করিয়া তথায় বাস করাইয়াছিলেন। গুহ, ঘোষ, বসু প্রভৃতি ইত্‌না রায়ের আনীত অনেক বঙ্গজ কুলীন রায়ের আশ্রিত ভাবে এখনও ঐ স্থানে বাস করিতেছেন।

মকিমপুর পরগণার অধিপতি হইলে পরমানন্দের 'রায়' উপাধি হয়। সাধারণ লোকে তাঁহাকে রাজা পরমানন্দ বলিত। তিনি যে মকিমপুরের জমিদার ছিলেন, তাহা ১২০৯ সালে যশোহর কালেক্টরীর ৩২৬৫০ নং তায়দাদ হইতে জানা যায়। পরমানন্দ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ভাতশালা নিবাসী (পদ্মনাভ-

ঘোষ বংশীয়) কমললোচন ঘোষের কন্যা দয়াময়ীকে প্রথমা পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।[১] তাঁহার অপর স্ত্রী মধ্যল্য নাগের কন্যা ; এজন্য নিজে উচ্চ কুলীনের কন্যা বলিয়া দয়াময়ীর কিছু গর্ব্ব ছিল। তিনি পতির নিকট যেমন আদর পাইতেন, দশজনেও জমিদার-পত্নীকে 'ঘোষ-দুহিতা' বলিয়া সম্মান করিত। এখনও অনেক পরিবারে বধুকে পিতৃবংশানুসারে পরিচিত ও সম্মানিত হইতে সচরাচর দেখা যায়। রায়-পরিবারের যখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থা, তখন ঘোষ-দুহিতার অভিলাষমত রায় নিবাসের সংলগ্ন স্থানে একটি দীর্ঘিকা খনিত হয় এবং উহার পশ্চিমতীরে একটি সুন্দর শিল্পকলা-সমন্বিত মঠ নির্ম্মিত হয় ; উহার নাম 'ঘোষ-দুহিতার মঠ' এবং এই নাম সর্ব্বজনবিদিত। মঠের গাত্রে যে ইষ্টক-লিপি আছে, তাহা এই :

'শূন্যবেদে শরেন্দৌ চ শাকে মকরগে রবৌ
সপ্তদশোত্তরে বেদে সম্মিতে চ জগদ্‌গুরু-
শ্রীজানেঃ পরিতোষায় শ্রীঘোষদুহিতুর্মঠঃ ॥'

শূন্য=০, বেদ=৪, শর=৫, ইন্দু=১, সপ্তদশোত্তরে বেদে=১৭+৪=২১শে তারিখে। অর্থাৎ ১৫৪০ শকে (১৬১৮ খৃঃ অব্দে) ২১শে মাঘ তারিখে জগদ্‌গুরু শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্য ঘোষ-দুহিতার এই মঠ (স্থাপিত হইল)। মঠটির দক্ষিণ দিকে সদর, উহার ভিতরের মাপ ১৩´×১৩´ ফুট, বাহিরের মাপ ২১´×২১´ ফুট, ভিত্তি ৪´ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৩০´ ফুট। গঠন খুব দৃঢ় এবং গায়ে ও কার্ণিসে বিচিত্র শিল্প-চাতুরী আছে। মাগুরার অন্তর্গত রাইনগরের মন্দির (১৫৮৮ খৃঃ) ব্যতীত এমন সুন্দর প্রাচীন মন্দির যশোহরের পূর্ব্বসীমায় আর নাই। রায়দিগের প্রাচীন বাটী সমেত এই মঠসংলগ্ন ৩১⁄ বিঘা জমি সম্ভবতঃ দেবোত্তরভুক্ত ছিল এবং তজ্জন্যই মকিমপুরের জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ার পরেও উহা এখন পর্য্যন্ত নিষ্করভাবে রায়দিগের ভোগদখলে

১ এই দয়াময়ী কমললোচনের কন্যা বা পৌত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একখানি ঘটক-গ্রন্থে তিনি কমল নয়নের পুত্র শিবরামের কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পদ্মনাভের পৌত্র রাঘব-সুত রমানাথের কমল ও নয়ন নামক দুই পুত্রের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ কমল নিজ কন্যা বা পৌত্রীর বিবাহ দিয়া ইটনায় উঠিয়া আসেন। রাঘবের প্রপৌত্র রামজীবন রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র কমল রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া শিবহাটিতে বাস করেন। শিবহাটি ও ইটনায় ঘোষ বংশ আছে।

আছে। ঘোষ-দুহিতার নামীয় আর একটি মঠ খুল্‌না জেলার মোল্যাহাট থানার অন্তর্গত আটজুড়ি গ্রামে ছিল, উহা এখন নদীগর্ভস্থ।[১]

ঘোষ-দুহিতার গর্ভে পরমানন্দের চারি পুত্র হয়—গোপীকান্ত, মদন, রাজীব ও রূপনারায়ণ। ইহা ব্যতীত নাগ-কন্যার গর্ভজাত আরও চারি পুত্র ছিল। পরমানন্দের দ্বিতীয় পুত্র মদন রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পৌত্র বিজয়াদিত্যকে কন্যাদান করেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (৪৩৫ পৃ)। ইহা ছাড়া যশোহর-রাজবংশের সহিত ইত্‌নার রায়-বংশের আরও অনেক বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল। আখণ্ডল-বংশীয় রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য্যকে জমিদার মদন রায় ১০৪১ সালে (বা ১৬৩৫ খৃঃ) যে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় তদ্বংশীয় শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। গোপীকান্তের প্রপৌত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ইট্‌না-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বপুরুষ রামদেবকে যে ব্রহ্মোত্তর দেন, তাহারও সনন্দ আছে। উহার তারিখ ১১০৫ সাল (বা ১৬৯৯ খৃঃ), যশোহর কালেক্টরীর ১২৮৩৬ নং তায়দাদ। সম্ভবতঃ এই নরেন্দ্র রায়ের নিকট হইতে রাজা সীতারাম রায় মকিমপুর পরগণা কাড়িয়া লন। তদবধি ইত্‌নার রায়-বংশ নিতান্ত নির্জ্জীব-ভাবে বাস করিতেছেন। তবে তাঁহাদের সামাজিক সম্মান এখনও আছে। বংশধারা এইরূপ: ১ কৃষ্ণ রাহা—কুবের—গদাধর—বিষ্ণুদাস—অরবিন্দ—রুদ্র—দুর্গাবর—গোবিন্দ রাহা—৯ কুমুদ ও পরমানন্দ রায়। ৯ পরমানন্দ—১০ গোপীকান্ত, মদন প্রভৃতি। ১০ গোপীকান্ত—১১ রামভদ্র—রামগোপাল—নরেন্দ্রনারায়ণ, নিঃসন্তান। ১০ গোপীকান্ত—১১ (অন্য পুত্র) রমাবল্লভ—চন্দ্রনারায়ণ—উদয়নারায়ণ—রামনাথ—কংসনারায়ণ—লক্ষ্মীনারায়ণ—রামপ্রসাদ—দীপচন্দ্র—রাজচন্দ্র। একটি ধারা মাত্র দেখান গেল। ইহার পরেও ২।৩ পুরুষ হইয়াছে।

রা য়ে র কা টি র রা জ বং শ॥ ইহারা বাসুকি-গোত্রীয় সেন-কুলোদ্ভুত দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। ইহাদের আদিনিবাস বর্ত্তমান চব্বিশ-পরগণা

১ বরিশালের অন্তর্গত মাধবপাশা রাজধানীতে একটি 'ঘোষ-দুহিতার দীঘি ও মঠ' আছে। সে ঘোষ-দুহিতা রাজা শিবনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী।

জেলার অন্তর্গত প্রাচীন দ্বিগঙ্গা নগরী।[১] এজন্য ইহারা 'দ্বিগঙ্গার সেন' বলিয়া খ্যাত। দ্বিগঙ্গা নগরী গঙ্গার কূলবর্ত্তী নহে ; ইহা যমুনার এক শাখা পদ্মার তীরে অবস্থিত ছিল। এখন সেখানে কয়েকটি দীঘি ও ঢিপি ব্যতীত অন্য কোন ভগ্নাবশেষ নাই। কথিত আছে, আদিশূরের সভায় আগত রমানাথ সেন এই স্থানে বাস করেন। রমানাথের প্রপৌত্র রামনারায়ণ মহারাজ বিজয়সেন দেবের মন্ত্রী ছিলেন। রামনারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীমান্ সেনের সময় দ্বিগঙ্গা বিখ্যাত সহর ও সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীমান্ সেন রমানাথ হইতে ৭ম পর্য্যায় ভুক্ত। ১৩শ পর্য্যায়ে শিবশঙ্কর সেন সুবিখ্যাত পুরন্দর খাঁ কর্ত্তৃক মৌলিক প্রধান বলিয়া গণ্য হন। ইহার পর হইতে সুন্দরবনের অবস্থা বিপর্য্যয়ে প্রতাপশালী সেন বংশীয়েরা দ্বিগঙ্গা ত্যাগ করতঃ যশোহর-খুল্না প্রভৃতি নানা-স্থানে বসতি করেন। তন্মধ্যে রায়েরকাটির রায়চৌধুরী উপাধিধারী রাজন্য-বংশ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কথাই এখানে বলিব। তদ্ব্যতীত যশোহরে সিরিজদিয়া, আফরা, চণ্ডীবরপুর এবং খুল্নায় পীলজঙ্গ, চন্দনীমহল ও বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে বাসুকি-সেনবংশ আছে।

পূর্ব্বোক্ত শিবশঙ্কর সেনের পৌত্র কিঙ্কর সেন মোগল আমলে 'ভুঞা' বলিয়া খ্যাত। ভুঞা কিঙ্কর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ রাঢীয় কায়স্থ মুখ্য কুলীনদিগের ১৮ পর্য্যায়ের একযায়ী বা নির্ব্বাচন-তালিকা স্থির করিয়া গোষ্ঠীপতি মৌলিক বলিয়া সম্মানিত হন। অন্য যে এক কিঙ্কর সেন মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে অসম্মান দেখাইয়া তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়েন এবং কারাগারে লবণ মিশ্রিত মহিষীদুগ্ধ পান করিয়া উদরাময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, ইনি সে কিঙ্কর সেন নহেন।[২] আমরা যে কিঙ্কর সেনের কথা বলিতেছি, ইনি বাদশাহ আকবরের আমলে পূর্ব্ববঙ্গে কতকগুলি পরগণা দখল করেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩৩৭ পৃ)। কিঙ্কর-পুত্র মদনমোহন মহাবীর প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ

১ এই দ্বিগঙ্গা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (১ম সংস্করণ) ১৭১ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। বল্লালী যুগে দ্বিগঙ্গা বা দীর্ঘগঙ্গা বাগড়ী উপবিভাগের একটি প্রধান স্থান ছিল। [তৃতীয় সংস্করণে ১৮১-২ পৃ দ্রষ্টব্য—শি মি]

২ 'বিশ্বকোষ', ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪ পৃ; 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' (নিখিলনাথ), ৩৭১ পৃ; 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস' ৪৮-৯ পৃ। হুগলীর নিকটবর্ত্তী চন্দননগরে এই দ্বিতীয় 'কিঙ্কর সেনের গড়' আছে। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের পর উঁহার মৃত্যু হয়।

করিতে বাধ্য হন। তাহার ফলে মধুদিয়া ও চিরুলিয়া ব্যতীত সমস্ত পরগণাই তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। প্রতাপের পতনের পর, যুবরাজ শাহ্‌জাহান যখন পিতৃবিদ্রোহী হইয়া বঙ্গে আসেন (১৬২২ খৃঃ), তখন মদনমোহন উপহারদ্রব্য সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মোগল সরকারে কার্য্যপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে খেলাত প্রদান করেন। ক্রমে তিনি কার্য্যদক্ষতা-গুণে ঢাকার নবাব বাহাদুরের সুদৃষ্টিতে পড়েন এবং ফৌজদার সুবি খাঁর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের পরগণা সমূহের রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে তিনি নিজপুত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ পরগণার সনন্দ পান। সেলিমাবাদ অতি বিস্তৃত পরগণা ; পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ, উত্তরে বাঙ্গরোঢ়া, পশ্চিমে বাগেরহাট ও দক্ষিণে বুজরগউমেদপুর—এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার রাজস্ব ৪০১৯০৲ ;[১] ফতেহাবাদের নিমকমহল হইতে ইহার উদ্ভব এবং আকবর-পুত্র সেলিমের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়। শ্রীনাথ রায় ভাগ্যবান্ পুরুষ ; তিনি আরও কয়েকটি পরগণা লাভ করিয়া সম্রাট শাহ্‌জাহানের সময়ে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। নথুল্যাবাদে তাঁহার রাজকাছারী, গড় ও দেবমন্দির ছিল। তৎপুত্র শ্রীরাম রায় মগের অত্যাচার নিবারণ করিয়া বীরত্বের পরিচয় দেন। ইঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলেশ্বরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী এক অরণ্যানী আবাদ করিয়া রায়েরকাটি নামে তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং দ্বিগঙ্গা হইতে আত্মীয় পরিবার আনিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। ইনিই রায়েরকাটি রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রমানাথ হইতে রুদ্রনারায়ণ পর্যন্ত ১৯ পুরুষের তালিকা দিতেছি : ১ রমানাথ সেন—পুরন্দর—মাধব—রামনারায়ণ—দিবাকর—ভাস্কর—শ্রীমান্—মালাধর—হরিহর—রামগোপাল—শিবদাস (দৈত্যারি)—যজ্ঞেশ্বর—১৩ শিবশঙ্কর সেন—রত্নেশ্বর—১৫ (ভুঞা) কিঙ্কর সেন—মদনমোহন রায়—রাজা শ্রীনাথ রায়—রাজা শ্রীরামরায় চৌধুরী—১৯ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে রুদ্রনারায়ণের রাজত্বারম্ভ হয়।[২]

রাজা হইবার পূর্ব্বেই রুদ্রনারায়ণ যশোহর-সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া পিতৃগুরু সুবিখ্যাত অবিলম্ব সরস্বতীর নিকট রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন (২৫১ পৃ)।

১ Beveridge, *Bakarganj*, p. 119.

২ 'বাকলা', ২৩১ পৃ।

পরে তাঁহার কুলপুরোহিত ৺রূপরাম চক্রবর্ত্তীর স্বপ্নাদেশ ক্রমে রায়েরকাটিতে পঞ্চমুণ্ডী রত্নবেদীর উপর ৺কালিকা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (১০৫০ সাল)। ঐ স্থানে সাধকপ্রবর রূপরাম সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া ৺মায়ের নাম সিদ্ধেশ্বরী রাখা হয়। কিছুদিন পরে মন্দিরমধ্যে দেবীর উদ্বোধন ক্রিয়া সমাহিত এবং প্রস্তর-লিপি সংযোজিত হয় (১০৬৫ সাল বা ১৬৫৯ খৃঃ)।[১] রুদ্ররাম কাশীধামে দেহত্যাগ করিবার পর তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠ রাজা নরোত্তমনারায়ণ রায়েরকাটিতে থাকেন, মধ্যম রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ বনগ্রামে, তৃতীয় রাজা কন্দর্পনারায়ণ পরগণা কাশিমপুরের অন্তর্গত চিংড়াখালি গ্রামে, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণ পরগণা চিরুলিয়ার অন্তর্গত কোদলা-খাসকাটীতে বাস করেন। কিছুদিন পরে রাজা গন্ধর্ব্ব নারায়ণ কোদলা হইতে উঠিয়া ভৈরব তীরবর্ত্তী মঘিয়া নামক স্থানে বাস করেন।[২] উঁহার বংশধরেরা মঘিয়ার রাজা বলিয়া খ্যাত। এই ভাবে এই প্রসিদ্ধ রাজবংশের জ্যেষ্ঠ মাত্র বরিশাল জেলায় থাকিলেন এবং অপর তিনজন বর্ত্তমান খুল্‌না জেলায় আসিয়া বসতি করেন। শেষোক্ত তিনজনের কথা মুখ্যভাবে আমাদের বর্ণনীয় হইলেও প্রথমজনের কথা প্রসঙ্গতঃ বাদ দেওয়া যায় না; বিশেষতঃ রায়েরকাটির অবস্থান বরিশাল জেলায় হইলেও সামাজিক হিসাবে উহা সম্পূর্ণরূপে খুল্‌না জেলার অংশ বলিয়া ধরা যায়।

নরোত্তমের ঘটনাবিহীন রাজত্বের পর তৎপুত্র সত্রাজিৎ কিছুকাল রাজত্ব করেন এবং বরিশালের সত্রাজিৎপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র জয়নারায়ণ তেজস্বী ব্যক্তি। এই সময়ে বুজরগ্‌উমেদপুরের জমিদার আগা বাখর[৩] জোর করিয়া সেলিমাবাদ দখল করিতে আসিলে জয়নারায়ণের সহিত

১ Beveridge, *Bakarganj*, p. 121, 'বাকলা', ২৩২ পৃ।

২ এই কোদলার একাংশে অযোধ্যা নামক স্থানে একটি উত্তুঙ্গ সুন্দর মঠ আছে। উহাকে সাধারণতঃ কোদলার মঠ বলে। উহার ভগ্নাবশিষ্ট লিপি হইতে জানা যায়, যে মঠটি কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মঠের কথা আমরা বিস্তৃতভাবে স্থানান্তরে আলোচনা করিব। এখানে বক্তব্য এই যে, উহার সহিত রাজা গন্ধর্ব্বের কোদলা-বাসের কোন সম্পর্ক আছে কিনা নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারি নাই।

৩ ইনিই প্রথম নিজ পরগণা বুজরগ্‌উমেদপুরের মধ্যে বাখরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন করেন। করেন। উহা হইতে সমগ্র জেলার নামই বাখরগঞ্জ হইয়াছে।—Beveridge, p. 43.

তাঁহার কয়েকটি রীতিমত যুদ্ধ হয়; শেষ যুদ্ধে জয়নারায়ণ বাখরকে পরাস্ত করিয়া ২২টি কামান জিতিয়া লন।[১] বর্গীর হাঙ্গামার জন্য প্রজা পলাইয়া যাওয়ায় জয়নারায়ণ কিছুকাল নবাবের রাজস্ব সরবরাহ করিতে না পারিয়া ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি জমিদারী ইস্তাফা দিয়া আসেন। কিন্তু তখনকার নিয়ম ছিল, শুধু জমিদারের ইস্তাফা দিলে চলিত না, তাঁহার দেওয়ানকে ঐ ইস্তাফা পত্রে সহি করিতে হইত। এই সময়ে কীর্ত্তিপাশার জমিদার বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণরাম সেন জয়নারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিরূপে মনিবের সম্পত্তি ইস্তাফা করিতে রাজী না হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং পরে স্বীয় অসামান্য উদারতা ও দানশীলতার গুণে শুধু নিজের নিষ্কৃতি নহে, রাজার জমিদারীরও উদ্ধার সাধন করেন, তাহা আমরা অন্য প্রসঙ্গে সমালোচনা করিয়াছি (৪৭৮-৯ পৃ)।[২] জয়নারায়ণ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের একটি তালুক দান করিয়া প্রভুভক্ত দেওয়ানকে পুরস্কৃত করেন। ইহাই কীর্ত্তিপাশার জমিদারীর মূল।

জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়পাত্র পূর্ব্বোক্ত আগা বাখর সেলিমাবাদ গ্রাস করিয়া বসেন। অনেক কষ্টে উহার ।১০ অংশ মাত্র রাজাদের হাতে থাকে। জয়নারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ বাখরের মৃত্যুর পর (১৭৫৮) ইংরাজ গবর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেবের অনুগ্রহে ও কোম্পানির দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের সাহায্যে অবশিষ্ট ৷৶১০ অংশের পুনরুদ্ধার করেন। এই গোকুল ঘোষাল ভূকৈলাস-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শিবনারায়ণ পুরস্কার স্বরূপ গোকুলকে নষ্ট-রাজ্যের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ।/১৫ অংশ দান করেন। গোকুলের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কালীশঙ্কর আরও ৵/১৭৷৹ অংশ খরিদ করেন। সুতরাং এক্ষণে সেলিমাবাদের ৷৷১২৷৹ অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণের হস্তগত এবং ঝালকাটির নিকট গুরুধামে তাঁহাদের সদর কাছারী।

শিবনারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ কতকগুলি জমিদারীর উদ্ধার করেন। তৎপুত্র মাধব ও নরনারায়ণ উভয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। মাধবনারায়ণ যেমন কর্ম্মদক্ষ, কৃতবিদ্য ও ধার্ম্মিক, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণ তেমনি কলাবিদ্যায়

১ 'বাকলা' ২৩৫ পৃ।

২ প্রসিদ্ধ লেখক ৺রোহিনী কুমার সেন কীর্ত্তিপাশা-জমিদার বংশের কৃতী পুরুষ।

(ক) রায়েরকাটির রাজ-বংশ

১৯ রাজা রুদ্রনারায়ণ

২০ রাজা নরোত্তম-নারায়ণ [রায়েরকাটি] | রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ [বনগ্রাম] | রাজা কন্দর্প-নারায়ণ [চিংড়াখালি] | রাজা গন্ধর্ব্ব-নারায়ণ [মঘিয়া]

(রাজা নরোত্তমনারায়ণের পুত্র)
২১ রাজা সত্রাজিৎ | রাজা শূরনারায়ণ

(রাজা সত্রাজিতের পুত্র)
২২ রাজা জয়নারায়ণ

(রাজা জয়নারায়ণের পুত্র)
২৩ শিবনারায়ণ | উদয়নারায়ণ | দুর্ল্লভনারায়ণ | লক্ষ্মীনারায়ণ

উদয়নারায়ণ — কমল — রাজকুমার — যোগেন্দ্র — জিতেন্দ্র

লক্ষ্মীনারায়ণ — গৌর — দুর্গানারায়ণ [দত্তক] — চণ্ডীচন্দ্র প্রভৃতি

২৩ শিবনারায়ণ

২৪ প্রাণনারায়ণ | গোপীচন্দ্র | বিশ্বনাথ | দেবনারায়ণ

২৫ মহেন্দ্রনারায়ণ (প্রাণনারায়ণের পুত্র)

২৬ মাধবনারায়ণ | নরনারায়ণ (মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র)

২৭ গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতি (মাধবনারায়ণের পুত্র) | ভূপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র (নরনারায়ণের পুত্র)

বিশ্বনাথ — রসিক — চন্দ্রনাথ — সত্যেন্দ্রনাথ বি, এল [রায় বাহাদুর]

দেবনারায়ণ — মহেশ — শশিভূষণ — উপেন্দ্রনাথ বি, এ

(খ) বনগ্রাম রাজবংশ

- রাজা নরেন্দ্র
  - রাজা সন্তোষ
    - জয়চন্দ্র
      - রামচন্দ্র =রসমণি চৌধুরাণী
        - বিশ্বেশ্বর
          - ক্ষেত্রমোহন
            - শশিভূষণ প্রভৃতি
          - ভুবনেশ্বর
            - যোগেন্দ্র প্রভৃতি
      - ভৈরবচন্দ্র
        - কাশীশ্বর
          - নকুলেশ্বর [দত্তক]
            - উপেন্দ্র
            - রাজেন্দ্র
      - তিলকচন্দ্র
        - মহিমাচন্দ্র =রাণী কমলকুমারী
        - নবীনচন্দ্র
          - প্রসন্নচন্দ্র
            - যাদবচন্দ্র
              - রমেশ প্রভৃতি

অসাধারণ পারদর্শী। নরনারায়ণ পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গ বাদ্যে সিদ্ধহস্ত ; তাঁহার রচিত অনেকগুলি নূতন বাজ্‌নার গৎ এ দেশে প্রচলিত। তিনি মৃদঙ্গকে যেন কথা কহাইতে পারিতেন ; তাঁহার অঙ্গুলি-সম্পাতে মৃদঙ্গ-মুখে সঙ্গীত ও সংস্কৃত স্তোত্র যেন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত। তিনি নিজ রচিত প্রাণ-স্পর্শী গানে ও বাদ্যযন্ত্রে হরিনামামৃত অনুরণিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত হরণ করিতেন। এই বংশের অপর সকলের মধ্যে রাজকুমার ও দুর্গানারায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য। শিবনারায়ণের এক বৃদ্ধপ্রপৌত্র রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এল পিরোজপুরের খ্যাতনামা উকীল ও জেলার মধ্যে একজন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি। এই রাজবংশের মহিলাগণ দানধ্যান, যাগযজ্ঞ, তীর্থদর্শন ও বিগ্রহ-স্থাপনদ্বারা বহু অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা ত্রিপুরা ও অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রনারায়ণের কন্যা হরসুন্দরীর স্থায়িনী কীর্ত্তি আছে। ত্রিপুরাসুন্দরীর পঞ্চরত্ন মন্দির, অন্নপূর্ণার উত্তুঙ্গ মঠ ও হরসুন্দরীর নবরত্ন মন্দির এখনও সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠাকালীন যাগযজ্ঞের কথা স্মরণপথে রাখিয়াছে।

রায়েরকাটি রাজবংশের খ্যাতি আছে কিন্তু পূর্ব্ববৎ সম্পত্তি গৌরব আর

নাই। কালবশে সকলেই প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র বনগ্রামের রাজবংশের অবস্থা ভাল। স্বর্গীয় রোহিণীকুমার লিখিয়া গিয়াছেন, 'নরেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতিপুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। মহিমাচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী কমলকুমারী চৌধুরাণী বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই রমণী যে প্রকার বুদ্ধিমতী, তদ্রূপ তেজস্বিনী। ষ্টেটের সমস্ত কার্য্যভার কর্ম্মচারিবর্গের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; ইঁহার কার্য্যকুশলতায় অনেক ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার কোন পুত্র নাই; দুইজন দৌহিত্র বর্ত্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্ম্মিক'।[১] এই বংশীয়েরা ক্রিয়াকর্ম্মে, যাগযজ্ঞে ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণে যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়াছেন। একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উঁহাদের ব্যয়ে চলিতেছে। রাজা জয়চন্দ্র ৺কালী প্রতিষ্ঠার জন্য এক অত্যুচ্চ সুন্দর পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন; ঐ মন্দিরের গায়ে ঘুরান সিঁড়ি-যুক্ত একটি গোলাকার স্তম্ভ ছিল। মন্দিরটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বনগ্রামে আরও একটি আধুনিক পঞ্চরত্ন শিব-মন্দির আছে। উহা জয়চন্দ্রের পুত্র রাম-চন্দ্রের পত্নী রসমণি চৌধুরাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ভাল অবস্থায় আছে এবং তথায় নিত্যপূজা হয়। উহার ভিতরের মাপ ১৮´×১৮´ ফুট। রসমণি পতিপুত্রবিহীনা হইয়া তুলাযজ্ঞাদি বহু সৎক্রিয়ায় প্রচুর অর্থব্যয় করেন। মহিমাচন্দ্র বাগেরহাট কাছারীর সম্মুখে প্রকাণ্ড পাকাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

চিংড়াখালি শাখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। সেলিমাবাদের ।১০ অংশ মাত্র রুদ্র রায়ের পুত্রচতুষ্টয়ের পৈতৃক সম্পত্তি। উহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরোত্তম /১৭॥ গণ্ডা এবং অপর তিনজন প্রত্যেকে ৴১৭॥ গণ্ডা অংশ পাইতেন। অবশিষ্ট ॥৶১০ আনার অংশ রায়েরকাটির শিবনারায়ণ নিজে অর্জ্জন করেন। মঘিয়ার ইতিহাসের কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ উহার নামের উৎপত্তি বংশ-বীরত্বের আভাস দেয়। রাজা রুদ্রনারায়ণ যখন চন্দ্রদ্বীপাধিপতি প্রেমনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া আরাকাণী মগ দস্যুদিগকে দমন করিতেছিলেন, তখন একদা

১ 'বাকলা', ২৫১-২ পৃ।

পরাভূত মগেরা নাছিরপুরের জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় লয়। ঐ সংবাদ পাইয়া যখন রুদ্র সসৈন্যে তাহাদিগকে চারিদিকে আটক করেন, তখন মগেরা রাত্রি মধ্যে এক খাল কাটিয়া বলেশ্বর নদে পড়িয়া পলাইয়া যায়। ঐ খাল দিয়া 'মগ্ গিয়া' বলিয়া উহার নাম মগিয়া বা মঘিয়ার খাল এবং উহার উভয়পার্শ্বস্থ স্থান মঘিয়া বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা গন্ধর্ব্বের পুত্র এই মঘিয়ায় আসিয়া বাস করেন। রাজচন্দ্র অল্পবয়সে কিরূপে সাংঘাতিক পীড়ায় মুমূর্ষু দশায় পড়িলে ব্রহ্মাণ্ডগিরি নামক সন্ন্যাসীর[১] কৃপায় তাঁহার প্রাণরক্ষা ও তান্ত্রিকদীক্ষা হয়, তাহা আমরা পাণিঘাটের অষ্টাদশভুজা দেবীর প্রসঙ্গে প্রথমখণ্ডে বিবৃত করিয়াছি।[২] রাজচন্দ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দানশীল নৃপতি ছিলেন। তিনি নিজ এলেকার মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করেন। কথিত আছে, এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট নালিশ হয় এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য এক দল নবাবী সৈন্যও আসে। রাজচন্দ্র বীরপুরুষ, তিনিও সৈন্যাধ্যক্ষ দেবী দেবের সাহায্যে নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সে যুদ্ধে নবাবী সৈন্য সম্পূর্ণ নির্জ্জিত হয়। কিন্তু এই সময়ে পলাশী ক্ষেত্রে সিরাজের পরাজয় ঘটায় রাজচন্দ্রের উপর কোন প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ হয় নাই।

রাজচন্দ্রের দুই রাণীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ প্রেমনারায়ণ ও কনিষ্ঠ ভাগ্যনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যাংশে কনিষ্ঠকে বঞ্চিত করিবার জন্য নবাব সরকারে খাজনা বাকী ফেলেন এবং জমিদারীর অংশ নিলামে বিক্রয় করাইয়া কোম্পানির দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বিনামে খরিদ করেন। কথিত আছে, এই কার্য্য তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের যোগে সম্পন্ন হয়। এই খেলারাম বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। নিলামের পর খেলারাম ভূকৈলাসে গিয়া গোকুল ঘোষালের নিকট হইতে কৌশলক্রমে প্রেম-নারায়ণের জমিদারী নিজপুত্র কালীপ্রসন্নের নামে কোবলা করিয়া লন এবং অবশেষে পূর্ব্ব-বন্ধুকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করেন।[৩] চিরুলিয়া পরগণা এখনও

১ নলডাঙ্গার রণবীর খাঁর দীক্ষাগুরু এবং এই ব্রহ্মাণ্ড-গিরি অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন না। উভয়ের মধ্যে সময়ের প্রভেদ ১৫০ বৎসর।

২ [১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৭৫ পৃ।—শি মি]

৩ 'দ্বিগঙ্গা-রাজবংশম্', ৮ম অধ্যায়, 'বাসুকী-কুলগাথা,' ৫৮-৬৬ পৃ।

খেলারামের বংশধরগণের হস্তগত আছে। ভাগ্যনারায়ণ প্রকৃতই ভাগ্যবান ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি রামা ঠেটা নামক প্রবল দস্যুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দেশের লোককে উৎপাত হইতে রক্ষা করেন।[১] তিনি জলাশয় খনন করিবার কালে যে অপূর্ব্ব পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি পান, তাহা একটি নূতন মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগ্যনারায়ণ স্বয়ং সাধক ছিলেন, তিনি এই মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করিলে দেবীর নাম হয় ভাগ্যেশ্বরী। এই মন্দির এখনও আছে, এবং সম্প্রতি তাঁহার প্রপৌত্র সুকবি হেমচন্দ্র উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যনারায়ণ নিজ পৌত্র আনন্দলালের জন্মবৎসরে (১২২১ সাল) নিজের সিদ্ধত্বের স্মৃতিস্বরূপ, সেই মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান উপলক্ষে, ভাগ্যেশ্বরীর মন্দির সমীপে এক বার্ষিক মেলার প্রবর্ত্তন করেন। উহাই বিখ্যাত 'মঘিয়ার মেলা'; উহা এখন প্রতিবৎসর উক্ত তিথিতে চৈত্র মাসে বসে এবং উহাতে ৩।৪ সহস্র লোকের সমাগম হয়।

(গ) চিংড়াখালি রাজবংশ

- ২০ রাজা কন্দর্পনারায়ণ
  - রাজা মনোহর
    - কৃষ্ণরাম
      - শিবচন্দ্র
        - শম্ভুচন্দ্র
          - গোবিন্দচন্দ্র
            - উমেশচন্দ্র প্রভৃতি
    - রাজনারায়ণ
      - ব্রজনারায়ণ
        - অনুপনারায়ণ
          - রাধানাথ
            - সীতানাথ
          - কৈলাসচন্দ্র
            - দেবেন্দ্রনারায়ণ
        - গম্ভীরনারায়ণ
          - বসন্ত
      - চন্দ্রনারায়ণ
        - নবীন
          - গোপাল ও বিপিন
        - ভারতচন্দ্র
          - কাশীশ্বর ও হরিচরণ

---

১ মঘিয়ার পার্শ্বে 'রাম ঠেটার খাল' এখনও উহার স্মৃতি রাখিয়াছে।

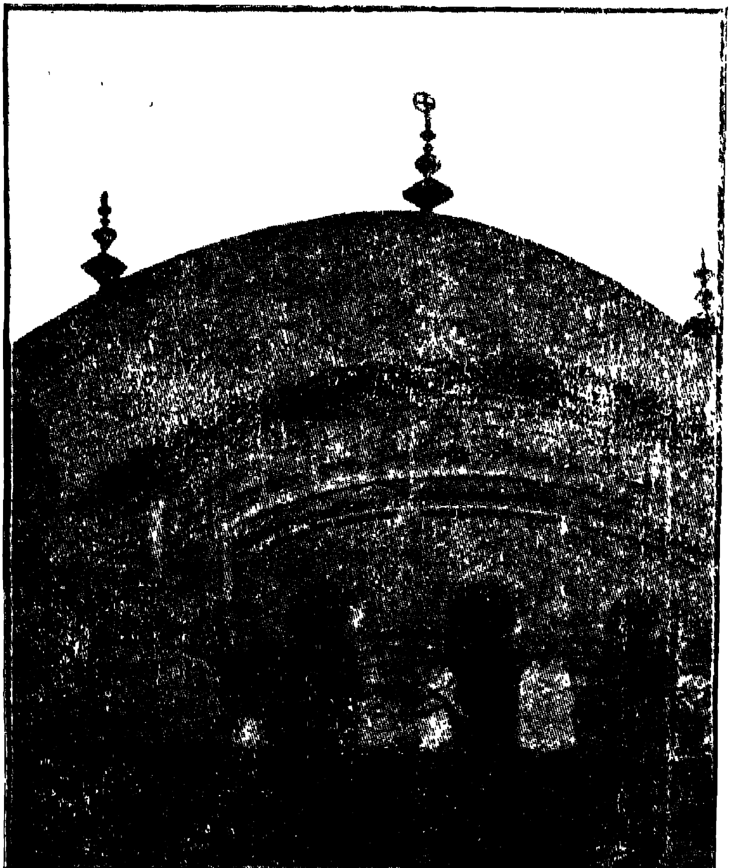
(ঘ) মঝিয়ার রাজবংশ

- ২০ রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণ
  - রাজা রাজচন্দ্র
    - প্রেমনারায়ণ
      - ধর্ম্মনারায়ণ
        - মহিমাচন্দ্র
          - শশিভূষণ
            - রাম ও নরেন্দ্রনারায়ণ
      - কাশীনাথ
        - হরিমোহন
          - ভুবন
        - রাজমোহন
          - যোগেন্দ্র
            - জিতেন্দ্র ও বীরেন্দ্র
    - ভাগ্যনারায়ণ
      - মহেন্দ্র
        - আনন্দলাল
          - রামলাল
            - দক্ষিণালাল
              - সতীন্দ্রনাথ
      - রাধামোহন
        - মদন-মোহন
          - পুলিন
            - সুধীর-কুমার এম,এ
        - উপেন্দ্র-মোহন
          - হেমচন্দ্র
            - বঙ্কিম, অক্ষয় প্রভৃতি
        - রজনী
          - নীরদবিহারী এম, এ

কা ড়া পা ড়া র রা য় চৌ ধু রী বং শ ॥ ইঁহারা গাভ-বসু বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। কান্যকুব্জ হইতে আগত দশরথ বসুর পুত্র পরম বসু বঙ্গজ বসু-বংশের আদি পুরুষ। তৎপুত্র পুষণ বসু বল্লাল সেনের সভায় কৌলীন্য পান এবং তাহা হইতে পর্য্যায় গণনা হয়। পুষণ হইতে ১৪শ পর্য্যায় পরমানন্দ বসু যশোহর-সমাজপতি রাজা বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যশোহরে যান এবং ভূমিবৃত্তি যৌতুক পাইয়া তথায় রাজধানীর সন্নিকটে পরমানন্দকাটিতে বাস করেন (৯৪, ৩৩৮ পৃ)। এখন একটি পুরাতন বাঙ্গালা মন্দির পরমানন্দকাটির সেই আবাস বাটীর নিদর্শন রাখিয়াছে। হাবেলী প্রভৃতি পরগণা জমিদারী পাইয়া পরমানন্দের 'রায়' উপাধি হয় এবং ঘটককারিকায় তাঁহার নাম রাজকুমারী ভবানীর নামে যুক্ত হওয়ায় তিনি ভবানী-পরমানন্দ রায় বলিয়া আখ্যাত হন (১১২ পৃ)। পুষণ হইতে পরমানন্দ পর্য্যন্ত বংশধারা এই : ১ পুষণ—দিবাকর—বাগ্‌ভট—তমোপহ—৫ অর্হপতি—বনমালী—মধুসূদন—মুক্তিরাম—৯ গাভবসু। অর্হপতির অন্য প্রপৌত্র ৮থাক বসু বংশীয় বলভদ্র



কোদ্‌লার প্রাচীন মঠ



শালনগরের জোড়বাঙ্গালা

বসু চন্দ্রদ্বীপের বসু-রাজগণের আদি পুরুষ। বলভদ্রের প্রপৌত্র রাজা কন্দর্প-নারায়ণ বারভুঞার অন্যতম (৪৪ পৃ)। ৯ গাভবসু—হৃষীকেশ—তিনকড়ি—নারায়ণ—১৩ বিদ্যানন্দ কবিরাজ। এই কবিরাজের ১৭ ভ্রাতার মধ্যে একজনের নাম কমলাকান্ত বাচস্পতি। তিনি কাড়াপাড়ার সন্নিকটে বাস করিতেন। জমিদার বংশ ব্যতীত কাড়াপাড়ার অন্য বঙ্গজ-বসুগণ উক্ত কমলাকান্তের সন্তান। বিদ্যানন্দ কবিরাজের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন পরমানন্দ রায়। তিনিই কাড়াপাড়া জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। উঁহারই বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।

কথিত আছে, ভবানী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া অর্থাৎ বসন্ত রায়ের মহিষীদিগের মনোমালিন্য হওয়ায় পরমানন্দ নিজ যৌতুক-প্রাপ্ত হাবেলী পরগণায় বাসাবাটী গ্রামে বাসস্থান করিয়া কিছুকাল বাস করেন।[১] ঐ স্থানে নদীতীরে নানাপ্রকার চোব ডাকাইতের উৎপাত থাকায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়ালবাটী গ্রামে প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীতে বাস করেন। সে স্থানও নিম্ন জলাভূমি বলিয়া পরমানন্দের বংশধরেরা পরে বর্ত্তমান কাড়াপাড়া গ্রামে কাড়া পিটিয়া জঙ্গল কাটিয়া ঘরদরজা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদবধি উহা হাবেলী খালিফাতাবাদের কাড়াপাড়া নামে অভিহিত। পরমানন্দ যে সব পরগণা যৌতুক পান, তন্মধ্যে পরগণা হাবেলী ও রামপুব-শিবপুরের নাম শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য কিরূপে রায়েরকাটির রাজগণের হস্ত হইতে হাবেলী পরগণা জয় করেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩৩৮ পৃ)। বিবাহ সময়েই এই পরগণা প্রদত্ত হয় বলিয়া বোধ হয় না। উঁহারা যশোহর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে এই পরগণা দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ পরমানন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সদ্ভাব ছিল এবং বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার যখন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন হয়ত প্রতাপের

১ বাদশাহ আকবর সুবা বাঙ্গালাকে যে ২৪ সবকারে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে খালিফাতাবাদ অন্যতম। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস খাঁ জাহান আলির প্রসঙ্গে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। সরকার খালিফাতাবাদ ৩৫টি মহলে বিভক্ত, মোট রাজস্ব ৫,৪০২,১৪০ দাম বা ১,৩৫০,৫৩৷০ টাকা। উহার মধ্যে একটি মহলের নাম পরগণা হাবেলী। এই সরকার হইতে পূর্ব্বে বন্যহস্তী ধৃত হইতে এবং লঙ্কা মরিচ সংগৃহীত হইত।—*Ain-i-Akbari* (Jarrett), Vol. II, pp. 123, 134. পারসীক হাবেলী শব্দের অর্থই বাসাবাটী। হাবেলী পরগণার বাসাবাটী গ্রামে প্রথম জমিদারেরা বাস করেন। সাধারণ লোকের মুখে হাবেলী এক্ষণে হাউলী হইয়াছে।

পক্ষভুক্ততার জন্যই পরমানন্দকে যশোহর ত্যাগ করিতে হয়, এবং প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে হাবেলী পরগণা দিয়া প্রত্যন্ত-সামন্তের মত রাজ্যসীমায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১১৩২ সালে (১৭২৬ খৃঃ) এই বংশীয় মুনিরাম, রামকৃষ্ণ ও রঘুনন্দন রায় বসু সকল সম্পত্তির বাটোয়ারা (বিভাগ) জন্য যে মুচলকা-পত্র সম্পাদন করেন, উহা এখনও জীর্ণ অবস্থায় আছে। উহা হইতে জানা যায়, (১) হাবেলী পরগণা, (২) রামপুর-শিবপুর পরগণা এবং (৩) মধুদিয়া, চিরুলিয়া, জামিরা ও বন্দোয়ার প্রভৃতি পরগণাভুক্ত কতকগুলি তালুক—এই বংশের বিভিন্ন জনের নামীয় নানা স্বত্বযুক্ত এই সকল সম্পত্তি একত্র ধরিয়া উহার ।৵৹ অংশ মুনিরাম, ।⁄৹ অংশ রামকৃষ্ণ এবং অবশিষ্ট ।⁄৹ অংশ রঘুনন্দন নিজ নিজ অনুজগণ সহ আপোষে মীমাংসা করিয়া প্রাপ্ত হন। রামপুব ও শিবপুর পরগণা সুন্দর-বনের মধ্যবর্ত্তী প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত। ঐ দুই পরগণাই বিবাহকালে ভবানীকে যৌতুক দেওয়া হয়। অন্যান্য তালুক বা জমিদারীর অশংগুলি পরবর্ত্তী সময়ে অর্জ্জিত হইয়াছিল এবং ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে কর আদায়ের কড়া আইনের ফলে উহা করচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এখন মাত্র হাবেলী পরগণাই তাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি। তবে রামপুর-শিবপুরের জন্য তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু মালিকানা পান। সেই কথাই বলিয়া লইতেছি।

রামপুর ও শিবপুর পরগণা পশর ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্ত্তীস্থানে সমুদ্র-সান্নিধ্যে অবস্থিত। উহারা নিমক-মহল বা লবণ উৎপাদনের প্রধান স্থান ছিল। এজন্য ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশীয় লবণের কারবার একচেটিয়া ভাবে ইংরাজ কোম্পানি নিজ হস্তে লন,[১] তখন জমিদারদিগকে ২০০০৲ টাকা মুনাফা দিবার সর্ত্তে কোম্পানি ঐ দুই পরগণা ইজারা লন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ঐ দুই পরগণার সদর খাজনা দাবি করা হয়, জমিদারেরা উহা যৌতুক সম্পত্তি বলিয়া নিষ্কর মনে করিতেন। কিন্তু সে জবাব গ্রাহ্য না হইয়া উঁহাদের

---

১ "A new system was introduced in September 1780, 'for the provision of salt by agency, under which all the salt of the provinces was to be manufactured for the Company and sold for ready money'"—*Fifth Report*, 1812, (Firminger), 1917, p. 38; Ascoli, *Revenue History*, p. 137. ১৮৭৩ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের এই লবণের কারবার চলিয়াছিল।

কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরী-বংশ

- ভবানী-পরমানন্দ রায়
  - রঘুনাথ
    - মহাদেব
      - রাজেন্দ্র
        - *মুনিরাম [।৵০ অংশ]
          - রামগোবিন্দ
            - গোবিন্দচন্দ্র
              - (১) ভারতচন্দ্র
              - তিলকচন্দ্র
                - বদনচন্দ্র
                  - চন্দ্র
                    - অক্ষয়
                  - রজনী
                    - অবিনাশ
      - রামগোপাল
        - *রামকৃষ্ণ [।/০ অংশ]
          - গঙ্গাপ্রসাদ
            - শম্ভুচন্দ্র
              - হরচন্দ্র
                - পার্ব্বতী
                  - অন্নদা
                    - বামাচরণ
        - রঘুরাম
          - ভাগ্যধর
            - ফকিরচাঁদ
              - আনন্দলাল
                - কুঞ্জলাল
          - *রঘুনন্দন [।/০ অংশ]
            - রামনারায়ণ
              - হরিনারায়ণ
                - কুঞ্জলাল [দত্তক]
                  - কমলাকান্ত
                    - জগদীশ
                      - নকুলেশ্বর প্রভৃতি
      - রামেশ্বর
        - রত্নেশ্বর
          - কন্দর্পনারায়ণ
            - শিবপ্রসাদ
              - কালীপ্রসাদ
                - নবীনচন্দ্র
                  - *নিকুঞ্জবিহারী [রায়সাহেব]
                    - মুরারী, বনবিহারী প্রভৃতি
                  - যোগেশ

(১) ভারতচন্দ্র

- (১) ভারতচন্দ্র
  - *মহিমাচন্দ্র
    - নিবারণ
      - সুরেশ
        - মোক্ষদা
  - রামতারণ
    - *শরচ্চন্দ্র
      - সুধীর
    - পূর্ণচন্দ্র
      - প্রণব
    - যতীশ প্রভৃতি
  - *মাধব
    - হেমচন্দ্র
    - নির্ম্মল
      - বিমল
    - ভূপেশ
    - দীনেশ

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা বাহির হয়। জমিদার মহিমাচন্দ্র রায়চৌধুরী ও তাঁহার দেওয়ান রাখালগাছী নাগ-বংশীয় শ্রীরাম নাগচৌধুরীর সময় এই ঘটনা ঘটে। পূর্ব্বেই জমিদার বংশের সরিকগণ রামপুর-শিবপুরের প্রায় ৷৷/০ নয় আনা অংশ উক্ত নাগ-চৌধুরীদিগের নিকট খণ্ডে খণ্ডে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং রায়চৌধুরী ও নাগচৌধুরীগণ একত্র যোগে জবাব দেন যে, গবর্ণমেণ্ট পরগণা দুইটি ছাড়িয়া দিলে সদর খাজনা দেওয়া হইবে। তখন কমিশনার সাহেব পরগণাদ্বয় ছাড়িয়া দিবার মত প্রকাশ করেন, কিন্তু লাট সাহেব (স্যর রিচার্ড টেম্পল) স্বয়ং সুন্দরবন পরিদর্শনে আসিয়া এই বিষয়েরও তদন্ত করেন। সমস্ত সুন্দরবন বিলি বন্দোবস্ত ও আবাদ না করিয়া অন্ততঃ কাষ্ঠাদির জন্য উহার জঙ্গলাংশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় মত ছিল।[১] তজ্জন্য তদীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মীমাংসা করেন যে, (১) পরগণাদ্বয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে, (২) উহার সদর খাজনা মাপ হইবে এবং (৩) মালিকগণ প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২,০০০৲ দুই হাজার টাকা মালিকানা স্বরূপ পাইবেন। সরিক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হস্তান্তরের ফলে মালিকানার সমস্ত টাকা বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশীদার খুল্‌না জেলার 'Roll of Recipients of permanent Malikana' নামক হিসাব-ভুক্ত হইয়া ট্রেজারী হইতে বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট টাকা পান। প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মালিকানা পাইবার সম্মান সামান্য নহে।

কাড়াপাড়ার এই জমিদার বংশ প্রায় ৩০০ বৎসর খুল্‌নার অধিবাসী। তাঁহারা বঙ্গজ সমাজের বিশিষ্ট কুলীন। এজন্য আরও অনেক বঙ্গজ পরিবার তাঁহাদের কুটুম্ব ও আশ্রিতভাবে কাড়াপাড়ায় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বাস করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, অন্যজাতি ও সমাজের সদ্বংশীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের বাটীতে চাকরীবৃত্তি-সূত্রে হাবেলী পরগণায় আসিয়া বাস করিয়াছেন। কাড়াপাড়ার জমিদারদিগের দেওয়ান বংশীয় বাসাবাটীর নাগ, দশানির বিশ্বাস, কাড়াপাড়ার দত্ত, কৃষ্ণনগরের বসু, ফুলতলার ভঞ্জ প্রভৃতি বংশসমূহ উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে ধনসমৃদ্ধিতে খ্যাতিসম্পন্ন। বর্ত্তমান

১ Buckland, C. E., *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol. II, p. 613.

রাজপুরোহিতগণ এবং অন্যান্য কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণবর্গ এই জমিদারদিগের বৃত্তিভোগী হইয়া এখানে সমাজ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বাস করিতেছেন।

এই বংশে বহু ভাগ্যবান কৃতীপুরুষের জন্ম হইয়াছে। মুনিরাম একজন সাধক বলিয়া খ্যাত। তাঁহার নামে বাগেরহাটের একাংশকে মুনিগঞ্জ বলে, তথায় তিনি মুনিগঞ্জেশ্বরী ৺কালী ও শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদ্বংশীয় ৺মহিমাচন্দ্র রায় একবার উহার সংস্কার করেন ; কিছুদিন হইল দশানি নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় পুনরায় উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। রহিমাবাদে (বয়নাবাজে) যে গোবিন্দগঞ্জ বাজার ছিল, তাহা মুনিরামের পৌত্র গোবিন্দ-চন্দ্রের কীর্ত্তি। বাগেরহাটের বাজার উক্ত গোবিন্দের পৌত্র মহিমাচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের নামে ঐ বাজারের অন্য নাম মাধবগঞ্জ। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে যখন বাগেরহাট একটি সব্‌ডিভিসন হয়, তখন মহিমাচন্দ্র রায় ঐ জন্য ৫৫ বিঘা জমি দান করেন এবং পরবৎসর ঐ স্থানে একটি সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৬৭ অব্দের ভীষণ ঝড়ের পর মহিমাচন্দ্র রায় বিপন্ন জনসাধারণ এবং নিজ প্রজাবর্গকে অকাতরে সাহায্য করেন। এই সকল কারণে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিখ্যাত ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এবং বঙ্গের লাট বীডন মহোদয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন এবং পরে ১৮৭৭ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারতরাজ-রাজেশ্বরী' উপাধি গ্রহণের সময় মহিমাচন্দ্রকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন ('in recognition of his assistance rendered after the Cyclone of 1867, general liberality and interest taken in the promotion of the works of public utility')।

মহিমাচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শরচ্চন্দ্র ও নিকুঞ্জবিহারী রায় সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদেরই সমবেত চেষ্টার ফলে কাড়াপাড়া গ্রামে হাই স্কুল, কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ইঞ্জিনিয়াররূপে কর্ম্মনিপুণতা দেখাইয়া নিকুঞ্জ-বিহারী যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে 'রায়সাহেব' উপাধি ভূষিত করা হইয়াছে। তিনি যেমন সুশিক্ষিত ও সজ্জন, তেমনি বিদ্যোৎসাহী এবং দানশীল ; তিনি যেমন অমায়িক ও সামাজিক, তেমনি নিজের গ্রাম ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত।

গ্রাম্য স্কুলের সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগ ও ব্যয়বাহুল্যে বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কাড়াপাড়ায় হয় এবং সে মহামিলনের কর্ণধার হইয়াছিলেন আমাদের খুল্‌না জেলায় গৌরবস্তম্ভ, জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। উহার কার্য্য বিবরণীর পূর্ব্বাভাষে রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সত্য—'যে সকল সচ্চিন্তা লইয়া তিনি প্রবাসের কঠোরতা মন্দীভূত করেন, দেশে আসিলে কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়কল্পে সেই সকল চিন্তার কর্ম্মাভিব্যক্তি হয়।' ঐ সম্মেলনেই বাগেরহাট কলেজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবনা হয় এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সহযোগিতায় এবং সাধারণ নেতৃবর্গের অমানুষিক প্রচেষ্টায় বৎসর-মধ্যে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। নিকুঞ্জবিহারী হাবেলী পরগণার একটি 'সামাজিক সংঘ' সংস্থাপন করিয়া ঐ পরগণার অধিবাসী শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকে সমবেত করিয়া জনহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কাড়াপাড়া জমিদার বংশীয় পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী সবজজ্ ছিলেন এবং আনন্দলাল রায় চৌধুরী ৩০ বৎসর যাবৎ লক্ষ্ণৌ ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। এই জমিদার বংশের কাহারও 'রাজা' উপাধি না থাকিলেও নিজ পরগণার মধ্যে তাঁহারা রাজার মত সম্মানিত এবং রাজোচিত সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাই এই রাজন্য-পংক্তিতে তাঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মূলঘরের বৈদ্য চৌধুরী জমিদার বংশ॥ ইহারা বঙ্গজ বৈদ্য কুলীন, মৌদ্গল্য গোত্রীয় এবং বিষ্ণুদাসের সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাদের কুলগত উপাধি 'দাসগুপ্ত', নবাব আমলে চাকরীর খেতাব 'বিশ্বাস', 'সরকার' বা 'মজুমদার' এবং জমিদারীলাভের নিদর্শন 'রায়চৌধুরী' উপাধি। বঙ্গজ বৈদ্যদিগের মধ্যে যে ৮ জন বল্লাল সেনের সভায় মুখ্যাষ্টকুলীন বলিয়া চিহ্নিত হন, তন্মধ্যে মৌদ্গল্য গোত্রীয় চায়ূ অন্যতম। চায়ূর বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রজাপতির দুই পুত্র, অরবিন্দু ও বিষ্ণু বিশেষ বিখ্যাত। তন্মধ্যে মূলঘর বিষ্ণুবংশীয়দিগের প্রধান স্থান। তাহার মূল কারণ, এই বংশীয় জানকীবল্লভ জমিদারী লাভ করিয়া তথায় প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেন। চায়ূ হইতে জানকীবল্লভ পর্য্যন্ত বংশধারা দিতেছি: ১ চায়ূ—পুরন্দর—নরসিংহ—নারায়ণ—প্রজাপতি—

৬ বিষ্ণুদাস—শম্ভুদাস—রামদাস—নিমদাস—শ্রীনায়কদাস—১১ জানকীবল্লভ বিশ্বাস ও গোপীবল্লভ প্রভৃতি অন্য ৬ পুত্র।

প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে জানকীবল্লভ মূলঘরে একটি পাঠশালায় সামান্য শিক্ষকতা করিতেন। প্রতাপাদিত্য সুলতানপুর-খড়রিয়া পরগণা দখল করিয়া লইবার পর মূলঘরের প্রজাবৃন্দ জলকষ্টের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করেন। কথিত আছে, তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিবার জন্য জনৈক রাজকর্ম্মচারী, দেওয়ান রামদাস সেখানে আসেন।[১] যোগ্যতার পথ চিররুদ্ধ থাকে না; দৈবযোগে জানকীবল্লভের সহিত উক্ত কর্ম্মচারীর পরিচয় হয়। তিনি উঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হন; তিনি পুষ্করিণী খননের ভার জানকীবল্লভের উপর দিয়া প্রস্থান করেন এবং পরে পুনরায় আসিয়া দেখেন কার্য্যটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তখন তিনি জানকীবল্লভের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া রাজধানীতে লইয়া যান; তথায় তিনি প্রথমে জরিপ সেরেস্তার মুহুরী কার্য্যে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে কানুনগো পদে উন্নীত হইয়া 'মজুমদার' হন। যাগযজ্ঞ ও মোগল-সংঘর্ষ-কালে নানাস্থান হইতে রসদ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল; সেই কার্য্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়া মহারাজের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহার ফলে তিনি সুলতানপুর-খড়রিয়ার জমিদারী লাভ করেন। শেষ যুদ্ধে জানকীবল্লভ যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত সন্ধি করিবার লুব্ধ-আশ্বাসে ঢাকায় রওনা হইলে, যখন মোগলেরা রাজধানী লুঠ করিবার জন্য হল্লা করে, তখন অপর সেনানীগণের মত জানকীবল্লভও রাজপরিবারের মানরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করেন; যখন সকল চেষ্টা বিফল হইল, তখন তিনি প্রতাপের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া 'রাজরাজেশ্বর' ও 'লক্ষ্মীনারায়ণ' নামক দুইটি চক্র লইয়া প্রস্থান করেন।[২] এখনও শিলাদ্বয় কাজুলিয়া ও মূলঘরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫৭০ পৃ)।

১ এই পুকুরটিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খুলনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্তৃক খনিত হইয়া সুরক্ষিত হইয়াছিল। তখন কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট উহাকে জাহাঙ্গীর ট্যাঙ্ক বলিয়া বর্ণিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

২ 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩২৩ সাল, ২৩০ পৃ।

জানকীবল্লভের তিন পুত্র, রামভদ্র কবিকর্ণপুর, বলভদ্র কবিচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ কবিকঙ্কণ। তন্মধ্যে রামভদ্র জ্যেষ্ঠোত্তর এক আনা ধরিয়া ।৶০ আনা অংশীদার, অপর দুই ভ্রাতা প্রত্যেকে জমিদারীর ।/০ আনা করিয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু বলভদ্র বলপ্রয়োগে রামকৃষ্ণকে বিষয়-বঞ্চিত করেন। তখন রামকৃষ্ণ সেনহাটি গিয়া বাস করেন, বলভদ্র ॥৶০ আনা অংশ দখল করেন জ্যেষ্ঠের বংশধরগণ কতক নিজ পরগণার উত্তর-পূর্ব্বাংশে কাজুলিয়ায় বাস করেন, কতক মূলঘরে ছিলেন। বলভদ্রের তিন পুত্র হরিনাথ, রামরাম মজুমদাব ও লক্ষ্মণ রায়, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ নিঃসন্তান। হরিনাথ বড় তেজস্বী এবং উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সকল ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া প্রবল জমিদার হন এবং নবাব সরকার হইতে 'রাজা' উপাধি পান (৫৭১ পৃ)। বৈষয়িক প্রতিপত্তির সঙ্গে সমাজের উপর আধিপত্য করিতে তাঁহার প্রবল লালসা হয়। 'বাজা হরিনাথ তাঁহার বংশের পূর্ব্বকৃত কুক্রিয়া বিধৌত করিবার জন্য খড়রিয়া গ্রামে এক ইষ্টকনির্ম্মিত মঞ্চ প্রস্তুত করেন; তাঁহার আশা ছিল যে, ঐ মঞ্চের সর্ব্বোপরি স্তরে মহাসম্মানের সহিত কুলীন সমাজে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া বসিবেন।'[১] কিন্তু কার্ণ্যবংশাবতংস ঘটকপ্রবর রামকান্ত হরিনাথের পূর্ব্বপুরুষ ফুল্লশ্রীতে বিবাহ করায় তাঁহার কুল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার কবায়, রাজা হরিনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হন। তিনি ঘটকের শিরশ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিলে, ঘটক-বংশীয়েরা সকলে বেন্দা হইতে উঠিয়া বিক্রমপুরে চলিয়া যান। রাজা হরিনাথের বংশধরেরা পুরশ্চরণাদির ফলে অবশেষে সমাজে কুলীন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। রাজা হরিনাথ অধিক কাল জীবিত ছিলেন না, এবং তাঁহার বংশে আর কেহ রাজোপাধি পান নাই। তবুও এই বংশ পরবর্ত্তী সৎক্রিয়ার জন্য সমাজের সর্ব্বত্র রাজবংশের মত সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

রাজা হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম বিষয়ের অধিকারী হন। তিনি দেববিগ্রহ রক্ষার জন্য নিজ গৃহে একটি সুন্দর জোড়-বাঙ্গলা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহা এখনও আছে। মন্দিরটি সীতারামের মন্দিরের মত কারুকার্য্য খচিত। ভগ্নাবস্থায়ও উহার সুরুচি ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় আছে। সমস্ত মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৫´×২৫´, পশ্চিমদ্বারী মন্দিরের খোলা বারান্দা

১ শ্যামলাল সেন মুন্সী, 'অম্বষ্ঠ-তত্ত্ব-কৌমুদী', ২৩৮ পৃ।

১৮´×৮´-৭", ছাদের উচ্চতা ১৬´, মধ্যবর্ত্তী জোড়া দেওয়ালের ভিত্তি ৪´-৯"। রামরাম মন্দির মধ্যে গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার সঙ্গে জগদেকনাথ, শিবলিঙ্গ ও কাত্যায়নী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জগদেকনাথ বড় সুন্দর কৃষ্ণমূর্ত্তি। ফরিদপুরের অন্তর্গত পিছলিয়ায় যে অপূর্ব্ব জগদেকনাথ দেখিয়াছিলাম, এ মূর্ত্তি তাহারই অনুরূপ। এই সকল মূর্ত্তির জন্য এখনও এই বংশীয়েরা ৭২১৷৷১ কাঠা জমি দেবোত্তর নিষ্কর ভোগ করিতেছেন।[১] উহা ছাড়া আরও ৫০০।৬০০ বিঘা জমি বেদখল আছে। মন্দিরগাত্রে যে ইষ্টকলিপি ছিল তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে কয়েকখানি স্খলিত ইষ্টক এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকাংশ এবং ১৫৯৩ শকাব্দা বা ১৬৭১ খৃঃ পাওয়া যায়:

'শুভমস্তু। * * শাকে শ্রীরামেণ যশস্বি *।
* * স নিবাসায় প্রাসাদ * * তঃ॥ ১৫৯৩।'[২]

রামরামের পুত্র ছিলেন, রামকেশব শিরোমণি। তিনি দলিলে শিরোমণি রায়চৌধুরী বলিয়া উল্লিখিত এবং এখনও শিরোমণির পুকুর তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। শিরোমণিই সীতারাম রাজার সমসাময়িক। রামরাম হইতে জমিদারগণের বংশতালিকা এই: রামরাম—রামকেশব—মনোহর—রঘুদেব—

১ যশোহর-কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১২৪২৫ নং তায়দাদে তিনখানি সনন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। ১ম, সনন্দ-দাতা 'রাজা প্রতাপাদিত্য, জশর', বিগ্রহ—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীবাজরাজেশ্বর ও শ্রীবংশীবদন। ২য়, সনন্দ-দাতা রামরাম মজুমদার, বিগ্রহ—৺জগদেকনাথ, ৺শিবঠাকুর ও কাত্যায়ণী। ৩য়, সনন্দ-দাতা শিরোমণি রায় চৌধুরী, বিগ্রহ—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপাল, ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রভৃতি। 'বর্ত্তমান দখিলকার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা নন্দদুলাল, রামনরসিংহ রায় ও তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ, মোট জমি ৭২১৷৷১'। এই তায়দাদ এক্ষণে খুলনায় আছে। ১৮১৯ অব্দের দুয়েম কানুন মত গোবিন্দ প্রসাদ, রাধামোহন প্রভৃতির নামে সরকার হইতে যে মোকদ্দমা হয়, তাহার ১২৪৪ সাল ১০ই মাঘের রায়ের একাংশে আছে: 'উহার দিগের মৌরাস জানকীবল্লভ মজুমদার নাজেমানের আমলের পূর্ব্ব হইতে দেবসেবা ইত্যাদির জন্য প্রতাপাদিত্যের আমলে জমি হাসীল করিয়া প্রায় ২০০ কি ২৫০ বৎসর কেহ খাজনা না দিয়া নাখেরাজ রূপে উহার দিগের মৌরাস একের পর আর দখিলকার ছিল'—এইরূপ বর্ণনা আছে। ইহার জন্য ৭২১৷৵০ বিঘা জমি দেবোত্তর নিষ্কর বহাল রাখা হয়।

২ সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ ছিল:

'নেত্রগ্রহেবিন্দুশাকে শ্রীরামেণ যশস্বিনা।
শ্রীনিবাস-নিবাসায় প্রাসাদোঽয়ং বিনির্ম্মিতঃ।'

কৃষ্ণচন্দ্র। এই কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ১৭৭৪ অব্দে খড়রিয়ার জমিদারী হাটখোলার দত্তচৌধুরীগণের হস্তে যায়।

শুধু এক জানকীবল্লভ নহেন, মূলঘরে তিন জানকীবল্লভের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। জমিদার জানকীবল্লভ গ্রামের উত্তর ভাগে জঙ্গল মধ্যে সর্ব্ববিদ্যাবংশ-তিলক জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ঐ জঙ্গল এক্ষণে 'গুরুর বাগান' বলিয়া খ্যাত। জানকীবল্লভ যখন কৃষক-মণ্ডলীর নিকট 'বিশ্বাস মহাশয়' বলিয়া পরিচিত, তখন প্রতাপাদিত্যের সরকার হইতে তহশীলদার হইয়া জানকীবল্লভ ঘোষ খড়রিয়ায় আসেন। উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য ঘটিল। তহশীলদার ঘোষ মহাশয় বন্ধুবরকে বিশ্বাস ও মজুমদার উপাধি পার হইয়া রায়চৌধুরী হইতে দেখিলেন। কিন্তু জমিদার জানকীবল্লভ বন্ধুত্বের অবমাননা করেন নাই। তিনি মূলঘরে আসিয়াই ঘোষ মহাশয়কে স্বীয় দেওয়ান করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। এই জানকীবল্লভ ঘোষ মূলঘরের প্রসিদ্ধ বংশজ ঘোষকায়স্থগণের আদিপুরুষ এবং অন্যান্য কুলীন কায়স্থগণের আশ্রয়দাতা। জমিদারদিগের নিকট হইতে তিনি কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি তালুক পাইয়াছিলেন, উহা তাঁহার বংশধরেরা এখনও ভোগ করিতেছেন। জানকীবল্লভ ঘোষের পর ক্রমে তাঁহার পুত্র রত্নেশ্বর, পৌত্র রামপ্রসাদ এবং পরে কৃপারাম, সহস্ররাম প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে জমিদারীর শেষ পর্য্যন্ত অকৃত্রিম প্রণয়ে বৈদ্যচৌধুরীগণের দেওয়ান স্বরূপ প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখান। এমন কি, উঁহাদের জমিদারী গেলে নূতন জমিদারের অধীন উচ্চপদের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এখনও দুরবস্থ চৌধুরী-বংশীয়দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ত্যাগ করেন নাই।

রায়চৌধুরী-বংশে আধুনিক যুগে অনেক কৃতবিদ্য কৃতীপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা কেহ গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ কর্ম্মচারী, কেহ স্বাধীন ব্যবসায়ে কীর্ত্তিমান। স্থানাভাবে এখানে দুইচারিজনের মাত্র নামোল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। খড়রিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র রায় ও বোলপুর শান্তি-নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মনীষী নেপালচন্দ্র রায় বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি। কবিরাজ প্রাণনাথ ও কালীপ্রসন্ন রায় স্বীয় স্বীয় জীবদ্দশায় দেশের লোকের প্রাণদাতা ছিলেন। পয়োগ্রাম নিবাসী কবিরাজ পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি এবং তৎপুত্র যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্, এ, এম, বি, সমগ্র

বঙ্গদেশে খ্যাতিসম্পন্ন। যামিনীভূষণ কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। অতি সংক্ষেপে এখানে এই বিস্তৃত বংশের কয়েকটি ধারা মাত্র প্রদর্শন করিতেছি :

মূলঘরের রায়চৌধুরী-বংশ

১ জানকীবল্লভ মজুমদার

২ রামভদ্র কবিকর্ণপূর   * (১) বলভদ্র কবিচন্দ্র   রামকৃষ্ণ কবিকঙ্কণ [সাং সেনহাটী]

৩ কাশীশ্বর   দুর্গাদাস

৪ রামদেব [সাং কাজুলিয়া]   গঙ্গারাম   রঘুনন্দন

৫ রঘুনাথ   রামশরণ   রামমোহন   নন্দরাম

৬ রামচন্দ্র   কন্যা   জগন্নাথ   জগমোহন

৭ হরিপ্রসাদ [=রাজা রাজবল্লভ]   রামচন্দ্র   শিবচন্দ্র

৮ তিলক   *ভৈরব   স্বরূপচন্দ্র   হরানন্দ

৯ গৌর   কাশীদাস   প্রাণনাথ

তারকচন্দ্র রায় [সাং কাজুলিয়া]   উমেশচন্দ্র   কাশীনাথ

কান্তি   হেম এম, এ   চারু বি, এ প্রভৃতি   গোপাল বি, এ   নেপাল বি, এ প্রভৃতি

* (১) বলভদ্র কবিচন্দ্র

- * রাজা হরিনাথ
  - রঘুদেব কবীন্দ্র
    - নরোত্তম রায়
      - লক্ষ্মীনারায়ণ [সাং খান্দারপাড়া]
        - শম্ভুনাথ
          - হরিশ্চন্দ্র [পয়োগ্রাম]
            - পঞ্চানন রায় [কবি চিন্তামণি]
              - যামিনীভূষণ এম্, এ, এম্, বি
- * রামরাম
  - কৃষ্ণনাথ
    - রামজীবন
      - লক্ষ্মীনারায়ণ
        - বিশ্বনাথ
          - রামনিধি
            - মদনমোহন
              - ঈশ্বরচন্দ্র
                - যোগেশ
                  - প্রফুল্ল বি,এল্
  - * রামকেশব শিরোমণি
    - * মনোহর
      - * রঘুদেব
        - *কৃষ্ণচন্দ্র
          - রামনরসিংহ
            - নন্দকুমার
              - হরচন্দ্র
                - রাধানাথ
                  - অনুকূল বি, এল্
                  - ললিত এল্,এম্,এস্
                  - অনন্ত [ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট]
            - রাধামোহন
              - বাণীনাথ
                - হরিপ্রসন্ন
                  - দেবীপ্রসন্ন
              - দ্বারকানাথ
                - শশিভূষণ
                  - বিন্দুভূষণ
        - নন্দদুলাল
- লক্ষ্মণ

বো ধ খা না র চৌ ধু রী ব ং শ ॥ ইহারা মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় দেব উপাধি-ধারী দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। কপোতাক্ষী-তীরে বোধখানা একটি অতি প্রাচীন পল্লী। এক সময়ে এই দেব-বংশীয়েরা জমিদারীর অধিকারী হইয়া রাজোচিত সামাজিক প্রতিপত্তিতে এই বোধখানায় বাস করিতেন। এখনও সেখানে ইঁহাদের এক শাখা বর্ত্তমান। অনেকেই এই বোধখানা হইতে

নানাস্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। এজন্য এই বংশ বোধখানার চৌধুরী বলিয়া খ্যাত।

এই দেব-বংশের কিছু বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছিলাম (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৩০৭ পৃ)। তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছি যে দেব-বংশীয়েরা সপ্ত গোত্রীয়—শাণ্ডিল্য মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলমান।[১] তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য দেবগণ কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়া বহু পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা সেই স্থানে বলিয়াছি। এখানে পরবর্ত্তী গোত্র—অর্থাৎ মৌদ্গল্য-বংশের বিবরণ দিব। এই একমাত্র মৌদ্গল্য-শাখাই এমন ভাবে সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, ইহারই সংযোগ-সূত্রগুলি স্থির রাখা কঠিন। তবুও একান্ত ভাবে চেষ্টা করিলাম। ভ্রম ও ত্রুটি অনিবার্য্য, তজ্জন্য আমি একক দায়ী নহি। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, এই বংশের আদি পুরুষ বিজয় হরিদেব হরিদ্বার হইতে এদেশে আসেন, বহু আলোচনার পর এখন সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি, তিনি কোলাঞ্চ দেশ বা দাক্ষিণাত্য হইতে আসেন। কুলগ্রন্থে এই কোলাঞ্চকে কান্যকুব্জ ধরিয়া লওয়ায় গোলযোগ ঘটিয়াছে। ঘটকেরা লিখিয়াছেন :

'কুলঞ্চে বসতি, রাজার সন্ততি, হরিদেব ঠাকুর নাম।
কুলঞ্চ ত্যাজিয়া, নিবাসী হইয়া, দক্ষিণ রাঢ়ে করিলেন ধাম।'[২]

এই বংশীয়েরা দক্ষিণ রাঢ়ে আসিলেও, হরিদেব প্রথমে সে অঞ্চলে আসেন নাই। 'বারেন্দ্র ঢাকুর' হইতে জানিতে পারি, ইহারা 'কাণসোনার দেব'

---

১ 'দেববংশ মহাবংশ, কাণসোনার অবতংস, খ্যাতিভাতি সর্ব্বলোকে কয়।
কতই রাজা মন্ত্রী পাত্র, কত বা কুল সুপবিত্র, সপ্তগোত্র গৌড়ে প্রচারয়॥
মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য-রাজ, পরাশর ভরদ্বাজ, বাৎস্য, ঘৃতকৌশিক, আলমান।
রাঢ়ীমধ্যে সবে গণ্য, আলমান বারেন্দ্রে ধন্য, রাজসভায় বহুত সম্মান।'
—কাশীদাস কৃত 'বারেন্দ্র ঢাকুর।'

২ এই কুলঞ্চ বা কোলাঞ্চ বলিতে কেহ কলিঙ্গ, কেহ দাক্ষিণাত্য বা কোলাচাল মনে করেন। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ কোলাচলের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ চালুক্যরাজগণের প্রভাবকালে দাক্ষিণাত্য হইতে যাঁহারা কান্যকুব্জাদি প্রদেশ ঘুরিয়া বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসেন, তাঁহারা কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দিতেন।—'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্য-কাণ্ড, ১৩০-৩১ পৃ।

বলিয়া খ্যাত।[১] কাণসোনা বলিতে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বা আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি প্রদেশ বুঝায়। 'শব্দকল্পদ্রুমে' আছে :

'আসীৎ শ্রীহরিদেবাখ্যঃ শ্রীহরেরংশরূপকঃ।
কায়স্থানাং কুলে দেববংশস্যোদ্ভবহেতুকঃ॥
মুর্শিদাবাদনগরাসন্নে স্বজনপালকঃ।
কর্ণস্বর্ণনামধেয়সমাজে বাসকারকঃ॥'[২]

এই হরিদেব হইতে অষ্টম পুরুষে পীতাম্বর দেব এই বংশের একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী পুরুষ। তিনি নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া খাঁ উপাধি পান এবং ধনবলে সমৃদ্ধ হইয়া এক কুলযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উহাতে তাঁহার স্বজাতির বহু কুলীন ও সামাজিকের সমাগম হয় এবং তিনি সকলের নিকট সেবা মাহাত্ম্যে বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়া 'ধন্য পীতাম্বর' নামে গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। এখনও গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সভায় আগত সামাজিকদিগের অভ্যর্থনার জন্য বর্ষাকালে নিজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটি জলাভূমির উপর ধান্য দিয়া রাস্তা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া 'ধান্য-পীতাম্বর' আখ্যা পান। কিন্তু মনে হয়, ধনধান্য তুল্যার্থ-বোধক হইলেও ধান্যের কথাটা গল্পমাত্র, ধন্য শব্দের অপভ্রংশেই ধান্য দাঁড়াইয়াছে।

এই ধন্য পীতাম্বরের অধস্তন এক শাখা নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরে মুড়াগাছায় বাস করেন; তদ্বংশীয় দেবিদাস তখন মুড়াগাছার কানুনগো ছিলেন। সেই মুড়াগাছার ধারা হইতে শোভাবাজারের রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিতেছি। ঘটকদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—'বালী দ্বিগঙ্গা আর মুড়াগাছা, আর যত সব কাদা খোঁচা।' অর্থাৎ বালীর দত্ত, দ্বিগঙ্গার সেন ও মুড়াগাছার দেব-বংশ মৌলিক কায়স্থের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ঘর। ধন্য পীতাম্বরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শিবদাস দেব সরকারের নাম পাই। তাঁহার নিবাস ছিল চৌখণ্ডী। এজন্য তিনি সাধারণতঃ শিবদাস চৌখণ্ডী নামে খ্যাত।

---

১ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৮৯-৯১ পৃ; 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' রাজন্যকাণ্ড, ২২৫ পৃ।

২ প্রথম সংস্করণ, ১ম কাণ্ড, ৮৵০ পৃ, [বরদাপ্রসাদ বসু এবং হরিচরণ বসু সম্পাদিত ২য় সং, ১৯৬১, ১ম কাণ্ড, ॥০ পৃ —শি মি]

এখন প্রশ্ন এই, এই চৌখণ্ডী কোথায় ? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞিমালার মধ্যে চৌৎখণ্ডী দেখিতে পাই। কান্যকুব্জাগত বাৎস্য-গোত্রীয় ছান্দড়ের একটি পুত্র নীলাম্বর বা ভানু চৌৎখণ্ডী গ্রামে বাস করিতেন।[১] এই চৌৎখণ্ডী বা চতুর্থ-খণ্ডী শব্দের অপভ্রংশে চৌখণ্ডী হইয়াছে।[২] বাৎস্য-গোত্রীয় পরিতোষ রাজা জয়-পালের নিকট যে শাসন প্রাপ্ত হন, উহার এক অংশকেও চতুর্থ খণ্ড বা চৌৎখণ্ড বলিত।[৩] ছান্দড়ের বংশধরগণেব অন্য শাসনগুলির মত চৌখণ্ডী গ্রাম বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের কোন অংশে গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কুলস্থান। এই স্থানে দেব-দ্বিজভক্ত শিবদাস দেব বাস করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁ যখন গৌড়াধিপ হুসেন শাহের রাজস্ব সচিব ছিলেন, তখন শিবদাস তাঁহার অধীনে চাকরী করিয়া 'সরকার' উপাধি পান এবং বিশ্বস্ততাগুণে তাঁহার অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন হন। বিশেষতঃ পুরন্দর যখন স্বীয় আবাসস্থান (হুগলীর অন্তর্গত) সেরাখালা গ্রামে দক্ষিণ বাঢ়ীয় সকল কুলীনকে একত্র (একযায়ী) করিয়া নূতন কুলবিধি প্রণয়ন এবং মৌলিকগণের সহিত কুলীনের আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহার অনুগত শিবদাস সামাজিকদিগের অভ্যর্থনাব সুব্যবস্থা করিয়া সকলেব নিকট সমাদৃত এবং বংশগৌরবে উচ্চ-সম্মানিত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে শিবদাস চৌখণ্ডী (খুল্‌নার অন্তর্গত) মলই পরগণার জমিদারী পান ; সম্ভবতঃ উহাও পুরন্দরের অনুগ্রহের ফল। তখন তিনি কপোতাক্ষীকূলে হাজিরালি গ্রামে[৪] আসিয়া বসতি করেন। এই শিবদাস হইতেই 'চিত্রপুর ও কর্ণপুরের দেব' নামক দেব-বংশের দুইটি প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘটকেরা বলেন, শিবদাস কর্ণপুর বংশ এবং তাঁহার পুত্র মুরারি বা মুরলীধর হইতে চিত্রপুর শাখা বাহির হইয়াছে।[৫]

১ লালমোহন, 'সম্বন্ধনির্ণয়', ৩৩৮-৯ পৃ।

২ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১২৮, ১৪৫ পৃ।

৩ ঐ, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ২১-৩ পৃ।

৪ কপোতাক্ষকূলবর্ত্তী রেলষ্টেশন ঝিকারগাছা হইতে হাজিরালি বহুদূরে নহে। পুবন্দর খাঁ শিবদাসের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে।

৫ 'কায়স্থকুলদর্পণ,' ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃ। দেবগণের ১৩টি সমাজ—কর্ণসুবর্ণ, গৌরহট্ট, চাঁপা, চিত্রপুর, বৈন্নাটি, নীলপুর, ভুষালি, আন্দুল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম, চৌরগাঁ, ইন্দ্রাণী ও গৌরীপুরা— 'কায়স্থকারিকা,' উপ, ১৬ পৃ।

আমার মনে হয়, উভয় শাখাই শিবদাসের দুই পুত্র হইতে উদ্ভুত, কারণ উভয় শাখাই শিবদাসের পবিচয় দেয়। এই সকল শাখা দক্ষিণ বঙ্গে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রায়, সরকার, হালদার প্রভৃতি নানা উপাধিযুক্ত শিবদাস সন্তানগণ যে কতস্থানে কতভাবে বাস করিতেছেন, তাহা বলিবার নহে। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত বহুস্থানে শিবদাসের পরিচয় দিয়া ধন্য হন। দেব-বংশীয়গণ নানা গোত্রীয় বলিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল। অনেক অমূলজ কায়স্থ গুপ্তভাবে দেব-বংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মাথা তুলিতে সাহসী না হইয়া 'দেব' স্থলে 'দে' মাত্র উপাধিধারী হইয়া কায়স্থ সমাজের নিম্নতম স্তরে নিজেদের মধ্যে পৃথক্ সমাজ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। হয়ত কেহ ব্যবসায় বা চাকরীর পয়সার জোরে দরিদ্র মুখ্যকুলীনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি খেতাবের অন্তরালে 'দে'-চিহ্ন লুকাইয়া আবার গ্রীবা উন্নত কবিবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন। অপরদিকে আবার যাহারা প্রকৃত পক্ষে দেব-বংশ হইতে উদ্ভূত, তাঁহাবা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে দারিদ্র্য-দশায় পড়িয়া বহু পুরুষ ধরিয়া পরিচয়-সূত্র হারাইয়া বসিলেন এবং বহুকাল পরে অদৃষ্টের পুনরাবর্ত্তনে সৎকর্ম্মশীল হইতে পারিয়া সমাজানুগ্রহে বংশগৌরব ফিরাইয়া পাইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: ১৩শ পর্য্যায় ভুক্ত শিবদাস সরকারেব বংশধর অধস্তন ২২ পর্য্যায় ভুক্ত বলরাম দেব সরকার দমদমার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালার নগণ্য গুরুমহাশয় ছিলেন। তৎপুত্র রামদুলাল দেব বা স্বনামধন্য দুলাল সরকার ভাগ্যস্ফীতি বশতঃ ধনকুবের হন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দানধর্ম্মে ব্যয়িত করিয়া কোটি টাকার উপর ধনসম্পদ রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথ (সাতুবাবু ও লাটুবাবু) অর্থবৃষ্টি করিয়া কলিকাতায় 'বাবু' বলিয়া খ্যাত হন। উঁহারা নিজ বাটীতে ২৪ পর্য্যায়ের কুলীনবর্গের একযায়ী করেন। প্রমথনাথের দুই পোষ্যপুত্র ২৫ পর্য্যায় উক্ত কুলীনের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। ইঁহারা কায়স্থ-কুল-ভূষণ।

শিবদাসের মনোহর ও দামোদর নামে অন্য দুই ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহারা মুসলমান সরকারে চাকরী করিয়া যথাক্রমে 'মল্লিক' ও 'নিয়োগী' উপাধিযুক্ত হন। যশোহরের অন্তর্গত আল্‌তাপোল এবং খুল্‌নার মধ্যস্থ মিক্‌সিমিল ও শোল্‌গাতি প্রভৃতি স্থানের মল্লিক কায়স্থগণ মনোহর মল্লিকের ধারা। দামোদর নিয়োগীর



মহেশ্বরপাশার জোড়বাঙ্গালা



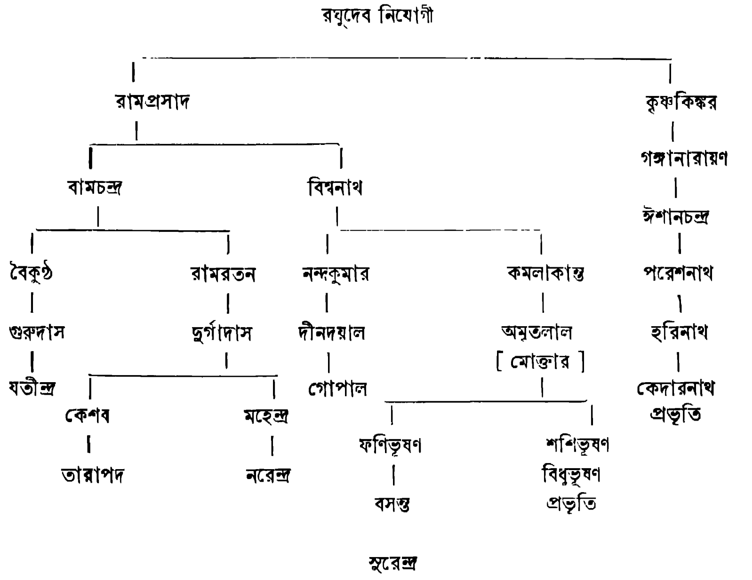
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পৈতৃক বাটী, রাড়ুলী

অধস্তন কেশব ও রঘুদেব হইতে খুল্‌নার অন্তর্গত উত্তর-পাড়ার নিয়োগী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।[১] হরিদেব হইতে শিবদাস পর্যন্ত মোট ১৩ পুরুষ। উঁহাদের ক্রমিক তালিকা এই : ১ হরিদেব—২ কৃষ্ণানন্দ—৩ গোবিন্দদেব—৪ দুর্গাবর—৫ বিশ্বম্ভর—৬ ভবানন্দ—৭ শ্রীধর—৮ পীতাম্বব খাঁ বা 'ধন্য পীতাম্বর'—৯ পৃথ্বীধর—১০ পূর্ণানন্দ—১১ পুরুষোত্তম—১২ কুরুনন্দন—১৩ শিবদাস চৌথণ্ডী।[২]

---

১ রঘুদেব নিয়োগী হাজিরালি বা বোধখানা হইতে খুল্‌নাব অন্তর্গত ফকিরহাটের নিকটবর্ত্তী উত্তব-পাড়ায় আসিয়া বাস করেন। রঘুদেব সম্ভবতঃ দামোদর নিয়োগী হইতে অবস্তন ৫ম পুরুষ। তাঁহাব বংশধরগণ এখনও ধন্য পীতাম্বরের সন্তান পরিচয়ে সম্মানিত কায়স্থ বংশ। তাঁহাদের বংশ-লতিকা এই :

উত্তর-পাড়ার নিয়োগী-বংশ



২ হরিদেব হইতে ৮ম পুরুষে পীতাম্বর এবং ১৩শ পুরুষে শিবদাস, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং ঘটক-গ্রন্থে উল্লেখিত। বিশ্বেশ্বরের 'কায়স্থ-কুলদর্পণে' দেখিতে পাই, 'চৌথণ্ডী নিবাসী ৺শিবদাস দেব সরকার ১৩শ পর্য্যায়ে সুবিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন' (২য় খণ্ড, ৩৯ পৃ)। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব মহোদয় স্বপ্রকাশিত 'শব্দকল্পদ্রুমের' প্রারম্ভে নিজের যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদের প্রদত্ত তালিকার ২, ৩, ১০ ও ১১ একেবারে বাদ দিয়াছেন; ৫ এবং ৬ স্থলে বিশ্বেশ্বর ও বিঘ্নেশ্বর এবং ৭ স্থানে ১০ এর নাম দিয়াছেন। কাজেই শিবদাসের পর্য্যায় সংখ্যা ১৩ স্থলে ৯ দাঁড়াইয়াছে।

শিবদাসের কয়েক স্ত্রীর গর্ভে অনেকগুলি পুত্র ছিল ; তাঁহারা সকলে যশোহরে আসেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুরারি প্রভৃতি পুত্রগণ কর্ণপুর ও চিত্রপুর প্রভৃতি ধারার প্রতিষ্ঠাতা হইয়া মুর্শিদাবাদের মধ্যে বাস করেন। মুরারির পুত্র চিত্রপুর হইতে হালিসহর আসেন। সেখানে তাঁহার বংশ আছে। শিবদাসের যশোহর-খুল্‌নাবাসী দুই পুত্রের উল্লেখ আছে—শ্রীরাম খাঁ ও নীলাম্বর খাঁ। শিবদাস সম্ভবতঃ মলই পরগণার পর বর্ত্তমান যশোহরের উত্তরাংশে শাহউজিয়াল পরগণারও মালিক হন এবং নিজের জীবদ্দশায় উক্ত দুই পরগণা দুই পুত্রকে দিয়া যান। নীলাম্বর মলই পরগণা পাইয়া প্রথমতঃ হাজিরালি এবং পরে তাঁহার

এইজন্য তিনি যে (৯) নিত্যানন্দ হইতে স্বীয় বংশধারা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে শিবদাসের ভ্রাতা বলিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, (৮) পীতাম্বরের কতিপয় পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র পৃথ্বীধরের নাম আমরা দিয়াছি, নিত্যানন্দ (সাং সোদপুর), চতুর্ভুজ রায় (সাং তালা) ও শ্রীনাথ (সাং ধুলিয়াপুর) অপর তিন পুত্র হইতে পারেন। নিত্যানন্দকে নবম পর্য্যায় ধরিলে, স্যর রাধাকান্ত দেবের ২৩ পর্য্যায় হয়, ইহাই সম্ভবপর। কারণ, তিনি যখন একযায়ী করেন, তখন গঙ্গানন্দপুরের (২১) রাধামোহন ও তৎপুত্র দুর্গাদাস, হাজিরালির (২২) কালীনাথ রায় চৌধুরী সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং রাধামোহন বয়স ও পর্য্যায়ের জ্যেষ্ঠত্বগুণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পান। নিত্যানন্দকে (১৩) শিবদাসের ভ্রাতা ধরিলে, স্যর রাধাকান্তের পর্য্যায় ২৭ দাঁড়ায় এবং তাঁহার বংশ এক্ষণে ২৯।৩০ পর্য্যায়ে অবতরণ করে। বিশেষতঃ ২৭ পর্য্যায়ের রাধাকান্ত কখনও ২১ পর্য্যায়ের রাধামোহনের সঙ্গে সমসাময়িক হইতে পারেন না। সুতরাং আমরা রাধাকান্তের আত্মপরিচয় আমূল সত্য বলিয়া ধরিতে পারিলাম না। আমাদের অনুমানে শোভাবাজারের ধারা এইরূপ দাঁড়ায় :

৮ ধন্য পীতাম্বর—পৃথ্বীধর, ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি—৯ নিত্যানন্দ—শ্রীমন্ত—চণ্ডীবর—পরমানন্দ—বিজয়াবল্লভ রায়—কৃষ্ণানন্দ—রঘুনন্দন—বিদ্যাধর রায় (নিতড়াগ্রাম)—১৭ দেবিদাস মজুমদার (মুড়াগাছার কানুনগো)—রুক্মিণীকান্ত ব্যবহর্ত্তা—রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তা—দেওয়ান রামচরণ দেব—২১ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব—২২ রাজা গোপীমোহন (দত্তক)—২৩ রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। (গোপীমোহনকে দত্তক গ্রহণের পর নবকৃষ্ণের এক পুত্র হয়), ২২ রাজা রাজকৃষ্ণ—২৩ রাজা শিবকৃষ্ণ, মহারাজ কমলকৃষ্ণ, মহারাজ স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ , ২৩ মহারাজ কমলকৃষ্ণ—২৪ রাজা বিনয়কৃষ্ণ। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর অশেষবিধ দেশহিতকর এবং স্বজাতি-গৌরব বর্দ্ধক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি দুইবার যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ পর্য্যায়ের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনবর্গের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতিত্বের অতুল সম্মান লাভ করেন। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। দেব বংশের এই রাজশাখা ধন্য পীতাম্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন এবং সমগ্র বঙ্গে স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বংশধর হরিঢালী গ্রামে গিয়া বাস করেন। শ্রীরাম খাঁর ভাগে শাহউজিয়াল প্রভৃতি সম্পত্তি পড়িয়াছিল এবং তিনি বারবাজারে গিয়া গড়কাটা প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করেন।

মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক গাজীর অত্যাচার প্রসঙ্গে আমরা প্রথম খণ্ডে (৩য় সং, ৪২৩-৪ পৃ) যে শ্রীরামরাজার গল্প লিখিয়াছিলাম, তিনি ও শ্রীরাম খাঁ অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। মুসলমানী কেচ্ছাপূর্ণ কেতাবের অতিরঞ্জিত বর্ণনার সাহায্যে আমরা গল্প করিয়াছি, কিভাবে গাজী গিয়া বারবাজারে শ্রীরাম-রাজার বাড়ীর দক্ষিণে জাহির হইয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন, এমন কি শ্রীরামরাজাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। এই কথার সত্যতা আর একবার এই প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখিব। অন্যদিকে প্রবাদ মুখে শুনিতে পাই এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও লিখিয়া গিয়াছেন,[১] রাজা মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসেন, তখন দেব-বংশীয় শ্রীরাম খাঁ তাঁহাকে সৈন্যাদি দিয়া সাহায্য করেন; উহার ফলে মানসিংহ তাঁহাকে হলদহ ও মূলঘর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী ও রাজা উপাধি দেন। এই উভয় গল্পের সমন্বয় করা যায় না এবং গাজী ও মানসিংহের আক্রমণের মধ্যে যে ৫০।৬০ বৎসর সময় ছিল, তাহারও মীমাংসা হয় না। প্রথমতঃ, গাজীর অত্যাচার কাহিনীতে কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বারবাজারে শ্রীরামরাজার বাড়ীর যে ভগ্নাবশেষ আছে তাহাও একটা অত্যাচারের চিত্র প্রকটিত করে। উহার পার্শ্বে বা নিকটে কোনস্থানে শ্রীরামরাজার কোন বংশধর বা স্বজাতিও নাই। বারবাজারে থাকিয়া শ্রীরামরাজা যদি মানসিংহকে সাহায্য করিবার মত অবস্থাপন্ন হইতেন, তাহা হইলে উক্ত স্থানের আজ এমন দুরবস্থা দেখিতাম না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরামরাজা মানসিংহের আক্রমণ কালে জীবিত থাকা সম্ভবপর নহে। গাজীর অত্যাচারে শ্রীরামরাজার মত লাউজানির ব্রাহ্মণ-নৃপতি মুকুটরায়ও সবংশে উৎসন্ন হন। তাঁহার একটি মাত্র শিশু পুত্র

১ 'Seventh in descent from Purandar [i. e. Pitambar] was Raja Ram Chandra Khan who was a favourite of the great Raja Man Singh and held high post under him. He acquired, probably by some sort of grant from Man Singh, the Zemindari of Muhammadabad, in Nuddea, and established the seat of his family at Bara Bazar, ten miles north of Jessore.'—Westland, *Jessore*, p. 156. [ed. of 1871, p. 200 note.—শি মি]

বোধখানার চৌধুরী-বংশ

১ হরিদেব—কৃষ্ণানন্দ—গোবিন্দদেব—দুর্গাবর—বিশ্বম্ভর—ভবানন্দ—শ্রীধর তৎপুত্র—৮ পীতাম্বর খাঁ।

৮ পীতাম্বর খাঁ [ধন্য পীতাম্বর]

- ৯ পৃথ্বীধর
  - ১০ পূর্ণানন্দ
    - ১১ পুরুষোত্তম
      - ১২ কুরুনন্দন
        - ১৩ শিবদাস দেব সরকার [চৌখণ্ডী]
          - ১৪ শ্রীরাম খাঁ [বারবাজার]
            - ১৫ অজিতনারায়ণ
              - ১৬ রাজা কমলনারায়ণ রায় [বোধখানা]
                - ১৭ কন্দর্প-নারায়ণ [বোধখানা]
                - ১৭ গন্ধর্ব্ব-নারায়ণ [বোধখানা]
                - ১৭ রাজা কংসনারায়ণ [গঙ্গানন্দপুর]
                  - ১৮ রাঘবেন্দ্র [গঙ্গানন্দপুর]
                  - ১৮ রত্নেশ্বর [নওয়াপাড়া]
          - ১৪ নীলাম্বর খাঁ [হাজিরালি, হরিঢালী ও রাড়ুলি]
        - মনোহর মল্লিক
        - দামোদর নিয়োগী
- ৯ নিত্যানন্দ [সোদপুর]
  - শ্রীমন্ত
    - চণ্ডীবর
      - পরমানন্দ
        - বিজয়াবল্লভ
          - কৃষ্ণানন্দ
            - রঘুনন্দন
              - বিদ্যাধর
                - ১৭ দেবিদাস মজুমদার
                  - রুক্মিণীকান্ত ব্যবহর্ত্তা
                    - রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তা
                      - দেওয়ান রামচরণ দেব
                        - মহারাজ নবকৃষ্ণ
                          - রাজা গোপীমোহন
                            - ২৩ রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব

কামদেব বা ঠাকুরবব মুসলমান হইয়া চারঘাটে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কি ভাবে প্রতাপের রাজত্বকালে (১৬০০ খৃঃ) হরি শুড়ির বিরুদ্ধাচারী হন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি (বর্ত্তমান খণ্ডের ৩১৮-২০ পৃ), সুতরাং উহার অন্ততঃ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে গাজীর অত্যাচার হয়, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষ দশায় নসরৎ শাহের রাজত্বের পর যখন দেশমধ্যে নানা অরাজকতা চলিতেছিল, তখনই গাজীর অত্যাচার ঘটে। তখন শ্রীরামরাজার বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসর ধরিলে মানসিংহের আক্রমণকালে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। সুতরাং শ্রীরামরাজা মানসিংহকে সাহায্য করেন নাই ; তাঁহার কোন অধস্তন বংশধর করিতে পারেন ; কারণ পূর্ব্বোক্ত হলদহ, মূলঘর পরগণা একসময়ে শ্রীরাম খাঁর বংশধরদিগের হস্তগত ছিল। এখন প্রশ্ন এই, মানসিংহকে কে সাহায্য করিয়াছিলেন ?

বোধখানার চৌধুরীগণ শ্রীরাম খাঁর বংশধর, তাহা সত্য। কিন্তু শ্রীরামের অজিতনারায়ণ নামক একটি নাবালক পুত্র ব্যতীত আর কোন সন্তানের সন্ধান নাই। গাজীর অত্যাচার অবশ্য এজন্য দায়ী। মুকুটরায়ের মত শ্রীরামরাজাও সেই অত্যাচারে সপরিবারে নিহত হন ; প্রবাদ আছে, কোন এক দাসীর কৌশলে তাঁহার একটিমাত্র শিশু পুত্র পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐ শিশুপুত্রের নাম অজিতনারায়ণ। তাঁহার পক্ষে হাজিরালি বাটীতে আসাই সম্ভব। কিন্তু লাউজানির উপর অত্যাচারকালে সেখানেও কেহ বাস করিতে পারে নাই ; তখন নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা, জানি না ; ঐ সময়ে তিনি বা তাঁহার পুত্রগণ হরিঢালীতে গিয়া বাস করেন। নীলাম্বরের প্রপৌত্র রামগোপাল হইতে রাড়ুলির ধারা বাহির হইয়াছে।

অজিতনারায়ণ পরাশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন ; এতদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনের আর কোন ঘটনা জানিবার উপায় নাই। তৎপুত্র কমলনারায়ণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ; তিনি মোগলবিজয়ের পরে মোগলরাজধানীতে গিয়া কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনিই সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের রণবাহিনীর সঙ্গে যশোহরে আসিয়া বীরত্ব ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেন। পাঠানের অত্যাচারকাহিনী শুনিলেই মানসিংহ উদ্রিক্ত হইতেন এবং বিপন্ন প্রাচীন রাজবংশীয়দিগকে সামন্তরাজের মত আশ্রয় দিতেন। কমলনারায়ণের নিকট তাঁহার পিতামহের দুর্গতি এবং নিজের নিরাশ্রয় জীবনের কথা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং সম্ভবতঃ কমলের প্রার্থনানু-

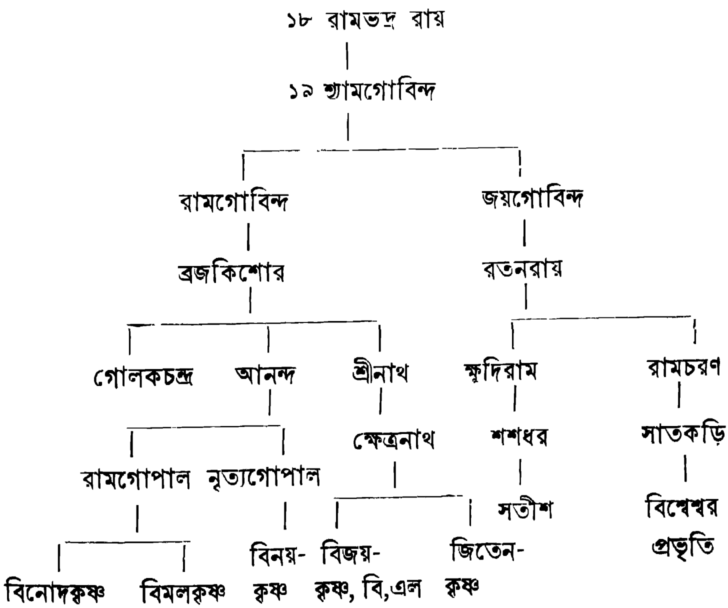
সারে তাঁহাকে হলদহ ও মূলঘর নামক কপোতাক্ষী-কূলবর্ত্তী দুইটি পরগণার জমিদারী ও রাজোপাধি দেন। তখন রাজা কমলনারায়ণ বোধখানায় আসিয়া বসতি নির্দ্দেশ করিলেন। এখনও সেখানে তাঁহার পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। এই বোধখানা একটি অতি পুরাতন ঐতিহাসিক পল্লী। উহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দিব। ঐ স্থানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ৺কানাইঠাকুরের শ্রীপাট আছে, তজ্জন্য উহা বিশেষ বিখ্যাত। রাজা কমল-নারায়ণ এইস্থানে বসু, মিত্র প্রভৃতি বহু কুলীনবংশ স্থাপন করেন এবং সর্ব্বশ্রেণীর কুলীনের সহিত সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতা সূত্রে সমাজে সম্মানিত হইয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষ ধন্য পীতাম্বরের মত স্বনামধন্য হন। সেইজন্যই বোধখানার চৌধুরী বংশ এত দেশবিখ্যাত হইয়াছে। ধন্য পীতাম্বর হইতে প্রধান ধারা দেখান হইল।

(ক) বো ধ খা না র শা খা॥ বোধখানার চৌধুরী নাম হইলে কি হয়, সেখানে একটিমাত্র ক্ষুদ্র শাখা আছে। সকলেই এখান হইতে উঠিয়া গিয়া নানা স্থানে বাস করিয়া এই নামের পরিচয় দিয়া সম্মানিত হইতেছেন। রাজা কন্দর্পের প্রপৌত্র বলরাম রায় চৌধুরী বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন। তিনিই দুই প্রকাণ্ড জোড়া-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রাধাবল্লভ (কৃষ্ণ ও রাধিকা) এবং গোপীবল্লভ (বলরাম ও রেবতী) বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন দশ-ভুজা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম চক্র প্রভৃতি ছিলেন। উত্তর দক্ষিণে দুই পার্শ্বে দুইটি মন্দির ও মধ্যস্থলে খোলা খিলান ছিল। এখন একটি মন্দির ভাঙ্গিয়া

২০ বলরাম রায়চৌধুরী
|
রামকান্ত
|
- চন্দ্রকান্ত
  |
  গুরুদাস
  |
  - ২৪ মহেন্দ্র
  - উপেন্দ্র
  - সুরেন্দ্র
- সূর্য্যকান্ত
  |
  বাণীকণ্ঠ
  |
  - অন্নদাপ্রসাদ
  - যোগেন্দ্রনাথ

পড়িয়াছে ; যেটি আছে, তাহার ভিতরের মাপ ১০´-১৩´´×১০´-৩´´, ভিত্তি ৪´-৬´´। এবং গুম্বজের ভিতরে উচ্চতা ১৯´-৪´´। মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখন বিগ্রহগুলি বাড়ীর মধ্যে একটি সুন্দর নূতন অট্টালিকার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। বলরামের পুত্র রামকান্তের চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত নামে দুই পুত্র ছিলেন। চন্দ্রকান্তের পৌত্র মহেন্দ্রনাথ এক্ষণে স্বকীয় উচ্চকুলের প্রধান পরিচয়-স্থল।

বর্গীর উৎপাতের সময় এইরূপ বাস পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। তখন রাজা কন্দর্প বা তাঁহার ভ্রাতার পৌত্র শ্যামগোবিন্দ বর্গীর ভয়ে সপরিবারে নলডাঙ্গার রাজার আশ্রয় লন। রাজানুগ্রহে তিনি কিছুকাল চণ্ডালজানি গ্রামে বাস করেন ; তথায় আজিও 'রায়ের ভিট্টা' আছে। কয়েক বৎসর পরে শ্যামগোবিন্দের মৃত্যু হইলে, নলডাঙ্গার রাজা মহেন্দ্রদেব রায় (৪৮১ পৃ) বর্ত্তমান ঝিনাইদহের অন্তর্গত নাগপাড়া, গোবিন্দপুর, সিংহনগর, ধোপাখোলা, বিল কুমরাইল এই পাঁচখানি মৌজা ১১৭৭ সালে (১৭৭১ খৃঃ) শ্যামগোবিন্দের পুত্র

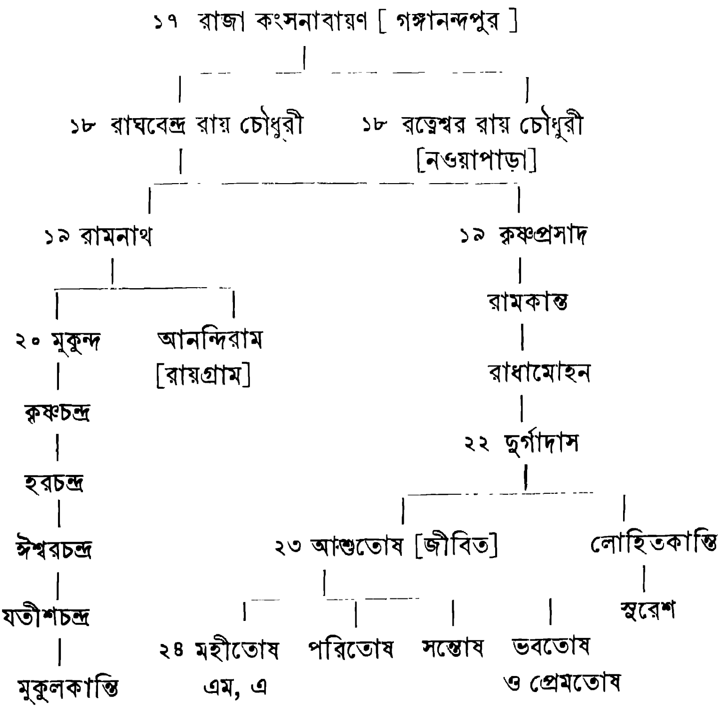


রামগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দকে পাট্টা করিয়া দিয়া ঐ অঞ্চলে পত্তন করেন। তৎপরে অন্যান্য সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া উঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে নাগপাড়ায় বাস করিতেছেন। ঐ পাট্টা এখনও আছে। রামগোবিন্দের পৌত্র গোলকচন্দ্র কৃতী পুরুষ; তিনি বংশাভিমানে নিজ শ্যালীপতি-ভ্রাতা নড়াইলের বিখ্যাত রতন বাবুর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গিয়া নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হন। গোলকের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পৌত্র বাবু বিজয়কৃষ্ণ রায় এক্ষণে ঝিনাইদহের উদীয়মান উকীল।

এই বংশে কুলীনের সঙ্গে ভিন্ন আদান-প্রদান ছিল না; এখনও কদাচিৎ সে নিয়ম ভঙ্গ হয়। এমন কি, বংশজের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতি-সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হইতে হইত। অনেকে এই ভাবে নিন্দিত হইয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: গন্ধর্ব্বনারায়ণের কোন পৌত্র বংশীবদন রায় চৌধুরী ভুগিলহাটের সন্নিকটে পাইকপাড়া গ্রামে বংশজ বসু-বংশে বিবাহ করিয়া বোধখানা হইতে বিতাড়িত হন। তদ্বংশীয়েরা এখন উক্ত পাইক-পাড়ায় আছেন। বংশধারা এই: ১৯ বংশীবদন—রামশঙ্কর—রামকিশোর—রামসুন্দর—নীলকমল—হৃদয়নাথ ও যোগেন্দ্রনাথ। ২৪ হৃদয়নাথের পুত্র অমূল্য, এবং যোগেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র প্রফুল্ল ও সুরেশ জীবিত।

(খ) গঙ্গানন্দপুরের ধারা॥ রাজা কমলনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কংস-নারায়ণ শিশুকালে মাতৃহীন হইয়া বিমাতার স্নেহে প্রতিপালিত হন। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি শত্রুতাচারণ করায়, তিনি পলায়ন করিয়া ঢাকায় নবাব সরকারে উপস্থিত হন। তথায় উচ্চ কর্ম্মচারী ভেরচি-নিবাসী রঘুনন্দন মিত্র মহাশয়ের সুনজরে পতিত হন। তিনি কংসনারায়ণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া নবাব সরকারের প্রতিপত্তিবলে নিজে মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ মিটাইয়া দেন। তদনুসারে কংসনারায়ণ হলদহ পরগণা প্রাপ্ত হইয়া বোধখানার নিকটবর্ত্তী ঝুমঝুমপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ণয় করেন। সেই গ্রামেরই নাম পরে তিনি গঙ্গানন্দপুর রাখেন। রঘুনন্দনের চেষ্টায় নবাব দরবার হইতে কংসনারায়ণের রাজোপাধি বহাল থাকে। বোধখানা হইতে পৈতৃক কুলবিগ্রহ শ্যামরায় ঠাকুরকে লইয়া গিয়া গঙ্গানন্দপুরে একটি সুন্দর জোড়-বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ভিন্ন

৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং শিবমন্দিরও পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সবগুলিরই ভগ্নাবশেষ এক্ষণে বর্ত্তমান। প্রবাদ এই, ৺শ্যামরায় বিগ্রহটি প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোহর রাজধানী হইতে সম্ভবতঃ কমলনারায়ণ কর্ত্তৃক আনীত হন। এই গল্পের সত্যতা নির্ণয়ের পন্থা নাই; তবে শ্যামরায় বিগ্রহ আছেন এবং এখনও গঙ্গানন্দপুরে কোন প্রকারে নিত্য পূজিত হইতেছেন। কংসনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রত্নেশ্বর গঙ্গানন্দপুর হইতে যশোহর নওয়াপাড়ায় বাস করেন। কংসের প্রপৌত্র আনন্দিরাম প্রথমতঃ রায়গ্রামে এবং পরে তদ্বংশীয়েরা চণ্ডীবরপুরে বাস করেন। চণ্ডীবরপুরের অমৃতলাল রায় দেশীয় লিখিবার কালির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হন।



(গ) নওয়াপাড়ার শাখা॥ রত্নেশ্বর আসিয়া বর্ত্তমান যশোহর সহরের অনতিদূরে ভৈরবতীরে নবপাড়া বা নওয়াপাড়া গ্রামে বাস করেন।

ইহা ঈশপপুর পরগণার অন্তর্গত। এখানে ভৈরব নদ আঁকিয়া বাঁকিয়া অন্দরে বাহিরে রত্নেশ্বরের বাটীর জলাশয়ের কার্য্য করিয়াছিল। কবির রঞ্জিত বর্ণনায় দেখা যায় :

"যথায় বিখ্যাত ঈশপ্‌পুর পরগণা, বৃথা চক্ষু তা'র না দেখিল যেই জনা।
তা'র মধ্যে গ্রামচূড়া নবপাড়া গ্রাম, নবীন কৈলাস যেন দর্শনে সুঠাম।
তথায় শ্রীশিবচন্দ্র রায় গুণমণি, প্রশস্ত কায়স্থ-বংশে যিনি চূড়ামণি।
যাঁর যশে যশোময় ছিল যশোহর, যেন নবচন্দ্র নবপাড়ার ভিতর।"[১]

এই শিবচন্দ্র রত্নেশ্বরের প্রপৌত্র এবং নওয়াপাড়া নাম যাঁহারা এ অঞ্চলে বিখ্যাত করিয়াছেন, সেই রতিকান্ত, কালীকান্ত, বাণীকান্ত ও নবকান্ত নামক পুত্র-চতুষ্টয়ের পুণ্যশ্লোক পিতা।

রত্নেশ্বরের দুই পুত্রের বংশ আছে—রামরাম ও কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ পিতৃবাটী ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী নূতন বাড়ীতে বাস করেন। এই জন্য উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশধরগণের মধ্যে বড় বাড়ী ও নূতন বাড়ী বলিয়া দুইটি ভাগ হইয়াছে। কৃষ্ণরামের পৌত্র নিমানন্দ ভূষণার মুন্সেফ ছিলেন; তখন তিনি সেখান হইতে রাজমিস্ত্রী আনিয়া নূতন বাটীতে সুন্দর শিল্পযুক্ত চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করেন, উহা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেই সকল শিল্পীর সাহায্যে শিবচন্দ্রও নিজ বাটীতে অপূর্ব্ব চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া লন, উহা এখনও আছে। ঐ বাটীতে যে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা দূর হইতে রাজোচিত প্রাসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা রতিকান্তের সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে সময়ে উঁহাদের বৈষয়িক আয় আনুমানিক ৫০,০০০ হাজার টাকা ছিল। যেমন

১ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'বাসবদত্তা', ৩য় সং, ১৫ পৃ। এই কবিবর প্রথম বয়সে কালীকান্তের বৈঠকে দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। সেই সময় তিনি কালীকান্তের অনুমতি মত সংস্কৃতের 'শেষবক্তা' বররুচি-ভাগিনেয় সুবন্ধু-কৃত গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তার' পদ্যানুবাদ করেন। ১৭৫৮ শকে বা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। কবির নিজের কথা এইরূপ :

'মদনমোহন, করিয়া যতন, কালীর সম্প্রীতি তরে
অসার আশার, করিতে সুসার, ভাষার রচনা করে।'

এই কাব্যে অত্যুক্তি, শ্লেষ, অনুপ্রাস ও আদি রসের একশেষ, অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য ও সুরুচি-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও কাব্যের শাব্দিক সৌষ্ঠবে এ গ্রন্থ অতুলনীয়।

২৫।৩০টি নীলের কুঠির আয় ছিল, তেমনই মহল কাল্না ও হোগলা পরগণা ১১ বৎসরের জন্য ইজারা ছিল বলিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিবচন্দ্রের মধ্যম পুত্র কালীকান্তই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি নল্দী পরগণার নায়েব বা সাজোওয়াল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তরফ নহাটা, মিঠাপুর এবং লাট-উজিরপুর, এই তিনটি সম্পত্তি নল্দীর অধীন পত্তনী লন। এতদ্ব্যতীত পরগণা ইমাদপুরের ।/৪ অংশ বগচরের আঢ্য জমিদারদিগের নিকট হইতে খরিদ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পদ যেমন জোয়ারের জলের মত আসিয়াছিল, তেমনই কয়েক বৎসরের মধ্যে (১২৮৩-৮৮ সাল) একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। তরফ নহাটা নীলকর সেলভি সাহেবের নিকট বিক্রয় করা হয়; নড়াইলের সরিক গুরুদাসবাবুর হাটবাড়িয়া লাট-উজিরপুরের অন্তর্গত ছিল। গুরুদাসবাবু কালীকান্তের শ্যালী-পুত্র; এজন্য তিনি যখন জ্ঞাতি-বিরোধের জন্য পৃথক বাড়ী করিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন তাঁহার প্রার্থনামত কালীকান্ত উজিরপুর কোবলা করিয়া দেন। বগচরের আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর সহিত কালীকান্তের ধর্ম্ম-বন্ধুত্ব ছিল; মিঠাপুর নীলাম হইবার সময়ে কালীকান্ত উহা আনন্দচন্দ্রের বিনামে খরিদ করেন। কিন্তু আনন্দচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর সে বিনাম আর স্বনাম হয় নাই। ইমাদপুরের অংশও নিলামে বিক্রয় হইলে, চাঁচড়ার রাজা খরিদ করেন। এইরূপে অল্পদিনমধ্যে নওয়াপাড়ার জমিদারগণ জমিদারী-বিহীন হইয়া পড়েন। কবির উক্তিতে কালীকান্ত সম্বন্ধে, "যা'রে গুণ দিয়া ব্রহ্মা হলেন নিগুর্ণ" ইত্যাদি অত্যুক্তি যাহাই থাকুক, তিনি যে 'বিশিষ্ট বলিষ্ঠ শিষ্ট' ইষ্ট-নিষ্ঠ প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সে বিপুল সৌভাগ্যের সঙ্গে নওয়াপাড়ার রায় চৌধুরীদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আর তাঁহাদের ভগ্ন-প্রায় সৌধরাজির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। এক্ষণে এই বংশের প্রায় অধিকাংশই চাকরী-জীবী। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ-যোগ্য; নবকান্তের পুত্র দুর্গাকান্ত সবজজ্ হইয়াছিলেন; কালীকান্তের পৌত্র নলিনীনাথ ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ চাকরী করেন; কালীকান্তের পুত্র কেশবলাল ও তৎপুত্র শৌরীন্দ্রনাথ সব-রেজিষ্ট্রার এবং রতিকান্তের পৌত্র মণীন্দ্রলাল যশোহর কালেক্টরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

- ১৭ রাজা কংসনারায়ণ
  - ১৮ রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী [নওয়াপাড়া]
    - ১৯ রামরাম [বড বাড়ী]
      - কালী
        - কৃপারাম
          - শ্রীনাথ
            - শ্যামাচরণ
              - উপেন্দ্র
                - গুরুদাস
                  - পুলিন
                - দুর্গাদাস
      - ২০ মধুসূদন
        - ২১ শিবচন্দ্র
        - লক্ষ্মীনারায়ণ
          - গোলক
            - দীননাথ
    - রামকিশোর [নূতনবাড়ী]
      - রামহরি
        - তারিণী
          - দিগম্বর
            - দুর্গাবর
              - শরৎ, শ্রীশ, ও সতীশ
        - ভবানী
          - শ্রীরাম
            - শ্রীপতি
              - খগেন্দ্র
      - ২১ নিমানন্দ
        - দেবনারায়ণ
          - রামেন্দ্র
            - ২৪ যোগেন্দ্র
              - ২৫ কালীকৃষ্ণ
              - শিবকৃষ্ণ
              - জয়কৃষ্ণ
            - নগেন্দ্র
              - বিনোদ
            - ব্রজেন্দ্র
              - ননী
      - জয়চন্দ্র
        - রামসুন্দর
          - সুধীর প্রভৃতি

- ২১ শিবচন্দ্র
  - ২২ রতিকান্ত
    - নীলমাধব
      - হেমন্ত
        - শরৎ
          - ২৬ শিশির
    - দেবলাল
      - তরণীকান্ত
        - কিরণ
    - প্যারী-লাল
      - মণীন্দ্রলাল
        - ব্রজলাল প্রভৃতি
  - কালীকান্ত
    - কেশবলাল
      - ২৪ শৌরীন্দ্র-নাথ
    - কৈলাস
      - নলিনী-নাথ
  - বাণীকান্ত
    - ইন্দুভূষণ
      - মহেন্দ্র
      - সুরেন্দ্র
  - নবকান্ত
    - দুর্গাকান্ত [সবজজ্]
      - ২৪ সতীকান্ত বি, এ প্রভৃতি
    - তারাকান্ত
      - বীরেশ্বর প্রভৃতি

(ঘ) রা ড়ু লী শা খা॥ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাজী যখন লাউজানির রাজা মুকুটরায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করেন, তখন নীলাম্বর বা তৎপুত্র গদাধর হাজিরালি

হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, গদাধরের পুত্র শ্রীরাম মল্লিক মোগল সুবাদারের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মলই পরগণার জমিদারী বহাল থাকে।[১] এই সময়ে শ্রীরাম মল্লিক কপিলমুনির নিকটবর্ত্তী হরিঢালী গ্রামে নদীতীরে বাস করেন। শ্রীরামের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম রামগোপাল রায়। নীলাম্বর হইতে শ্রীরাম পর্য্যন্ত কয়েক পুরুষের বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। ১৭ পর্য্যায়ভুক্ত রামগোপালই রাড়ুলী শাখার আদি।

রামগোপালের চারি পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি, কমলাকান্ত, গোপীকান্ত, রঘুনন্দন ও শ্রীহরি। ইহার মধ্যে গোপীকান্তের বংশ-ধারা ধরিতে পারি নাই। রঘুনন্দন হইতেই রাড়ুলী ধারা বাহির হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত অত্যন্ত বলবান পুরুষ ছিলেন; পালোয়ান তীরন্দাজ রূপে তাঁহার সমকক্ষ পাওয়া দুর্ল্লভ ছিল। এই সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণ জলপথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বড় অত্যাচার করিত (৪৫৮ পৃ)। কমল রায় সবল হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া জলপথে গুপ্তভাবে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। এবং তিনি পরিবারবর্গকে নিরুপদ্রব করিবার নিমিত্ত নদীকূল ত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে একটু দূরে এক গড়কাটা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। হরিঢালীতে সে বাটির ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। দস্যুর অত্যাচার নিবারণ জন্য লোকজন রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে গিয়া, কমল রায় বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং বহু বৎসর ধরিয়া ঢাকার নবাব সরকারে রীতিমত রাজস্ব সরবরাহ করিতে পারেন না। তখন চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ও এতদঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারী। তখনকার পদ্ধতি অনুসারে কিরূপে নিকটবর্ত্তী জমিদারগণের মালগুজারি রাজা মনোহরের সামিল হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (৪৯৫-৬ পৃ)। এইভাবে কমলাকান্তের রাজস্ব মনোহরের সামিল হয় এবং তিনি মলই পরগণার রাজস্ব প্রতি সন নিজে দাখিল

১ মলই নামক পৃথক পরগণার নাম 'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ খলিফাতাবাদ সরকারের মধ্যে যে ক্ষুদ্র পরগণা 'Taaluk of Srirang' বলিয়া উক্ত হইয়াছে [*Ain.*, (Jarrett), Vol. II, p. 134], তাহাই মলই পরগণা হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, মৌলিক বা মল্লিক কথা হইতে মলই হইয়াছে। শ্রীরাঙ্গ বা শ্রীরাম তালুকের রাজস্ব ২৬,৪২৭ দাম। কপিলমুনির পার্শ্বে শ্রীরামপুর গ্রাম শ্রীরাম মল্লিকের নাম রাখিয়াছে।

করিয়া জমিদারীটি রক্ষা করিতেন। কমলাকান্ত অবশেষে সে বাকী দেনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, পরগণাটি কোবালায় মনোহর রায়কে লিখিয়া দেন (১৬৯৯ খৃঃ)।[১]

রাড়ুলী-রায় বংশের প্রাচীন দলিলাদি হইতে দেখিতে পাই, কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ মলই পরগণার অন্তর্গত বুড়নপুর গ্রামের একাংশে গিয়া বসতি করেন, এজন্য সে পাড়াকে 'রায়ের আলি' বলিত, উহাই অপভ্রংশে এক্ষণে বাড়লী বা রাড়ুলী দাঁড়াইয়াছে। রামকৃষ্ণের সময়ও খাঁটিভাবে রাড়ুলীতে বসতি হয় নাই; পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হরিঢালী এবং কেহ কেহ রাড়ুলীতে থাকিতেন। রামকৃষ্ণ-তনয় রামপ্রসাদের চারি পুত্র ছিল; শিবচরণ, দয়ারাম, শুকদেব ও চন্দ্রশেখর। ইহার মধ্যে দয়ারাম ব্যতীত আর কাহারও বংশ নাই। শিবচরণ বা শিবচন্দ্র হরিঢালীতে থাকিতেন। তিনি ঢাকার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর মুন্সী ছিলেন এবং যখন (১৭৮১ খৃঃ) যশোহর ইংরাজ বাজত্বের সর্ব্ব প্রথম রাজস্বকেন্দ্ররূপে পরিণত হয় (Westland, p. 54), তখন শিবচরণ কার্য্য লইয়া যশোহব আসেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ দয়ারামের পুত্র মাণিকচন্দ্র সেই চাকরী পান (*See*, Letter No. 227 from the Collector of Jessore to the Board of Revenue, Fort William, dated 26. 5. 1800), এবং ৩৫ বৎসর কাল নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুত্র আনন্দলাল ১৮ বৎসর বয়সে গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু (১৮৬১ খৃঃ) পর্য্যন্ত হুগলী ও যশোহরে নানা-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল যশোহরে কাটিয়াছিল। সেই সময়ে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র রায় 'পারশী, উর্দ্দূ ও বঙ্গভাষায় সুপারগ' বলিয়া কালেক্টরীতে মুন্সীগিরি পদে নিযুক্ত হন (১৮৪৭)। আনন্দলাল যশোহরে

১ *Westland, Report,* p. 45. চাঁচড়া রাজ সরকারের পুরাতন কাগজপত্রের মলই পরগণা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই: 'সাবেক জমিদার কমলাকান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায় এই দুইজনা ছিল। মালগুজারী মনোহর রায়ের সামিল। পরে বাকী আটকাইলে সরবরাহ করিতে না পারিয়া বাকিতে কবলা করিয়া দিলেক। সাবেক দুই জমিদারের সন্তান রাড়ুলী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। কমলাকান্ত রায়ের পৌত্র শিবচরণ হরিঢালীতে বর্ত্তমান আছে'। যে শিবচরণের কথা উল্লিখিত আছে, তিনি কমলাকান্তের পৌত্র নহেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণের পৌত্র।

থাকিবার সময় উহার সন্নিকটে কিছু তালুক অর্জ্জন করেন এবং তথাকার প্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ধোপাখোলায় একটি সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। আনন্দলালের সময়েই রাড়ুলীর সুন্দর অট্টালিকা সমন্বিত বৃহৎ আবাসবাটী নির্ম্মিত হয়। এই আনন্দলালের পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায় স্যর প্রফুল্ল-চন্দ্রের পিতা এবং পুত্র-সম্পদে তিনি আজ দেশবিখ্যাত।

হরিশ্চন্দ্র রায় সময়োচিত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও ফারসীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সমাজমধ্যে আধুনিক সভ্যতার উদার মতাবলম্বী এবং অগ্রণী ছিলেন। নিজে যেমন শিক্ষিত, তিনি শিক্ষালোকে প্রতিবেশিগণকে উন্নত করিবার জন্য তেমনই উদ্যোগী ছিলেন। এমন কি, ১৮৪৫ অব্দে তিনিই প্রথম রাড়ুলীতে বালিকা-বিদ্যালয় খুলেন এবং বহু বৎসর যাবৎ নিজ গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুলের যাবতীয় আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করেন। ১৯০৩ অব্দে ঐ বিদ্যালয় হাই স্কুলে পরিণত হওয়া অবধি তাঁহারই মধ্যম পুত্র নলিনীকান্ত উহার সম্পাদক এবং তৃতীয় পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে উহার পৃষ্ঠপোষক আছেন। এতদিন পর্য্যন্ত স্কুল তাঁহাদেরই নিজবাটীতে ছিল; সম্প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্টের বিপুল সাহায্যে স্কুলটির জন্য পৃথক্ স্থানে বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র যে শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর হইতে অব্যাহত উন্নতিতে ফলপ্রসূ বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র সম্প্রতি স্থানীয় লোকের শিক্ষাকল্পে পৃথক্‌ভাবে সমিতি গঠন করিয়া যে অর্থভাণ্ডার দান করিয়াছেন, তাহার ফলে স্কুলটি যে কালে কলেজে পবিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? হরিশ্চন্দ্র নিজের চারিটি পুত্রের শিক্ষার জন্য অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়াধিক্য করিয়াছিলেন। আজ দেশের লোকে তাঁহার সে প্রচেষ্টার ফলভাগী হইয়াছে। তাঁহার মত পুত্রভাগ্য যশোহর-খুলনার মধ্যে কাহারও হয় নাই।

হরিশ্চন্দ্রের চারি পুত্র—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। সকলেই জীবিত, তন্মধ্যে মধ্যম ও কনিষ্ঠ বাড়ীতে থাকেন; জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া বহু বৎসর যাবৎ ডায়মণ্ডহারবারে ওকালতী করিতেছেন। মধ্যম পুত্র 'রায় সাহেব' নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী; তাঁহার বিশেষ পরিচয় আমরা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নানাপ্রসঙ্গে দিয়াছি (১১২-১৩ পৃ)। স্বীয় পিতৃপুরুষের মত তিনি প্রজারঞ্জক ভূম্যধিকারী, তাহাতে আবার কৃতবিদ্য

অভিজ্ঞ ডাক্তার; এজন্য সর্ব্বজাতীয় লোকে তাঁহাকে আপন জনের মত ভালবাসে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিকারী এবং সমগ্র সুন্দরবন তাঁহার নখ-দর্পণ-স্বরূপ। তিনি কি ভাবে আমার সঙ্গে সুন্দরবনের গহনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, পুরাতত্ত্বের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিয়া এই ইতিহাস সঙ্কলনের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন, কি ভাবে আমি অপরিশোধ্য ঋণে তাঁহার নিকট সমাবদ্ধ, ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে পারি না।[১]

মহামতি হরিশ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (Sir P. C. Ray, Kt., C. I. E., D. SC., PH. D., F. C. S., &c.)। এই পুস্তকের তৃতীয় অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডে আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখিব। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই তাঁহাদের জীবনী বাহির হয়, তিনি তাহার অন্যতম; অনেকেই তাঁহার প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও অবদানের কথা জানেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য; সংসার-ধর্ম্মে বিলাস-বিরহিত ঋষিকল্প চিরকুমার, দেশের ও দশের সেবায় একাগ্রকর্ম্মী দানবীর; তাঁহার পরিচয় আমি কি দিব? যশোহর-খুল্‌নায় এমন শিক্ষিত ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি খুল্‌না জেলার এই কৃতী সন্তানের এবং দেশের এই একনিষ্ঠ সেবকের দানের কথা, ধ্যানের কথা, কর্ম্মের কথা ও মর্ম্মের কথা না শুনিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী বলিলে ঠিক হয় না; এই পুস্তকই তাঁহার, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক স্থানে রাজার দানে পুস্তক প্রকাশিত হয়, কিন্তু রাজার প্রাণ তাহার মধ্যে থাকে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আমাকে জাগাইয়া কার্য্যব্রতী করিয়াছিলেন, তাঁহারই অযাচিত অনুকম্পায়, তাঁহারই প্রাণের মহিমায় গত দ্বাদশবর্ষকাল দেশের পুরাতত্ত্বের আলোচনার কঠোর সাধনায় একাগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের বেলা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছি। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের অপার্থিব চরিত্রে, অসামান্য প্রতিভায় এবং অপরিসীম ত্যাগ-মাহাত্ম্যে তাঁহার দেশ, তাঁহার স্বজাতি এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ বংশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।[২]

১ [ইতিহাসপ্রিয় ও জনকল্যাণব্রতী নলিনীকান্ত ১৮।১২।১৯২৪ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন; ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১১৮ পৃ দ্র.—শি মি]

২ [দেশবরেণ্য মহামানব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৬।৬।১৯৪৪ তারিখে ৮৩ বৎসর বয়সে তিরোধান করেন।—শি মি]

রাড়ুলীর রায়-চৌধুরী বংশ।

- ১৩ শিবদাস চৌখণ্ডী
  - ১৪ নীলাম্বর খাঁ
    - ১৫ গদাধর রায়
      - ১৬ শ্রীরামমল্লিক
        - ১৭ রামগোপাল রায় [হরিঢালী]
          - ১৮ কমলাকান্ত
            - রাজবল্লভ
              - রামসন্তোষ
                - হরেকৃষ্ণ
                  - ২২ ভৈরবচন্দ্র
                  - রামজয়
                    - সৃষ্টিধর
                      - ২৪ রসময়
                        - ২৫ হরষিত [হরিঢালী]
                      - জগৎ
                      - সুখময়
                  - রামতনু
                    - মদনমোহন
                      - শীতলচন্দ্র
                        - ২৫ যতীন্দ্র
          - গোপীকান্ত
          - ১৮ রঘুনন্দন
            - ১৯ রামকৃষ্ণ [রাড়ুলী]
              - ২০ রামপ্রসাদ
              - রামচরণ
                - জগন্নাথ
                  - গোলক
                    - পার্ব্বতী
                      - সৃষ্টিধর
                        - মণীন্দ্র
                      - ভূধর
              - ভাগ্যমন্ত
                - বৈদ্যনাথ
                  - শ্রীমন্ত
                    - শ্যামাচরণ
                      - অবিনাশ
                        - ২৫কালীপদ
          - শ্রীহরি
            - রামভদ্র
              - জয়দেব
                - তুলারাম
                  - গোরাচাঁদ
                    - রামনারায়ণ
                      - কমলাকান্ত
                        - কাশীশ্বর প্রভৃতি
                - রূপরাম
                  - রামতনু
                    - দ্বারিক
                      - প্যারী
                        - ক্ষীরোদ

- ২০ রামপ্রসাদ
  - শিবচন্দ্র
  - শুকদেব
  - ২১ দয়ারাম
    - ২২ মাণিকচন্দ্র
      - ২৩ আনন্দলাল
        - ২৪ হরিশ্চন্দ্র
          - ২৫ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র
            - যতীন্দ্রনাথ
              - জগন্নাথ
          - রায়সাহেব নলিনীকান্ত
            - ২৬ যামিনী
            - অবনী
            - ধরণী
          - ২৫ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র C. I. E.
          - পূর্ণচন্দ্র
            - চারুচন্দ্র
    - বৈকুণ্ঠনাথ
      - রামলাল [দত্তক]
        - রাজেন্দ্রলাল
          - নরেন্দ্র প্রভৃতি
  - চন্দ্রশেখর

দ্বি তী য় অং শ

ঐতিহাসিক

২. ইংরাজ আমল

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

বৃটিশ-শাসন ও হেক্কেলের কীর্ত্তি

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইভের নিকট পরাজিত ও পলায়িত হইলেন বটে, কিন্তু উহাতে নবাবী শাসনের পরিবর্ত্তন হয় নাই; কারণ সিরাজের নৃশংস হত্যার পর, তাঁহার স্থলে মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসান হইল। তবে বিশ্বাসঘাতকতার বিষদোষে মানুষের মেরুদণ্ড বিনষ্ট হয়, তাঁহার আত্মসম্মান বা স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান থাকে না; মীরজাফর ইংরাজের হস্তে কলের পুতুল হইয়া বসিলেন, লোকে তাঁহাকে 'কর্ণেল ক্লাইভের গর্দ্দভ' বলিয়া উপহাস করিত।[১] এমন কি, তাঁহার ইংরাজ-প্রভুই তাঁহাকে অকর্ম্মা সাব্যস্ত করিয়া গদিচ্যুত করতঃ তাঁহার জামাতা মীরকাশেমকে নবাব-তক্তে বসাইলেন। কিন্তু মীরকাশেমের প্রকৃত চরিত্র পূর্ব্বে জানা যায় নাই; তিনি যখন স্বদেশীয় রাজ-তক্তের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মাথা তুলিলেন, তখন তিনি বিদ্রোহীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হইলেন এবং পলায়ন করিয়া দীনহীনের মত জীবন শেষ করিলেন। অহিফেনসেবী, কুষ্ঠাক্রান্ত, বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য মীরজাফরের আবার ডাক পড়িল, কিন্তু অচিরে মৃত্যু তাঁহার বিষণ্ণ অবসন্ন জীবনের সমাপ্তি করিয়া দিল। বঙ্গীয় মুসলমান-শাসনের স্বাতন্ত্র্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এই সঙ্গে শেষ হইয়া গেল। ইহার পর বৈদেশিক শাসক-সম্প্রদায়ের ক্রীড়া পুতুলের মত কত জন নবাব-তক্তে বসিয়া বৃত্তিভোগ করিলেন, তাঁহাদের কাহিনীর সহিত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

১৭৬৫ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন; তখন অর্থ আসিল ইংরাজের হস্তে, শাসন থাকিল চরিত্রহীন মজ্জাহীন স্বার্থসম্বন্ধহীন নবাবের হাতে। সুতরাং কড়াকড়ি করিয়া শুধু টাকাকড়িই আদায় হইত; তাহারও কতক ইংরাজ কোম্পানির হস্তে পৌছিত, কতক দেশীয় দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারীরা চুরি করিয়া খাইত; জবরদস্তি করিয়া অতিরিক্ত আদায়ের চাপ নিরীহ প্রজাবর্গের উপর পড়িয়া

১ Stewart, *History of Bengal* (Bangabasi edition), p. 608.

তাহাদিগকে নিঃস্ব ও নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর আবার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বশতঃ অনাবৃষ্টি হওয়ায়, ১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খৃঃ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, উহাতে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পড়িল। ঐ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যশোহর-খুল্‌নায়ও আসিয়াছিল ; যে অঞ্চলে 'সকল ধান ২২ পাহারী' (১১০ সের) ছিল, সেখানেও এই 'কাটা' মন্বন্তরে টাকায় দশসের করিয়া ধান্য বিক্রয় হইয়াছিল। নদীমাতৃক দেশ বলিয়া লোকের একেবারে অন্নাভাব বা অতিরিক্ত প্রাণহানি হয় নাই।[১]

এই দুর্ভিক্ষের পর ভারত-শাসনের উপর বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়ে এবং নূতন বিধানানুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গের গবর্ণর হইয়া দেওয়ানী আফিস মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনেন (১৭৭২)। আসিয়াই তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য স্থানে স্থানে কালেক্টর বা সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। কিন্তু খরচের ভয়ে শীঘ্রই সে প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল। যশোহরে প্রায় দুই বৎসরকাল একজন কালেক্টর ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তুলিয়া লওয়ায় কর সংগ্রহে গোলমাল ঘটিল। প্রকৃত পক্ষে ১৭৮১ অব্দের পূর্ব্বে, যশোহরে কোনই শাসন থাকিল না। নবাবী আমলে ভূষণা ও মীর্জানগর এই দুই স্থানে দুইজন ফৌজদার থাকিয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন এবং অবস্থানুসারে যাঁহারা নবাবের প্রিয় পাত্র, সেই সব জমিদারদিগকে প্রতিবেশীর সম্পত্তি নিজের সামিল করিয়া লইতে সাহায্য করিতেন। নবাবী শাসন গিয়াছে, কিন্তু বৃটিশ শাসন আসে নাই ; এই সন্ধিযুগে ফৌজদার না থাকায় অরাজক দেশে জমিদারেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চাঁচড়ার সন্নিকটে প্রাচীন মুড়লীতে মুসলমান আমলের একটি শাসন-কেন্দ্র ছিল। ১৭৮১ অব্দে ইংরাজেরাও ঐ স্থানে একটি 'আদালত' বা কাছারী খুলিলেন এবং যশোহর, ফরিদপুর ও খুল্‌নার অধিকাংশ স্থান উহার শাসনাধীন হইল। গবর্ণর-জেনারেল তখন টিলম্যান হেঙ্কেল (Tilman Henkell) নামক সুযোগ্য সদাশয় ব্যক্তিকে মুড়লীতে জজ্‌ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সহকারী (Registrar) হইয়া আসিলেন রিচার্ড রোক সাহেব (Richard Rocke)। উভয়ের জন্য উচ্চ বেতন ও বাসস্থানের

১ Khulna Gazetteer, p. 102.

ব্যবস্থা হইল। মুড়লীতে একটি পুরাতন কুঠি ছিল, তাহাই মেরামত করিয়া হেঙ্কেল সাহেব নিজের মনোমত করিয়া লইলেন।

নিয়ম হইল, জজ্ সাহেবই পূর্ব্বতন ফৌজদার ও থানাদারের কার্য্য করিবেন। পূর্ব্বে পুলিস বিভাগের কার্য্য থানাদারেরা করিতেন, এখন এই বিভাগের ভার-প্রাপ্ত হইয়া জজের অন্য নাম হইল ম্যাজিষ্ট্রেট। অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য মুড়লী ও ভূষণায় দুইজন দারোগা ছিলেন। কিন্তু দারোগারা মুখ্যতঃ তখনও মুর্শিদাবাদের নাজিম বা নবাবের অধীন ছিলেন, কারণ ফৌজদারীর শাসনভার তখনও কোম্পানির হস্তে যায় নাই। জেল বা কারাগার এবং মোকদ্দমার কাগজ পত্র সবই দারোগার হাতে থাকিত। নায়েব নাজিমের হুকুম তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত দিয়াই পাইতেন, তবুও তাঁহারা অনেক সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম মানিতেন না; দ্বৈধ-শাসনের ইহাই ফল।

হেঙ্কেলের আসিবার পূর্ব্বে ৪টি প্রধান থানা ছিল, ভূষণা ও মীর্জানগরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহা ব্যতীত খুল্‌নার অপর পারে নয়াবাদ এবং কেশর-পুরের কাছে ধরমপুরে দুইটি থানা বসিয়াছিল। দেশে তখন চুরি ডাকাইতি খুব চলিতেছিল, থানার লোকেরা অনেক সময়ে দুর্ব্বৃত্তদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া রক্ষকেরাই ভক্ষক হইত। হেঙ্কেল সাহেব প্রত্যেক থানায় প্রধান দারোগার অধীন দেশী বরকন্দাজ না রাখিয়া, বিদেশী সিপাহী রাখার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাব মঞ্জুর হইল, মুড়লীতে ৫০ জন, ভূষণা ও মীর্জানগরে ৩০ জন করিয়া এবং ধরমপুরে ৪ জন সিপাহী গেল। নয়াবাদে পৃথক্ সিপাহী থাকিল না; খুল্‌নায় (বর্ত্তমান কয়লাঘাট) যে নিমক-চৌকি ছিল, তথাকার লোকদ্বারাই থানার কার্য্য চালাইয়া লওয়া হইত।

এইভাবে পুলিস রক্ষা করিতে যথেষ্ট খরচ পড়িতে লাগিল। তাৎকালিক গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে উহা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইল। পর বৎসর (১৭৮২) হেঙ্কেলের ব্যবস্থা উন্টাইয়া দিয়া, কোম্পানি এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিলেন যে, তখন হইতে জমিদার তালুকদারগণ দেখিবেন যেন তাঁহাদের স্ব স্ব এলেকায় কোন চুরি ডাকাইতি বা খুন না হয়, ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশমত তাঁহাদিগকেই স্থানে স্থানে থানা রাখিতে হইবে এবং প্রজার চরিত্রের জন্য তাঁহারাই দায়ী থাকিবেন। চুরি ডাকাইতির জন্য প্রজার ক্ষতিপূরণ জমিদারকেই করিতে হইবে, এসব হুকুম পালন করিয়া দেশের শান্তিরক্ষা করিতে না পারিলে,

উঁহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এই ভীষণ সারকিউলারের জন্য জমিদারেরা বিষম বিপন্ন হইলেন। মোট ৫টি স্থলে থানা বসিল ১৩টি, তন্মধ্যে ঝিনেদহ ও নয়াবাদের থানা গবর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে রহিল। ১৭৮২ হইতে ১৭৯২ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিল, কিন্তু চুরি ডাকাইতি ঠেকাইল না। ইস্তাহার যেমন আসিল, তেমনই থাকিল, উহা কখনও কার্য্যে পরিণত হইল না। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পণ্ড হইল।

হেঙ্কেল সাহেব জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিচারের ক্ষমতা তাঁহার হাতে ছিল না। তিনি আসামী ধরিয়া চালান দিলে, দারোগা বিচার করিতেন। সে দারোগা নিজামের লোক, কোম্পানির কর্ম্মচারী নহেন। এতদতিরিক্ত তিনি দারোগার কাজে হাত দিতে পারিতেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে দারোগার হাতে যাইতেই আসামীর মাসাধিক লাগিত, সেখানে যে কত মাস কাটিত, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। দারগা এক প্রকার কাজির বিচার করিতেন; কখনও সামান্য শাস্তি দিয়া ঘোর দুর্ব্বৃত্তকে ছাড়িয়া দিতেন, কখনও বা অতিরিক্ত শাস্তি দিয়া চিরজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুদণ্ড, কারাযন্ত্রণা, বেত্রাঘাত বা অঙ্গহানি এই চারিপ্রকারে শাস্তি দেওয়া হইত।[১]

তখনও ডাকাইতেরা সর্ব্বত্র উৎপাত করিত। এই আমলের একজন নামজাদা ডাকাইত ছিল—হীরা সর্দ্দার। নবাবের লোকেরা চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারে নাই। জমিদারেরা কখনও বা ডাকাইতদিগকে হাতে রাখিতেন; তাঁহারাই মিথ্যা করিয়া হীরার মৃত্যু খবর প্রচার করিয়া দেন। ইংরাজ আমলে ধরা পড়িয়া হীরা জেলে গেল; কিন্তু জেল হইতে তাহাকে খালাস করিবার জন্য খুল্‌নায় ৩০০ লোক জমা হইয়াছিল; তখন হেঙ্কেল সাহেব পূর্ব্বোক্ত মত মুড়লীতে ৫০ জন সিপাহী আনিয়া আত্মরক্ষা করেন। জমিদারেরাও অনেক সময়ে লুটতরাজে লিপ্ত থাকিতেন। ১৭৮৩ অব্দে ভূষণা হইতে যখন কলিকাতার দিকে ৪০,০০০৲ টাকা চালান যাইতেছিল, তখন পথে তিন হাজার লোকে পড়িয়া উহা লুটিয়া লয়। সে আসামীরা আর ধরা পড়ে নাই। নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় লাঠিয়াল লইয়া একখানি চাউলের নৌকা লুটিয়া লন; সম্ভবতঃ নৌকার মালিককে নির্য্যাতন

১ Summarised from Westland, *Jessore*, Chap. XIII-IV.

করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। অনেক দিন পরে অনেক কষ্টে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া, ৪০ জন পাহারা সহ আনিয়া মুড়লীর হাজতে রাখা হয়, কিন্তু দারোগার বিচারে তিনি খালাস পান। ভূষণাতেই ডাকাইতের বেশী উপদ্রব ছিল, কিন্তু নাটোরের রাজা সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। ১৭৮৪-৫ অব্দে নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ হয়; ঐ সময়ে ডাকাইতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

দেওয়ানী বিচারের জন্যই হেঙ্কেল সাহেব ছিলেন জজ্; ১৭৯৩ অব্দে মুন্সেফ নিয়োগের পূর্ব্বে অন্য কোন দেওয়ানী বিচারক ছিল না। হেঙ্কেল সাহেবও একক বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। জমির স্বত্ব বা ব্রহ্মোত্তরাদির সম্বন্ধেই অধিক মোকদ্দমা হইত; উহার বিচারের জন্য তিনি স্থানীয় জমিদারদিগের উপর ভার দিতেন। সুতরাং যেখানে প্রজা ও জমিদারে কলহ, সেখানে কোন কাজ হইত না। বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি কয়েকজন সদর আমীন নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন; ব্যয়বাহুল্য মনে করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উহা মঞ্জুর করিলেন না।

হেঙ্কেল সাহেবের আরও বিপত্তি ঘটিয়াছিল। কোম্পানি শুধু শাসক নহেন, তখন তাঁহাদের নানাবিধ ব্যবসায়ও ছিল। যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে লবণ ও কাপড়ের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য। এই উভয় ব্যবসায়ের জন্য পৃথক্ লোকজন ছিল; কিন্তু তাহারা দেশের সাধারণ শাসন মানিয়া চলিত না। এজন্য হেঙ্কেল সাহেবের সঙ্গে তাহাদের নিত্য কলহ ঘটিত, সময়ে সময়ে মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত চলিত। মহামতি হেঙ্কেল এদেশীয় প্রজার জন্য স্বদেশীয় লোকের সঙ্গে বিরোধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইজন্যই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

প্রথমতঃ লবণের ব্যবসায়ের কথা বলিয়া লইতেছি। সুন্দরবনের রায়মঙ্গল বিভাগের উৎপন্ন লবণের ব্যবসায়ের সদর কাছারী বা আফিস ছিল খুল্‌নায়; উহাকে নিমক-চৌকি বলিত; উহার প্রধান কর্ত্তা ছিলেন ইউয়ার্ট সাহেব (Ewart)। তাঁহার অধীন দুইজন দারোগা এবং যথেষ্ট লোকজন ছিল।[১]

১ Calcutta Rev., 1878, p. 420. খুল্‌নার নিকটবর্ত্তী মুছর্ব্বপুরগ্রাম নিবাসী, সাতুরাম মজুমদার মহোদয় এক সময়ে খুল্‌নার নিমক মহলের দারোগা ছিলেন। তখন ইহা বেশ নামের ও পয়সার চাকরী ছিল। মজুমদার মহাশয় উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। খুল্‌নায় স্কুলের জন্য পাকা ঘর এবং নদীর উপর সুন্দর ঘাট তিনিই প্রস্তুত করিয়া দেন। সে ঘাট নদীগর্ভস্থ

সুন্দরবনের মধ্যে নদীতীরবর্ত্তী স্থানে লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু সেখানে লোকের বাস ছিল না। আবশ্যক লোক অর্থাৎ মাহিন্দার গ্রাম হইতে দাদন দিয়া সংগ্রহ করিতে হইত। এইরূপে মাহিন্দার সংগ্রহ করিয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য যাঁহারা সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করিয়া লইতেন, তাঁহাদিগকে মোলঙ্গী বলিত। সুন্দরবনের লোনা জায়গায় মাটিতে লবণ হইত। ঐ লোনা মাটি অল্প অল্প কোপাইয়া রাখিয়া, উহার উপর খালের লোনা জল ভর্ত্তি করিয়া চারিপাশ বাঁধিয়া রাখা হইত। জল নির্ম্মল হইলে যখন নিম্নে লবণ পড়িত, তখন আস্তে আস্তে জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। যে খোলা মাটি রহিল, তাহা উপর উপর তুলিয়া লইয়া কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইত এবং উহার নিম্নে বড় বড় চাড়ি পাতা থাকিত। চাড়িতে জল জমিলে সেই জল মোলঙ্গা বা ভাঁড়ে করিয়া প্রকাণ্ড বাইনে (উনুনে) জ্বাল দিলে নূন পাওয়া যাইত। মোলঙ্গীরা মাহিন্দারের সাহায্যে এই কাজ করিতেন। এখনও অনেক স্থলে মোলঙ্গী উপাধি আছে, কিন্তু নিমকের কারবার এই লবণের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সস্তা সাদা বিলাতী লবণ এদেশে রপ্তানি হইয়া দেশীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃত লবণের ব্যবসায় মাটি করিয়া দিয়াছে।[১]

মাহিন্দারী কার্য্যে গরিব প্রজার পয়সার লোভ ছিল বটে, কিন্তু প্রাণের ভয়ে অনেকে গৃহ ছাড়িয়া জনশূন্য লবণাক্ত দূর দেশে সহজে যাইতে চাহিতেন না। রায়মঙ্গল বড় ভীতিসঙ্কুল স্থান ছিল, প্রতিবৎসর তথায় গিয়া বহুলোক মারা যাইতেন। এখনও কাহাকেও শাস্তির ভয় দেখাইতে হইলে রায়মঙ্গলে যাওয়ার কথা বলে। লোকে সহজে মাহিন্দারী লইতেন না; এমন কি, দাদন লইয়াও সময়মত কথামত কাজ করিতেন না। এজন্য মোলঙ্গীরা লোক সংগ্রহ জন্য জোর জুলুম করিতেন এবং সে সময়ে ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দিয়া

হইয়াছে। স্কুলের সে দালান নাই, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জিলা-স্কুলের জন্য বর্ত্তমান বিস্তীর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এবং উহার মধ্যবর্ত্তী হলে মজুমদার মহাশয়ের কীর্ত্তি রক্ষার জন্য স্মৃতি-ফলক সংযোজিত হইয়াছে।

১ যে সকল ছোট ভাঁড়ে লবণের রস সরবরাহ করা হইত, তাহার নাম রসাঙ্গী; নিমকের কারখানার স্থানকে নিমক-খালাড়ী এবং উহার প্রহরীদিগকে স্থল-পহরী বলিত। লবণের রাশির উপর যাহারা ছাপ দিতেন, তাঁহাদের নাম আদলদার। গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তি ব্যতীতও যাঁহারা লবণ প্রস্তুত করিতেন, উঁহাদের সাধারণ নাম ছিল মোলঙ্গী।

তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন। প্রজারা মোলঙ্গীর অত্যাচারের নালিশ করিলে, বা দাদন-প্রাপ্ত লোকেরা অন্য কারণে আসামী হইলে, হেঙ্কেল সাহেবের কার্য্যবিধির গোলযোগ উপস্থিত হইত এবং নিমকের সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটিত। তাই তিনি প্রজার পক্ষভুক্ত হইয়া নিমক মহলের কার্য্য প্রণালীর বিপক্ষে অবিরত অভিযোগ করিতেন এবং প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন দেওয়া যে অন্যায়, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেন। অবশেষে তিনি উভয়দিক রক্ষা করিবার জন্য নিজেই নিমক মহলের তত্ত্বাবধানের ভার অতিরিক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তখন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে রাজি হইয়া ইউয়ার্ট সাহেবকে খুল্‌না হইতে বাখরগঞ্জে সরাইয়া দিলেন। হেঙ্কেল ভার গ্রহণ করিয়াই প্রচার করিয়া দিলেন যে, (১) কয়েকটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার লইবার জন্য দাদন দেওয়া হইবে, (২) কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া দাদন দেওয়া হইবে না, এবং (৩) একবৎসরের দাদনের জন্য পর বৎসর দায়ী হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সঙ্গে আর একটি কথা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল যে, (৪) যদি দেখা যায়, প্রজারা স্বেচ্ছায় লবণের কারবারে কার্য্য করিতে চাহে না, তাহা হইলে এই ব্যবসায় বন্ধ করা হইবে। অবশেষে মহামতি হেঙ্কেলের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে এই বিষয়ক প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় নূতন আইন প্রণীত হইয়াছিল।[১]

যশোহরের মধ্যে দুইটি মাত্র স্থানে কোম্পানির কাপড়ের কারখানা ছিল। দুইটি স্থানই এক্ষণে খুল্‌নার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মধ্যে পড়িয়াছে। একটি কলারোয়ার নিকটবর্ত্তী সোনাবাড়িয়া, অন্যটি সাতক্ষীরার নিকটবর্ত্তী বুড়ন। এই দুই স্থানে কোম্পানির কর্ম্মচারী থাকিতেন; তাঁহারা দাদন দিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানের জোলা ও তাঁতিদিগের নিকট হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেন। এই সূত্রে জোলাদিগের সঙ্গে বিরোধ ঘটিলে যখন মুড়লীতে নালিশ হইতে লাগিল, তখন হেঙ্কেল সাহেব এই সকল কর্ম্মচারীর অত্যাচারের বিষয়ও রেভেনিউ বোর্ডের দৃষ্টিপথে আনিলেন এবং যথাসাধ্য ন্যায়বিচারের জন্য চেষ্টা করিলেন। এই সকল লেখালিখির ফলে উভয় পক্ষের বিরোধ ভঞ্জনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিয়ম করিতে বাধ্য হন। কোম্পানির লোকের কয়েক প্রকার কাপড়ের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল; এজন্য তাঁহারা কতকগুলি তন্তুবায়কে

১ Regulation 29 of 1793.

নিজের লোক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলেন; উঁহাদের উপর অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা ছিল না। উঁহাদের খাজানা বাকী পড়িলে বা উঁহাদের নামে ফৌজদারী নালিশ হইলে, কোম্পানির কর্ম্মচারীকে লিখিতে হইত। সুতরাং, কার্য্যতঃ কারবারী কর্ম্মচারী সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। হেঙ্কেলের প্রতিবাদেও বিশেষ ফল হয় নাই। তবুও তিনি ছাড়িবার লোক ছিলেন না। ন্যায়ের মর্য্যাদা ও শাসন-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী হইয়াও শাসন-সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় যে সব সংস্কার হইয়াছিল, উহার অধিকাংশের মূলীভূত কারণ যশোহরের হেঙ্কেল সাহেব। তাঁহারই প্রস্তাব মত ১৭৮৬ অব্দে যশোহর একটি পৃথক্ জেলারূপে পরিণত হয়। ইহাই বঙ্গদেশের প্রথম জেলা এবং তিনিই সে জেলার প্রথম কালেক্টর। এই জেলার সর্ব্ববিধ সুশাসন এবং স্থায়ী উন্নতির জন্য তিনি যে কত ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কলিকাতায় যাইবার যে প্রধান নদীপথ সুন্দরবনের মধ্য দিয়া ছিল, তাহা দস্যু-ডাকাইতের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। ঐ দস্যুদল উৎখাত করিবার জন্য, সুন্দরবনের পতিত ও জঙ্গলভূমি আবাদ করিয়া শস্যশ্যামলা করিবার জন্য এবং দীর্ঘ-মেয়াদী কয়েদীদিগের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য হেঙ্কেল মহোদয় বিশেষ উদ্যোগী হন। এই বিষয়ক তাঁহার প্রস্তাবসমূহ ওয়ারেণ হেষ্টিংস মঞ্জুর করিলে, তিনি বলেশ্বর ও কালিন্দীর মধ্যবর্ত্তী সুন্দরবন ভাগ নিজ কর্তৃত্বাধীন করিয়া উহার জরিপ জমাবন্দী করেন (১৭৮৪)। ইহারই ফলে ৬৪,৯২৮ বিঘা জমি বিলি হওয়ায় ১৪৪টি তালুকের সৃষ্টি হয়; উহাদিগকে হেঙ্কেলের তালুক বলিত।[১] উহাদের শাসন ও কর-সংগ্রহের জন্য তিনি তিনটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন—পশ্চিম প্রান্তে কালিন্দীকূলে হেঙ্কেলগঞ্জ,[২] মধ্যভাগে কপোতাক্ষীকূলে চাঁদখালি এবং

১ Pargiter, F. E., *Revenue History of the Sundarbans*, Chap. 1.

২ হেঙ্কেল সাহেবের নিজ নামে হেঙ্কেলগঞ্জ নাম হয়, উহাই অপভ্রংশে 'হিঙ্গুলগঞ্জ' দাঁড়াইয়াছে। প্রথম আবাদের সময় যখন অত্যন্ত বাঘের উৎপাত হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী স্থানটির নাম হেঙ্কেলগঞ্জ রাখিয়া ভাবিয়াছিল, সাহেবের ভয়ে বাঘের ভয় থাকিবে না। সুন্দরবনের ম্যাপ প্রস্তুত করিবার কালে উহাতে স্থানীয় লোকের উচ্চারণ-ভ্রম বজায় রাখিয়া হিঙ্গুলগঞ্জ লেখা হয়। সেই নামই চলিতেছে। ইহা সুন্দরবনের একটি প্রধান গঞ্জ বা বাজার।—24-Parganas Gazetteer, p. 242.

পূর্ব্বসীমায় বলেশ্বরতীরে কচুয়া। কিন্তু সুন্দরবনের উত্তরসীমা লইয়া পূর্ব্বতন জমিদারদিগের সঙ্গে অবিরত বিবাদ হওয়ায় এবং অবশেষে হেঙ্কেল সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া যাওয়ায়, উহার ব্যবস্থা বেশীদিন ভাল ভাবে চলে নাই। কতকগুলি তালুক জমিদারেরা বেদখল করিয়া লন, কতকগুলির ইস্তাফা হয়, কতকগুলির জন্য মোকদ্দমার ফলে গবর্ণমেণ্ট মালিকানা দিতে বাধ্য হন। সবিশেষ বিবরণ সুন্দরবন প্রসঙ্গে দিব। অবশেষে ১৮১৪ অব্দে সুন্দরবনের সংশোধিত জরিপ-ম্যাপ প্রস্তুত করাইয়া, গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য ইস্তাহার দ্বারা উহা পৃথক্ করিয়া লন। তদবধি নূতন বিলি বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে। আজ যে সুন্দরবন গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান আয়ের সম্পত্তি, হেঙ্কেলের প্রাথমিক চেষ্টা উহার ভিত্তি-স্বরূপ। নিজে কোন অতিরিক্ত বেতন ত লইতেনই না,পরন্তু সময়ে সময়ে নিজের তহবিল হইতে অর্থ দিয়া আবাদকারী তালুকদারদিগকে সাহায্য করিতেন।[১] তিনি প্রজাদিগকে সন্তানের মত ভালবাসিতেন। 'কৃতজ্ঞ প্রজারা তাহাদের প্রাণের অনুরক্তি দেখাইবার জন্য প্রত্যেক গৃহে তাঁহার মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া দেবতার মত পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একথাটি পরে সংবাদরূপে সেকালের একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। (২৪।৪।১৭৮৮)'।[২]

১ Westland, *Jessore*, pp. 106-7 : Hunter, *Statistical Accounts*, Vol. I, p. 328.

২ 'কলিকাতা, সেকালের ও একালের', ৬৭২ পৃ।

দ্বি তী য় প রি চ্ছে দ

যশোহর-খুল্‌না : গঠন ও বিস্তৃতি

১৭৭২ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াই রাজস্ব আদায়ের জন্য স্থানে স্থানে কালেক্টর বসাইয়া দেন। ঐ সময়ে ফরিদপুর, যশোহর ও খুল্‌না লইয়া একটি তহশীল-বিভাগ গঠিত হইয়া একজন কালেক্টরের হস্তে ন্যস্ত হয়। কিন্তু দুই বৎসর মধ্যে এ ব্যবস্থা রহিত হয় এবং কর-সংগ্রহের নানা গোলযোগ চলিতে থাকে। ১৭৮১ অব্দে হেঙ্কেল সাহেব যশোহর সার্কেলের জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া মুড়লীতে আসেন, সে কথা বলিয়াছি। ১৭৮৬ অব্দে যশোহর একটি পৃথক্ জেলারূপে পরিণত হয়। ইহাই বঙ্গের প্রথম জেলা এবং হেঙ্কেল সাহেব সে জেলার প্রথম কালেক্টর। তখন মোটামুটি ইশপপুর ও সৈয়দপুর পরগণা-সমষ্টি বা চাঁচড়া-রাজ্য লইয়া জেলা হয়। ১৭৮৭ অব্দে মামুদশাহী পরগণা উহার সহিত যুক্ত হয়। যশোহর হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তার দক্ষিণভাগে ইচ্ছামতী নদীই এই জেলার পশ্চিম সীমা ছিল। ১৭৯৩ অব্দে নল্‌দীসমেত ভূষণা বিভাগ যশোহরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সীমার পরিবর্ত্তন হয়। তখন ঝিকারগাছার কাছে কপোতাক্ষী নদী যশোহর জেলার পশ্চিম সীমা হয়। ঝিকারগাছা হইতে বনগ্রাম যাইবার রাস্তার উত্তরাংশ নদীয়া জেলাভুক্ত হয়, কিন্তু উহার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ কপোতাক্ষী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যশোহরের মধ্যেই রহিয়া যায়। বহুকাল পরে ১৮৬৩ অব্দে এই দক্ষিণাংশ অর্থাৎ প্রধানতঃ সাতক্ষীরা সব্‌ডিভিসন চব্বিশ-পরগণা জেলার মধ্যে যায় এবং উত্তরাংশ বা বনগ্রাম মহকুমা নদীয়া হইতে যশোহরের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৪২ অব্দে খুল্‌নাকে একটি মহকুমায় পরিণত করা হয়। ইহাই বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সব্‌ডিভিসন। সম্পূর্ণ বাগেরহাট এবং যশোহর সদর ও নড়াইলের কতকাংশ ঐ সময়ে খুল্‌না মহকুমার শাসনাধীন হইয়াছিল।

১৮৪৫ অব্দে মাগুরা মহকুমা স্থাপিত হয়। যেখানে মুচিখালী দিয়া গড়ই ও কুমারনদের জল নবগঙ্গায় পড়িতেছিল, সেই সন্ধিস্থলে নবগঙ্গার দক্ষিণমুখী বাঁকের তীরে মাগুরা অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নদীকূলবর্ত্তী স্থানে মগ প্রভৃতি নানা-জাতীয় দস্যুদিগের কিরূপ উপদ্রব ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৮৯, ৫৩৫ পৃ)।

ইংরাজ আমলে এই প্রদেশে সর্ব্বদা ডাকাইতি হইত। উহা দমন করিবার সুবিধার জন্য এই মহকুমা খোলা হয়। ককবার্ণ (Cockburn) সাহেব উহার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্।

ঝিনেদহ (Jhenidah) বা ঝিনাইদহ নবগঙ্গার কূলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এখন সেখানে নবগঙ্গা একপ্রকার মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং যশোহর-ঝিনেদহ নূতন লাইট-রেলওয়ে ভিন্ন যাতায়াতের অন্য সুবিধা নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতে এখানে ভূষণার অধীন চৌকি ছিল। ১৭৮৬ অব্দ পর্য্যন্ত মামুদ-শাহীর তহশীল কাছারী এখানে ছিল। শেরবার্ণ (Sherburne) সাহেব শেষ কালেক্টর ছিলেন। ১৭৮৭ অব্দে মামুদশাহী যশোহর কালেক্টরী ভুক্ত হয়। এখনও মামুদশাহীর নয় আনা অংশের নড়াইল-জমিদারদিগের কাছারী বর্ত্তমান ঝিনেদহের পার্শ্ববর্ত্তী চাক্‌লা নামক স্থানে রহিয়াছে। ১৭৯৩ অব্দে এখানে একটি পুলিস থানা স্থাপিত হয়। নীল-বিদ্রোহের ফলে ১৮৬২ অব্দে এখানে মহকুমা খুলিবার প্রয়োজন হয়।

নড়াইলেও নীল-বিদ্রোহের সময়ে ১৮৬১ অব্দে মহকুমা হয়। প্রথমতঃ ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপালগঞ্জে এই মহকুমার স্থান নির্ব্বাচিত হয় ; পরে অতি অল্প সময় মধ্যে সেখান হইতে ক্রমান্বয়ে বারাসিয়া কূলে ভাটিয়াপাড়া, নবগঙ্গার কূলে লোহাগড়া ও নল্‌দীর পরপারে কুমারগঞ্জে (চণ্ডীবরপুর) এবং অবশেষে নড়াইলে মহকুমার সদর ষ্টেশন স্থাপিত হয়।

১৮৬১ অব্দে সাতক্ষীরা মহকুমা গঠিত হয় এবং দুই বৎসর পরে উহা চব্বিশ পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া যায়। ১৮৬৩ অব্দে বাগেরহাটও একটি মহকুমা বলিয়া চিহ্নিত হয়, এতদিন উহা খুল্‌নারই মধ্যে ছিল। মোরেল সাহেবদিগের অত্যাচার নিবারণ কল্পে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব। সর্ব্বপ্রথমে বাগ অর্থাৎ বাগানের মধ্যে হাট মিলিয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম বাগেরহাট। বাঘ বা ব্যাঘ্রের সঙ্গে এ নামের কোন সম্বন্ধ নাই।

১৮৮১-২ অব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, খুল্‌নাকে কেন্দ্রস্থান করিয়া সুন্দরবনের জন্য একটি পৃথক্ জেলা গঠন করা প্রয়োজনীয়। এজন্য যশোহরের মধ্য হইতে খুল্‌না ও বাগেরহাট মহকুমাদ্বয় এবং ২৪-পরগণার মধ্য হইতে সাতক্ষীরা মহকুমা লইয়া খুল্‌নাকে একটি নূতন জেলায় পরিণত করা হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সুন্দরবনের শাসন জন্য রেভেনিউ বোর্ডের অধীন একজন পৃথক্

কমিশনার ছিলেন। ১৯০৫ অব্দ হইতে সুন্দরবনের কর্ত্তৃত্বভার সংশ্লিষ্ট তিনটি (২৪-পরগণা, খুল্‌না ও বাখরগঞ্জ) জেলার কালেক্টরগণের উপর পড়িয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, এক্ষণে যশোহর জেলায় সদর মহকুমার সঙ্গে নড়াইল, মাগুরা, ঝিনেদহ ও বনগ্রাম লইয়া মোট পাঁচটি মহকুমা। সমগ্র জেলার পরিমাণ-ফল ২,৯০৪ বর্গমাইল এবং ১৯২১ অব্দের গণনানুসারে লোকসংখ্যা ১৭,২২,২১৯ জন। খুল্‌না জেলায় সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এই তিনটি মহকুমা। পরিমাণফল ৪,৭৩০ বর্গমাইল, তন্মধ্যে সুন্দরবনেরই পরিমাণ ২২৯৭ বর্গমাইল। ১৯২১ অব্দের সমাহার (Census) অনুসারে লোকসংখ্যা ১৪,৫৩,০৩৪ জন। উভয় জেলার পরিমাণফল ৭,৬৩৪ বর্গমাইল এবং লোকসমষ্টি ৩১,৭৫,২৫৩ জন।[১]

হেঙ্কেল সাহেবের সময় মুড়লীতে যশোহর জেলার সদর ষ্টেশন ছিল; ১৭৮৯ অব্দে তিনি বদলী হইবার পর, যখন রোক সাহেব (Richard Rocke) কালেক্টর হন, তখন তিনি, কি কারণে ঠিক জানা যায় না, মুড়লী ত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সাহেবগঞ্জে আফিসাদি স্থানান্তরিত করেন। ঐ সময় চাঁচড়ার রাজগণ ঐ জন্য গবর্ণমেণ্টকে ৫০০৲ বিঘা ভূমিদান করিয়াছিলেন। পাঠান আমলে মুড়লীর নাম ছিল মুড়লী-কস্‌বা (সহর)। হেঙ্কেলের সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ একটু পশ্চিমদিকে ভৈরব-তীরে যেখানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, উহাকে সাহেবগঞ্জ বা সংক্ষেপতঃ কস্‌বা বলিত।[২] ঐ কস্‌বায় যশোহর জেলার আফিস আদালত আসিলে কর্ত্তৃপক্ষ উহারই নাম রাখিলেন,—যশোহর। কিন্তু সাধারণ লোকে উহাকে কস্‌বাই বলিত, এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে সে নাম লুপ্ত হয় নাই। ভৈরব-নদ তখনই মরিয়া আসিতেছিল এবং উহা খেয়া নৌকায় পার হইতে হইত। তবে নদীর খাত সংকীর্ণ বলিয়া নৌকায় দড়ি বাঁধা থাকিত এবং উহাই টানিয়া লোকে এপার ওপার যাইত, এজন্য উহাকে 'দড়াটানার খেয়া'

১ ১৯১১ অব্দের গণনায় যশোহরের লোকসংখ্যা ১৯০১ অপেক্ষা ৩০৩ জন কমিয়াছিল, পরবর্ত্তী দশবৎসরে উহা শতকরা ১·২ জন কমিয়াছে। খুল্‌নার লোকসংখ্যা ১৯১১ অব্দে দশবৎসরে শতকরা ৯ জন বাড়িয়াছিল, পরবর্ত্তী সমাহারে উহার বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৬·৮ জন করিয়া ঠিক হইয়াছে। [প্রকাশিত 'Census, 1921' অনুযায়ী সংখ্যাগুলি সংশোধিত—শি মি]

২ লোকে কস্‌বা শব্দের অর্থ ভুলিয়া গিয়া উহাকে একটি স্থানের নাম বলিয়া মনে করিত। তাহারা ভাবিত মুড়লী-কস্‌বা দুইটি স্থানের জোড়া নাম। এজন্য মুড়লীর পার্শ্ববর্ত্তী সাহেবগঞ্জ কস্‌বা বলিয়াই পরিচিত হইল, বাস্তবিক যশোহর সহরকে মুড়লীরই অংশ বলিতে পারি।

বলিত। এখন সেখানে দড়াটানার পুল হইয়াছে। ভূষণার রাজস্ব সংগ্রহের ভার যশোহরের উপর পড়িলে, মহম্মদপুর অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রস্থান এবং স্রোতস্বিনী মধুমতীর তীরবর্ত্তী বলিয়া ১৭৯৫ অব্দে তথায় সদর ষ্টেশন স্থানান্তরিত করিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু সে মতলব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন মহম্মদপুরে একটি থানা ও রেজেষ্ট্রী আফিস মাত্র আছে। হেঙ্কেলের সময় জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ সম্মিলিত হয়, রোক সাহেবের সময় ঐরূপই ছিল; ১৭৯৩ অব্দে তিনি চলিয়া গেলে, কালেক্টরেব পদ পুনরায় পৃথক্ হয়। পরে কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের এলেকা সব সময়ে এক ছিল না। এখন আবার পদদ্বয়ের সম্মিলনের সঙ্গে এলেকারও ঐক্য হইয়াছে। ১৮৬৪ অব্দে যশোহরে প্রথম মিউনিসিপালিটি হয়, এখন উহা পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। যশোহর ব্যতীত কোট্‌চাঁদপুর ও মহেশপুরে আর দুইটি মাত্র মিউনিসিপালিটী আছে, কিন্তু উহার কোনটি মহকুমা নহে।

খুল্‌না জেলার সদর ষ্টেশনের কিছু প্রাচীন ইতিহাস আছে। মহকুমা হইবার সময় রূপসা একটি খাল মাত্র ছিল; রূপ সাহা নামক এক লবণের ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক উহা প্রথমে খনিত হয়। উহার পূর্ব্বপার অর্থাৎ যে পারকে এখন রেণীগঞ্জ বলে, তাহারই নাম ছিল খুল্লনা বা খুল্‌না। সেইখানেই প্রাচীন খুল্লনেশ্বরীর মন্দির ছিল।[১] বড় বেশী দিনের কথা নয়, উহা নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। সেই স্থানেই জঙ্গল কাটিয়া প্রাচীন নয়াবাদ (নূতন আবাদ) থানা বসিয়াছিল। রেণী সাহেবের পুরাতন বাটী ও শ্রীরামপুর গ্রামের মধ্যস্থানে এখনও থানার ভিট্টা ও পুকুরের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। ঐ স্থানে লখপুরের চৌধুরীদিগের যে তালুক ছিল, তাহার নাম 'তালুক খুল্‌না-ইলাইপুর'। ১৭৬৬ অব্দেও যে খুল্‌না একটি নগণ্য স্থান ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে।[২] প্রাচীন ম্যাপে খুল্‌নাকে 'Jessore-Culna' বলিয়া লিখিত দেখি। ঐ ম্যাপে যশোহর বলিয়া কোন

---

১ খুল্লনেশ্বরীর মন্দিরের ঠিক অপর পারে "উলুবু'নের কালীবাড়ী", কেহ কেহ বলেন সেটি 'লহনেশ্বরী'। প্রাচীনকালে চাঁদ সওদাগরের দুই পত্নী, লহনা ও খুল্লনার নামে ভৈরবের দুইপারে দুইটি কালীবাড়ী ছিল। নদীর ভাঙ্গনের জন্য দুইটি কালীবাড়ীই এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

২ ১৭৬৬ অব্দে পশরনদীর দক্ষিণভাগে Falmouth নামক একখানি জাহাজ ডুবিয়াছিল, তৎপ্রসঙ্গে সরকারী কাগজপত্রে দেখিতে পাই :

"The *Buxey* (বক্‌সী) lays before the Board an account of charges

পৃথক সদর ষ্টেশনের উল্লেখ নাই।[১] তখন খুল্‌নাই ইংরাজ-আমলের যশোহর বিভাগীয় সদর ষ্টেশন বলিয়া মনে হয়।[২]

১৮৪০ অব্দের কিছু পূর্ব্বে রেণী সাহেব নামক (Henry Sneyd Rainey of the 3rd Buffs) একজন সৈনিক পুরুষ দৈবক্রমে হোগলা পরগণার চারি আনা অংশের মালিক হইয়া প্রাচীন খুল্‌নায় আসেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রূপসা-চর এবং লথপুরের চৌধুরীদিগের নিকট হইতে খুল্‌না-ইলাইপুর তালুকের কয়েকটি পত্তনী লইয়া নয়াবাদের কাছে বাস করেন এবং নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে নীল ও ইক্ষুচিনির ১০।১২টি কুঠি খুলিয়া অত্যাচার অবিচারে প্রজাবর্গকে ব্যাকুল করিয়া তুলেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন, রেণী সাহেবকে শাসনাধীন রাখিবার জন্যই খুল্‌নায় প্রথম মহকুমা হয়।[৩] উহার প্রথম জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট M. A. G. Shawe সাহেব।[৪] তিনি মহকুমার কর্ত্তা হইয়া আসিয়া রেণীর বাড়ীর কাছে তাঁবুতে কাছারী আরম্ভ করেন। তখনকার দিনে বর্ণের সাম্যই সম্প্রীতির কারণ হইত; কথিত আছে, শ-সাহেব প্রথম হইতেই রেণীর পক্ষপাতী হন। জামাতৃ-পদ লাভের অভিসন্ধি উহার মুলীভূত কারণ কিনা বলা যায় না। যাহা হউক, অল্পদিন মধ্যে রেণী সাহেব নবাগত সরকারী কর্ম্মচারীর যোগে বন্দোবস্ত করিয়া, নিজের হোগলা-পরগণার অন্তর্গত টুটপাড়া গ্রামে জমি বদল

---

incurred in the *Buxey Connah* (বক্সী খানা) in *Budgerows* (বজ্‌রা), Boats and necessaries supplied at Culnea (Khulna), and sent from hence for the relief of the people saved from the '*Falmouth*', amounting to Rs. 10,135 which is ordered to be paid."—Long, Rev. J., *Selections*, Vol, I. p. 457.

১ Map published with Vol. IV of *Selections of Calcutta Gazettes*, by Seton-Karr.

২ Calcutta Review, Vol. 66, 1878, p. 418—article on *Jessore*, by H. J. Rainey. এই লেখক উল্লিখিত রেণী সাহেবের মধ্যম পুত্র।

৩ 'A sub-division, the first established in Bengal, was set up here (Khulna) in 1842. Its chief object was to hold in check Mr. Rainey, who had purchased a zemindari in the vicinity and resided at Nihalpur and who did not seem inclined to acknowledge the restraints of law'.—Westland, *Jessore*, 1871, p. 284.

৪ খুল্‌নার বিবরণে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ভুল করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রথম মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম শোর ('Mr. Shore'), তাহা সত্য নহে।—Cal. Rev., Vol. 66, 1878, p. 418.

দিয়া মহকুমার স্থান রূপসার পশ্চিম পারে সরাইয়া দেন। তদবধি টুটপাড়া গ্রামের একাংশ খুল্‌না নামে অভিহিত হইয়া একটি প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেণীর ইতিহাস আমরা পরে দিব।

খুল্‌নার বাজারকে এখনও 'সাহেবের হাট' বলে। উহা তখন খালিসপুরের মধ্যবর্ত্তী ছিল। খালিসপুরে অনেকদিন হইতে একটি বড় নীলকুঠি ছিল; এক সময় তাহার কর্ত্তা ছিলেন চোলেট (Chollet) সাহেব। সাধারণ লোকে তাঁহাকে স্থালেট বলিত এবং সেই জন্য হাটের নাম হইয়াছিল, 'স্থালেট সাহেবের হাট'। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে চার্লস সাহেবের নামে হাটের নাম Charligunj বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। এই হাট সে সময়েও বুধ ও শনিবারে বসিত, এখন প্রত্যহ দুইবেলা বাজার হইলেও সেই দুইদিনে হাট বসে। বাজারের পশ্চিম দিকে নদীতীরে উক্ত চোলেট সাহেবের বাড়ী ছিল; বহু সংস্কারের পর তাহা এখনও ষ্টীমারঘাটের পার্শ্বে খাড়া আছে এবং উহা রেলওয়ে গার্ড্দিগের আবাস-বাটিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই খুল্‌নার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন অট্টালিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১৭৮৬ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। সামরিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন মৌলিকতা তাঁহার ছিল না। তবে তিনি উন্নত-চরিত্র এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক; বিলাতী ডিরেক্টর সভার অভীষ্ট যে তিনি একাগ্রভাবে পালন করিবেন, সে বিশ্বাস সকলের ছিল। বঙ্গীয় জমিদারদিগের সঙ্গে বাৎসরিক বা পাঁচবৎসরের অস্থায়ী বন্দোবস্তে যে গোলযোগ হইতেছিল, তাহা জানিয়া ডিরেক্টরগণ উঁহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এদেশে চিরশান্তি সংস্থাপনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত এই যে, অতিরিক্ত রাজস্বের নিয়মিত ও সময়ানুমত সংগ্রহে প্রজার চিরকল্যাণ সাধন করে।[১] পিটের ইণ্ডিয়া বিলই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক।

কর্ণওয়ালিস আসিয়া এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে কোম্পানির অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে যশোহরের হেঙ্কেল সাহেব একজন। তাঁহার মত জানাইবার পূর্ব্বে এবিষয়ে যে বিশিষ্ট দুইজনের বাদ-বিচার হইয়াছিল, সেই কথা অগ্রে বলিয়া লইতেছি। কোম্পানির সেরেস্তাদার জেমস্-গ্রাণ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও অর্থ-সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[২] উহাতে তিনি দেখান যে, ১৭৬৫ হইতে

১ '.. a moderate Jumma if regularly and punctually collected unites the consideration of their interest, with the happiness of the natives and security of the landholders, more rationally than any imperfect collection of an exaggerated jumma to be enforced with severity and exaction.'—*Fifth Report*, 1812, p. 30 [1917, (Cambray), Vol I, p. 31—শি মি]

২ *'The Analysis of the Finances of Bengal'* 1786 and *'The Historical and Comparative view of the Revenues of Bengal'*, 1788.

কর্ণওয়ালিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবিষ্কর্ত্তা নহেন। Pitt's India Act of 1784 হইতে কোম্পানির উপর আদেশ ছিল, '...for settling and establishing upon principles of moderation and justice, according to the laws and constitution of India, the permanent rules by which their respective tributes, rents and services shall be in future rendered and paid'—ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল হেতু। '...the

১৭৮৬ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে দেশীয় কর্ম্মচারীরা মোগল আমলের হিসাবানুসারে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া প্রায় দশ কোটি টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৫০ হাজার টাকা করিয়া কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়াছে। জমির উৎপন্নের $\frac{১}{৪}$ মধ্যে সরঞ্জাম খরচ $\frac{১}{১০}$ বাদে অধিকাংশ জমিদারদিগেব নিকট হইতে কোম্পানির প্রাপ্য। নবাবী আমলের আবওয়াবগুলি অন্যায় অত্যাচারের ফল বলিয়া বাদ দিয়াও গ্রাণ্ট বঙ্গের রাজস্ব তিন কোটির অধিক নির্দ্ধারণ করেন, উহা মোগল রাজস্বের শেষ সীমা হইতেও ৫৭ লক্ষ টাকা অধিক।

এই সময়ে স্যর জন শোর সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি গ্রাণ্ট সাহেবের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া এক বিখ্যাত নিবন্ধ রচনা করেন। তাহাতে দেখান যে, তিন প্রকারে বন্দোবস্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ, রাইয়তওয়ারী বন্দোবস্তে খাস আদায় করিতে গেলে, কালেক্টরের যে অভিজ্ঞতা চাই তাহা দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ, ইজারা বা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য খণ্ড খণ্ড বন্দোবস্তে সম্পত্তির উন্নতির দিকে কেহ দিক্‌পাত করে না। তৃতীয়তঃ, জমিদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত, উহাই সমীচীন। জমিদারের যেমন জমির উপর স্বত্ব আছে, তেমনই শান্তিরক্ষা ও বিদ্রোহ-নিবারণের জন্য তাহারা সহায়ক হইতে পারেন। এজন্য শোর মহোদয় জমিদারেব সঙ্গে বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হন বটে, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের পরামর্শ দেন।

হেঙ্কেল সাহেবের মতে রাইয়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই ভাল। তিনি বলেন, জমিদারের স্বত্ব অধিকার করা যায় না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকারী ধরিয়া লওয়াই উচিত। প্রজারা উচ্চ হারে খাজনা দেয়, কিন্তু তাহারা অনেক বেশী দখল করে। এখন সেই অতিরিক্ত জমির পাট্টা দিলে, তাহাদের নিকট হইতে খাজনা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। নিষ্কর সম্বন্ধে হেঙ্কেল সাহেব বলেন যে, যশোহরের ৩,৫০,০০০/ বিঘা অর্থাৎ $\frac{১}{২০}$ অংশ নিষ্কর। ১৭৬৫ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী নিষ্কর বহাল রাখা উচিত। ১৭৭২ অব্দে নিষ্কর দেওয়া নিষিদ্ধ হয় বলিয়া, ১৭৬৫-৭২ পর্য্যন্ত যে সব নিষ্কর প্রদত্ত হয়, তাহাও বহাল না রাখিলে অত্যন্ত কঠোরতা করা হয়। উহা মঞ্জুর না করিলে দলিলের তারিখ বদলাইয়া জালজুয়াচুরি দ্বারা জমিদারের লোকেরা

popular idea that Cornwallis was the originator of the Parmanent Settlement is erroneous'—Hunter, *Bengal Records*, Vol. I, p. 25.

অতিরিক্ত ঘুষ খাইবে মাত্র। লর্ড কর্ণওয়ালিস এই সকল মতের সমন্বয় করিয়া ডিরেক্টরগণের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

জমিদার, নিরপেক্ষ তালুকদার, বা জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। আবওয়াব বা বাজে আদায় বাদ দিয়া, ১৭৬৫ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বিশ্বাসযোগ্য লাখিরাজ স্বীকার করিয়া লইয়া, মোগল আমলের রাজস্ব-হার এবং আবাদী জমির আয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া, বহু চেষ্টায় রাজস্ব ধার্য্য হইল। তদনুসারে ১৭৯০ অব্দের নিমিত্ত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার কর-সমষ্টি ২,৬৮,০০,৯৮৯৲ টাকা স্থির হইল।[১] ১৭৯৩ অব্দের ৮ম আইন (Regulation VIII of 1793.) দ্বারা ঐ দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল।[২] অবধারিত কর বৎসরের মধ্যে কিস্তীমত কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে সূর্য্যাস্তের মধ্যে সরকারী কালেক্টরীতে জমা দিতে হইবে। না দিলে জমিদারী বা তালুক উক্ত ৮ম আইন অনুসারে নিলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে। উপরিস্থ মালিকের স্বত্ব এইভাবে বিনষ্ট হইলে, নিম্নবর্ত্তীদিগের স্বত্বহানি হইবে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য জমিদারের নিম্নস্থ সকলেও পরোক্ষে দায়ী থাকিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে আব্‌ওয়াব বা সায়র আদায়সমূহ বাদ দিয়া জমিদারদিগের রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইল। হাট-বাজার হইতে দুই প্রকার কর ছিল; হাটের মধ্যে দোকানের জন্য স্থান অধিকার করিবার খাজনাকে 'চাঁদনী' বলে এবং হাটের দারগা বা ইজারাদার, ঝাড়ুদার প্রভৃতির পোষণার্থ যে শুল্ক কতক দ্রব্যাদিতে কতক নগদ পয়সায় তুলিয়া লওয়া হইত, তাহার নাম 'তোলা'। বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থ এই দ্বিবিধ শুল্কের অর্থ জমিদারের রাজস্ব হইতে বাদ পড়িল বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে জমিদারগণ উহা আদায় করিতে ছাড়িলেন না। ইহাতে লাভ জমিদারেরই হইল; এজন্য এক যশোহর জেলাতেই গবর্ণমেণ্টের ১০।১২ হাজার টাকা লোকসান পড়িল। আবার অপর পক্ষে যে সকল জায়গীর প্রভৃতি নবাব আমলের স্বীকৃত ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্ট নিজের গায়ে লইয়া জমিদারের

১ *Fifth Report*, p. 47. সঙ্গে সঙ্গে মনে করিতে হইবে যে, আবওয়াব ধরিয়াও কাশিম আলি খাঁর সর্ব্বোচ্চ তালিকায় ২,২৩,৮৩,০৯৫৲ টাকা ছিল।—Ascoli, *Revenue History*, p. 47.

২ এই জন্যই গবর্ণমেণ্টের রাজস্বকে লোকে অষ্টমের খাজনা বলে এবং বাকী করের নিলামের নাম অষ্টমের নিলাম।

রাজস্ব সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বহুবেগম[১] নামক এক মহিলা বাগেরহাট খলিফাতাবাদে ।৵০ অংশ জায়গীর স্বরূপ পাইতেন। অবশিষ্ট দশ আনা পৃথক্ স্থানে আদায় হইত বলিয়া দশানি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। বেগমের পক্ষ হইতে এই লভ্যাংশ আদায় করিবার জন্য বাগেরহাটে কাছারী ও মালখানা প্রভৃতি ছিল, তাহার কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। বাগেরহাটের মিঠাপুকুর প্রভৃতি সেই আমলের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। এই জায়গীরের হস্তবুদ ৯২০০৲ টাকা, তন্মধ্যে ২৯০০৲ টাকা অনাদায় ছিল। অবশিষ্ট ৬৩০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট পরগণার রাজস্বে যোগ করিয়া দিয়া জমিদারের নিকট আদায় করিতে লাগিলেন এবং ঐ টাকা বেগমকে বৃত্তিস্বরূপ নগদ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৯৪ অব্দে বেগমের মৃত্যু হইলে, বৃত্তি দেওয়া বন্ধ হইল এবং গবর্ণমেণ্টের লভ্যাংশ চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রাক্কালে অনেক জমিদার খাজনা কমাইয়া নগদ সেলামী বেশী লইয়া বহু তালুকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন উহাদের নিকট বেশী রাজকর আদয় করিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল তালুক স্বীকার করিয়া লইয়া, উহার কর জমিদায়ের রাজস্ব হইতে খারিজ করিয়া দিলেন। ইহারই নাম খারিজা তালুক। আইনে মালিকদিগকেই independent বা স্বাধীন তালুকদার বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এই ভাবে মোট রাজস্ব স্থির হইয়া গেল। সকল খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করিবার আমাদের সময় নাই। একমাত্র যশোহর জেলার কথাই আমাদের আলোচ্য। তখনকার যশোহরে ১০৩টি পরগণায় ৪৬০৪টি সম্পত্তির তৌজি হইয়াছিল; উহাদের পরিমাণ ফল ৪,২৬০ বর্গমাইল; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে মোট রাজস্ব ১১,২৩,৫১৭৲ টাকা। পরবর্ত্তী একশত বৎসর মধ্যে জেলা বিভাগ ও সীমা পরিবর্ত্তনেব জন্য হিসাবও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যশোহরের রাজকর ৮,৫৯,৫৭২৲ টাকা এবং খুল্‌নায় ৬,৬৭,৭০৩৲ টাকা, উভয় জেলায় মোট ১৫,২৭,২৭৫৲ টাকা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে পথকর

১ Westland, *Jessore*, p. 88. এই বেগম মীরজাফর পত্নী বাব্বু বেগম হইতে পারেন। উঁহার গর্ভজাত পুত্র মোবারকদ্দোলা ১৭৭০-১৭৯৩ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন। উহার নাবালক অবস্থায় কেন যে বাব্বু বা বহু বেগমকে অভিভাবক না করিয়া মীরজাফরের বিমাতা মণিবেগমকে অভিভাবক করা হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ নবাব-জননীকে এই সময়ে যে সব বৃত্তি দেওয়া হয়, তন্মধ্যে খলিফাতাবাদের অংশ একটি।—*Masnad of Murshidabad*, p. 42.

প্রভৃতি সেস্ আছে ; তাহা যশোহরে ১৯০০ অব্দে ২,০২,৫০৩৲ টাকা এবং খুল্‌নায় ১,৬৪,৪৬১৲ টাকা মোট ৩,৬৬,৯৬৪৲ টাকা। রাজস্ব ও সেস্ উভয় দফায় দুই জেলার মোট আদায় ১৮,৯৪,২৩৯৲ টাকা।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল উভয়ই আছে ; আমরা সংক্ষেপে উহার বিচার করিতেছি। প্রথমতঃ বন্দোবস্তের ফলে দেশে একটা শান্তি ও স্বত্বাধিকারের স্থায়িত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে :

১ ১৭৭২ অব্দের পর প্রায় বছর বছর বন্দোবস্ত হইত। সহজে রাজস্ব কমান হইত না ; কখনও বা কিছু বৃদ্ধি করাও হইত। প্রতি-বৎসর কালেক্টরের সঙ্গে দর কষাকষি করিয়া জমিদার-দিগেরই ক্ষতি হইত। তাঁহাদের সর্ব্বদা ঐ চিন্তাই প্রবল ছিল এবং তাঁহারা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে গিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেন।[২] দরে না বনিলে ভূম্যধিকারীরা সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না, তাহা হইলে যে তাহাদের জীবনোপায়, পৈতৃক মানসম্ভ্রম ও ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়! কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় এই চিন্তাক্লেশ হইতে জমিদারেরা নিষ্কৃতি পাইলেন।

২ চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পূর্ব্বে জমিদার ও প্রজার সঙ্গে জমির কোন পাকাপাকি স্বত্ব-সম্বন্ধ ছিল না। জমিদার উদার-হৃদয় হইলে সে স্বতন্ত্র কথা, সাধারণতঃ সকলেই প্রজার নিকট হইতে যে যাহা পারিতেন, আদায় করিয়া লইতেন। তজ্জন্য প্রজারা পূর্ব্বে জমির আবাদ বা উন্নতির দিকে চাহিতেন না। এখন প্রজার একটা স্বত্ব-স্বামিত্ব স্থির হওয়ায় জমির প্রতি তাঁহাদের আসক্তি বাড়িল।

১ Hunter, *Jessore*, Vol. II, p. 328 ; *District Statistics, Khulna*, p. 13 ; *Jessore*, p. 13.

২ 'The annual Revenue being, in fact, fixed on each Zemindar without any detailed assessment, but rather by a sort of haggling between the Collector and the Zemindars, the latter must go to the wall. That the Zemindars did go to the wall and they were irretrievably plunged in debt, is a fact'—Westland, *Jessore*, 1871, p. 106

৩ পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট, জমিদার বা প্রজা পরস্পর কাহারও মধ্যে বিশ্বাস ছিল না, তজ্জন্য জমিদারীর বা দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দাখিল করিতে পারিলে জমিদার নিশ্চিন্ত, খাজানা দিয়া দাখিলা পাইলে প্রজা নিশ্চিন্ত ; মৌরসী জমির উপর পাকাবাড়ী বা ভাল বাগান করিতে পারিলে, তাহা নিজ সন্তানগণের ভোগ্য হইবে, ইহা একটা কম সান্ত্বনার বিষয় ছিল না।

এক্ষণে আমরা কুফলের বিষয় আলোচনা করিব। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে পুরাতন জমিদার বংশীয়গণ একে একে তাঁহাদের সম্পত্তি হারাইতে লাগিলেন। তজ্জন্য নূতন গবর্ণমেণ্টকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না।

১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন মত যে রাজস্ব ধার্য্য হইল, তাহা বড় অতিরিক্ত। ১৭৭২ অব্দ হইতে যে দাবি চলিতেছিল, তাহাই মোগল আমল অপেক্ষা বেশী, আবার অস্থায়ী বন্দোবস্তে যেরূপ ধার্য্য হইতেছিল, তদপেক্ষাও চিরস্থায়ীর হার অধিক দাঁড়াইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইশপপুরের রাজস্ব ৩,০২,৩৭২৲ টাকা ধার্য্য হইল, উহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫,০০০৲ টাকা বেশী ; সৈয়দপুরের রাজস্ব ২,০০০৲ টাকা বাড়াইয়া ৯০,৫৮৩৲ টাকা স্থির হইল ; মামুদশাহীর ধ্বংসপ্রায় তের আনী অংশের জমিদারীতে পূর্ব্ব রাজস্ব ১,৩৪,৬৬৫৲ টাকার উপর ৫ বৎসরে মোট ১৫,৬৭৮৲ টাকা বৃদ্ধি করা হইল। এইরূপ অতিরিক্ত কর-বৃদ্ধি এই সকল জমিদারের পতনের হেতু। কারণ এই নূতন দাবি পূরণ করিবার জন্য তাঁহারা জমিদারীর মধ্যে কর-বৃদ্ধি করিলে প্রজা বিদ্রোহী হইতেন এবং তখনকার আইনে উঁহাদের কিছু করিতে পারা যাইত না।

২ প্রজার নিকট হইতে জমিদারের যাবতীয় প্রাপ্য আদায় হইবে ধরিয়া লইয়াই এই নূতন ব্যবস্থা হইল ; বাস্তবিক সেরূপ আদায় হইত না। প্রজাপীড়ন ভিন্ন আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না। জমিদারেরা বিদ্রোহী প্রজাকে পীড়ন করিতে গেলে, নিজেদেরই সর্ব্বনাশ ঘটাইতেন।

৩ গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রাপ্য রাজকর কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু জমিদারের পক্ষে প্রজার নিকট হইতে কর-সংগ্রহের পন্থা যথেষ্ট বা ফলপ্রদ ছিল না। 'লাটের কিস্তীর' খাজনা না দিতে পারিলে, জমিদারী তৎক্ষণাৎ 'লাটে' নিলাম হইত; কিন্তু প্রজারা খাজানা না দিলে উহা আদায় করিবার জন্য জমিদারকে বহু খরচ ও সময়ক্ষেপ করতঃ মোকদ্দমা করিয়া সব সময় ফল হইত না, অনেক সময়ে খরচের টাকাও উঠিত না।

৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূম্যধিকারীর দান-বিক্রয় বা হস্তান্তরের যোগ্য স্বত্ব বর্ত্তিল। এজন্য পূর্ব্বে জমিদারেরা যে সব দেনা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তমর্ণগণ এখন দায়িকের সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া পাওনা টাকা আদায় করিবার সুযোগ পাইলেন। প্রধানতঃ এই সকল কারণে প্রধান প্রধান জমিদারগণের সম্পত্তি ধ্বংস পাইতে লাগিল। প্রাচীন বংশ উৎখাত হইল, নূতন অর্থশালী বা কূটকৌশলী লোকদিগের মাথা তুলিবার সময় আসিল। প্রাচীন জমিদারগণ বংশগত গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্যই হউক, বা প্রকৃতিগত উদারতার জন্যই হউক, প্রজার উপর পীড়ন করিতে পারিতেন না। নবোত্থিত অপরিচিত ব্যক্তিরা অনেকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিয়া কঠোরতার সহিত তহশীল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অর্থোপায় করিতে লাগিলেন; প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া পাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপর তুষ্ট রহিলেন। দুর্ব্বল আইনে প্রজার স্বত্ব বা সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়া উঠিল না।

পরবর্ত্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা এই নব্য জমিদারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভূসম্পত্তির স্বত্ব-বিভাগ

একটি সমগ্র পরগণার অধিকারকেই জমিদারী বলে। উহার ষোলআনার বা অংশ বিশেষের অধিকারীকে জমিদার কহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন জমিদারই ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং প্রথম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী। তাঁহাদিগেরই সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নিকট হইতেই প্রধানতঃ রাজস্ব গ্রহণ করেন। জমিদারের নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদিগকে তালুকদার কহে। তালুক চারি প্রকার : খারিজা, বাজেয়াপ্তী, সামিলাৎ এবং পাট্টাই বা পত্তনী তালুক। তন্মধ্যে খারিজা ও বাজেয়াপ্তী তালুকের অধিকারিগণ গবর্ণমেণ্টের তৌজি হিসাব-ভুক্ত হইয়া নিজ নিজ নামে স্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরীতে রাজস্ব দাখিল করেন ; সামিলাৎ এবং পাট্টাই বা পত্তনী তালুকের খাজানা জমিদারের হস্তে আদায় হয়। মুসলমান আমলের নওয়ারা এবং জায়গীর মহল বাবদ বা অন্যভাবে পরগণার অংশসমূহ রাজস্বের অনাদায়ে দায়গ্রস্ত হইলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে গবর্ণমেণ্ট উহার রাজস্ব তত্তৎ জমিদারী হইতে খারিজ করিয়া পৃথক ভাবে লইতে স্বীকৃত হন, এজন্য উহার নাম খারিজা তালুক। ১৮১৯ অব্দের দুয়েম কানুন বা ২ আইন (Regulation II of 1819) অনুসারে যে সব নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় নূতন মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহাই বাজেয়াপ্তী তালুক। দৈব কারণে বা মালেকের ইচ্ছানুসারে গবর্ণমেণ্টের সেরেস্তাভুক্ত যে সব চিহ্নিত তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে কোন জমিদারীর সামিল করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে বলে সামিলাৎ তালুক। ইহা ভিন্ন জমিদারেরা নিজ নিজ জমিদারীর যে সকল ক্ষুদ্রাংশ পাট্টা সাহায্যে বিলি করেন বা পত্তনী দেন, তাহাই পাট্টাই বা পত্তনী তালুক। সামিলাতের সঙ্গে এই জাতীয় তালুকের প্রভেদ এই যে জমিদারের স্বত্ব নষ্ট হইলে পাট্টাই বা পত্তনী তালুকের স্বত্ব যায়, কিন্তু সামিলাতের স্বত্ব নষ্ট হয় না। পত্তনীদারেরা মৌরসী স্বত্বে যে সব বিলি ব্যবস্থা করেন, তাহার নাম দর-পত্তনী ; পত্তনী তালুকের নিলামে উহার উচ্ছেদ হইতে পারে এবং উহার করও সব সময়ে নির্দ্দিষ্ট থাকে না। দর-পত্তনীর নিম্নস্থ স্বত্বের নাম সে-পত্তনী বা তৃতীয় পত্তনী

যশোহর-খুল্‌নার বিভিন্ন স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারীদিগের বিভিন্ন নাম আছে, যেমন মামুদশাহী পরগণায় বা যশোহরের উত্তরাংশে উহাদের নাম জোতদার, যশোহরের দক্ষিণভাগে ও খুল্‌নার পশ্চিমাংশে উহাদের নাম গাঁতিদার এবং খুল্‌নার পূর্ব্বাংশ বা বাগেরহাট অঞ্চলে উহাদের নাম হাওয়ালাদার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহুপূর্ব্ব হইতে এই স্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং প্রারম্ভে এই স্বত্বাধিকারিগণ আবাদকারী প্রজাই ছিলেন। দীর্ঘকালের অধিকারের ফলে ও দেশীয় প্রথানুসারে ইঁহাদের অধিকার কায়েমী এবং হস্তান্তরযোগ্য বা গর-কায়েমী হইয়াছে। হাওয়ালার প্রথা বাখরগঞ্জ হইতেই খুল্‌নায় আসিয়াছে, প্রকৃত অর্থ ধরিতে গেলে, বিশ্বস্তসূত্রে যে জমি বিলি করা হয় তাহার নামই হাওয়ালা। জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে গাতিদার, জোতদার বা হাওয়ালাদারগণ অবস্থাপন্ন হইয়া তালুকদার প্রভৃতির ন্যায় সম্মানিত হইয়া বসেন। হাওয়ালার নিম্নে নিম-হাওয়ালা এবং ওসত-হাওয়ালা প্রভৃতি নিম্নস্বত্বের আবির্ভাব হইয়াছে।[১] জোতদারের অধীন যাহারা জমা রাখে, তাহাদিগকে কর্‌ফা বা কোলজানা প্রজা বলে। যাহারা কোন জোতদার বা গাতিদারের খামার জমি চাষ-আবাদ করিয়া মজুরীর জন্য সাধারণতঃ ধান্যের অর্দ্ধেক ভাগ পায়, তাহারা বর্গা-জোতদার বা বর্গাইত।

সুন্দরবনের মধ্যে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। সেখানে আবাদ করিবার জন্য যিনিই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লন, তিনিই তালুকদার এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি নিজের রাইয়ত বা প্রজাবিলি করিতে পারেন। মোরেলগঞ্জের মোরেল সাহেব এই সকল 'সুন্দরবন তালুকদারগণের' মধ্যে সর্ব্বাগ্রণী। উঁহাদের বিবরণ পরে দিব।

চতুর্থ শ্রেণীর জমিস্বত্বের নাম মৌরসী মোকর্‌ররী। মৌরসী শব্দে পুরুষানুক্রমিক এবং মোকর্‌ররী শব্দে খাজানার হার নির্দ্দিষ্ট বুঝায়। সুতরাং তালুকাদির ন্যায় এই স্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগদখলযোগ্য অর্থাৎ কায়েমী এবং দান বিক্রয় হস্তান্তরের উপযুক্ত। ইহার আরও প্রকারভেদ আছে, সে সব স্থলে জমা কায়েমী হইলেও তাহার খাজানা হ্রাসবৃদ্ধিসাপেক্ষ হইতে পারে। পত্তনীদারের মত মোকর্‌ররীদারগণও দর-মৌরসী বা সে-মৌরসী দিতে পারেন এবং মেয়াদী বা হস্তান্তরের অযোগ্য স্বত্বে জমিবিলি করিতে পারেন।

১ Hunter, *Statistical Account of Jessore*, p. 264.

এই সকল ভিন্ন আর এক প্রকার স্বত্বাধিকারী আছেন, তাঁহারা ইজারাদার। উহারা জমিদার বা তালুকদারের নিকট হইতে বিস্তৃত সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া চুক্তি অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী মালেকের স্বত্বস্বামিত্ব ভোগদখল বা হস্তান্তর করিতে পারেন। 'দায়সুদী' বা 'পচানী' ইজারাদারেরা মালেককে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া যে পর্য্যন্ত ঐ টাকা সুদে আসলে শোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ইজারার উপস্বত্ব ভোগ করেন।

অবশিষ্ট যে সকল সম্পত্তি রহিল, তাহা লা-খেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তি। ১৭৬৫ অব্দে ইংরাজ-কোম্পানি বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী গ্রহণ করেন। উহার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগেব দ্বারা সনন্দ বা তাম্রশাসনাদি সূত্রে যে সকল নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু সনন্দাদি নষ্ট হওয়ায় বা অন্য কারণে যাহারা অধিকার প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়া নিষ্কর হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারা নানা প্রকারে গোলযোগ উপস্থিত করে। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ১৮১৯ অব্দের ২ আইন করিয়া সকল লা-খেরাজের স্বত্ব পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাকে সাধারণ লোকে জুয়েম কানুন বলে। ১৮৩০ অব্দের পূর্ব্বে তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হয় নাই। যে সব পুরাতন নিষ্করের স্বত্ব সপ্রমাণ হয় নাই, তাহাই নির্দ্দিষ্ট রাজস্বে বাজেয়াপ্তী তালুকে পরিণত হয়, সে কথা বলিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩) হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত লা-খেরাজের দলিলাদির প্রথম পরীক্ষা হয়; ঐ পরীক্ষার পর যাহারা উদ্ধার পায়, গবর্ণমেণ্ট ১৮০২ অব্দে তাহাদিগকে নিষ্করের বহালী তায়দাদ দিয়াছিলেন। ইহাকেই সাধারণতঃ ১২০৯ সালের তায়দাদ বলে। উহাতেই পূর্ব্ববর্ত্তী সনন্দাদি যাহা কিছু প্রমাণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহার উল্লেখ ছিল। এই ১২০৯ সালের তায়দাদ নিষ্কর সম্পত্তির প্রধান দলিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৩০ অব্দের পর জুয়েম কানুনানুসারে পরীক্ষা করিয়া পুনরায় তায়দাদ দেওয়া হইয়াছিল। এখন যে সব নিষ্কর বহাল আছে, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি: (১) দেবোত্তর—দেবতার উদ্দেশ্যে হিন্দুদিগের দ্বারা যে সম্পত্তি উৎসৃষ্ট হয়। (২) ব্রহ্মোত্তর—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্রাহ্মণদিগকে যে সব ভূমিদান করেন। (৩) ভোগোত্তর—গুরুপুরোহিতের ভোগের জন্য যে সব জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। (৪) মহাত্রাণ—কোন ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে

তাহার কার্য্যদক্ষতা বা সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ যে ভূমি প্রদত্ত হয়। (৫) চেরাগী—কোন মুসলমানের কবরের উপর বাতি দিবার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য যে জমি দেওয়া হয়। (৬) পীরোত্তর—মুসলমান সাধু বা পীরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত কোন সম্পত্তির উপস্বত্ব ধর্ম্ম বা জনহিতকর কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া ওয়াক্‌ফ বা ট্রাষ্ট সম্পত্তির সৃষ্ট হইয়াছে। সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেটের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর এক প্রকার উৎসৃষ্ট সম্পত্তিকে 'চাকরাণ' বলে। কোন ব্যক্তিবিশেষ গৃহকর্ম্ম সুনিয়মে সম্পাদনের জন্য বা পূর্ব্বকালে শান্তি রক্ষার জন্য যে জমি ব্যক্তিবিশেষের জীবনকালের জন্য বা পুরুষানুক্রমে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাকেই চাকরাণ বলে। কিন্তু ইহা চুক্তিমূলক, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন না করিলে, ইহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নড়াইল জমিদার-বংশ

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের 'রায়' উপাধিযুক্ত কায়স্থ জমিদারগণ বিশেষ বিখ্যাত। সম্পত্তিশালিতায় ও বংশমর্য্যাদায়, সঙ্গতি-প্রভাবে ও শাসন-প্রতাপে, শিক্ষা-গৌরবে ও দেশময় প্রতিপত্তি-সূত্রে ইঁহারা সমগ্র বঙ্গের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ইঁহারা নড়াইলে বাস করেন, এবং ঐ শাসনের প্রারম্ভ হইতে তাঁহাদের সম্পত্তির সূচনা হয়। সুতরাং তাঁহারা নবাবী ও ইংরাজী উভয় আমলের সন্ধিস্থলে প্রাদুর্ভূত। এইজন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কথা বলিয়া পরে ইংরাজ আমলের নব্য জমিদারবর্গের কথা তুলিব।

ইঁহারা দত্ত-উপাধিধারী, দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। ইঁহারা ভরদ্বাজ-গোত্রীয়, 'বালীর দত্ত' ও গোষ্ঠীপতি বলিয়া খ্যাত। "বালীর দত্ত কুলের কান্দা, যা'র দুয়ারে হাতী বান্ধা"—এ প্রবচন ইঁহাদের সম্বন্ধেই খাটে। প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ টাকার সম্পদ ইঁহাদের করায়ত্ত; সকল শ্রেণীর প্রধান কুলীনগণ ইঁহাদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে গৌরবান্বিত। দুয়ারে হাতী বাঁধিয়া রাজশক্তি প্রচারের দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। নড়াইলের জমিদারদিগের সরকার প্রদত্ত রাজোপাধি না থাকিলেও বঙ্গদেশীয় কোন রাজা অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি নিতান্ত ন্যূন নহে।

আদিশূরের সভায় যে পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষ আসেন, তন্মধ্যে মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত অন্যতম; তিনি বটগ্রাম-শাসন লাভ করিয়া তথায় বাস করেন। উহার কিছুদিন পরে খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রণশূর যখন দক্ষিণ রাঢ়ের ('তক্কন্ লাড়ম্') অধিপতি, তখন কাঞ্চীপুরপতি মহারাজ রাজেন্দ্র চোল রাঢ় বঙ্গ আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ সেই সময় ভরদ্বাজ-গোত্রীয় অন্য এক পুরুষোত্তম দত্ত সেই দিগ্বিজয়ী বীরের সঙ্গে বঙ্গে আসেন এবং ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া ভাগীরথী-তীরে বালীতে বসতি করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক-গ্রন্থে আছে :

'বীজী পুরুষোত্তম দত্ত সদা শিব অনুরক্ত,
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ
কুলাভাব হইল নিজ দোষে॥'

এই পুরুষোত্তম গজপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আছে।[১] রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গের আক্রমণ কালে বিজয় সেন গৌড়াধিপ ছিলেন। পুরুষোত্তম বালী হইতে তাঁহার সভায় যান এবং গর্ব্বদোষে মৌদ্‌গল্য দত্তের মত ইঁহারও কুলাভাব ঘটে। কুল না থাকিলে কি হয়, সমাজে তাঁহার বিপুল খ্যাতি ছিল। তদবধি বালী একটি প্রধান দত্ত-সমাজ হয়, পরে ঘোষ কুলীনেরা এ স্থানের খ্যাতি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বালীর দত্তগণ বঙ্গের নানা স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বহুপুরুষ পরে ইঁহাদের এক শাখা মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যান। পুরুষোত্তম হইতে অধস্তন ১৯ পর্য্যায়ভুক্ত নারায়ণ দত্ত তথায় চৌড়াগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র—মদনগোপাল ও মুকুন্দরাম।

মদনগোপাল নবাব সরকারে চাকরী করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-দিগের ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতা ও পরিবারবর্গ লইয়া পলায়ন করেন। তাহার পূর্ব্ব হইতে ভদ্র ও রক্ষিত উপাধিধারী কায়স্থেরা এই স্থানের বাসিন্দা ছিলেন, এবং কুরিগ্রামের ৺নিশানাথ ঠাকুরের বটতলা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মদনের পুত্র রামগোবিন্দের তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে তৃতীয় রূপরামই বিখ্যাত। নবাব সরকারে চাকরীর ফলে মদনগোপাল 'সরকার' উপাধি পান, তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দরামও ঐ উপাধিতে পরিচিত।

মুকুন্দরামের বংশধরগণ এখনও নড়াইলে বাস করিতেছেন। কিন্তু রূপরাম হইতে যে জমিদারীব সূচনা হয়, উঁহারা তাহার অংশভাগী নহেন বলিয়া দত্ত বা দত্ত-সরকার উপাধিধারীই আছেন। একজন প্রধান কৃতীপুরুষের জন্মগৌরবে মুকুন্দরামের ধারাও উজ্জ্বল হইয়াছে। ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত, এম,এ; ইনি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একাউণ্টাণ্ট-জেনারেলরূপে এবং অন্যান্য দায়িত্ব-পূর্ণ উচ্চ কার্য্যে অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

রূপরাম দত্ত প্রসিদ্ধ গুয়াতলীর মিত্র বংশীয় কৃষ্ণরাম মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। উঁহার গর্ভে নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কালীশঙ্করই নড়াইলের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাতামহ কৃষ্ণরাম মিত্রের জলকষ্ট নিবারণ জন্য কপোতাক্ষী তীর হইতে দূরবর্ত্তী

১ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্য কাণ্ড, ১৪২-৪৩, ৩১৭ পৃ।

নড়াইল জমিদার-বংশ

- মদনগোপাল দত্ত
  - রামগোবিন্দ
    - রূপরাম দত্ত সরকার
      - কালীশঙ্কর রায়
        - রামনারায়ণ রায় [নড়াইল]
          - রামরতন রায়
            - চন্দ্রকুমার
              - রাজকুমার
                - হেমন্ত-কুমার
                  - শৈলেন্দ্র
                - নীরদ-কুমার
                  - প্রফুল্ল
            - কালীপ্রসন্ন
              - ভূপেন্দ্রকুমার
                - গোবিন্দ-প্রসন্ন
                  - প্রদ্যোৎকুমার
                - শ্যামা-প্রসন্ন
          - হরনাথ ‘রায় বাহাদুর’
            - উমেশচন্দ্র
              - উপেন্দ্রচন্দ্র
                - ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় M.L.C.
              - কিরণচন্দ্র ‘রায় বাহাদুর’
                - যতীশচন্দ্র
            - কালিদাস
              - নরেন্দ্রভূষণ
                - খগেন্দ্রভূষণ প্রভৃতি
              - নৃপেন্দ্রভূষণ
          - রাধাচরণ রায়
            - যোগেন্দ্রনাথ
              - যতীন্দ্রনাথ I.C.S.
                - রবীন্দ্র
              - ধীরেন্দ্র প্রভৃতি
            - পুলিন-বিহারী
              - বিজনবিহারী
                - বিপিনবিহারী
              - শিবশঙ্কর
        - জয়নারায়ণ রায়
          - দুর্গাদাস
          - গুরুদাস [হাটবাড়িয়া]
            - গোবিন্দচন্দ্র
              - জিতেন্দ্রনাথ বি.এ.
                - নলিনী-নাথ রায় M.A., M.L.C.

গুয়াতলী গ্রামে ১২ বিঘা জমিতে এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেন, উহা এখনও আছে।[১] রূপরাম অল্প বয়সে নাটোর রাজসরকারে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে বিশ্বাসভাজন হইয়া ঐ সরকারের উকীলরূপে মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে কার্য্য করিতেন। এই ভাবে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন এবং রাণী ভবানীর কৃপায় আলাদাতপুর নামক তালুকের পাট্টা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোরের নামে গ্রহণ করেন (১৭৯১ খৃঃ)। ঐ তালুকের কর ১৪৮।৫ টাকা ধার্য্য ছিল। উহারই মধ্যে নড়াইলের জমিদারবাটী অবস্থিত। ঐ স্থানে রূপরাম চিত্রাতীরে যে বাজার বসাইয়াছিলেন, তাহার নাম রূপগঞ্জ; অতি অল্পদিন হইল ঐ নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া রূপরামের প্রপৌত্র রামরতনের নামে রতনগঞ্জ করা হইয়াছে। সাধারণ লোকে রূপগঞ্জ বলিয়াই জানে; রূপরামের নাম মুছিয়া যাওয়ার কোন হেতু নাই। ১৮০২ অব্দে রূপরাম দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার দুইপুত্র কালীশঙ্কর ও রামনিধি মাত্র ছিলেন, নন্দকিশোর পূর্ব্বেই অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

রূপরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গঙ্গারাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামনিধি উভয়েরই বংশ আছে। কিন্তু তাঁহারা জমিদারীর অংশীদার নহেন। এজন্য আমরা এখানে শুধু কালীশঙ্করের ধারাই আলোচনা করিব, কারণ তিনিই বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কৃতী পুরুষ এবং তিনি জমিদারীর স্থাপয়িতা।

কালীশঙ্কর পিতার সঙ্গে অতি অল্পবয়সে নাটোর রাজ-সরকারে প্রবেশ করেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৬১৯ পৃ)। তখন রাণী ভবানী নাটোর-রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কালীশঙ্করের যেমন সুন্দর মূর্ত্তি, তেমনই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সে সময় শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় তিনি

১ এই পুষ্করিণীর গর্ভখাতে জলাশয়ের পরিমাণ এখনও ৩৯০'×২৩৪' ফুট, এবং উহার পাহাড় এখনও প্রায় ১৫´ ফুট উচ্চ আছে। কৃষ্ণরাম মিত্র গুয়াতলী মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ কুলীন অভিরাম মিত্রের ৪র্থ পুত্র। কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণবল্লভ গুয়াতলী হইতে উঠিয়া আসিয়া বিবাহ-সূত্রে খুল্‌না জেলায় ফকিরহাটের নিকটবর্ত্তী পাগ্‌লা গ্রামে বাস করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার প্রাণবল্লভের অধস্তন ৭ম পুরুষ, বংশধারা দিতেছি: ১৮ অভিরাম—প্রাণবল্লভ—আনন্দিরাম—রামকৃষ্ণ—রামজয়—গৌরমোহন—প্যারীমোহন—সতীশচন্দ্র (গ্রন্থকার)—শিবশঙ্কর (বর্ত্তমান সম্পাদক)। কৃষ্ণরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র পরেশনাথ মিত্র মহোদয় এখনও জীবিত আছেন এবং গুয়াতলী গ্রামে থাকিয়া সেই ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত পুরাতন পল্লীর মুখরক্ষা করিতেছেন।

পণ্ডিত হইতে পারেন নাই ; কিন্তু জমিদারীর কার্য্য চালাইতে যেটুকু বাঙ্গালা ও পারসী বিদ্যা লাগিত, কালীশঙ্করের তাহা ছিল। আর ছিল তাঁহার মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শরীরের অমিত বল, আর মনের অসীম সাহস। ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিতে তিনি সুনিপুণ ছিলেন ; তজ্জন্য অবলম্বিত পন্থার ন্যায়ান্যায় বিশেষ বিচার করিতেন না।[১] সেই সময়ের যুগ-ধর্ম্মই এই ছিল। মোগল ও ইংরাজ শাসনের সন্ধি-যুগে দেশে ছিল অরাজকতা ; দেশীয় লোকে সহজে বৈদেশিককে আমল দিতে রাজি ছিল না ; সুতরাং দেশীয়েরা যাহাকে স্বাধিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন, শাসকেরা তাহাই বে-আইন বলিয়া ঘোষণা করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হেঙ্কেল সাহেব যশোহরের প্রথম জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন, তাঁহার আমলে (১৭৮৪) কালীশঙ্কর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকিশোরের নামে এক লুট-তরাজের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা সূত্রে বিরক্ত হইয়া কালীশঙ্কর একখানি নৌকা লুটিয়া লন, অমনি হেঙ্কেল সাহেব তাঁহাকে ডাকাইত নামে অভিহিত করিয়া সরকারে রিপোর্ট করেন,[২] কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে এ বড় সাধারণ ডাকাইত নহে। তাই তিনি কুতব্উল্লা সর্দ্দারের অধীন কতকগুলি সিপাহীকে কালীশঙ্করকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য নড়াইলে পাঠাইলেন। উহাদের সহিত কালীশঙ্করের ১৫০০ লাঠিয়ালের এক রীতিমত খণ্ড-যুদ্ধ হইল, তাহাতে সরকারের দুইজন হত ও ১৫ জন আহত হইল। আহতদিগের মধ্যে কুতব্উল্যা নিজেই একজন। পুনরায় যখন সাহেব অতিরিক্ত সৈন্যদল পাঠাইলেন, তখন নন্দকিশোর ধৃত হইলেন বটে, কিন্তু কালীশঙ্কর হাতছাড়া হইয়া প্রথম নাটোরে ও পরে কলিকাতায় গিয়া লুক্কায়িত থাকিলেন। যদিও বহু গোলযোগের পর অতিকষ্টে তাঁহাকে মুড়লীতে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু তিনি দারোগার বিচারে অব্যাহতি

১ 'Kalisankar was a man of wonderful energy and ability in business —my regard for truth compels me to say it—he was perfectly unscrupulous'.—Westland, *Jessore*, p. 157. *See also*, Hunter, *Jessore*, p. 217.

২ 'A dacoit and a notorious disturber of peace', quoted from Henkell's letters by Westland on p. 60, with his own remarks : 'Kalisankar appears to have been much more of a lathial zamınder than a dacoit'— *Ibid.*, p. 61.

পাইলেন।[১] দেশীয় জমিদারেরা তখন অনেক স্থলেই সাহেবী বিচারের পথে অন্তরায় হইতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ কালীশঙ্করের নিকট কাদিহাটি পরগণা বিক্রয় করেন এবং ভূষণা জমিদারীর অবশিষ্টাংশ তাঁহাকে ইজারা দেন। ভূষণা তখন লাভের সম্পত্তি ছিল না এবং তাহার রাজস্ব পরিশোধিত হইতেছিল না। কারণ, প্রজাদিগের নিকট হইতে সহজে খাজনা আদায় হইত না। এজন্য মহারাজ ভাবিলেন, ঐ জমিদারী কালীশঙ্করের হাতে গেলে প্রকৃত শাসনতলে আসিবে।[২] ১৭৯৩ অব্দে ইজারা আরব্ধ হইল। কালীশঙ্কর প্রথম বৎসরই উহার খাজনা বৃদ্ধি করিয়া ৩,২৪০০০৲ হইতে ৩,৪৮০০০৲ টাকা এবং পর বৎসর ৩,৮৮০০০৲ টাকা করিলেন। জোরজারিতে কর-বৃদ্ধি করিলে প্রজারা বিদ্রোহী হইল। কেহ কেহ অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য নালিশ করিল এবং কেহ কেহ তিন গুণ টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য ডিগ্রী পাইল।[৩] শুধু তাহাই নহে, কালীশঙ্করের নামে এক মিথ্যা ঘুষের মোকদ্দমা রুজু হইল। তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু সে চারিমাস কাল হাজতে থাকিবার পর। ১৭৯৫ অব্দের শেষ ভাগে তিনি যখন জেল হইতে বাহির হইলেন তাঁহার প্রতিপত্তি বিলুপ্ত প্রায় হওয়ায় খাজনাপত্র কিছুই আদায় হইল না। এ সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন পাশ হইয়াছে, ভূষণার খাজনা বহু পরিমাণ বাকী পড়িয়াছিল। সুতরাং উহার উদ্ধারের পন্থা ছিল না। একটা চেষ্টা বাকী ছিল, অন্যের পরামর্শে মহারাজ তাহাও করিলেন। তিনি ১৭৯৫ অব্দে ভূষণা জমিদারী নিজের নাবালক পুত্র বিশ্বনাথের নামে দানপত্রে লিখিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট নাবালক সম্পত্তি নিলাম করিতে পারেন না। সুতরাং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে, তাহাই হইল। গবর্ণমেণ্ট উক্ত সম্পত্তি হস্তে লইয়া একজন কমিশনার এবং

---

১ "The fight lasted three hours and Kalisankar gained the day, having killed two and wounded fifteen of the magistrate's force; Kutbullah was among the wounded"—Westland, *Jessore*, 1871, p. 78. সুতরাং ইহা যে একটি ছোটখাট যুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২ 'Certainly if any one could have made it a paying zamindari, that man was Kalisankar.'—*Ibid.*, p. 157.

৩ *Ibid.*, p. 61; Cal. Rev., 1873, p 16—*Rajas of Rajshahi.*

তাঁহার অধীনে একজন সাজোয়াল বা ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তখনও কালীশঙ্করের কূটনীতির মর্ম্মগ্রহণ করেন নাই; এজন্য কালীশঙ্করের পুত্র রামনারায়ণকেই সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া বসিলেন। কালীশঙ্কর তখনও পত্তনীদার, ক্রমশঃ তাঁহার খাজানা বাকী পড়িতেছিল। কালেক্টর তাঁহাকে বাকী করের জন্য জেলে দিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামনারায়ণের কৌশলে সহজে তাহা পারিলেন না। অবশেষে রামনারায়ণকে সরাইয়া কালীশঙ্করের এক প্রকাশ্য শত্রুকে সাজোয়াল করা হইল (১৭৯৬)। কালীশঙ্করের দেনা শীঘ্রই ৯৮,০০০৲ টাকা দাঁড়াইল; তখন কালেক্টর বুঝিলেন তিনি শুধু শঠতা করিয়া রাজস্ব দাখিল করিতেছেন না। এজন্য তাঁহার ইজারা বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

এদিকে প্রজারা বিদ্রোহী হইল; অনেক দিনের পর অতিকষ্টে কমিশনার সাহেব ভূষণার জন্য ৩,২৭,৮০০৲ টাকা কর স্থির করিলেন; স্থির হইল যে, সমস্ত টাকা আদায় হইলে, উহার মধ্যে ২৬,৬৫৪৲ টাকা জমিদার পাইবেন। কালীশঙ্কর তখনও দেওয়ানী জেলে ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে দেনার টাকা আদায় করা সহজ হইল না। এই সময়ে তিনি একখানি দলিল দাখিল করিয়া দেখাইলেন যে, দেনার মধ্যে ৫০,০০০৲ টাকা নাটোরের মহারাজের নিকট তাঁহার ব্যক্তিগত দেনা। তখন অবশিষ্টাংশের জন্য তাঁহার নামে ডিগ্রী হইল, এবং নাটোরের মহারাজ তাঁহার জামিন হইলে কালীশঙ্কর মুক্তি পাইলেন।

রেভেনিউ বোর্ড যখন তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ডিগ্রীর টাকা আদায় করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন, তখন কালীশঙ্কর গণ্ডীর বাহিরে কলিকাতায় গিয়া, নিজের প্রধান সম্পত্তি তেলিহাটি পরগণা পুত্রের নামে লিখিয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি বেনামী করিয়া রাখিলেন। এমন সময়ে তাঁহার জামিন, মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, কালীশঙ্কর একপ্রকার নিস্তার পাইলেন।

এই সময়ে রাজা বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। রেভিনিউ বোর্ড তাঁহাকে পক্ষ করিয়া কালীশঙ্করের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ৬২,০০০৲ টাকার ডিগ্রী পাইলেন (১৭৯৯)। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু চেষ্টার পর, পরবৎসর কালীশঙ্কর আবার ধরা পড়িলেন এবং পুনরায় চারি বৎসরকাল দেওয়ানী জেলে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ মিটাইলেন। তাঁহার নিকট প্রাপ্য সুদ মাপ করা হইল, আসলের মধ্যে ১০,০০০৲ টাকা নগদ এবং বাকী

৩৫,৪৫০৲ টাকা কিস্তীবন্দী করিয়া, পাঁচজনকে জামিন রাখিয়া, কালীশঙ্কর খালাস পাইলেন (১৮০৪)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পর হইতে যখন নাটোরের বিপুল জমিদারী খণ্ডে খণ্ডে নিলামে বিক্রীত হইতেছিল, তখন কালীশঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সরকারের ভৃত্যবর্গই অধিকাংশ সম্পত্তি অন্য নামে খরিদ করিয়া লইতেছিলেন। এইরূপ বিশ্বাসের অপব্যবহারই কালীশঙ্করের চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। তিনি উক্ত প্রকারে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমে পরগণা তেলিহাটি, বিনোদপুর, রূপপাত, তরফ কালিয়া এবং পরগণা পোক্‌তানি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মহল নিলাম হইবার সময়ে নিজের অনুগত লোক দ্বারা বিনামে খরিদ করিয়া লন।[১] কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারী এইভাবে হস্তগত করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৺কাশীধামে এবং মীর্জাপুরেও তিনি কিছু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮২০ অব্দে নিজ পুত্রদ্বয় রামনারায়ণ ও জয়-নারায়ণের হস্তে সম্পত্তির ভারার্পণ করিয়া, তিনি প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে, মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য, হিন্দু-জীবনের চিরন্তন প্রথানুসারে কাশী-যাত্রা করেন।

কাশীতেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এ সময়ে পাণ্ডাদিগের পীড়নে এবং অন্যবিধ দুর্ব্বৃত্তগণের উৎপাতে কাশীক্ষেত্রে নিরীহ তীর্থযাত্রিগণ সর্ব্বদা বিড়ম্বিত হইত। কালীশঙ্কর সে দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অবিরত চেষ্টা ও নানা কূট-কৌশলে সর্ব্বজাতীয় অত্যাচারীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়া কাশীক্ষেত্রকে নিরুপদ্রব করিয়া যান। ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে বোধ হয় কাশীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়; কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে

১ তেলিহাটি ও আমীরাবাদ ১৭৯৫ অব্দে রেভেনিউ বোর্ডের নিলামে কলিকাতায় থাকিতে কালীশঙ্কর স্বয়ং খরিদ করেন। রূপাপাত ১৭৯৯ অব্দে রাজস্ব নিলামে ভৈরবনাথ রায় নাটোরের মহারাজের বিনামে খরিদ করেন, উহা পুনরায় ১৮০৮ অব্দে নিলাম হইলে রামনারায়ণ খরিদ করিয়া লন (১২১৪ সাল)। তরফ কালিয়া ১৭৯৯ অব্দে রাজস্ব নিলামে গদাধর মুখোপাধ্যায় খরিদ করেন, তিনি উহা ১৮০১ অব্দে দেবীপ্রসাদ রায়কে কোবালা করিয়া দেন। দেবীপ্রসাদ কালীশঙ্করের শ্যালক। তিনি উহা কোবালা দ্বারা জয়নারায়ণের নামে হস্তান্তর করেন। বিনোদপুর তপ্পা কালীশঙ্কর ১৭৯৫ অব্দে রাজনারায়ণ দাসের নামে খরিদ করেন, পরে উহা জয়নারায়ণকে হস্তান্তরিত করা হয়। পরগণা পোক্‌তানি ১৮১৪ অব্দের নিলামে জয়নারায়ণের নামে ক্রয় করা হয়।

বলা যায় যে, কাশীতে যেরূপ পাণ্ডা বা অন্য কাহারও কোন অত্যাচার নাই, এমন শান্তিময় অবস্থা আর কোনও তীর্থে দেখা যায় না। এই অবস্থার জন্য কাশীবাসিগণ চিরদিন প্রধানতঃ কালীশঙ্কর রায়ের নিকট ঋণী রহিবেন। সেই পবিত্র কাশীধামে ১৮৩৪ অব্দে, প্রায় ৮৫ বৎসব বয়সে কালীশঙ্করের দেহ-ত্যাগ হয়।

কালীশঙ্কর কাশী যাওয়ার পর প্রথমতঃ তৎপুত্র জয়নারায়ণ (১৮২২) ও পরে রামনারায়ণ (১৮২৭) মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীশঙ্কব দেশে থাকিবার কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রদ্বয় একত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা পৃথক্ হন। তদবধি বড়তরফ ও ছোটতরফ নামের সৃষ্টি। রামনারায়ণের তিনপুত্র, রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ পূর্ব্ব-বাটীতে থাকিলেন বলিয়া উঁহাদের বংশধরগণ সাধারণতঃ 'নড়াইলের বাবু' বলিয়া খ্যাত। জয়নারায়ণের চারিপুত্র মধ্যে ভবানীদাস ও কৃষ্ণদাস নাবালক অবস্থায় মারা যান, দুর্গাদাস ও গুরুদাস মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহারা নড়াইলের বাটীব অদূববর্ত্তী ব্রাহ্মণডাঙ্গা বা হাটবাড়িয়া গ্রামে নদীতীরে বসতি স্থাপন করেন। এজন্য উঁহাদের বংশধরেরা 'হাটবাড়িয়ার জমিদারবাবু' বলিয়া পরিচিত। কালীশঙ্করের মৃত্যুর কিছুদিন পরে দুর্গাদাসও অপুত্রক মারা যান। তখন ছোটতরফে একমাত্র গুরুদাস জীবিত থাকিলেন; তিনিও সুশিক্ষিত ছিলেন না এবং তাঁহার শরীর দুর্ব্বল এবং পা খোঁড়া ছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ শক্তিতে তাঁহার শিক্ষাভাব ও সকল দুর্ব্বলতার ক্ষতিপূরণ করিয়াছিল। পৌত্রান্তর ফলের কথা জনপ্রবাদে শুনা যায়। পিতামহের কূটবুদ্ধির অধিকাংশ গুরুদাসের উত্তরাধিকারে বর্ত্তিয়াছিল। এই গুরুদাস বাবুর সহিত তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতৃগণের ঘোর বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

কালীশঙ্করের মৃত্যুর পব রামরতন প্রভৃতি একখানি উইল বাহির করেন; উহাতে দেখা যায়, সম্পত্তির ৷৶০ দশ আনা অংশ কালীশঙ্কর রামনারায়ণকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই উইল অবিশ্বাস করিয়া ১৮৪৭ অব্দে গুরুদাস রায় ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাসের বিধবা পত্নী রণরঙ্গিণী দাস্যা সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবার হিসাবে ৪১,২৯,২৩৬৷৶৫ টাকার দাবি করিয়া এক বিরাট মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। যশোহরের জজ্ স্বনামধন্য সেটন কার (W. S. Seton-Karr) সাহেবের বিচারে (১৮৫৮, ১৮ই ডিসেম্বর) এই দাবি ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়। তখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে

উহার আপীল হয়। সেখানে তিনজন জজের বিচারে (১৮৬১, ২২শে জুলাই) গুরুদাসের অনুকূলে মোকদ্দমার ডিগ্রী হয়। তখন অপরপক্ষ বিলাতে প্রিভি-কৌন্সিলে উহার আপীল করেন। কিন্তু সেখান হইতে ১৮৭৬ অব্দের পূর্ব্বে মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার হয় নাই। সে কৌন্সিলেও সদর দেওয়ানী আদালতের রায় বহাল থাকে অর্থাৎ গুরুদাস জয়লাভ করেন।

কিন্তু এই মোকদ্দমা চলিবার কালে, ১৮৬০ অব্দে রামরতন, এবং ১৮৬৮ অব্দে হরনাথ মারা যান। তখন মাত্র রাধাচরণ বাবু বড় তরফের কর্ত্তা ছিলেন। প্রিভি-কৌন্সিলের নিষ্পত্তির দুই বৎসর পূর্ব্বে গুরুদাস বাবুর মৃত্যু ঘটে। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মোকদ্দমার শেষ ফলের জন্য আশান্বিত ছিলেন এবং নিজ পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে মীমাংসা করিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, গোবিন্দচন্দ্র সে উপদেশ না মানিয়া অপর পক্ষের সহিত শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলেন। তাহার ফলে ৪০,০০০৲ টাকা নগদ এবং ১২,০০০৲ টাকা হস্তবুদের জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই সম্পত্তির মধ্যে তরফ কালিয়া এবং পরগণা রূপাপাত, পোক্‌তানিই প্রধান ; তদ্ভিন্ন নল্‌দীর অধীন উজীরপুর পত্তনী এবং মামুদশাহীর অধীন তরফ নাগিরাট ও আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মহাল আছে।

রামনারায়ণের পুত্রগণের তিনজনই কৃতী পুরুষ। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামরতন বা স্বনামধন্য রতন বাবু সমধিক বিখ্যাত। তাঁহার সময়ে নলডাঙ্গার রাজাদিগের অধিকৃত মামুদশাহী পরগণার ॥৵১০ অংশ ক্রমে ক্রমে অর্জ্জিত হয় (৪৮২ পৃ)। এখন নড়াইলের বাবুদিগের উহাই সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। অপর সম্পত্তির মধ্যে পরগণা তেলিহাটি, বেলগাছি ও বীরমোহন (ফরিদপুর), পরগণে ইশপপুর ও রসুলপুর (যশোহর-খুল্‌না), পরগণে দাঁতিয়া (খুল্‌না) এবং নল্‌দীর অধীন তরফ দারিয়াপুর প্রভৃতি প্রধান। রতন বাবুর আমলে নীলকর সাহেবরা দেশময় সর্ব্বত্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও জমিদারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতে সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে রতন বাবু একজন। তিনিও বহু কুঠির মালিক হইয়াছিলেন। কয়েকটি নাম করিতেছি : ঘোড়াখালি, মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, য'তেরকাটি, ধোপাদি, গোপালপুর, শৈলকুপা, শ্রীখণ্ডী, কুমারগঞ্জ, আউড়িয়া, আফ্‌রা, তুজার ডাঙ্গা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। উহার অনেকগুলি সাহেব-দিগের নিকট হইতে খরিদ করা হয়। যে বৎসর নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়,

সেই বৎসরই রতন বাবুর মৃত্যু ঘটে। রতন বাবু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন, তিনি নড়াইলের বাটীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসবাদি পর্ব্বানুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। রতন বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধের মত দানসাগর শ্রাদ্ধ এদেশে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

তাঁহার মৃত্যুর পর, মধ্যমভ্রাতা বাবু হরনাথ রায় জমিদারীর কর্ত্তা হন। তিনি নড়াইল হইতে যশোহর পর্য্যন্ত একটি উৎকৃষ্ট রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। এইরূপ আরও কতকগুলি জনহিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। রাধাচরণ বাবুর সময়ে হাটবাড়িয়ার সহিত বিবাদ মিটিয়া যায়। রতন বাবুদের তিন ভ্রাতার প্রত্যেকের দুইটি করিয়া পুত্র ছিল,—রতন বাবুর পুত্র চন্দ্রকুমার ও কালীপ্রসন্ন ; হরনাথের পুত্র উমেশচন্দ্র ও কালিদাস ; এবং কনিষ্ঠ রাধাচরণের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ও পুলিন। এই ছয়জন তুল্যাংশে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, প্রত্যেকের ৵৮ পাই অংশ ; তন্মধ্যে কালিদাসের পুত্রগণের সম্পত্তি পৃথকভাবে শাসিত হয়, উহাকে সাধারণতঃ আড়াই আনী বলে ; অবশিষ্ট ৫ জনের ৸৵৪ পাই অংশ একসঙ্গে শাসিত হয়। তজ্জন্য ম্যানেজার, ডেপুটী ম্যানেজার ও অন্যান্য বহু কর্ম্মচারী আছেন।[১]

বঙ্গের বিদ্যোৎসাহী জমিদারগণের মধ্যে নড়াইলের বাবুরা অন্যতম। রতন বাবুর সময়ে তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাই ১৮৮৬ অব্দে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং ৪ বৎসর পরে ১৮৯০ অব্দে উহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত উহাতে বি, এ, পড়ান হইত ; কয়েকজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন আর বি, এ, ক্লাস নাই, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের দুইটি

---

১ লক্ষ্মীপাশা নিবাসী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে এই বিপুল জমিদারীর প্রধান ও উপযুক্ত ম্যানেজার। উক্ত ৫ জনের ৸/৪ অংশে হস্তবুদ ৬,৭১,১৯০৲ টাকা ও কালিদাস বাবুর অংশে, ১,৩৪,২৩৮৲ টাকা অর্থাৎ মোট ৮,০৫,৪২৮৲ টাকা আদায়। ইহা ব্যতীত প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে অর্জ্জিত পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তি আছে। উহার আনুমানিক হস্তবুদ পাঁচ জনের একত্র যোগে ৫,০০,০০০৲ টাকা এবং কালিদাস বাবুর সম্পত্তি আনুমানিক ৬৫,০০০৲ টাকা হইতে পারে। তাহা হইলে নড়াইলের বাবুগণের সম্পত্তির হস্তবুদ আদায় ১৩,৭০,৪২৮৲ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা হইবে। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটা খসড়া হিসাব দিলাম মাত্র, প্রতি বৎসর উহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

ক্লাস মাত্র আছে। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের শিক্ষায় ও যত্নে এই কলেজের পরীক্ষাফল সুন্দর হয়। বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্ট খণ্ডে দিব।

রতন বাবুর সময় হইতে ঐ স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং সুবিখ্যাত ডাক্তার এণ্ডারসন সাহেব (Dr. J. G. Anderson) বহুকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসকরূপে থাকিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

রতন বাবুর পুত্র কালীপ্রসন্ন একান্ত নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। রতন বাবু নিজ বাটীতে ৺কালী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮১২ শকাব্দে (১৮৯০ খৃঃ) সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নী সেই কালিকামূর্ত্তি একটি অপূর্ব্ব শ্বেত মর্ম্মর-নির্ম্মিত মন্দিরে বিশেষ সমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরে এই ফলক লিপি আছে :

'কায়স্থো দত্তবংশবিজিতবিধুযশা রামরত্নাভিধানঃ
কর্ত্তুং কাল্যাঃ প্রতিষ্ঠাং প্রতিকৃতিমুপলৈঃ কারয়িত্বৈব তস্যাঃ।
কালীধামাপমুক্তা ভুবমিতি সুমতিস্তস্য পুত্রঃ কনিষ্ঠঃ
শ্রীমান্ কালীপ্রসন্নঃ পিতুরভিলসিতাং তাং প্রতিষ্ঠাং বিধায়।
দক্ষিণায়ণসংক্রান্ত্যাং ভুজেন্দু বসুভূ-মিতে
শাকে সংস্থাপয়ামাস তাং নাম্না সর্ব্বমঙ্গলাং॥
শকাব্দা ১৮১২, সম্বৎ ১৯৪৭, ১২৯৭, ৩২শে আষাঢ়।'

রায় বাহাদুর হরনাথ বাবুর পৌত্র কিরণচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। রায় বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেন্দ্রচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত জনহিতৈষী ব্যক্তি ; তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে দেশের ও দশের জন্য বহু ব্যাপারের উদ্যোক্তা বলিয়া খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রায় সুশিক্ষিত, প্রবীণ ও বুদ্ধিমান জমিদার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড হইতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বহুবৎসর যাবৎ ম্যাজিষ্ট্রেটি চাকরী করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুলিনবিহারী ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, তিনি কাশীপুরের নিজবাটীতে পৃথক্‌ভাবে ৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হাটবাড়িয়ায় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বি, এ, একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। কয়েক বৎসর হইল তিনি নিজবাটীতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার অধিবেশন সম্পাদন

করিয়া একান্ত স্বজাতিবৎসলতার পরিচয় দেন। তৎপুত্র বাবু নলিনীনাথ রায় এম, এ, অল্পবয়স্ক হইলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। হাটবাড়িয়া ও রূপাপাত এই উভয় স্থানে হাটবাড়িয়ার বাবুদিগের মনোরম বাড়ী আছে।

নড়াইলে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাশীপুরে নড়াইলের বাবুদের প্রত্যেকের রাজোচিত বাড়ী আছে। দুঃখের বিষয়, এখন প্রায় সকলেই অধিকাংশ সময় কাশীপুরের বাটীতে বাস করেন, কদাচিৎ কখনও নড়াইলের বাটীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন। এজন্য নড়াইলের বাটীর পর্ব্বানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম্ম বা সাধারণ হিতকর কার্য্যে আর তাঁহাদের সেরূপ যত্ন বা ব্যয়-ব্যবস্থা নাই। প্রজাবর্গ আর জমিদারের দর্শনলাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদের অভাব অভিযোগ জমিদার বাবুদের কর্ণে পৌছে না; দেশের রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হাটবাজার বা হাসপাতাল প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠান শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে; খাজানার আদান-প্রদান ব্যতীত প্রজা মনিবে জানাশুনা বা আর বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা জানা যায় না। জমিদারগণ সহরের কোণে বৈদ্যুতিক আলোক-ব্যজনে যতই স্বচ্ছন্দে থাকুন না কেন, নড়াইলের জমিদারের মান প্রতিপত্তি ও প্রবল প্রতাপ নড়াইলে যেমন ছিল, কাশীপুরের ঔপনিবেশিক বড় লোকের মধ্যে তাঁহাদের সে সম্মান, সে বিশেষত্ব, সে প্রতিপত্তি বা আত্মতৃপ্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নব্য জমিদারগণ

চাঁচ্ড়া, নলডাঙ্গা, সৈয়দপুর ও সীতারামের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা অনেকগুলি পরগণার শাসন ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিবরণ দিয়াছি। পরে রায়েরকাঠি, কাড়াপাড়া, নড়াইল প্রভৃতি জমিদার বংশের পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় দিতে গিয়া কতকগুলি পরগণার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছি। যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে আর কয়েকটি প্রধান পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে দিব। বংশ-কাহিনী পরখণ্ডের জন্য স্থগিত রাখিয়া, এখানে শুধু জমিদারীর বৃত্তান্ত লিখিব এবং সেই সম্পর্কে যশোহরের যেটুকু বংশ-পরিচয় দিবার আবশ্যক হয়, তাহাই দিব। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অধিবাসী নব্য জমিদারগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই নড়াইল-বংশের কথা বলিয়াছি। খুল্‌নার অধিবাসী জমিদারগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব প্রধান, এখানে সেই সাতক্ষীরা-জমিদার বংশের কথা সর্ব্বাগ্রে বলিয়া লইব।

সা ত ক্ষী রা জ মি দা র ব ং শ॥ প্রাচীন ঘটককারিকা হইতে দেখা যায়, যে সকল প্রাচীন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-বংশ বহুকাল হইতে রাঢ়ীয় সমাজ-ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে কাটানি-গাঞি বলিয়া চিহ্নিত খুল্‌না জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামের চক্রবর্ত্তী-বংশ কুলক্রিয়া দ্বারা বিখ্যাত।[১] এই বংশীয় বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৭৮২), যখন তাঁহার অধিকৃত পরগণাগুলি বিক্রীত হইতেছিল, তখন বিষ্ণুরাম বুড়ন পরগণা নিলাম খরিদ করিয়া, তদন্তর্গত সাতঘরিয়া বা সাতক্ষীরায় আসিয়া বাস করেন ও রায়চৌধুরী উপাধিধারী হন। তিনি পরে তালা, খাজ্‌রা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। বিষ্ণুরামের দুই পুত্র, রাধানাথ ও প্রাণনাথ; তন্মধ্যে প্রাণনাথ কৃতী পুরুষ। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে নিলামাদি দ্বারা মলই, ভেরচি, শ্রীপদগহা, মণ্ডলঘাট, বালাণ্ডা, উখড়া ও জয়পুর (অর্দ্ধাংশ) খরিদ করেন। ইহার মধ্যে মলই প্রভৃতি পরগণা লইয়া চাঁচ্ড়ার রাজাদের সঙ্গে প্রাণনাথ রায়ের দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমা

১ লালমোহন, 'সম্বন্ধনির্ণয়', ৪২৫ পৃ; 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১০১ পৃ।

সাতক্ষীরা জমিদার-বংশ

- বিষ্ণুরাম রায় চৌধুরী
  - রাধানাথ
    - কাশীনাথ
      - ব্রজনাথ প্রভৃতি
    - দেবনাথ
      - মহেন্দ্র
        - রামনিরঞ্জন প্রভৃতি
    - পার্ব্বতীনাথ
    - উমানাথ
      - তারক [পোষ্য]
        - নগেন্দ্রনাথ
    - শ্যামানাথ
      - অমরেন্দ্র
        - জিতেন্দ্র
  - প্রাণনাথ
    - বৈদ্যনাথ
      - গিরিজানাথ
        - শৈলজানাথ M.L.C.
        - অদ্রিজা
        - শিখরিজা
        - হিমাদ্রিজা
        - হিমজা
      - সতীন্দ্রনাথ
        - যতীন্দ্রনাথ
        - জ্ঞানেন্দ্র
        - রবীন্দ্র
        - যোগেন্দ্র
    - শিবনাথ
      - মন্মথ
        - দ্বিজেন্দ্রনাথ

চলিয়াছিল; অবশেষে ১৮৪৮ অব্দে, উহাতে প্রাণনাথই জয়লাভ করেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর বাজিতপুর পরগণা নল্‌তার ভঞ্জচৌধুরীদিগের হস্তগত হয়, তাঁহাদের অবস্থা মন্দ হইলে ঐ পরগণার ৸০ বার আনা অংশ প্রাণনাথ খরিদ করেন। প্রাণনাথের সময়েই প্রাণসায়র নামক কৃত্রিম খাল খনিত করিয়া সাতক্ষীরা সহরের সহিত বেতনা নদীর সংযোগ করা হয়।

রাধানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পঞ্চপুত্র 'পঞ্চনাথ কমিটি' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই পঞ্চনাথের মধ্যম দেবনাথ রায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দেবদ্বিজভক্ত, দেব-চরিত্র লোক ছিলেন।[১] তিনি খুল্লতাত প্রাণনাথের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। প্রাণনাথের সময়ে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সাতক্ষীরার বাটীতে ৺অন্নপূর্ণা, ৺আনন্দময়ী ও ৺গোবিন্দদেব এবং কালভৈরব প্রভৃতি বিগ্রহের জন্য সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির ও রাসমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। অন্নপূর্ণার মন্দির দেশপ্রসিদ্ধ। দেবনাথই সাতক্ষীরা সহরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য ছায়াবৃক্ষ সমন্বিত রাস্তা প্রস্তুত করেন, দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার কূলে দোলমঞ্চ, টাউনহল ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সকল গৃহে এক্ষণে 'প্রাণনাথ হাই স্কুল' চলিতেছে। দেবনাথের মৃত্যুর পর পঞ্চনাথ কোম্পানির বিষয়াংশ যখন ব্যবস্থাদোষে বিক্রীত হইতে থাকে, তখন উহার কতকাংশ মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা, রাজা দিগম্বর মিত্র ও দিঘাপাতিয়ার রাজার হস্তগত হয়, কতকাংশ প্রাণনাথের পৌত্র গিরিজানাথ ক্রয় করেন। গিরিজানাথ ও তাঁহার ভ্রাতা সতীন্দ্রনাথের জমিদারী একত্রযোগে সংরক্ষিত হইতেছে এবং তাহার ম্যানেজার আছেন মুকুন্দপুর নিবাসী লক্ষ্মণচন্দ্র রায় (১৫৭ পৃ)। এই সম্পত্তির হস্তবুদ প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। গিরিজানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলজানাথ কৃতবিদ্য, অধ্যবসায়ী, উন্নতমনা জমিদার; তিনি বঙ্গীয় ব্যস্থাপক সভার সদস্য হইয়া দেশের সেবা কবিতেছেন।

১ হোগ্‌লা পরগণা

ল খ্ পু রে র কা শ্য প চৌ ধু রী - বং শ॥ খুল্‌না জেলার পূর্ব্বাংশে হোগ্‌লা একটি বিস্তীর্ণ পরগণা। ইহাও সুন্দরবনের একাংশে অবস্থিত; লোনা মুল্লুকে নদী বা খালের কূলে যেখানে সেখানে হোগ্‌লা গাছের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব বশতঃ এই পরগণার হোগ্‌লা নাম হইয়াছে। খাঁ জাহান আলির আমলে এই পরগণার যতখানি আবাদ হইয়াছিল, তিনি তাহা দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর (১৪৫৯ খৃঃ) পর উহা কাহার অধিকারে আসে, জানা যায় না। পরে সম্ভবতঃ হুসেন সাহের রাজত্বের প্রারম্ভে (আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে) রাঢ়ীয় কুলীন

১ দামোদর ভট্টাচার্য্য কৃত 'দেবনাথচরিতম্' নামে এক সুদীর্ঘ সংস্কৃত মহাকাব্য আছে; সে কাব্যে শুধু স্তাবকতা ও বাক্‌চাপল্যই আছে, কোন প্রকৃত চরিত্র-চিত্র বা ঐতিহাসিক কথা নাই।

ব্রাহ্মণ সুরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় হোগ্‌লা, নিকলাপুর ও জয়পুর পরগণার জমিদার হইয়া হোগ্‌লার অন্তর্গত লখ্‌পুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তখন তাঁহার 'রায় চৌধুরী' খেতাব হয়, এবং সাধারণ লোকে তাঁহাকে 'মহারাজ' সুরেশ্বর বলিয়া জানিত। উপাধিটি লৌকিক মাত্র, উহা গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক প্রদত্ত নহে। সুরেশ্বরের বংশধরগণ হোগ্‌লার বা 'লখ্‌পুরের কাশ্যপ চৌধুরী' বলিয়া খ্যাত। এই বংশীয়েরা সকলেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বিদ্যোৎসাহিতার জন্য এবং জনহিতকর সৎকর্ম্মে অবস্থার অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া স্বজাতি সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সুরেশ্বরের অধস্তন ৭ম পুরুষ রাজবল্লভ রায় চৌধুরী সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম হয় বিদ্যাধর। অতিরিক্ত বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিষয়-বিভ্রমেই হউক, বা যে কোন কারণে হউক, তাঁহার জমিদারীর রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন সম্ভবতঃ মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের সুবাদার, তিনি কি ভাবে কড়াকড়ি করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহা সকলে জানেন। বিদ্যাধর মুর্শিদাবাদে নীত হইয়া তখনকার রীতি অনুসারে শাস্তি ভোগ করেন। গল্প আছে, তাঁহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রে দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হয়; কিন্তু হয়ত তাঁহার ভক্তি-মাহাত্ম্যে আকাশ অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে ছায়াদান করে। মুর্শিদকুলি খাঁ উহা দেখিয়া তাঁহাকে নিষ্কৃতি ত দিলেনই, অধিকন্তু তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ হোগ্‌লা পরগণা হইতে একটি পৃথক্ তালুক সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে অসম্মত হইলে, ঐ তালুক সামান্য করে তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল। ঐ তালুকের নাম 'ছায়াপতি তালুক', এখনও উহা লখ্‌পুরের চৌধুরীগণ ভোগ করিতেছেন।[১]

বিদ্যাধরের পুত্র রাজারাম ও মহাদেবের মধ্যে সম্পত্তি ॥৵০ ও ।৵০ আনায় বিভক্ত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বল্লভপুর নিবাসী পরশুরাম বসু উহাদের দুই ভ্রাতার পক্ষে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে মোক্তার ছিলেন; কথিত আছে, তিনি প্রেরিত রাজস্ব সময়মত জমা না দিয়া নিজ নামে হোগ্‌লা পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাঁহার পৌত্র কল্যাণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্দ্দান্ত অত্যাচারে চৌধুরীগণ লখ্‌পুর হইতে বিতাড়িত হইয়া নিকটবর্ত্তী জাড়িয়া গ্রামে বাস করেন; তথায় এখনও তাঁহাদের বাড়ী ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। কিন্তু অত্যাচারের ফল

১ Calcutta Review, 1878, p. 430—'*Jessore*' by H. J. Rainey.

লখ্‌পুর চৌধুরী-বংশের দুই একটি ধারা

['মহারাজ' সুরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—পশুপতি—বেদগর্ভ—রামচন্দ্র—মহেন্দ্রদেব—কমলাকান্ত—রাজবল্লভ (বিদ্যাধর) রায়চৌধুরী]

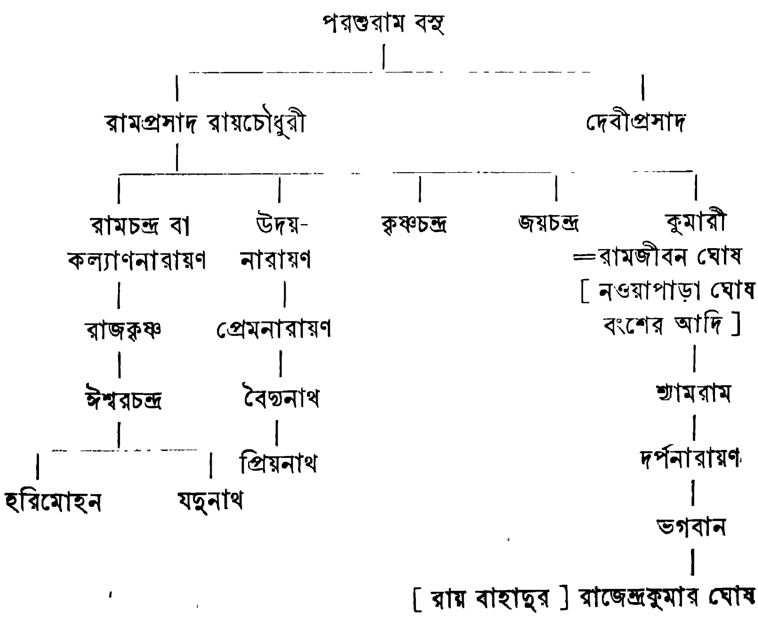
বিদ্যাধর রায়চৌধুরী

- রামরাম
  - রঘুনাথ
    - বলরাম
      - রামহরি
        - ভৈরব
          - অম্বিকাচরণ [নলধা]
            - রামচন্দ্র রায় [ম্যানেজার, খড়রিয়া মেজ-জিলা]
- রাজারাম [॥৵০]
  - *কেশবরাম
    - নীলকণ্ঠ
      - মৃত্যুঞ্জয়
        - রাজকৃষ্ণ
          - গোপাল
          - গুরুদাস প্রভৃতি
- মহাদেব [।৵০]
  - রামকান্ত
    - *অনন্তরাম
      - রামদাস
        - জয়কুমার
          - বাসুদেব
            - সারদা প্রভৃতি
    - উদয়নারায়ণ
      - রামবিষ্ণু
        - রাজকিশোর
          - তারিণীচরণ
            - আশুতোষ
              - নকুল প্রভৃতি

বেশী দিন বিলম্বিত হয় নাই। কল্যাণনারায়ণের জীবদ্দশাই বাকী করের জন্য হোগ্‌লা জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়া যায়। তখন কাশ্যপ চৌধুরী-বংশীয় রাজারামের পুত্র কেশবরাম ও মহাদেবের পুত্র অনন্তরাম এই দুইজনে বহু চেষ্টার পর (আঃ ১৭৫৮ খৃঃ) হোগ্‌লার অর্দ্ধাংশ মাত্র পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন; অপর অর্দ্ধেক বেলফুলিয়া পরগণার তদানীন্তন ক্ষত্রিয় জমিদার কৃষ্ণসিংহ রায়ের নামে বন্দোবস্ত হয়। কেশবরামকে নষ্ট পরগণা দখল করিবার জন্য যথেষ্ট গণ্ডগোলে পড়িতে হইয়াছিল, বসুচৌধুরীগণ সহজে দখল দেন নাই। এই কারণে যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়, তজ্জন্য কেশবরাম প্রভৃতি নিজের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ সমগ্র পরগণার সিকি অংশ উক্ত কৃষ্ণসিংহ রায়ের জনৈক

জ্ঞাতি মুড়াগাছার অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ রায়কে বিক্রয় করেন। যে সিকি অংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাকী করে নিলাম হওয়ায় ভূকৈলাসের রাজা বাহাদুর, কালীশঙ্কর ঘোষাল খরিদ করেন। তাঁহার নিকট হইতে ঐ চতুর্থাংশ রেণী সাহেবের হাতে আসে এবং পরে সম্প্রতি নড়াইলের বাবুরা উহার মালিক হইয়াছেন। সেকথা পরে বলিতেছি।

পী ল জ ঙ্গে র ব সু চৌ ধু রী ॥ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ, মাহিনগরে বসুবংশীয় ১৯ পর্য্যায়ভুক্ত কুলীন পরশুরাম বসু কাশ্যপ চৌধুরীগণের চাকরীসূত্রে লখ্‌পুরের পার্শ্বস্থ বল্লভপুর গ্রামে বাস করেন, তথায় তাহার বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে। পরশুরাম কিরূপে হোগ্‌লা পরগণা পান, তাহা বলিয়াছি। এইরূপে বাজিতপুর পরগণারও কতকাংশ তাঁহার হস্তগত হয়। এই দুই সম্পত্তি তিনি দুই পুত্রের মধ্যে বণ্টন করেন। দেবীপ্রসাদ বাজিতপুরের অংশভাগী হইয়া সেখানে যান এবং রামপ্রসাদ তাঁহার দুই স্ত্রীর জন্য বল্লভপুর ও পীলজঙ্গে দুই বাড়ী নির্ম্মাণ



করেন। এক স্ত্রীর গর্ভজাত রামচন্দ্র (অন্য নাম কল্যাণনারায়ণ) ও উদয়-নারায়ণ পীলজঙ্গে ছিলেন, এবং তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ও জয়চন্দ্র বল্লভপুরের বাটীতে থাকিতেন। তথায় তাঁহাদের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। কল্যাণনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন; কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাঁহাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় হয়, সে কথা বলিয়াছি। কল্যাণনারায়ণ ১১৬৫ সালে (১৭৫৮ খৃঃ) শিব-প্রতিষ্ঠার জন্য যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও আছে। শিব-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, এই সময়েই তাঁহাদের জমিদারী যায়। রাজারাম ও মুনিরাম নামে পরশুরামের আরও দুই ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহারা হোগ্‌লা জমিদারীর অংশ পান নাই। উঁহারা পূর্ব্বেই বল্লভপুর হইতে নওয়াপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। রাজারামের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ বসু পিপুলবুনিয়া তালুক (খুল্‌নার ৪৫৬নং তৌজি) খরিদ করেন। তদবধি এই বংশীয়েরা 'তালুকদার বসু' বলিয়া খ্যাত; পীলজঙ্গশাখার মত ইঁহাদের রায়চৌধুরী উপাধি নাই।

ক্ষ ত্রি য় জ মি দা র ব ং শ॥ বেলফুলিয়া পরগণার জমিদার কৃষ্ণসিংহ রায়চৌধুরী হোগ্‌লার অর্দ্ধাংশ খরিদ করেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারই সহিত ঐ অংশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ জমিদারী তদ্বংশীয় গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে আসে। ইনি মুড়াগাছা হইতে কলিকাতায় ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। এখনও মুড়াগাছায় এই জমিদারদিগের বাড়ী ঘর আছে এবং পর্ব্বানুষ্ঠান হয়। গঙ্গানারায়ণ তাঁহার দুইপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদকে ॥৵০ ও কনিষ্ঠ তারাপ্রসাদকে ।৵০ অংশ দিয়া যান। তারা-প্রসাদের পুত্র হরপ্রসাদ ও পরে তৎপুত্র বরদাপ্রসাদ ।৵০ অংশ ভোগ করিতেছেন। দুর্গাপ্রসাদের ॥৵০ অংশ তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্যামাপ্রসাদের পুত্র রমাপ্রসাদ ৴/৪ অংশভাগী আছেন; উঁহার অংশকে হোগ্‌লার বড়-জিলা বলে। দ্বিতীয় পুত্র হরিপ্রসাদ জীবিত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অংশ বরদাপ্রসাদকে পত্তনী দিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র কালীপ্রসাদের অংশ কলিকাতা নিবাসী দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় খরিদ করেন ও তিনি সে সম্পত্তি হরপ্রসাদকে পত্তনী দেন। সুতরাং বরদা-প্রসাদ পৈতৃক ।৵০ বাদে পত্তনী ।৵৮ পাই অংশেরও অধিকারী আছেন। বরদাপ্রসাদের অংশকে হোগ্‌লার ছোট-জিলা বলে। ইঁহাদের উভয় সরিকের

কাছারী বাটী পূর্ব্বে পাচআনী গ্রামে ছিল, এখন উহা মানসায় আসিয়াছে। সমগ্র হোগ্‌লা পরগণার অর্দ্ধাংশ লইয়া বড়-জিলা ও ছোট-জিলা গঠিত। অপর চারি আনা অংশ রামনগর নিবাসী ঘোষচৌধুরীদিগের সম্পত্তি। তাঁহাদেরও কাছারী মানসায় আছে, তাহাকে হোগ্‌লার মেজ-জিলা বলে।

রা ম ন গ রে র ঘো ষ চৌ ধু রী ব ং শ॥ উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ সৌকালীন গোত্রীয় কৃষ্ণদুলাল ঘোষ বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী জগদানন্দপুরে বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার সহিত চাঁচ্‌ড়ার রাজা শ্রীকণ্ঠ রায়ের বিবাহ হয়। সেই সূত্রে তিনি চাঁচ্‌ড়ার সন্নিকটে ভৈরব-তীরে রামনগরে আসিয়া বাস করেন এবং রাজারা ইমাদপুর পরগণার মধ্য হইতে রামনগর, বলরামনগর, তালবেড়িয়া প্রভৃতি খারিজা তালুক সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণদুলালের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। কৃষ্ণদুলাল যশোহর-কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন এবং পরে তৎপুত্র রাধামোহন ঐ চাকরী পান। তখন এ সকল চাকরীতে 'দু-পয়সা' ঘরে আসিত, পিতাপুত্রে যে অর্থ সঞ্চয় করেন, তদ্বারা সুযোগমত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হোগ্‌লা পরগণার চতুর্থাংশ কাশ্যপ চৌধুরী-দিগের নিকট হইতে মুড়াগাছার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ রায় খরিদ করেন; তৎপুত্র বৈদ্যনাথ রায় (১২০১ সালে) একখানি কবচপত্র দ্বারা ঐ সম্পত্তি রাধামোহন ঘোষচৌধুরীকে হস্তান্তর করেন। এইরূপে বেলফুলিয়া পরগণার।০ চারি আনা অংশ এবং ইশপপুর পরগণার তরফ সেনহাটি প্রভৃতি ইঁহাদের হস্তে আসে। রাধামোহনের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দসেবক নিঃসন্তান মারা যান; অপর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সমভাবে বিভক্ত হয়। চতুর্থ নৃসিংহদেবের একমাত্র পুত্র বলহরি ঘোষচৌধুরী ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন, তাঁহারই সময়ে বর্ত্তমান রামনগরের সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। এখন তাঁহার দত্তক পুত্র গোপালহরি জীবিত আছেন। তিনিও বৎসরের অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায় বাস করেন। ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত রামনগরের রম্য হর্ম্ম্যাদি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। রাধামোহনের সময় যে ৺রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়, রামনগরের বাড়ীতে উহার নিত্য ভোগরাগ চলিতেছে। সম্পত্তির অধিকারী পাঁচ পুত্রের বংশধরদিগের মধ্যে গোপালহরি হোগ্‌লা পরগণায় তাঁহার পৈতৃক ✓৪ গণ্ডা ব্যতীত অন্য সরিকদিগের একজনের

জমিদারীর ৴১৬ এবং অপর দুইজনের পত্তনী ⁄১৭।– অংশ ভোগ করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহার অংশে মোট ।⁄১৭।– দাঁড়াইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের পুত্রবধূ ব্রজভামিনী ৵৪ অংশ পৃথক্ আদায় করেন। অপর সরিকগণের ।৵২॥= অংশ ঘাটভোগ নিবাসী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ৴১৬ অংশ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় খরিদ করিয়াছেন।

হরিপ্রসাদ ঘোষ [জগদানন্দপুর]
- কৃষ্ণদুলাল ঘোষ [রামনগর]

রাধামোহন ঘোষচৌধুরী — কন্যা=রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় [চাঁচড়া]

- গোবিন্দ-সেবক
  - বিজয়রাম [জগদানন্দপুর]
    - সত্যরঞ্জন
- মধুসূদন
  - দেবনারায়ণ [দত্তক, জীবিত]
    - হরেরাম
      - প্রমথ প্রভৃতি
- শ্রীরাম
  - জয়রাম
    - শশিভূষণ প্রভৃতি
- নৃসিংহদেব
  - বলহরি
    - গোপালহরি [দত্তক]
- পুরুষোত্তম
  - রঘুত্তম
    - শশিভূষণ প্রভৃতি
    - গিরিজাভূষণ [ওঃ গোপালহরি]
- রামকৃষ্ণ
  - হরেকৃষ্ণ [দত্তক] [=ব্রজভামিনী]
    - রামোত্তম
    - নরোত্তম প্রভৃতি

রে নী সা হে ব॥ হোগ্‌লার চতুর্থাংশ ভূকৈলাসের রাজা, কালীশঙ্কর ঘোষাল খরিদ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বরিশালে গুরুধামে উঁহাদের কাছারী ছিল (৬৫০পৃ)। এই স্থানে এক সময়ে কামরুল (Camarul) সাহেব ম্যানেজার হইয়া আসেন। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে কেরাণী ছিলেন, তাঁহাকে সাধারণতঃ কামরুল কেরাণী বলা হয়। ইঁহার স্ত্রীর নাম

মারগারেট্ ও একমাত্র সন্তান, পরমাসুন্দরী কন্যার নাম বারবারা (Miss Barbara), উহার সহিত বেণীসাহেব (William Henry Sneyd Rainey) নামক একজন সৈনিকের বিবাহ্ হয়। গুরুধামে আসিবার পর বিবি মারগারেটের সহিত প্রণয়সূত্রে রাজা কালীশঙ্কর নিজ সম্পত্তি হোগ্‌লা পরগণার ।০ চারিআনা অংশ উহাকে খোস কোবালায় লিখিয়া দেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বারবারা ঐ সম্পত্তি পান এবং রেণী তাহার ট্রাষ্টী হন। এই সময়ে রেণী লখ্‌পুর ও রামনগরের জমিদারগণের নিকট হইতে কয়েকটি পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তালিবপুরে আসিয়া বাস করেন এবং নীল ও চিনির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। সে কথা পরে বলিব ; এখানে শুধু তাঁহার সম্পত্তির পরিণতির কথা লিখিতেছি। বিবি বারবারার গর্ভে রেণী সাহেবের ৩টি পুত্র (John Rod, Henry James ও William Arthur Rainey) এবং ৩টি কন্যা (Ellen Margaret, Emilie Barbara, এবং Isabella Matilda Rainey) হয়। ইহার মধ্যে মধ্যম পুত্র বা মেজ সাহেব হেন্‌রী জেমস্ রেণী বিখ্যাত লেখক ও শিকারী ছিলেন। সুন্দরবনের প্রকৃতি ও ভূবৃত্তান্ত তাঁহার জানা ছিল। এ দেশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে তাঁহাব যে অধিকার ছিল, 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রের বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যান চরিত্রবান লোক ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সম্পত্তির ট্রাষ্টী হন। তাঁহার বিশেষ পরামর্শে এবং গরিব হইয়া যাইবার আশঙ্কায়, ভ্রাতা ভগিনীগণের মধ্যে কেহই বিবাহ করেন নাই। ১৮৮২ অব্দে জ্যান ও হেন্‌রী এই মর্ম্মে প্রত্যেকে উইল করেন যে, একজন মারা গেলে অন্যে তাঁহার সম্পত্তি পাইবেন, উভয়ে মারা গেলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ (Administrator General of Bengal) হইতে দখল লইয়া ৫/৬ অংশ উঁহাদের ভগিনীদিগকে দিয়া অবশিষ্ট ১/৬ অংশ জনহিতকর কার্য্যের জন্য Calcutta District Charity Society নামক সমিতিকে দিবেন। সর্ব্বাগ্রে হেন্‌রী ও পরে এমিলি ও ইসাবেলা মারা গেলেন। শীঘ্র জ্যানও তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিলেন। থাকিলেন মাত্র উইলিয়ম ও এলেন। জ্যানের মৃত্যুর পর খুল্‌নার জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। উইলিয়ম তখন অনন্যোপায় হইয়া মোকদ্দামা করিয়া দুই ভ্রাতা ভগিনীতে তুল্যাংশে সম্পত্তির ৮/১৫ অংশ পাইলেন, অবশিষ্ট ৭/১৫ অংশ গবর্ণমেণ্টের হাতে গেল। মোকদ্দমাকালে উইলিয়ম গতাসু হওয়ায়

উভয়ের অংশ এলেন পাইলেন এবং তিনি উহা ৮০,০০০৲ টাকা মূল্যে এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ২০০৲ টাকা মাসহারা পাইবার সর্ত্তে নড়াইলের জমিদার রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায় এবং বাবু ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়দিগকে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বাবুরা গবর্ণমেণ্টের হস্তন্যস্ত অপরাংশও পরে ৭০,০০০৲ টাকা পণে খরিদ করিয়াছেন। এই উভয় পণসমষ্টি ১,৫০,০০০৲ টাকার সুদ হইতে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে চেরিটি সোসাইটিকে সাহায্য করিতেছেন। রেণী সাহেবের যাহাই অকীর্ত্তি থাকুক, তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের এই জন-হিতৈষণার সুকীর্ত্তি চিরকাল ঘোষিত হইবে।

২ সুলতানপুর-খড়রিয়া পরগণা

এই পরগণা কিরূপে প্রতাপাদিত্যের সময় বৈদ্যবংশীয় জানকীবল্লভ মজুমদারকে প্রদত্ত হয় ও পরে তাঁহার অধস্তন ৭ম পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি জমিদারদিগের সময় বাকী খাজনার জন্য ঐ পরগণা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া কাশীনাথ দত্তচৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয়, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৬৬৬ পৃ)। এই কৃষ্ণচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে ৷৷৶০ অংশী ছিলেন ; অপর ৷৶০ অংশী হরিপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের একজনের ৶০ অংশও কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকৃত হয়। অপর পুত্র ভৈরবচন্দ্র অবশিষ্ট ৶০ অংশীদার হন। ১১৭৫ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে (১৭৬৮ খৃঃ) কৃষ্ণচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র রায় আপোষে এক একরার-নামা দ্বারা তেরআনা ও তিনআনা অংশ বাটোয়ারা করিয়া লন। ঐ দলিলে নল্‌ধানিবাসী শিবরাম ভঞ্জ সাক্ষী ছিলেন। জমির অবস্থা ভাল ছিল না, তাহাতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য অজন্মা দোষে প্রজার খাজানা আদায় না হওয়ায় জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন যশোহরের কালেক্টর মালিকের বিরুদ্ধে রেভেনিউ বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করেন। তখন কলিকাতা-হাটখোলানিবাসী কাশীনাথ দত্তচৌধুরী প্রথমতঃ দুই বৎসরের বাকী খাজানা গছানি দিয়া ১৭৭৪, ১৬ই মে তারিখে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট হইতে এই পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার হুকুম পান। তিন আনা অংশের মালিক ভৈরবচন্দ্রের সম্পত্তি আপোষে পৃথক্ হইলেও কোম্পানি ষোল আনাই কাশীনাথের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮৯ পর্য্যন্ত মেয়াদী বন্দোবস্ত চলিয়া পরে কাশীনাথের নামেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

ন ল্ ধা র ভ ঞ্জ চৌ ধু রী গ ণ ॥ পূর্ব্বে নল্‌তার বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরীর বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা দক্ষিণ রাঢ়ীর মৌলিক কায়স্থ 'ভঞ্জ' গণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত লিখিয়াছি (৪২৬ পৃ)। ঐ বংশের প্রাচীন প্রবাদ হইতে শুনা যায়, পাঠান রাজত্বের শেষভাগে কলাধব ও মালাধর নামক দুই ভ্রাতা সুলতানপুর, খড়রিয়া প্রভৃতি ৭টি পরগণার জমিদারী পাইয়া মৌভোগ গ্রামে বাস করেন।[১] প্রবাদ ভিন্ন ইহার কোন প্রমাণ পাই নাই। কয়েক পুরুষ পরে ঐসকল পরগণা প্রতাপাদিত্যের হস্তে যায় এবং তখন বৈদ্য-চৌধুরীগণের জমিদারী হয়। মালাধরের প্রপৌত্র রামকৃষ্ণ মৌভোগ হইতে নল্‌ধায় এক গড়কাটা বাড়ীতে বাস করেন। সে বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও ভঞ্জচৌধুরীদিগের অধিকারে আছে। গল্প আছে, রামকৃষ্ণের পৌত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাব মীরজাফরকে সঙ্গীতে মোহিত করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হন। তিনি বলেন, মূলঘরের চৌধুরীগণ পরগণার বহির্ভূত গুয়াধনা, লালুয়া, কোদ্‌লা প্রভৃতি কতকগুলি মৌজা গোপনে ভোগ-দখল করিতেছেন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজ পৈতৃক ॥৵০ অংশ ছাড়া যে অতিরিক্ত ৶০ অংশে ভৈরবচন্দ্রের সহযোগে আপোষে দখল করিতেন, উক্ত মৌজাগুলি তাহারই এলেকাধীন ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণের নামে নবাব 'গুয়াধনা ওগয়রহ' তালুক নামে তিন আনা জমিদারীর সনন্দ দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দেশে আসিয়া দেবিদাস দে সরকার নামক একজন দুর্দ্দান্ত কায়স্থকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া উক্ত তালুকগুলি দুইচারি বর্ষকাল জোর দখল করিয়া লন। তখন বৈদ্য-চৌধুরীদিগের দেওয়ান কৃপারাম ঘোষ জমিদারী রক্ষার জন্য উক্ত দেবী দেওয়ানের সহিত মিত্রতা করেন। কোদ্‌লার এক পার্শ্বে 'দেবী-বাজার' নামক একটি হাট এখনও দেবী দেওয়ানের স্মৃতি বহন করিতেছে। নবাব বন্দোবস্ত করিতে না করিতে যখন বাঙ্গালার দেওয়ানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে যায়, তখন জমিদারীর দখলাদি লইয়া অত্যন্ত গোলমাল চলিতে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র শিবরাম উক্ত গুয়াধনা, উজলপুর প্রভৃতি তালুক দখল

১ আদিপুরুষ কুবের ভঞ্জ হইতে সংক্ষিপ্ত বংশধারা এই : ১ কুবের—কাকুৎস্থ—হরিহর—মকরন্দ—বিনায়ক—গোপাল—পরমেশ্বর—রাঘব—কানাই—দৈত্যারি—নিশাপতি—১২ চক্রপাণি—১৩ গন্ধর্ব্ব খাঁ ও রামচন্দ্র ; রামচন্দ্র—কেশবরুদ্র—কাশীনাথ—১৬ মালাধর (মৌভোগ)—বাণীনাথ—কমলাকান্ত—রামকৃষ্ণ (নল্‌ধা)—রাজারাম—লক্ষ্মীনারায়ণ—শিবরাম, ভোলানাথ ও গঙ্গাপ্রসাদ ; শিবরাম—রামনারায়ণ—বিশ্বম্ভর—২৩ আশুতোষ, বেণী ও অশ্বিনী (পোষ্টাল ইনস্পেক্টর)।

করিতে থাকেন। এমন সময় কাশীনাথ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া যায়। তিনি যোল আনাই দখল করিয়া বসেন। শিবরাম রেভেনিউ বোর্ডের নিকট বারংবার দরখাস্ত করিয়াও বিশেষ কোন ফল পান নাই।[১] তবে জমিদারী কাগজ পত্র হইতে এইটুকু জানা যায় যে, কাশীনাথ দত্তচৌধুরী উজলপুর তালুকের দাবী ত্যাগ করিয়া এবং নল্‌ধা গ্রামের থানাবাড়ী প্রভৃতি সমেত ৫০৲ বিঘার মহাত্রাণ সনন্দ দিয়া এই গোলযোগ নিষ্পত্তি করেন।[২] ঐ সনন্দের তারিখ ১২৯৩ সাল বা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ। সেই বৎসরেই যশোহর জেলা হয়।

হাটখোলার দত্তচৌধুরী বংশ॥ কাশীনাথ দত্ত যে বংশীয় তাহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, বালীর দত্ত, দক্ষিণ রাঢ়ীয় বিশিষ্ট মৌলিক কায়স্থ। হাটখোলার দত্তদিগের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ বাদশাহী জায়গীর পাইয়া আন্দুল হইতে গোবিন্দপুরে আসেন। তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে গোবিন্দপুরের জমি বদল করিয়া হাটখোলায় আসিয়া বাস করেন। রামচন্দ্রের পৌত্র মদনমোহন বিখ্যাত দানশীল স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জগৎরাম কোম্পানির পক্ষে পাটনার দেওয়ান ছিলেন এবং বহু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জগৎরামের তিন পুত্র কাশীনাথ, রামজয় ও হরসুন্দর। কাশীনাথ সুলতানপুর-খড়রিয়া ব্যতীত বেলফুলিয়া পরগণার ।৵০ অংশ এবং অন্যান্য সম্পত্তি খরিদ করেন। তন্মধ্যে সুলতানপুর খড়রিয়ার ৸৵০

১ ১৭৮৬, ৯ই মার্চ্চ তারিখের ১১৭২নং এবং ১৭৮৭, ২৪শে এপ্রিলের ১২৭৮নং দরখাস্ত। Hunter, *Bengal Ms. Records*, Vol. I. pp. 132, 141. One entry runs thus : 'Petition from Sibram Bhanj complaining of dispossession of Taluk Gudna by one Kashi Nath Dutta.'

২ এই মহাত্রাণ সনন্দের অবিকল নকল এই : 'স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীভোলানাথ ভঞ্জ ও শ্রীরামনারায়ণ ভঞ্জ ও শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ভঞ্জ সদ্বদার চরিতেষু—মহাত্রাণ জমী পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমার জমিদারী পরগণে শুলতানপুর খড়রিয়া ওগয়রহেব মধ্যে উটীতের লায়েক পতিত খামারের অন্দরে ৫০৲ পঞ্চাষ বিঘা জমী তোমারদিগের খোরোপোস কারণ মহাত্রাণ দিলাম। জাত মাফিক চিহ্নিত করিয়া লইয়া পুত্র পৌত্রাদীক্রমে পরম শুখে ভোগ করিতে রহো ইহার রাজস্ব সহিত দায় নাই এতদার্থে মহাত্রাণ সনন্দ দিলাম ইতি সন ১১৯৩ তারিখ ২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীকাশীনাথ দত্তস্য। জাত জমা নলধায়ায় গড়বাটী ১০৲ সোতাল ১০৲ হিজলা ২৫৲ মৌজে কাথুলী ৫৲—৫০৲ পঞ্চাষ বিঘা মাত্র।'

তেরআনা ও বেলফুলিয়া ।৵০ আনা একত্র এক হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহাই যশোহর কালেক্টরীর ২৫৪নং এবং খুল্‌নার ১৭১নং তৌজির মহল। গুয়াধনা প্রভৃতি তালুক লইয়া গঠিত সুলতানপুর খড়রিয়ায় ৶০ তিন আনা অংশ যশোহরের ২৫৫নং এবং খুল্‌নার ১৭২নং তৌজি। কাশীনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত একান্নভুক্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের গোলযোগ নিবারণার্থ ইহারা ১২২৩ সালে আপোষে সমস্ত সম্পত্তি তিন অংশে বিভাগ করিয়া লন। ইহাই খড়রিয়ার বড়-জিলা, মেজ-জিলা ও ছোট-জিলা নামে পরিচিত। কাশীনাথের নিজ ধারায় বড়-জিলার জমিদার মনুজেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী বর্ত্তমান আছেন।

মধ্যম ভ্রাতা ৺রামজয় দত্তচৌধুরীর দিন দিন বংশবৃদ্ধি হইতে থাকায় সম্পত্তি সুচারুরূপে পরিচালনার্থ উক্ত বংশের কৃতী পুরুষ, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী স্বনামধন্য সদাশয় কুমারকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী[১] মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে এবং অন্যান্য সরিকগণের সহযোগিতায় ১৯০১, ১৩ই জুন তারিখে একটি লিখিত একরার-নামা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে খড়রিয়া মেজ-জিলা জমিদারী সিণ্ডিকেট (The Khararia Mejo Zillah Zemindari Syndicate Ltd.) নামক এক কোম্পানি গঠিত করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানি ১৯০১ অব্দে খড়রিয়া মেজ-জিলার সম্পত্তি ৯৯ বৎসরের জন্য মেয়াদী পত্তনী লইয়াছেন। তৎপর খড়রিয়া বড়-জিলার ।০ চারি আনা অংশ চিরস্থায়ী পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়াছেন। কোম্পানির কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। খড়রিয়া বড়-জিলার বাকী ৸০ বার আনা অংশ মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে শরৎচন্দ্র বসু ।৴০ পাঁচ আনা, মনুজেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী ।০ চারি আনা ও কৃষ্ণবিহারী দত্তচৌধুরী-দিগের ৶০ তিনআনা অংশের ভোগ দখল চলিতেছে। ৺হরসুন্দর দত্তচৌধুরীর ছোট-জিলার ৸১৬ গণ্ডা অংশে জমিদারী স্বত্বে এবং ৶৪ গণ্ডা অংশে পত্তনী স্বত্বে সুবিখ্যাত ৺মোহিনীমোহন রায়চৌধুরীর পুত্র ভবানীপুর নিবাসী প্যারীমোহন রায়চৌধুরী দখিলকার আছেন।

১ দত্তচৌধুরী বংশের বংশধারা এই : গোবিন্দশরণ—বাণেশ্বর—রামচন্দ্র—কৃষ্ণচন্দ্র ও মাণিক্য-চন্দ্র ; কৃষ্ণচন্দ্র—মদনমোহন। মাণিক্যচন্দ্র—জগৎরাম—কাশীনাথ, রামজয় ও হরসুন্দর ; রামজয়—কালীচরণ—নীলমণি—গোপাল—কুমারকৃষ্ণ প্রভৃতি।

৩ বেলফুলিয়া পরগণা

বে ল ফু লি য়া ব স্থ - চৌ ধু রী ব ং শ ॥ বেলফুলিয়া অতি প্রাচীন স্থান। ইহার অন্তর্গত ভৈরব কূলবর্ত্তী সেনেরবাজার অতি প্রাচীন কাল হইতে একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেনবংশীয় কে কখন এই বাজার বসাইয়া ছিলেন, তাহা রহস্য-জড়িত। স্থানান্তরে উহার আলোচনা করিব। পাঠান আমলে বেলফুলিয়া পরগণা ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল।[১] প্রাচীন দলিলাদিতে উহার ঐরূপ উল্লেখ আছে। গৌড়াধিপ হুসেন শাহের সহিত খুল্‌না জেলার যে সম্পর্ক ছিল, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে বিবৃত করিয়াছি (৩য় সং, ৩৭৫ পৃ)। তিনি প্রথম জীবনে যে আলাইপুরের কাজিদিগের গৃহে প্রতিপালিত হন, তাঁহার নাম যুক্ত সেই আলাইপুর ও নিকটবর্ত্তী হুসেনপুর উভয়ই বেলফুলিয়া পরগণার অন্তর্গত। গৌড়েশ্বর হইবার পর তিনি যখন এই প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন হুসেনপুর প্রভৃতি অধুনা-নগণ্য গ্রামপার্শ্বে তাঁহার তরণী লাগিয়াছিল। উহারই নিকটবর্ত্তী ভদ্রগাতিতে চতুরঙ্গ ভদ্র নামক একজন কর্ম্মদক্ষ বলশালী প্রিয়দর্শন মৌলিক কায়স্থ বাস করিতেন। হুসেন-পুত্র নসরৎ শাহ্ বাগেরহাটে আসিয়া কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার মসজিদ্ নির্ম্মিত ও নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচারিত হয়, সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। চতুরঙ্গ ভদ্র কোন শুভমুহূর্ত্তে নিজের দেশেই পিতাপুত্রের দর্শন লাভ করিয়া আলাইপুরের কাজিদিগের ন্যায় গৌড়ের রাজসরকারে গিয়া চাকরী করিতেন। সে চাকরীর জন্য তিনি প্রভূত ধন সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি তখন বল-কৌশলে দক্ষিণরাঢ়ীয় মাহিনগর সমাজের একজন প্রধান কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডীবর বসুকে কন্যা সম্প্রদান করেন; উহার ফলে চণ্ডীবরকে কুলভ্রষ্ট হইয়া মাহিনগরের পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের আশ্রয় লইতে হয়। চতুরঙ্গ তাঁহাকে নিজ অধিকারভুক্ত শ্রীফলতলা গ্রামে কিছু মহাত্রাণ জমি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন।[২] এখনও যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী প্রভৃতি চণ্ডীবরের বংশধর-

১ আবুলফজল সম্ভবতঃ এই বেলফুলিয়াকে উণ্টাইয়া 'ভুলিয়াবেল' বা 'ফুলিয়াবেল' করিয়াছেন। Cf. Bholiyabel in *Ain.*, (Jarrett), Vol. II, p. 132. উহার অনুবাদে 'ফুলবৈল' আছে ('আইন-ই-আকবরী', বসুমতী সংস্করণ, ৮৫ পৃ)। কেহ কেহ উহাকে 'বেলফুলি' করিয়াছেন ('গৌড়ের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ২১০ পৃ)। এই পরগণার রাজস্ব ছিল, ৩,৮৪,৪৫২ দাম বা ৯,৬১১ রূপেয়া।

২ একখানি প্রাচীন ভূমি বিক্রয় দলিলের কতকাংশ এই: 'লিখিতং শ্রীবিষ্ণুরাম বসুরায়

গণ সেই বাটীতে বাস করিতেছেন। চণ্ডীবর মাহিনগরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধারায় ১৪ পর্য্যায়-ভুক্ত। সে ধারা এই : ৫ মুক্তি (মাহিনগর)—দামোদর—অনন্ত —গুণাকর—মাধব—লক্ষ্মণ—মহীপতি—সুরেশ্বর—১৩ বিশ্বনাথ, লোকনাথ ও কাকুৎস্থ ; এই কাকুৎস্থের পুত্র চণ্ডীবর।[১] বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত সকলেই প্রবলমুখ্য, লোকনাথ কনিষ্ঠ কুলীন, এবং কাকুৎস্থ নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডীবরের কুলনাশের জন্য নিজে নিষ্কুলীন।

১৪ চণ্ডীবর বসুরায়
|
১৫ শ্রীনাথ রায়চৌধুরী
|
জগদানন্দ [ত্যাজ্যপুত্র] | হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী
|
জগদানন্দ | রাঘব | ধর্ম্মনারায়ণ | মদন

জগদানন্দ — দুর্ল্লভ — বিশ্বনাথ — রামগোবিন্দ — লক্ষ্মণচন্দ্র [শ্রীফলতলা]
লক্ষ্মণচন্দ্র — দেবীপ্রসাদ ।৶০, কৃপানাথ ।/০, বীরভদ্র ।০

রাঘব — জানকীবল্লভ [আইচ্‌গতি]; দুর্ল্লভ — বিশ্বেশ্বর — রামকৃষ্ণ [দেয়াড়া]

ধর্ম্মনারায়ণ — চন্দ্রশেখর [কান্দড়ী ও বিশ্বেশ্বর আজগড়া]

মদন — কমল [শ্রীফলতলা]; শ্রীচন্দ্র [আজগড়া]; কন্দর্প ও রাধাবল্লভ [মৈষাঘুনী]

* * * সাকীন শ্রীফলতলা পরগণে বেলফুলিয়া সন ১২৩২ সালাব্দে নাখেরাজ জমি বিক্রয় কবলা লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে পরগণা মজকুরের শ্রীফলতলা গ্রামের মধ্যে আমার পৈতৃক খানাবাটী মহত্রাণ জমি দত্তা ৶চতুরঙ্গ ভদ্র গ্রীহিতা ৶চণ্ডীবর রায় সেই খানাবাটী'—ইত্যাদি।

১ 'কায়স্থ কারিকা', মাহিনগর বংশ-লতিকা।

চণ্ডীবর অতি অল্প বয়সে গৌড় রাজসরকারে চাকরী করিতে যান, তখন চতুরঙ্গের সহিত পরিচয় এবং উক্ত বিবাহ ঘটে। শ্রীফলতলায় বাস করিবার পরও তিনি গৌড়ে চাকরী করিতেন এবং তখন সুযোগমত বেলফুলিয়া পরগণার জমিদারী সনন্দ লাভ করেন। তাঁহার জ্ঞাতি খুল্লতাত ১৩ পর্য্যায়ভুক্ত গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ সুলতান হুসেন শাহের উজীর ছিলেন; শুধু শ্বশুরের চেষ্টা নহে, এ সম্পর্কও তাঁহার জমিদারী প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। চতুরঙ্গ শেষ জীবনে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়; তখন হইতে তাঁহার সহিত জামাতার সকল সম্বন্ধ রহিত হয়।[১] চণ্ডীবরের পর তৎপুত্র শ্রীনাথ এবং পৌত্র হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদারী ভোগ করেন। হরিশ্চন্দ্র প্রতাপাদিত্যের দিগ্বিজয়ী পতাকার নিম্নে বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রতাপের পতনের পর, যখন ইস্‌লাম খাঁ নবাব হইয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন কোন কারণে এই জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়। সেই জন্যই হরিশ্চন্দ্রের পুত্র জগদানন্দ প্রভৃতি এই পরগণার মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি ক্ষুদ্র তালুকের অধিকারী হইয়া, শ্রীফলতলা হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন এবং নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। জগদানন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্র লক্ষ্মণ রায় নবাব আলিবর্দ্দীর সময়ে বেলফুলিয়া ও হোগ্‌লা পরগণার মধ্যে কয়েকটি তালুক পান। সেই সম্পত্তি উঁহার পুত্রদিগের মধ্যে সাতআনী, পাঁচআনী ও সিকি এই ভাবে তিনটি পৃথক্ বাড়ীর সৃষ্টি করে, উহা এখনও আছে।[২] হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন বসুচৌধুরিগণ যিনি যেখানেই বাস করিয়াছেন,

১ কথিত আছে চণ্ডীবরকে কন্যাদানের বহুপরে চতুরঙ্গ গৌড়ে এক মুসলমান বান্দীর প্রেমমুগ্ধ হওয়ায় কাজির বিচারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'পঞ্চরঙ্গ খাঁ' হন। তখন কত লোক এমনভাবে মুসলমান হইয়া যাইতেন। তিনি বেলফুলিয়ার আইচগাতি গ্রামে ভৈরবের অনতিদূরে ৪১/ বিঘার সনন্দ পাইয়া তথায় এক গড়কাটা বাড়ী নির্ম্মাণ করতঃ মুসলমান রমণীসহ বাস করেন। সেই পত্নীর গর্ভে তাঁহার সুবি খাঁ ও বুচি খাঁ নামক দুইপুত্র হয়। পঞ্চরঙ্গও শেষ জীবনে কাজিগিরি চাকরী পান, তাঁহার পুত্রগণও কাজি হন। এখনও প্রশস্ত কাজির রাস্তা, কাজির দেউড়ী, কাজির বাড়ী ও গড়, সুবি খাঁর কবর প্রভৃতি পুরাতন নিদর্শন আছে। এই কাজি বংশীয়গণ বহু পুরুষ ধরিয়া হিন্দুর মত আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন।

২ হরিশ্চন্দ্র হইতে ২।১টি ধারা এই: ১৬ হরিশ্চন্দ্র—জগদানন্দ—দুর্ল্লভ—বিশ্বনাথ—রামগোবিন্দ—লক্ষ্মণ—কৃপানাথ (পাঁচআনী)—গোপী—তিলক—বিশ্বম্ভর—শশী—যতীন্দ্র বি. এল,

বেলফুলিয়ার কায়স্থ-সমাজে তাঁহাদের অবাধ প্রতিপত্তি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদেরই সম্পর্কে বেলফুলিয়ায় স্থানে স্থানে বহু কুলীনের বসতি হইয়াছে। বসুচৌধুরিগণের জমিদারী যাওয়ার পর বেলফুলিয়া পরগণা পরবর্ত্তী শত বৎসরকালে দূরবর্ত্তী স্থানীয় বহু জমিদারের হাত বদলাইয়া ছিল। উহার ধারাবাহিক কাহিনী জানিতে পারি নাই। নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে আনুমানিক ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে বেলফুলিয়া পরগণা নিলাম হইলে, হাতিয়াগড়ের দত্ত-বংশীয় রামসন্তোষ ও রামগোপাল দত্ত উহা খরিদ করিয়া মৌভোগে আসিয়া বাস করেন।

মৌভোগের দত্তচৌধুরী বংশ॥ ইহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, বালীর দত্ত নামে পরিচিত। নড়াইল-জমিদারের বংশপ্রসঙ্গে এই দত্ত-শাখার পরিচয় দিয়াছি। বালী হইতে রামসন্তোষের পূর্ব্বপুরুষ কখন্ এবং কেন হাতিয়াগড়ে যান, তাহা জানি না। তবে তাঁহারা যে বাণিজ্য-বলে অর্থশালী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাণিজ্য-পোত সপ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম যাতায়াত করিত, তাহা শুনিয়াছি। জমিদারী প্রাপ্তির পর রামসন্তোষ ও রামগোপাল পরিবারবর্গসহ পরগণার পূর্ব্ব সীমায় মৌভোগ গ্রামে পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন।[১] তাঁহাদের সুরম্য বাড়ী ও কারুকার্য্যযুক্ত মন্দিরের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। এই দত্তচৌধুরীরা অত্যন্ত অর্থশালী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটা গল্প আছে। পার্শ্ববর্ত্তী বারুইপাড়া গ্রামের হাটে একখানি সামান্য কুলার মূল্য লইয়া অন্য এক জমিদারের লোকের সহিত একদিন উঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে, উভয়পক্ষ ঐ সামান্য দ্রব্যের দরবৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে দত্তপক্ষ দুই হাজার টাকায় উহা খরিদ করিয়া জিদ্ বজায় রাখেন; তদবধি নাকি বারুইপাড়া নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'দোহাজারী' হইয়াছে। এ গল্পে কেহ বিশ্বাস না করিলে

---

১৭ রাঘব—দুর্ল্লভ—বিশ্বেশ্বর—রামকৃষ্ণ (দেয়াড়া)—রামপ্রসাদ—রামকিঙ্কর—রামগোবিন্দ—ফটিক—২৫ অক্ষয়কুমার, ১৭ রাঘব—জানকীবল্লভ (আইচ্গাতি)—নরোত্তম—কৃষ্ণরাম—শ্যামসুন্দর—কমলাকান্ত—গৌরীকান্ত—২৪ যোগেন্দ্রকুমার।

১ রামসন্তোষ দত্ত বীজী পুরুষোত্তম দত্ত হইতে ১৯শ পর্য্যায়ভুক্ত। তদ্বংশীয়েরা মৌভোগে ৭।৮ পুরুষ বাস করিতেছেন। একটি বংশধারা এই: ১৯ রামসন্তোষ—রামকৃষ্ণ—রাজবল্লভ—জয়নারায়ণ—তারাচাঁদ—দ্বারকানাথ—বসন্তকুমার—বিজয়, নেপাল (M. Sc.) এবং ভূপাল।

আপত্তি নাই, তবে দত্তচৌধুরিদিগের যে অর্থ ছিল এবং উন্মুক্ত হস্তে উহার সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। মৌভোগ হইতে আজগড়া পর্য্যন্ত কয়েকটি গ্রামের বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তাঁহারা যে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার শত শত সনন্দ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কতকগুলি আমি নিজেই দেখিয়া পরীক্ষা করিয়াছি। এই সকল নিষ্করের লোভে বহু ব্রাহ্মণ আসিয়া মৌভোগে বাস করেন এবং উহা একটি বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান হয়। ১১৩৮ হইতে ১১৬৩ পর্য্যন্ত সনন্দের তারিখ দেখিয়াছি। ১১৬৩ সালে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হয়; সুতরাং সে পর্য্যন্ত জমিদারী দত্তচৌধুরীদিগের হস্তে ছিল, অনুমান করিতে পারি। এখন জমিদারী নাই বটে, কিন্তু রায়চৌধুরী উপাধিধারী মৌভোগের দত্তগণ স্বস্থানে ও সমাজে বিশেষ সম্মানিত।

১১৬৭ সালে (১৭৬০ খৃঃ) যখন 'অন্যে পরে কা কথা,' স্বয়ং মীরজাফরেরই নবাবী লইয়া টানাটানি চলিতেছে, তখন দেখি, বেলফুলিয়া পরগণা মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমিদার কৃষ্ণসিংহ রায় (ওরফে সীতারাম রায়) ও ব্রজলাল রায়ের করগত হইয়া পড়িয়াছে। তখন কৃষ্ণসিংহ রায় বেলফুলিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে জয়পুর নামক গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। বর্ত্তমান খড়রিয়া জমিদারী কাছারীর পূর্ব্বভাগে যেখানে একটি পুরাতন বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে এবং পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষ 'কোঠাবাড়ী' নামে পরিচিত, উহাই কৃষ্ণসিংহের বাটী। তাহারই পার্শ্বে খড়রিয়া পরগণার সীমা ছিল। অল্পদিন মধ্যে কৃষ্ণসিংহ রায় হোগলা পরগণার অর্দ্ধাংশ খরিদ করেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু তিনি অধিকদিন জমিদারী ভোগ করিতে পারেন নাই। উঁহাদের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ বশতঃ হোগলার অংশ গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে যায় এবং বেলফুলিয়ার অধিকার কোম্পানি কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বেলফুলিয়া পরগণা গবর্ণমেণ্টের খাস ছিল। ১৭৯৯ অব্দে দেখা যায়, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিক্রীত হইতেছে।[১] কালক্রমে সেই সকল খণ্ড একত্র করিয়া হাটখোলার দত্তচৌধুরিগণ ।৵০, গঙ্গানারায়ণের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ রায় ।৵০ ও রামনগরের ঘোষ চৌধুরিগণ ।০ অংশের মালিক হন। এখনও সেইরূপ আছে। বেলফুলিয়া পরগণায় পৃথক্ তৌজি নাই, উহার অংশত্রয় খড়রিয়া ও হোগলার তৌজিভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

১ Westland, *Jessore*, pp. 50, 151 [ed. 1871, pp. 130, 194—শি মি]।

৪ চিরুলিয়া, মধুদিয়া ও রাঙ্গদিয়া

গো ব র ডা ঙ্গা র জ মি দা র গ ণ ॥ যশোহরের অন্তর্গত সারষার প্রসিদ্ধ কুলীন শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় একদা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ইচ্ছাপুর গিয়া তথাকার হোড়চৌধুরীদিগের কন্যা বিবাহ করেন, সেই দোষে তিনি নিজগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ইচ্ছাপুরে বাস করেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল, জগন্নাথ ও খেলারাম; খেলারাম সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সৌভাগ্যযোগে যশোহর-কালেক্টরীর সেরিস্তাদার হন এবং কালেক্টর সাহেবের অত্যন্ত প্রয়পাত্র হইয়া পড়েন। তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করতঃ ক্রমে ক্রমে গোবরডাঙ্গা তালুক, চিরুলিয়া ও মধুদিয়া পরগণা এবং শাহউজিয়াল পরগণার অন্তর্গত ডিহি আড়পাড়া প্রভৃতি সম্পত্তি নিলাম খরিদ করেন এবং পরে বিখ্যাত দুলাল সরকারের নিকট হইতে রাঙ্গদিয়া পরগণা পত্তনী লন। খেলারামের কালীপ্রসন্ন ও বৈদ্যনাথ নামে দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ নিঃসন্তান। কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার, তাঁহার সময়ে তাঁহার পৈতৃকসম্পত্তিগুলি সবলে অধিকৃত ও উহাদের আয়বৃদ্ধি হয়। তিনিই গোবরডাঙ্গায় যমুনা কূলে ‘প্রসন্নভবন’ অট্টালিকা ও দ্বাদশ লিঙ্গসহ ৺আনন্দময়ীর বাটী প্রস্তুত করেন। ১৮৪৪ অব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে সারদাপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন নামে তাঁহার দুই নাবালক পুত্র ছিল, উহার মধ্যে তারাপ্রসন্ন নিঃসন্তান। সুতরাং ১৮৬৯ অব্দে অল্প বয়সে সারদাপ্রসন্নের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি গিরিজাপ্রসন্ন, অন্নদাপ্রসন্ন, জ্ঞানদাপ্রসন্ন ও প্রমদাপ্রসন্ন—তাঁহার এই চারি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। খুলনা জেলার মধ্যে মধুদিয়া, রাঙ্গদিয়া ও চিরুলিয়া নামক তিনটি পরগণা যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতার সম্পত্তি এবং ঘোষের-হাট, যাত্রাপুর ও পাণিঘাটে যথাক্রমে উহাদের তহশীলের কাছারী রহিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য—তূলা, চিনি ও নীল

মুসলমান আমলে যশোহর-খুল্‌নার বাণিজ্য কেমন ছিল, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ইংরাজ আমলের প্রথম হইতেই কিছু কিছু বিবরণ আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। ইংরাজ-রাজত্বকালকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—কোম্পানির শাসন ও রাজকীয় শাসন। ১৭৮১ অব্দে যশোহরে ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় হইতে সিপাহি-বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক ভারত-শাসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোম্পানির আমল এবং তৎপরে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রাজকীয় যুগ। এই যুগের বাণিজ্যাবস্থা আমাদের চক্ষুর উপর আছে, বিস্তৃত বিবরণী দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে মাত্র। সেজন্য আমরা প্রধানতঃ কোম্পানির আমলের কথাই বলিব।

কোম্পানির শাসনের প্রথম ভাগে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এই কয়েকটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল: কস্‌বা, মুড়লী, কেশবপুর, সেনেরবাজার, ফকিরহাট কচুয়া, মনোহরগঞ্জ, খুল্‌না, তালা, কালীগঞ্জ (যশোহর), ইছাখাদা, ঝিনাইদহ, গোপালপুর ও শৈলকুপা,[১]—ইহার মধ্যে মুড়লীর স্থানে বর্ত্তমান রাজারহাট ধরা যায়, অপরগুলি এখনও আছে; কিন্তু এখনকার বড় বড় হাটের নাম ইহার ভিতর নাই,—চৌগাছা, কোটচাঁদপুর, বসুন্দিয়া, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, দৌলতপুর, বড়দল, ত্রিমোহানী, ঝিকারগাছা, বাগেরহাট, রূপগঞ্জ ও বিনোদপুর। সুন্দরবন বিভাগে হিঙ্গুলগঞ্জ, বসন্তপুর, কালীগঞ্জ, ন'বাকীর হাট, বড়দল, সোলাদানা, চালনা, গৌররম্ভা, মরেলগঞ্জ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৩ অব্দে যখন পুলিস ট্যাক্স বসে, তখন উৎপন্নের পরিমাণ অনুসারে বাণিজ্যস্থানের ক্রমিক তালিকা এইভাবে দেওয়া যায়—সাহেবগঞ্জ, ফকিরহাট, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কেশবপুর, সেনেরবাজার, মনোহরগঞ্জ, মুড়লী, তালা ও খাজুরা। ইহার মধ্যে সাহেবগঞ্জ ও মনোহরগঞ্জ আধুনিক যশোহর সহরের দুই অংশ ছিল। চাঁচ্‌ড়ার রাজা মনোহর রায়ের নামে

১ Westland, Report, *Jessore*, p. 134. [ed. 1871, p. 172—শি মি]।

মনোহরগঞ্জ হইয়াছিল। এই সময়ে এই কয়েকটি স্থলে শস্যের আমদানী হইত— নওয়াপাড়া, কুমারগঞ্জ (নল্‌দী), ফকিরহাট চাঁদখালি, ও হেঙ্কেলগঞ্জ বা হিঙ্গুলগঞ্জ। যশোহর-খুল্‌না হইতে ধান্য চাউল ত যথেষ্ট রপ্তানি হইতই, তদ্ব্যতীত বরিশালের চাউলও এই পথে কলিকাতায় যাইত। ১৭৯১ অব্দে যশোহরের রপ্তানি ৯ লক্ষ মণ চাউল এবং বরিশালের দেড়লক্ষ মণ। যশোহরের মুগ, মসূর, ছোলা ও অন্যান্য কলাই এবং খুল্‌নার ধান্য, নারিকেল ও সুপারির রপ্তানি পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। শুধু তামাকের উৎপন্ন পূর্ব্বের তুলনায় কিছুই নাই বলিলে হয়। ঐ সময় বাৎসরিক উৎপন্ন ৩০ হাজার মণের মধ্যে ১০ হাজার মণ তামাক রপ্তানি হইত। এখন রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে তামাক আসিয়া এদেশের চাষ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কোম্পানির আমলের অবশিষ্ট উৎপন্নের মধ্যে যশোহরের তুলা, চিনি, ও নীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তুলার চাষ একেবারে গিয়াছিল, বিদেশী সূতার কাপড়ের ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। সম্প্রতি আবার একটু নূতন বাতাস বহিয়াছে, তুলা চাষের সাড়া পড়িয়াছে, চরকার সূতায় বস্ত্র-বয়ন আরব্ধ হইয়াছে, শীঘ্রই স্বাবলম্বিতার দিন ফিরিবে কিনা, শ্রীভগবানই জানেন। চিনির ব্যবসায় অনেক কমিলেও, এখনও আছে; যশোহর এখনও চিনির জন্য বিখ্যাত। এক সময়ে যশোহরের নীল জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল; এখন উহার ব্যবসায় একেবারে গিয়াছে। আমরা এস্থলে তুলা ও চিনির কথা বলিয়া পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে নীলের কথা লিখিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে তুলাই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শিল্প-সামগ্রী। পৃথিবীর মধ্যে তুলার রপ্তানি হিসাবে ভারতবর্ষেরই প্রথম স্থান ছিল, এখন সে বিষয়ে আমেরিকা সর্ব্বপ্রধান হইয়া ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলিয়াছে। ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে ও আমাদের বিচার্য্য যশোহরে তুলার চাষ কম ছিল না। ১৭৮৯ অব্দের হিসাবে দেখা যায়, সে বৎসর যশোহরে ২৪,০০০ মণ তুলা জন্মিয়াছিল এবং ৩৬,০০০ মণ তুলা বাহির হইতে আসিয়াছিল। এই ৬০ হাজার মণ তুলার সূতা ও ভূষণা হইতে আগত সামান্য পরিমাণ সূতা হইতে যশোহরের বস্ত্র-শিল্প চলিয়াছিল; ঐ বৎসর, ১,৪৮,১০০ খানা কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। কৃষকের নিকট তুলা কিনিয়া স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা চরকায় কাটা সূতা হইত; উহাই লইয়া তাঁতি, জোলা ও যোগীরা বস্ত্র প্রস্তুত

করিতেন। হাটে বাজারে তুলা, সূতা ও বস্ত্র তিন দ্রব্যই বিক্রয় হইত। গৃহস্থেরা ঘরে কাটা সূতা লইয়া বয়নকারিগণের বাড়ীতে গিয়া কিছু নির্দ্দিষ্ট 'বাণী' (মজুরী) দিয়া ফরমাইজ মত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেন। স্ত্রীলোকেরা চরকায়, এমন কি হাতে পর্য্যন্ত, অতি সূক্ষ্ম সূতা কাটিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ-রমণীরা সূক্ষ্ম পবিত্র পৈতার সূতা কাটিয়া দেশমধ্যে খ্যাতি লাভ করিতেন। বস্ত্রের চিন্তা ও তদানুষঙ্গিক কার্য্য যে গৃহস্থের একটা দৈনিক কর্ত্তব্য ছিল, প্রবাদে প্রবচনে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[১]

এখনও যশোহর-খুল্‌নায় বস্ত্রের ব্যবসায় বিলুপ্ত হয় নাই, তবে অধিকাংশ বিদেশী সূতায় প্রস্তুত হয়। যশোহরের অন্তর্গত সিদ্ধিপাশা, নরনিয়া, সাতবাড়িয়া ও চিংড়া এবং সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাক্‌সা প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের ধুতি ও শাড়ী উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে সিদ্ধিপাশা ও বাক্‌সার দেশবিদেশে সুনাম আছে। এখনও সিদ্ধিপাশায় ১৫।১৬ টাকা দরের জোড়ার ধুতি ও চাদর প্রস্তুত হয়। ইহা ব্যতীত নিম্ন শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত ছোট ধুতি, স্ত্রীলোকের 'তবন্' ও 'ডুমো' (নাতিদীর্ঘ শাড়ী), নানাবিধ লুঙ্গি, রঙ্গিন গামছা ও মশারির থান, ইহা প্রায় সকল প্রধান প্রধান হাট বা গঞ্জের নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রস্তুত হয়। প্রথম আমলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে বস্ত্রের কারখানা স্থাপন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী তাঁতিদিগকে অগ্রিম দাদন দিয়া কাপড়ের ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার জন্য উহার উৎসাহ দিয়াছিলেন। সোনাবাড়িয়া ও বুড়ন বা সাতক্ষীরার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরে যখন ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়িগণ এদেশের লোকের পছন্দমত বা বাসোপযোগী কাপড় প্রস্তুত করিতে শিখিল এবং রাশি রাশি বিলাতী বস্ত্র পণ্য-জাহাজে ভারতে পৌছিতে লাগিল, তখনই কোম্পানির লোকেরা কারখানা তুলিয়া দিয়া এবং অন্য প্রকারে এদেশীয় ব্যবসায়ীকে হাতেভাতে

১ এখনও 'কাট্‌না কাটা' বৃত্তির উল্লেখ আছে; পরের চিন্তা করা অপেক্ষা 'আপন চরকায় তেল দাও' বলিয়া উপদেশ শুনা যায়, শাসন করিতে গিয়া পুত্র বা ছাত্রকে বলা হয়, 'টা'কোয় আড় থাকে ত তোমাতে আড় রাখিব না।' টা'কোয় আড় থাকা যে সুতাকাটার কি বিঘ্নকর, তাহা আবার লোকে বুঝিবে। অলস-স্বভাবা বধূকে এখনও খাশুড়ী তিরস্কার করেন, "দিন যায় বউএর হেলে পেলে, রাত হ'লে বউ কাপাস ডলে।" কাপাস ডলিয়া বীচি বাছা প্রভৃতি কার্য্য দিবাভাগে করাই ভাল।

মারিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে মর্ম্মভেদী কাহিনীর স্থান এখানে নাই। কলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া গৃহশিল্প বিকলাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু একেবারে মরিল না; একবার একটা ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইলে, তাহা সহজে যায় না; সূক্ষ্মশিল্পীর অল্পতা হইলেও অন্ততঃ যাঁহারা মোটা কাপড় বুনিতেন, তাঁহাদের বংশ-ধারা নষ্ট হইল না। তবে সস্তাদরের পাট মিশ্রিত বা মিহি বিলাতী সূতা হাটে বাজারে আমদানী হইয়া চরকার মূলে কুঠারাঘাত করিল।

'চরকা আমার নাতিপুতি, চরকা আমার প্রাণ,
চরকার দৌলতে মোর গোলাভরা ধান'—

এ বুলি আর থাকিল না। কলের চরকার বিলাতী সূতা সস্তায় পাইয়া লোকে চরকাদ্বারা ইন্ধনের কার্য্য সারিল এবং সস্তায় পস্তাইয়া, নিজের ঘরে নিজে আগুন দিয়া একেবারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। তবুও বস্ত্র-শিল্প একেবারে উড়িয়া গেল না। অগ্রে বিলাতী বণিক ব্যবসায় করিবার ছলে এদেশের লোকের পছন্দের সন্ধান ও মাত্রা বুঝিয়া লইয়াছিল, শেষে বিলাতেই বাঙ্গালীর জন্য নূতন পছন্দ নূতন ফ্যাসান্ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, বস্ত্রের রঙ্গে ও পা'ড়ের বাহারে লোকের চক্ষু ধাঁধিয়া দিল। ঘরসন্ধানী প্রতীচ্য বণিক এইবার স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। শাড়ীতে দুইটি পা'ড়ের স্থলে "পাছা পা'ড়" বাড়িল, রঙ্গিন সূতায় চন্দ্রহারের স্থান অধিকার করিয়া গৃহস্থ-ললনার রুচি বিগড়াইয়া দিল। শুধু তিন পা'ড় নহে, ৪।৫ পা'ড় পর্য্যন্ত হইল, আর কাঙ্গালের ঘরে গুলবাহার ও হাতিপা'ড় আসিয়া গৃহধর্ম্মের তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু রুচি-বিকার হইলেও শিল্পী একেবারে মরিল না, আজও হাটে বাজারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

যশোহর সহর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে কেশবপুরের নিকট মধ্যকূল নামক একটি ক্ষুদ্র স্থানে প্রতি শুক্রবারে প্রধানতঃ একটি কাপড়ের হাট বসে; উহাতে প্রতি হাটে একদিনে প্রায় ৫০ হাজার টাকার দেশী তাঁতের কাপড় বিক্রয় হয়। নরনিয়া, পাত্‌লা, রস্তমপুর, বরাতিয়া, নূরপুর, ভাইসা, সাতবাড়িয়া, জানপুর, দুর্ব্বাডাঙ্গা, বাঙ্গালীপুর, কোমরপুর, বেগমপুর, (খৃষ্টান জোলাগণ), কড়িয়াখালি, ঝাপা, মস্বিননগর, চিংড়া, ধানদিয়া প্রভৃতি বহুস্থানের জোলা ও তাঁতিগণ এই

মধ্যকূলে আসিয়া কাপড় বিক্রয় করেন। এসব কাপড় অধিকাংশই পাইকারি বিক্রয় হয়, খুজুরা বিক্রয় হয় না বলিলেও চলে। এজন্য বড় বড় পাইকারি ব্যাপারী আছেন,[১] উঁহারা কাপড় লইয়া প্রতি মঙ্গলবারে কলিকাতার পরপারে হাওড়ার হাটে বা চেতলার হাটে বিক্রয় করেন এবং কলিকাতা হইতে সূতা ক্রয় করিয়া সময়মত মধ্যকূলে উপস্থিত হন। কাপড়ের মূল্য কতক নগদ, কতক সূতায় দেওয়া হয়, তাঁতির হিসাব ব্যাপারীর খাতায় উঠে ও তাঁহারা দরকার মত দাদন পান। এইভাবে বছর ভরিয়া কারবার চলিতেছে; কিন্তু এই কারবার প্রধানতঃ আমেরিকার তুলা হইতে ল্যাঙ্কাসায়ারে (ইংলণ্ড) প্রস্তুত মিহি সূতার খেলা মাত্র; ভারতীয় তুলার মোটা সূতায় যখন এই খেলা চলিবে, সেই দিনই লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবেন।

মধ্যকূলের নিম্নেই মুড়লীর পার্শ্ববর্ত্তী রাজারহাট, কেশবপুর, ধান্‌দিয়া, চান্দুড়িয়া এবং মধুমতীর কূলে বোয়ালমারি (এখন ফরিদপুরের মধ্যে) প্রভৃতি স্থানের হাট বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। বোয়ালমারির কাপড় পূর্ব্বে অধিকাংশই লক্ষ্মীপাশা আসিয়া বিক্রয় হইত।[২] সিদ্ধিপাশা, বাক্‌সা, সাতবাড়িয়া (ত্রিমোহানীর নিকটবর্ত্তী) প্রভৃতি স্থানে তাঁতির বাড়ী হইতেও ব্যাপারিগণ কাপড় লইয়া যান। এখনও এই সকল স্থানের বয়নকারীদিগকে উন্নত পদ্ধতিতে সামান্য শিক্ষা দিলে এবং অর্থ দাদন দিয়া সাহায্য করিলে উঁহারা দেশের লজ্জা নিবারণ পক্ষে প্রধান সহায়ক হইতে পারেন। জাতিভেদের সুফল কুফল যাহাই থাকুক, উহাতে যে পুরুষানুক্রমে কতকগুলি শিল্প-নৈপুণ্য বংশবিশেষে চিরস্থায়ী করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের শিল্পী আছে, এখন দেশের লোকে পুনরায় তুলার চাষ ও চরকা ধরিলে, বস্ত্রশিল্প পুনর্জীবিত হইবে। সে কিছু কঠিন কথা নহে। ১৬৪৩ অব্দের পূর্ব্বে মোমবাতির পলিতা ভিন্ন অন্য কার্য্যে ইংলণ্ডের লোকে তুলার ব্যবহারই জানিত না; চেষ্টার ফলে সেই দেশে পৃথিবীর ¾ অংশ সূতা প্রস্তুত করিতেছে, অথচ সেদেশে এক ছটাক তুলার চাষ হয় না।[৩]

১ বর্ত্তমান সময়ে এই সকল ব্যাপারীদিগের মধ্যে জয়লাল কারিগর, ওমেদালি কারিগর, বেণীদাস, রসিকলাল দালাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এক জয়লাল কারিগরই প্রতি হাটে ১৫।১৬ হাজার টাকার কাপড় খরিদ করেন।

২ Hunter, *Jessore*, p. 302.

৩ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, 'চরকা' (পুস্তিকা), ৫ পৃ।

আর যে দেশের ভূমি তুলার চাষের উপযুক্ত ও লোকে সে চাষ জানে, যেখানে এখনও চাষীর মুখে শুনা যায়, "ষোল চাষে মূলা, তা'র অর্দ্ধেক তুলা," যে যশোহর-খুল্‌নায় এখনও ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ স্ত্রী-কন্যার হস্তরচিত সূক্ষ্ম পৈতা ভিন্ন পরেন না, যেখানে এখনও কার্পাসতরু গৃহকোণ হইতে চিরবিদায় লয় নাই, সেই সমুর্ব্বর-ক্ষেত্রবহুল শিল্পীর নিবাস-ভূমে শীঘ্রই যে অন্নবস্ত্রের জন্য পরের দ্বারস্থ হওয়ার অভ্যাস বন্ধ হইবে, তাহা আশা করিতে পারি।

চিনিই যশোহরের প্রধান পণ্য। এখানে ইক্ষুর চাষ বা ইক্ষুর চিনি অতি কমই হয়। চিনি বলিতে এ অঞ্চলে খেজুর চিনিই বুঝায়, কারণ উহাই সহজে ও সস্তায় উৎপন্ন হয়। লবণাক্ত ভূমিতে ভাল ইক্ষু জন্মে না; উচ্চ জমিতে যথেষ্ট চাষ ও অতিরিক্ত সার দিয়া পরম যত্নে ইক্ষু জন্মাইতে হয় এয়ং ক্ষেত্রগুলি সমস্ত বৎসর ঘিরিয়া রাখিয়া উহার পাছে লাগিয়া থাকিতে হয়। অপর পক্ষে এদেশে খেজুর গাছ সহজে জন্মে, একটু উচ্চজমিতে বীজ ছড়াইয়া রাখিলেই গাছ হয়, ছাগল গরুর উৎপাতের ভয় নাই, ক্ষেত্র ঘিরিতে হয় না, বৎসরের মধ্যে একবার জমিখানিতে চাষ দিয়া রাখিলেই চলে। ৬।৭ বৎসর পরে গাছগুলি হইতে রস বাহির করা যায় এবং পরবর্ত্তী অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসরকাল উহা একটি বাৎসরিক লাভের সম্পত্তি হইয়া থাকে। খেজুরগাছ যশোহর-খুল্‌নার একটি প্রধান বিশেষত্ব; এখানকার লোকেই ইহা কাটিয়া রস বাহির করিতে এবং রস হইতে গুড় চিনি প্রস্তুত করিতে জানে। অন্য জেলার লোকে তাহা জানে না। এমন কি, অন্য জেলায় খেজুরগাছ থাকিলেও তাহার সদ্ব্যবহার হয় না; সময় সময় উহার পাতা দিয়া পাটি এবং সাহেবী হ্যাট তৈয়ার করা হয় মাত্র। হুগলী জেলায় দেখিয়াছি, যশু'রে লোক তাহাদের নিজ অস্ত্র লইয়া সেখানে না গেলে, বৃক্ষগুলি অস্ত্রাঘাত পায় না, কণ্টকিত তরু সরস হয় না। যে বৎসর গাছ 'দিবার' (কাটিবার) জন্য যশু'রে গাছি যায়, সে বৎসর তাহার একচেটিয়া কারখানা বালক বৃদ্ধের জয়োল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং সেও কিছু পয়সা লুটিয়া লইয়া স্বদেশে আসে। কিন্তু তবুও সহজে ঘরুয়া বাঙ্গালী সকল বৎসর পরদেশী হইতে চায় না।

যশোহর-খুল্‌নার লোককে গুড় প্রস্তুত করার কথা না শুনাইলেও চলিতে পারিত। তবে অনেকে দেশে থাকেন না, থাকিয়াও দেখিতে জানেন না, গুড়ের কথা জানেন ত চিনির কথা জানেন না; বিশেষতঃ অন্যস্থানের লোকে

এতদুভয়ের কোনটির কথাই জানেন না, অথচ তাঁহারাও এ পুস্তক পড়িবেন কাজেই সংক্ষিপ্ত ভাবে গুড় ও চিনির প্রস্তুত প্রণালী বলিতে হইল। উহাতে অনেক ব্যবহারিক বা প্রাদেশিক কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। যাঁহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করেন, তাঁহাদের নাম গাছি (বা শিউলি)। বর্ষান্তে গাছিরা খেজুর গাছ 'তোলে' অর্থাৎ উহার মাথার একদিকের পাতাগুলি গোড়া কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া সেই অর্দ্ধেকটা চাঁছিয়া পরিষ্কার করেন। কিছুদিন পরে ঐস্থান বেশ শুকাইয়া গেলে, পুনরায় 'চাঁছ দেন' অর্থাৎ চাঁছিয়া পরিষ্কার করেন এবং ভাঁড় টাঙ্গাইবার জন্য উপরের একটি পাতার গোড়ায় একগাছি করিয়া দড়ি ঝুলান এবং চাঁছ দেওয়া স্থানটির নিম্নভাগে দুইদিকে দুইটি খাঁজ কাটিয়া তাহার সন্ধিস্থলের কিছু নিম্নে একটি বিঘত-প্রমাণ বাঁশের কঞ্চির 'নলী' বসান। তখন কর্ত্তিত স্থানের রস খাঁজ বাহিয়া নলীর মুখ দিয়া ভাঁড়ের মধ্যে পড়িতে পারে। চাঁছের পর ভাঁড় পাতিলে রাত্রিতে সামান্য রস হয় বটে, কিন্তু উহা লবণাক্ত। উহাও জ্বালাইলে এক প্রকার গুড় হয় এবং তাহা পাতায় ঢালিয়া শুকাইয়া 'পাটালি' প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু চাঁছের পাটালি লবণাক্ত বলিয়া সুস্বাদু নহে। গাছটি আরও একটু শুকাইলে, কয়েকদিন পরে যখন পরিষ্কৃত স্থানটির মধ্যস্থলে দুই পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কাটিয়া উহার রস নলীতে যাইবার পথ করিয়া দেওয়া হয়, তখনকার রসে এক প্রকার সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়, উহাকে 'নলিয়ান' গন্ধ বলে। সে রসের গুড় হইতে যে নলিয়ান গুড় বা পাটালি হয়, উহা বাঙ্গালীর বড় লোভনীয় খাদ্য। এই গুড় পৃথক করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলে কয়েক মাস তাহার গন্ধ থাকে এবং চিনির সঙ্গে উহার স্বল্প সহযোগে 'ভীমনাগের নূতন গুড়ের সন্দেশ' তৈয়ারী হয়। অতি অল্প কয়েকদিন নলিয়ান গন্ধ থাকে ; পরবার যখন গাছগুলি কাটা হয়, তখন সেই পরবর্ত্তী কাটকে 'পর-নলিয়ান' বলে। গাছিরা তাঁহাদের গাছগুলি কয়েক 'পালায়' বিভক্ত করিয়া, এক এক পালা একদিনে কাটেন। পর পর তিন দিনের বেশী এক সময়ে কোন গাছে রস প্রদান করে না; পরবর্ত্তী আর তিন দিন গাছকে বিশ্রাম বা 'জিরান' দিয়া আবার যখন কাটা হইতে থাকে, তখন প্রথম দিনের কাটকে 'জিরানকাট' বলে, সেদিনের রস খুব পরিষ্কৃত ও সুস্বাদু হয়। পরদিনের কাটকে 'দোকাট' ও তৃতীয় দিনের কাটকে 'তেকাট' কহে। গাছগুলিকে রোগীর মত সন্তর্পণে পালন করিতে হয়, বেশী গভীর করিয়া বারংবার

কাটিলে শীঘ্রই উহাদের জীবনান্ত হয়। তৃতীয় দিনে প্রায়ই গাছটিকে না কাটিয়া কেবল মাত্র মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাত্রির জন্য ভাঁড় বাঁধা হয়, উহাকে 'ঝরা' বলে, এবং দিনের বেলায় সংগৃহীত রসের নাম 'ওলা'। প্রথম দিন অপেক্ষা প্রতি রাত্রিতে ক্রমেই রস কম হয় এবং ঘোলা হইতে থাকে। জিরান রসেরই গুড় ও চিনি ভাল হয়, রাত্রিতে শীত কম পড়িলে অপর দিনের রসের গুড়ে একটু অম্ল আস্বাদন হয়। ঝরা ও ওলা রসের গুড়ে দানা বাঁধে না ; উহা হইতে পাতলা বা ঝোলা গুড় হয়। উহার অধিকাংশই তামাক মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যূষ হইতে গাছের রস পাড়িয়া গাছিরা রসের ভাঁড়গুলি বাঁকে করিয়া কারখানায় বা বাইনশালে লইয়া যান। যে উনুনে রস জ্বাল দিয়া গুড় হয়, তাহার নাম বা'ন বা বাইন। ঐ চুল্লীতে দুইটি হইতে ৮।১০টি পর্য্যন্ত মুখ থাকে, তাহাতে নাদা বা 'জ্বালুয়া' নামক মাটিয়া কড়া চড়াইয়া দিয়া রস পূর্ণ করা হয় এবং ৪।৫ ঘণ্টা ধরিয়া যথেষ্ট জ্বালানি কাঠ বা শুষ্ক পত্রের সদ্ব্যবহার করিলে, রসের রঙ্ সরিষা ফুলের মত হইয়া পরে উহা হইতে হরিদ্রাভ লাল গুড় হয়। সময় মত জ্বালুয়াগুলি নামাইয়া কাঠি বা তাড়ুয়া দিয়া গুড়ের পার্শ্বে ঘসিয়া 'বীজ মারিতে' হয় ; যখন ঘন ঘর্ষণে গুড় হইতে শুষ্ক শ্বেতবর্ণ গুঁড়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে, তখন গুড়ের দানা বাঁধাইবার জন্য ঐ গুঁড়া বীজ গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া তাহা হইতে পাটালি প্রস্তুত হয়, অথবা সে গুড় বড় কলসী, গাদন বা গাছানে কিম্বা ছোট ভাঁড় বা ঠিলায় ঢালিয়া রাখা হয়। এই সকল কলসী বা ভাঁড় হাট বাজারে বিক্রয় হয়। গুড় কতক গৃহস্থের সংসার খরচে লাগে, কতক হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা গুড় হইতে চিনি বাতাসা প্রস্তুত করিতেন, তাঁহাদের নাম কুরি। সেই কুরি বা কারিগরেরা গুড় কিনিয়া লইয়া চিনি প্রস্তুত করেন, কোন কোন স্থানে গাছিরাও নিজ বাটীতে অল্প চিনি প্রস্তুত করিয়া হাটে বিক্রয় করেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গুড়ের কাঁচি (৬০ তোলায় সের) মণের দর এক হইতে দুই টাকার মধ্যে ছিল, এখন উহা দ্বিগুণেরও অধিক অর্থাৎ ৪৲ বা ৪৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

এই গুড় হইতে দেশী প্রণালীতে কি ভাবে চিনি হয়, তাহাই এখন বলিব। প্রত্যেক চিনির কারখানায় অসংখ্য গুড়ের কলসী বা ভাঁড় খরিদ করিয়া মজুত করা হয়। প্রথমতঃ ভাঁড়গুলি ভাঙ্গিয়া চাড়া বা খাপরা ফেলিয়া গুড়টুকু চুবড়ী

(ঝুড়ি) বা পেতেতে রাখা হয়। পেতেগুলি মৃন্ময় নাদার উপর তেকাঠা দিয়া বসান থাকে। পেতে হইতে গুড়ের রস গলিয়া ঐ নাদায় সঞ্চিত হয়। পেতেয় গুড় রাখিবার তৃতীয় দিনে গুড়ের দলাগুলি 'বৈঁকি' অস্ত্র দিয়া কুঁচাইয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ 'মুটানো' হয়। এবং পরদিন ঐ গুড়ের উপর শেওলা (শৈবাল) দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। সকল শেওলায় এই কাজ হয় না। বিধির কি স্থন্দর বিধান, যে দেশে খেজুর গাছের এত আমদানী, সেই স্থানের কপোতাক্ষী প্রভৃতি মরণোন্মুখী নদীতে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযোগী এক প্রকার 'চিনিয়া' বা পাটা শেওলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং কত লোকে ঐ শেওলা নৌকা পুরিয়া তুলিয়া আনিয়া ভারে ভারে কারখানার দ্বারে উপস্থিত করে। ইহাতেও কত জনের জীবিকার সংস্থান হয়। আর এই কপোতাক্ষী নদীর কূলে কূলে চিনির কারখানার প্রধান স্থানগুলি এক সময়ে যশোহরের পণ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। শেওলা দেওয়ার ৭ দিন পরে পেতের উপরের যে অংশ সাদা চিনি হইয়া যায়, তাহা কাটিয়া তুলিয়া লওয়া হয় এবং অবশিষ্ট পুনরায় 'মুটিয়া' নূতন শেওলা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। আবার ৭।৮ দিন পরে কতকটা চিনি কাটিয়া লওয়া হয়, এইরূপ ৪।৫ বার করিলে এক পেতে শেষ হয়।

প্রথমবারে যে মাৎ বা পাতলা গুড় (কোন কোন স্থানে ইহাকে কোত্‌রা গুড়ও বলে) নাদায় পড়ে, তাহা লইয়া বড় বড় লোহার কড়ায় জ্বাল দেওয়া হয়। পরে সেই মাৎ গুড় মৃত্তিকা প্রোথিত জালার মধ্যে ঢালিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। ৮।১০ দিন মধ্যে উহা হইতে গুড় জমিয়া যায়। সে গুড়ও পেতেয় দিয়া শেওলা ঢাকা দিয়া মুটিয়া মুটিয়া তিন চারিবার চিনি পাওয়া যায়।

এইভাবে যে চিনি প্রস্তুত করিবার কথা বলিলাম, তাহার নাম 'দলুয়া চিনি'। উহা কিছু সরস, কোমল, স্থস্বাদু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলা যুক্ত, এজন্য উহার নাম দলুয়া। ময়রাগণ এই চিনির সমধিক পক্ষপাতী। এই দলুয়া চিনির আবার প্রকার ভেদ আছে; পেতেয় প্রদত্ত প্রথমবারের গুড় হইতে যে উৎকৃষ্ট চিনি হয়, তাহার নাম 'আখ্‌ড়া' এবং উহা অপেক্ষা যে কিছু লাল চিনি বাহির হয় তাহার নাম 'চল্‌তা'। আর দ্বিতীয়বারের চিনিকে 'কুন্দো' কহে। প্রথমবারের মাৎ জ্বাল দিয়া কুন্দো চিনির জন্য পেতেয় দেওয়া হয়; কুন্দোর পেতে হইতে যে মাৎ হয়, তাহা মাৎই থাকে এবং সেইভাবে বিক্রয় করা হয়। উহা জ্বাল দিলে টানা চিটা গুড় প্রস্তুত হয় এবং তাহা বাখরগঞ্জ

প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে তামাক মাখিবার গুড়রূপে ব্যবহৃত হয়। আখ্‌ড়া ও কুন্দোর দামে ছয় বা আটআনা মণকরা প্রভেদ হয়, চল্‌তার মূল্য উহার মাঝামাঝি। খরিদ্দার বুঝিয়া দামের ন্যূনাধিক্য হয়।

দলুয়া চিনি বেশীদিন ভালভাবে বা শুষ্ক অবস্থায় থাকে না, শীঘ্রই 'মাতিয়া' উঠে। এজন্য দলুয়া চিনিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য উহাকে 'পাকা চিনি' করিয়া লওয়া হয়। দলুয়া চিনি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মেটে খোলায় বা বড় কড়াতে জ্বাল দিয়া দুধ দিয়া উহার 'গাদ কাটিয়া' বা ময়লা উঠাইয়া ফেলে। শেষে উহা ছিদ্রযুক্ত খোলায় রাখিয়া শেওলার সাহায্যে পুনরায় পূর্ব্ববৎ চিনি করিয়া লওয়া হয়। উহার মধ্যে যাহা খুব সাদা এবং বড় দানাওয়ালা, তাহাকে 'দোবরা' চিনি বলে এবং তদপেক্ষা লাল্‌চে চিনির নাম 'একবরা' চিনি।

দলুয়া হইতে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার কথা যেমন বলিলাম, তেমনই যশোহর-খুল্‌নার অনেক স্থানে গুড় হইতে পাকাচিনি প্রস্তুত করিবার প্রথা আছে। তাহা এই : ভাঁড় ভাঙ্গিয়া গুড় লইয়া প্রথমতঃ বস্তায় পুরিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়, উহার নিম্নে প্রোথিত বড় বড় নাদা থাকে। বস্তার দুই পার্শ্বে দুই দুইখানি বাঁশকে দড়ি দ্বারা চাপিয়া বাঁধিয়া বস্তার গুড়ের মাৎ নিংড়াইবার কৌশল থাকে। এইভাবে রস ঝরিয়া গেলে, বস্তার শুক্‌না গুড় জলসহ জ্বাল দিয়া, দুগ্ধদ্বারা গাদ কাটিয়া, পরে নাদায় ফেলিয়া শেওলা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। উহার উপর যে সাদা চিনি পাওয়া যায়, তাহা পিটাইয়া গুঁড়া করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট পাকা চিনি হয়।

কেশবপুরে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার একটি পৃথক্ প্রণালী আছে: প্রথমেই ভাঁড় ভাঙ্গিয়া গুড় লইয়া তাহা বড় বড় নাদা বা জ্বালুয়ায় জ্বাল দেওয় হয় এবং প্রত্যেক নাদায় দুই এক মুষ্টি বীজগুড় নিক্ষিপ্ত হয়। মাৎগুড়া জ্বালাইয়া শুষ্ক ও নীরস করিলেই বীজ হয়, ঐ বীজ মিশাইলে গুড় একবারের অধিক জ্বাল দিতে হয় না; একবার জ্বালেতেই বীজের গুণে গুড় হইতে মাৎ নিঃসরণের ক্ষমতা বাড়ে। জ্বাল হইতে নামাইয়া গুড়কে শীতল করিয়া তাহার উপর শেওলা চাপান হয়, তখন সেই গুড় হইতে চিনি হয়। সেবারে যাহা মাৎযুক্ত গুড় থাকে, তাহা বস্তায় পুরিয়া পূর্ব্ববৎ চাপিয়া যাহা সারভাগ পাওয়া যায়, তাহাতে জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া শীতল করিয়া শেওলা চাপা দিয়া পরিষ্কৃত চিনি উৎপন্ন হয়।

পাকা চিনিই বিদেশে রপ্তানি হয়, ইয়োরোপে দলুয়া চিনি যায় না। এদেশেও সাধারণ ব্যবহারে ও সন্দেশাদি প্রস্তুত করিবার জন্য পাকা চিনির অধিক ব্যবহার হয়। পাকা চিনির পাকা একমণ, ৬০ তোলার সেরের কাঁচা দুইমণের সমান। বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ পাকামণ ২২৲ হইতে ২৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বে এই পাকামণের দামই ১২৲ হইতে ১৮৲ পর্য্যন্ত ছিল। তখন দলুয়ার পাকামণ ৮৲ হইতে ১২।১৩৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইত। মাৎগুড় সবই জ্বাল দিয়া পূর্ব্বে চিঠা গুড় করা হইত এবং উহার অধিকাংশই নলছিটি, ঝালকাটি প্রভৃতি স্থানের ব্যাপারীরা কিনিয়া লইয়া যাইতেন। শীতকালের শেষভাগে বরিশালের লোকে বড় বড় নৌকা পুরিয়া সিদ্ধ চাউল লইয়া আসিতেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া গুড় ও চিনি বোঝাই করিয়া স্বদেশে ফিরিতেন। উঁহাদের পণ্য-তরণীতে ভৈরব ও কপোতাক্ষীর বক্ষ আকীর্ণ হইয়া থাকিত। এখন ভৈরবের অর্দ্ধেক মরিয়া গিয়াছে; তবুও বহুদূর বক্রপথ ঘুরিয়া শৈবালমণ্ডিত কপোতাক্ষীর কূলে বহু ব্যাপারী নৌকার সমাগম হইয়া থাকে। আজকাল কোটচাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে সব মাৎগুড় চিটা করা হয় না, উহার কতক মদের ভাঁটির জন্য মাৎ অবস্থাতেই কলিকাতা, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে নীত হয়।

যশোহরের মধ্যে কোটচাঁদপুর ও কেশবপুরই সর্ব্বপ্রধান চিনির কারবার স্থান, তন্নিম্নে ছিল চৌগাছা ও ত্রিমোহানী; সবগুলি স্থানই কপোতাক্ষীর সন্নিকটে। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্থানে চিনি প্রস্তুত হইত; যেমন, যশোহর (রাজার হাট), খাজুরা, মণিরামপুর, ঝিঙ্গারগাছা, তালা, বসুন্দিয়া, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, নিমুরায়ের বাজার (সেনহাটি), সেনেরবাজার ও ফকির-হাট। কিন্তু ঝিঙ্গারগাছা, যাদবপুর, কালীগঞ্জ, ইছাখাদা ও নওয়াপাড়া প্রভৃতি স্থানে চিনির কারখানা অপেক্ষা গুড়ের হাটই বড় ছিল। কোটচাঁদপুরে শতাধিক কারখানায় সহস্র সহস্র লোকে কাজ করিত, শীতকালে গুড়ের গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হইত, ভাঁড়ভাঙ্গা চাড়া বা খাপ্‌রা পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া থাকিত। ঐস্থানে এখনও সেই খাপ্‌রা দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হয়, ইটের খোয়া লাগে না। কেশবপুরে 'কারখানা পাড়া' ও 'কলিকাতা পটী' ছিল; কলিকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া চিনির কারবার করিতেন। চৌগাছা এবং ত্রিমোহানীতেও বহু সংখ্যক কারখানা ছিল। আমাদের শিশুকালে সেনেরবাজার ও ফকির-

হাটে ৩০।৪০টি করিয়া কারখানা দেখিয়াছি। এখন তাহার কিছুই নাই। সেনেরবাজার, ফকিরহাট, নিমুরায়ের বাজার ও নওয়াপাড়ার কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় খুল্‌নায় চিনির কারবার নাই, যাহা আছে যশোহরেই আছে। বিলাতী বিট চিনি এবং যবদ্বীপের বিলাতী কারখানার 'যাবা' চিনি আসিয়া দেশের ব্যবসায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন মাত্র কোটচাঁদপুরে শতাধিক স্থলে ৩০।৩২টি, চৌগাছায় ১টি, ত্রিমোহানী ও কেশব-পুরে ৫।৭টি করিয়া কারখানা চলিতেছে। এখন যশোহরের গুড়ই অন্য জেলায় নীত হইয়া চিনির কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে।

চিনির কারখানা যাহাই হউক, শীতকালে কতকগুলি গুড়ের হাট দেখিবার উপযুক্ত। ইহার মধ্যে রূপদিয়ার নিকটবর্ত্তী ছাতিয়ান-তলার হাট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শীতকালে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাটের দিন তথায় সহস্রাধিক গরুর গাড়ীতে গুড় আসে এবং উহা কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুই তিন শত ব্যাপারী নৌকা মরা ভৈরবের শৈবালময় বক্ষে ভাসমান থাকে। ইহার পর রাজারহাট, কালীগঞ্জ, মণিরামপুর, ঝিঙ্গারগাছা, যশোহর, ও যাদবপুর (নাভারণ) এবং দক্ষিণে বড়দল, বসন্তপুর ও হিঙ্গুলগঞ্জের হাটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুড়ের আমদানী হয়।

কোটচাঁদপুর এখনও যশোহরের মুখ রাখিয়াছে। এখানকার কারবার অনেকটা মন্দীভূত হইয়া গেলেও বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমরের সময় হইতে উহার অনেকগুলি কারখানা আবার সবেগে চলিতেছে। ১৮৭৪ অব্দে এখানে ৬৩ কারখানায় মোট ৯,৩৮,৮৫০৲ টাকা খাটাইয়া ১, ৫৬,৪৭৫ মণ চিনি পাওয়া যায়; ১৮৮৯ অব্দে ৮।৯ লক্ষ টাকায় ১,৭৫০০ মণ চিনি পাওয়া যায়। এখন ৩২টি কারখানা চলিতেছে। প্রতি শীতকালে প্রত্যেক পেতেয় ৪ মণ গুড়ের কাজ হয়; ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫ হাজার পেতের কাজ একটি কারখানায় হইতে পারে; এক হাজারের কম পেতের কাজে কোন কারখানা চলে না। গুড়ের মূল্যের ⅔ অংশ টাকা মূলধন হইলে কারখানা চালান যায়। গুড়ের মূল্য মণপ্রতি ৩৲ ধরিলে প্রত্যেক পেতেয় ৮৲ হিসাবে মূলধনের আবশ্যক হয়। যদি গড়ে ৩০০০ পেতে দ্বারা প্রত্যেক কারখানা চলে, তাহা হইতে প্রত্যেক কারখানায় ২৪০০০৲ টাকা এবং ৩২টি কারখানায় ৭,৬৮,০০০ টাকা মূলধন খাটিতেছে ধরা যায়। প্রত্যেক পেতেয় ৪৴ গুড়ে ১৶৮ সের আন্দাজ আখ্‌ড়া চিনি, ।২ কিম্বা ।৩ সের

কুন্দো, ১৴৩ সের মাৎগুড় এবং অবশিষ্ট ।৬ সের ঘাট্‌তি বা জল্‌তি (wastage) যায়। উক্ত চিনি ও গুড়ের মূল্য মোট ২৪৲ টাকা ধরা যায়। খরচের মধ্যে গুড়ের মূল্য ১২।১৩৲ টাকা, পেতে প্রতি খরচ ২৲, মোট খরচ ১৪।১৫৲ টাকা বাদ দিলে, প্রত্যেক পেতেয় আনুমানিক ৯।১০৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। অবশ্য ইহার মধ্য হইতে সরঞ্জাম, টাকার সুদ প্রভৃতি আরও খরচ বাদ পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিলাতী ব্যবসায়ীরা চিনির কারবার করিতে বঙ্গে আসেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ধোবা নামক স্থানে ব্লেক (Blake) সাহেব প্রথম ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার লোকসান হইতে লাগিলে, একটি কোম্পানি গঠন করিয়া তিনি নিজ কুঠি ৪½ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। কোটচাঁদপুর ও ত্রিমোহানীতে ঐ কোম্পানির কুঠি বসিয়াছিল। সেই সময়ে নিউহাউস্ (Newhouse) সাহেব কোটচাঁদপুরে এবং সেণ্টস্‌বারি সাহেব ত্রিমোহানীর কুঠির মালিক হন। এই সময়ে কলিকাতার Gladstone Wyllie & Co. চৌগাছায় আসিয়া কারখানা খুলেন। প্রথমে স্মিথ্ ও পরে ম্যাক্‌লিয়ড্ (Mcleod) সাহেব ম্যানেজার ছিলেন। ম্যাক্‌লিয়ড্ প্রথমে স্থানীয় সমস্ত খেজুর রস কিনিয়া লইয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিতেন। বড় বড় খেজুর ক্ষেতে রস ঢালিয়া দিলে উহা কিরূপে লোহার নল দিয়া কারখানায় পৌছিত, তাহা এখনও দেখিয়া বুঝা যায়। কারখানার পার্শ্বে সাহেবের যে সুন্দর পাকা আবাস বাটিকা ছিল, তাহা এখনও বাসোপযোগী রহিয়াছে। চারিপার্শ্বে এখনও সুন্দর কলমের বাগান, কবর স্থান ও সন্তান সন্ততির অকাল মৃত্যু-জনিত মর্ম্মস্পর্শী স্মারকলিপি আছে। কোটচাঁদপুর, কেশবপুর, ত্রিমোহানী, ঝিঙ্গারগাছা ও নারিকেলবাড়িয়ায় এই কোম্পানির কারখানা ছিল। কিন্তু ১৮৫০ অব্দে সবগুলি উঠিয়া গিয়া কেবল কোটচাঁদপুর ও চৌগাছায় থাকে।

১৮৬১ অব্দে নিউহাউস্ সাহেব চৌগাছার কারখানার শাখারূপে কপোতাক্ষী ও ভৈরবের সঙ্গমস্থলে তাহিরপুর (Tarpu) নামক স্থানে একটি চিনির কল খুলিয়া ইয়োরোপীয় মতে চিনি প্রস্তুত করিতে থাকেন। উহার সঙ্গে রম্ মদ প্রস্তুত করিবার ভাটিখানারও যোগ হয়। কিন্তু ক্রমশঃ দেনা বাড়িতে লাগিলে, ১৮৮০ অব্দের পর এমেট চেম্বার্স কোম্পানির নিকট কারবার বিক্রয় করা হয়। সাহেবেরা আসিয়া কলকারখানা ও বাড়ী ঘরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া, হাড়ের গুঁড়ার সাহায্যে চিনি পরিষ্কার করিবার নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা

করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৮৪ অব্দে সে কোম্পানি উঠিয়া গেল ; বালুচর নিবাসী রায় বাহাদুর ধনপত্ সিংহ উহা খরিদ করিয়া লইলেন এবং তিনি মৃত্যুকাল (১৯০৬) পর্য্যন্ত কারবার চালাইলেন।

১৯০৯ অব্দে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, হাইকোর্টের জজ্ সারদা চরণ মিত্র, নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রায় বাহাদুরের সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইয়া 'তারপুর চিনির কারবার' নামক যৌথ ব্যবসায় খুলেন এবং ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। কিন্তু কার্য্য ভাল চলে নাই। আমেরিকা ও জাপান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ দেশীয় একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু পতনের হাত হইতে কারবার রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহস্থল।

মোট কথা, বিলাতী কল-কারখানার ব্যয়সাপেক্ষ প্রণালীতে এ গরীব দেশের ব্যবসায় চলিবে না, দেশীয়দিগের প্রাচীন গার্হস্থ্য পদ্ধতিদ্বারা কার্য্য হইবে। সে প্রকার ক্ষুদ্র গৃহস্থ-ব্যবসায়ীর লোকসান হইবে না এবং দেশের কার্য্যও সুন্দর ভাবে চলিবে। এখনও কপোতাক্ষীকূলে ঝিঙ্গারগাছা ও মিছরী-দাঁড়া এবং ভৈরবকূলে যশোহর ও বসুন্দিয়া প্রভৃতি হাটে গেলে, কৃষকদিগের গৃহজাত সুন্দর দানাওয়ালা পরিষ্কৃত চিনি ক্রয় করা যায়। বহুস্থানে চিনির কল বা কারখানা বন্ধ হইলেও, এখনও সর্ব্বত্র কুড়াইয়া যশোহরে যে চিনি পাওয়া যায়, তাহা সমগ্র বঙ্গের উৎপন্ন চিনির $\frac{৩}{৪}$ অংশ অপেক্ষাও বেশী। ১৯০০-০১ অব্দে যশোহরের ১১৭টি কারখানায় ১৫ লক্ষ টাকার চিনি দিয়াছিল। সে বৎসর সমগ্র বঙ্গের ২১,৮০,৫৫০ মণ চিনির মধ্যে একমাত্র যশোহর হইতে ১৭,০৯,৯৬০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়।[১]

১ 'Inspite of the decline in the manufacture, Jessore is still the chief date sugar producing district in Bengal, the outturn per annum being estimated at 1,221,400 cwts. out of total of 1,559,679 cwts. for the whole Province.'—Quarterly Journal of the Bengal Agricultural Department (article '*The Date Sugar Palm*' by N. N. Banerji), 1908, pp. 161-62 ; Jessore Gazetteer, p. 91.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ

চিনির পর নীলই যশোহরের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীকেই যশোহরের নীলের যুগ ধরা যায়, তন্মধ্যে ১৮১০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত উহার ক্রমোন্নতির কাল। ১৮৫৮ অব্দে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাতে উহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়, এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীলের চাষ একেবারে বন্ধ হয়। নীলের নূতন রকম বাণিজ্য-প্রণালী বিলাতী লোকে এদেশে আনেন বটে, কিন্তু নীল জিনিসটি এদেশে নূতন নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে নীলরঙ্গের কথা ভারতবাসীদের জানা ছিল এবং তাঁহারা উহা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। ধ্যানস্থ আর্য্যঋষিগণ আকাশের রঙ্ হইতে পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং পটে বা প্রতীকে সেই নীলবর্ণ প্রতিফলিত করিতেন। প্লীনি প্রভৃতি প্রাচীন রোমক পণ্ডিতগণ ইণ্ডিকাম্ (Indicum) বলিয়া উহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ইণ্ডিগো (Indigo) কথা, বা যে গাছ হইতে নীল হয়, সেই গাছের বৈজ্ঞানিক (Indigofera Tinctoria) নামের সঙ্গে ইন্দ বা হিন্দুস্থানের সম্বন্ধ চিরগ্রথিত রহিয়াছে।

আবুল-ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে দেখিতে পাই, গুজরাটের অন্তর্গত আহমদাবাদে এবং আগ্রার নিকটবর্ত্তী বায়নাতে উৎকৃষ্ট নীলরঙ্গ প্রস্তুত হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইত ; কিন্তু তখন সেই উৎকৃষ্ট দ্রব্যের মণকরা মূল্য ১০।১২ টাকার অধিক ছিল না।[১] ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকেরা আগ্রায় যথেষ্ট নীল সংগ্রহ করেন ; কিন্তু সে সময়ে পারস্যে ও ইংলণ্ডে উহার বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় ইংরাজদিগের যথেষ্ট লোকসান সহ্য করিতে হয়।[২] বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানি, বায়না প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ করিবার জন্য ওলন্দাজ (Dutch) বণিকেরা তথায় বাসা করিয়া থাকিতেন।[৩] ভারতবর্ষে তখন কি প্রণালীতে নীল প্রস্তুত হইত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, এবং বৈদেশিক বণিকেরাও উহা শিখিতে পারেন নাই।

---

১ *Ain* (Jarrett), Vol. II., pp. 181, 241.

২ J. A. S. B., 1836, Appendix, p. 156.

৩ Bernier, *Travels* (Bangabasi), p. 275.

ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে আমেরিকা হইতে নীল উৎপাদনের নূতন প্রণালী এদেশে আসে এবং উহার প্রথম প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন একজন ফরাসী বণিক লুই বোনড (Louis Bonnaud)। তিনি ১৭৩৭ অব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেল সহরে জন্মগ্রহণ করেন ও অল্প বয়সে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া দৈবক্রমে নীলের ব্যবসায় শিক্ষা করেন। তিনি ১৭৭৭ অব্দে বঙ্গদেশে আসিয়া চন্দন নগরে অধিষ্ঠান করতঃ নিকটবর্ত্তী তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় দুইটি নীলকুঠি খুলেন; উহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বোনড্ একজন অদ্ভুতকর্ম্মা লোক; তিনি কয়েক বৎসর পরে মালদহে গিয়া আর একটি নীলকুঠি নির্ম্মাণ করেন; সেদেশে চূণের অভাব দেখিয়া তিনি একটি মুসলমান কবরখানা হইতে মনুষ্যাস্থি উঠাইয়া উহাই পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৪ অব্দে তিনি বাঁকীপুরের নীল ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং পরে কিছুদিনের জন্য যশোহরের অন্তর্গত নহাটা কারবারের মালিক ছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি কাল্‌না নীলকুঠি হইতে একবৎসরে ১৪০০ মণ নীল রপ্তানি করেন। ১৮২১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ইয়োরোপীয় নীলকর।[১] বঙ্গদেশে নীলের চাষের সংবাদ ১৭৮৯ অব্দের ২৯শে অক্টোবরের সরকারী ঘোষণা পত্র হইতে প্রথম জানা যায়।[২]

যশোহরের কথা বলিতে গেলে, তথায় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন বৈদেশিক নীলকরের কুঠি স্থাপিত হইবার প্রমাণ নাই।[৩] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণের অনুমতি ব্যতীত কোন পাশ্চাত্য বণিক কারখানার জন্য এদেশে কোন জমি লইতে পারিতেন না। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বণ্ড (Bond) সাহেব নামক এক ব্যক্তি উক্ত ডিরেক্টর সভার অনুমতি লইয়া যশোহরের অন্তর্গত রূপদিয়াতে এই জেলার সর্ব্ব প্রথম কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ভৈরবের কূলে এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পর বৎসর টাপ্‌ট্ (Tuft) সাহেব মহম্মদশাহীতে কুঠি খুলিবার আদেশ পান। ১৮০০ অব্দে টেলার (Taylor) সাহেব কয়েকটি কুঠি খুলেন এবং পর বৎসর এণ্ডারসন যশোহরের কাছে বারান্দী ও নীলগঞ্জে

১ Asian, March 18, 1879—*Biographical Sketch of the First Indigo Planter in India*, by H. J. Rainey.

২ 'কলিকাতা, সেকালের ও একালের,' ৬৭৬ পৃ।

৩ Westland, *Jessore*, p. 135.

এবং খুল্‌নার কাছে দৌলতপুরে কুঠি করেন। এগুলির ভগ্নাবশেষ এখন একপ্রকার বিলুপ্ত হইতেছে। এই সময়ে প্রতিবৎসর বৈদেশিকদিগের নামের লিষ্ট দাখিল করিতে হইত। ১৮০৫ অব্দে নিম্নলিখিত কুঠিয়াল সাহেবদিগের নাম পাওয়া যায়: [কুঠির নাম বাঙ্গালায় এবং মালিকের নাম ইংরাজীতে প্রদত্ত হইল] Deverell—ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী হাজরাপুর; Brisbane—কোটচাঁদপুরের কাছে দাঁতিয়ারকাটি ; Taylor and Knudson—মীরপুর ; Reeves—সিন্দুরিয়া ; Razet—নহাটা ; ইত্যাদি।[১] এইরূপে ১৮১১ অব্দে যশোহর ও ঢাকা জেলা নীল কুঠিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবেরা নিজ নিজ এলেকার সীমা ও প্রজাবিলি লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঝিঙ্গারগাছার কুঠির Jennings সাহেব এবং রূপদিয়ার Bond সাহেব যশোহরে অভিযোগ করিলেন। কালেক্টর (Thmaos Powney) তৎক্ষণাৎ এক সাময়িক ইস্তাহার জারী করিয়া দিলেন যে, এক কুঠির ১০ মাইলের মধ্যে অন্য কুঠি বসিতে পারিবে না। এজন্য আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনারালকে লিখিলেন। কিন্তু লর্ড মিণ্টো কালেক্টরের কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি লিখিলেন, এরূপ আইন হইলে ২০ মাইল বা লক্ষাধিক বিঘা জমির উপর একজন নীলকরের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে; তখন জমিদারদিগের ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তার্পণ করা হইবে এবং প্রতিযোগিতার অভাবে প্রজার লভ্যাংশ কম হইয়া পড়িবে। সুতরাং আইন হইল না ; তবে ঐ সময়ে নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল। সে অত্যাচারের কথা পরে বলিতেছি।

কালেক্টরের ইস্তাহার উঠিয়া গেলে নীলকরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সর্ব্বত্র নীলকুঠি স্থাপন করিতে লাগিলেন। উহার ফলে প্রতিবৎসর যথেষ্ট নীল প্রস্তুত হইত এবং বিলাতে ও বিদেশের সকল বিপণিতে বঙ্গীয় নীলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন কি, কথিত আছে, ১৮১৫-১৬ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে সমগ্র পৃথিবীর লোকের প্রয়োজনীয় নীল সরবরাহ করা হইয়াছিল।[২] আর এই

১ *Ibid.*, p. 136.

২ The Dawn Magazine, July, 1905—*Fifty years ago.* ['নীলদর্পণ', কর-মজুমদার, ১৩২৮, ১৪৯ পৃ দ্র. —শি মি]

নীলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল, বিশেষতঃ নদীয়া ও যশোহর জেলার নীল জগতের মধ্যে অতুলনীয়।[১]

প্রথমতঃ জমিদারের অধীন অল্প অল্প জমি জমা লইয়া সাহেবেরা প্রধানতঃ স্থানীয় রাইয়তের সাহায্যে নীলের চাষ করাইতেছিলেন। পরে ১৮১৯ অব্দের অষ্টম আইনে[২] জমিদারদিগকে পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হইল এবং জমিদারগণ নবাগত নীলকরদিগের নিকট হইতে উচ্চহারে সেলামী লইয়া তাঁহাদিগকে বড় বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন। এ দেশীয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও নিজের অথবা পরের জমিদারী মধ্যে পৃথক্‌ভাবে পত্তনী লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। উঁহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদারেরা অগ্রণী। সাহেবদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কাজ চালাইবার জন্য উঁহারা সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন। এখনও নড়াইলের নিকটবর্ত্তী ঘোড়াখালিতে নীলকুঠির পার্শ্বে সেই আমলের সাহেব ম্যানেজারের বাড়ী আছে। উহা এখন উঁহাদের জমিদারীর প্রধান ম্যানেজারের আবাস বাটিকা।

নদীয়া-যশোহরের নীলের খ্যাতি বিলাতে পৌছিলে, বহু ধনীর পুত্র এই ব্যবসায়ে বড়লোক হইবার আশায় এদেশে আসিতে লাগিলেন। কেহ নিজে স্বত্বাধিকারী থাকিয়া, কেহ কেহ বা কয়েকজনে মিলিয়া যৌথ কোম্পানি স্থাপন পূর্ব্বক এক একটি বিস্তৃত Concerns বা কারবার খুলিতেন, উহাকে সাধারণ লোকে হৌস্ বা কান্‌সরণ বলিত। কথাটা চলিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা কারবার বা কান্‌সরণ উভয় কথাই ব্যবহার করিব। এক একটি কান্‌সরণের মধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি করিয়া কুঠি (factory) থাকিত, সকলগুলির

১ 'The Indigo manufactured in this side of India is of prime quality and that of lower Bengal, especially which is produced in the districts of Nuddea and Jessore, is probably the very finest in the whole world.'—Indigo Commission Report, para 72, p. 21.

'The finest indigo that the world produces is, I believe generally admitted to be that of Bengal, and second to none is the indigo of Jessore and Furreedpore.'—Gastrell, *Statistical Reports*, 1868, p. 11. 'The Nadia and Jessore Indigo is still the finest in India.'—Grant, *Minute*, para 54. [*Vide* Buckland—*Bengal under the Lieutenant-Governors*, Vol. I, p. 258.—শি মি]

২ Regulation VIII of 1819.

কার্য্যব্যবস্থা একই কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা হইত। সর্ব্বোপরি যিনি কর্ত্তা বা ম্যানেজার তাঁহাকে 'বড় সাহেব' এবং তাঁহার সহকারীকে 'ছোট সাহেব' বলা হইত। কান্‌সরণের মধ্যে প্রধান কুঠির নাম ছিল সদর কুঠি। কারবারের পরিমাণ বড় না হইলে, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষই যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কার্য্যকারিতা শক্তিই বৃটিশকে রাজার জাতি করিয়াছে।

ম্যানেজারের অধীন কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান। উঁহার বেতন ৫০৲ টাকা, সে আমলে তাহাই উচ্চ হার। নায়েবের অধীন থাকিতেন গোমস্তা। রাইয়তদিগের হিসাবপত্রের সহিত উঁহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; এজন্য তাঁহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে দস্তুরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় করিতেন। সাহেবদিগের অবোধ্য অশ্লীল গালাগালি এবং সময়মত বুটের আঘাত উঁহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাৎপদ না হইয়া ইঁহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্ব্বনাশ বা মর্ম্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেন। ভাল লোক কেহ থাকিতেন না, তাহা বলিতেছি না; তবে সাধারণতঃ ভাল থাকা যাইত না। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, দেশীয় লোকে দেশ ও স্বজাতির পানে চাহিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিলে, নিশ্চয়ই নীলের ব্যবসায় এত কলঙ্কিত হইত না। গোমস্তা ব্যতীত, জমি মাপের জন্য আমীন, নীল মাপের জন্য ওজনদার, কুলি খাটাইবার জন্য জমাদার বা সর্দ্দার, খবর প্রেরণ ও সময়মত রাইয়তদিগকে কাজের তাগিদ করিবার জন্য কয়েকজন করিয়া তাগিদগীর বা তাইদগীর থাকিত।

বনগ্রাম মহকুমা তখন নদীয়ার মধ্যে ছিল, এখন উহাকে যশোহরের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইতেছে। কতকগুলি কান্‌সরণের অধীন কুঠি, উভয় জেলায় ভাগাভাগি ছিল; উহাদিগকে ঠিক পৃথক্ করিয়া এখন আর হিসাব দিবার উপায় নাই। বনগ্রাম, মাগুরা ও ঝিনাইদহ এই তিনটি মহকুমায় প্রধান প্রধান নীলের কারবার ছিল; সাতক্ষীরায় বেশী কারবার ছিল না; লবণাক্ত জলে ভাল নীল হইত না; কারবার যাহা ছিল, তাহারও বিশেষ খবর আমরা রাখি না। খুল্‌নাকে যশোহরের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই আমরা কান্‌সরণগুলির তালিকা দিতেছি। নীলকুঠিগুলির সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল; আমরা যেখানে পারি ঐ সময়েরই উৎপন্নের হিসাব দিব।

বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানিই নদীয়া-যশোহরের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারবার ছিল। উহার অধীন চারিটি প্রধান কান্‌সরণ ; তন্মধ্যে মোল্লাহাটি ও কাঠগড়া এক্ষণে যশোহরে পড়িয়াছে, খালবলিয়া নদীয়ার মধ্যেই আছে এবং রুদ্রপুর (চান্দুড়িয়ার সন্নিকটে) ২৪-পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট।

১ মো ল্লা হা টি কা ন্ স র ণ॥ বর্ত্তমান বনগ্রাম হইতে ৫।৬ মাইল দূরে ইচ্ছামতীর তীরে মোল্লাহাটিতে বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির সদর কুঠি ছিল। সাহেবদিগের ভাষায় ইহার নাম ছিল 'Mulnath'। ইহার মধ্যে মোল্লাহাটি, বাঘডাঙ্গা, পিপুলবাড়িয়া, পিপড়াগাছি, ভবানীপুর, বেনাপোল, দুর্গাপুর, গাইঘাটা, হুগলী, মীর্জাপুর প্রভৃতি ১৭টি কুঠি ছিল। মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২,০০,০৯২ জন। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির ম্যানেজার প্রবল প্রতাপান্বিত লারমোর (R. T. Larmour) সাহেব মোল্লাহাটিতে বাস করিতেন। ১৮৬০ অব্দের প্রাক্কালে জেমস্ ফরলঙ (J. Forlong) সাহেব মোল্লাহাটি কান্‌সরণের কর্ত্তা ছিলেন। এই কুঠির অত্যাচাব কাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' প্রণীত হয়, সে কথা পরে বলিতেছি।

২ কা ঠ গ ড়া কা ন্ স র ণ্॥ মোল্লাহাটির উত্তরাংশে কপোতাক্ষীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে কাঠগড়া, খালিসপুর, চৌগাছা, গুয়াতলী, কাঁদবিলা, ইল্‌শামারি প্রভৃতি ৬টি কুঠি ছিল। লোকসংখ্যা ৭৩,৮৩৯ জন। চৌগাছা, খালিসপুর ও কাঠগড়ার এখন কুঠি বাড়ীগুলি খাড়া আছে। এই কান্‌সরণে প্রথম নীল-বিদ্রোহ আরব্ধ হয়।

৩ হা জ্ রা পু র॥ মাগুরা ও ঝিনাইদহেব মধ্যস্থলে। হাজ্‌রাপুরেরই নাম পরে পোড়াহাটি কান্‌সরণ্ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে হাজ্‌রাপুর, লোহাজঙ্গ, নারায়ণপুর, বরীশাট, পোড়াহাটি, পবহাটি, রাজারামপুর, জিতোড়, ফলুয়া প্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। পূর্ব্বে হাজ্‌রাপুর ও পোড়াহাটি দুইটি পৃথক কারবার ছিল, পোড়াহাটি ছিল হেন্‌রী রাসেল (Henry

Russel) সাহেবের ; তিনি হাজ্‌রাপুরের মালিক টুইডী (Dr. Thomas Tweedie) সাহেবকে নিজ কান্‌সরণ্‌ বিক্রয় করিলে উভয় সম্মিলিত হয়। তৎপুত্র টুইডী (C. Tweedie) সাহেব এখনও জীবিত আছেন ; তাঁহার কুঠি নাই, সম্পত্তি আছে। তবে তিনি হাজ্‌রাপুরের কুঠি বাড়ী ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এই সম্মিলিত কারবারে ১৬,০০০ বিঘা জমিতে বৎসরে ১০০০৲ মণ নীল উৎপন্ন হইত।

৪ সিন্দূরিয়া॥ ইহা নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত। তবে এই কান্‌সরণের অনেকগুলি কুঠি ঝিনাইদহের মধ্যে পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে বিজলিয়া প্রধান। ১৮৮৯-৯০ অব্দে বিজলিয়া কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লোক বিদ্রোহী হয়। বিজলিয়া ব্যতীত ঝিনাইদহের মধ্যে বিষ্ণুদিয়া, ভুঁঞাডাঙ্গা, কাত্‌লামারি, দুর্গাপুর প্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। উহাতে ১০,৬০০ বিঘা নীলের চাষে বাৎসরিক ৭০০৲ মণ উৎপন্ন হইত। ইহা একটি যৌথ কোম্পানির অধীন ছিল, সেরিফ (W. Sheriff) সাহেব তাহার প্রধান অংশীদার ও কর্ত্তা ছিলেন। তিনি উন্নতমনা ও বদান্য ব্যক্তি।

৫ জোড়াদহ কান্‌সরণ্‌॥ ইহার অধীন জোড়াদহ, ভবানীপুর, সোহাগপুর, হরিশপুর, ঘোলদাড়ী প্রভৃতি কতকগুলি কুঠি ছিল। ইহাও এক সেরিফ (J. Sheriff) সাহেবের নিজস্ব ছিল। ১৮৫৭-৫৮ অব্দে জর্জ ম্যাক্‌নেয়ার জোড়াদহ ও সিন্দূরিয়ার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অত্যাচারী বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। জোড়াদহে ৯,৪৫৮ বিঘায় বৎসরে গড়ে ৬০০৲ মণ নীল পাওয়া যাইত।

৬ খড়গড়া কান্‌সরণ্‌॥ ইহাতে খড়গড়া, আট্‌লে, ত্রিবেণী প্রভৃতি কুঠিতে ৪,০৬৪ বিঘার চাষে ১৬৬৮২ সের নীল উৎপন্ন হইত। ইহারও কর্ত্তা ছিলেন উইলিয়ম সেরিফ।

৭ মহিষাকুণ্ড কারবার॥ ইহার মালিক নড়াইলের

জমিদারগণ। কুঠিগুলি ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন ; উহাদের নাম মহিষাকুণ্ড, তালনিয়া, গোপালপুর, শৈলকূপা, ডুধসর, গোপীনাথপুর, মকরমপুর, প্রভৃতি। উৎপন্ন ৫,১৭৪ বিঘায় ১৯৯/ মণ।

৮ নহাটা কান্সরণ্॥ প্রথমে সেবী (Savi)[১] সাহেব নল্দীর অধীন নহাটা পত্তনী লইয়া এই কারবার আরম্ভ করেন। কিছু কাল পরে তিনি উহা টমাস ও থরবার্ণ কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করেন (৪৮৩ পৃ)। পরে উহা সেলবী (Selby) সাহেবের হাতে যায়। নহাট্টা, পলিতা, চাঁদপুর, চাউলিয়া, সত্রাজিৎপুব, রাজাপুর, আড়পাড়া, চরখালি প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর কুঠি ছিল। ১৮৭২ অব্দে ওটস্ (H. Oatts) সাহেব ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১০,০৬৪ বিঘায় ৫০০/ মণ নীল জন্মিত।

৯ বাবুখালি কান্সরণ্॥ ইহার মধ্যে বাবুখালি হাটবাড়িয়া ও শ্যামগঞ্জ কুঠি ছিল। ৪,১৮৫ বিঘায় ২৩৪/ মণ নীল পাওয়া যাইত। বিদ্রোহের কিছু দিন পরে ইহা বন্ধ হয়। সপিয়ান (Saupian) ও পরে ব্রে (W. Brae) সাহেব কর্ত্তা ছিলেন। ব্রে সাহেব বড় অত্যাচারী ; মাগুরায় তাঁহার পুত্রের সমাধি আছে। বাবুখালিতে মধুমতীকূলে সাহেবদিগের যে সুন্দর বাড়ী ছিল, তেমন জাঁকজমকের বাড়ী তখন আর যশোহরে ছিল না।[২]

১০ শ্রীকোল-নহাটা কান্সরণ্॥ এই কান্সরণেরও

১ Westland, *Jessore*, p. 148 ; John and Robert Savi দুই ভ্রাতা ছিলেন।

২ 'The house still standing on the bank of the Madhumati is the most magnificent house in the District'.—*Ibid.*, p. 211. ব্রে সাহেবের নিকট হইতে এই বাড়ী উকিল প্যারীমোহন গুহ খরিদ করেন। কয়েক বৎসর হইল (১৯০৬) মহম্মদ হাদিক্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক ঐ বাটী ও সংলগ্ন ১৬৪ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন।

মালিক ছিলেন সপিয়ান সাহেব। নহাটা, আমলসার প্রভৃতি কুঠি ছিল।

১১ শ্রীখণ্ডী, হরিপুর ও নিশ্চিন্তপুর কান্‌সরণ্‌॥ এ কয়েকটি কারবারের মালিক ছিলেন নড়াইলের বাবুরা। তিন স্থানেই কুঠি ছিল। সর্ব্বসমেত ২,৭১০ বিঘায় ১১৫৲ মণ নীল হইত।

১২ রামনগর কান্‌সরণ্‌॥ ইহার মধ্যে রামনগর (কৃষ্ণপুর), মাগুরা, ধনেখালিতে কুঠি ছিল। ৫,৪৮৫ বিঘায় ১৪০৲ মণ নীল উৎপন্ন হইত। টমাস্ ওমান (T. Oman) সাহেব ইহার মালিক। এখনও বরই ও রামনগরে কুঠিবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। বরই কুঠি আবাইপুরের শীকদারদিগের নিকট বিক্রীত হয়।

১৩ মদনধারী কান্‌সরণ্‌॥ এই কারবারের মালিক পাউরাণ (J. E. and R. S. Powran) সাহেবগণ। ৩,০০০ বিঘা নীলের চাষে ১৮৭॥ মণ উৎপন্ন। ইহা পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কালীপ্রসন্ন সরকার খরিদ করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রধান কারবার ব্যতীত দেশীয় জমিদার তালুকদারগণ নানাস্থানে বহু কুঠি স্থাপন করিয়া নীলের ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন। অনেক চতুর লোক সাহেবদের কতকগুলি কুঠির মুৎসুদ্দি বা প্রধান কার্য্যকারক হইয়া বহু টাকা উপার্জ্জন করিতেন। ঝিনাইদহের মধ্যে মথুরাপুরের বক্সী, পবহাটির মজুমদার, ভগবান নগরের রায়, নলডাঙ্গার রাজা, সাধুহাটির আচার্য্য এবং মাগুরার মধ্যে তালখড়ির ভট্টাচার্য্য ও নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। মাগুরায় নান্দোয়ালী, শিবরামপুর, ছাঁদড়া, সুরসেনা (সরগুণা), কাশীনাথপুর, সিংহেশ্বর ও বামুনখালি প্রভৃতি স্থানে কুঠির পরিচয় পাওয়া যায়। নড়াইলে লক্ষ্মীপাশা, কালীগঞ্জ, সিঙ্গা গোবরা, দিঘলিয়া, শালনগর প্রভৃতি স্থানে কুঠি ছিল। নড়াইল ও হাটবাড়িয়ার জমিদারগণ অনেক কুঠির মালিক ছিলেন। ভৈরব কূলে মধ্যপুরে ও দেয়াপাড়ার সন্নিকটে, শ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্দ্র বসুর কুঠি ছিল। যশোহর সদর মহকুমায় ভাটপাড়ায় নলডাঙ্গা রাজগণের, খাল্‌কুলায় তথাকার মিত্রগণের, নারিকেলবাড়িয়ার সাধুখাঁদিগের এবং তেলকুপি জগন্নাথপুর

প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে কুঠি ছিল। খুল্‌নার মধ্যে সিকিরহাট, দৌলতপুর ও খালিসপুরে সাহেবদিগের এবং নেহালপুরে ও বিরাটে শ্রীরামপুরের ঘোষদিগের নীলকুঠি বহুকাল চলিয়াছিল।[১]

সমগ্র যশোহর জেলার উৎপন্ন নীলের হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৮৪৯-৫০ অব্দেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয়, উহার পরিমাণ ১৬,৮১৮ মণ। আকস্মিক বন্যাদির জন্য ১৮৫৫-৫৬ অব্দে নীলের পরিমাণ কমিয়া ৬,৫৮৫ মণ মাত্র হয়। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের গড় ধরিলে প্রতিবৎসর ১০,৭৯১ মণ উৎপন্ন হইত। ১৮৫০ অব্দকেই বঙ্গীয় নীল ব্যবসায়ের উচ্চ সীমা বলা যায়। ১৮৬০ অব্দের পর হইতে উহার ক্রমে অবনতি হইতে হইতে ৩০ বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ পতন হয়। সে পতনের কারণ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে আমরা নীলের চাষের ও প্রস্তুত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া লইব।

নীলের চাষের 'নিজ' ও 'রাইয়তী' নামে দুইটি প্রণালী ছিল; প্রথম, কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির নিজ জমিতে নিজের তত্ত্বাবধানে ভৃত্য বা মজুর দ্বারা যে চাষ, তাহার নাম 'নিজ আবাদি' বা খামার; আর দ্বিতীয়, অগ্রিম টাকা দাদন বা গছানি দিয়া রাইয়তদিগের দ্বারা তাঁহাদের জমিতে নীল উৎপাদন করাইয়া লওয়া হইত, ইহার নাম রাইয়তী বা দাদন-পদ্ধতি। রাইয়তদিগকে খাতার হিসাব ভুক্ত হইতে হইত বলিয়া ইহাকে 'খাতা-পদ্ধতি'ও বলে। রাইয়তেরা দাদন লইয়া নীল বুনিতে চুক্তি করিতেন। রাইয়তী চাষও দুইপ্রকার ছিল; নীলকরের নিজ জমিতে চাষ হইলে ইহাকে এলেকা কহিত এবং অপরের জমিতে হইলে উহার নাম ছিল বে-এলেকা চাষ। চুক্তি পত্র প্রায়ই একবৎসরের জন্য হইত। কোন কোন স্থলে তিন, পাঁচ বা দশবৎসরের জন্যও হইতে দেখা গিয়াছে। রাইয়তী চাষে রাইয়তেরা নিজ ব্যয়ে গাছ কাটিয়া বান্ধিয়া গাড়ী বা নৌকাযোগে কুঠিতে পাঠাইতেন। কুঠি হইতে পৌছাইবার খরচটা দেওয়া হইত। কুঠির যে অংশে নীল গাছ জমা হইত, উহার নাম নীলখোলা। তথায়

---

১ তখনকার যশোহরে মাগুরা ও ঝিনাইদহে অধিক নীলের চাষ ছিল, তাহা বলিয়াছি। ঐ দুই মহকুমার ৬৭ কুঠিতে ৭৬,০০০ বিঘা চাষে ৪,১০০/ মণ নীল উৎপন্ন হইত। নড়াইল মহকুমায় বার্ষিক ১৯,৮৭৬ বিঘায় ৪৯৩/ মণ, যশোহর ও খুল্‌না মহকুমায় ৫,৩৭৫ বিঘায় ৮৭/ মণ ৩৪ সের নীল হইত। বাগেরহাটে ৯৫২ বিঘার চাষ ছিল বটে, কিন্তু উহার গাছগুলি ফরিদপুরে নীত হইত।—Sen, Ram Sanker, *Report* p. 16.

পৌঁছিলে 'নিজ' আবাদী নীলের মাপ হইত না। ওজনদারেরা রাইয়তের নীল ছয় ফুট দীর্ঘ শিকল দ্বারা মাপ করিয়া কয় বোঝা বা বাণ্ডিল হইল, তাহা সেই রাইয়তের নামে হিসাব ভুক্ত করিয়া দিতেন।

প্রত্যেক কারখানায় উচ্চ ও নিম্ন দুই থাকে দুইসারি কুণ্ড বা চৌবাচ্চা (Vat বা হৌজ) থাকিত। প্রত্যেক হৌজ বা চৌবাচ্চার পরিমাণ ২১´×২১´ ×১½´ ফুট। এক এক সারিতে ১২টি হইতে ১৫টি থাকিত। নীলগাছ হইতে রঙ্গ প্রস্তুত করা কার্য্য দুই প্রকারে হইতে পারিত: কাঁচা গাছ কাটিবা-মাত্র পচাইয়া, অথবা উহার শুষ্কপাতা জলে ভিজাইয়া।[১] গাছ শুকাইয়া রাখিতে পারিলে সময়মত কার্য্য করিবার অধিকতর সুবিধা হয়। কিন্তু যশোহরে যখন জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে গাছ কাটা হইত, তখন রাশি রাশি গাছ শুকাইয়া রাখা যাইত না। এজন্য কাঁচা গাছ হইতেই কাজ হইত; এখানে উহারই বর্ণনা করিতেছি। কাঁচা নীলও অন্য শস্যের মত গাদা করিয়া রাখিলে পচিয়া নষ্ট হইত, এজন্য ব্যস্ততার সঙ্গে কার্য্য চালাইবার জন্য চৌবাচ্চার সংখ্যা বেশী লাগিত। নীল খোলা হৌজের দিকে ক্রমোচ্চ; ওজন হইবামাত্র সাধারণতঃ মেয়ে কুলিরা নীলের বোঝা মাথায় করিয়া উপরের থাকের হৌজে ফেলিয়া দিতেন। সাধারণতঃ ১০০ বাণ্ডিলে একটি হৌজ পূর্ণ হইত। তদনন্তর উহার উপর এক ফুট অন্তর এড়োভাবে বাঁশ পাতিয়া তাহার উপর দুই পার্শ্বে দুইখানি ভারী কাঠ বিছাইয়া কতকগুলি লোকে উহার উপর উঠিয়া চাপ দিতেন, তাহাতে নীল বসিয়া যাইত।

নীল পচাইবার জন্য পরিষ্কার জলের প্রয়োজন। এজন্য নীলকুঠিগুলি প্রায়ই সুপেয়-সলিলা নদীর তীরে অবস্থিত হইত। নদী হইতে 'চীনা' কলে জল তুলিবার ব্যবস্থা থাকিত। এই প্রণালীতে অল্প সময়ে অধিক জল উত্তোলন করিয়া নদীর ধারে একটি উচ্চ বৃহৎ চৌবাচ্চায় সঞ্চিত হইত। সেখান হইতে একটি পয়ঃপ্রণালী দ্বারা হৌজের মধ্যে জল আসিত। হৌজ ছাপাইয়া জল দিলে ১০।১২ ঘণ্টায় নীল পচিয়া যাইত; তখন প্রত্যেক হৌজের নলের মুখ খুলিয়া দিলে দুর্গন্ধ হরিদ্রাভ জল নিম্নবর্ত্তী চৌবাচ্চাগুলিতে আসিত। তখন উপরের হৌজের 'সিটি' অর্থাৎ গাছগুলি মেয়ে কুলিরা তুলিয়া লইয়া গাদা করিয়া

---

১ Ure, *Dictionary of Arts and Manufactures*; Hunter, *Nadiya*, p. 98.

রাখিতেন এবং তিনমাস পরে উহা শুকাইলে জ্বাল-ঘরের জ্বালানি বা ক্ষেত্রের সার হইত। নীলজলপূর্ণ নিম্ন হৌজের প্রত্যেকটিতে ১০জন কুলি দুই সারিতে দাঁড়াইয়া পাঁচফুট দীর্ঘ এক একখানি বাঁশের বৈঠা দিয়া দুই ঘণ্টাকাল চীৎকার বা গান করিতে করিতে নীলজলে অবিরত সরিয়া সরিয়া পিটাপিটি করিতেন। রঙ্গের উপাদান জল হইতে পৃথক্ করিবার জন্য এই প্রণালী অবলম্বিত হইত। রঙ্গ-মিস্ত্রী পরীক্ষা করিয়া বলিলে পিটাপিটি বন্ধ হইত, তখন দুইঘণ্টাকাল নীল জল থিতাইতে দেওয়া হইত। পরে ঐ সকল হৌজের নিম্নাসারির নলগুলি খুলিয়া দিলে ঈষৎ রঙ্গিন জল একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়া নদীতে গিয়া পড়িত এবং হৌজের নিম্নভাগে ৪ অঙ্গুলি প্রমাণ গাঢ় নীলরঙ্ সঞ্চিত থাকিত। উহা একটি নল দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জ্বাল-ঘরে গিয়া দুইঘণ্টা কাল উত্তপ্ত হইত। পরে নলের মুখে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া একটি প্রশস্ত পাটাতনের উপর সমস্তদিন ধরিয়া বস্ত্রাবৃত অবস্থায় চাপ-যন্ত্রের নিম্নে দিয়া চাপিয়া লওয়া হইত ; পরে একটি খোপ-ওয়ালা বাক্সের মধ্যে চাপিয়া খণ্ড খণ্ড চৌকা প্রস্তুত হইত, সেই চৌকাগুলিকে লম্বা ও এড়োভাবে কাটিয়া ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত করা হয়। উহারই উপর কুঠির নামের ছাপ দিয়া লইলেই বিদেশে রপ্তানি করার মত নীল প্রস্তুত হইল।[১]

বৎসরের মধ্যে দুইবার নীলের চাষ হইত। প্রথম, হৈমন্তিক চাষ ; বর্ষান্তে বন্যার জল সরিয়া গেলে পলিযুক্ত নদীর চরে বিনাচাষে, অথবা ডাঙ্গা জমি ও ভিট্টাবাড়ীতে চাষ করিয়া, নীলের বীজ বুনিয়া দেওয়া হইত ; পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠমাসে অর্থাৎ বন্যায় চরভূমি ডুবিয়া যাইবার পূর্ব্বে নীলগাছ কাটিয়া লওয়া হইত। দ্বিতীয়, বাসন্তী চাষ ; অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র মাসে বর্ষা হইয়া জমিতে 'যো' হইলে, যে সময় আউস ধানের চাষ হয়, সেই সময় জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া মই দিয়া নীলের বীজ বপন করা হইত ; এবং গাছ ৪।৫ ফুট লম্বা হইলে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গাছ কাটিয়া লইত। যশোহর জেলায় উচ্চ জমিই বেশী, চর-ভাগ অধিক নহে বলিয়া দ্বিতীয় প্রকারেই অধিক নীল উৎপন্ন হইত। কিন্তু কৃষকেরা আউস ধান ফেলিয়া এই চাষ সহজে করিতে চাহিতেন না বলিয়া কুঠির লোকদিগকে এজন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইত।[২]

---

১ Summarised from '*Rural Life in Bengal*', 1860. Letter No. viii, pp. 114-36.

২ Hunter, *Jessore*, p. 252.

'নিজ আবাদী' চাষ ও কারখানার যাবতীয় কার্য্যের জন্য বহুসংখ্যক দৈনিক মজুর বা কুলির দরকার হইত। ছোট কারখানায় হয়ত স্থানীয় লোকের মজুরীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে; কিন্তু বড় বড় কুঠিতে তাহাতে চলিত না। মোল্লাহাটিতে ৬০০ কুলিতে কাজ করিতেন। এজন্য নীলকর সাহেবেরা মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকুলি, অথবা বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম ও সিংহভূম প্রভৃতি স্থান হইতে সাঁওতাল জাতীয় 'জঙ্গলী' বা 'বুনা কুলি' সংগ্রহ করিতেন। সকলকেই বাড়ীতে কিছু কিছু টাকা দাদন দিয়া আনিতে হইত; এদেশে আসিয়া মেদিনীপুরের কুলিরা ৪৲, বুনা কুলিরা ৩৲, স্ত্রীলোক ও বালকেরা ২৲ হিসাবে বেতন পাইতেন। এই সকল বুনা কুলি অধিকাংশই স্ত্রীপরিবাব সঙ্গে আনিয়া কুঠির পাশে অল্পকরের জমি পাইয়া বাস করিতেন। তদবধি তাঁহারা নিজেদের সমাজ গঠন করিয়া এদেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। যশোহর-খুল্‌নার যেখানে যেখানে বড় কুঠি ছিল, সেখানেই তাঁহাদের বাস হইয়াছিল। এখন কুঠি নাই বটে, কিন্তু বুনাদের বাস দেখিয়া তৎসান্নিধ্যে কুঠির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন বুনাগণ দিন মজুরী ও মুটিয়ার কাজে জীবিকা অর্জ্জন করেন। তাঁহারা রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি যাবতীয় মাটির কার্য্যে বড় মজবুত।

প্রতি বিঘায় নীলচাষের জন্য খরচ ছিল: খাজনা ৷৵০, বীজ ।০, চাষ ১৲, বুনন ।০, নিংড়ান বা পরিষ্কার করা ॥০, গাছকাটা ।০, দাদনের একরার-নামার জন্য ষ্ট্যাম্প ৵০—সমষ্টি ৩৲; প্রতি বিঘায় ৮ হইতে ১২ বাণ্ডিল নীল হইত, উৎপন্ন ৮ বাণ্ডিল ধবিয়া এবং উচ্চ দর টাকায় ৪ বাণ্ডিল হিসাবে ধরিলে,[১] নীলের আয় ২৲, উৎপন্ন একমণ বীজের মূল্য ৪৲—মোট ৬৲ টাকা। ইহা হইতে চাষের খরচ ৩৲ ও দাদন ২৲ বাদ দিলে কৃষকের প্রাপ্য হইত মাত্র ১৲ টাকা।[২] আর উৎপন্ন নীল ১২ বাণ্ডিল ধরিলে আয় ২৲ টাকা দাঁড়াইত। কিন্তু দৈব কারণে ভাল নীল না জন্মিলে হয়ত দাদনের টাকাও শোধ হইত না। গ্যাষ্ট্রেল

১ ১৮৪০ অব্দে হিলস্ সাহেবই সর্ব্ব প্রথম নীলের দর টাকায় ১০ বাণ্ডিল স্থলে ৪ বাণ্ডিল করেন। এই হিলস্ (Hills) সাহেব Hills White & Co. এর প্রধান অংশীদার।—Indigo Com. Report, p. 23.

২ Deposition of R. P. Page, Manager of Katgorah & Khalbolia Concerns.—*Ibid.*, p. 48.

সাহেব প্রজার নীলের আয় মাত্র চারি আনা ধরিয়াছেন।[১] সাধারণতঃ যে কৃষক শুধু নীলের উপর নির্ভর করিতেন, তাঁহার লোকসানই হইত।[২] "রাইয়তের ভাগ্যে পাওয়া প্রায়ই ঘটিত না এবং বকেয়া বাকী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। এই জন্যই কুঠির তাগিদ্‌গীর বলিয়াছিল, 'নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, একবার লাগলে আর ওঠে না'।"[৩] লারমুর সাহেবের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, ১৮৫৮-৫৯ অব্দে তাঁহার অধীন বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির কুঠিসকলে ৩৩,২০০ লোক চাষ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২,৪৪৮ জন মাত্র দাদনের অতিরিক্ত কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, বাকী ৩০,৭৫২ জনের দাদনের হিসাবই শোধ হয় নাই। সব কুঠিরই প্রায় একদশা।

কাজেই নীলের চাষ প্রজার পক্ষে লাভজনক ছিল না। তাহারা প্রারম্ভে ইহা বুঝেন নাই। প্রথমতঃ, দেশীয় প্রজারা স্বল্পায়াসলভ্য শস্য-বাহুল্যে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা তখনও পয়সার মুখ চোখে দেখেন নাই। এজন্য নীল-দাদনের নগদ পয়সা তাঁহাদের চোখ ধাঁধিয়া দিয়াছিল। তাঁহারা ভালমন্দ বিচার না করিয়া নীলের চাষ করিতে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক খুল্‌নায় যেমন পতিত জমি কম এবং অধিকাংশ চাষের জমিতে প্রচুর ধান্য জন্মে, যশোহরের অবস্থা তাহা নহে। তথাকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ধান্য কম হয়, সরিষা কলাই প্রভৃতি প্রচুর ফলিলেও পতিত জমি যথেষ্ট ছিল। উহাতে নীলের চাষ দ্বারা দু'পয়সা পাইয়া একটু হাল চা'ল বদলাইবার আশা অনেকেই করিয়াছিলেন। হাল চা'ল যে কিছু বদলাইয়াছিল, তাহাও সত্য। প্রথম আমলে অধিকাংশ নীলকর সাহেবই নিজের মঙ্গল বুঝিতেন, প্রজার সহিত সম্প্রীতি ব্যতীত যে ব্যবসায়ের উন্নতি নাই, তাহা বুঝিয়া প্রজার মঙ্গলের দিকে

১ Gastrell, *Statistical Report*, p. 13.

২ কৃষকের লোকসান হইত বটে, কিন্তু কুঠির যথেষ্ট লাভ ছিল। ১০০০ বাণ্ডিল নীলের গাছে ৬/ মণ নীল হইত, বিঘায় ৯ বাণ্ডিল গাছ ধরিলে নীলের পরিমাণ হয় দুইসের। সাহেবদিগের কারখানার উৎকৃষ্ট নীলের প্রতিমণের মূল্য ছিল ২৩০৲ টাকা এবং দেশীয় কারখানার সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর নীল প্রতিমণ ১০৯৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইত। উচ্চ দর ধরিলে প্রতি বিঘায় ১১৷৹ টাকার নীল জন্মিত, উহার জন্য ৩৲ খরচ এবং বিনা সুদে টাকা দাদন দিতে হইত। সুতরাং সরঞ্জাম খরচ বাদেও কুঠিয়াল সাহেবদের লভ্যাংশ যথেষ্ট থাকিত।

৩ 'নীলদর্পণ', কর-মজুমদার, ৪৮-৯ পৃ।

চাহিতেন। তখনও দুইচারিজন অত্যাচারী থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশের সদ্ব্যবহারে কুঠির সন্নিকটস্থ প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছু বাড়িয়াছিল বলিয়াই ধরিতে পারি। রাজা রামমোহন রায় লর্ড বেণ্টিঙ্কের ইচ্ছাক্রমে যখন পাশ্চাত্য-দিগের ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁহার নীলকর সম্বন্ধীয় মন্তব্য হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] ঝিঙ্গারগাছার মেকেঞ্জি ও সিন্দুরিয়ার সেরিফ সাহেবের সদাশয়তার গল্প শুনা যায়।

নীলকরের নিকট গবর্ণমেণ্টেরও কিছু আশা করিবার ছিল। দস্যুর অত্যাচার ও প্রজা বিদ্রোহ হইতে শান্তিরক্ষা করিতে তাঁহারা পারিতেন; অনভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারীর অবিচার, অকর্ম্মণ্যতা ও চরিত্রদোষের সন্ধান তাঁহারা দিতেন।[২] কিন্তু ব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভে তাঁহাদের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছিল। তাঁহারা রাজার হালে বাস করিতেন।[৩] নিজেকে রাজার জাতি মনে করিয়া প্রজাকে ঘৃণা করিতেন। হাতে হাতে উহার পরিচয়-ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, কুঠিয়াল্ সাহেব

১ 'I found the native residing in the neighbourhood of Indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be more partial injury done by the Indigo planters, but on the whole they have performed more good to the generations of natives of this country than any other class of Europeans.'—Cal. Rev., 1860, p. 24.

২ Indigo Com. Report, p. 21.

৩ মোল্লাহাটিতে ফরলং ও লারমুর সাহেবের সময় রাজার মত বাড়ী ছিল, উহার ছবি দিলাম। জনৈক চিত্র-শিল্পী গ্রাণ্ট সাহেব *'Rural Life in Bengal'* গ্রন্থে মোল্লাহাটির বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। প্রাচীর বেষ্টিত হাতার (কমপাউণ্ড) মধ্যে প্রকাণ্ড বাবুর্চ্চিখানা, আস্তাবল, পক্ষিশালা, স্কুল, হাসপাতাল, ফলের বাগান, লোকজনের বাড়ী ছিল। হাতার বাহিরে বাওড়ের ধারে আবদ্ধ উদ্যানে হরিণ চরিত। এখনও কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে ফরলং-পত্নীর সমাধিস্তম্ভটি উল্লেখ-যোগ্য। বাবুখালি কুঠির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নহাটা কুঠিবাড়ি নলডাঙ্গার রাজার রাজপ্রাসাদ হইয়াছে; হাজরাপুরের বাড়ী ব্যারিষ্টার সাহেবের আবাস বাটী হইয়াছে। নিশ্চিন্তপুরের কুঠীতে ৭০টি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। চৌগাছার দোতলায় এখনও বাস করা যায়। অনেকে গ্রাম্য রাস্তা পাকা করিয়া ঘোড়ার গাড়ী চালাইতেন। মরেল সাহেবেরা চারিঘোড়ার গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিতেন। কৃষকের গানে আছে: 'বজরা চলে এলো মেলো ডিঙ্গা চলে সাথে, দেবী (Davies) সাহেবের নীল ঘোড়া চলে ভাঙ্গা পথে।'

বিচারকের পার্শ্বের চেয়ার পাইতেন, দেশীয় জমিদার বা প্রজা কাঠগড়ায় খাড়া থাকিতেন। সাহেব বিচারক কুঠিয়ালের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেন এবং আফিসান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণের আদান প্রদান হইত। সুতরাং বিজিত দেশের জমিদার বা রাইয়ত উভয়ই নিজ অবস্থা বুঝিতেন। জমিদার নিজের তালুক মলুক নীলকরকে ইজারা পত্তনী দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, রাইয়তেরা লোকসানের সম্ভাবনা জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন। নীলকুঠি অপেক্ষা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার-গৃহ দূরে অবস্থিত, অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে পৌছিতে পারিলেও বিচারের দুর্গতি আশঙ্কার বিষয় ছিল। ক্রমে অবস্থাটা যখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন, তখন গর্ব্বস্ফীত নীলকরেরা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইলেন।

১৮১০ হইতে নীলকরদিগের অত্যাচারের বার্ত্তা শুনা যায়। ঐ বৎসর ৪ জন নীলকরের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হয় এবং অন্য সকলে যাহাতে রাইয়তের উপর কোন মারপিট বা অত্যাচার না করে তজ্জন্য হুকুম জারি হয়। কিন্তু তবুও অত্যাচার থামে না। প্রজাকে জোর করিয়া দাদন দিবার যে অভ্যাস ১৮১০ অব্দে ছিল, তাহা ১৮৫৯ অব্দেও যায় নাই।[১] প্রথমে নীলকরেরা আত্মকলহ করিতেন, শেষে কলিকাতায় তাঁহাদের সমিতি (Indigo Planters' Association) গঠিত হইলে সে বিবাদ থামিল, কিন্তু উঁহারা তালুকাদির মালিক হওয়ার পর রাইয়তের উপর অত্যাচার বাড়িল। তাহার ফলে খৃষ্টধর্ম্মে জাতি যাওয়ার ভয়ের মত, নীলকেও প্রজারা শত্রু মনে করিল। কথা উঠিল 'জমির শত্রু নীল, কাজের শত্রু ঢিল (আলস্য), আর জাতির শত্রু পাদ্‌রী হীল।'[২]

তখন হইতে প্রজারা নীলকরের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আনিতেন, সাহেবেরাও চুক্তিভঙ্গের আপত্তি করিতেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট গোলমাল মিটাইবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ১৮৩০ অব্দে এক আইন (Regulation V of 1830) পাশ হইল, তদ্দ্বারা চুক্তিভঙ্গের জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমা হইত ; পাঁচ বৎসর পরে বেণ্টিঙ্ক এ আইন তুলিয়া দিলেন। লর্ড

১ Buckland, *Bengal under Lieutenant Governors*, Vol. I, p. 241—*Minute of Sir J. P. Grant.*

২ Rev. Hill নিজের সাক্ষ্যেই এই প্রবচনের কথা উল্লেখ করেন।—Ind. Com. Report, 1860—*Answer No. 1693.*

মেকলের মতে দেওয়ানী আদালতেই চুক্তিভঙ্গ মামলা হওয়া স্থির হইল। মহামান্য হ্যালিডে যখন বাঙ্গালার প্রথম ছোট লাট হন, তখন তিনি এ সব বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করিতেন না; এমন কি, তিনি নীল-প্রধান জেলায় নীলকর সাহেবকে সহকারী অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে লাগিলেন (১৮৫৯)। সাধারণ লোকে ভাবিল বুঝি গবর্ণমেণ্টই নীলের অংশীদার। নীলকরেরা এই সুযোগ ধরিয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইলেন। উহা হইতে কিরূপে নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তাহাই এখন বলিব।

নীলের চাষে লাভ নাই, তাহা প্রজারা বুঝিলেন। তখন হইতে তাঁহারা নীল চাষ না করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিতেন। কুঠিয়াল সাহেবেরা নানাভাবে ভয় দেখাইয়া মারিয়া ধরিয়া অত্যাচার করিয়া তাঁহাদিগকে নীলবুননে বাধ্য করিতেন। এবং সাদা কাগজে একবার-নামা লেখাইয়া লইতেন।[১] সব সাহেব একরূপ ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে আদর্শ ইংরাজ-চরিত্রের লোকও ছিলেন। আমরা এখানে শুধু অত্যাচারীর কথাই বলিতেছি। এই অত্যাচার যে কত প্রকারের ছিল, তাহা বলিবার নহে। রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়া উপড়াইয়া তাহাতে নীলের ক্ষেত করা হইত; পলায়িত প্রজার ঘর ভাঙ্গিয়া ভিট্টার উপর নীলের চাষ করা হইত; এমন কি ঘর জ্বালাইয়া দিয়া উৎপাত করিয়া অবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। অনেক সময়ে কুঠির লোকেরা বিদ্রোহী প্রজার ঘটিবাটি গরু-বাছুর ধরিয়া আনিত; একবার বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট মহামান্য ইডেন সাহেব একটি কুঠি হইতে ২।৩ শত আবদ্ধ গরু খালাস করিয়া আনিয়াছিলেন,[২] কিন্তু নীলকরের ভয় এত বেশী ছিল যে, কয়েকদিন মধ্যে লোকে নিজের গরু লইতে আসিতেও সাহসী হইতেছিলেন না। কুঠিতে কুঠিতে কয়েদ ঘর ছিল; চুক্তি

১ একজন সহৃদয় ইংরাজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : 'The cold, hard and sordid, who can plough up grain-fields, kidnap recusant ryots, confine them in dark holes, beat and starve them into submission, which things have sometimes been done, can give no moral guarantee of his incapability of filling up a blank bond and turning it to his pecuniary profit. —Cal. Rev., Vol. 36. p. 40.

২ ইহাও লারমুর সাহেবের কীর্ত্তি।—*Answer No. 3576*—Indigo Com. Report, 1860.

ভঙ্গ করিলে রাইয়তদিগকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া নানা নবোদ্ভাবিত কৌশলে পীড়ন করিবার পর, কয়েদ করিয়া রাখা হইত। যশোহরের এক কুঠিতে গিয়া এক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং কয়েদ হইতে কতকগুলি লোককে খালাস করিয়া দিয়া কুঠির লোকদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন।[১] কয়েদকরা লোকদিগের যাহাতে সন্ধান না মিলে, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নানা কুঠিতে ঘুরাইয়া লইত। এজন্য নীলকরেরা 'চৌদ্দ কুঠির জল খাওয়াইবার' ভয় দেখাইত।[২] কোন কোন হত-ভাগ্য আবদ্ধের যে একেবারেই সন্ধান হইত না, তাহাও ছোটলাট সাহেব বিশ্বাস করিয়াছিলেন।[৩] মোল্লাহাটির 'লালমোন' (Larmour) সাহেবের আরও এক নূতন কীর্ত্তি ছিল; তাহার কুঠিতে রাইয়তদিগকে প্রহার করিবার জন্য আরও যে এক প্রকার নূতন লগুড় তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার নাম 'রামকান্ত' বা 'শ্যামচাঁদ'। এই শ্যামচাঁদের আঘাতে রাইয়তেরা জর্জ্জরিত হইতেন। কুঠির লোকেরা প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, চুক্তিভঙ্গের শাস্তির জন্য সরকার হইতে এক 'মুগুরের আইন' পাশ হইতেছে, চুক্তিমত নীল না বুনিলে মুগুরের ঘা সহ্য করিতে হইবে।[৪] এই মুগুরের আইন ও শ্যামচাঁদের ভয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র রাইয়তেরা থরহরি কম্পবান হইতেন। নীল বুনিতে না চাহিলে ক্রোধান্ধ কুঠিয়ালেরা গুলি করিয়া খুন করিত, গ্রামকে গ্রাম উজাড় উৎসন্ন করিয়া দিত। এই জন্যই কথা উঠিয়াছিল : 'মনুষ্যরক্তে কলঙ্কিত না হইয়া কোন নীলের বাক্স ইংলণ্ডে যাইত না।'[৫] ইহার উপর আরও ছিল; ভারতীয় প্রজা সব সহ্য করেন, স্ত্রীকন্যার সম্ভ্রমহানি সহ্য করেন না। নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে এমনও দুর্ব্বৃত্ত ছিল, যাহারা জোর করিয়া কৃষককন্যাদিগকে ধরিয়া লইয়া

১ Buckland, *Bengal under Lieutenant Governors*, Vol. I., pp. 245-6.

২ 'এ কান্সারণে আর কত কুঠী আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দকুঠির জল খেলেন'··· ইত্যাদি। 'নীলদর্পণ' : কর-মজুমদার, ৩৬ পৃ।

৩ Buckland, Vol. I, p. 253—*Sir P. Grant's Minute*, para 43.

৪ 'নীলদর্পণ', কর-মজুমদার, ২৬৯ পৃ—ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিত প্রবন্ধ 'পূর্ব্বকথা'।

৫ Indigo Com. Report, *Answer* 3918, *Evidence of* Mr. E. De *Latour*, *Magistrate of Faridpur*; Chakladar, (article) '*Fifty years ago*.' ['নীলদর্পণ', কর-মজুমদার, ১৩২৮, ১৪৯ পৃ দ্র.—শি মি]

কুঠিতে আনিয়া অপমান করিত।[১] এই সব অত্যাচারের ফলে অবশেষে আগুন জলিয়া উঠিল। বিশ বৎসর ধরিয়া অসহায় প্রজাকুল নীলের চাষ করিবে না বলিয়া নানা চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু নীলকরদিগের ছল বল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এইবার যখন লারমূর প্রভৃতির অত্যাচার চরমে পৌছিল, সহৃদয় ইডেন সাহেবের পরওয়ানায় যখন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, নীলের চাষ করা না করা রাইয়তের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, তখন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, 'প্রাণ থাকিতে তাহারা আর নীল বপন করিবে না'।[২] সম্মিলিত প্রজাশক্তির এই কঠোর প্রতিজ্ঞা কেহ ভঙ্গ করিতে পারিল না। ১৮৫৮ অব্দে দেশময় নীল-বিদ্রোহ দেখা দিল।

এই সময়ে মান্যবর ইডেন সাহেব (The Hon'ble Ashley Eden) বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন সহৃদয়, স্বাধীনচেতা ও উচ্চমনা কর্ম্মচারী ; এই গুণেই তিনি পরে বঙ্গেশ্বর হইয়াছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে নীলকর সাহেবদিগের গোলমালের সূচনা দেখিয়াই স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, প্রজাই জমির মালিক, নীলকরেরা নহে। প্রজার জমি জোর দখল করিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। নীলকরেরা যেখানে আইন অমান্য করিয়া সেরূপ

১ বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে কমিশন এ অভিযোগ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এ দেশীয় প্রজা মান ইজ্জতের ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। চরিত্রহীন কুঠীয়ালেরা নিম্নতম শ্রেণী হইতে যে স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিত, তাহার প্রমাণাভব ছিল না। যেখানে গৃহস্থ-রমণীর উপর বলপ্রয়োগ করিত, সেখানেই গোলযোগ ঘটিত। জাতিপাতের ভয়ে প্রজারা কেহ প্রকাশ্য অভিযোগ বা সাক্ষ্য দিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের মর্ম্মব্যথা হইতে বিদ্রোহ-বহ্নির সৃষ্টি করিয়াছিল। Rev. J. Long সাহেব 'Harkaru' পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'The violation of their daughters will teach ryots how they complain of the Indigo Shaheb' কাচিকাটা কুঠির হিলস্ (Archibald Hills) সাহেব হরমণি নামে এক সুন্দরী কৃষক কন্যাকে বলপূর্ব্বক কুঠিতে আনিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইহা প্রকাশিত হয়। 'The story was told by Rev. C. Bomwetsch before the Indigo Commission. The Magistrate (Herschel) said in his reply that the abduction seemed very clearly proved.' এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' রোগ্ সাহেবের পাশবিক অত্যাচার কল্পিত হইয়াছিল।

২ রাইয়তের কঠোর প্রতিজ্ঞার আভাস কমিশনের বহু কৃষক সাক্ষীর মুখে শুনা যায়।



ফাদার লঙ



দীনবন্ধু মিত্র



নীল গাছ



মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

করিবে, ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সেখানে প্রজার স্বত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য। ছোটলাটও এই মতের পরিপোষক হইলেন। সৌভাগ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য গ্রহণের সঙ্গে এদেশীয় শাসন-বিভাগে এক নবযুগের অবতারণা হইয়াছিল। বাংলার সৌভাগ্যফলে প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ট মহোদয় (Sir J. P. Grant) তখন বঙ্গের মসনদে উপবিষ্ট এবং দয়ার সাগর লর্ড ক্যানিং ভারতের রাজপ্রতিনিধি। কমিশনার সাহেব ইডেনের মত-বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কি হয়, ছোটলাট গ্রাণ্ট সে মতের অনুমোদন করিলেন এবং ক্যানিং গ্রাণ্টের সহিত একমত হইলেন। বাস্তবিকই এই ক্যানিং-গ্রাণ্ট-ইডেনের আবির্ভাবের ফলে নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়াছিল। এজন্য বঙ্গবাসীরা এই ত্রিমূর্ত্তির নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

১৮৫৯, ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইডেন সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় এক রোবকারী রচনা করিয়া সাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে, 'নীলের জন্য চুক্তি করা বা না করা প্রজাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।' নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সহৃদয় হর্শেল (W. J. Herschel) সাহেব তাঁহার পন্থানুসরণ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের সম্মতি মত প্রজাদিগকে এই রোবকারীর নকল দিবার ব্যবস্থা হইল। প্রজারা উহাই চাহিতেছিলেন; এখন শতশত লোকে নকল লইয়া উহার প্রকৃত মর্ম্ম সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে বলভরসা দিয়া উদ্রিক্ত করিবার লোকের অভাব হইল না। তখন প্রজারা 'যোট' বান্ধিয়া নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দিলেন। যশোহরের অন্তর্গত কাঠগড়া কান্‌সারণের মধ্যেই এই চাষ বন্ধ করিবার ব্যাপার প্রথম আরম্ভ হয়। এই সঙ্গে নীল-বিদ্রোহের প্রকৃত কারণগুলি গণনা করিতে পারা যায়:

১ নীলের চাষ লাভজনক নহে বলিয়া প্রজার অনিচ্ছা।

২ ড্যালহৌসির শাসনকালে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হইলেও নীলকরেরা প্রজাদিগের নীলের লভ্য বাড়াইলেন না, এজন্য প্রজাদিগের অসন্তুষ্টি।

৩ বাধ্য করিয়া দাদন দেওয়ার পদ্ধতিতে প্রজার বিরক্তি।

৪ নীলকরের অত্যাচার ও অবিচারের জন্য নীলচাষের প্রতি ঘৃণা ও ভয়।

৫ ইডেনের ইস্তাহার হইতে প্রজারা জানিলেন যে, নীলের চাষ করা না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন।

৬ গ্রাণ্ট মহোদয় প্রজার পক্ষে মত প্রচার করিলে গুজব রটিল যে, গবর্ণমেণ্ট নীলচাষের বিরোধী।

৭ নায়কদিগের উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণী।

এই সকল কারণ সমবেত হইয়া নীলবিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল।

যশোহরের অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস বাস করিতেন। তাঁহারা পূর্ব্বে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল; তাঁহারা কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া প্রজাদিগকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিলেন। বহ্নি অনেকদিন হইতে ধূমায়িত হইতেছিল, কিন্তু এই চৌগাছা হইতে উহা সর্ব্বপ্রথম জ্বলিল। (চৌগাছা কাঠগড়া কান্‌সরণের অন্তর্গত)।[১] দুই বৎসর মধ্যে এই বহ্নি সমস্ত দেশ জ্বালাইয়া দিল। বিশ্বাসদিগের কিছু সঙ্গতি ছিল; যাহা ছিল সব এই পাছে ব্যয় করিলেন। প্রজার 'যোট' ভাঙ্গিবার জন্য নীলকরেরা ক্ষেপিয়া গেল; বিশ্বাসেরা বরিশাল হইতে লাঠিয়াল আনিলেন, দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন; বঙ্গের মানসম্ভ্রম রক্ষার উপাদানরূপে লাঠি আবার উঠিল। নীলকরের হাজার লোক আসিয়া বিষ্ণুচরণের বিদ্রোহী গ্রাম সহসা আক্রমণ করিল, কত রক্তপাত হইল, কিন্তু বিশ্বাসদিগকে ধরিতে পারিল না। তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতেন, গ্রামের পর গ্রাম জাগাইতে লাগিলেন। রাইয়তেরা কোন নীল বুনিলেন না, দেড়বৎসর মধ্যে কাঠগড়া কারবার বন্ধ হইয়া গেল, আর খুলিল না। নিঃস্ব প্রজার নামে নালিশ হইলে উঁহারা দুইজনে তাঁহার জরিমানা বা দাদনের টাকা এবং মোকদ্দমার খরচা দিতেন, কেহ জেলে গেলে তাঁহার পরিবার পালন করিতেন। এইরূপে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। হিসাব করিয়া

---

১ ১৮৬০ অব্দে বনগাঁর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে, কাটগড়া কান্‌সরণের অন্তর্গত ইলিশমারি (মহেশপুরের সন্নিকটে) কুঠির পার্শ্ববর্ত্তী নারায়ণপুর, বড়খান্‌পুর প্রভৃতি গ্রামে প্রথম গোলমাল আরম্ভ হয়। নীল বুনিবেন না বলিয়া রাইয়তেরা আপত্তি করেন এবং বাগ্‌দা থানার লোকের উপর আক্রমণ করেন। *See* Indigo Com. Report p. 83—*Evidence of D. J. McNeile*. কিন্তু স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৮০ অব্দে স্বীয় অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখেন যে, চৌগাছাতেই প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়। চৌগাছা বা নারায়ণপুর উভয়ই কাঠগড়া কান্‌সরণের মধ্যবর্ত্তী।

দেখিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ১৭ হাজার টাকা। টাকা সামান্য বটে, কিন্তু টাকার অনুপাতে অনুষ্ঠিত কাজের মূল্য অনেক বেশী।[১]

শুধু চৌগাছার বিশ্বাসেরা নহেন, দেশমধ্যে এমন অনেক লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে ; যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্ত্তমান ছিল, সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্যবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস। যাঁহারা তাহার চাক্ষুষ বিবরণ দিতে পারিতেন, আজ ৬৪ বৎসর পরে তাঁহাদের অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও গল্পগুজবে যাহা আছে, শীঘ্রই তাহা লুপ্ত হইবে। প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে কতশত গ্রামে নীলকুঠির চিত্র আছে ; এখনও উহার অনেক ভগ্নস্তূপ ইমারতের গায়ে বা রাস্তার খোয়ায় আত্মগোপন করে নাই। ঐ সকল কুঠির তিরোভাবের সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিকতা বিজড়িত আছে। হয়ত উহাদের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র সকল একদিন যোদ্ধ-রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু কে আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের তালিকা নির্ণয় করিবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছিল, আজ কয়জনে তাহার খবর রাখে? যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, আমার এই ইতিহাসে তাহারই বা স্থান কোথায়? এখনও কৃষকের মুখে গ্রাম্য সুরে শুনিতে পাওয়া যায় :

"মোল্লাহাটির লম্বালাঠি, রইল সব হুদোর আটি,
কল্‌কাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজ্‌রা চেপে, লড়াই দেখ্‌বে ব'লে।"
—ইত্যাদি

লড়াই হইয়াছিল, কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাঁহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ্ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত দেশ-শাসন করিতেন, প্রজারা চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আঁটি পড়িয়া রহিল, উহা ধরিবার লোক জুটিল না। নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া আসিল। এই সময়ে বিষ্ণুচরণের মত দেশ-মাতৃকার আরও কত সুসন্তান জাগরিত হইয়া

১ *Pictures of Indian Life*, Ganesh & Co., pp. 72-80—'A Story of Patriotism in Bengal', by Sisirkumar Ghosh.

দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। উঁহাদের সকলের কথা জানি না ; যাহাদের কথা জানি, তন্মধ্যে পলুয়া-মাগুরার শিশিরকুমার ঘোষ, সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য্য, চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া লেখনীর সাহায্যে দীনহীন প্রজাবর্গের বন্ধু হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চৌবেড়িয়ার 'নীল-দর্পণ' প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র এবং কলিকাতার 'হিন্দু-পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

১৮৫৮ অব্দে শিশিরকুমারের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। প্রজা নীল বুনিবে না বলিয়া 'যোট' করিয়াছে শুনিয়া, তিনি আনন্দে আটখানা হইয়াছিলেন। সেই অজাতশ্মশ্রু যুবক 'পেট্রিয়ট' পত্রের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় নীলকরের অত্যাচার প্রসঙ্গ লইয়া যে সব ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের তাক্ লাগিয়াছিল।[১] যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মোলনী (Molony) ও স্কীনার (Skinner) সাহেব তাঁহাকে কারাভয় দেখাইলেন, কিন্তু লেখা ছাড়াইতে পারিলেন না।[২] তিনি প্রজাদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেন, নীলের চাষ যে কত অপকারী এবং উহা বন্ধ করা যে আইনবিরুদ্ধ অপরাধ নহে, তাহা বুঝাইয়া দিতেন। ১৮৫৯ হইতে রাইয়তী নীলের চাষ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্রোহী প্রজারা শত নির্য্যাতনের লক্ষ্যস্থল হইয়াও অটল রহিলেন। গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত ; নীলকরের লোকে অত্যাচার করিতে গ্রামে আসিলে, কেহ সেই ঢাক বাজাইয়া দিতেন, অমনি শত শত গ্রাম্য কৃষক লাটিসোটা লইয়া দৌড়িয়া আসিতেন। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত দেহে পলাইতে পারিত না। সম্মিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। প্রজাদের নামে অসংখ্য মোকদ্দমা হইত, তাঁহারা জেলে

১ 'Some of these articles of Babu Sisirkumar found their way into the Indigo Commission's Report and they display his remarkable sagacity, strong common sense, power of expression and clear scathing style and mastery over the English language even in those days when he was a mere stripling.'—*Pictures of Indian Life*, p. 6.

২ শিশিরকুমারের অন্য নাম ছিল মন্মথলাল ঘোষ। এজন্য তিনি 'M. L. G.' এই সংক্ষিপ্ত নামে প্রবন্ধ লিখিতেন। মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ উহা 'M. L. L.' হইয়া গেল ; শিশিরকুমার সে ভুল আর সংশোধন করিলেন না।

যাইতেন। বিচারালয়ে তাঁহাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য লোক জুটিত না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হইতে ২।৩ জন মাত্র মোক্তার পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা সব মোকদ্দমার কার্য্য করিতে পারিতেন না। এই সময়ে শিশিরকুমার তাঁহার অঞ্চলে প্রজার একমাত্র বন্ধু ছিলেন; তিনি নানাভাবে উঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তিনিই প্রজাদিগকে সত্যাগ্রহ শিখাইয়াছিলেন; কষ্ট পাইলে, নিরন্ন থাকিলে, সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তাঁহারা জেদ্ ছাড়িতেন না। তাঁহারা হাসির সঙ্গে কারাবরণ করিয়া লইতেন, ভগবানের নাম করিয়া সকল দুঃখ নীরবে সহ্য করিতেন। "নীলকরের অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন শিশিরকুমার ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, এই মনে করিয়া কৃষকগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত; তাহারা তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ মনে করিয়া 'সিন্নিবাবু' নামে অভিহিত করিয়াছিল।"[১] গবর্ণমেণ্ট হইতে শিশিরকুমারকে ধরিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ স্থাপিত হইতে পারিতেছিল না। পুলিস ইনস্পেক্টর প্রসন্নচন্দ্র রায়ের উপর তদন্তের ভার পড়িল; তিনি রিপোর্ট করিলেন, শিশিরকুমার নীল বুনিতে নিষেধ করিতেছেন, ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হুকুম চাহিলেন; কিন্তু কৌশলী যণ্ড'রে বীরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ পাওয়া গেল না, কারণ তিনি কখনও আইন-বিগর্হিত কার্য্য করিতে প্রজাদিগকে পরামর্শ দেন নাই। সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নীল-বিদ্রোহী কৃষকেরাও তাঁহাদিগের নেতাদিগকে এইসব নামে অভিহিত করিতেন।

হরিশ্চন্দ্র দেশহিতৈষী 'পেট্রিয়ট'-পত্রে যে বহ্নি জ্বালাইয়াছিলেন, শিশির-কুমার প্রভৃতি কয়েকজনে মফস্বল হইতে উহার ইন্ধন যোগাইতেন।[২] হরিশ্চন্দ্র সামান্য বেতনের সরকারী কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ কলমের মুখে যে জ্বলন্ত ভাষা উদ্গীরিত হইত এবং বিপ্লবের যুগে তিনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি শুধু

১ অনাথনাথ বসু, 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ', ৩৫ পৃ।

২ যশোহর হইতে গিরিশচন্দ্র বসু নামক একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরও 'পেট্রিয়টে' নীলকরের কাহিনী লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। সে দোষে অবশ্য তাঁহাকে চাকরী ইস্তাফা দিতে হইয়াছিল।

সম্পাদকতা করিতেন না, রোমান ট্রিবিউনের মত তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদা অনর্গল থাকিত, সে গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য অসংখ্য নীলকর-পীড়িত রাইয়তের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত। তিনি উঁহাদিগকে আশ্রয় দিতেন, অন্নদান করিতেন। অবশেষে অনিয়মিত গুরুপরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সিন্দুরিয়া ও জোড়াদহের কার্য্যাধ্যক্ষ জর্জ ম্যাক্‌নেয়ার সাহেবের অপব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য্য এবং তাঁহার অন্যতম সরিক দিক্‌পতিবাবু উত্তেজিত কৃষকদিগের পক্ষাবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে উদ্রিক্ত করিয়া দলবদ্ধ করেন। কথিত আছে, সেই বিদ্রোহকালে একস্থানে প্রায় ৩০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। কুঠিয়ালের লোকেরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে হটাইতে পারে নাই। নীলকরের অত্যাচারের ফলে বিদ্রোহ হয় বটে, কিন্তু বিদ্রোহের সময়ে উদ্রিক্ত প্রজারা নীলকরের উপর কম অত্যাচার করেন নাই। মথুরানাথের প্রজারা অনেক নীল-কর্ম্মচারীর বাড়ীঘর লুঠ-তরাজ ও তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিয়াছিলেন। অবশেষে ম্যাক্‌নেয়ার মথুরানাথের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অতিকষ্টে রাইয়তদিগকে উপশান্ত করেন। নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় যে বিদ্রোহ হয়, তাহার প্রধান নেতা ছিলেন চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। তিনি কমিশনে সাক্ষ্য দেন।

১৮৬০ অব্দের প্রারম্ভ হইতে বিদ্রোহের অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। লর্ড ক্যানিং সে সংবাদে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোন নির্ব্বোধ নীলকরের বন্দুকের মুখে আগুন জ্বলিলে তদ্দারা বঙ্গের সমস্ত নীলকুঠি ভস্মসাৎ হইবে, ইহাই তাঁহার আশঙ্কা হইল।[১] এই বৎসর মহামতি গ্রাণ্ট যশোহরের উত্তরভাগে কুমার ও কালীগঙ্গা নদীপথে ৬০।৭০ মাইল ভ্রমণ করিবার সময়ে

১ Lord Canning wrote 'I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames'—Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol. I, pp. 191-2.

১৪ ঘণ্টাকাল উভয়কূলের শ্রেণিবদ্ধ, সুবিচারপ্রার্থী অত্যাচারিত প্রজাপুঞ্জের আকুল আর্ত্তনাদে ব্যাকুলিত হইয়া দুরবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।[১]

উহার পূর্ব্বেই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ৩১শে মার্চ্চ তারিখের ১১শ আইন (Act XI of 1860) অনুসারে নীলকরের অত্যাচার বিষয় তদন্ত করাইবার জন্য পাঁচজন সদস্য লইয়া এক 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠিত করেন। যশোহরের ভূতপূর্ব্ব জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেট সীটন-কার (W. S. Seton-Karr) সাহেব উহার সভাপতি হন। সরকার পক্ষ হইতে তিনি এবং টেম্পল (R. Temple) সাহেব, প্রজা ও মিশনরী পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড সেল (Rev. J. Sale) সাহেব, নীলকর সভার পক্ষ হইতে ফার্গুসন (W. T. Fergusson) সাহেব এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হইতে জমিদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই 'কমিশনের' সদস্য ছিলেন। এই কমিশন ১৮ই মে হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৩৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ২৭শে আগষ্ট রিপোর্ট দাখিল করেন। সাক্ষীদিগের মধ্যে ১৫ জন সরকারী কর্ম্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন পাদরী, ১৩ জন জমিদার বা তালুকদার এবং ৭৭ জন রাইয়ত ছিলেন। উঁহাদের জবানবন্দী হইতে ধীর গম্ভীর নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা কমিশনের মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।[২] ফার্গুসন সাহেব কোন কোন বিষয়ে একটু ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও নীলকরের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, কমিশন তাহার অধিকাংশই মোটামুটি স্বীকার করেন এবং স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করেন যে, 'নীলকরদিগের ব্যবসায়-পদ্ধতি উদ্দেশ্যতঃ পাপজনক, কার্য্যতঃ ক্ষতিকারক এবং মূলতঃ ভ্রমসঙ্কুল।'[৩] পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে গ্রাণ্ট মহোদয় এই রিপোর্ট সম্বন্ধে স্বকীয় সুদীর্ঘ মন্তব্য সঙ্কলিত করেন। উহাতে নীলকরদিগের অপকর্ম্মের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। ছোটলাট স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন, 'বাঙ্গালার প্রজা

১ *Ibid.*, p. 192.

২ 'At a moment of passionate excitement the careful impartiality with which the Commission conducted their enqueries was admitted on all sides. The cautious, temperate and kindly manner in which they have framed their Report will, I am sure, be cordially acknowledged by every one.'—Grant's Minute, para 49 ; Buckland, p. 271.

৩ 'The whole system is vicious in theory, injurious in practice and radically unsound.'—Indigo Com. Report, p. 5.

ক্রীতদাস নহে, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী। তাহাদের পক্ষে এরূপ ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিস্ময়কর নহে। যাহা ক্ষতিজনক তাহা করাইতে গেলে অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী ; এই অত্যাচারের আতিশয্যই নীলবপনে প্রজার আপত্তির মুখ্য কারণ।'[১]

কমিশন বা ছোটলাট কোন নূতন আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। তবে প্রচলিত আইন যাহাতে চলে, অত্যাচার অবিচার ও ভুল ধারণা যাহাতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্য কয়েকটি ইস্তাহার প্রচার করা হয়। তদ্দ্বারা সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, (১) গবর্ণমেণ্ট নীল চাষের পক্ষে বা বিপক্ষে নহেন, (২) অন্য শস্যের মত নীলচাষ করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে প্রজার ইচ্ছাধীন, এবং (৩) আইন অমান্য করিয়া অত্যাচার বা অশান্তির কারণ হইলে নীলকর বা বিদ্রোহী প্রজা কেহই কঠোর শাস্তির হস্তে নিস্তার পাইবেন না। ইহার পর নূতন আইনানুযায়ী (Act XLII of 1860) বিচারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে মহকুমা স্থাপিত হইল এবং সর্ব্বত্র পুলিসের শক্তিবৃদ্ধি করা হইল। প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া ঐ বৎসর নীলের হৈমন্তিক চাষ জোর করিয়া বন্ধ করিবেন শুনিয়া যশোহর ও নদীয়ায় দুইদল পদাতিক সৈন্য পাঠান হইল এবং দুইখানি রণতরী দুই জেলার নদীপথে ভ্রমণ করিতে থাকিল। প্রজাদিগের ক্রোধ তখনও যায় নাই, তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া নীলকর-তালুকদার-দিগের খাজানা বন্ধ করিয়া দিলেন ; তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ২।১ জন নীলকরকে লাটের খাজনা দাখিল করিবার জন্য কিছু কিছু সময় দিতে বাধ্য হন। পরবৎসর দেশের অবস্থা ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করিল ; নীলকরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ অনেকে ব্যবসায়ান্তর গ্রহণে ব্রতী হইলেন।

কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইতে না হইতে ঐ বৎসর (১৮৬০ খৃঃ, ১২৬৭ সাল) আশ্বিনমাসে 'নীলদর্পণ' নাটক ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই সে নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই নাটকে দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-পীড়িত বাঙ্গালা দেশের এক জীবন্ত চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। মোল্লাহাটির কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর বাড়ী, নির্য্যাতিত প্রজাবৃন্দ তাঁহার প্রতিবেশী, ডাকবিভাগের চাকরীর

১ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'নীলদর্পণের' ভূমিকা, কর-মজুমদার সং, ১/ পৃ।

জন্য নদীয়া যশোহরের সর্ব্ববিধ সংবাদ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সহজ, তিনি নিজে নাট্যকলায় সিদ্ধহস্ত সুরসিক লেখক। নাটকীয় চরিত্রগুলির ভাষা ও ভাবভঙ্গি এত স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল, যে তাহার সন্ধান অব্যর্থ হইল। কয়েক মাস মধ্যে যখন এই পুস্তক পাদরী লঙ্ (Rev. James Long) সাহেবের তত্ত্বাবধানে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইল, তখন নীলকর মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তখন ক্ষিপ্ত নীলকর সম্প্রদায় অচিরে লঙ্ সাহেবের বিরুদ্ধে ভীষণ মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন; সুপ্রীম কোর্টের বিচারে লঙ্এর একমাস কারাদণ্ড ও সহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইল। জরিমানার টাকা স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ কোর্টে দাখিল করিলেন। কারাদণ্ড খণ্ডিত হইল না বটে, কিন্তু উহার জন্যই মহামতি লঙ্ দেশপ্রসিদ্ধ হইলেন। পথে ঘাটে শস্যক্ষেতে মর্ম্মব্যথিত কৃতজ্ঞ কৃষকের করুণ কণ্ঠে স্বভাব কবির গ্রাম্য সুরে গান শুনা গিয়াছিল :

'নীল-বাঁদরে সোনার বাঙ্গালা করলে এবার ছারেখার!
অসময়ে হরিশ ম'লো, লংএর হল কারাগার—
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।'

নীলদর্পণ যতই পঠিত ও প্রচারিত হইল, নীলকরের অত্যাচার বৃত্তান্ত ততই দেশের সকল স্তরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে লাগিল। শীঘ্রই 'নীলদর্পণ' বহু ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে,) 'এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লঙ্ সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন।[১] ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবননির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধ বা কর্ম্মচ্যুত

---

১ সীটনকার অভিযোগের ফলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করেন। পরে ভারত সরকার হইতে তাঁহাকে হাইকোর্টের জজ্ ও পররাষ্ট্র-সচিবের পদে পুনর্নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।'[১] নীলদর্পণ রচনা কালে একদা মেঘনা পার হইবার সময় দীনবন্ধুর নৌকা জলমগ্ন হয়, তিনি কোনক্রমে উহার পাণ্ডুলিপিখানি মাত্র সঙ্গে লইয়া দৈবানুগ্রহে সে যাত্রা রক্ষা পান। আমরা তৃতীয় খণ্ডে রায় বাহাদুর দীনবন্ধুর জীবনবৃত্ত দিব।

নীলকরদিগের প্রতিপত্তিও কম ছিল না, তাহারা প্রতিহিংসাও কম লন নাই। গ্রাণ্টের শাসনকালে তাহাদের চরিত্র-কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ায় তাহারা হাড়ে চটিয়া যান। উহারা 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সাহায্যে নানা ছদ্মনামে গ্রাণ্ট হইতে ইডেন পর্য্যন্ত বহুজনের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিয়া গায়েব জ্বালা মিটাইয়াছিলেন। এই সময়ে সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে ম্যাক্‌আর্থার নামক একজন যশোহর জেলার নীলকরের কুচরিত্র সম্বন্ধীয় চিঠি প্রকাশিত হয় বলিয়া নীলকরগণ মহামান্য গ্রাণ্টের নামে ১০ হাজার টাকার দাবিতে এক মানহানির মোকদ্দমা রুজু করেন। তখন এদেশীয় আদালতে লাট সাহেবদেরও বিচার হইত। স্যর বার্ণিস পিককের (চিফ্‌-জজ্‌) বিচারে ঐ মোকদ্দমায় লাটসাহেবের নামমাত্র একটাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। কাচিকাটা কুঠির আর্চিবল্‌ড হিলস্‌ সাহেবের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; তৎকর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কাহিনী 'পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয় বলিয়া হিলস্‌ সাহেব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন; অকস্মাৎ অকালে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হইলেও উদ্ধার নাই, তাঁহার স্ত্রীর নামে মোকদ্দমা চলিয়াছিল।

এইরূপ বহুবৎসর ধরিয়া বিলাতে ও এদেশে নীলকরগণ নানাভাবে তাহাদের ব্যবসায়ের শত্রুদিগের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেছিলেন। কিন্তু নীলের ব্যবসায়ে আর উন্নতি হইল না। কমিশনের নির্দ্দেশমত নীলগাছের দর টাকায় ৪ বাণ্ডিল রহিয়া গেল। বিদ্রোহের দুই বৎসর যশোহরের কোথায়ও নীলের চাষ হয় নাই; বিদ্রোহ থামিলে আবার সকলে নীল বুনিল। যে সব কুঠির সাহেবেরা উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন, তথায় নীলের চাষে আর সুবিধা হইল না। মোল্লাহাটির প্রধান কার্য্যকারক বংশীবদন সরকার পুরাতন বীজ বপন করিবার ব্যবস্থা করায় নীলের গাছ উঠিল না। বংশীবদনের ত চাকরী গেলই, অধিকন্তু

১ বঙ্কিমচন্দ্র, 'দীনবন্ধু-জীবনী'। ['নীলদর্পণ', ১৩২৮, ২১৩-৪ পৃ —শি মি]

ঐ কান্‌সরণের সাহেবেরা শীঘ্রই কারবার বন্ধ করিলেন। কাঠগড়া কান্‌সরণ মোটেই খুলিল না। যে সব কুঠির সাহেবেরা আবার প্রজার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে লাগিলেন, সেখানে রাইয়তেরা অন্ততঃ কতক জমিতে আবার নীলের চাষ করিলেন। হাজরাপুরের টুইডী সাহেবের প্রজাগণ বিদ্রোহের দুই বৎসর নীলের চাষ না করিলেও বিদ্রোহী হন নাই। নীলের কুঠি চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু জোর করিলে চাষ বৃদ্ধি হইত না। উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় কারবারে লোকসান হইতেছিল, তাই ক্রমে অনেক কুঠি বন্ধ হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্য্যন্ত দশবৎসর মধ্যে গড়ে প্রতিবর্ষে যশোহর হইতে ১০,৭৯১ মণ নীল উৎপন্ন হইত। তথনকার হিসাবে উহার জন্য ১০৩ বর্গমাইল জমির চাষ লাগিয়াছিল।[১] বিদ্রোহের ১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭০ অব্দে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের হিসাবে ঐ চাষ ৮৪$\frac{৩}{৪}$ বর্গমাইল দাঁড়াইয়াছিল, এবং ১৮৭২-৭৩ অব্দে রামশঙ্কর সেনের রিপোর্টানুসারে উহা ৪৯ বর্গমাইলে আসিয়াছিল। এইরূপে চাষের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমিতেছিল। এমন সময়ে ১৮৮৯ অব্দে পুনরায় নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল।

এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সর্ব্বত্র হয় নাই; ইহা প্রধানতঃ যশোহরের উত্তরভাগে বিজলিয়া ডিভিসনে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ডম্বল (Durup De Dambal) সাহেবের অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ। ঐ কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লোকে দলবদ্ধ হইয়া নীল বপন বন্ধ করিলেন। কৃষক ও জোতদারেরা একত্র হইয়া ষষ্টীবরের জমিদার বঙ্কবিহারী ও তৎকনিষ্ঠ বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়কে নেতৃত্ব গ্রহণ করাইলেন। ক্ষিপ্ত কৃষকেরা সাহেবকে আক্রমণ ও নির্য্যাতন না করিয়া তৃপ্ত হইলেন না, আরও কত উপদ্রব ঘটাইলেন, তাহা বলিবার স্থান নাই। ডম্বল সাহেব রামনগর ও বাবুখালি কান্‌সরণের অংশীদার এবং চাউলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। এজন্য বিনোদপুর অঞ্চলেও এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ বিস্তারিত হইয়াছিল। তথন যাঁহারা প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উড়্‌বার কেদারনাথ ঘোষ, ঘুল্লিয়ার আশুতোষ গাঙ্গুলী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও উকীল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণপুরের

১ Hunter. *Jessore*, p. 300.

বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি।[১]

এই বিদ্রোহের কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যায় :

১ এই সময়ে পাট প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় উহার চাষ লোভনীয় হয় ; প্রজাগণ অনিচ্ছাসত্ত্বে নীল চাষ করিয়া যাহা আয় করিতেন, তদ্দ্বারা জীবিকার সংস্থান হইত না।

২ ডম্বল সাহেবের অপব্যবহারে মাগুরা-ঝিনাইদহের লোক বিরক্ত ও উদ্রিক্ত হইয়াছিলেন।

৩ ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে যে মূল্যে নীলগাছ বিক্রয় করিলে কিছু মজুরী থাকিত, এ সময় তাহা থাকিত না।

৪ ত্রিশবৎসরের আন্দোলনের ফলে এই জাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত একটা লোকমত দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময়ে যাঁহারা রাজদ্বারে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হন, তন্মধ্যে বিখ্যাত লাহোর 'ট্রিবিউন' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল, সর্ব্বপ্রধান।[২] যশোহর-লোহাগড়ার এক সমৃদ্ধ পরিবারে তাঁহার জন্ম, সুন্দর ও কমনীয় তাঁহার মূর্ত্তি, যেমন তিনি সুলেখক, তেমনই সুবক্তা। এই উদীয়মান যুবক ওকালতী পাশ করিয়া পূর্ব্ববৎসর (১৮৮৮) আসেন ; তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছিল। নীলবিদ্রোহে তাহা জুটিল। তিনি প্রথম হইতেই ঐকান্তিকভাবে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। এই বৎসর ষ্টিভেন্সন্ মুর (Stevenson Moore) সাহেব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঝিনাইদহে আসিলেন ; প্রজার নামে অসংখ্য মোকদ্দমা হইল, আর তাঁহারা শাস্তি পাইতে লাগিলেন। আবার শত শত প্রজা জেলে গেলেন কিন্তু নীল চাষ করিলেন না। এই সকল মামলায় প্রজাপক্ষে উকীল হইতেন অক্লান্তকর্ম্মী যদুনাথ এবং নীলকরের পক্ষ সমর্থন করিতেন বর্ত্তমান ঝিনাইদহের

১ কেদারনাথ ঘোষ পরে সন্ন্যাসী হইয়া কেশবানন্দ ভারতী নাম ধারণ করেন। বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবৎ 'কল্যাণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রে নীলবিদ্রোহের সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন 'কল্যাণী' সাপ্তাহিক পত্র নড়াইল হইতে প্রকাশিত হয়।

২ ইনিই এক্ষণে রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি, C. I. E., M. L. A. 'হিন্দুপত্রিকা'র সম্পাদক ও বহুগ্রন্থ-লেখক। আমরা তৃতীয় খণ্ডে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী দিব।

বৃদ্ধ উকীল কেদারনাথ বক্‌সী। কিছুদিন পরে লুসন (Luson) সাহেব নীল ব্যাপারে বিশেষ বিচারক হইয়া আসিয়া ঝিনাইদহ ও মাগুরায় কোর্ট করিতে লাগিলেন। শুধু প্রজার পক্ষে স্বল্প বা বিনাস্বার্থে ওকালতী করা নহে, সংবাদপত্রে লেখা, উচ্চ গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা প্রভৃতি প্রায় সকল কার্য্যই যদুনাথ করিতেন। তিনি ও মাগুরার উকীল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনে উদ্যোগী হইয়া মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে বিলাতে আবেদন পাঠাইলেন, তথায় মহামতি ব্রাড্‌ল বিদ্রোহ-বার্ত্তা পার্লিয়ামেণ্টে তুলিলেন। উহার ফলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব হয়। তখন ছোটলাট সাহেব যদুনাথকে ডাকেন এবং তাঁহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে একটি সালিশী কমিটি (Arbitration Committee) স্থাপন করা স্থির হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যদুনাথ, নীলকরের পক্ষে জোড়াহাটি কান্‌সরণের টুইডী সাহেব এবং সরকার পক্ষে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার স্মিথ (Alexander Smith) সাহেব সদস্য হন।

এই কমিটি প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সমস্ত গোলমালের মীমাংসা করেন। কমিটির প্রস্তাবে একটা কার্য্য এই হয় যে, প্রতি বাণ্ডিল নীলের মূল্য ।০ স্থলে ।৵০ নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপ দেড়গুণ মূল্য দিয়া নীলের ব্যবসায় চালান দুষ্কর হইয়া পড়ে। এজন্য ক্রমে নীলকরগণ নিজ নিজ কান্‌সরণ বিক্রয় করিতে থাকেন। এই সময়ে বাবুখালি, মদনধারি ও নহাটা বিক্রয় হইয়া যায়। ১৮৯৫ অব্দে দেখা গেল, মাত্র ১৭টি কুঠিতে ১,৪১৬ মণ নীল উৎপন্ন হইল। কিন্তু ইহারই কিছুদিন পরে জার্ম্মানী হইতে কৃত্রিম কৌশলে প্রস্তুত সস্তা নীল প্রচুর পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায়, স্বভাবজাত দুর্ম্মূল্য নীলের ব্যবসায় একেবারে উঠিয়া গেল। কত আন্দোলন ও প্রাণপণ চেষ্টায় যাহা হয় নাই, বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহা সহজে সংসাধিত হইল। যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত একশত বৎসর নীলের ব্যবসায় ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রেণী ও মরেল-কাহিনী

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে নীল-বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে যে সকল সাহেবের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা সকলেই যশোহর-জেলার নীল-ব্যবসায়ী; এখন আর যে দুইজনের কথা বলিব, তাঁহারা খুল্না জেলার ব্যবসায়ী, এবং এই স্থানে জমিদারী বা তালুকের মালিক হইয়া স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাদের জমিদারীও নাই, বংশও নাই; আছে মাত্র অন্যাধিকৃত তাঁহাদের পুরাতন বাটী, দুই একটি সমাধি-স্তম্ভ আর লোকমুখে প্রচারিত সদসৎ চরিত্র-কথা। অগ্রে রেণীর কথা বলিতেছি।

রেণী সাহেব॥ রেণী সাহেবের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। তিনি পত্নীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হোগলা পরগণার চারিআনা অংশের ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়া ঐ সম্পত্তি পরিচালনা করিতেন। সে সময়ে তিনি কলিকাতার হ্যামিণ্টন্ কোম্পানির হৌস্ হইতে ৮ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া, খুল্নার অপর পারে থাকিয়া, চিনি ও নীলের বিস্তৃত ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তালিবপুর গ্রামে ভৈরবতীরে যেখানে তাঁহার বাটী ছিল, উহাকে এখন 'পুরাতনকুঠি' বলে; তাঁহার রম্যহর্ম্ম্য ও বাঁধাঘাট সবই আজ নদীগর্ভস্থ, কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ আম লিচু নারিকেলের বাগানের মধ্যে কয়েকটি উত্তুঙ্গ ঝাউগাছ এবং রেণীদম্পতীর সমাধিস্তম্ভ পূর্ব্বচিহ্ন রক্ষা করিতেছে। ঐ 'পুরাতন কুঠি'র অপর পারে নন্দনপুরে কয়েকটি (ইক্ষু) চিনির কল ছিল এবং তালিবপুর, লখপুর, ঘোষেরহাট প্রভৃতি অনেক স্থানে এখনও তাঁহার নীলকুঠির নিদর্শন আছে। বেলফুলিয়ার দীননাথ সিংহ, নওয়াপাড়ার গদাধর ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার বিশিষ্ট কার্য্যকারক ছিলেন। ঐ সকল কুঠির কার্য্য-চালনার জন্য তিনি স্থানীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতেন। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের কথা শুনা যায় না বটে, কিন্তু অন্য কারণে বহু লোক উত্ত্যক্ত হইত। এমন কি, তাঁহার বাড়ীর নিকট দিয়া চলাফেরা করা বন্ধ হইয়াছিল; তিনি পথের লোক ধরিয়া কার্য্য করাইয়া লইতেন। এখনও 'শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে রেণী সাহেবের খড় কাটিবার' প্রবাদ-বাক্য আছে। উদ্যানের বৃক্ষাদি ছেদন, সীমানা নষ্ট করিবার জন্য বড় বড় পগার খনন, জোর করিয়া

দাদন দেওয়া, ধান্যশস্য নষ্ট করিয়া নীল বপন—এসব কার্য্য যখন তখন হইত। এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম একপ্রকার নিষ্প্রদীপ হইয়া গিয়াছিল। এই সব দেখিয়া স্থানীয় প্রধান প্রধান লোক অর্থাৎ লখপুরের চৌধুরী, নওয়াপাড়ার ঘোষ, তিলকের মিত্র, শ্রীরামপুর-নৈহাটির ঘোষ মহোদয়েরা একত্র হইয়া অত্যাচারের প্রতিরোধ জন্য পরামর্শ করেন। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের ঘোষবংশীয় শিবনাথ ঘোষ সকলের অগ্রণী হন।[১] ১২৪৬ হইতে ১২৪৯ পর্য্যন্ত রেণী ও শিবনাথের ঘোর বিরোধ চলিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর যেমন ধরণ, কার্য্যকালে পরামর্শকারিগণ কেহই শিবনাথের সহায়তা করেন নাই; তিনি একপ্রকার একক দুর্দ্দান্ত কুঠিয়ালের অত্যাচর হইতে প্রতিবেশীকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বস্বপণ করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পক্ষে সহস্রাধিক ঢাল-শড়কীওয়ালা লাঠিয়াল বহাল হইয়াছিলেন। রেণীর পক্ষে দেশীয় কর্ম্মচারী ছাড়া কয়েক জন গোরা ছিলেন, শিবনাথের পক্ষে বাহিরদিয়া নিবাসী চন্দ্রকান্ত দত্ত, তিলকের রামচন্দ্র মিত্র, পাণিঘাটের ভৈরবচন্দ্র মিত্র এবং বিরাট নিবাসী লাঠিয়াল সর্দ্দার সাদেক মোল্যা প্রভৃতি বীরবৃন্দ জুটিয়া রেণীর দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন।[২] গ্রাম্য কবিতায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায়:

'চন্দ্র দত্ত, রণে মত্ত, শিব-সেনাপতি

* * *

গুলিগোল্যা সাদেকমোল্যা, রেণীর দর্প কর্‌ল চুর
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা, ধন্য বাঙ্গালা বাঙ্গালী বাহাদুর॥'

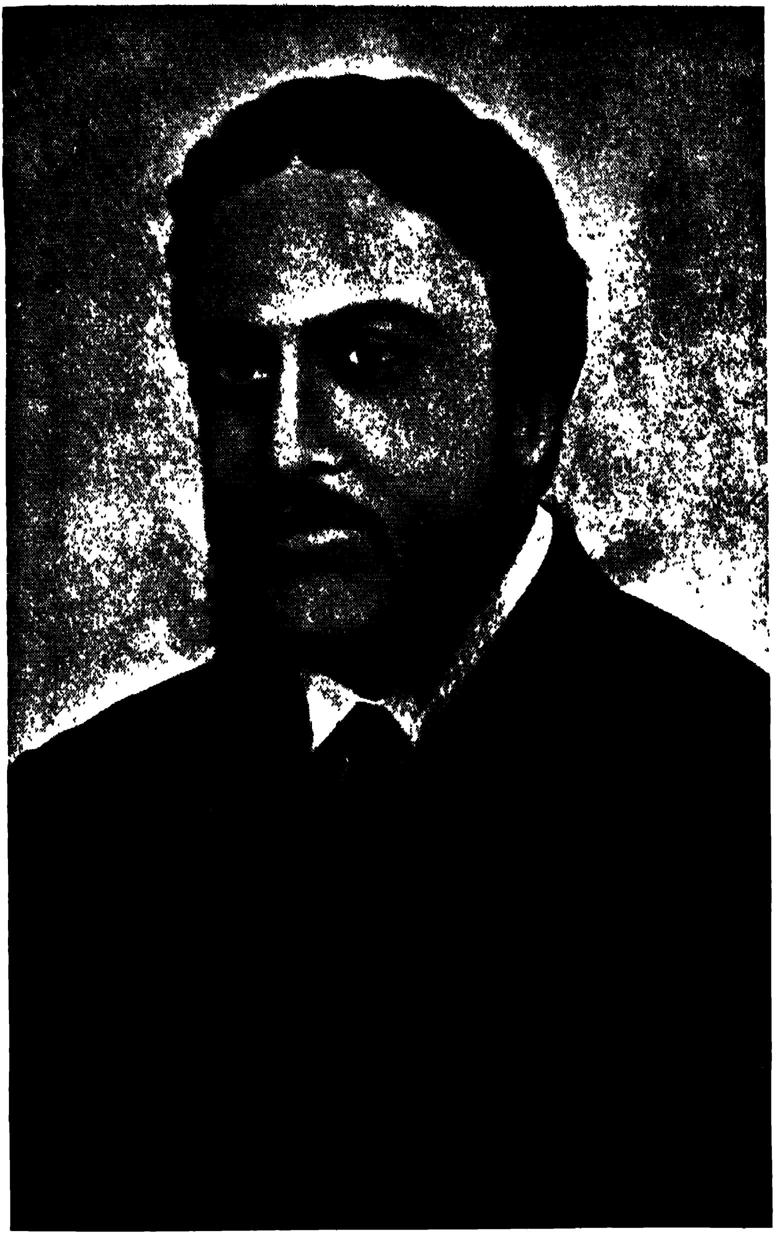
---

১ আক্‌না-সমাজের কুলীন রাধামাধব ঘোষ বিবাহ দোষে কুল হারাইয়া নেহালপুরে বাস করেন, তৎপুত্র রামভদ্র কাশ্যপ-চৌধুরীদিগের নিকট হইতে শ্রীরামপুর প্রভৃতি তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লন; রামভদ্রের পুত্র রামনারায়ণ পশর ও মাথাভাঙ্গা নদীর সংযোগ করিবার জন্য যে খাল খনন করেন, তাহার নাম রাখেন 'নারায়ণ খালি', শিবনাথ এই রামনারায়ণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। বংশধারা এই: রামনারায়ণ—রাধাকান্ত—বাণেশ্বর (নৈহাটি), ভুবনেশ্বর ও রামকিশোর (শ্রীরামপুর); ভুবনেশ্বর—সদানন্দ—শিবনাথ—প্রসন্ন, রাজেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র, যতীন্দ্র প্রভৃতি।

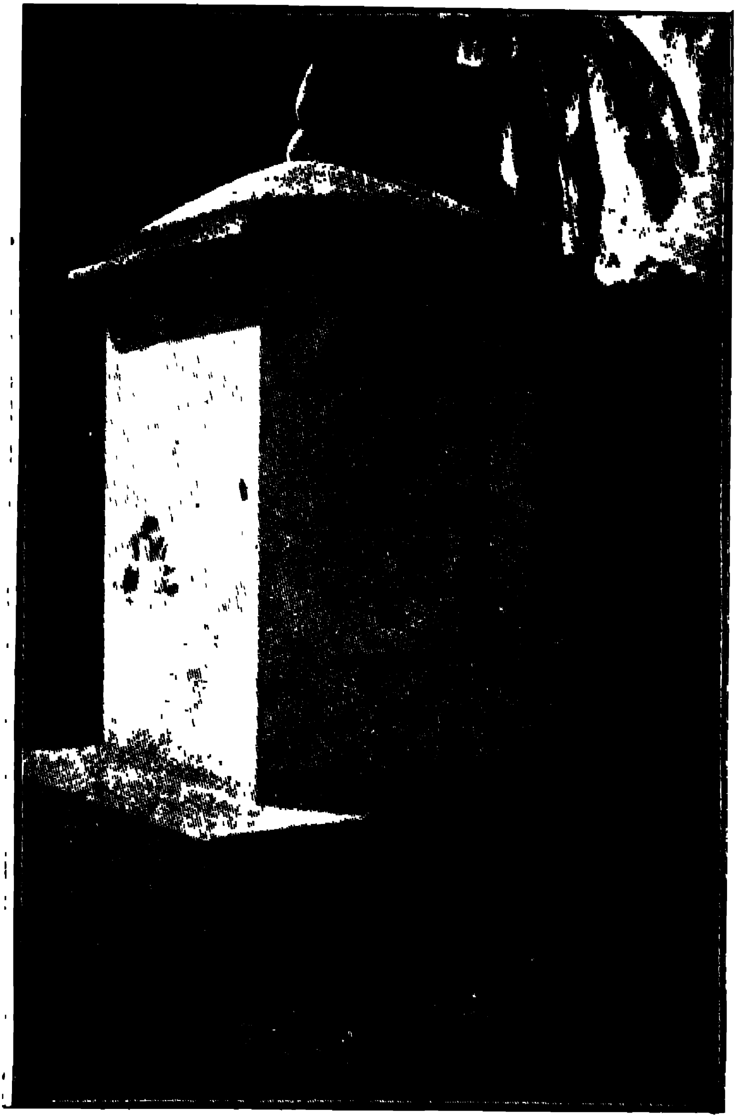
২ বিরাটের গয়রা তুল্যা, গৌর ধোপা, ফকির মামুদ, আফাজদ্দি, খানমামুদ জোলা প্রভৃতি আরও অনেক বিখ্যাত লাঠিয়ালগণের নাম শুনা যায়। সভ্যতার হিসাবে ইঁহারা নগণ্য মূর্খ লোক, কিন্তু আত্মরক্ষা ও স্বজাতিসেবার বীরত্ব হিসাবে ইঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

বাস্তবিকই শিবনাথের ডঙ্কা বাজিয়াছিল, চৌগাছার বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের মত শ্রীরামপুরের শিবনাথও বীরত্ব-গৌরবে বাঙ্গালী বাহাদুর। তাঁহার রণ-ডঙ্কায় রেণী সাহেবকে শঙ্কান্বিত করিয়াছিল। শিবনাথ প্রতিকার্য্যে তাঁহার প্রতিরোধ করিতেন, এজন্য তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আরও অত্যাচার করিতেন; দিনে দিনে যখন তখন, যেথানে সেথানে উভয়পক্ষে খণ্ড-যুদ্ধ হইত। প্রায়শঃ সাহেবের লোকদিগকে রণভঙ্গ দিতে হইত। এখনও কথায় আছে, 'দেখিয়া শিবের ভঙ্গি পলাইল দীনেই সিঙ্গি' (দীননাথ সিংহ)।[১] উভয়ের বিরোধ ভঙ্গের জন্য গবর্ণমেণ্ট উভয়ের বাসস্থানের মধ্যে নয়াবাদ থানা ও পরে খুল্‌না মহকুমা স্থাপন করিতে বাধ্য হন। বিবাদ ঘোরতররূপে আরব্ধ হইলে, সে থানাও সেখানে তিষ্ঠিতে পারে নাই। সেকথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৭০৬-০৭ পৃ)। শিবনাথ রেণী সাহেবের ৩৬ খানা নীল ও চিনি বোঝাই নৌকা কলিকাতা যাইবার পথে কাঁচি-ঝাঁকা নদীর মধ্যে ডুবাইয়া দেন, উহার একখানা মাত্র নৌকা পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। সাহেব সে নৌকার মাল স্বীয় মহাজনের হৌসে না দিয়া গোপনে অন্যত্র বিক্রয় করেন এবং সমস্ত নৌকাগুলির লুট-তরাজের অভিযোগ শিবনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া মোকদ্দমা করেন। কিন্তু শিবনাথ গুপ্ত বিক্রয় ধরাইয়া দেওয়ায় মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। ১২৪৯ (১৮৪৩) সালে রেণী সাহেব শিবনাথের নামে ৯৬টি খুনের অভিযোগ আনেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু করিতে পারেন না।

১ দীননাথ সিংহ পরে অত্যাচারীর চাকরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এবং রাজসাহীতে বড় কুঠির দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ মোক্তার রূপে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। অন্নদানে এবং দীন দুঃখী বা আশ্রিতের সাহায্যকল্পে কেমন করিয়া অজস্র অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ইঁহার মত অতি কম লোকেই জানিয়াছেন। তাঁহার দীননাথ নাম সার্থক হইয়াছিল এবং এখনও তিনি এতদঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। একদা তিনি রাজসাহীতে এক মাতালকে তিরস্কার করিয়া আশ্রয় দিতে না চাহিলে, সে উচিত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল: 'তুমি অন্যের বেলায় দীননাথ, আমার বেলায় সিঙ্গি' (সিংহ)। খুল্‌নার অপর পারে বেলফুলিয়া-আইচগাতি গ্রামে তাঁহার নিবাস, তদ্বংশীয়েরা এখনও সম্মানিত তালুকদার। তাঁহাদের বাটীতে অদ্যাপি শ্রীবিগ্রহ ও শিবলিঙ্গের নিত্যসেবা চলিতেছে। দীননাথের মধ্যম পুত্র, যোগেন্দ্রকুমার সিংহ এম, এ, মহোদয় বিহার গবর্ণমেণ্টের অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি চিরজীবন বিদ্যাদেবীর একনিষ্ঠ সাধক। স্বধর্ম্মে তাঁহার সুদৃঢ় আস্থা এবং সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।



মাইকেল মধুসূদন



মাইকেলের সমাধিস্তম্ভ, সাগরদাঁড়ি

এমন কি, শিবনাথ রেণীর কুঠির নীল গাছ লুটিয়া লইয়া স্বকীয় নেহালপুর ও বিরাটের কুঠিতে নীল প্রস্তুত করিতেন। এমন সময় মহাজনেরা টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেও সাহেব কিছুদিন নিজ জমিদারীর আয় হইতে কুঠি চালাইয়াছিলেন, কিন্তু বেশী দিন পারেন নাই। দেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহের সমকালে তাঁহারও কুঠি বন্ধ হইয়া যায়। রেণী ও শিবনাথ উভয়েই বীর ছিলেন; বীরই বীরত্বের মর্ম্ম বুঝেন; উহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল। ১২৫৫ সালে ৩৯ বৎসর বয়সে শিবনাথের মৃত্যু ঘটিলে, একজন রেণীসাহেবকে ঐ সংবাদ জানাইয়া সন্তুষ্ট করিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু সাহেব শিবনাথের মৃত্যুতে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জাতির মহত্ত্ব এবং বীরের ধর্ম্ম।

মরেল সাহেব॥ হেঙ্কেল সাহেবের সময় হইতে সুন্দরবন আবাদ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্তু জমিদারদিগের সহিত সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদের জন্য সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। ১৮২৮ অব্দে সীমা স্থির করিবার আইন (Regulation III of 1828) হয়। তদনুসারে কমিশনার ড্যাম্‌পিয়ার (Dampier) সাহেবের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন জরিপ হইয়া সীমা স্থির হয় (১৮৩০) এবং নব বিধানমত সমস্ত সুন্দরবন লাটে (Lot) বা খণ্ডে বিভক্ত হইতে থাকে।[১] সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ব সীমায় বলেশ্বর কূলবর্ত্তী ১, ২, ৩ এবং ৪নং লাট ও বারুইখালি গ্রাম টাকীর স্বনামখ্যাত জমিদার কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে ৯৯ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি ৮০০/ বিঘার অধিক আবাদ করিতে না পারায়, চারি লাটের মধ্যে ঐ অংশ (৩নং অন্তর্গত খাউলিয়া আবাদ) ব্যতীত অবশিষ্ট জমি অন্যের সহিত বন্দোবস্তের হুকুম হয়। তখন শ্রীমতী মরেল (Mrs. Morrell) নামক এক ইংরাজ-পত্নী প্রার্থী হইয়া উক্ত লাটগুলি নিজ পুত্রদিগের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন (১৮৪৯)। উঁহার চারিটি পুত্র ছিলেন, রবার্ট, টমাস্, উইলিয়ম্ ইভান্‌স ও হেন্‌রী। তন্মধ্যে মধ্যম টমাস্ অল্প বয়সে মারা যান। অপর তিন ভ্রাতা নৌকাযোগে আসিয়া বলেশ্বর ও পানগুচি নদীর সঙ্গম সন্নিকটে সরালিয়া নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়া বসতি করেন। অচিরে তাঁহাদের অদম্য উত্তম, অক্লান্তশ্রম, ইংরাজোচিত অধ্যবসায় ও

১ Pargiter, *Revenue History of Sunderbans*, Chap. VI; Ascoli, *Sunderbans* (1870-1920), p. 3.

ব্যবস্থা-নৈপুণ্য দ্বারা প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক তুচ্ছ করিয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গল আবাদ করিয়া তুলেন এবং দশ বৎসরের মধ্যে ৬০।৬৫ হাজার বিঘা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেন। দলে দলে প্রজা আসিয়া স্থায়ী নিরীখে (১৵০ বিঘা হিসাবে) পাট্টা গ্রহণ করেন ; শীঘ্রই তাঁহাদের সম্পত্তির মূল্য ১০ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।[১] মরেলগণ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুবৃহৎ ইমারত নির্ম্মাণ করিয়া আবাস বাটিকা করেন ; উহার চতুঃপার্শ্বে সুবিস্তৃত পাকারাস্তা, ঘাটবাঁধা পুকুর ও ফলের বাগান রচনা করেন। এখনও ৫০ বিঘা জমিতে একটি নারিকেল বাগান রহিয়াছে। উঁহারা নদীতীরে বাজার বসাইয়া তাহার নাম রাখেন মরেলগঞ্জ। সে হাট এখনও আছে, সোম শুক্রবারে সমস্তদিন ধরিয়া একটি হাট বসে ; উহা বড়দলের মত না হইলেও সুন্দরবনের একটি বড় হাট ; ধান চাউলই প্রধান পণ্য।

অবস্থান গুণে মরেলগঞ্জ একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে। হাট যত বড় হইতে লাগিল, নানা দেশীয় পণ্য-তরণী এখানে আসিতেছিল। ১৮৬৯ অব্দে গবর্ণমেণ্ট মরেলগঞ্জকে বন্দর (Port) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন এবং বড় বড় জাহাজ এখানে আসিবার ব্যবস্থা হয়।[২] ক্রমে সাহেবদিগের উদ্যোগে মরেলগঞ্জে একটি থানা, স্কুল, সবরেজেষ্ট্রী আফিস ও ডিস্পেন্সারী বসিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারুইখালি গ্রামটি মরেল সাহেবদিগের ছিল।[৩] ঐ গ্রামে সাহেবদিগের সময় বহু কৃষকের বসতি হইয়াছিল। মরেলগঞ্জে নীলের চাষ ছিল না বা এখানকার সাহেবেরা যশোহরের নীলকরদিগের মত অসঙ্গত নীতিতে

১ Sir J. P. Grant's Minute on the Indigo Commission, para 59: Buckland, Vol, I. p. 260.

২ Hunter, *Jessore* pp. 232-3.

৩ এই বারুইখালির অন্য নাম ফকিরের-তাকিয়া। কারণ সাহেবদিগের আগমনের বহু পূর্ব্বে কালাচাঁদ নামক এক বিখ্যাত ফকির, তাঁহার শিষ্য কচুয়াথানার মোঙ্গল জমাদারকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়া জঙ্গলের মধ্যে আস্তানা করেন। মোঙ্গল সে আস্তানার কাছে পরে সপরিবারে বাস করেন। এবং তাঁহার জামাতা রবিউল্যা কাজি ফকিরের চেলা হন। ফকিরের আদেশে প্রতিবৎসর ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে ঐ আস্তানার পার্শ্বে মেলা বসিত, তাহাতে ৭।৮ হাজার লোক সমাগম হইত। এখনও বছর বছর মেলা বসে, লোকসংখ্যা কম হয় না। এখন রবিউল্যার পৌত্রগণ আস্তানার উপস্বত্বভোগী। আবাদ সম্বন্ধে ফকিরের একটা উক্তি ছিল : 'আবাদ করিবে টুপিওয়ালা, খাবে টিকিওয়ালা।' আবাদ সাহেবের হাত হইতে হিন্দুর হাতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ব্রাহ্মণস্ব হয় নাই।

দাদন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই। প্রজাদিগের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া তাঁহারা বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। খুল্‌না তখন মহকুমা মাত্র; সেখান হইতে মরেলগঞ্জ বহুদূরে দুর্গম স্থানে অবস্থিত; মরেলেরাই সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, গবর্ণমেণ্টের আইন-কানুনের ধার না ধারিয়া তাঁহারা এক প্রকার স্বাধীনভাবে প্রজা শাসন করিতেন। রবার্ট মরেল্ সুবিজ্ঞ ব্যক্তি হইলেও যে সময় সময় শাসন বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইতেন না, তাহা নহে; তিনি অনেক সময় ঠিক থাকিলেও তাঁহার কার্য্যকারকেরা সর্ব্বদাই মাত্রা ছাড়াইতেন, এবং কার্য্যতঃ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন কতকগুলি বেতনভোগী লাঠিয়াল ছিল, উহাদের দলপতি ছিলেন তাঁহার ম্যানেজার হেলি (Denys Hely) সাহেব। এই হেলি প্রথম সামান্য বেতনের সৈনিক ছিলেন, সেই চাকরী ত্যাগ করিয়া পয়সার লোভে মরেলের সরকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন।[১] এই হেলির দোষে বারুইখালির প্রজার সঙ্গে একটা ঘোর দাঙ্গা হয়; তেমন দাঙ্গা যখন তখন হইত।[২] যে একটা ঘটনায় মরেলদিগের পতনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল, তাহাই এখানে বলিব।

বারুইখালির একজন মাতব্বর প্রজার নাম রহিমউল্যা; এই সুস্থ সবল কর্ম্মঠ কৃষকের অবস্থার অতিরিক্ত তেজস্বিতা ছিল। তিনি হেলির অপব্যবহার জন্য উদ্রিক্ত প্রজার পক্ষাবলম্বন করিতেন। তাই সাহেব তাঁহার উপর জাতক্রোধ ছিলেন। ১৮৬১ অব্দের নভেম্বর মাসে রহিমউল্যার সহিত তাঁহার প্রতিবেশী গুণীমামুদ তালুকদারের সীমানা লইয়া বিবাদ হয়; হেলি সাহেব তাহার মিটমাট করিতে গিয়া গুণীমামুদের প্রতি পক্ষপাতিতা দেখান। রহিমউল্যা তাহা না মানিয়া সাহেবকে কিছু অপমানসূচক গালি দেন। উহা সহ্য করিতে না পারিয়া হেলি কতকগুলি লাঠিয়াল লইয়া রহিমউল্যাকে নির্য্যাতন করিতে যান। কিন্তু সেদিন সাহেবের পক্ষে রামধন মালো খুন হইলে তিনি রণে ভঙ্গ দেন। দ্বিতীয় দিন বহুসংখ্যক লাঠিয়াল লইয়া রহিমউল্যার বাড়ী ঘেরাও করেন। রহিমউল্যার অল্পসংখ্যক স্বজন এবং কিছু গুলিবারুদ ছিল। উহার সাহায্যে তিনি সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীর চারিধারে

১ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী', ১১৯ পৃ।

২ ঐ সময় 'Friend of India' কাগজে বাহির হয়—'Such affrays have been only too common.'

গড়কাটা ছিল, সুন্দরবনের অনেক বাড়ীতে এমন থাকে। সম্মুখের সদর পথে ভিজা কাঁথা টাঙ্গাইয়া কৃষকবীর উহার আড়াল হইতে সমস্ত রাত্রি গুলি চালাইয়াছিলেন। গুলি ফুরাইয়া গেলে স্ত্রীলোকের হাতের রূপার কঙ্কণ (কাহন) ভাঙ্গিয়া উহার খণ্ডাংশগুলি দ্বারা গুলির কার্য্য চালাইয়াছিলেন। অবশেষে গুলিবারুদ নিঃশেষ হইলে রাত্রিশেষে রহিমউল্যা ঢাল ও রামদাও হস্তে করিয়া লম্ফ দিয়া পড়িলেন, তখন হেলি ও অন্য একজনের গুলিতে রহিমউল্যার মৃত্যু ঘটিল। সেইখানেই যুদ্ধ শেষ হইল। আত্মরক্ষা ও স্বজাতির মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য রহিমউল্যা যে প্রাণপাতী যুদ্ধ করিলেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। এই যুদ্ধে ১৭ জন হত এবং বহুজন আহত হয়, অধিকাংশই সাহেব পক্ষের। শবগুলি জঙ্গলে লইয়া পুড়াইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বদিন হইতে গ্রামের লোক অনেক পলাইয়াছিল; যাহা বাকী ছিল, সাহেবের লোকেরা পরদিন সকাল পর্য্যন্ত তাহাদের সব বাড়ী লুঠ করে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, এমন কি স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়া অত্যাচার করিতেও ছাড়ে নাই। এই পাপে সাহেবদিগের সর্ব্বনাশ হয়।

এই সময়ে সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুল্‌নার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্। সকলেই জানেন, তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি, এ, উপাধি-ধারী। পাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী হয়। যশোহরে সে চাকরীর আরম্ভ এবং খুল্‌নায় তাঁহার প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। খুল্‌নাতেই তাঁহার প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ হয়। খুল্‌নায় আসিয়াই তিনি কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত Indian Field সংবাদপত্রে "*Rajmohan's Wife*" নাম দিয়া একটি ক্রমিক গল্প প্রকাশিত করিতেছিলেন; এই স্থানে বসিয়াই তিনি তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি ১৮৬০ সালের নভেম্বর হইতে ১৮৬৪ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কাল খুল্‌নায় ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি জলদস্যুদিগের ডাকাইতি ও অন্য নানাবিধ অত্যাচার নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।[১] যখন দেখি, এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র অজাতশ্মশ্রু যুবক, তাঁহার

১ 'While in charge of Khulna subdivision he (Bankimchandra) helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals'—Buckland, *Bengal*, Vol. II, p. 1079.

বয়স ২৩।২৪ বর্ষ মাত্র, অথচ সেই যুবকের প্রতাপে মহকুমা টলটলায়মান, আর যখন ভাবি, দৌরাত্ম্য-পীড়িত প্রদেশের কঠোর শাসনের মধ্যে তিনি তাঁহার যুগান্তকারী উপন্যাসের প্রথমখানির রচনা শেষ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

যেদিন বারুইখালিতে ভীষণ দাঙ্গা ও রহিমউল্যার হত্যা হয়, সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র ফকিরহাট থানায় ছিলেন।[১] ঘটনার দুইদিন পরে সেখানে তাঁহার নিকট খুনের এজাহার হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি যশোহর হইতে ৫০ জন সিপাহি-সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা করিয়া, স্বয়ং নৌকাযোগে স্বল্প পুলিসসহ মরেলগঞ্জ রওনা হন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি নির্ভীকভাবে দাঙ্গার স্থান ও পরদিন সাহেব-দিগের কুঠি প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, কিন্তু সিপাহি পৌঁছিবার পূর্ব্বে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু গুপ্তচরমুখে সিপাহি প্রেরণের সংবাদ পাইবা-মাত্র মরেল ও হেলি প্রভৃতি সাহেবেরা এবং প্রধান কর্ম্মচারীরা সকলে রাত্রি-যোগে পলায়ন করেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, বঙ্কিমের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া খুল্‌নায় নীত হইল। বহু তদন্তের পর তিনি জোর কলমে তীব্র মন্তব্য সমেত সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। বেন্‌ব্রিজ (Bainbridge) সাহেব তখন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট্, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হন। বঙ্কিমচন্দ্র হেলি ও অন্যান্য আসামীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সাহেবদিগের একজন প্রধান কার্য্যকারক দুর্গাচরণ সাহা পলায়ন করতঃ রাধামাধব দাস নামে বৃন্দাবনে লুক্কায়িত ছিলেন, বঙ্কিমের ওয়ারেণ্ট সেখানে পৌঁছিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। হেলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করিয়া বম্বে হইতে পলাইতে-ছিলেন, পুলিস সেখান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। ইঁহারা ধৃত

১ এই সময়ে আমার পিতৃদেব ৺প্যারীমোহন মিত্রের বয়স ১৯।২০ বৎসর মাত্র। তিনি খুল্‌নায় বঙ্কিমচন্দ্রের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং মফঃস্বল-ভ্রমণে এবার তাঁহার সহচর ছিলেন। তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বারুইখালির শোচনীয় দশা স্বচক্ষে দর্শন করেন। গরুবাছুর ঘরবাড়ী ফেলিয়া গ্রাম হইতে সব লোক পলাইয়া গিয়াছিল, কত গৃহ পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কত লোক খুন হইয়াছিল, তাহা ঠিক করা গেল না। তদন্তকালে বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুগম্ভীর মূর্ত্তির কথা পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি। আমি নিজে মরেলগঞ্জে গিয়া স্থানীয় অনুসন্ধানেও অনেক বার্ত্তা জানিয়াছি।

হইবার পূর্ব্বেই বঙ্কিমের তদন্ত-রিপোর্ট যশোহরে প্রেরিত হয়; তিনি নিজে তদন্তকারী বলিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিলেন না। ১৮৬২ সালের জানুয়ারী হইতে নূতন পেনাল কোড প্রচারিত হয়; ঘটনাটি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়া তিনি যে এ মোকদ্দমা বিচার করিতে সমর্থ, তাহা তিনি বুঝাইয়া দিতে ছাড়েন নাই। তদন্তকালে সাহেবেরা বঙ্কিমকে লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে এবং উহা লইতে না চাহিলে খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি বিচলিত হন নাই।[১]

যশোহরে দায়রার বিচারে একজনের ফাঁসি এবং ৩৪ জন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। দুর্গাচরণের কয়েক বৎসর জেল হইয়াছিল; তাহার পুত্র ও পৌত্র এখনও মরেলগঞ্জ ষ্টেটে চাকরী করিতেছেন। রবার্ট মরেল ঘটনার সময়ে বরিশালে ছিলেন, তিনি আসামী শ্রেণিভুক্ত হন নাই। হেন্‌রি মরেল বিলাতে পলাইয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। হাইকোর্টের দায়রায় হেলি প্রভৃতি গোরাদিগের বিচার হয়, কিন্তু কেহ হেলিকে সনাক্ত করিতে না পারায় তিনি খালাস পান। লোকে বলে, কয়েক বৎসর পরে আসামের কোন স্থানে বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই মোকদ্দমার ব্যাপার প্রায় ১৪।১৫ বৎসর চলিয়াছিল; তাহাতে সাহেবদিগের যথেষ্ট অর্থব্যয় ও গ্লানি ভোগ হয়। ইহারই মধ্যে বড় সাহেব রবার্ট মরেল বরিশালে গতাসু হন। মরেলগঞ্জে তাঁহার জন্য একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। হেন্‌রীর মৃত্যুর পর একমাত্র উইলিয়ম্ জীবিত ছিলেন। দাঙ্গার পর রবার্ট সাহেব হেলিকে বরখাস্ত করিয়া লাইটফুট (Lightfoot) সাহেবকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন; তিনি বিশেষ বিবেচক ও ন্যায়পর লোক ছিলেন এবং তিনি ষ্টেটের অংশীদার হইয়াছিলেন।

রবার্টের মৃত্যুর পর ১, ২, ৩ নং লাট মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করা হয়। তিনি বন্ধকী ষ্টেট হস্তগত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে ১৮৭৮ অব্দে সে সুযোগ আসিল; মরেল ভ্রাতৃগণের মধ্যে একমাত্র জীবিত উইলিয়ম দেনার জন্য বিষয় বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে,

১ 'বঙ্কিম-জীবনী', ১২৪-৭ পৃ।

পর বৎসর মহারাজ লাহা, ডগলাস কোম্পানির নিকট বন্ধকী ৪নং লাট ও বারুইখালির দেনা শোধ করিয়া দিয়া মরেলদিগের সমস্ত সম্পত্তি নিজে খরিদ করিয়া লন। তাঁহাদের অন্য সম্পত্তি সোণাখালি প্রভৃতি রাজা দিগম্বর মিত্রের নিকট বিক্রীত হয় এবং তুষখালি শেষ মরেল বাকী করের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ইস্তাফা করেন। তদবধি মরেলগঞ্জ ষ্টেট লাহারাজগণের স্বত্বাধীন আছে এবং খুল্না জেলার মধ্যে ইহার মত লাভের সম্পত্তি অন্য কোন জমিদারের নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

সমাজ ও আভিজাত্য

সমাজের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় চরিত্রের অভিনয় সামাজিক চিত্রেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল সমাজ; সমাজই সভ্যতার আশ্রয়স্থল; ব্যষ্টির চরিত্রই সমষ্টি বা সমাজের ভিত্তি। সমাজ লইয়াই যশোহর-খুল্‌নার প্রধান গৌরব; সে হিসাবে এই প্রদেশ বঙ্গের সংক্ষিপ্ত সার। সুতরাং ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে হইলে, বহু জাতি-তত্ত্ব ও বংশ-কাহিনীর আলোচনা করিতে হয়। অবশ্য নানা প্রসঙ্গে ইহার কতক অংশের আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি; তবুও এখানে অবশিষ্টের স্থান সংকুলান হইতে পারে না। উহার বিবরণ ৩য় বা পরিশিষ্ট খণ্ডে দিব, ইচ্ছা রহিল। এখানে শুধু যশোহর-খুল্‌নার অতিকায় সমাজের অস্থি-পঞ্জরের একটা ক্ষীণ আদর্শ দিতেছি।

সমতটের অন্তর্গত যশোহর-খুল্‌না রাঢ়ের মত সুপ্রাচীন নহে। সুন্দরবনের নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ে এদেশ অনেকবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। সে বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। প্রাচীন বসতির কিছু কিছু চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু প্রাচীন সমাজের অবশেষ নাই বলিলে চলে। এখন যে বসতি ও সমাজ চলিতেছে, উহা পাঁচশত বর্ষের অধিক নহে। ঐ সময়ের মধ্যে নানা সূত্রে রাঢ় ও বঙ্গের সামাজিকেরা এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। একটা কোন বিপ্লব, উৎপীড়ন বা উৎকট ঘটনা না হইলে বাসের পরিবর্ত্তন ঘটে না। যে সকল কারণে নানা দিক হইতে বিভিন্ন সময়ে লোকে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ, কোন রাজা বা প্রতাপশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজ গড়িয়া উঠে; চাক্‌রী বা অন্য সম্বন্ধ বশতঃ নানাস্থানের লোকে আসিয়া রাজপাটের সন্নিকটে বাস করে। খাঁ জাহান আলির সঙ্গে কত আবাদকারী প্রজা বা দুঃসাহসিক ভৌমিক এদেশে আসেন; বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্যের রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে 'যশোহর-সমাজ' গঠিত হয়; সীতারামের আবির্ভাবে ভূষণা-সমাজের বহুল সংস্কার হয়; ইংরাজ আমলে সদর ও মহকুমাগুলির সহরে ও সন্নিকটে আমলা বা ব্যবসায়ীর নূতন উপনিবেশ গঠিত হইতেছে। সুতরাং প্রধানতঃ রাজনৈতিকতাই এ অঞ্চলের বসতির মূল। প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি

নৃপতির অভ্যুদয় কালে যুদ্ধ বা অন্য কর্ম্মোপলক্ষে এদেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তির আগমন হয়। ক্রমে শাসন প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইলে কর্ম্মক্লান্ত যোদ্ধাগণ পূর্ব্বনিবাসে ফিরিয়া না গিয়া, সবলে কিছু কিছু ভূসম্পত্তি দখল করিয়া এদেশে বাস করেন। পরে তাঁহারা সেই অরাজকতার যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া, এদেশের ভূমিজলের সঙ্গে চিরসম্পর্কিত হইয়া যান। এখানে ভূমি স্বল্পায়াসে শস্যভারে হাস্যময়ী হয়; নদীবহুলতায় মৎস্যাধিক্য দ্বারা সহজলভ্য অন্নরাশির উপযুক্ত উপকরণ জুটে; গ্রাসের ব্যবস্থা হইলে আচ্ছাদন বা বাসগৃহের অসংস্থান হইত না; নিম্নবঙ্গে বস্ত্রাধিক্যের প্রয়োজন বা চলন ছিল না; দেশে কার্পাস জন্মিত, অন্যস্থান হইতে শিল্পী আসিত, সুতরাং আবশ্যক বস্ত্রের অভাব হইত না। স্থানীয় বাঁশ, খড়, ও হোগলার সাহায্যে এখানে যেমন অত্যন্ত সস্তায় প্রয়োজনমত ভাল-মন্দ গৃহ রচনা করা যায়, সমগ্র বঙ্গ বা ভারতবর্ষের কোথায়ও সে সুবিধা নাই। সূক্ষ্মানুসন্ধানে জানিতে পারি, ভুঞা বা অন্য রাজন্যবর্গের প্রভাবকালে প্রজার জীবন অস্থির ও অস্থায়ী ছিল, তাঁহাদের পতনের পর প্রজারা স্থায়ী বাসিন্দা হইলেন; কুলীনগণ অস্ত্রধারী বা কর্ম্মচারী হইয়াও এদেশে আসিতেন, কুলধর্ম্মের মাহাত্ম্যই তাঁহাদের আগমনের প্রধান কারণ নহে। তাই দেখি, রাজনৈতিকতায় সমাজ গঠিত, অধীনতার যুগে উহা পরিপুষ্ট। প্রতাপাদিত্য নাই, কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কিরূপে তাঁহার সম্বন্ধসূত্র সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়তঃ, মগফিরিঙ্গি ও অন্যজাতীয় দস্যুদুর্ব্বৃত্তের উৎপাতের জন্য সামাজিকেরা জাতিমানের ভয়ে দেশমধ্যে নানাস্থানে বাস পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহ এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বহু উচ্চপদস্থ সামাজিক রাঢ় ত্যাগ করিয়া যশোহর-খুল্‌নায় আসিয়াছেন। অর্থাৎ ১৫৭৫-১৬২৫ এবং ১৭০০-১৭৫০ এই দুইটিকে সমাজ পত্তনের যুগ বলিতে পারি।

গঙ্গাতটে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রাচীন সমাজ স্থাপিত ছিল, উক্ত দুই যুগে সমাজের সেই একটি ধারা ত্রিধারা হইয়া যশোহর-খুল্‌নায় আসিয়াছিল। পশ্চিম-দক্ষিণে যমুনা-ইচ্ছামতী, উত্তর-পূর্ব্বভাগে নবগঙ্গা-মধুমতী, মধ্যভাগে ভৈরব-কপোতাক্ষী—এই তিনটি নদীযুগ্মের তীরভাগ সমাজের সেই ত্রিধারার

প্রবাহ নির্দ্দেশ করিতেছে।[১] আমরা নিম্নে যে সকল সমাজস্থানের নাম করিব, তাহার সবগুলিই প্রায় এই কয়েকটি নদীকূলে অবস্থিত। এইবার আমরা ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বজাতীয় প্রধান সামাজিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান দেখাইব।

ব্রাহ্মণ-সমাজ

সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি। যশোহর-খুল্‌নায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ সমধিক প্রবল, বৈদিক ও বারেন্দ্রের সংখ্যা স্বল্প। তন্মধ্যে বারেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম, খুল্‌নার বুড়ন পরগণায়, যশোহরের মাগুরা মহকুমায় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ-প্রধান বড় বড় গ্রামে দুইচারি ঘর প্রধান বারেন্দ্র বংশ আছেন। এক সময় সাতক্ষীরায় বারেন্দ্র ভট্টাচার্য্যগণের বসতিজন্য ভাটপাড়া-কলাগাছি একটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখনও গঙ্গাচরণ বেদান্ত-বিদ্যাসাগর এই বংশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ও কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ বল্লালী কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন।

অনেককাল হইতে উচ্চবর্ণের গুরুপুরোহিতরূপে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও সমাজে প্রতিপত্তিশালী। বঙ্গে যে সব বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহারা দ্বিবিধ: দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য। দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বিশেষ বাস যশোহর-খুল্‌নায় নাই। প্রতাপাদিত্যের আনীত ৺গোবিন্দদেবের সেবায়ৎ রায়পুরের অধিকারিগণ উড়িষ্যা হইতে আসেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরে রাজানুগ্রহে রাঢ়ীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশে বৈদিকেরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈদিক। উঁহাদের গোত্র সংখ্যা ২৪টি, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ ও শুনক —এই পঞ্চ গোত্র প্রধান।[২] ইঁহারা পঞ্চগোত্রীয়, অবশিষ্ট সকলে পারিভাষিক হিসাবে ষড়গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হন। মাগুরার অন্তর্গত বারুইখালি বৈদিকদিগের প্রধান সমাজ; এখানকার শুনক ('ধলছত্রের শৌনক')

১ চিত্রা ও ভদ্র যথাক্রমে ভৈরব ও কপোতাক্ষীর শাখা। সুতরাং তত্তীরবর্ত্তী সমাজ মূল নদীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 'কঙ্কালমালিনী' তন্ত্রে ভৈরব ও চিত্রা সঙ্গমের কথা উক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সেখানে একটি প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র ছিল। প্রথম খণ্ডে আধুনিক সেখহাটির কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছি।

২ বৈদিককুলদীপিকা, 'বিশ্বকোষ', ৪র্থ খণ্ড, ৩৩৮ পৃ।

বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ রসিক কবি কবিচন্দ্র এবং কাশ্মীর জম্বু পাঠশালায় ভূতপূর্ব্ব ন্যায়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ ন্যায়তর্কতীর্থ এই বংশীয়। শুধু শুনক নহে, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, ঘৃতকৌশিক ও কৃষ্ণাত্রেয় প্রভৃতি গোত্রীয় বৈদিকগণ বারুইখালি ও বায়নায় (বানা) বাস করেন এবং নালিয়ার (কাশ্যপ) ভট্টাচার্য্যগণ সমাজে আদৃত। অসংখ্য বৈদিক পণ্ডিতের বসতির জন্য বারুইখালি একসময়ে নবদ্বীপের মত সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান ছিল। এখনও এখানে একটি সংস্কৃত কলেজ চলিতেছে। নড়াইলের নিকটবর্ত্তী উজিরপুর মৌদ্‌গল্য-বৈদিকের প্রধান কেন্দ্র। এই বংশীয় কৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন; প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্করত্ন এই কৈলাসচন্দ্রের শিষ্য। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ সাংখ্যবেদান্তশাস্ত্রী উজিরপুরের বৈদিক বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। যশোহরে বকুলতলা, আউড়িয়া, নহাটা, বাটাজোড়, সরশুনা, পলাশবাড়িয়া, কুমড়াদহ, আবইপুর প্রভৃতি স্থানে মৌদ্‌গল্য ও কৌশিক গোত্রীয় বৈদিকের বাস। খুল্‌নার দক্ষিণাংশে ধলবাড়িয়া. ঘলঘলিয়া, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের বাৎস্য-গোত্রীয় বৈদিকের কথা এবং তৎপ্রসঙ্গে বশিষ্ট-গোত্রীয় নারায়ণ ভট্ট কিরূপে প্রাচীন যশোহর হইতে উঠিয়া ভট্টপল্লীতে গঙ্গাবাস করেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৯৬ পৃ)।

যশোহর-খুল্‌না রাঢ়ীয় কুলীনদিগের প্রধানস্থান। বল্লালসেন রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে বাছিয়া কৌলীন্য দেন, লক্ষ্মণসেন কুলবিধির সংস্কার করেন, উহার ফলে কৌলীন্য বংশগত হইয়া যায়। কুলীনগণ আভিজাত্য বেচিয়া জীবিকার সংস্থান করেন, অকুলীনেরা বেদ ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া 'শ্রোত্রিয়' হন। মুসলমান যুগে নানা বিপ্লবে বসতি-বিপর্য্যয় হওয়ায় কয়েকজন কুলীন সুপাত্রের অভাবে প্রতি-গ্রাহী ব্রাহ্মণে কন্যাদান করিয়া কুল হারাইয়া বসেন, উঁহারা বংশজ বলিয়া চিহ্নিত হন। কুলীনদিগের সহিত শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদান চলিত, কিন্তু বংশজের সম্বন্ধ চলিত না; ক্রমে বংশজেরা শ্রোত্রিয়কেও কন্যাদান করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহারা সমাজে এইভাবে নিগৃহীত হইয়া পরের কুলভঙ্গ করিতে চেষ্টা করেন; যাঁহারা বংশজের কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা 'ভঙ্গকুলীন' বলিয়া গণ্য হন। বংশজেরা কুলভঙ্গ করাইবার জন্য অর্থবলে কূটকৌশলের অবতারণা করিতেন। অর্থলোভে কুল হারাইয়াও লোকে স্বর ছাড়িলেন না, 'স্বকৃতভঙ্গ', 'দুই বা তিন পুরুষে ভঙ্গ' প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) কুলীন, (২) শ্রোত্রিয়, (৩) ভঙ্গকুলীন ও (৪) বংশজ।

কৌলীন্যের মূল্য যাহাই থাকুক, উহা যে সমাজকে বিচূর্ণ এবং ব্রাহ্মণকে আদর্শচ্যুত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভঙ্গ ও বংশজের সংঘর্ষে বা অন্যবিধ অধঃপতনের ফলে কুলীন-সমাজে এত প্রকার দোষ প্রবেশ করিয়াছিল যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেবীবর ঘটক বংশানুক্রমে দোষের তালিকা নির্ণয় করেন এবং একই প্রকার কতকগুলি দোষ যাহাদের আছে, তাহাদিগকে এক এক শ্রেণী বা 'মেল'-ভুক্ত করেন। দেবীবরের ব্যবস্থায় রাঢ়ীয় কুলীনগণ এই প্রকার ৩৬টি মেলে বিভক্ত হন। মেলের উৎপত্তি, আদিস্থান, এবং প্রবর্ত্তক ব্যক্তির (অর্থাৎ 'প্রকৃতির') নামানুসারে মেলের নামকরণ হয়। মেল ভাঙ্গিয়া বিবাহ হইত না, এক মেলের ভিতর যাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে পারে, তাঁহারা পরস্পর পাল্‌টি ঘর। ৩৬টি মেলের ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী বা সুরাই এই চারিটি মেল প্রবল; পণ্ডিতরত্নী এবং আচার্য্যশেখরী প্রভৃতি আরও দুই একটি মেলও সুবিদিত। এই কয়েকটি মেলেরই নির্দ্দোষ বা 'নিকষ' কুলীনগণ যশোহর-খুল্‌নায় বাস করিতেছেন। কুলীনের কুলভঙ্গ হইবার যতদিন পর পর্য্যন্ত মেলভঙ্গ না হয়, ততদিন 'ভঙ্গ' খেতাব চলে; মেলভঙ্গ হইলেই বংশজ হইয়া যান। ভঙ্গে বংশজে এইটুকু মাত্র প্রভেদ।

কনৌজ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ সস্ত্রীক এদেশে আসিয়া রাঢ়ে বাস করেন, পরে উঁহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় বাসের জন্য রাঢ়দেশে ৫৬ খানি শাসন বা গ্রাম প্রাপ্ত হন। ঐসকল গ্রামের নামে তাঁহারা গ্রামীণ বা গাঞি বলিয়া চিহ্নিত হন। তন্মধ্যে গোত্রানুসারে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গাঞির উল্লেখ করিতেছি। ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের সন্তানগণ মুখটি ও ডিংসাই প্রভৃতি গাঞিভুক্ত; শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সন্তানেরা বন্দ্য, কুশারি, বটব্যাল প্রভৃতি, কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষের সন্ততি চট্ট, হড়, গুড় প্রভৃতি; সাবর্ণি গোত্রীয় বেদগর্ভের বংশধরগণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি এবং বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের সন্তানগণ ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল, কাঞ্জারী, শিমলাল প্রভৃতি গাঞি বলিয়া পরিচিত। কেহ স্পষ্টতঃ মুখোপাধ্যায়, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল প্রভৃতি গাঞির নামে, কেহ বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধির অন্তরালে কুলীন, বংশজ বা শ্রোত্রিয় সমাজে বিরাজ করিতেছেন। যশোহর-খুল্‌নায় প্রায় সকল কুল, সকল মেল এবং

অধিকাংশ গাঞ্রির অধিষ্ঠান আছে। প্রথমতঃ মেলী কুলীনদিগের কথা বলিতেছি। জয়পুর, লক্ষ্মীপাশা ও প্রতাপকাটির বন্দ্য বা বাঁড়ুয্যেগণ ফুলিয়া মেলের শ্রেষ্ঠ নিকষ কুলীন; আল্তাপোল ও বাজিতপুরের বাঁড়ুয্যে, কাশীপুর ও ঘাটভোগের চট্ট, গাদগাছি ও মস্বিননগরের চৈতলী চট্ট, পিঠাভোগ, লখপুর, বনগ্রাম, পীলজঙ্গ ও সেনহাটির মুখুয্যে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলীনেরা খড়দহ মেলভুক্ত। সেনহাটিতে প্রধান চারিমেলেরই কুলীন আছেন, মহেশ্বর পাশার বল্লভী, সুরাই ও আচার্য্যশেখরীর বাস। শেষোক্ত মেলের কুলীনগণ কাশীপুর, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, ইতিনা, সরগুনা, আফরা ও সেখহাটি প্রভৃতি স্থানে আছেন। পান্তাপাড়া ও ইতিনার কাঞ্জিলালগণ সুরাই মেলের শ্রেষ্ঠ কুলীন।

কুলীন বংশজের মধ্যে যশোহর-খুল্নার নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ বংশগুলি সমাজের মধ্যে মহোজ্জ্বল। লক্ষ্মীপাশা ও জয়পুরের বন্দ্য ও মুখো, নকীপুর, নকফুল, বাঁকা, ছঘরিয়া ও আলতাপোলের বন্দ্য, কাশীপুর, খান্কা ও ঘাটভোগের চট্ট, সারষার মুখো, বিষ্ণুপুরের শাণ্ডিল্য রায় ও ফুলিয়া মুখো, বারুইখালির মুখো, সেনহাটির সুন্দরমল্ল বংশীয় সিদ্ধান্ত-ভট্টাচার্য্য (বন্দ্য, ৪৩২-৩ পৃ), চন্দনীমহলের ভট্টাচার্য্য (কাচ্নার মুখটী, গ্যাকরের সন্তান) এবং ধনবিজয় চট্ট, ঈশ্বরীপুরের অধিকারী চট্ট (৪৫১-২ পৃ), জয়দিয়ার রায়চৌধুরী ও সুরাই মুখো, লখপুরের কাশ্যপ-চৌধুরী ও চাঁচড়ী-বিষ্ণুপুরের কাশ্যপ-ভট্টাচার্য্য, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য, (কাচ্নার মুখটী), আঠারখাদার চক্রবর্ত্তী (বন্দ্য), বারুইপাড়ার শাণ্ডিল্য রায়, নলডাঙ্গার রাজ-বংশীয় দেবরায় (আখণ্ডল বন্দ্য, ৪৭০-২ পৃ), ঘাটভোগ ও গদখালির আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য ও সুঁতির আখণ্ডল-রায়, মল্লিকপুরের বাৎস্য-ভট্টাচার্য্য (কানু-কাঞ্জিলাল), আজগড়ার ঘোষাল, ভুগিলহাটের বাৎস্যপুতিতুণ্ড ভট্টাচার্য্য, আঁধার-মাণিকের কাশ্যপ-ভট্টাচার্য্য (খনিয়ার চাটুতি, ৮৮-৯ পৃ), মহেশ্বরপাশার চট্ট, বোধখানা, দেয়ানা ও বানার রায় (ভরদ্বাজ), পীলজঙ্গের গুরু-ভট্টাচার্য্য (বাৎস্য-কাঞ্জিলাল), মূলঘর, মহেশ্বরপাশা ও পাবলার 'মুখভারত' ভট্টাচার্য্য (বাৎস্য-কাঞ্জিলাল) প্রভৃতি বংশগুলি বিশেষ বিখ্যাত।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে সারল, কুন্দসী ও সেনহাটীর কাণ্ডারী বংশ 'বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও সৎক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিখ্যাত।' ঘাটভোগ, বেন্দা ও সেনহাটির সর্ব্ববিদ্যা (পাকড়াশী) সন্তানগণ দেশমান্য গুরুবংশীয়। মহেশপুরের শিমলাল ভট্টাচার্য্য এবং প্রতাপকাটি, চাঁপাফুল, কামালপুর, সাগরদাড়ি ও

কোঁড়ামারার 'ভারতী'-বংশীয় শিমলায়ী কাশ্যপ-ভট্টাচার্য্যগণ প্রসিদ্ধ অবিলম্ব সরস্বতীর বংশধর সিদ্ধশ্রোত্রিয় (২৪৯-৫০)। মহেশপুর, বিছালী ও দক্ষিণ-ডিহির গুড়-বংশীয় রায় চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ার জন্য খ্যাত। ঘাটভোগ ও পিঠাভোগের কুশারিগণ বহুকুলীনের আশ্রয়দাতা, ইহাদেরই একাংশ পীরালি সংস্রব-দোষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ 'ঠাকুর' বংশে পরিণত। সেনহাটি, কালিয়া ও গদখালির হড় এবং ইছাপুরের হড়-চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। সেথ-হাটির মাষচটক, মল্লিকপুরের পারি-শ্রোত্রিয় মল্লিক-গোষ্ঠী, সিঙ্গিয়া ও বড়গাতির সুন্দরামল্ল শ্রোত্রিয় গুরুভট্টাচার্য্যগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কত কবি, পণ্ডিত ও কৃতী পুরুষের জন্মগ্রহণে যে যশোহর-খুল্‌নার কুলীন ও শ্রোত্রিয়-বংশ উজ্জ্বল হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। ঘটকরাজ লালমোহন বিদ্যানিধি (মহেশপুর নিবাসী) মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে 'অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের মধ্যে বাৎস্য গোত্রেই অধিক সংখ্যা দেখা যায়।' মহেশপুরের শিমলাল-ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি 'অন্তর্ব্যাকরণ-নাট্য-পরিশিষ্ট' নামক প্রসিদ্ধ নাটকাদি প্রণয়ন করেন। সেনহাটির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বেদান্ত-বাগীশ এবং পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু কাণ্ডারীবংশীয়; বিশ্ববিখ্যাত তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি সারলের কাণ্ডারী কুল-প্রদীপ। ঘাটভোগ নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র চূড়ামণি এবং বেন্দার প্রসিদ্ধ বক্তা মধুসূদন আগমবাগীশ ও সাধক-শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র সর্ব্ববিদ্যাবংশীয় দেশমান্য ব্যক্তি। পণ্ডিত হরিনাথ বেদান্তবাগীশ সেনহাটির সিদ্ধান্ত। মল্লিকপুরের ভট্টাচার্য্য বংশীয় বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত, ইছাপুরের হড়-চৌধুরী রাঘব সিদ্ধান্ত, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশের আদিপুরুষ চৈতন্যদেবের পার্ষদ মহাপুরুষ লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুরুদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন, নলডাঙ্গার আখণ্ডল বংশের আদিপুরুষ বিষ্ণুদাস হাজরা প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। জয়দিয়ার মুখোপাধ্যায় দেশ-প্রসিদ্ধ নীলাম্বর ও ঋষিবর, গায়ক মতিলাল, ইনস্পেক্টর ফণিভূষণ (P. Mukherji), সারসার সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বাগ্‌আচড়ার ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন। আধুনিক সময়ে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, দৌলতপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহামহাধ্যাপক ব্রজলাল শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ স্মৃতিভূষণ, প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ও নৈয়ায়িক গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশীয় 'বাৎসায়ন ভাষ্যের'

ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, 'ভারতী'-বংশীয় সুবক্তা সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ কেদারনাথ এবং সুলেখক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যশোহর-খুল্‌নার খ্যাতিবর্দ্ধন করিতেছেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছঘরিয়া নিবাসী মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ উকিল ৺মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ঢোলপুর ষ্টেটের রাজসচিব সর্দ্দার উমাচরণ ও তৎপুত্র সর্দ্দার তারাচরণের পূর্ব্বনিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্গত জঙ্গল-বাধালে।[১]

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, তাঁহারা 'সপ্তশতী' পর্য্যায় ভুক্ত। এখনও এই 'সাতশতী' বংশীয় ও পরাশর গোত্রীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ যশোহর-খুল্‌নায় আছেন। ইঁহাদের মধ্যে সেনহাটির ও সাতক্ষীরার 'কাটানি' বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব জগতে যে মহাত্মা 'যবন হরিদাস' বলিয়া পরিচিত এবং ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বলিয়া পূজিত, তিনি বুড়ন পরগণায় ভাট-কলাগাছি গ্রামে পরাশর-গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশ পবিত্র করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বংশ ব্যতীত আরও এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরা যশোহর-খুল্‌নায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ মানসিংহের পার্শ্বচররূপে প্রতাপাদিত্যকে নিগৃহীত করিবার জন্য এদেশে আসেন এবং প্রত্যাগমনকালে সেই সকল পাঁড়ে, তেওয়ারী (ত্রিবেদী), মিশ্র প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা কলারোয়ার নিকটবর্ত্তী সাম্‌টা, চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। ইঁহাদের মধ্যে সাংকৃতি-গোত্রীয়, কৌশিক গোত্রীয় ত্রিবেদী বা 'প্রধান', এবং পাড়ে ও রায় উপাধিধারিগণ সমধিক বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে ও তৎপুত্র দানশীল মনোমোহন পাঁড়ে এবং অধ্যাপক সীতানাথ প্রধান প্রভৃতি এই বংশীয় কৃতী পুরুষ।

বৈদ্যবংশ

বল্লাল সেনের পূর্ব্ব হইতে বৈদ্যবংশে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট, এই তিন শ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে সিদ্ধগণ বল্লালের নিকট কৌলীন্য পান। উঁহাদের মধ্যে আট জনকে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন মুখ্যাষ্ট কুলীন বলিয়া চিহ্নিত করেন : শক্তি-গোত্রীয়

---

১ 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', ৫০২ পৃ।

ছুহি ও শিয়াল, ধন্বন্তরি-গোত্রীয় বিনায়ক ও গয়ি, মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় চায়ু ও পন্থ এবং কাশ্যপ-গোত্রীয় ত্রিপুর ও কায়ু। ইঁহার মধ্যে প্রথম চারি জনের উপাধি 'সেন', চায়ু ও পন্থের উপাধি 'দাস' এবং ত্রিপুর ও কায়ুর উপাধি 'গুপ্ত'।[১] সেন ও 'সেন' দাস উপাধির সঙ্গে গুপ্ত উপাধি যুক্ত হয়। এই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের কুলীনগণ যশোহর-খুল্‌নায় বাস করেন। ইঁহাদিগকে বঙ্গজ বৈদ্য বলে। তন্মধ্যে সেনহাটি সর্ব্বপ্রধান কুলস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেনহাটি-চন্দনীমহল হইতে উঠিয়া যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন, তাঁহারা সকলেই বঙ্গজ বৈদ্য। যাঁহারা রাঢ়দেশে শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি সমাজে রহিয়া যান, তাঁহারা রাঢ়ী বৈদ্য। রাঢ়ী বৈদ্যদিগের দুই এক ঘর মাত্র এদেশে আছেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা সর্ব্বাপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন। আমরা একে একে সংক্ষেপে বঙ্গজ বৈদ্যের সব শাখার বিবরণ দিতেছি। পরে রাঢ়ী বৈদ্যদিগের কথা বলিব।

শ ক্তি গো ত্র ॥ সর্ব্বপ্রথমে ছুহি বা ধোয়ীর কথা বলিব। যে পাঁচজন মহাপণ্ডিত পঞ্চরত্নরূপে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ধোয়ী কবিরাজ অন্যতম। অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঘটক-কারিকার মহাকুলীন ছুহি ও 'শ্রুতিধর ধোয়ী' কবি অভিন্ন ব্যক্তি। ছুহির দুই পুত্র কাশী ও কুশলী; তন্মধ্যে কুশলী বঙ্গে আসেন। তিনি রাঢ় হইতে আসিয়া ভৈরবতটে যে স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে বাস করেন, তাহারই নাম হয় শুভরাঢ়া; তৎপুত্র হিঙ্গু সেন নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি শুভরাঢ়া পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সম্ভবতঃ বৈদ্যডাঙ্গায় (বর্ত্তমান বেজেরডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন) ও পরে পয়োগ্রামে বসতি করেন। এই হিঙ্গু সেনই পয়োগ্রামের হিঙ্গুবংশের আদি। তাঁহার গণ নামক অন্য ভ্রাতা তেঘরিয়ায় এবং মাধব মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত

১ বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্য সন্তানেরা 'দাস' না লিখিয়া 'দাশ' এইরূপ বানান করেন। প্রাচীন বৈদ্যকারিকায় দাস প্রয়োগই আছে। শব্দটি উপাধিবোধক, উহাকে ভৃত্যার্থবোধক না ধরিলেই চলে। বৈদ্যগণ কখনও কায়স্থের ভৃত্যার্থবোধক অতিরিক্ত দাস শব্দ প্রয়োগ করেন না, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে আপত্তিজনক হইত। উপাধি যেমন ছিল, তেমনই আছে; শকারে শুধু পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মাত্র। আমি প্রাচীন কারিকার অনুগত হইয়া দাসের বানান পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখিলাম না। উপাধির বিশেষ অর্থ নাই, দাশ শব্দও এস্থলে নিরর্থক।



মোল্যাহাটির বড় কুঠি



রেণী-দম্পতীর সমাধি, তালিবপুর



লোহাগড়ার জোড়বাঙ্গালা

পাঁচথুপিতে বাস করেন। হিঙ্গুর পৌত্র—নিধিপতি, আদিত্য ও উমাপতি। নিধিপতির ধারা পয়োগ্রামে থাকেন এবং আদিত্যের ধারা ইত্‌নায় ও উমাপতির ধারা পূর্ব্ববঙ্গে যান। উমাপতির বংশধর 'নাড়ী-প্রকাশ'-রচয়িতা শঙ্কর সেন কবিরাজ পয়োগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভারত-বিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন এই উমাপতি-বংশের উজ্জ্বল রত্ন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পয়োগ্রামে বাসগৃহ নির্ম্মাণের পর পরলোকগত হইয়াছেন। নিধিপতির পৌত্র রাম ও পীতাম্বর; পীতাম্বরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়রাম খান্দারপাড়া বাস করেন। জয়রামের পৌত্র মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্রশেখরের পরিচয় এবং তদ্বংশীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫৭৭ পৃ)। রামের পুত্র প্রভাকর বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি। প্রভাকরের সন্তানগণ সৎক্রিয়ান্বিত মহোজ্জ্বল কুলীন। সেই জন্য 'পয়োগ্রামের প্রভাকর' নামে একটি বিশিষ্ট থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বংশে যে কত কবিরাজ, কবিকণ্ঠাভরণ, কবিচিন্তামণি এবং কবীন্দ্র প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ভিষগ্বর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। শেষ কবীন্দ্র, কালিদাস সেন প্রভাকর বংশের মহারত্ন। প্রভাকরের ভ্রাতা ধর্ম্মাঙ্গদের বংশীয়গণ পয়োগ্রাম হইতে সেনহাটি আসেন। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশ। কবিরাজ গৌরকিশোর সেন সেনহাটির হিঙ্গু বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

কুশলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গণ (গণপতি) তেঘরিয়ায় ছিলেন। তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ গঙ্গাধর গুণার্ণব সেখান হইতে সেনহাটি আসিয়া গণপাড়ায় বাস করেন। সে কালের বহু আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ-প্রণেতা এই গঙ্গাধর এবং এ যুগের বিশ্রুতকীর্ত্তি কবিরাজ পীতাম্বর সেন এই 'গণ'-পর্য্যায়ের কৃতী সন্তান।

শক্তি-গোত্রীয় অপর কুলীন শিয়াল সেনের বংশধরগণ কালক্রমে কুল হারাইয়া বংশজ হইয়া যান। উঁহাদের একটি থাককে পুখুরিয়া বলে। সেই ধারার শিয়ালগণ যশোহরের উত্তরাংশে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত মহীশালায় বাস করিতেন। মহীশালা হইতে আগত এক ঘর মাত্র সেনহাটিতে আছেন।

ধ ন্ব ন্ত রি গো ত্র॥ এই গোত্রীয় শ্রীহর্ষ রাঢ়দেশে সেনভূমে রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র কমল ও বিমল; বল্লাল সেনের সময় কমল পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব পান। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন পিতা-পুত্রে যে সমাজগত বিবাদ ছিল, তাহা

সুবিদিত। উহার ফলে বিমল লক্ষ্মণ সেনের নিকট কৌলীন্য পান এবং কমল নিষ্কুলীন হইয়া যান। বিমলের পুত্র বিনায়ক অষ্টকুলীনের অন্যতম। বিনায়কের পুত্র ধন্বন্তরি, তৎপুত্র গাঙেয়ী, তাঁহার ৬ পুত্র মধ্যে হিঙ্গু সেন কৌলীন্য-খ্যাতি-সম্পন্ন; এই হিঙ্গু সেন রাঢ়দেশের মালঞ্চ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটিতে আসিয়া বাস করেন।[১] 'কবিকণ্ঠহারে' আছে (৪৭ পৃ):

'ষণ্ণাং মধ্যে হিঙ্গুসেনো কৌলীন্যে খ্যাতিমিয়িবান্।
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরীমধ্যুবাস সঃ॥'

কেহ কেহ বলেন, সেনহাটির পূর্ব্বনাম ছিল 'ছুঁচো খালি,' হিঙ্গু সেন আসিয়া উহার বিরক্তিকর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সেনহাটি' নাম দেন। ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে সেনহাটি গ্রাম ছিল বা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।[২] কিন্তু তাহা এখনও বিচারসহ হইতে পারে নাই। সুতরাং হিঙ্গু সেনকেই সেনহাটির বৈদ্যনিবাসের আদিপুরুষ মনে করি। দুহি ও বিনায়ক মুখ্যাষ্টকুলীনের দুইজন, তাঁহারা সমসাময়িক। দুহির পৌত্র ও বিনায়কের প্রপৌত্র উভয়ের নাম হিঙ্গু সেন। প্রথম হিঙ্গু শুভরাঢ়ায় এবং দ্বিতীয় হিঙ্গু সেনহাটিতে বসতি করেন। প্রথম হিঙ্গু দ্বিতীয়জন অপেক্ষা বয়সে অধিক হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সমসাময়িক হওয়ার বাধা হয় না। দ্বিতীয় হিঙ্গু সেনহাটিতে আসেন, প্রথম জন শুভরাঢ়া হইতে পরে বা তাঁহার পরপুরুষে

১ আমাদের এতদঞ্চলে চন্দনীমহল গ্রামেই রাঢ় হইতে আগত বৈদ্যদিগের প্রথম বসতি হয়। সম্ভবতঃ তথাকার গুড়-চৌধুরী জমিদারগণের আশ্রয়ে বৈদ্যেরা আসেন। এখান হইতে উঁহারা কতক সেনহাটিতে, কতক পূর্ব্ব বঙ্গে বিক্রমপুরে যান। চন্দনীমহলে এখন বৈদ্যবাস নাই, সুতরাং সেনহাটিকেই আদিস্থান বলা হয়। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে চন্দনীমহল একটি প্রধান ('অম্বষ্ঠতত্ত্ব-কৌমুদী', ৯০-৯১ পৃ)। বিক্রমপুরের বৈদ্যগণ এখনও চন্দনীমহল সমাজভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। বিকর্ত্তনের বংশধর রাঘব কবিবল্লভ চন্দনীমহলে ছিলেন। তৎপুত্র রমানাথ জনাপবাদভীত হইয়া 'ধর্ম্মঘটং সমারুহ্য ধর্ম্মতঃ শুদ্ধিমিয়িবান্' ('কবিকণ্ঠহার,' ৯২ পৃ)। হড়দিগের কারিকায় আছে 'ভট্টাচার্য্য ঘাটে রমাইয়ের ঘটে আরোহণ, যবনের অপবাদ করিতে মোচন।' উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিতে চান, উক্ত রাঘবের নির্দ্দেশমতই সেনহাটির নামকরণ হয়। উহা সত্য নহে, কারণ রাঘবের অপমানের বহু পূর্ব্বে হিঙ্গু সেন সেনহাটিতে বসতি করেন।

২ এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (১ম সং, ২২০, ২৩২ পৃ) এই সব প্রবাদের আলোচনা করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। [১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৪৩-৪ পৃ—শি মি]

পয়োগ্রামে যান। শুভরাঢ়ায় বৈদ্যনিবাস নাই। সুতরাং সেনহাটিকেই আদি স্থান ধরিতে পারি এবং সেইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনহাটিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া উহার নামকরণ হয়।[১]

হিঙ্গু সেনের তিন পুত্র: উচলি, ডমন ও বিকর্ত্তন। উচলির কোন কোন ধারায় 'হামবৈদ্য' সংগ্রাম সাহের সঙ্গে সংস্রব হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫৩০-১ পৃ)। অপর এক ধারা বেন্দার কৃষ্ণাত্রেয় দেব-বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। ডমনের কন্দর্প, রাম, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন প্রভৃতি পৌত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ডমনের ধারা সেনহাটি, মূলঘর ও ভট্টপ্রতাপে আছেন, তাহারা মহাকুলীন। লক্ষণের বংশধরগণ সেনহাটি হইতে উঠিয়া গিয়া হোগলডাঙ্গায় বাস করেন। তথা হইতে উঁহারা এক্ষণে মূলঘর ও সোনাখালিতে বাস করিতেছেন। কবিরাজ দেবীচরণ সেন, অন্নদাচরণ সেন এবং খ্যাতনামা শম্ভুসেন মহাশয়গণ এই লক্ষ্মণ-বংশীয়। শত্রুঘ্নের বংশ ছোট-কালিয়ায় বাস করিতেছেন। প্রসিদ্ধ গিরিধর সেন ও হাইকোর্টের উকীল বংশীধর সেন এই বংশীয়। উঁহাদের সন্তানগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও রাজসম্মান-মণ্ডিত। কালিয়ার এই সেনগণ যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে একটি আদর্শ হিন্দু-পরিবার এবং সৌভ্রাত্র গুণের দৃষ্টান্তস্থল। যশোহরের ভূতপূর্ব্ব উকীল সরকার যোগেন্দ্রচন্দ্র, খুল্‌নার বর্ত্তমান উকীল সরকার মহেন্দ্রচন্দ্র এবং হাইকোর্টের উকীল সুরেন্দ্রচন্দ্র, শুধু জ্ঞানবত্তায় নহে, অমায়িকতার জন্যও খ্যাতনামা।

হিঙ্গু সেনের অন্য পুত্র বিকর্ত্তনের ধারা সেনহাটিতে আছেন। সেনহাটির বিকর্ত্তন একটি প্রসিদ্ধ বংশ। বিকর্ত্তনের দুই-এক ঘর এখান হইতে পয়োগ্রাম ও কালিয়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। বিকর্ত্তন মধ্যে এক বংশের নবাবদত্ত উপাধি ছিল—বক্‌সি। ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের উকীল বাগ্মিপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন, খুল্‌নার ভূতপূর্ব্ব উকীল সরকার রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী সেন, রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুবিদ্বান্ ত্রিগুণাচরণ সেন এই বক্‌সি-বংশের কৃতী পুরুষ।

---

১ ধন্বন্তরি হিঙ্গুর অধস্তন ১২শ পুরুষ মহারাজ রাজবল্লভ পলাশীর যুদ্ধ কালে (১৭৫৭ খৃঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং সাধারণ নিয়মানুসারে তিন পুরুষে শত বৎসর ধরিয়া হিঙ্গুর সময় ১৩৫৭ খৃঃ হয়। কবিকণ্ঠহার 'পঞ্চসপ্ত তিথৌ শাকে' (১৫৭৫) অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে 'সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা' প্রণয়ন করেন। তিনি চায়ু দাস-বংশীয়, চায়ুর পুত্র পুরন্দর হিঙ্গুর সমসাময়িক. পুরন্দর হইতে কণ্ঠহার ১০ম পুরুষ। সে হিসাবেও হিঙ্গুর সময় ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হয়।

মহাপণ্ডিত বিনোদরাম সেন কবিরত্নাকর, 'সখা'-প্রবর্ত্তক বালকবন্ধু প্রমদাচরণ সেন, সেনহাটির বিকর্ত্তন কুল পবিত্র করিয়াছেন।[১] কালিয়ার ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার মোহিতকান্ত সেন বিকর্ত্তন বংশের সুসন্তান।[২]

মৌ দ্‌ গ ল্য গো ত্র ॥ এই গোত্রীয় চায়ু ও পদ্মদাস বংশের কথা এখন বলিব। চায়ু-বংশীয়গণের কুলগত উপাধি দাসগুপ্ত, নবাব সরকার হইতে কেহ কেহ মজুমদার ও রায় উপাধি লাভ করেন। চায়ুর পুত্র পুরন্দর; উঁহার প্রপৌত্র প্রজাপতি 'সপ্তস্বরা' নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রজাপতির তিন পুত্র: অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুদাস। তন্মধ্যে অরবিন্দ ও বিষ্ণুদাস সমধিক বিখ্যাত, এই দুইজন হইতে চায়ুদাস বংশের দুইটি প্রসিদ্ধ ধারা নামিয়াছে। তন্মধ্যে সেনহাটি অরবিন্দদাস-বংশের এবং মূলঘর বিষ্ণুদাস-বংশের আদিস্থান। সেনহাটির অরবিন্দ বংশে 'সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা'র গ্রন্থকার রামকান্ত কবিকণ্ঠহার, 'সদ্ভাবশতক'-প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বজনবিদিত। প্রসিদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্, এ, এবং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত এই বংশের কৃতী সন্তান। অরবিন্দ-বংশের বহু শাখা ক্রিয়াদোষে কুলজ ও হীনবংশজ ভাবাপন্ন হইয়া নানাস্থানে বাস করিতেছেন। যাঁহারা এখনও মহাকুল বিশিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সেনহাটির রমানাথ কবি-সার্ব্বভৌমের প্রথম পুত্রের ধারাই অরবিন্দতুল্য শোভমান।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগ ও ফিরিঙ্গি উৎপাত জন্য চায়ু ও পদ্মদাস বংশীয় অরবিন্দ ও নয় দাসের সন্তানগণ সেনহাটি হইতে সর্ব্ববিদ্যা গুরু এবং হড়-পুরোহিত সঙ্গে লইয়া কালিয়া ও বেন্দায় গিয়া বাস করেন। বেন্দার সর্ব্ববিদ্যাগণ দেশবিখ্যাত। অরবিন্দ-বংশীয় কবিকণ্ঠহারের ভ্রাতুষ্পুত্রই কালিয়ার এই নবোপনিবেশ স্থাপনের অগ্রদূত। মধুসূদনের পৌত্র রামকেশব দাস

১ 'সখা' পত্রিকা পরে 'সখা ও সাথী'তে পরিণত হইয়া ৬।৭ বৎসর চলিয়াছিল। উহার সুযোগ্য পরিচালক ছিলেন সেনহাটির অরবিন্দ বংশীয় ভুবনমোহন রায় মহাশয়। তাঁহার 'সাথী প্রেস' এখনও সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। ঐ প্রেসে বর্ত্তমান পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে।

২ বিকর্ত্তন বংশীয় রাঘবেন্দ্র কবিবল্লভের জনৈক প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম নবাবদত্ত মুন্সী উপাধি পান। সেনহাটির মুন্সীবংশ বিখ্যাত। এই বংশে 'অম্বষ্ঠতত্ত্বকৌমুদী'-প্রণেতা শ্যামলাল মুন্সী কবিরত্ন এবং অবসরপ্রাপ্ত সবজজ্ দুর্গাচরণ সেন মহাশয়ের জন্ম।

কবিশেখর। তাঁহার ভগিনী যে শক্তি-বংশে পরিণীতা হন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর যতীশচন্দ্র এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র (I. C. S.) সেই বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কালিয়ার অরবিন্দ-বংশে যে কত মনস্বী ও যশস্বী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখ করিতেছি: বহুগ্রন্থ প্রণেতা সুকবি ডাক্তাব প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, খ্যাতনামা উকীল সুখময় ও প্রাণশঙ্কর, এবং বরিশালের স্বনামধন্য উকীল সরকার গণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত। জয়দাস-বংশের কেহ যশোহর-খুল্‌নায় নাই। বিষ্ণুদাস-বংশের বিশেষ বিবরণ মূলঘরের বৈদ্যচৌধুরী জমিদার বংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৬৬২-৮ পৃ)। এখানে পৃথক্‌ভাবে কিছু দিবার নাই।

মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় অপর কুলীন পন্থ দাসেব পুত্র নৃসিংহ মাত্র বঙ্গে আসেন। নৃসিংহের পুত্র নয় দাস। নয় দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাকরের সন্ততিগণের ধারা মাত্র কালিয়া ও বেন্দায় আছেন।

কা শ্য প - গো ত্র॥ ত্রিপুর গুপ্তের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ধারা যশোহর-খুল্‌নায় নাই। অপর কুলীন কায়ু গুপ্তের পুত্র বনমালী সেনহাটিতে আসেন, অন্য কেহ বঙ্গে আসেন নাই। বনমালীর পুত্র কার্পটি ও মধুসূদনের সন্তানগণ সেনহাটি, ইত্‌না ও উৎকূল গ্রামে বাস করিতেছেন। অপর দুইটি মাত্র শাখার সন্ধান লইয়াছি; একটি খুল্‌না জেলার কেরলকাতা ও ভাণ্ডারপাড়ায়, অপরটি যশোহরে ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী গয়েশপুরে বাস করিতেছেন। উভয়ই রাঢ় হইতে আগত, একান্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশ এবং পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। কৃষ্ণানন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের সরকারে রাজবৈদ্য নিযুক্ত হইয়া যশোহরে আসেন; কথিত আছে, তিনি কুমার উদয়াদিত্যের সাংঘাতিক পীড়ার চিকিৎসা করিয়া ভূমিবৃত্তি লাভ করেন। কৃষ্ণানন্দ ও তৎপুত্র জানকীবল্লভ কেরলকাতায় বাস করেন; জানকীবল্লভের পুত্র মুকুন্দরাম ডুমুরিয়ার নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডারপাড়ায় আসেন। সেখানকার কবিরাজ বংশ বিখ্যাত। কবিরাজ হীরালাল ও মন্মথ নাথের নাম উল্লেখযোগ্য। গয়েশপুরের বৈদ্যবংশের পূর্ব্বপুরুষ রামশঙ্কর নলডাঙ্গার রাজা রামশঙ্করের বন্ধু ও রাজ-কবিরাজ ছিলেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন একজন সন্ন্যাসী, তিনি রাধাবল্লভ বিগ্রহ লইয়া শ্রীখণ্ড হইতে

নলডাঙ্গায় আসেন। রাজা ইঁহাদিগকে বহুবিঘা নিষ্কর দিয়া প্রথমতঃ বেজপাড়ায় ও গয়েশপুরে বসতি করান। উঁহারা সে নিষ্কর এখনও ভোগ করিতেছেন। কবিরাজ রামশঙ্কর মৃত্যুর দিন-ক্ষণ বলিয়া দিয়া নিজের গঙ্গাযাত্রা নিজে করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র মহেন্দ্রনাথ (L. M. S.) জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের গৃহে আজিও রাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্য-সেবা চলিতেছে।

কায়স্থ-সমাজ

যশোহর-খুল্‌নার কায়স্থ-সমাজ বঙ্গদেশের সারাংশ। তবে একথা চারিশ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্বন্ধে যেমন খাটে, অপর দুই শ্রেণী অর্থাৎ উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সম্বন্ধে তেমন খাটে না। সেন রাজগণের রাজত্ব-কালে বারেন্দ্রদিগের প্রধান সমাজ যশোহরের উত্তরাংশে শৈলকূপা অঞ্চলে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ; এখনও সেখানে ঐ শ্রেণীর কুলীনগণের কয়েক শাখা বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফরিদপুর, পাবনা ও রাজসাহী অঞ্চলে উঠিয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি রঘুনাথ রায় (নাগ) এবং সীতারামের কর্ম্মচারী বলরাম দাস মুন্সীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বারেন্দ্রদিগের স্থূলকথা কিছু বলিয়াছি (৪২৮-৩১, ৬৩৭-৯ পৃ)। বারেন্দ্র মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী সিদ্ধ বা কুলীন এবং দেব, দত্ত ও নাগ সাধ্য বা মৌলিক। এই কয়েক ঘর লইয়া শৈলকূপার বারেন্দ্র সমাজ স্থাপিত হয়।

চাঁচড়া-রাজবংশ ও রাজা সীতারামের বংশকথা উপলক্ষ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কথা বলিয়াছি (৪৮৭, ৫২৪ পৃ)। ঐ সমাজে বাৎস্য-সিংহ ও সৌকালিন-ঘোষ এই দুই ঘর কুলীন। উভয়ই যশোহরে বর্ত্তমান ; চাঁচড়ার রাজগণ উক্ত সিংহ-বংশীয় এবং রামনগরের ঘোষচৌধুরী জমিদারগণ (৭৩৯ পৃ) উক্ত ঘোষ-কুলীন। অপর ৫।৬ ঘর মৌলিকের মধ্যে রাজা সীতারাম রায় দাস-বংশীয় এবং তাঁহার কয়েকঘর মৌলিক আত্মীয় মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট হন। সীতা-রামের শ্বশুর সরল খাঁ ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ কুলীন, তিনি মহম্মদপুরের সন্নিকটে ঘুল্লিয়ায় বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে বংশ এক্ষণে নিরন্বয় (৫৪৬ পৃ)।

ব ঙ্গ জ কা য় স্থ॥ বঙ্গজ কায়স্থগণের একটি প্রধান সমাজ প্রাচীন যশোহরে স্থাপিত হয়, সে পরিচয়ও পূর্ব্বে দিয়াছি (৯৩-৭ পৃ)। ঘটকেরা

বলেন, বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপ শীর্ষস্থানীয়, যশোহর দ্বিতীয়, তন্নিম্নে ইদিলপুর ও বিক্রমপুর, তৎপরে ফতেহাবাদ ও বাজু প্রভৃতি স্থানীয় অন্যান্য সমাজ।[১] রাজা বসন্ত রায় সর্ব্বজাতীয় প্রধান কুলীন আনিয়া যশোহর-সমাজ গড়িয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্যের প্রতাপান্বিত শাসনতলে সে সমাজ চন্দ্রদ্বীপকেও অধোনত করিয়াছিল। এখন ততটা না থাকিলেও কুলীন-প্রধান যশোহর-সমাজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। পুরাতন যশোর-রাজ্যই এ সমাজের ক্ষেত্র ছিল, এখন তাহা খুল্‌না ও ২৪-পরগণা জেলার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। আধুনিক যশোহরে বঙ্গজের বসতি বড় কম; ইত্‌না ও সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে কয়েক ঘর আছেন, উহাদের কথা বলিয়াছি (৬৩৩-৬, ৬৪৪-৬ পৃ)। খুল্‌নার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় নানা স্থানে এবং বাগেরহাটের অন্তর্গত হাবেলী পরগণায় বঙ্গজের বাস আছে।

বঙ্গজদিগের মধ্যে বসু, ঘোষ ও গুহ কুলীন; মিত্রও কুলীন ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ বংশ পোষ্যপুত্রে পরিণত হওয়ায় কুলহীন হইয়া গিয়াছেন।[২] এতদ্ভিন্ন দত্ত, দাস, নাগ ও নাথ এই ৪ ঘর মধ্যল্য, এবং দেব, রাহা, সেন, সিংহ প্রভৃতি ১৯ ঘর মহাপাত্র বঙ্গজ-সমাজভুক্ত। ইহার মধ্যে তিন শ্রেণীর কুলীন, বংশজ এবং মৌলিকের মধ্যে দত্ত ও দাস বংশ মাত্র আধুনিক যশোহর-সমাজে বর্ত্তমান, মিত্রবংশ বা অন্য মৌলিক বংশ নাই। তাই বলিতেছিলাম, এ সমাজ প্রধানতঃ কুলীনের সমাজ।

কুলীনদিগের মধ্যে ঢাকা-মাল্‌খা নগর হইতে আগত, বৎস, পৃথ্বীধর ও রাঘববসু-বংশীয় বসুকুলীনগণ ইছামতী-কূলে শ্রীপুরে, এবং গাভবসু-বংশীয় রায়-চৌধুরিগণ বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী ভৈরব তীরবর্ত্তী হাবেলী পরগণায় কাড়া-পাড়া, উৎকূল প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কাড়াপাড়া বসুবংশের বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি (৬৫৬-৬২ পৃ)। ঘোষবংশে সদাশিব ঘোষ বংশীয়গণ বাঁশদহ ও শ্রীপুরে এবং সদানন্দ ঘোষের ধারা শিবহাটি ও হাবেলী পরগণার

---

১ 'চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃস্থানং যশোরঃ নয়নদ্বয়ম্।
ইদিলপুরো বিক্রমপুরঃ উভৌ বাহূ প্রচক্ষ্যতে॥
বক্ষঃ ফতেহাবাদশ্চ বাজুশ্চরণযুগ্মকম্।
অন্যস্থানং পুরীষঞ্চ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ॥'—'মিশ্রকারিকা'

২ কালীপ্রসন্ন সরকার, 'কায়স্থ-তত্ত্ব', ৮৮ পৃ।

অধিবাসী। গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় 'রায়' উপাধি বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন; তাঁহারা এখনও স্থানিক রাজোপাধি ভূষিত হইয়া নূরনগর, কাটুনিয়া, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪-পরগণার মধ্যবর্ত্তী পুঁড়া-খোড়গাছিতে বাস করিতেছেন; উৎকূলের রায়গণের রাজোপাধি নাই। বিশেষ বিবরণ যশোহর-রাজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৪৩৪-৪৮ পৃ)। উক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় আশ-গুহ বংশীয় অন্য শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুরে বাস করিতেন; অপরাংশ টাকী প্রভৃতি স্থানেব মুন্সী বংশীয়। খুল্‌নার ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত উকীল বেণীভূষণ রায়, হাইকোর্টের উকীল শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, কলিকাতার প্রখ্যাতনামা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (L. R. C. P., London)[১] এবং সুপণ্ডিত ও সুবক্তা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ এই বংশীয় এবং শ্রীপুরের অধিবাসী। এতদ্ব্যতীত বিন্‌গুহ বংশীয় রায়চৌধুরীরা বাঁশদহে বাস করিতেছেন।

বংশজদিগের মধ্যে বাকৃসা, বাঁশদহ ও শিবহাটির 'হংস'-বসুগণ এবং শ্রীপুরের কার্ণ্যঘোষ ও 'সরকার' উপাধিযুক্ত গুহ-বংশীয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কার্ণ্যবংশীয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে (৬৩৩ পৃ)। এই পবিত্র কুলে প্রসিদ্ধ লেখক ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জন্ম। তিনি 'বঙ্গের বীর পুত্র' নামক প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কাব্য-গ্রন্থের লেখক। তাঁহার পিতা মোহনচাঁদ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র জমিদার সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কাটুনিয়ার গোবিন্দদেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন (২৬৯ পৃ)।

বঙ্গজ মৌলিকদিগের মধ্যে রাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌদ্‌গল্য দত্ত এবং শ্রীপুরের দাস মজুমদারগণের নাম উল্লেখযোগ্য। সিংগাতির দত্ত রায়েরা বসন্ত রায়ের শ্বশুর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১১৭ পৃ)। ব্যারিষ্টার

১ রাজা বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাঁহার যে জ্ঞাতি ভ্রাতা ভবানীদাস (১১৪ পৃ) যশোহরে আসেন, তৎপুত্র যদুনন্দন জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া মাইহাটি প্রভৃতি পরগণার অধিকারী হইয়া শ্রীপুরে বাস করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র যদুনন্দন হইতে অষ্টমপুরুষ। বংশধারা এই: যদুনন্দন—বাসুদেব—বাণেশ্বর—রামকান্ত—শিব—প্রাণকালী (তিন আনী শাখা)—প্রকাশচন্দ্র (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট)—বিধানচন্দ্র। [খুল্‌না জেলার অন্যতম গৌরবস্থল এই প্রতাপাদিত্য-বংশীয় অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক নেতা, চিরকুমার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৮-৬২) থাকাকালীন ১৯৬২, ১লা জুলাই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।—শি মি]

প্রমথনাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্তবংশীয়। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং ইউনিভার্সিটি আইন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল বিরাজমোহন মজুমদার শ্রীপুরের দাস বংশের উজ্জ্বল রত্ন।

দ ক্ষি ণ রা ঢী য় স মা জ॥ কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা বল্লালী যুগে রাঢ়ের দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন) কূলের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারাই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত হন। সমতট প্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, শস্যপূর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাঢ়ে যখন পাঠান-বিদ্রোহ, বৈদেশিকের উপনিবেশ, দস্যুর উৎপাত ও বর্গীর হাঙ্গামা ঘটিতেছিল, তখন ক্রমে ক্রমে অভিযান-পরায়ণ কায়স্থগণ গঙ্গাপারে, যশোহর-রাজ্যে নানাস্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। অগ্রে আসিয়াছিলেন মৌলিকেরা, তাঁহারাই শেষে মূল বাসিন্দা হইয়া কুলীনদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিয়াছিলেন। কুলস্থানগুলি সবই গঙ্গাতীরে ছিল ; ধনধান্য বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা সঙ্গতিসম্পন্নের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রলোভনে কুলীনেরা অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষা ঐহিকের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়া যশোহর-খুল্‌নায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সেরূপ বসতির গূঢ় তত্ত্ব এবং কৌলীন্যের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। তবুও এস্থলে একান্তপক্ষে যাহা না বলিলে নয়, এমন দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইবে। দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বসু ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন ; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, গুহ ও দাস—এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চন্দ্র, সোম, রাহা, নাগ, বিষ্ণু, ব্রহ্ম প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া সমাজ ছিল, তদনুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ঘোষ-দিগের সমাজ বালী ও আক্‌না, বসুদিগের মাহিনগর ও বাগাণ্ডা এবং মিত্রদিগের বড়িষা ও টেকা। এইসকল সমাজের কুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদিগের অধিকাংশ শাখা যশোহর-খুল্‌নায় বর্ত্তমান। একমাত্র মাহিনগর সমাজভুক্ত খানাকুলের বসু সর্ব্বাধিকারী এবং কোন্নগরের মিত্র বংশ ব্যতীত অন্যস্থানের কুলীনগণ যশোহর-খুল্‌নার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ নহেন।

বল্লাল ও তদ্বংশীয় দনৌজামাধবের সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের উজীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খাঁ

অধিবাসী। গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় 'রায়' উপাধি বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন; তাঁহারা এখনও স্থানিক রাজোপাধি ভূষিত হইয়া নূরনগর, কাটুনিয়া, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪-পরগণার মধ্যবর্ত্তী পুঁড়া-খোড়গাছিতে বাস করিতেছেন; উৎকূলের রায়গণের রাজোপাধি নাই। বিশেষ বিবরণ যশোহর-রাজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৪৩৪-৪৮ পৃ)। উক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় আশ-গুহ বংশীয় অন্য শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুরে বাস করিতেন; অপরাংশ টাকী প্রভৃতি স্থানের মুন্সী বংশীয়। খুল্‌নার ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত উকীল বেণীভূষণ রায়, হাইকোর্টের উকীল শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, কলিকাতার প্রখ্যাতনামা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (L. R. C. P., London)[১] এবং সুপণ্ডিত ও সুবক্তা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ এই বংশীয় এবং শ্রীপুরের অধিবাসী। এতদ্ব্যতীত বিন্‌গুহ বংশীয় রায়চৌধুরীরা বাঁশদহে বাস করিতেছেন।

বংশজদিগের মধ্যে বাক্‌সা, বাঁশদহ ও শিবহাটির 'হংস'-বসুগণ এবং শ্রীপুরের কার্ণ্যঘোষ ও 'সরকার' উপাধিযুক্ত গুহ-বংশীয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কার্ণ্যবংশীয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে (৬৩৩ পৃ)। এই পবিত্র কুলে প্রসিদ্ধ লেখক ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জন্ম। তিনি 'বঙ্গের বীর পুত্র' নামক প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কাব্য-গ্রন্থের লেখক। তাঁহার পিতা মোহনচাঁদ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র জমিদার সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কাটুনিয়ার গোবিন্দদেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন (২৬৯ পৃ)।

বঙ্গজ মৌলিকদিগের মধ্যে রাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌদ্‌গল্য দত্ত এবং শ্রীপুরের দাস মজুমদারগণের নাম উল্লেখযোগ্য। সিংগাতির দত্ত রায়েরা বসন্ত রায়ের শ্বশুর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১১৭ পৃ)। ব্যারিষ্টার

১ রাজা বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাঁহার যে জ্ঞাতি ভ্রাতা ভবানীদাস (১১৪ পৃ) যশোহরে আসেন, তৎপুত্র যদুনন্দন জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া মাইহাটি প্রভৃতি পরগণার অধিকারী হইয়া শ্রীপুরে বাস করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র যদুনন্দন হইতে অষ্টমপুরুষ। বংশধারা এই: যদুনন্দন—বাসুদেব—বাণেশ্বর—রামকান্ত—শিব—প্রাণকালী (তিন আনী শাখা)—প্রকাশচন্দ্র (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট)—বিধানচন্দ্র। [খুল্‌না জেলার অন্যতম গৌরবস্থল এই প্রতাপাদিত্য-বংশীয় অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক নেতা, চিরকুমার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৮-৬২) থাকাকালীন ১৯৬২, ১লা জুলাই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।—শি মি]

প্রমথনাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্তবংশীয়। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং ইউনিভার্সিটি আইন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল বিরাজমোহন মজুমদার শ্রীপুরের দাস বংশের উজ্জ্বল রত্ন।

দ ক্ষি ণ রা ঢ়ী য় স মা জ॥ কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা বল্লালী যুগে রাঢ়ের দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন) কূলের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারাই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত হন। সমতট প্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, শস্যপূর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাঢে যখন পাঠান-বিদ্রোহ, বৈদেশিকের উপনিবেশ, দস্যুর উৎপাত ও বর্গীর হাঙ্গামা ঘটিতেছিল, তখন ক্রমে ক্রমে অভিযান-পরায়ণ কায়স্থগণ গঙ্গাপারে, যশোহর-রাজ্যে নানাস্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। অগ্রে আসিয়াছিলেন মৌলিকেরা, তাঁহারাই শেষে মূল বাসিন্দা হইয়া কুলীনদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিয়াছিলেন। কুলস্থানগুলি সবই গঙ্গাতীরে ছিল ; ধনধান্য বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা সঙ্গতিসম্পন্নের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রলোভনে কুলীনেরা অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষা ঐহিকের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়া যশোহর-খুল্‌নায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সেরূপ বসতির গূঢ় তত্ত্ব এবং কৌলীন্যের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। তবুও এস্থলে একান্তপক্ষে যাহা না বলিলে নয়, এমন দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইবে। দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বসু ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন ; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, গুহ ও দাস—এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চন্দ্র, সোম, রাহা, নাগ, বিষ্ণু, ব্রহ্ম প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া সমাজ ছিল, তদনুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ঘোষ-দিগের সমাজ বালী ও আক্‌না, বসুদিগের মাহিনগর ও বাগাণ্ডা এবং মিত্রদিগের বড়িষা ও টেকা। এইসকল সমাজের কুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদিগের অধিকাংশ শাখা যশোহর-খুল্‌নায় বর্ত্তমান। একমাত্র মাহিনগর সমাজভুক্ত খানাকুলের বসু সর্ব্বাধিকারী এবং কোন্নগরের মিত্র বংশ ব্যতীত অন্যস্থানের কুলীনগণ যশোহর-খুল্‌নার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ নহেন।

• বল্লাল ও তদ্বংশীয় দনৌজামাধবের সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের উজীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খাঁ

(গোপীনাথ বসু) সকল কুলীনের সমীকরণ বা একযায়ী করিয়া নবরঙ্গকুল গঠন ও পূর্ব্বতন কুলবিধির সংস্কার সাধন করেন। নবরঙ্গের মধ্যে মূল কুল পাঁচটি : মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ। শেষোক্ত চারিজনের দ্বিতীয় পুত্রগণও কুলীন, সুতরাং সর্ব্বসুদ্ধ কুল ৯টি, তন্মধ্যে পুরন্দর ছভায়া ও উহার 'দ্বিতীয় পুত্র' এই দুই কুলের সৃষ্টিকর্ত্তা। মুখ্য কুলীনের আবার তিন শ্রেণী আছে : প্রকৃত, সহজ ও কোমল। মুখ্যের দ্বিতীয় পুত্র কনিষ্ঠ, ৩য় পুত্র মধ্যাংশ ও ৪র্থ জন তেওজ কুলীন ; পঞ্চম হইতে অন্য সকল পুত্র 'মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র' নামক কুল বিশিষ্ট। কাল সহকারে এই শেষোক্ত কুলীনের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে।

সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনদেবের সময় হইতে কুলীনদিগের সমীকরণ বা একযাই (একযায়ী) প্রথা ছিল। উহার বিবরণ পাই না। পুরন্দর খাঁ যখন ১৩ পর্য্যায়ের কুলীনদিগের একযাই করেন, তদবধি ১৩ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত ১৩টি পর্য্যায়ের একযাই হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৪, ২৫—এই সাতটি পর্য্যায়ের বার মাহিনগর সমাজের বসু-সর্ব্বাধিকারিগণ মুখ্য কুলীন মধ্যে প্রকৃতরাজ নামে সর্ব্বাগ্রগণ্য হন ; অবশিষ্ট ছয়বারে বালী সমাজের ঘোষগণ এই রাজতুল্য পদবীর অধিকারী হন। ১৪ পর্য্যায় হইতে বালীর ঘোষদিগের প্রধান ধারা এই : ১৪ গণপতি—১৫ জগন্নাথ—(শিবানন্দ)—(রতিকান্ত)— ১৮ রাজেন্দ্র—গোস্বামীদাস— ২০ ভরতচন্দ্র—(রামদেব)—(রামেশ্বর)— ২৩ হরেকৃষ্ণ—(ব্রজকিশোর)— ২৫ চণ্ডীচরণ। ২৫ পর্য্যায়ে শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বাগ্রগণ্য হন এবং চণ্ডীচরণ ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উপরি লিখিত ধারায় যাঁহাদের নাম বন্ধনীর মধ্যে দিলাম, তাঁহারা প্রকৃত রাজ হন নাই, অপর ছয়জন হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গণপতি, জগন্নাথ ও রাজেন্দ্র বালীতে বাস করিতেন। গোস্বামী বা গোসাঁই দাস নবাবের দেওয়ান ও দাঁতিয়া পরগণার জমিদার স্বনামধন্য রুক্মিণীকান্ত মিত্র-চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া বর্ত্তমান খুল্‌নার অন্তর্গত কুমিরায় বাস করেন। রুক্মিণীকান্ত সর্ব্বজাতীয় কুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কুলত্যাগ করতঃ মৌলিক হইয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় কুমিরা তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থের একটি প্রধান সমাজ হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের পূর্ব্বনিবাস এই কুমিরায়। গোসাঁই দাসের পুত্র ভরত প্রকৃতরাজ হন, তৎপুত্র রামদেব কালিদাস রায়ের কন্যা বিবাহ

করিয়া বাঘুটিয়ায় বাস করেন। রামদেবের পৌত্র হরেকৃষ্ণ প্রকৃতরাজ হন; তৎপুত্র ব্রজকিশোরের সময়ে ১৭০৩ শকে (১৭৮১ খৃঃ) বাঘুটিয়ার নূতন বাটীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎসুত চণ্ডীচরণ প্রতাপশালী কায়স্থকুলপতি। তিনি বহু পরিত্যক্ত কায়স্থ বংশের সমন্বয় ও সমুন্নতি সাধন করিয়া দেশমধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। চণ্ডীচরণের পুত্র কৃষ্ণচরণের সময় কলিকাতার সাতুবাবু নাটুবাবু একযাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। কৃষ্ণচরণের প্রথম পুত্র কুলইচরণের অকালমৃত্যুতে তৎকনিষ্ঠ হরিচরণ প্রকৃতমুখ্য বলিয়া গণ্য হন। এখন হরিচরণ ও তৎকনিষ্ঠ প্রিয়নাথের বংশাভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং উঁহাদের কনিষ্ঠ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ বাঘুটিয়া সমাজে কৌলীন্যে অগ্রগণ্য। তবে এক্ষণে একযাই হইলে প্রকৃতরাজ হইবার অধিকার এ ধারায় আর বর্ত্তিবে কিনা সমস্যার বিষয় হইয়াছে।

এখন আমি অতি সংক্ষেপে যশোহর-খুল্না‌র মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থের প্রধান প্রধান বংশগুলির অবস্থান নির্দ্দেশ করিব এবং প্রসঙ্গতঃ দুইএকজন খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিব। বিস্তৃত বংশ বিবরণ পরিশিষ্ট খণ্ডের জন্য অবশিষ্ট রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘোষ বংশের দুইটি সমাজ, বালী ও আকনা। তন্মধ্যে বালী-সমাজের ঘোষ কুলীনগণ বাঘুটিয়া, কুমিরা, গোণালি, মহিষখোলা, বিভাগদি, কাটিপাড়া, চৌগাছা, পোলো-মাগুরা, বাসড়ী ও কুরিগ্রামে, এবং আক্না-সমাজের ঘোষগণ বিদ্যানন্দকাটি, মঙ্গলকোট, দিঘলিয়া, খরসঙ্গ, কোড়ামারা, নওয়াপাড়া, মাগুরখালি, হদ্, ভদ্রবিলা, কলাগাছি ও মৈষাঘুনী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। পোলো-মাগুরার ঘোষবংশে প্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ও মতিলালের জন্ম হয়; এবং বিখ্যাত উকীল অম্বিকাচরণ ঘোষ ও 'বসুমতী' সম্পাদক ঔপন্যাসিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ চৌগাছার ঘোষ বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। আলিপুরের উকীল সরকার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিদ্যানন্দকাটীর অধিবাসী ছিলেন। তৎপুত্র মান্যবর চারুচন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান হাইকোর্টের জজ্। আক্না-সমাজের বংশজগণ রায়গ্রাম, আউড়িয়া, শ্রীরামপুর ও মূলঘর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন; চূড়ামণকাটী, খেদাপাড়া ও বাগডাঙ্গার ঘোষগণের মূল পরিচয় অজ্ঞাত বলিয়া ঘটকের কবিতা আছে।

বসুবংশের দুইটি সমাজ, বাগাণ্ডা ও মাহিনগর। তন্মধ্যে বাগাণ্ডার বসু

কুলীনগণ কুমিরা, জঙ্গলবাধাল, পাঁজিয়া (জেয়ালার বসু), হরিশঙ্করপুর, আল্‌কা, গোটাপাড়া, কাটিপাড়া, রাধানগর, কোলা-দীঘলিয়া, শ্রীধরপুর, শুভরাঢ়া, মাছিন্দিয়া প্রভৃতি স্থানে, এবং মাহিনগর-সমাজের কুলীনগণ কুমিরা, মাগুরা, বিভাগদি, বিদ্যানন্দকাটি, খলিসাখালি, মূলঘর, মসিদপুর, গৌরীঘনা, মধুদিয়া ('মীরবহর' বসু), ধোপাদি, ভাড়া সিমুলিয়া ও বাঁকা প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছেন। পাঁজিয়ার রাজা পরেশনাথের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১১৩ পৃ)। প্রসিদ্ধ লেখক ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺রাসবিহারী বসু, সব্‌জজ্‌ রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বসু, হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল নরেন্দ্রকুমার বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেসন্‌স জজ্‌ বীরেন্দ্রকুমার বসু (I. C. S.) বিদ্যানন্দ-কাটির বসুবংশকে দেশবিখ্যাত করিয়াছেন। গণিতাধ্যাপক কালীপদ বসু হরিশঙ্করপুরের অধিবাসী। বাগাণ্ডা বসুবংশীয় বংশজেরা পাইকপাড়া, শঙ্করপাশা প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগরের বংশজেরা বেলফুলিয়া, বিছালী, কোদলা, ঘৃতকান্দিতে বাস করিতেছেন। বেলফুলিয়ার বসুচৌধুরীদিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মাহিনগর সমাজের রাজা সূর্য্যদেব বসু খুল্‌নার অন্তর্গত শোভনা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। তথায় তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে।

মিত্রদিগের দুইটি সমাজ বড়িষা ও টেকা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বড়িষা এখনও সমাজস্থান; টেকার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বড়িষার মিত্রগণের প্রধান ধারা কোন্নগরে যান, সেস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত। এতদঞ্চলে বড়িষার মিত্রগণের প্রথম বসতি কপোতাক্ষীতীরে গুয়াতলীতে এবং কেশবপুরের নিকটবর্ত্তী পাঁজিয়ায়। অনেক স্থানের মিত্রগণ এই দুইস্থানের পরিচয় দিয়া থাকেন। কবিলপাড়ায় এখনও মিত্রবংশের মুখ্য কুলীনের বাস আছে। পাঁজিয়া, সাতাইসকাটি, মিক্‌সিমিল, রাড়ুলি, কাটিপাড়া ও মৈষাঘুনী গ্রামে পাঁজিয়ার ধারা এবং গুয়াতলী, পাগলা, পাইকপাড়া, দেয়াড়া প্রভৃতি স্থানে গুয়াতলীর মিত্রগণ বাস করিতেছেন। ইহা ব্যতীত চৌবেড়িয়া, বাসড়ী, দুর্ব্বাডাঙ্গা ও মাগুরায় মিত্রকুলীন আছেন। বড়িষা-সমাজের বংশজেরা বাঘুটিয়া, খাজুরা, ধূলগ্রাম, ত্রিলোচনপুর, মিত্রসিঙ্গা, রাজঘাট, মধ্যপুর, দামোদর, শোভনা, টিপ্‌না প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি, রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণে যমুনা-বিধৌত চৌবেড়িয়াকে পবিত্র করিয়াছেন। ধূলগ্রামের মিত্রবংশের বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি (৫১১ পৃ)। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল

ও গ্রন্থকার উপেন্দ্রগোপাল ত্রিলোচনপুরবাসী ; বনগ্রামের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রধান উকীল তারাপ্রসাদ গুয়াতলীর অধিবাসী ; বর্ত্তমান গ্রন্থকারও গুয়াতলীর মিত্র-বংশীয় (৭২২ পৃ)। বাগেরহাটের প্রধান উকীল ৺অঘোরনাথ পাঁজিয়ার নিকটবর্ত্তী সাতাইসকাটিতে বাস করিতেন। খাজুরার মিত্রবংশে ডাক্তার লালবিহারী, সব্‌জজ্ বেণীমাধব এবং তৎপুত্র বিজ্ঞান কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র (Dr. P. C. Mitra, Ph. D.) সর্ব্বত্র সুবিদিত। পাঁজিয়ার নন্দরাম মিত্র ও মিক্‌সিমিলের জয়মিত্র প্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন। মিত্রবংশে এমন আরও কত ঘটকের কথা শুনা যায়। বংশকাহিনী সংগ্রহের প্রবৃত্তি বর্ত্তমান গ্রন্থকারের বংশগত সম্পত্তি। কুমিরাবাসী দেওয়ান রুক্মিণীকান্ত মিত্রের গোষ্ঠীপতি মৌলিক হইবার কথা বলিয়াছি। তদ্বংশীয়েরা এখন দাঁতিয়া, কড়রা, সিঙ্গা-হাড়িগড়া প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেছেন। যশোহর জেলা বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বংশোচিত কর্ম্মনিপুণতার পরিচয় দিতেছেন। টেকা-সমাজের মিত্রদিগের সংখ্যা বড়ই কম ; ইত্‌না, মহেশ্বরপাশা ও বেলফুলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের কুলীন ও বংশজ আছেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিকগণের মধ্যে দেব, দত্ত, সেন, সিংহ ও গুহগণ বিশেষ প্রখ্যাত। দেববংশের বহু শাখা ; সে পরিচয় এবং 'বোধখানার চৌধুরী'বংশের কাহিনী পূর্ব্বে দিয়াছি (৬৬৮-৯০ পৃ) ; বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই বংশের গৌরবস্তম্ভ। আল্‌তাপোল, শোলগাতি ও সাতবাড়িয়ার মল্লিক, উত্তরপাড়ার নিয়োগী এই বংশীয়। আলিপুরের উকীল বঙ্কুবিহারী মল্লিক সাতবাড়িয়ার অধিবাসী। দেবদিগের আরও দুইটি সমাজ আছে—কর্ণপুর ও চিত্রপুর। তন্মধ্যে কর্ণপুরের দেবগণ এক্ষণে ভাটিয়াপাড়ার বক্‌সী, দেয়াপাড়ার মজুমদার, সুবলকাটি ও রুদাঘরার হালদার এবং সাধুহাটি, পাঁজিয়া, আল্‌কা ও কছুন্দীর সরকার বলিয়া খ্যাত। কোটাকোলের সরকারগণ চিত্রপুরের দেব। রুদাঘরার বসন্তকুমার হালদার খুল্‌নার প্রবীণ উকীল এবং হেমন্তকুমার মুন্সেফ ও হাইকোর্টের উকীল ভূধর হালদার সুপরিচিত।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে অন্ততঃ চারিপ্রকার দত্ত পাওয়া যায় ; ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বালীর দত্ত, মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় বটগ্রামের দত্ত, কাশ্যপ-গোত্রীয় বটগ্রামী দত্ত, এবং কল্কীশ-গোত্রীয় বিঘটিয়ার দত্ত। তন্মধ্যে বালী ও বটগ্রামের খ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বালীর দত্তগণ, নড়াইলের রায়, দত্ত ও সরকার উপাধি-

যুক্ত (৭১৯-২০ পৃ), সাহসের দত্তচৌধুরী, মৌভোগের রায়চৌধুরী, ভগবান-নগরের রায়, সেনহাটির মুস্তৌফি, এবং সিদ্ধিপাশা, কছুন্দী, মুক্তীশ্বরী ও ধোপাদি প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। নড়াইলের কৃষ্ণলাল দত্তের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (৭২০ পৃ)। বটগ্রামের মৌদ্‌গল্য দত্তগণ রাঙ্গদিয়া, শ্রীপুর, তালা, বনগ্রাম, ঢাকুরিয়া (মজুমদার), পাইকপাড়া, চাঁচড়ী, নন্দনপুর প্রভৃতি গ্রামে সগৌরবে বাস করিতেছেন। ঢাকুরিয়ার হৃদয়নাথ মজুমদার সব্‌জজ্ ছিলেন। কাশ্যপ দত্তগণ কাল্‌না কামটানায় বাস করিতেছেন। বাঙ্গালার কবিকুল-চূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোহর-সাগরদাঁড়ির কাশ্যপ দত্তবংশের নাম বিশ্ববিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। বিঘটিয়ার দত্তবংশের প্রধান পুরুষ কালিদাস রায় বাঘুটিয়া, বিভাগদি ও জঙ্গলবাধালের ঘোষ বসু সমাজের প্রতিষ্ঠাতা (৪২৫ পৃ); তদ্বংশীয় কেশবলাল রায়চৌধুরী যশোহরের সরকারী উকীল। বিঘটিয়ার দত্তেরা বিভাগদি, সেখহাটি ও পাতালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রায়েরকাটির রাজবংশের বিবরণে দ্বিগঙ্গার বাসুকি-গোত্রীয় সেনবংশের পরিচয় ও সন্ধান দিয়াছি। রাজবংশীয়গণ রায়েরকাটি, বনগ্রাম, মঘিয়া ও চিংড়াখালিতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অন্য শাখা যশোহরের অন্তর্গত সিরিজদিয়া, আফরা, চণ্ডীবরপুর ও পুটিয়া এবং খুল্‌নার অন্তর্গত দামোদর, পীলজঙ্গ, বারাকপুর ও চন্দনীমহলের অধিবাসী।

সিংহ-বংশের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় যশোহর-খুল্‌নায় আছে। ১ম, বাৎস্য গোত্রীয় আন্দুলিয়ার সিংহ; বারভুঞার অন্যতম রাজা মুকুন্দরাম রায় এবং তৎপুত্র সত্রাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠাতা সত্রাজিৎ এই বংশীয়। ক্রিয়াগুণে সত্রাজিৎপুরের সিংহগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এতদ্ভিন্ন (খুল্‌না) মাগুরার রায়চৌধুরী, পাঁজিয়ার চৌধুরী, রায়েরকাটির (সিংহ) রায় এবং ভেরচি ও আমাদির সিংহগণ আন্দুলিয়ার সিংহ। ভেরচির সিংহগণের পূর্ব্বপুরুষ গোপীকান্ত ১৯ পর্য্যায়ের কুলীনগণের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী পাঁজিয়ার সিংহ-বংশীয় ছিলেন। ২য়, অত্রি গোত্রীয় সিংহ; ইঁহারা প্রথমতঃ বর্ণীগ্রামে, পরে তথা হইতে বিছালী ও বেলফুলিয়ার আইচগাতি গ্রামে বাস করেন। বেলফুলিয়ার দানবীর দীননাথ এবং তৎপুত্র সুপণ্ডিত যোগেন্দ্র-কুমার সিংহের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৮০০ পৃ)।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রীয় গুহদিগের মধ্যে বরাটের (গুহ) রায়, জয়পুরের

গুহ, মহেশ্বরপাশার মজুমদার ও মথুরাপুরের বক্‌সি সমধিক উল্লেখযোগ্য। যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে কি দক্ষিণ রাঢ়ীয় বা কি বঙ্গজ, উভয় শ্রেণীরই গুহ বংশীয়-দিগের স্বভাবগত তেজস্বিতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অন্যান্য মৌলিকদিগের মধ্যে পাঁজিয়া, মৌভোগ ও বিষ্ণুপুরের বিষ্ণু মজুমদারগণ, নল্‌তা ও নলধার ভঞ্জচৌধুরীগণ, শোলপুর, তপনভাগ ও ভয়াখালির শাঁকরালি-সমাজভুক্ত দাসগণ, সত্রাজিৎপুরের পাল ও খরসঙ্গের পালিতগণ, পবহাটি ও বাগডাঙ্গার মজুমদার উপাধিধারী রাহা এবং নলধা ও রাজপাটের রাহাগণ, রাখালগাছির নাগ চৌধুরী এবং হাবেলী বাসাবাটীর নাগ-মজুমদারগণ, রায়পাশার সোমচৌধুরিগণ, মাগুরার অন্তর্গত কাওড়ার সরকার উপাধিযুক্ত এবং নন্দনপুরের নন্দীগণ, দামোদরের ব্রহ্ম, মিক্‌সিমিলের রক্ষিত ও খিস্‌মা সমাজভুক্ত শঙ্করপাশা প্রভৃতি স্থানের চন্দ্রগণ কায়স্থ সমাজে সম্মানিত। ভুগিল-হাটের শাঁকরালি দাসবংশে হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল শ্রীনাথ দাসের জন্ম; নল্‌ধা-নিবাসী রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা খুল্‌না ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় চেয়ারম্যান; দামোদরের নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। চুঁচড়ার বিখ্যাত সোমবংশীয় রাজবল্লভ ও রায়দুর্ল্লভ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধুমতীকূলে রায়পাশায় বসতি করেন এবং রাজা সীতারামের নিকট হইতে চৌধুরী উপাধি পান। চুঁচড়ার সোমবংশীয় বিহারের সুবাদার মহারাজ জানকীনাথ এবং তৎপুত্র 'মহারাজ মহীন্দ্র' দুর্ল্লভরাম সোম কিভাবে নবাব আলিবর্দ্দী ও সিরাজের রাজত্বে রাজনৈতিক ক্রীড়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই।

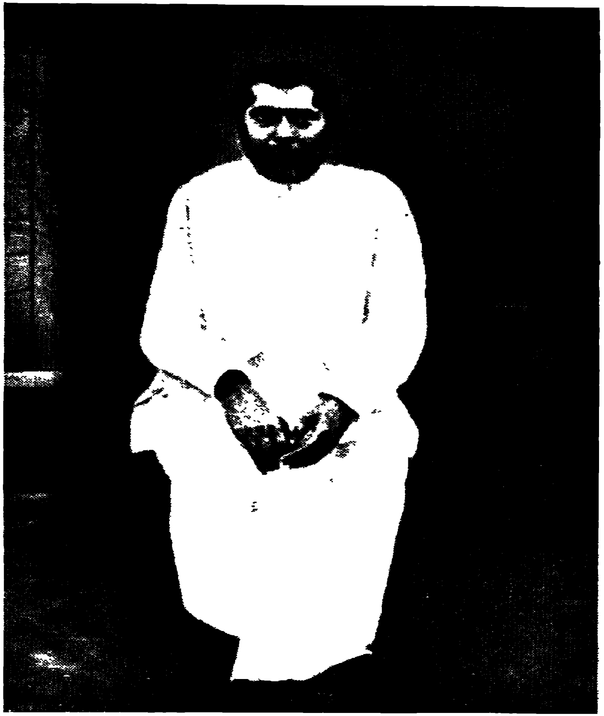
জাতিভেদ অনুসারে যশোহর-খুল্‌নার উচ্চজাতীয় লোকসংখ্যার একটা সাধারণ হিসাব দিতেছি। গত ১৯২১ অব্দের সমাহারের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে, তদনুসারে সূক্ষ্মহিসাব পরিশিষ্ট-খণ্ডে দিব।[১] আপাততঃ মোটামুটি হিসাবই তুলনায় সমালোচনার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। উভয় জেলার

১ [বর্ত্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৪পৃ দ্র—১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার (Census Report, 1921) অনুযায়ী উভয় জেলার মোট লোকসংখ্যা—৩১,৭৫,২৫৩, তন্মধ্যে মুসলমান—১৭,৮৬,৪৪২; মুসলমান যশোহরে শতকরা ৬১'৭৫ ও খুল্‌নায় ৪৯'৭৫, গড়ে ৫৬'২৬। উভয় জেলায় মোট হিন্দু—১৩,৮৩,২০৪; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ—৭৩,৭১১, কায়স্থ—৯৫,৮১৯ এবং বৈদ্য—৫,২০৭—শি মি]

মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমানের অনুপাত যশোহরে শতকরা ৬২ জন, খুল্‌নায় ৫২ জন, গড়ে ৫৭ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ১৮ লক্ষ। অবশিষ্ট ১৪ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ৬৮ হাজার, কায়স্থ ৯০ হাজার, বৈদ্য ৪ হাজার। অর্থাৎ কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সমষ্টি অপেক্ষাও প্রায় ⅓ অধিক। আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভুঞা বা রাজাই কায়স্থ; আলোচ্য দুই জেলায় জমিদারের সংখ্যা তাঁহাদের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে ব্রাহ্মণ। বৈদ্য ভূম্যধিকারী বড়ই কম। উচ্চরাজকার্য্যে এবং চাকরী ক্ষেত্রে কায়স্থ ব্রাহ্মণের অবাধ প্রতিপত্তি হইলেও শিক্ষিতের অনুপাত ও শিক্ষালাভের চেষ্টা বৈদ্যের মধ্যেই অধিক। কায়স্থ-ব্রাহ্মণের বিশাল সমাজে লোকসংখ্যা অধিক, নানাশ্রেণী ও অবস্থার লোক উহার অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে হেয়কার্য্যে লিপ্ত ও হীনাবস্থাপন্নের সংখ্যা কম নহে; একই জাতির মধ্যে আভিজাত্য ও সামাজিক অবস্থার অত্যধিক তারতম্যের জন্য স্বজাতি-প্রীতির মাত্রা বড় কম; উহাই উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। অপরপক্ষে স্বল্পসংখ্যক বৈদ্যের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির ফলে শিক্ষা ও উন্নতির পন্থা সুগম হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যশোহর ও খুল্‌না উভয়স্থলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি অবৈতনিক উচ্চপদগুলি সকলই কায়স্থের করায়ত্ত, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সমাজে বৈদ্য-কায়স্থের যে বিদ্বেষভাব জাগিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কতক প্রশমিত হইয়াছে। এখনও এদেশীয় কতক বৈদ্যসন্তান অনুপনীত থাকিলেও, বৈদ্য সমাজে উপনয়ন পদ্ধতি স্থায়িভাবে প্রচলিত হইয়াছে; এখন আর সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় না। সম্প্রতি কায়স্থ-সমাজে উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা জাগিয়াছে ও তজ্জন্য সমাজে কলহ ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে। ক্রমে উপবীতীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিলেও বিশাল কায়স্থ-সমাজের বিস্তৃতির অনুপাতে উহার গতি বড় মন্থর। কয়েকটি কুলীনপ্রধান কায়স্থ-সমাজ এ বিষয়ে শীর্ষোত্তোলন করিতেছেন না এবং কায়স্থ-সমাজে এ জাতীয় কর্ম্মীর অভাব বশতঃ চেষ্টার ফল আশাপ্রদ বা সন্তোষজনক নহে। বিশেষতঃ অনেকস্থলে উপনয়ন সংস্কারকে কার্য্যতঃ ধর্ম্মসাধনের সহায়ক বলিয়া না ধরিয়া অধিকার লাভের কৌশল মাত্র মনে করা হয়। এইজন্য উহা সদাচারনিষ্ঠা জাগাইয়া সংস্কারের প্রকৃত ফল প্রদান করিতেছে না। আন্দোলনের



কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার



ব্রজলাল শাস্ত্রী
[দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা]



কবি মানকুমারী বসু

গণ্ডগোল মিটিলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা এখনও অনুমান করা যায় না। তবে সমাজ মধ্যে আত্মকলহ নিবারণ জন্য যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উদারতার প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ন ব শা খ স ম্প্র দা য়॥ বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন বর্ণের নিম্নেই যাঁহাদের আসন, যাঁহাদের জল আচরণীয়, যাঁহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের অনুরূপ, তাঁহারা নবশাখ বলিয়া পরিচিত, কারণ উঁহারা ৯টি শাখাভুক্ত। পরাশর সংহিতায় আছে, পরশুরাম এই ৯টি জাতির সাহায্য লইয়া ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, এজন্য ইঁহাদিগকে নবশাখা না বলিয়া নব শায়ক (বাণ) বলা হয়। আমরা প্রথম খণ্ডে (৩য় সং, ২৭৩-৪ পৃ) নবশাখের কথা বলিয়াছি। এখানে পুনরায় আলোচনার জন্য উঁহাদের তালিকা দিতে হইল। এই তালিকাসূচক সংস্কৃত শ্লোকটি এই :

'গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকঃ বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥'

অর্থাৎ গোপ (সদ্গোপ), মালাকর, তিলী বা তৈলিক (কলু নহে), তন্তুবায় (তাঁতি), মোদক (ময়রা, কুরি), বারুজীবী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার (কামার), নাপিত(ক্ষৌরকার নাপিত ও মধুনাপিত অর্থাৎ ময়রা)—এই নয়টি জাতি সমাজে সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত। ইহা ব্যতীত বণিকদিগের মধ্যে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক (শাঁখারি), কাংস্য বণিক (কাঁসারি), এই তিন সম্প্রদায়ও নবশাখের তুল্য। বণিকদিগের মধ্যে সুবর্ণবণিকগণ মাত্র রাজকোপে পতিত হইয়া সমাজে পতিত হইয়াছিলেন, নতুবা সুবর্ণ অপেক্ষা কাংস্যের মূল্য অধিক হইত না। যশোহরের উত্তরাংশ বণিক অর্থাৎ গন্ধবণিকগণের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের নিকটবর্ত্তী সাঁকোর বণিকদিগের সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্যে উল্লেখিত হইয়াছে। যে বণিকদিগের বাণিজ্য-তরণী ভারতের বাহিরে দূরদেশে যাইত, তাঁহাদের বৈশ্যত্বে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং নবশাখের মধ্যে সকলেই বৈশ্যবৃত্তিধারী ব্যবসায়ী, তাহাও সত্য। ব্যবসায়ের সামগ্রী, আর্থিক অবস্থা ও দেশকালপাত্র দোষে উঁহাদের মধ্যে আচার-ব্যবহারের তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু যখন তাঁহাদের কোন কোন শাখা শিক্ষা ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া বৈশ্যত্বের দাবি করেন, শাস্ত্রযুক্তি সাহায্যে উহা সপ্রমাণ

করিতে চান, তখন পরাধীন জাতির দীর্ঘকালের সাধারণ পাতিত্য অপরাধ বিস্মৃত না হইয়া, সেই উন্নতিকামী জাতিকে বাধা দিয়া চাপিয়া রাখিবার কি হেতু আছে, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যায় না। উর্দ্ধগামী হইলে কোমল ছত্রককেও কঠিন ভূমিখণ্ডে বাধা দিতে পারে না।

বৈ শ্য - বা রু জী বী ॥ নবশাখের মধ্যে যশোহর-খুল্‌নায় বারুজীবী বা বারুই জাতির সংখ্যা অধিক। মোটামুটি হিসাবে যশোহরে প্রায় ১১ হাজার এবং খুল্‌নায় ১৬ হাজার, সমষ্টি প্রায় ২৭ হাজার হইবে।[১] বর্ত্তমান সময়ে এই দুই জেলায় ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিকামী জাতি। ইঁহাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি যেমন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তেমনই ইঁহাদের জ্ঞান-পিপাসা এবং স্বজাতি-প্রীতি একান্ত প্রশংসনীয়। যশোহরের সর্ব্বপ্রধান উকীল রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বিদ্যাবারিধি (M.A., B.L., C.I.E., M.L.A.) মহোদয় এই জাতির উজ্জ্বলতম রত্ন এবং প্রতাপশালী নায়ক। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যেমন দেশে বিদেশে যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিয়াছে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা তেমনি স্বজাতিকে স্বল্পকালে উন্নতির পথে সবেগে প্রধাবিত করিয়াছে। আরও অনেক বিদ্বান ও সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার সে চেষ্টার সহায় বটে, কিন্তু স্বজাতি সমাজে তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। আমরা পরিশিষ্ট খণ্ডে এই কর্ম্মবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিব, এখানে তাঁহার জাতীয় সমাজ সম্পর্কে দুই একটি মাত্র কথা বলিতেছি। ১৩০৮ সালে যদুনাথের প্রবর্ত্তিত 'বৈশ্য-বারুজীবী সভা' এই জাতির উন্নতির অন্যতম হেতু। সভার সম্পাদক প্রসন্নগোপাল রায়, বি, এল, মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সভা হইতে শাস্ত্রার্থ সাহায্যে এই জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং আমার মনে হয়, সে চেষ্টা বিফল হয় নাই।[২]

বৈশ্য-বারুজীবী বংশে লোহাগড়ার মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দত্ত-মজুমদার এবং দাস-

---

১ [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী বারুজীবিগণের সংখ্যাগুলি এইরূপ : যশোহর—১২,৬৫৭ ; খুল্‌না—১৮,৭৭১, সমষ্টি—৩১,৪২৮—শি মি]

২ এই জাতির অনেক উপাধি গোত্র প্রবর বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ জাতির সমতুল্য , ইঁহাদেব মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নাই, ইঁহারা দাসত্ব করেন না, পবিত্র ব্যবসায়ে ক্রমেই ইঁহাদের ধনবল বৃদ্ধি হইতেছে। এই সব বৈশ্যত্বের নিদর্শন। বৈশ্য-বারুজীবী সভা হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গীয় বৈশ্য'

সরকার, দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির দে, বিশ্বাস, কচুবাড়িয়ার সমাদ্দার প্রভৃতি বংশ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোহাগড়ার মজুমদার বংশে রায় বাহাদুর যদুনাথের জন্ম। ১৭শ শতাব্দীর শেষে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ বংশীধর দত্ত মীরবহর ছিলেন। উঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কতকগুলি মৌজার ভূম্যধিকার পাইয়া 'মজুমদার' হন, রায় বাহাদুর তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার বাটীতে ঐ আমলের একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত জোড়-বাঙ্গালা আছে। অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার (M.A., Ph.D.) জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় লোহাগড়ার সরকার-কুল পবিত্র করিয়াছেন। দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির বিশ্বাসগণ সকলেই শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী; তন্মধ্যে দশানি নিবাসী জমিদার, রায় সাহেব ৺যদুনাথ বিশ্বাস বিদ্যোৎসাহিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।[১] তিনি দৌলতপুর কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টী; সেই কলেজে এবং বাগেরহাট স্কুলে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ বংশীয় গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল, বাগেরহাট কলেজের সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উক্ত কলেজের উন্নতিকল্পে অক্লান্তকর্ম্মী। নলদীর অন্তর্গত কচুবাড়িয়ার সমাদ্দার বংশে 'সমসাময়িক ভারত' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ লেখক প্রত্নতত্ত্ববাগীশ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (F.R. Hist. S.) মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন বাহিরদিয়া নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নেপালচন্দ্র সেন এম, এ, ও I.C.S. পরীক্ষোত্তীর্ণ রাখাল চন্দ্র সেন, এম, এ, ভ্রাতৃযুগলের নাম উল্লেখযোগ্য। রায় বাহাদুর যদুনাথের পুত্র কুমার অধিক্রম মজুমদার, বি, এল, সমর-সার্ভিসে 'সুবেদার মেজর' হইয়া পরে এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেছেন। মহেশ্বর-পাশা আর্টস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রশিল্পী শশিভূষণ পাল মহাশয় দেশে বিদেশে অসামান্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড তাঁহার শিল্প-বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক; তিনি স্বদেশ ও বিলাত হইতে অসংখ্য পদক ও

পুস্তিকায় এবং ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিত 'সিদ্ধান্তসমুদ্রের' ৩য় খণ্ডে বৈশ্যত্বের প্রমাণসমূহ সমালোচিত হইয়াছে।

১ বৈশ্য-বারুজীবি-বংশীয়দিগের প্রধান উদ্যোগে এবং বিদ্যোৎসাহিতার ফলে বরিশালে কদমতলী হাই স্কুল, যশোহরে লোহাগড়া, সুফলাকাটি ও রাজঘাট হাইস্কুল, খুলনায় বাগেরহাট কলেজ এবং দৈবজ্ঞহাটি, খালিসপুর স্কুল এবং দৌলতপুরে একটি নূতন স্কুল চলিতেছে

প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন সপত্নীক তাঁহার গ্রাম্য-ভবনে গিয়া শিল্পশালা পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন।

স্ব র্ণ ব ণি ক॥ হিন্দুসমাজে যে সকল জাতি অনাচরণীয় বলিয়া চিহ্নিত, তন্মধ্যে স্বুবর্ণবণিক ও যোগী জাতির কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে ইঁহারা যে বড় জাতি ছিলেন, আকারে প্রকারে বুদ্ধিকৌশলে ও ধনদৌলতে তাহার পরিচয় আছে। উভয়েই বহুকাল বৌদ্ধাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ও অন্য কারণে রাজকোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত হন। স্বুবর্ণ মূল্যবান হইলে কি হয়, উহার দান গ্রহণ ও ব্যবসায় হিন্দুসমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। স্বুবর্ণ-বণিকগণের সম্বন্ধে স্বর্ণাপহরণের নানা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ স্বর্ণের ব্যবসায়, কুসীদ জীবিকা ও জাতিগত অত্যধিক ধন-লালসাই তাঁহাদের পাতিত্যের প্রকৃত কারণ। যাহা হউক, ইঁহারাও বারুজীবী প্রভৃতি জাতির মত আপনাদিগকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা চিরদিনই বণিগ্‌বৃত্তিধারী ব্যবসায়ী, যেখানে বন্দর বা ব্যবসায়ের কেন্দ্র, সেখানে ইঁহাদের বাস, সেখানে ইঁহাদের অতুল প্রতিপত্তি; কলিকাতার অর্দ্ধেক ধনী ও রাজ-পরিবার স্বুবর্ণ বণিক জাতীয়। নেতৃবিহীন সমাজের বিচারফল যাহাই হউক, ইঁহারা আচারচ্যুত হইলেও যে কার্য্যতঃ বৈশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালী যুগে অত্যাচার পীড়িত স্বুবর্ণবণিকেরা কিরূপে পশ্চিম বঙ্গে কর্জ্জনা ও সপ্তগ্রামে এবং দক্ষিণ বঙ্গে স্বুন্দরবন অঞ্চলে নির্ব্বাসিত হন, তাহার কতক পরিচয় প্রথম খণ্ডে দিয়াছি (৩য় সং, ২৭৬ পৃ)। উহা হইতে সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি সমাজ হয়। উভয় সমাজের প্রায় দশ সহস্র লোক যশোহর-খুল্‌নায় বাস করিতেছেন।[১] সপ্তগ্রামীরা মুড়লীর পার্শ্ববর্ত্তী বগচরে এবং দক্ষিণরাঢ়ীরা মহম্মদ-পুর, ভাটপাড়া, দক্ষিণডিহি, মহেশ্বরপাশা, আইচগাতি, শ্রীরামপুর, সাঁইহাটি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। নদীবহুল দক্ষিণ রাঢ়ে ইঁহারা নদীপথে পোতযানে বাণিজ্য করিতেন বলিয়া ইঁহাদিগকে 'পোতদার' বা (উহার অপভ্রংশে) 'পোদ্দার' বলে। জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে খাজাঞ্চী বা মুদ্রাগণনাদি

১ [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী স্বুবর্ণবণিকগণের সংখ্যা এইরূপ: যশোহর—৪,১৮৫; খুল্‌না—৩,৭৮৩; সমষ্টি—৭,৯৬৮—শি মি]

কার্য্য ইঁহাদের এক প্রকার একচেটিয়া ; এজন্য মুদ্রার হিসাব রক্ষার কর্ম্মকেই পোদ্দারী বলে। ইঁহাদের পৃথক্ গুরু পুরোহিত আছেন। ইঁহারা অধিকাংশই বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ৺উদ্ধারণ দত্ত যে কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায়ে এখনও পরমভক্তের অভাব নাই।

বংশ ও সম্পত্তি গৌরবে বগ্‌চরের পোদ্দার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমান হাড়মূল-পাতশালা হইতে কেবলরাম দে বগ্‌চরে আসিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় আঢ্যবংশে বিবাহ করিয়া বাস করেন। ইনি বাণিজ্য ব্যাপারে প্রভূত অর্থলাভ করিয়া কমলাপুর, শ্রীপুর, সিলিমপুর ও ব্রহ্মপুর এই চারিটি খারিজা তালুক অর্জ্জন করেন। ইঁহার পুত্রপৌত্রগণের সময়ে সম্পত্তি ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। প্রধান বংশধারা এই : কেবলরাম—রামনারায়ণ, গুরুপ্রসাদ ; রামনারায়ণ—রায় কালীপ্রসাদ ; গুরুপ্রসাদ—আনন্দচন্দ্র চৌধুরী (৬৮৩ পৃ), তারিণীচরণ চৌধুরী। কেবলরামের পৌত্র কালীপ্রসাদ স্বনামধন্য দানবীর ; তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি দানধর্ম্মে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি সুদীর্ঘ রাস্তাই প্রধান : (১) যশোহর হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী চাকদহ পর্য্যন্ত ৫০ মাইল দীর্ঘ সুন্দর সুচ্ছায় রাজবর্ত্ম এখনও 'কালীপোদ্দারের রাস্তা' নামে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিয়াছে।[১] ইহার জন্য কপোতাক্ষী, বেত্রবতী, নাওভাঙ্গা ও ইছামতী প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর পাকাপুল নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন এবং উহার সংস্কারের জন্য বার্ষিক তিন শত টাকা আয়ের একটি সম্পাত্তি 'চাঁচড়া রোড ষ্টেট্' নামে তৌজিভুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া যান। (২) যশোহর হইতে নহাটা পর্য্যন্ত রাস্তা, ইহা পূর্ব্বে ফৌজ চলাচলের পথ ছিল ; সেই রাস্তার সংস্কার কালে নীলগঞ্জের নিকট ভৈরবের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। (৩) চুড়ামণকাটি হইতে মেটেরি দিয়া কালনা পর্য্যন্ত রাস্তা। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রনাথ, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রেও

১ তখন যশোহর হইতে গঙ্গাস্নানে যাইবার ভাল রাস্তা ছিল না। দীনদুঃখী সর্ব্বজাতীয় লোকে যাহাতে স্বচ্ছন্দে গঙ্গাস্নানে যাইতে পারে, তজ্জন্য মাতৃ-আজ্ঞায় কালীপ্রসাদ এই দীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। খুলনা হইতে যে 'যশোর-রোড' কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহারই একাংশ কালীপোদ্দারের রাস্তা, সে অংশ যশোহর হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দুইধারে বৃক্ষসারি-সমাবৃত সেই-অংশই অতীব সুন্দর। বেনাপোল বা যাদবপুরের নিকট রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দুইদিকে চাহিলে যে নয়নাভিরাম চিত্রপট প্রকটিত হয়, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় উপভোগের বস্তু।

ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নানাকীর্ত্তি ছিল। এই সকল জনহিতকর সদনুষ্ঠানের জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ১৮৪৬ অব্দে, গবর্ণমেণ্ট হইতে কালীপ্রসাদকে নানাবিধ খেলাত সহ 'রায়' উপাধি প্রদত্ত হয়; যশোহরের জজ্‌ ও কালেক্টর মহামতি সীটন-কার এই উপাধি ও খেলাত দিবার সময়ে যশোহরে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। রায় কালীপ্রসাদের খুল্লতাতপুত্র আনন্দচন্দ্রের 'চৌধুরী' খেতাব ছিল, সে উপাধি এখনও চলিতেছে। বগ্‌চরের বাবুরা এখনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও সদাশয়তায় যশোহরে বিশেষ সম্মানিত।

যো গি জা তি॥ এই জাতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রথম খণ্ডে কয়েকস্থানে বলিয়াছি। গুপ্তনৃপতিগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গাদি দেশের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর উহারা পুনরায় হিন্দু আচার গ্রহণ করিতে থাকে। পুরাতন নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিজাতি সেনরাজগণের সময়েও বৌদ্ধাচার অক্ষুণ্ণ রাখেন, ইহাই তাঁহাদের নিগৃহীত হইবার মুখ্য কারণ। বল্লাল সেনের স্কন্ধে সকল অবিচারের দোষ চাপাইয়া অনেক নিম্নজাতি উচ্চপদবীর দাবি করিতেছেন বটে, কিন্তু সকল পাতিত্যের কারণই যে বল্লাল সেন, তাহা নহে। তিনি তদানীন্তন সমাজের অবস্থাকে স্থায়ী হইয়া থাকিবার পাকা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মাত্র, ইহাই তাঁহার দোষ বা শক্তিমত্তার চিহ্ন। সে ব্যবস্থা উল্টাইতে হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর একাধিপত্য করিতে বল্লালের মত তেজস্বী নৃপতির প্রয়োজন। যোগীরা এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধাচারের কিছু নিদর্শন এখনও তাঁহাদের মধ্যে আছে; সবিশেষ প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছি। (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৪৪৯-৫২ পৃ)। জীবিকার জন্য এখন যোগীরা বস্ত্র বয়ন বা বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধশ্রমণের মত ধর্ম্ম-তত্ত্বালোচনা এবং সংস্কৃত ভাষাচর্চ্চা এখনও তাঁহাদের আছে। আমাদের অঞ্চলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ব্যতীত এখনও যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন করেন, তন্মধ্যে যোগীর সংখ্যা অধিক। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগিগৃহে তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের স্বহস্তলিখিত রাশি রাশি সংস্কৃত পুঁথি অযত্নে রক্ষিত হইতেছে।[১]

---

১ যে যে স্থানে পুঁথি সংগ্রহ আছে, তন্মধ্যে দেখা যায়, জ্যোতিষ ও দশকর্ম্মের পুঁথিই অধিক। নাথগণ পূর্ব্বে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা রাজা বা জমিদারের সরকারে দ্বার-পণ্ডিত হইতেন।

অধ্যাপকের মত তাঁহাদের 'ভট্টাচার্য্য' প্রভৃতি উপাধি ছিল। শিক্ষাদীক্ষায় তাঁহাদের যে নিষ্ঠা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বহুপুরুষের শাস্ত্রানুশীলনের ফল। যশোহর-খুল্‌নায় প্রায় ২৩ হাজার যোগীর বাস।[১] উঁহাদের মধ্যে দুই চারিজন এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হইতেছেন। যোগি-সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'যোগি-সখা'য় ইঁহাদের রচনা-নৈপুণ্য ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে তাঁহাদের অবস্থা যাহাই থাকুক, হিন্দুসমাজে তাঁহাদের আধুনিক ব্রাহ্মণত্বের দাবি কখনও স্বীকৃত হইবে না। তবে তাঁহারা যে প্রাচীনকালের এক উন্নত জাতি ও এ অঞ্চলের অন্যতম আদিম বাসিন্দা, সে কথাও অস্বীকার করা চলিবে না।

কৈ ব র্ত্ত জা তি॥ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এক প্রধান অঙ্গ কৈবর্ত্ত। যশোহর-খুল্‌নায় প্রায় ৮০ হাজার কৈবর্ত্তের বাস।[২] উঁহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছেন: হালিক বা চাষী এবং জালিক বা নৌজীবী। তন্মধ্যে নবশাখের পরেই চাষী কৈবর্ত্তের স্থান; উঁহাদের জল আচরণীয় এবং উঁহাদের বিবাহাদি উচ্চ বর্ণের অনুরূপ। চাষী কৈবর্ত্তেরাই এক্ষণে শাস্ত্রমত লইয়া 'মাহিষ্য' বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। পূর্ব্বকালে কৈবর্ত্তেরা যে বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা বা বড় সম্প্রদায় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিরূপে চাষী কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্বোক মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করিয়া উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়া লন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৈবর্ত্তরাজ ভীম বরেন্দ্র মণ্ডলে রাজা হন, তাহা ইতিহাসের বিষয়।[৩] ভূষণা অঞ্চলে মাহিষ্য কৈবর্ত্তের

---

১ [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী উভয় জেলায় যোগীগণের সংখ্যা—২১,২০১ জন —শি মি]

২ [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা এইরূপ: চাষী-কৈবর্ত্ত, যশোহর—৩৮,৪৭৯, খুল্‌না—২৬,৮০৫, সমষ্টি—৬৫,২৮৪। নৌজীবী-কৈবর্ত্ত, যশোহর—৮,২১৭, খুল্‌না—১৩,৩৩৫, সমষ্টি—২১,৫৫২। উভয় জেলায় সর্ব্ব মোট সংখ্যা—৮৬,৮৩৬ —শি মি]

৩ সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামপালচরিতে' (১।৩৯) উহার বিশেষ বিবরণ আছে। 'গৌড়রাজ-মালা', ৪৮ পৃ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ১ম, ২৫৩-৪ পৃ। 'Divya or Divyoka of the Chasi-kaibarta tribe (Kewat-caste)', etc., 'Divyoka's place was taken by his nephew Bhima who became king of Varendra.'—Smith, V. A., *Early History*, 1924, p. 416.

একটি বিশিষ্ট সমাজ আছে। মাহিষ্য বা চাষী কৈবর্ত্তের সঙ্গে জালিক কৈবর্ত্তের মূলতঃ কোন মিলন বা সম্বন্ধ আছে বোধ হয় না। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বল্লাল সেনের নৌবিভাগের কর্ত্তা যে সূর্য্য মাঝির কথা বলিয়াছি ও যাঁহাকে তিনি বিস্তৃত জায়গীর দিয়াছিলেন, তিনি জালিক বা জেলে জাতীয়।[১]

নৌজীবী কৈবর্ত্তেরা সমাজে এখন নিগৃহীত এবং অনাচরণীয় বটে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না। কৈবর্ত্তের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই নৌজীবী। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ল্যাসেন কিং বর্ত্ত বা কি ব্যবসায় এই অর্থ হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন বলিয়া উঁহাদিগকে হীন ব্যবসায়ী মনে করেন। 'কিন্তু নৌজীবী হীন ব্যবসায়ী নহে, হীন হইলে কৈবর্ত্ত-কন্যার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হইত না এবং শান্তনু রাজা চেষ্টা করিয়া কৈবর্ত্ত-কন্যা বিবাহ করিতেন না।'[২] মহাকবি কালিদাস যে বাঙ্গালীকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে বাঙ্গালী পূর্ব্বকালে ভারত সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হেতু, যাঁহারা চীন জাপান প্রভৃতি দূরদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ কৈবর্ত্ত। এখন নৌবিদ্যার সমাদর বা প্রসার নাই, তাই উঁহারা মৎস্য-ব্যবসায়ী হইয়া হীনদশাপন্ন। মালোগণ এই ধীবর কৈবর্ত্তের এক শাখা। যশোহর-খুল্‌নার মৎস্যপূর্ণ নদীর কূলে বহু মালোর বাস। উঁহারা নমশূদ্র জাতীয় জেলে বা জিয়ানি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

নৌব্যবসায়ী কৈবর্ত্তগণের পূর্ব্বজীবিকার একটি নিদর্শন পাটনী জাতিতে আছে। ইঁহারা পৌরাণিক মাধব পাটনীর সন্তান। বর্ত্তমান কালে শুল্ক লইয়া নদীতে খেয়ার নৌকায় পারাপার করিয়া এবং হলকর্ষণ দ্বারা কৃষিকার্য্যে ইঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অন্য কোন নিকৃষ্ট কর্ম্ম করেন না। এজন্য চাষী

১ এই জেলে রাজার রাজ্য যশোহরের অন্তর্গত হল্‌দা-মহেশপুরে ছিল। উহার নানা চিহ্ন অদ্যাপি মহেশপুরে আছে। বল্লাল সেন যে সূর্য্য মাঝির জল আচরণীয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা সন্দেহের বিষয়। অনুসন্ধানের ফলে আমার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিতেছি। কারণ সূর্য্য মাঝির আত্মীয়স্বজন এখনও মহেশপুরের সন্নিকটে বর্ত্তমান এবং এখনও তাঁহারা অনাচরণীয় মাঝি উপাধি-যুক্ত। মহেশপুরের রায় গুড়-চৌধুরিগণ সূর্য্য মাঝির অধস্তন ৫ম পুরুষ সুলতান মাঝিকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়া জেলে রাজার রাজ্য দখল করেন। [সূর্য্য মাঝি কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন না।—বর্ত্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৩৩-৪, ২৭৭-৮, ৩৩১ পৃ দ্র.—শি মি]

২ 'কুশদহ পত্রিকা' (চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)।

কৈবর্তের মত ইঁহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া বহুসংখ্যক পণ্ডিত ইঁহাদের মাহিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবি সমর্থন করিয়াছেন। 'মাহিষ্য-হিতসাধিনী' সমাজ হইতে এই সঙ্গত উদ্যমে উদারতা প্রদর্শন করা উচিত।

অনুন্নত অন্যজাতি॥ হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে যে বহুসংখ্যক জাতি যশোহর-খুল্‌নায় বাস করেন, তন্মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় জনসংখ্যায় প্রধান। ইহারা পোদ ও নমশূদ্র জাতি। উভয় জেলায় পোদের সংখ্যা দুই লক্ষ এবং নমশূদ্রের সংখ্যা ৩½ লক্ষ অর্থাৎ দুইটি শাখার সমষ্টি সমগ্র জনসংখ্যার ⅙ অংশ। নমশূদ্রের সংখ্যা উভয় জেলায় প্রায় সমান; কিন্তু পোদের সংখ্যা যশোহরে মাত্র ৮ হাজার, অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৯১ হাজার পোদ খুল্‌নার অধিবাসী অর্থাৎ খুল্‌নার ৪৮ জন হিন্দুর মধ্যে ১৪ জন পোদ।[১] এই ৫½ লক্ষ লোক সবই কৃষিব্যবসায়ী এবং অধিকাংশই ধনধান্যে লক্ষ্মীযুক্ত। বর্তমান অন্নসমস্যার দিনে ইঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ইঁহাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার প্রধান কারণ এই যে, ইঁহাদের মধ্যে বিলাতী সভ্যতার মন্দটুকু প্রবেশ করতঃ অলস ও বিলাসী করিয়া তুলিয়া ব্যয়াধিক্য ঘটায় নাই।

পোদগণ এক্ষণে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চান, পোদশব্দ পুণ্ড্র কথার অপভ্রংশ এবং তাঁহারা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভুত প্রাচীন পৌণ্ড্রক বা পুণ্ড্রজাতি।[২] একথা আমি অবিশ্বাস

---

১ [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী সংখ্যাগুলি এইরূপ :

	যশোহর	খুল্‌না	উভয় জেলায় মোট
সমগ্র হিন্দু—	৬,৫৬,৩৪৩	৭,২৬,৮৬১	১৩,৮৩,২০৪
তন্মধ্যে পোদ—	৫,০১৯	১,৫১,৯৫৩	১,৫৬,৯৭২
এবং নমশূদ্র—	১,৭৯,১৩১	২,২৭,৮৪৪	৪,০৬,৯৭৩

—শি মি]

২ মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় স্বপ্রণীত '*A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods*' নামক পুস্তকে চাষী পোদদিগের প্রাচীন কাহিনী বহু সতর্ক প্রমাণসহ অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়া, তাঁহার স্বজাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্গত দাবি সভ্য সমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা প্রশংসিত হইয়াছে এবং তাঁহার সে প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার একাগ্র সহানুভূতি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও পুঁড়া ও পোদদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবংশীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।—'বিবিধ প্রবন্ধ', বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, ১ম প্রস্তাব।

করি না। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অতি পূর্ব্বকালে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রক জাতি বঙ্গদেশে শতমুখী গঙ্গার নবোত্থিত ভূভাগে উপনিবিষ্ট হন এবং সেই ব্রাহ্মণবিহীন প্রদেশে ক্রিয়ালোপে সংস্কারশূন্য বা ব্রাত্য হইয়া যান। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবাহে আসমুদ্র বঙ্গ প্লাবিত, তখন উঁহারাও সে প্রবাহে ভাসিয়া যান। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইলে অনেকে সে মতে পুনর্দীক্ষিত হন বটে, কিন্তু কতকগুলি জাতির রাজানুগ্রহ লাভে আগ্রহ না থাকায়, তাঁহারা নব সমাজের প্রবল কোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত ও অনাচরণীয় হন। এমন পাকা দলিলে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা কলমবন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, বহু শতাব্দীতেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে সুবর্ণ বণিক ও যোগীজাতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুলজাত পুণ্ড্রগণও সেই একই প্রকারে নির্য্যাতিত। মহাভারতাদি গ্রন্থে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতীয় পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনার্য্য পৌণ্ড্রেরা দক্ষিণ ভারত হইতে দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রকূলে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ মৎস্য-ব্যবসায়ী হন। সেই ধীবর পোদগণের আচার প্রকৃতি চাষী পোদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চাষী পোদগণ যে অনার্য্য নহেন, বহু অনুসন্ধানের ফলে ইহাই আমার বিশ্বাস; উঁহারা স্থান ও ব্যবহার দোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র।

খুল্‌নার দক্ষিণাংশে বহু চাষী পোদের বাস। তাঁহারাই সুন্দরবনের প্রধান আবাদকারী জাতি। ইঁহাদের মধ্যে সামাজিক কৌলীন্য নাই বটে, কিন্তু ক্রিয়াগুণে কতকগুলি পরিবার সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে পাইকগাছা থানার অন্তর্গত হাতিয়ারডাঙ্গার বাছাড় ও চণ্ডীপুরের ঢালী, এবং তালার অন্তর্গত মহিষাডাঙ্গার সর্দ্দার ও বিশ্বাস বংশ বিশেষ বিখ্যাত। হাতিয়ারডাঙ্গার হরিমোহন বাছাড় সঙ্গতিসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ও অতিথিপরায়ণ লোক ছিলেন। গুড়িখালি বাজারে ঘোষখালি নদীর উপর তিনি যে কারুকার্য্যখচিত প্রকাণ্ড রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন, উহার উচ্চতা প্রায় ৩৫ হাত এবং বেষ্টন ৯৪ হাত। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বংশ ব্যতীত সাহাপুর, বয়ারডাঙ্গা, লাউডোব, সরল, ডুমুর-পোতা প্রভৃতি স্থানের মণ্ডল, হাজিডাঙ্গা ও দাসকাটির জোতদার, টুঙ্গিপুরের বর্ম্মণ এবং পাখীমারা প্রভৃতি স্থানের মীরধাগণও সমাজে সম্মানিত।

অল্পদিন হইল পোদ ও নমশূদ্র উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষালাভের চেষ্টা জাগিয়াছে। এ বিষয়ে পোদ অপেক্ষা নমশূদ্রেরা এবং যশোহর-খুল্‌না অপেক্ষা

ফরিদপুরের নমশূদ্রেরা অধিক অগ্রসর। গোপালগঞ্জ মহকুমা একটি প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র।[১] তথাকার ভীষ্মদেব দাস (B.L., M.L.C.) মহাশয় এক্ষণে ভাঙ্গার উকীল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রতিনিধি। যশোহর-খুলনার মধ্যে বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী খাঁড়াসম্বল গ্রামের মল্লিক ভ্রাতৃগণ শিক্ষাপ্রভায় এই দুই জেলার নমশূদ্র সমাজের মধ্যে সর্ব্বোন্নত। উঁহাদের মধ্যে কুমুদবিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুকুন্দবিহারী হাইকোর্টের উকীল, অতুলবিহারী (M.A., B.L.) মুন্সেফ, নীরদবিহারী (M.A., B.L.) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (M.L.C.) এবং ক্ষীরোদবিহারী সব্-ডেপুটি। এই প্রাচীন নমশূদ্র জাতি এক সময়ে প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রভৃতি নৃপতিগণের ঢালী সৈন্য-বিভাগ পুষ্ট করিয়াছিলেন, এখনও উঁহাদের বহু পরিবারের ঢালী ও সর্দ্দার প্রভৃতি উপাধি সেই যোদ্ধজীবনের ইঙ্গিত করে। শিক্ষা বিস্তারের ফলে এই সকল জাতি প্রায়ই উন্নত হইবে, আশা করা যায়। তবে যদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকুরী-বৃত্তি এবং তাহার ফল কৃষি-বৃত্তির বিলোপই হয়, তাহা হইলে সেরূপ শিক্ষা কামনার বিষয় না হইয়া উন্নতির পথে কণ্টক হইতে পারে। নমশূদ্র জাতি হইতে জালিয়া, জিয়ানি, তিওর, কড়াল প্রভৃতি নিম্ন জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

আর তিনটি বিচিত্র অনাচরণীয় জাতির কথা বলিয়া হিন্দু-পর্য্যায় শেষ করিব; যথা, কপালী, কিন্নর, ও ভগবানিয়া জাতি। ইহার মধ্যে কপালী জাতি কাশ্মীর হইতে আগত প্রাচীন বৌদ্ধ, কিন্নরগণ পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগত গন্ধর্ব্ব জাতি, ভগবানিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণে উৎপন্ন অভিনব সঙ্কর জাতি। গল্প আছে, এক সময়ে কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ভৈরব কপালীর বংশীয়গণ বঙ্গদেশে আসিয়া বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করেন। এখন উঁহারা অধিকাংশই কৃষি-ব্যবসায়ী, অনেকে ভূসম্পত্তিশালী। ইঁহারা অনাচরণীয়

১ এই মহকুমার গোপালগঞ্জ, গোপীনাথপুর ও ওড়াকান্দি মিশন স্কুল এবং ভাঙ্গার অন্তর্গত দুই একটি স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া প্রতিবৎসর বহু নমশূদ্র ছাত্র দৌলতপুর কলেজে পড়িতে আসিতেছে এবং তথায় তাহারা নানা সুবিধায় ও স্বচ্ছন্দে পড়াশুনা করিয়া প্রতিবৎসর অনেক ছাত্র, আই, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। যশোহরের অন্তর্গত মণিরামপুর থানায় শতাধিক গ্রামের নমশূদ্রগণ মিলিত হইয়া মসিয়ারহাটি হাই স্কুল খুলিয়াছেন। অচিরে সেস্থানও একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে, আশা করা যায়।

হইলেও ঘৃণিত নহেন, ইঁহারা নবশাখের তুল্য সদাচারী। ইঁহাদের গুরু পুরোহিত স্বতন্ত্র।[১] ভরতভায়নার নিকটবর্ত্তী গৌরীঘনা, বরাতিয়া, বামনদিয়া, সন্ন্যাস-গাছা, বামনডাঙ্গা, মাদারডাঙ্গা, রত্নেশ্বরপুর, বাক্‌সাপোল, সাতাইসকাটি প্রভৃতি ১৪।১৫ খানি গ্রামে কপালীর বাস।

কিন্নরগণ নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী। উঁহারা চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে মুকুট রায়ের রাজত্বকালে ঝিঁকারগাছার নিকটবর্ত্তী লাউজানির পার্শ্বে গরিবপুরে আসিয়া বাস করেন। পরে পাঠানদিগের অত্যাচারে সেখান হইতে উঠিয়া যাদবপুরের দক্ষিণে সাম্‌টা ও উলসী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী হন; সেখানে ৪।৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র উলসী গ্রামে ১৪।১৫ ঘর আছে, তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে যৌন-সম্বন্ধজন্য ক্রমে এই জাতির লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হাটগাছা-কাল্‌নায় কয়েক ঘর মাত্র কিন্নর আছেন, উলসীর সঙ্গে তাঁহাদের দুই একটি বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। সুকবি মধুসূদন কিন্নর বা ঢপ্‌-সঙ্গীতের প্রবর্ত্তক স্বনামধন্য মধু কা'ন পীযূষবর্ষী সঙ্গীতে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। পরিশিষ্ট খণ্ডে আমরা তাঁহার জীবনী ও কবিত্বের সমালোচনা করিব।

ভগবানিয়া এক অদ্ভুত জাতি। ইঁহারা মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার 'কর্ত্তাভজা' সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা এক 'গুরু সত্য' জাতীয় মন্ত্র সকলে পান, পৃথক্ পৃথক্ বীজ মন্ত্র নাই। ইঁহাদের মন্দির বা মস্‌জিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস নাই; উপাসনার কোন সময়, স্থান বা প্রকার নাই। ইঁহারা মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্রপূত করিয়া মুসলমানের মত কবর দেন। মাংস মোটেই খান না, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করেন না। মৎস্য সকলে খান; আহারে হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। গলায় মালা ধারণ বা বস্ত্র পরিধানের কোন নিয়ম নাই। দাড়ি রাখা বা না রাখা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। ইঁহারা একমাত্র নিরাকার ভগবানে বিশ্বাস করেন, এজন্য ইঁহাদের নাম ভগবানিয়া, কিন্তু ইঁহারা জাতিতে মুসলমান বলিয়া লিখিত

১ পুরোহিতের নামে ইঁহারা শ্রীমন্ত ও মৃত্যুঞ্জয় এই দুই সমাজে বিভক্ত। ইহা ব্যতীত নলদী পরগণায় অন্যবিধ কপালী সমাজ আছে। কিন্তু কোন সমাজের সহিত কোন সমাজের বিবাহাদি সম্বন্ধ নাই।—১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২১৩ পৃ।

ও কথিত হন এবং সেলাম দেন। তালার নিকটবর্ত্তী চর নামক স্থানে, মাগুরা-ঘোনা, পাতরা, বেতাগা, ঘোষড়া, লাইতাড়া, বড়েঙ্গা, হদ্, মণিরামপুর, প্রভৃতি স্থানে ভগবানিয়াদিগের বাস আছে।

মুসলমান-সমাজ

সর্ব্বাগ্রে আমি অকপট ভাবে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কারণ, এ সম্বন্ধে আমি উপযুক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পারাও বড় কঠিন কার্য্য। যশোহর-খুল্‌নায় প্রায় ৩২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমান;[১] উঁহাদের বসতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত, কোথায়ও সীমাবদ্ধ নহে। উঁহাদের কোন বংশকারিকা বা লিখিত বিবরণ নাই। এই বিরাট বিচিত্র সমাজের কোন প্রকাশযোগ্য বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গেলে যে সময়, সঙ্গতি, সুযোগ ও গুরু শ্রমের প্রয়োজন এবং উহা গ্রন্থিত করিতে এই পুস্তকে যতটুকু স্থান আবশ্যক, তাহা আমার নাই। এজন্য প্রকাশ্যে ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, অঙ্গহীনতার হস্ত হইতে পুস্তকখানিকে রক্ষা করিবার জন্য, সামান্য মাত্র দুই চারিটি কথা বলিব। তাহাও যে ভ্রমসঙ্কুল হইবে না, এমন স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। ভ্রম-সংশোধনের ভার মুসলমান ভ্রাতৃগণের উপর ন্যস্ত থাকিল।

মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান শ্রেণী—শিয়া ও সুন্নি। তন্মধ্যে যশোহর-খুল্‌নার স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে শিয়া নাই বলিলে চলে; সহরে বাজারে যে দুই দশ জন শিয়া-মুসলমান মহরমের তাজিয়া উৎসব করেন, তাঁহারা পশ্চিম হইতে আগত ব্যবসায়ী বা কর্ম্মচারী। এখানকার অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি এবং উঁহারা হানিফী মতাবলম্বী।[২] সাফেয়ী, হাম্বলী ও মালিকী নামে সুন্নিদিগের যে অন্য তিনটি সম্প্রদায় আছে, উঁহারা এ অঞ্চলে নাই। এখানকার হানিফী সুন্নিদিগের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

১ [৮৩২ পৃ দ্র.—শি মি]

২ ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ইমাম্ আবু হানিফার (৬১৯-৭৩৩ খৃঃ) মতানুবর্ত্তী। ইঁহারা দিবসে ৫ বার নমাজ করেন এবং তৎকালে নাভিদেশের উপর হস্তের উপর হস্তার্পণ করেন। সাফেয়ী অর্থাৎ আবদুল্যা সাফির (৭৬৭-৮২০ খৃঃ) মতাবলম্বিগণ বক্ষের উপর ঐ ভাবে হস্তার্পণ করেন।

১ আশ্‌রাফ্ (শরফ্ শব্দের বহুবচন) অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ মুসলমান।

২ আত্‌রাফ্ (তরফ্ শব্দের বহুবচন) অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীভুক্ত।

৩ আর্‌জাল্ (রজীল শব্দ হইতে নিষ্পন্ন) অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের অনাচরণীয় মুসলমান। চামার, মেহ্‌তর প্রভৃতি আর্‌জাল্ শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে উচ্চ দুই শ্রেণীর কোন সমাজ সম্পর্ক বা আহার ব্যবহার চলে না, উঁহাদের কোন বিশেষ খাদ্য-বিচার বা ধর্ম্মাচার নাই। হিন্দুর মধ্যেও চামার প্রভৃতি থাক আছে। আর্‌জাল্‌দিগের জন-সংখ্যা খুব বেশী নহে।

আমরা এখানে প্রধানতঃ উর্দ্ধতন দুই শ্রেণীর কথাই বলিব।

আ শ্‌ রা ফ্ স ম্প্র দা য়॥ আশ্‌রাফ্ বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ—এই কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত। সৈয়দগণ আরব হইতে আগত এবং হজরতের সহিত সম্পর্কিত; মোগলেরা ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত মঙ্গোলীয় জাতি; পাঠান বা আফগান শব্দ ব্যাপক অর্থ-বোধক, মোগল ও সৈয়দ ব্যতীত যে সব মুসলমান ইরান্ দেশ হইতে আসেন, উঁহারাই পাঠান নামে পরিচিত; সেখও পারস্যাদি দেশ হইতে আগত সম্ভ্রান্ত বংশীয়। সৈয়দদিগকে ব্রাহ্মণ এবং অপর তিন সম্প্রদায় এবং আমীর ও খাঁ উপাধিধারী-দিগকে ক্ষত্রিয়ের সহিত তুলনা করা যায়। যশোহর-খুল্‌নায় সেখ ব্যতীত অপর সকলের সংখ্যা ২৫ হাজারের অধিক হইবে না, কিন্তু সেখের সমষ্টি প্রায় ১২ লক্ষ।[১] সেখের মধ্যে কতক আশ্‌রাফ্ এবং অধিকাংশ আত্‌রাফ্ শ্রেণীতে পরিগণিত। আশ্‌রাফ্ সেখেরা পশ্চিম দেশ হইতে আগত সম্মানিত বংশ, উঁহাদের সংখ্যা দুই তিন লক্ষ মাত্র। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান জনসংখ্যার অর্দ্ধেক, সেখ-উপাধিধারিগণ হিন্দু জাতির নিম্নস্তর হইতে বহির্গত হইয়া এক সময়ে ক্রমে ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। উঁহাদের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস এক্ষণে অতীতের কুক্ষিতলে প্রচ্ছন্ন। এখন তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া

১ [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী উভয় জেলায় মুসলমানগণের মোট সংখ্যা—১৭,৮৬,৪৪২; তন্মধ্যে সেখগণের সংখ্যা—১৬,১১,৬৫৯ —শি মি]

চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। বহু পুরুষের সংস্কার ফলে এবং আধুনিক যুগে ধর্ম্মভাবের সঞ্জীবনে উঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতি বা চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। পাঠান আমলে খাঁ জাহান ও তাঁহার অনুচরগণ কিরূপে ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, উঁহাদের বল-প্রয়োগ বা প্ররোচনায় কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম মুসলমান হইয়া পীরালি হইয়া গিয়াছিলেন, গাজীদিগের ঘোষণায় কিরূপে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, তাঁহাদের কত কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান, সে কথা বিস্তৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি।[১] হিন্দুসমাজের নির্য্যাতনে পলায়িত নমশূদ্র, পোদ, কৈবর্ত্ত, তিওর ও ধীবর প্রভৃতি জাতিরা যখন দক্ষিণাংশে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন উদ্যমশীল মুসলমান যাজকগণই সে প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহসী হন ; এখনও সেই সকল পীরের আস্তানা যেখানে সেখানে বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের শিক্ষার ফলে ঐরূপ কত জাতি নব মতে দীক্ষিত হইয়া কৃষিজীবী মুসলমান হইয়া গেলেন ; যে সব উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ দৈব ঘটনায় ইস্লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুর আচার-ব্যবহার কতকাংশে বজায় রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই পীরালি মুসলমান নামে এখনও চিহ্নিত। উঁহাদের কথা পরে বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত নবদীক্ষিত কৃষিজীবী মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন। সামাজিক ব্যাপারে উঁহারা এখনও উচ্চ শ্রেণীতে পরিগণিত না হইয়া আত্রাফ্ সম্প্রদায় ভুক্ত আছেন। এখনও আশ্রাফ্ মুসলমানগণ উঁহাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন না।

আশ্রাফ্ শ্রেণীতে এ প্রদেশে যাঁহারা আছেন, তন্মধ্যে সৈয়দ, উচ্চশ্রেণীর সেখ, মীর্জা ও বেগ প্রভৃতি উপাধিধারী মোগল, খাঁ, মল্লিক, মীর, মীরধা প্রভৃতি

১ 'They came down upon the country sometimes as military colonists and sometimes as heads of great reclamation enterprises in the Deltaic districts. Even in an old settled district like Jessore, the earliest traditions begin with an enterprise of the latter sort. And wherever they went, they spread their faith, partly by the sword, but chiefly by a bold appeal to the two great instincts of the popular heart. The Hindus had never admitted the amphibious population of the Delta within the pale of their community. The Mahomedans offered the plenary privileges of Islam to Brahman and outcaste alike.'—Hunter, *Indian Mussalmans*, p. 154.

উপাধিযুক্ত পাঠান, আখন্দজী (অপভাষায় আকুঞ্জী) ও খোন্দকার (অধ্যাপক), মুন্সী (লেখক) এবং কাজি (বিচারক), এই সকল বংশই প্রধান। দেশের মধ্যে নানাস্থানে সাধারণ কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের মধ্যে বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত এই সকল সম্ভ্রান্ত বংশ এখনও বাস করিতেছেন; কিন্তু উঁহাদের স্বজাতীয় শাসনকালে তাঁহারা যেমন রাজানুগ্রহে সম্পোষিত হইতেন, ইংরাজ আমলে, বিশেষতঃ উহার প্রথম একশত বর্ষকাল গবর্ণমেণ্ট হইতে সুদৃষ্টির অভাবে, উঁহাদের অনেক পরিবার চিরাচরিত হালচা'ল বা বংশ-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গিয়া একেবারে হীনদশায় পতিত হন;[১] আবার শিক্ষোন্নতি ও সরকারের সদাশয়তার ফলে কিছুদিন হইতে তাঁহারা মস্তক উন্নত করিয়া বংশ-গৌরব দেখাইতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের উল্লেখ করিতেছি; খুল্‌নার অন্তর্গত সৈয়দমহল্যা, বাগেরহাট (রণবিজয়পুর) ও পয়োগ্রামের সৈয়দ বংশীয়গণ, যশোহরের উত্তরাংশে আলুকদিয়ার সৈয়দ-বংশীয় পীরসাহেব; আলাইপুর, রণবিজয়পুর, গদাইপুর, তেতুলিয়া, ব্যামর্ত্তার নিকটবর্ত্তী কাটিপাড়া, বড়দলের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর, মাগুরার নিকটবর্ত্তী বরীশাট প্রভৃতি স্থানের সুপ্রসিদ্ধ কাজি বংশ; মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শীরগ্রামের সম্ভ্রান্ত পাঠান-বংশ;[২] নাকোলের মীর্জা বা মিয়াজী বংশ; বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী সাবেকডাঙ্গা, কুলিয়াধা'ড়, রণবিজয়পুর, পাটরপাড়া ও কররীর সেখ বংশ; কাজি, মোল্যা ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিযুক্ত পয়োগ্রামের সেখবংশ; নল্‌দীর নিকটবর্ত্তী হবখালির মীর বংশ; শোলপুর-যুগীহাটির সর্দ্দার ও আকুঞ্জি বংশ; ইঁহারা সকলেই দেশমধ্যে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। শীরগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশে অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, পরম পণ্ডিত মৌলবী আবদুস্‌ সালাম, এম, এ, মহোদয়ের জন্ম; ইনি 'রিয়াজুস-সালাতিন' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন; ইঁহার ভ্রাতা মৌলবী আবদুল্‌ হামিদ, এম, এ, বি, এল, ভাগলপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং ইঁহার বংশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি বহু উচ্চকর্ম্মচারী আছেন। এইরূপে পয়োগ্রামে পুলিসাদি বিভাগে যে কত উচ্চ চাকুরীয়া

১ *Ibid.*, p. 154.

২ 'Close to Mahammadpur lies an old Musalman colony at Shirgeon on the Barasia River.'—*Reazu-s-Salatin*, p. 265 *note*.

আছেন, তাহা বলিবার নহে; তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রফেসর আনোয়ারল্ কাদের এবং পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাজি আজিজল্ হক্, খুল্না ডিঃ বোর্ডের সদস্য কাজি সৈফ্উদ্দীনের নাম করিতে পারি। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ 'নবি-কাহিনী' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা এবং 'শিক্ষক' পত্র-সম্পাদক খাঁ সাহেব কাজি ইমদাদুল্ হক্ (বি, এ, বি, টি) মহোদয় গদাইপুরের কাজি বংশের উজ্জ্বল রত্ন। কাজি মহম্মদ মেন্নাতুল্যা খাঁ তেতুলিয়ার কাজি বংশের কৃতী ব্যক্তি; ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর ষট্‌গুম্বজ মস্‌জিদ্ তেতুলিয়া পল্লীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। রণবিজয়-পুরের সৈয়দ বংশে বাগেরহাটের বিদ্যোৎসাহী যশস্বী উকীল সৈয়দ সুলতান আলি এবং মুন্সেফ্ সৈয়দ আমজফ্ আলি সাহেবের নাম করিতে পারি। ঐ স্থান ও কুলিয়াধা'ড়ের সেখ বংশে সব-ডেপুটি ফজলুর রহমান ও মোতাহেরল হক্ এবং আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বজলুর রহমান উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মহল্যার খাঁ সাহেব মহম্মদ ইউসফ (পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) এক্ষণে মূলঘরের অধিবাসী।

আ ত্‌ রা ফ্ স ম্প্র দা য় ॥ আত্‌রাফ্ সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের মধ্যে সেখই অধিক; শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহারা এক্ষণে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগিতেছে। এই সম্প্রদায়ের কৃতী ব্যক্তিগণের তালিকা সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। পরিশিষ্ট খণ্ডে কিছু চেষ্টা করিব। বস্ত্র ব্যবসায়ী জোল্‌হা, মৎস্য ব্যবসায়ী নিকারী ও চাকলাই (যশোহর-মণিরামপুর অঞ্চলে) মুসলমান, এবং দরজী, ফরাজী ও পীরালি প্রভৃতি থাক্‌ও এই শ্রেণিভুক্ত। সেখ ব্যতীত আরও যে তিন লক্ষ আত্‌রাফ্ আছেন, তন্মধ্যে যশোহর-খুল্‌নায় প্রায় ৮৩ হাজার জোল্‌হা বা বস্ত্রব্যবসায়ী মুসলমানের বাস।[১] অনেকেই পুরাতন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষি বা অন্য ব্যবসায় এবং লেখাপড়ায় মন দিতেছেন। বিদ্যাগৌরবে এই সকল পর্য্যায়ের মধ্যে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে। একজনের নাম করিতে পারি এবং তিনি বোধ হয় যশোহর-খুল্‌নার মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে পদ-গৌরবে এক্ষণে সর্ব্বোচ্চ। নল্‌তা-নিবাসী খাঁ বাহাদুর মৌলবী আসান্ উল্যা (M.A., I.E.S.) এক্ষণে শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে

১ [বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর ১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহারে দেখা যায়, জোল্‌হা মুসলমানগণের উভয় জেলার সংখ্যা—৫২,০৬৫ জন।—শি মি]

উন্নীত হইয়া চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। মৌলবী সাহেব যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সহৃদয় ও সামাজিক।

পী রা লি মু স ল মা ন ॥ যে সব উচ্চ বংশীয় হিন্দু একসময়ে নানা কারণে ইসলাম-মত গ্রহণ করেন, অথচ পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই পীরালি-মুসলমান নামে পৃথক্ হইয়া থাকেন। আকৃতি ও বর্ণে, শিক্ষা ও সভ্যতায়, সৌজন্য ও সদাচারে উঁহারা এখনও বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছেন। সাধারণ মুসলমান সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় না। যশোহরের পশ্চিমাংশে মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে, মধ্যভাগে সিঙ্গিয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে এবং দক্ষিণভাগে সাতক্ষীরা মহকুমায় ও পার্শ্ববর্ত্তী ২৪-পরগণার পূর্ব্বাংশে ইঁহাদের তিনটি কেন্দ্র আছে। দক্ষিণডিহি-নিবাসী গুড়-চৌধুরী ব্রাহ্মণ বংশীয় কামদেব ও জয়দেব কিরূপে পীরালি হন এবং ঐ সমাজ কিরূপে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সে ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (৩য় সং, ৩৩৩-৯ পৃ) দিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর সোনাই নদীর কূলে যে হাকিমপুর গ্রামে কাজিদিগের গৃহে একদা প্রতিপালিত হন, উক্ত কামদেব ঠাকুরের অধস্তন বংশধর নসর্উদ্দীন সেই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র হাজি মফিজ্উদ্দীনের নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর মস্জিদ্ সেইস্থানে আছে। হাজি সাহেবের পৌত্রেরা জীবিত আছেন, উঁহারা দেখিতে যেমন সুপুরুষ, বিদ্যাচর্চ্চায় তেমনই সুশিক্ষিত এবং ব্যবসায়ে ধন-সম্পত্তিশালী। এতদঞ্চলে পীরালি মুসলমানদিগের তিনটি সমাজের পরিচয় পাই :

১ খাঁ-সমাজ ॥ হাকিমপুরের খাঁগণ খাঁ-সমাজের অন্তর্গত; হাকিমপুর, লবঙ্গ ও রসুলপুর লইয়া এই সমাজ।

২ চৌধুরী-সমাজ ॥ পলাশপোল, কুলিয়া, শ্রীরামপুর, (যশোহরের নিকট) সিঙ্গিয়া, পাথরঘাটা, গণপতিপুর ও নগরঘাটা প্রভৃতি স্থান লইয়া চৌধুরী-সমাজ গঠিত। কুলিয়া-নিবাসী খ্যাতনামা মৌলভী মকলুব্ আহম্মদ খাঁ চৌধুরী (M. A.) মহোদয় এই চৌধুরী-সমাজভুক্ত।

৩ সুতলিয়া-সমাজ ॥ পলাশপোল, শ্রীরামপুর ও পাথরঘাটা প্রভৃতি স্থানে সুতলিয়া সমাজের লোকও দেখা যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প ও স্থাপত্য

অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভ্যতা শিল্প-বিলাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আদিম যুগে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষাই মানবের প্রধান সাধনা হয়; ক্রমে সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষায় তাহাদের চিত্ত নিবিষ্ট থাকে; ইহার পর মানসিক স্ফূর্ত্তি বা আনন্দ প্রকাশের জন্য দেশমধ্যে কলা-বিদ্যার প্রচলন হয়। ভারতেও তাহাই হইয়াছিল। তবে ভারতীয় আর্য্যগণ যাহা যখন ধরিয়াছেন, তাহার শেষ না করিয়া ছাড়েন নাই; 'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি'—ইহাই তাঁহাদের ভাষা। একটি দুইটি নহে, ভারতে চতুঃষষ্টি কলা উদ্ভূত ও প্রচলিত হইয়াছিল। ৬৪টি মূল কলা হইতে শিল্প-কলার সমষ্টি ৫৮২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।[১]

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান প্রকৃতি; ভক্ত ভারত দেবপ্রীতির জন্য যেমন গানবাদ্যের উৎকর্ষ সাধন করে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দেবচরিত্র চিত্রিত ও দেবমূর্ত্তি গঠিত হইত। উহা হইতে চিত্রবিদ্যা ভাস্কর্য্যের উদ্ভব হয়। চিত্র ও মূর্ত্তিগুলি সযত্নে সুরক্ষিত করিবার জন্য দেবমন্দির রচিত হইবার আবশ্যক হইয়াছিল; সেই জন্যই স্থাপত্য শিল্পকলার অঙ্গবিশেষ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এরূপভাবে ঘনিষ্ঠরূপে অপেক্ষিত যে, একটিকে বাদ দিয়া অন্যের কথা বলা চলে না। ভারতীয় প্রতিভা এই দুই বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের কোন নগণ্য অংশের ইতিহাস লিখিতে গেলেও তাহার দেবমন্দির বা দেবমূর্ত্তি অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে, সে ইতিহাসের অঙ্গহানি হয়। সামুদ্রিক বারিবিন্দুর মত আমাদের যশোহর-খুল্না অবশ্য নিতান্ত নগণ্য সামান্য স্থান মাত্র, তবুও ইহার নাতিপ্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তি কিছু কিছু পুরাতন ভাব ও গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে।

প্রাচীন ভারতবাসীকে শুধু ধর্ম্ম-সর্ব্বস্ব বলিলে অবিচার করা হয়।[২] গৃহ-

১ পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বসমেত ৫১৮টি কলার উল্লেখ করেন ('মাসিক বসুমতী' ১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭ পৃ) এবং শ্রদ্ধাস্পদ মৈত্রেয় মহোদয় উহাকে 'অন্তর কলা' সংজ্ঞা দিয়া মূল ৬৪ কলার সহিত সর্ব্বসমষ্টি ৫৮২ ধরিয়াছেন ('সাহিত্য', ভাদ্র, ১৩২৯, ৩৪৩ পৃ)।

২ Grunwedel, *Buddhist Art in India*, p. 1.

কর্ম্মেও তাঁহারা কম নিপুণ ছিলেন না ; গোভিলাদি গৃহ্য-সূত্রে তাহার পরিচয় আছে। বাস্তুবিদ্যাকে তাঁহারা এত সম্পুষ্ট করিয়াছিলেন যে, সাধারণ শিল্পবিদ্যা উহার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন, 'মানব সভ্যতার প্রথম সোপান বাস্তু রচনা ; গৃহ-নির্ম্মাণ-কৌশল অধিগত করিয়াই মানব সমাজ নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি লাভের অধিকারী হইয়াছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াই মানব-সমাজ নিরস্ত হইতে পারে নাই। তাহাকে সাজসজ্জায় সুশোভিত করিবার আকাঙ্ক্ষা বিবিধ শিল্প-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বাস্তুবিদ্যাই শিল্প-বিদ্যার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।'[১] স্থপতিবিদ্যা এই বাস্তুশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশীয় লোক ইহার সূক্ষ্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সমতটে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য প্রদেশে যে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের কথা আমরা প্রথম খণ্ডে নানাস্থানে বিচার করিয়াছি। এখানে প্রসঙ্গতঃ কতকগুলির নামোল্লেখ করিব মাত্র। সর্ব্বাগ্রে ভাস্কর্য্যের কথা বলিতেছি।[২] (১) বাগেরহাটের অন্তর্গত শিববাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় স্থপতি বিভাগের (Indian Archæological

১ 'সাহিত্য', ভাদ্র, ১৩২৯, ৩৩৯-৪০ পৃ।

২ [পুরাতন যশোর-রাজ্যের অন্তর্গত স্থান সমুদয় হইতে অধুনা আবিষ্কৃত নিম্নোক্ত উজ্জ্বল শিল্প-নিদর্শনগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) বেড়াচাঁপা-চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত মথুরা-শিল্পীর নিদর্শন তুল্য আঃ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর বুদ্ধের আবক্ষ লাল-বেলে-পাথরের বলিষ্ঠ মূর্ত্তি। ইহাই বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বুদ্ধমূর্ত্তি। (১ম খণ্ড, ৩য় সং, পরিশিষ্ট গ দ্র.)

(খ) অনুরূপভাবে চন্দ্রকেতু গড়ে আবিষ্কৃত সুঙ্গ-কুশান যুগের অপূর্ব্ব কমনীয় পঞ্চচূড়-যক্ষিণী মৃৎফলক। (১ম খণ্ড, ৩য় সং, পরিশিষ্ট গ দ্র.)

(গ) বালাণ্ডার নিকটবর্ত্তী ভাঙ্গড় হইতে সম্প্রতি প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রীদেবীর কষ্টিপাথরের নয়নাভিরাম ভঙ্গিমা-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। ইহা আঃ একাদশ শতাব্দীর শিল্পসৃষ্টি। (১ম খণ্ড, ৩য় সং, পরিশিষ্ট গ দ্র.)

(ঘ) সুন্দরবনের খাড়ী অঞ্চল হইতে পরবর্ত্তীকালে সংগৃহীত ডোম্মনপালের পট্টোলীর পশ্চাদ্‌পটে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি। এলোরায় যে রেখা-নির্ভর চিত্র পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়, ইহা

Department) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়[১] আমার সহিত ঐ মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এমন সুন্দর, এমন সৌষ্ঠব-সম্পূর্ণ, বুদ্ধের জীবনাখ্যায়িকা জ্ঞাপক এত অধিক বিবরণযুক্ত, এমন মূর্ত্তিস্তবক (Stele) ভারতে আর আছে কি না সন্দেহ। তিনি আমাপেক্ষাও (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২২৩-৫ পৃ) কিছু কিছু নূতন তথ্যের সমুদ্ধার করিয়াছেন। (২) যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠমূর্ত্তি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৬৮-৯ পৃ), সেখহাটির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৫০-১ পৃ), আমাদির চামুণ্ডা মূর্ত্তি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৭২-৩ পৃ), পাণিঘাটের অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তি (হিমাচল প্রদেশ হইতে আনীত, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৭৩-৮ পৃ)—এইগুলি এ প্রদেশের প্রাচীন নিদর্শন। (৩) যশোহর-খুল্‌নার নানাস্থানে যে বহুসংখ্যক চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছেন (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৩৬, ২৫২-৬ পৃ) উঁহার রচনাকাল সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ধরা যায়। এই প্রসঙ্গে সেখহাট ও নলডাঙ্গার গণেশমূর্ত্তির কথা বলিতে পারি। (৪) এতদ্ব্যতীত কষ্টিপাথরে বিনির্ম্মিত যে সকল সুন্দর সুন্দর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধাতু বা দারুময়ী রাধিকার সঙ্গে নানাস্থানে পূজিত হইতেছেন, উঁহাদের বয়স ৩।৪ শতবর্ষ হইবে। তবে প্রতাপাদিত্যের আনীত যে গোবিন্দদেব বিগ্রহ এক্ষণে কাটুনিয়ার রাজবাটীতে নূতন মন্দিরে (২য় খণ্ড, ২য় সং, ২৬২-৭০) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সে মূর্ত্তির বয়স বেশী হইবে। ধাতু বা পাষাণের বালগোপাল মূর্ত্তি, শ্বেতকৃষ্ণ পাষাণে বা অন্যবিধ প্রস্তর খচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় অসংখ্য শিবলিঙ্গ, চাঁচড়ায় মহাবিদ্যা সমূহের সুন্দর দারুময়ী মূর্ত্তিমালা, স্থানে স্থানে জগন্নাথ বা চৈতন্যদেবের দারুনির্ম্মিত স্বরূপ বিগ্রহ যশোহর-খুল্‌নার সম্পত্তিমধ্যে গণ্য। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের পুরাতন বংশে প্রত্যেকেরই গৃহবিগ্রহ ছিলেন, উঁহারই সম্পর্কে তাঁহারা চিহ্নিত ও পরিচিত হইতেন। সেদিন আর নাই ; তাই কত শত অপূজিত শ্রীমূর্ত্তি বা শিবলিঙ্গের মন্দির চর্ম্মচটিকার আবাসভূমি হইতেছে !

বিভিন্ন জাতির আক্রমণে, বিধর্ম্মীর নির্য্যাতনে এবং শাসনযন্ত্রের অবিরাম বিবর্ত্তনে যে আর কত দেববিগ্রহ বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে, কত সৌধ চূর্ণীকৃত

তাহার এক পূর্ণ পরিণত রূপ বলা চলে। ইহার তারিখ, ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ। (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৮২ পৃ দ্রঃ) —শি মি]

১ [প্রত্নতাত্ত্বিক কাশীনাথ দীক্ষিত মহোদয় —শি মি]

হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিবার সূত্র নাই। গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এইরূপ জাতি বা ধর্ম্মগত অত্যাচার অবিচার চলিয়াছে। বৌদ্ধ হিন্দুর উপর, এবং হিন্দু বৌদ্ধের উপর অবিরত অত্যাচার করিয়াছে। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' জীব-জন্তুর বেলায় যত খাটিয়াছে, মানুষের বেলায় তত খাটে নাই। দয়ার অবতার অশোকের রাজত্বকালেও জীবহত্যাকারী মানবকে শাস্তির জন্য হত্যা করা হইয়াছে। অনেক সময়ে মানুষের দয়ার পরিচয় প্রাণীতে যেমন পাইয়াছে, জড়বিগ্রহে বা ধর্ম্মমন্দিরে তাহা পায় নাই। নতুবা সত্যনিষ্ঠ চীনদেশীয় পরিব্রাজক সমতটে যে ৩০টি সংঘারাম এবং একশত দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা কোথায় গেল? বোধখানাকে বৌদ্ধস্থান বলিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি না হইতে পারে; সেখানে এখনও কতকগুলি পাথর পড়িয়া আছে, উহা কোথা হইতে আসিল? যেখানে কোন ধর্ম্মকেন্দ্র, সেই স্থানেই মুসলমান পীরগণ ধর্ম্মপ্রচারে আসিতেন; চৈতন্য প্রভুও পতিতোদ্ধারের জন্য এমন অনেক নির্য্যাতিত স্থানে পদার্পণ করিতেন। তিনি বোধখানায় আসিয়াছিলেন, তথায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কানাই ঠাকুরের শ্রীপাঠ আছে। পুরাতন কাহিনী সম্বন্ধে অনুমান করিবার কি কিছু নাই? আধুনিক বারবাজারের সন্নিকটে সাঁকো বা সঙ্কট নামে স্থান ছিল; কবিকঙ্কণে আছে, তথাকার সমৃদ্ধ বণিকেরা বহু বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া এই সঙ্কট বা সাঁকনাটে আসিয়াছিলেন, উহাই মুসলমান ঐতিহাসিকের লেখায় সাত নকলে জগন্নাথ হইয়া গিয়াছে। বারবাজার যে এক সময়ে একটি জনবহুলা সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৫-৯ পৃ)। সেখানেও কতকগুলি প্রস্তর ও স্তম্ভ পড়িয়া রহিয়াছে, উহা কোথা হইতে আসিল? সম্প্রতি যশোহর সহরে চারখানি পাথর আবিষ্কার করিয়াছি; দুইখানি পুলিস সাহেবের বাড়ীর বাহিরে পড়িয়া আছে, একখানি কার্ব্বালা ট্যাঙ্কের পাহাড়ের কোণে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় সিন্দুর-চর্চ্চিত ও দুগ্ধধৌত হইয়া পূজিত হইতেছে, অন্যখানি বগ্‌চর গ্রামে অশ্বিনী বাবুর বাড়ীর বাহিরের প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে মৃত্তিকা নিম্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিখানিই রাজমহল অঞ্চলের কঠিন পাষাণ, প্রত্যেকখানি ১৫" ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ৯।১০" পুরু, দৈর্ঘ্যও একখানির ৬'-১১" ইঞ্চি, অপরগুলির প্রায় ৬' ফুট; পুলিস সাহেবের বাড়ীর

একখানি পাথরের মধ্যস্থলে চতুর্ভুর্জা মঙ্গলকলস-হস্তা লক্ষ্মীমূর্ত্তি, অন্যখানিতে মধ্যস্থলে একটি অস্পষ্ট পুরুষ বা বিদ্যাধর মূর্ত্তি এবং বগ্‌চরের পাথরখানির নিম্নভাগে একটি মকরবাহনা গঙ্গামূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। সব পাথরগুলিই আর্কিও-লজিক্যাল বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে দেখাইয়া দিয়াছি; তিনি অনুমান করেন, প্রোথিত পাথরখানিতে একটি যমুনামূর্ত্তি থাকিতে পারে। মোট কথা, এই চারিখানি পাথর পরীক্ষা করিলে, উহা কোন একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের সদর দরজার চারি পার্শ্বের চারিখানি ফ্রেম, সে অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।[১] সম্ভবতঃ লক্ষ্মীমূর্ত্তিযুক্ত পাথরখানি উপরিভাগে ও পুলিস সাহেবের বাড়ীর অন্য পাথরখানি নিম্নদেশে, বগ্‌চরের পাথরখানি দক্ষিণভাগে এবং প্রোথিত পাথরখানি হয়ত বামভাগে ছিল। সে বিষ্ণু-মন্দির কোথায় গেল? সম্ভবতঃ মূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়া চারিখানি পাথরই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মন্দিরের অন্য পাথর যে বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে নীত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? প্রোথিত পাথরখানির সন্নিকটে খাঁ জাহানের অনুচর বহ্‌রাম খাঁ পীরের ইষ্টক রচিত প্রকাণ্ড দরগা বর্ত্তমান। সেটিও কোন পুরাতন বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাংশ বলিয়া অনুমান করি। বাগেরহাটেও হিন্দু বৌদ্ধের প্রাচীন মন্দির ছিল। এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রস্তর রচিত না হইলেও তাহার রচনায় যথেষ্ট পাথর ছিল, তাহার প্রমাণ অপ্রতুল নহে। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ষাট গুম্বজ ও মস্‌জিদ্‌কুড়ের মস্‌জিদ্ প্রসঙ্গে করিয়াছি। এখনও একখানি অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ বাগেরহাটে জাহাজঘাটায় প্রোথিত আছে। ষাট গুম্বজের অনতিদূরে যেখানে খাঁ জাহানের আবাস গৃহ ছিল, সেখানে খুঁড়িতে গিয়া ১৪।১৫ খানি বড় বড় পাথর বাহির হইয়াছে।

১ [গ্রন্থকারের এই ঐতিহাসিক অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞাপিত হইয়া বর্ত্তমান খণ্ড ১৩২৯ সালে পৌষ মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মাসার্দ্ধকাল যাইতে না যাইতে মাঘ মাসেই যশোহর সহরের পশ্চিমত্তোর কোণে পুরাতন কসবায় পদ্মপুকুরের অনতিদূরে ইটখোলায় তিন হাত মাটির নিম্নে এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুর্জ বাসুদেব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৫৩-৬ পৃ)। পেরিপ্লাসে উল্লেখিত গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া সহর দেগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গাতে অবস্থিত ছিল বলিয়া গ্রন্থকারের যে আঁর একটি ঐতিহাসিক অনুমান বর্ত্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যের ফলে সপ্রমাণিত হইতে চলিয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৮০-২,৪৬৭-৯ পৃ দ্র.)—শি মি]

উহা দীর্ঘ ছড়ওয়ালা প্রাসাদের থামের খণ্ডাংশ এবং কতক বা অন্য প্রকারে ব্যবহৃত পাথর। ইহার অনেকগুলি ৮।১০ হাত মাটির নিম্নে প্রশস্ত ভিত্তিমূল খুঁড়িতে বাহির হইয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আরও কত এমন পাথর লুক্কায়িত আছে, কে জানে? যে পালিশ করা পল তোলা খণ্ডগুলি বাহির হইয়াছে, উহা জুড়িয়া দীর্ঘ থাম করিবার জন্য প্রত্যেকের কেন্দ্রস্থলে যে মোটা লৌহ পেরেক প্রোথিত ছিল, তাহা সেই অবস্থায় আছে। উহার একখানি নিটুট্ নিরেট পাষাণ খণ্ড যে এক সময়ে হিন্দুর আরাধ্য প্রকাণ্ড বাণলিঙ্গ শিবের গৌরীপট্ট বা নিম্নাংশ ছিল, তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় উহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। বাণলিঙ্গের বসিবার গর্ত্তটি আছে, স্নান জল সরিয়া পড়িবার নালী আছে। পাথরখানি ২৫″×২৫″ ইঞ্চি, উহার উচ্চতা ১৫।।০ ইঞ্চি। এই গৌরীপট্ট দ্বারা একটি থামের নিম্নাংশ গঠিত হইয়াছিল, জোড়ার মুখ খুলিয়া গিয়া প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছে। যে বিরাট মন্দিরে এই বাণলিঙ্গ ছিল, তাহা এক্ষণে কল্পনানেত্রে দেখিবার জিনিস।

ভরতভায়নার স্তূপের দীর্ঘ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। উহা যে গুপ্ত-যুগের সমসময়ের বৌদ্ধস্তূপ, ইষ্টকাদির নানা নিদর্শনে তাহাও এক্ষণে স্থপতি বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমিত হইতেছে। উহার নিকট গৌরীঘনায় যে পাথরের কুমীর বা মকর এবং বিরাট স্তম্ভের পাদপীঠ ও ভগ্ন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সরকারী বিভাগের ব্যয়ে ভরতভায়না খনিত হইলে অনেক নূতন তত্ত্ব বাহির হইতে পারে। সরকারী রিপোর্ট [১ম খণ্ডের] পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন কীর্ত্তির উপর এইরূপ দারুণ দুরাচার (Vandalism) যে শুধু পূর্ব্বকালেই অনুষ্ঠিত হইত; তাহা নহে; ইংরাজ কোম্পানির আমলেও শাসকেরা উহা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রশ্রয় দিতেন। একে গ্রীষ্মপ্রধান লবণাক্ত দেশ, তাহাতে আবার দুর্গম প্রদেশে অযত্নে থাকিলেই ইষ্টক রচিত গৃহগুলি বৃক্ষলতার লীলাভূমি হইয়া পড়ে। লবণাক্ত দেশে বৃক্ষলতাগুলি লবণের মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করে না, উহারা যাহাকে আশ্রয় করিয়া বড় হয়, সবলে শিকড় চালাইয়া তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে ধ্বংস করে; আবার সাধারণ নির্ব্বোধ পল্লীবাসীরা স্বার্থের ও নূতনের এত পক্ষপাতী যে, পুরাতনকে ধ্বংস করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা

বোধ করেন না।[১] সরকারী বিবরণী হইতে জানিতে পারি, মুর্শিদাবাদের নিজামত দপ্তরে 'কিমাৎ খিশ্‌তকার' নামক একটি পৃথক্ বিভাগ ছিল, উহাতে গৌড়ের হর্ম্ম্যগুলির ধ্বংসসাধন করিতে দিয়া প্রতি বৎসর পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের নিকট হইতে ৮০০০৲ টাকা শুল্ক আদায় হইত।[২] ইংরাজ আমলে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজমহল ও রঙ্গপুর প্রভৃতি আধুনিক সহরগুলি প্রায় সম্পূর্ণই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে।[৩] কত মসজিদ, মন্দির বা পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া যে যশোহর-খুল্‌নার কত স্থানে রাস্তা ও নীলকুঠি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। মীর্জানগরের ইমারত ভাঙ্গিয়া রাস্তা নির্ম্মাণের কথা যথাস্থানে (৪৬০ পৃ) বলিয়াছি।

কোম্পানীর হস্ত হইতে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এ দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন হইতে হাওয়া ফিরিয়াছে। মহারাণীর আমলের প্রথম রাজপ্রতিনিধি সদাশয় লর্ড ক্যানিং ভারতীয় আর্কিওলজিকাল বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রথম রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড কার্জ্জন 'প্রাচীন-কীর্ত্তি-সংরক্ষণ' বিষয়ক নূতন আইন করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত

---

১ 'Many of them (Monuments) are in out-of-the-way places and are liable to the combined ravages of a tropical climate, an exhuberant flora, and very often a local and ignorant population who see only in an ancient building the means of inexpensively raising a modern one for their own convenience.'—Speech of Lord Curzon delivered to the Asiatic Society of Bengal.

২ Grant's Essay (Fifth Report, p. 285); J. A. S B., 1874, p. 303 *note.*

৩ 'Vandalism as well as Time has contributed to the general destruction of the ancient capital. There is not a village, scarce a house in the district of Maldah or in the surrounding country that does not bear evidence of being partially constructed from its ruins. The cities of Murshidabad, Maldah, Rajmahal and Rangpur have almost entirely been built with materials from Gour,'—Ravenshaw, *Gour*, p. 2 ; 'They (Mahomedan Governors) had to depend almost entirely on Hindu artisans for construction and for materials they utilised the fragments of Hindu temples they had demolished.'—J. A. S. B. 1910, pp. 24-5—*Pre-Moghal Mosques of Bengal* by M. M. Chakraverti ; 'Many indeed of the old Mahomedan mosques were themselves built up with materials plundered from still more ancient Hindu Temples'—Arch. Survey, 1902-3, p. 21—*Annual Report*, by Sir John Marshall.

এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। দেশীয় পুরাতন কীর্ত্তিরক্ষাকল্পে রাজার যে প্রজার নিকট একটা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, তাহা উন্মুক্ত প্রাণে স্বীকার করিয়া, সংরক্ষণ কার্য্যের জন্য সর্ব্বজাতীয় ব্যবস্থা ও ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া দিয়া, তিনি অনুসন্ধানের নূতন পন্থা এবং ইতিহাস চর্চ্চার জন্য নবযুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। যশোহর-খুল্‌নার মধ্যে ষাটগুম্বজ, খাঁ জাহানের সমাধি, মস্‌জিদকুড়ের মস্‌জিদ, ঈশ্বরীপুরের হামাম্‌খানা ও টেঙ্গা মস্‌জিদ্‌ এবং মহম্মদপুরের রামচন্দ্রের বাটী, এই কীর্ত্তিরক্ষার গণ্ডির মধ্যে পড়িয়াছে। আশা করি, এরূপ আরও অনেক উপযুক্ত পুরাকীর্ত্তি এই ভাবে সংরক্ষিত হইবে। আমরা এক্ষণে যশোহর-খুল্‌নার পুরাতন ইষ্টক-মন্দির ও মস্‌জিদ্‌গুলির রচনাপ্রণালী ও উহার বিশেষত্ব এবং শ্রেণীবিভাগের বিচার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যেগুলি সংরক্ষণজন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পাইবার যোগ্য, তাহারও প্রার্থনা জানাইব।

ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দেশ। নৈসর্গিক অবস্থা ও উপাদানের প্রভেদে প্রদেশ-বিশেষে স্থাপত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হইয়াছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পাহাড়-পর্ব্বত নাই, তাই এ অঞ্চলের স্থায়ী গৃহ ইষ্টক-রচিত। পাহাড়িয়া দেশে যে ইষ্টক নাই, তাহা নহে; পশ্চিমাঞ্চলেও কোন কোন স্থানে পর্ব্বত-পৃষ্ঠে ইষ্টক-মন্দির বর্ত্তমান আছে। তবে সাধারণতঃ লোকে অনায়াসলভ্য উপাদানেরই পক্ষপাতী হয়। বঙ্গে ইষ্টক সহজলভ্য বা সুলভ হইলেও উপাদান হিসাবে উহা ভঙ্গুর বই অন্য কিছু বলা যায় না। বিশেষতঃ দক্ষিণ বঙ্গের মত সিক্তবাত ও লবণাক্ত দেশে ইষ্টকের আয়ু দীর্ঘ হয় না। তবুও ইষ্টকের একটা গুণ এই যে, ইহা লইয়া কারু বা চারুশিল্পের খেলা চলে, শিল্পী ইষ্টক সাহায্যে স্বাধীন ভাবে বহুবিধ উচ্চনিম্ন ছোটবড় মনোমত গৃহ-রচনা করিতে পারেন। কিন্তু যে গৃহই তিনি নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে দেশের প্রকৃতি বা চলনের মত একটা বিশিষ্টতা না থাকিয়া পারে না। ফার্গুসন্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইষ্টকের উপর নির্ভর করিতে হইত বলিয়া বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র খিলানের অধিক প্রয়োজন ও প্রচলন এবং এই বিষয়ে বঙ্গীয় রীতির একটা বিশেষত্ব আছে। শুধু তাহাই নহে, বংশ-নির্ম্মিত গৃহের ছাদের মত বঙ্গীয়েরা ইষ্টক-গৃহের ছাদও সমতল না করিয়া সময় সময় বর্ত্তুলাকার করিতে ভালবাসে।[১] কেন এমন হয়, তাহা দেখিতেছি।

১ Fergusson. *History of Architecture*, Vol. III, p. 545.

বাঙ্গালা দেশে বাঁশ খড় সুলভ ও অনায়াসলভ্য। এজন্য ধনিদরিদ্র সকলেই উহাদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহের ছাদ চালদ্বারা গঠিত বলিয়া ঘরের নাম চালাঘর। চালের সংখ্যানুসারে উহা দ্বিবিধ—দোচালা এবং চৌচালা বা চৌরি-ঘর। পূর্ব্ববঙ্গের মত দোচালা ঘর তুলিবার রীতি অন্যত্র নাই, এজন্য দোচালা ঘরের অন্যনাম বাঙ্গালা ঘর, উহা বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। ইষ্টক নির্ম্মাণের সময় এদেশীয় লোকে সর্ব্বপ্রথমে দুইপ্রকার পাকাঘর করিত; তন্মধ্যে চৌচালা ইষ্টক গৃহকে মন্দির বা মণ্ডপ বলে এবং উহা চূড়াকারে উচ্চ হইলে দেউল বা মঠ নাম দেওয়া হয়। দোচালা ইষ্টক-গৃহকে বাঙ্গালা-মন্দির বলে; উহার বারান্দা দেওয়া যায় না বলিয়া প্রায়ই দুইখানি জুড়িয়া দেওয়া হইত; পশ্চাতের খানিতে দেব-বিগ্রহ থাকিতেন এবং সম্মুখের খানি বারান্দারূপে ব্যবহৃত হইত; ঐরূপ মন্দিরের সাধারণ নাম জোড়-বাঙ্গালা। বাঙ্গালা-মন্দিরের নির্ম্মাণ পদ্ধতি যে কত পুরাতন, তাহা স্থির করা যায় না। কারণ বঙ্গদেশে যতগুলি ঐরূপ মন্দির দেখিতে পাই, তাহার কোনটিই ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। মুসলমানী কীর্ত্তির মধ্যে পাণ্ডুয়ার একলক্ষী মস্‌জিদে এবং গৌড়দুর্গের ফতে খাঁর সমাধিগৃহে এই প্রণালীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়।[১]

বঙ্গীয় সাধারণ রীতি অনুসারে যশোহর-খুল্‌নার মন্দিরগুলি অধিকাংশই চতুষ্কোণ এবং বারান্দাযুক্ত; মন্দিরের গর্ভাংশ প্রায়ই সমচতুষ্কোণ হয়। বাঙ্গালা-গুলির এক একখানি দীর্ঘায়ত বটে, কিন্তু জোড়া একত্র ধরিলে বাহিরের মাপ প্রায়ই দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান দাঁড়ায়। চতুষ্কোণ মন্দিরগুলি একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল হয়। চূড়াকে রত্ন বলে; উহার সংখ্যানুসারে একতালা মন্দির একরত্ন, দ্বিতল মন্দির পঞ্চরত্ন এবং ত্রিতল মন্দির নবরত্ন নাম ধারণ করে। রত্নের উপর ১টি, ৩টি বা ৫টি ত্রিশূল দেওয়া থাকিত, উহা বজ্রপাতভয় নিবারণ করিত। প্রথমতঃ রাজাদেশ না পাইলে এইরূপ ত্রিশূল বা 'খুন্তী' বসান যাইত না, শেষে সে রীতি ছিল না, সকল মন্দিরেই একটি বা তিনটি ত্রিশূল শোভা পাইত। দোতালা মন্দিরের গর্ভাংশ ক্ষুদ্রতর হয়, উহার একতালার চারি কোণে ৪টি এবং দ্বিতলের শীর্ষে ১টি, মোট ৫টি চূড়া থাকে। ত্রিতল মন্দিরের নিম্নতলের কোণশীর্ষে ৪টি, দ্বিতলের চারিকোণে ৪টি এবং ত্রিতলের মাথায় একটি, মোট ৯টি রত্ন থাকে।

১ J. A. S. B., May, 1909—Article by M. M. Chakravarti.

অধিকাংশ স্থলেই দোতালা নামমাত্র, উহাতে বাসের ঘর বা উঠিবার সিঁড়ি থাকে না। নবরত্ন মন্দিরে প্রায়ই দ্বিতলে বিগ্রহের বাসগৃহ ও সিঁড়ি থাকে, ত্রিতল অংশটি নামমাত্র হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যশোহর-খুল্‌নার অধিকাংশ মন্দিরই চতুষ্কোণ, দুই একটি মাত্র ত্রিকোণ বা অষ্টকোণ মন্দির আছে।

পঞ্চ বা নবরত্ন মন্দিরগুলি বারান্দাযুক্ত। পঞ্চরত্নগুলির একদিকে বা কদাচিৎ তিনদিকে সংলগ্ন বারান্দা থাকে, নবরত্নগুলির চতুর্দ্দিকে বারান্দা থাকাই চাই। সম্মুখের বারান্দায় চারিটি স্তম্ভের উপর তিনটি খিলান থাকে; মধ্যবর্ত্তী দুইটি থাম সম্পূর্ণ ও পার্শ্বের দুইটি অর্দ্ধেক স্তম্ভাকার এবং অবশিষ্টাংশ বর্দ্ধিত হইয়া কোণ পর্য্যন্ত দেওয়ালে পরিণত। খিলান তিনটি গৌড়ের কদম্ রসুল্ মসজিদের মত সূচল (pointed) অথবা উহা কার্য্যতঃ গোলাকার হইলেও বহির্ভাগে কৃত্রিমভাবে সূচল করিয়া দেওয়া হইত। সূচল খিলান সাধারণতঃ 'মুসলমানী খিলান' বলিয়া কথিত হইলেও, উহা যে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। মহাপণ্ডিত হ্যাভেল প্রভৃতি সূক্ষ্মদর্শী শিল্প-সমালোচকগণ বহু গবেষণার ফলে দেখাইয়াছেন, মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এবম্বিধ খিলান মিশর, সিরীয়া, এশিয়া মাইনর ও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল; ভারতের হিন্দু বৌদ্ধযুগে শিল্পিগণ উহা ব্যবহার করিতেন। সুলতান সেকন্দর শাহের সময়ে (১৩৫৮-৮৯) যে উহা প্রথম গৌড়ের বিখ্যাত আদিনা মস্‌জিদে প্রযুক্ত হয়, তাহা ঠিক নহে। গৌড় বহু যুগ ধরিয়া হিন্দুরই রাজধানী ছিল; ঐ মস্‌জিদ্‌ও হিন্দুশিল্পীর কারুকর্ম্ম মাত্র; উহা বিদেশ হইতে আগত মুসলমান শিল্পী দ্বারা গঠিত বলিয়া প্রমাণ নাই। মুসলমান আমলের পূর্ব্বে বঙ্গীয় শিল্পিগণ ব্রহ্মদেশে গিয়া এই প্রণালীতে বহু মন্দির ও চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছিলেন।[১] এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নাই। এক্ষণে আমরা যশোহর-খুল্‌নায় নানা স্থানে যে সকল হিন্দু মন্দির বা

১ 'The Bengali builders being brick-layers rather than stone-masons had learnt to use the radiating arch whenever it was useful for constructive purposes long before the Mahomedans came there'—Havell, *Indian Architecture*, pp. 52-6. *See also*—Fergusson, *History of Architecture*, Vol. II, p. 353; Mitra, Rajendralal, *Budhgaya*, ch. III, pp. 101-3; Ganguly, Monomohan, *Orissa and Her Remains*, 1912, p. 108-9; Dawn Magazine, April-May, 1913, p. 106.

দেবস্থলী এবং মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ বা সমাধিগৃহ আছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তালিকা দিব। প্রসঙ্গক্রমে উহার অনেকগুলির উল্লেখ বা বর্ণনা এই পুস্তকের নানাস্থানে করিয়াছি, তাহার সন্ধান দিব[১] এবং কোন প্রসঙ্গে যেগুলির আলোচনা করা হয় নাই, তাহার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দিয়া শিল্প-কাহিনীর উপসংহার করিব।

মন্দির

ক. ত্রি কো ণ ম ন্দি র॥ ঈশ্বরীপুরের চণ্ডভৈরবের মন্দির ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত (১৪১ পৃ)।

খ. চ তু ষ্কো ণ ম ন্দি র॥ ইহার কতকগুলি এক বা ততোধিক চূড়াযুক্ত এবং কতকগুলি সমতল ছাদ বিশিষ্ট। চূড়াওয়ালা মন্দিরগুলি প্রায়ই চৌচালা হিন্দু গুম্বজের উপর চূড়াকারে পরিণত। চৌচালা গুম্বজ পাঠানেরাও নকল করিয়াছিলেন; বাগেরহাটের 'ষাট গুম্বজে'র (৭৭ গুম্বজের) মধ্যবর্ত্তী ৭টি গুম্বজ চৌচালা। চূড়ার সংখ্যানুসারে চতুষ্কোণ মন্দিরগুলিকে এইভাবে বিভাগ করা যায়:

১ একরত্ন মন্দির—চাঁচড়ার শিবমন্দির (৪৯৬ পৃ), সত্রাজিৎপুরের মন্দির (৬৪১ পৃ), অভয়ানগরের বড় মন্দির (৫০৯ পৃ), শিবসা দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী কালীমন্দির (১ম, ৮১-২ পৃ), নলডাঙ্গার গুঞ্জানাথ শিবমন্দির (৪৮০ পৃ), এবং সাঁইহাটীর সুন্দর প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন সাধারণ গৃহস্থবাটীতে বা দেবস্থলীতে অধিকাংশ মন্দিরই এই জাতীয়। তন্মধ্যে মুড়লী, খুলনা-শিববাড়ী, বাঘুটিয়া (৮২৭ পৃ), পীলজঙ্গ (৭৩৮ পৃ), লখপুর, বাগেরহাট (মুনিগঞ্জ), খড়রিয়া (শিববাটী), নান্দুয়ালী (৪৭৯ পৃ), রায়গ্রাম (৬৩১ পৃ), ধুলগ্রাম (৫১০ পৃ), বনগ্রাম (খুলনা), অভয়ানগর ও বুধহাটার মন্দির স্তবক, শ্রীধরপুর, নড়াইল প্রভৃতি স্থানের বহু মন্দিরের নাম করা যায়।

---

১ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যার পূর্ব্বে '১ম' লেখা থাকিবে; শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকিলে দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ত্তমান সংস্করণ বুঝিতে হইবে।

২ পঞ্চরত্ন মন্দির—বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত গোপালপুরের ভগ্ন মন্দির (২৬৩ পৃ), নলতার কৃষ্ণমন্দির (৪২৬ পৃ), নলডাঙ্গার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির (৪৭৫ পৃ), কানাইনগরের হরেকৃষ্ণ মন্দির (৫৭৯ পৃ), বনগ্রামের মন্দির (৬৫৩ পৃ), এবং সোনাবাড়িয়ার দুইটি শিবমন্দিরর প্রধান। প্রায় সবগুলির বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি, কেবল সোনাবাড়িয়ার কথা নিম্নে বলিতেছি।

৩ নবরত্ন মন্দির—দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র ৩টি মন্দিরের কথা বলা যায়; বেদকাশীর মন্দির (২৭১ পৃ) কিরূপ ছিল, জানা যায় নাই। ডামরেলীর সমাজমন্দির (৯৮ পৃ), ইছাপুরের নবরত্ন (১৪৩ পৃ), সোনাবাড়িয়ার শ্যামসুন্দর মন্দির। সোনাবাড়িয়ার এই নবরত্ন মন্দির বড় নয়নাভিরাম। খুল্না্র অন্তর্গত কলারোয়া হইতে ৫।৬ মাইল দূরে সোনাবাড়িয়া অবস্থিত; সেখানে পূর্ব্বে রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের কারখানা ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৬৯৯ পৃ)। চূড়াযুক্ত মন্দিরের মধ্যে বোধ হয় সোনাবাড়িয়ার নবরত্নই সর্ব্বপ্রধান, তবে ইহার বয়স অধিক নহে। উহার গায়ে অঙ্কিত যে অশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ ইষ্টকলিপির এখনও পাঠোদ্ধার করা যায়, তাহাতে পাই—'গ্রহবসু রসেন্দু শকাব্দে প্রণম্য দেবতপরং শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর * ইদং নবরত্নমন্দিরং পরমযত্নেন * * রামেশ্বরাত্মজ দীন শ্রীহরিরাম দাসেন কৃতং ১৬৮৯ সন ১১৭৪ জ্যৈষ্ঠ।' অর্থাৎ এই মন্দির ১৬৮৯ শকে বা ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে হরিরাম দাস কর্ত্তৃক শ্যামসুন্দর বিগ্রহের জন্য নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের পাদদেশের বাহিরের মাপ ৩৩´×৩৩´, উচ্চতা তিন তালায় ১৩´+১৫´+১৩´ মোট ৪১´ ফুট। এই মন্দিরের পার্শ্বে যে অশুদ্ধ লিপিযুক্ত দোতালা ভোগ মন্দির আছে, তাহা ১৭১০ শকে বা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রাধাচরণ দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। উহারই দ্বিতলে বহুসংখ্যক বিগ্রহ রক্ষিত হইতেছেন। মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে ৪টি শিবলিঙ্গ চারিটি ছোট ঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে ২টি লিঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে। সম্মুখে দুইপার্শ্বে দুইটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির আছে, একটিকে বুড়া শিবের মন্দির ও অন্যটিকে সদাশিবের মন্দির বলে। উভয়ই অত্যন্ত কারুকার্য্য মণ্ডিত। শেষোক্তটির গায়ে যে লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় 'রামবসুরসেন্দুমিতে' অর্থাৎ

১৬৮৩ শকাব্দে বা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হরিরাম দাস এই মন্দির রচনা করেন। উভয় শিবমন্দিরের মধ্যস্থলে একটি ছোট জোড়-বাঙ্গালা আছে। হরিরামের বংশীয়েরা কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী স্থলে বসতি করিতেছেন। বিগ্রহগুলির নিত্যসেবার সুব্যবস্থা নাই।

৪ সমতল ছাদবিশিষ্ট—সমতল ছাদবিশিষ্ট চতুষ্কোণ মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বরীপুরের যশোরেশ্বরী মন্দির (১৬২ পৃ), সেখহাটীর ভুবনেশ্বরীর মন্দির (১ম, ২৪৯ পৃ), চাঁচড়ার দশমহাবিদ্যার মন্দির (৫০৬-৭ পৃ), মহম্মদপুরের দশভুজা মন্দির ও রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটী (৫৭৮ ও ৫৫৬ পৃ), এবং লক্ষ্মীপাশার প্রসিদ্ধ কালীবাটীর নাম করিতে পারি।

গ. বা ঙ্গা লা ম ন্দি র॥ দোচালা ক্রমোচ্চ ছাদযুক্ত বাঙ্গালা-মন্দির কতকগুলি অযুগ্ম থাকে এবং কতকগুলিকে যুগ্ম বা জোড়-বাঙ্গালা বলে।

১ এক-বাঙ্গালা—এক বাঙ্গালা মন্দিরের দৃষ্টান্ত পরমানন্দকাটী, সেনহাটী (রাজা রাজবল্লভ সেন প্রদত্ত), এবং লোহাগড়ায় আছে। শেষোক্ত স্থানে জঙ্গল মধ্যে যে অভগ্ন পূর্ব্বদ্বারী বাঙ্গালাটি আছে, উহার বাহিরের মাপ ২০´×১০´-৬´´, ভিত্তি ২´-৮´´ ইঞ্চি। উহার গায়ে যে ইষ্টকলিপি আছে, তাহা এই :

'খসমুদ্ররসক্ষৌণী শকাব্দে শ্রীহরেগৃ´হং
শ্রীমদভিরাম দত্তেন কৃতমিত্যৈকনির্ম্মিতং ॥'

অর্থাৎ ১৬৭০ শকে বা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই কৃষ্ণমন্দির অভিরাম দত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

২ জোড়-বাঙ্গালা—সাধারণতঃ শিবের জন্য চৌচালা মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তির জন্য জোড়-বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও বহুসংখ্যক জোড়-বাঙ্গালা দৃষ্ট হয়। চাঁচড়ার প্রাচীন শ্যামরায়ের মন্দির (৪৯২ পৃ), মহম্মদপুরের কৃষ্ণজী মন্দির (৫৭৮ পৃ), রায়গ্রামের জোড়-বাঙ্গালা (৬৩১ পৃ), মূলঘরের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির (৬৬৪-৫ পৃ), শালনগরের জোড়-বাঙ্গালা, ধূলগ্রামের কৃষ্ণমন্দির (৫১০ পৃ), লোহাগড়ার ও মহেশ্বরপাশার জোড়-বাঙ্গালার নাম করা যায়। ইহার প্রধান প্রধান-গুলির বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। কয়েকটির কথা সংক্ষেপে এখানে

বলিতেছি। লোহাগড়ার নিকটবর্ত্তী শালনগরের চাক্‌লানবীশ উপাধি-যুক্ত ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারিগণ বিখ্যাত। উঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র নবাব সরকারে চাকরী করিয়া ধনশালী হন, এবং নিজ বাসভূমিতে বহু কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া যান। তন্মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির জন্য জোড়-বাঙ্গালা ও দোলমঞ্চ এখনও বর্ত্তমান। লোহাগড়ায় রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের বাটীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ৺চন্দ্রশেখর মজুমদার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পুরাতন জোড়-বাঙ্গালা আছে। চন্দ্রশেখর হইতে ৭।৮ পুরুষ নামিয়াছে, অর্থাৎ এই মন্দিরের বয়স ২০০ বর্ষের কম নহে। সম্ভবতঃ রায়গ্রাম ও লোহাগড়ার জোড়-বাঙ্গালা এক সময়ে নির্ম্মিত। লোহাগড়ার মন্দিরটির পূর্ব্বদিকে সদর, উহা সম্পূর্ণ কারুকার্য্যখচিত। তিনটি খিলানের উপর তিনটি British Emblem অঙ্কিত আছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইংরাজাধিকারের বহু পূর্ব্বে এই জাতীয় রাজচিহ্ন এ দেশীয় শিল্পীদিগের পরিজ্ঞাত ছিল। প্রত্যেক বাঙ্গালার ভিতরের মাপ ১২´×৫´, বাহিরের মাপ ১৭´-৯´´×৮´। ইহাতে কোন লিপি নাই। দৌলতপুরের নিকটবর্ত্তী মহেশ্বরপাশার জোড়-বাঙ্গালাটি বড়ই সুন্দর। প্রায় দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে মল্লিক (শাণ্ডিল্য বন্দ্য) বংশীয় গোপীনাথ গোস্বামী নামক একজন সাধক-শ্রেষ্ঠ ভক্ত কর্ত্তৃক ৺গোবিন্দরায় বিগ্রহের জন্য এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।[১] ইহাতে যে ইষ্টকলিপি ছিল, তাহার অধিকাংশই খসিয়া পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা আছে তাহা হইতে শেষ চরণের পাঠোদ্ধার করা যায়:

'* প্রশস্তি। শ্রীগোপীনাথনামা ক্ষিতিসুরসুতকে বৃষ্ণিরাশৌ দিনেশে॥ শ্রীহরিঃ'

ঘ. মঠ বা দেউল॥ চারিটি পুরাতন মঠের নাম করিতে পারি; জটার দেউল (২০৬ পৃ), ইত্‌নার মঠ (৬৪৫ পৃ), রায়নগরের মঠ-মন্দির এবং কোদলার মঠ। ইহার মধ্যে জটার দেউল চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত

১ চাঁচড়ারাজ এই বিগ্রহের সেবার্থ ১০০ বিঘা নিষ্কর দান করেন। গোপীনাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্রগণ এখনও জীবিত। তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অর্থে মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় এই মন্দির দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

হইলেও প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দিয়াছি ; ইত্‌নার ঘোষ-দুহিতার মঠের বিবরণও পূর্ব্বে দিয়াছি। উহার সঙ্গে রায়নগরের মঠের তুলনাও করিয়াছিলাম। এই রায়নগর মাগুরা (মহকুমা) হইতে ৭।৮ মাইল পূর্ব্বদিকে গোরাই (গড়ই) নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অতি কষ্টে পদব্রজে সেখানে পৌছিতে হয়। মঠটির উত্তর ও পশ্চিমদিকের দেওয়াল আছে, অপর দুইটি দেওয়াল নাই। বাহিরে মাপ ২২´-৩´´ × ২২´-৩´´, ভিতরের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৩´-৫´´ ইঞ্চি ; ভিত্তি ৪´-৫´´ ; ভিতরের উচ্চতা ২৫´ এবং চূড়া সমেত উচ্চতা ৪০´ ফুটের কম নহে। সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে সদর ছিল। উত্তর দিকে বদ্ধ দরজার খিলানের উপর ৮ পংক্তিতে দুইটি শ্লোকে সুন্দর ইষ্টকলিপির কতকাংশ আছে, অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পাঠোদ্ধারের ব্যাঘাত করিয়াছে। যাহা আছে, তন্মধ্যে প্রথম শ্লোক হইতে জানা যায়, এই মন্দির শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জন্য নির্ম্মিত এবং দ্বিতীয় শ্লোকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে উহার সময় নির্দ্দেশ করা যায় :

'শাকে ব্যোমামৃতকর-শর-ক্ষৌণি সংপাদিতেঽস্মিন্
প্রাসাদোঽয়ং ব্যরচি মহতা বিশ্বনাথাত্মজেন।'

ব্যোম=০, অমৃতকর=চন্দ্র=১, শর=৫, ক্ষৌণি – ১ ; অর্থাৎ ১৫১০ শকে (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে) বা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে বিশ্বনাথের পুত্র কোন ভক্ত কর্ত্তৃক এই প্রাসাদ বা মঠ বিনির্ম্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্লোকে আত্মগোপন করিয়া দুইবার পিতৃনামে নিজপরিচয় দিয়াছেন। এই বিশ্বনাথাত্মজ কে, তাহা নির্ণয় করা যায় নাই। বোধ হয় তিনি কোন রাজনৈতিক পুরুষ নহেন। প্রবাদ এই, এই মন্দির মথুরাপুরের দেউল-নির্ম্মাতা সংগ্রাম সাহার কীর্ত্তি। কিন্তু তিনি ১৬২১ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করি না। সে আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি (৫২৯ পৃ)। সম্ভবতঃ যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 'রায়'-দিগের বসতির জন্য এই স্থানের নাম রায়নগর (রাইনগর নহে) হয়, বিশ্বনাথ ও তাঁহার কৃতি পুত্র সেই বংশীয়। মন্দিরটি অত্যন্ত কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর ইষ্টকে নির্ম্মিত। উত্তর দিকে লিপির অংশ বাদে ৯১টি চত্বরে পদ্ম ও লতাপাতা অঙ্কিত আছে। পশ্চিম প্রাচীরে দরজার উপরিভাগে ১২ খানি ছবি আছে, সবগুলিই শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও যুগলরূপ প্রভৃতি। উহা দেখিলে এটি যে কৃষ্ণ-মন্দির, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না।

খুলনা হইতে বাগেরহাট যাইবার রেল-পথে যাত্রাপুর নামিলে তথা হইতে দুই

মাইল দূরে কোদ্‌লা গ্রাম ; উহারই একাংশকে অযোধ্যা বলে। সেই স্থানে মরা ভৈরবের অনতিদূরে একটি উত্তুঙ্গ সুন্দর মঠ আছে, উহাকে সাধারণ লোকে 'অযোধ্যার মঠ' বলে। সম্ভবতঃ দক্ষিণভাগ বিধৌত করিয়া এক সময়ে বেগবান ভৈরব-নদ প্রবাহিত হইত, এখন চর পড়ায় নদীখাত একটু সরিয়া গিয়াছে। ইহা কোন দেব-মন্দির নহে ; সম্ভবতঃ কোন মৃত মহাত্মার সমাধি-স্তম্ভ স্বরূপ এই মঠ রচিত হয়। উত্তরদিকে কোন দরজা নাই, অন্য তিন দিকে আছে। দক্ষিণে অর্থাৎ নদীর দিকে, কার্ণিসের নিম্নে দুই পংক্তিতে একটি ইষ্টকলিপি ছিল। প্রথম পংক্তির অক্ষরগুলি প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেটুকু পাইয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই :

'* * * শর্ম্মণা।
উদ্দিশ্য তারকং (ব্রহ্ম) (প্রাসা) দোঽয়ং বিনির্ম্মিতঃ॥'

তারকব্রহ্ম নাম কাহারও মরণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় ; মঠের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে। মাঠের নিম্নতল সমচতুষ্কোণ, ভিতরে প্রত্যেক দিকে ১০´-৫´´, বাহিরে ২৭´-৮´´, ভিত্তি ৮´-৭½´´ ইঞ্চি। বাহিরের উচ্চতা মেজের উপর ৫০´ ফুট হইবে। রক্তবর্ণ ইষ্টক রচিত উপরি-ভাগ এখনও খুব ভাল অবস্থায় আছে ; নিম্নাংশে প্রবেশ-দ্বারের উপর খিলানের ইট কতক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। খিলান দেখিলে মোগল আমলের হর্ম্ম্য বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক দরজা শীর্ষে হিন্দু শিল্পানুযায়ী চৌচালা গুম্বজ আছে। মন্দির গাত্রে সর্ব্বত্র শিল্পকলার বিকাশ। এই মঠ গবর্ণমেণ্টের স্থাপত্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পূর্ব্বপ্রাচীরে একস্থানে দুইজন গজারোহীর পশ্চাতে দুইজন ধনুকধারীর ছবি এবং দক্ষিণপ্রাচীরেব কার্ণিশের অগ্রভাগ মকরাঙ্কিত আছে। প্রবাদ এই, মঠটি প্রতাপাদিত্যের ব্যয়ে তাঁহার দ্বারপণ্ডিত অবিলম্ব সরস্বতীর স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ নির্ম্মিত। উহা সমর্থন করিবার যোগ্য কোন প্রমাণ পাই না। এ প্রদেশে অবিলম্ব সরস্বতীর গতিবিধি ও স্মৃতিচিহ্নের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি (২৫১ পৃ)। তবে রায়নগর ও অযোধ্যার মঠ যে প্রতাপের সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহ হয় নাই।

৬. অ ষ্ট কো ণ - ম ন্দি র॥ অষ্টকোণ মন্দিরের দৃষ্টান্ত মহম্মদপুরের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। উহা দোতালা এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট।

চ. দোল ও রাসমঞ্চ এবং তোরণ॥ এক সময়ে যশোহর-খুল্‌নার সর্ব্বত্র দোল ও রাসযাত্রাদির উৎসব খুবই হইত; সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তজ্জন্য ইষ্টকরচিত দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেন। যশোহরে মহম্মদপুর ও শালনগরে, খুল্‌নায় কাটিপাড়া ও নলতায় পুরাতন দোলমঞ্চ আছে। গুড়িখালির রাস-মঞ্চের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৮৪২ পৃ)। ধূলগ্রামে (৫০৯ পৃ), সেনহাটিতে ও চাঁচড়ার দশমহাবিদ্যার মন্দিরের সম্মুখে উৎকৃষ্ট তোরণদ্বার আছে।

মস্‌জিদ, ইমামবারা ও দরগা

মুড়লীর ইমামবারা মহম্মদ মহসীনের মোতউল্লীন্‌দিগের সময়ে নির্ম্মিত হয়। ইহা এবং বহু মুসলমান পল্লীর আধুনিক জুম্মাঘর বা উপাসনা গৃহগুলি সমতল ছাদবিশিষ্ট। পীরের আস্তানার নাম দরগা। বিস্তৃত ময়দানে সর্ব্বসাধারণের নমাজস্থলে ইদ্‌গা রচিত হইত। অসংখ্য ইদ্‌গার তালিকা দেওয়া যায় না। মস্‌জিদগুলি গুম্বজওয়ালা। গুম্বজের সংখ্যানুসারে উহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়:

ক. একগুম্বজ॥ দরগা ও অধিকাংশ মস্‌জিদই একগুম্বজযুক্ত। প্রাচীন একগুম্বজ মস্‌জিদের মধ্যে রণবিজয়পুরে খাঁজাহান আলির সমাধি গৃহ (১ম, ৩৬৪ পৃ) ও পার্শ্ববর্ত্তী বাবুর্চিখানা (১ম, ৩৬৮ পৃ), বারবাজার (১ম, ৩১৯ পৃ), চাকশিরি (২০৯ পৃ) ও মৌতলার (২২১ পৃ) মস্‌জিদের নাম করা যায়। সাতক্ষীরার নিকটবর্ত্তী লাবসার মাইচাম্পার দরগা (১ম, ৪৩৬ পৃ), যশোহরের গরিবশাহ মস্‌জিদ, মীর্জানগরের নিকট গোপালপুর ও মেহেরপুরের দরগা এবং তালার নিকটবর্ত্তী মদনমুন্সীর মস্‌জিদ উল্লেখযোগ্য।

খ. তিনগুম্বজ॥ মীর্জানগরের মস্‌জিদ (৪৬০ পৃ (এই জাতীয়। অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা নিজবাটীতে ত্রিগুম্বজ মস্‌জিদই করিতেন।

গ. চারিগুম্বজ॥ পরবাজপুরের প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ (৮৬ পৃ) ত্রিগুম্বজ শ্রেণীভুক্ত, উহার সম্মুখে একটির স্থলে দুইটি ছোট গুম্বজ আছে মাত্র।

ঘ. পঞ্চগুম্বজ॥ ধুমঘাটের প্রসিদ্ধ টেঙ্গা মস্‌জিদ ইহার প্রধান

দৃষ্টান্ত (১৬৩ পৃ)। বাগেরহাটের হুসেনশাহ মস্‌জিদ এই শ্রেণীভুক্ত, উহার গুম্বজগুলির দুইটি সারির প্রত্যেকটিতে পাঁচটি গুম্বজ।

ঙ. ষড় গুম্বজ॥ তেতুলিয়ায় কাজিদিগের বাটীর মস্‌জিদ প্রধান দৃষ্টান্ত। উহার বাহিরের মাপ ৪৬´×৩৩´ ফুট।

চ. নব গুম্বজ॥ বাগেরহাটের দিদার খাঁ মস্‌জিদ ও মস্‌জিদকুড়ের প্রসিদ্ধ উপাসনা গৃহ (১ম, ৩২৪ পৃ) এই শ্রেণীর প্রধান দৃষ্টান্ত।

ছ. ষাট্‌ গুম্বজ (সাত গুম্বজ)॥ বাগেরহাটের ষাট্‌গুম্বজে ৬০টি স্তম্ভ আছে, কিন্তু গুম্বজের সংখ্যা ৭×১১ অর্থাৎ ৭৭টি। সাতটি সারির প্রত্যেকটিতে ১১টি করিয়া গুম্বজ ছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। উহাতেই পাঠান মস্‌জিদের গুম্বজ সংখ্যা সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মের আলোচনা করিয়াছি (১ম, ৪৪৬-৭ পৃ)।

দ্বা দ শ প রি চ্ছে দ

সাহিত্য

সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই। কৃতী গ্রন্থকারগণের প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে, তাঁহাদের জীবনী ও গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে হয়, উহা তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ডে করিব বলিয়া অবশিষ্ট রাখিলাম। এখানে শুধু শ্রেণীবিভাগানুসারে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখের সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিব। সর্ব্ববিধ সাহিত্যে যশোহর-খুল্না কিরূপে আত্ম-প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, উহাতে তাহা সপ্রমাণ করিবে।

১ কা ব্য ও ক বি তা ॥ বঙ্গ-সাহিত্যে যশোহর-খুল্নার প্রভাব প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কবিকুলচূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যশোহরের সুসন্তান। সেনহাটির স্বভাবকবি 'সদ্ভাবশতক'-রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং সিঙ্গিয়ার নিকটবর্ত্তী জগন্নাথপুর-নিবাসী, 'মহিলা'-কাব্যের কবি ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত। মাইকেল-ভ্রাতুষ্পুত্রী বিদ্যানন্দকাটির মানকুমারী বসু বঙ্গীয় মহিলা কবিবৃন্দের অগ্রগণ্য।[১] বারুইখালির সংস্কৃত-স্বভাব-কবি কবিচন্দ্র এবং আধুনিক সময়ের খণ্ডকবিতা-লেখক কালিয়া নিবাসী প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২ শা স্ত্র চ র্চা ও গ দ্য সা হি ত্য ॥ মনুসংহিতাদি বহুগ্রন্থের টীকাকার ৺গঙ্গাধর কবিরাজ, 'নাট্য পরিশিষ্ট' প্রণেতা ৺কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, দর্শনাদির ব্যাখ্যাতা ৺পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, বাৎসায়ন-ভাষ্যের অনুবাদক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মাগণের উল্লেখ বংশ-পরিচয়ে পূর্ব্বে করিয়াছি। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সারসানিবাসী ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, 'আমিত্বের প্রসার' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, সংস্কৃত কাব্য-সমালোচক সুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, 'মানবতত্ত্ব' প্রভৃতির গ্রন্থকার সামটা-নিবাসী পণ্ডিত ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে এবং বৌদ্ধজাতকের অনুবাদক এবং

১ [মাইকেল মধুসূদন—১৮২৪-৭৩; দীনবন্ধু মিত্র—১৮২৯-৭৩, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—১৮৩৭-১৯০৭; মানকুমারী বসু—১৮৬৩-১৯৪৩; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—১৮৩৮-৭৮ —শি মি]

বহুসংখ্যক স্কুলপাঠ্য ইতিহাসাদি গ্রন্থ-রচয়িতা সুলেখক রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। হিন্দু-রসায়নের (ইংরাজী) ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্তর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমাজ ও অর্থ-সমস্যার মীমাংসক বহু প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক ভক্তকবি ৺শিশিরকুমার ঘোষ 'অমিয় নিমাই চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ভাষার মধ্যে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। একই কপোতাক্ষীর কূলে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি মধুসূদন, সর্ব্বপ্রধান পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরকুমার এবং সর্ব্বপ্রধান রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম; একজনের আবির্ভাবই দেশের গৌরবের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তিনজনের জন্মগৌরবে যশোহর-খুল্‌না ধন্য হইয়াছে।

৩ উপন্যাস ও ইতিহাস॥ যশোহর-বাগ্‌আচড়া-নিবাসী ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বর্ণলতা'র মত গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র গরিবের ঘরের প্রকৃত চিত্র দিতে পারেন নাই, তারকনাথ সে বিষয়ের প্রথম প্রবর্ত্তক এবং 'স্বর্ণলতা' আদর্শ গ্রন্থ। তারকনাথের আরও গ্রন্থ আছে। খুল্‌নার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু 'লক্ষ্মীমেয়ে', 'লক্ষ্মীমা' ও 'লক্ষ্মীবউ' প্রভৃতি সুলিখিত উপন্যাসে তারকনাথের পথানুবর্ত্তন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অন্য ঔপন্যাসিক বা গল্প লেখক-দিগের মধ্যে চৌগাছার ঘোষ-জমিদারবংশীয় বর্ত্তমান 'বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সেনহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, পলিতা-নহাটা-নিবাসী অন্ধলেখক ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, ধুলগ্রাম-নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পাঁজিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ও নল্‌দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে 'সমসাময়িক ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও 'গৌড়ের ইতিহাস' লেখক সিদ্ধিপাশার অধিবাসী ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী যশস্বী হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান গ্রন্থকারের জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি যশোহর-ছঘরিয়ার সুসন্তান বলিয়া দাবি করি। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কালিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ঘটক-গ্রন্থকার কালিয়া-নিবাসী ৺রামকান্ত কবিকণ্ঠহার, মহেশপুর-নিবাসী ৺লাল-

মোহন বিদ্যানিধি, নলদী-নিবাসী ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন, মিক্‌শিমিল-নিবাসী ৺জয়চন্দ্র মিত্র ও সেনহাটি-নিবাসী শ্যামলাল মুন্সী সুবিদিত।[১]

১ [প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিভারিজ (H. Beveridge) সাহেবের সহিত গ্রন্থকারের ইতিহাস-গত নানা তথ্য ও ঘটনা লইয়া বরাবর পত্র-বিনিময় হইত। বর্ত্তমান গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠের পর তিনি ইংলণ্ড হইতে এক দীর্ঘ পত্রে (১০।৪।২৩) রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর বিষয় উত্থাপন করেন এবং উহার এক বিস্তৃত সমালোচনায় বলেন : 'Mr. Satish C. Mitra seems to have studied nearly all available sources. The only omission that occurs to me is that he has said nothing about Carey and the missionaries. I think the omission a mistake. Though Serampore is on Hooghly, there ought to have been some mention of Mr. Carey. After all he is, with the doubtful exception of Hiuen Tsang, the most interesting figure in East Bengal. Mr. Mitra knows about him, for he kindly gave me information about Debhatta and Hasnabad in Khulna, where Carey and his family made a short stay before Mr. Udney made him an Indigo-planter and gave him a home in Maldah.'

রেভারেণ্ড ডক্টর উইলিয়ম কেরী (Rev. Dr. William Carey, 1761-1834) ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংলণ্ড হইতে পরিবারসহ বিপদসঙ্কুল পাঁচ মাসের সমুদ্রযাত্রার পর এক ডাচ্-জাহাজ হইতে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় অবতরণ করেন। জন্ থমাস্ (John Thomas) সাহেব তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে থমাস্ সাহেব একবার কলিকাতা থাকাকালীন বঙ্গভাষা শিক্ষার্থে রামরাম বসুকে মুন্সী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইবার থমাস্ সাহেবের সূত্রে রামরাম বসুর সহিত পরিচয় হইবামাত্র কেরী সাহেবও তাঁহাকে মুন্সীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই যোগাযোগ পরবর্ত্তীকালে বঙ্গভাষা, বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গদেশের মুদ্রণ বিষয়ে এক নব-জাগরণের সূচনা করে।

কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় মাণিকতলা অঞ্চলে জনৈক কুসীদজীবি নেলু দত্তের গৃহে রামরাম বসু ও কেরী সাহেবকে তাঁহার পরিবারসহ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। একদিকে নিদারুণ অর্থাভাব, অন্যদিকে পরিবারের সকলে রোগাক্রান্ত হওয়ায় কেরী সাহেবের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ইহার ফলে তাঁহার স্ত্রীও উন্মাদ হইয়া যান।

ইঁহাদের অনন্যোপায় অবস্থা দেখিয়া এবং রামরাম বসুর অনুরোধক্রমে তাঁহার পিতৃব্য হাসনাবাদের বনাকীর্ণ অঞ্চলে একখণ্ড জমি কেরী সাহেবকে ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইস্থানে দেশীয় চালচলনে সাধারণের সঙ্গে বসবাস এবং ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া কেরী সাহেব হাসনাবাদেই আসা স্থির করেন। কোনমতে কিছু ঋণের সাহায্যে একখানি নৌকা ক্রয় করিয়া সপরিবারে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৪, তারিখে যাত্রা করিলেন। নৌকাপথে চারদিন কাটিয়া যায় ও তখন সঙ্গে মাত্র একদিনের খোরাকী ; এমন সময়ে তাঁহারা দেবহাটায় নৌকা হইতে দূরে একখানি সাহেবী-বাড়ী

লোক-সাহিত্য

ভারতবর্ষে হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে যেরূপ ধর্ম্মভাব প্রসারিত হইয়াছে, জগতের বক্ষে কুত্রাপি এমন হয় নাই। এই জন্য ঋষিগণ এদেশে পুরাণের সৃষ্টি করেন, এই জন্যই সর্ব্বত্র রামায়ণ মহাভারতের পঠনপাঠন হয়। বঙ্গীয় হিন্দু কৃত্তিবাস ও কাশীরামের নিকট যত ঋণী, এত আর কাহারও নিকট নহে। শুধু পল্লীতে পল্লীতে দেবমন্দিরে, বৃক্ষতলে বা গৃহকোণে ভারতাদি পুরাণের পঠন-পাঠন নহে, ঐ সকল পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে নীতি-গল্প সংগ্রহ করিয়া, তাহাই সাধারণের বোধগম্য সরস ভাষায় কবিতার পয়ারে বা সঙ্গীতের স্বরে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গি, বাক্যালাপ ও নৃত্যরঙ্গের সাহায্যে আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভাবমুগ্ধ করা হইত। ইহা হইতেই ক্রমে কথকতা,

দেখিতে পান। সেখানে উপস্থিত হইলে কোম্পানীর তত্রস্থ লবণ-কারখানার অধিকর্ত্তা চার্লস সর্ট (Charles Short) সাহেবের সাহায্য পাইতে বিলম্ব হয় না।

কয়েকদিনের মধ্যে এখান হইতে উঠিয়া কেরী সাহেব হাসনাবাদ অঞ্চলে 'চালাঘর' নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ঐতিহাসিক বিভারিজ সাহেব এই স্থানকে 'জঙ্গল-বাড়ী' বলিয়া অনুমান করিতে চান। কেরী-পরিবার এখানে অনধিক প্রায় পাঁচ মাস ছিলেন। পুনরায় থমাস্ সাহেবর চেষ্টায় মালদহে মদনাবতীতে নীলের কারখানায় কাজ পাইলে কেরী সাহেব সপরিবারে ১৫ই জুন (১৭৯৪) হাসনাবাদ ত্যাগ করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পর (১৮০০) কেরী সাহেবের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য সতীর্থের সাহায্যে শ্রীরামপুর মিশনরী স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কার্য্যাবলি ও অবদান সর্ব্বজনবিদিত। এই মিশন শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া এবং পঞ্চানন কর্ম্মকার ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহরের সাহায্যে ভারতীয় ভাষার টাইপ সৃষ্টি করিয়া ১৮০১-৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৪০টি ভাষায় ২,১২,০০০ পুস্তকখণ্ড মুদ্রিত করেন। শ্রীরামপুর মিশনেই কেরী সাহেব ৯ই জুন, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত যশোর-রাজ্যের ইতিবৃত্তে অন্য এক সূত্রেও কেরী সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষায় প্রথম গদ্য-সাহিত্য এবং প্রথম প্রকৃত ইতিহাস-গ্রন্থ মহারাজা প্রতাপাদিত্য বিষয়ক। উহা রামরাম বসু কর্ত্তৃক রচিত এবং কেরী সাহেবের সাহায্যে ও অনুপ্রেরণায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Marshman, J. C., *Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, 1859, 2 vols.; নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', ১৩১৩ সাল; 24-Parganas Gazetteers, 1914; Kesavan, B. S., ed., *The Carey Exhibition*, 1955—শি মি]

পাঁচালী, নাটক, যাত্রা, ভাসান প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। যশোহর প্রদেশ যে বঙ্গীয় সমাজের সার স্বরূপ তাহার আর একটা প্রমাণ এই যে, এইভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার কার্য্যে এ অঞ্চলের সকল স্তরের সকল লোকে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন। শুধু শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ও কবি নহেন, এ অঞ্চলের অনেক নিরক্ষর গ্রাম্যলোকেও অনর্গল কবিতা ও গান রচনা করিয়া, তর্জ্জার লড়াই ও ছড়া কাটাকাটির ছলে, চামর ঢুলাইয়া রামায়ণের গানে বা ঢু'লের সঙ্গে নাচিয়া 'কবির পাল্লায়' ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, নবাগত মুসলমান অধিবাসিগণও হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া উভয় ধর্ম্মের সারনীতিসমূহ সর্ব্বজাতীয় লোকের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। উন্নত বঙ্গীয় সাহিত্যের সমালোচনা আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিগণ করিতে পারেন ও করিতেছেন, কিন্তু আমার আলোচ্য জেলাদ্বয়ের এই জাতীয় নিম্ন-সাহিত্যের সংবাদ তাঁহারা না রাখিতে পারেন, এজন্য সাধ্যমত আমি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই সাহিত্য-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি যাঁহারা আমার দেশের মুখোজ্জ্বলকারী, তাঁহাদের গুণগ্রামের কথা স্থগিত রাখিয়াও আমি এই সকল স্বল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর কবির নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী চিরস্থায়িনী করিতে প্রয়াসী। আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক ইতিহাসের সঙ্কলয়িতা ইহাদের নাম বিস্মৃত হইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে পারেন।

১ কথকতা॥ শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদি পুরাণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সরল ও সরস ভাষায় যে বিশদ ব্যাখ্যা হয়, তাহারই নাম কথকতা। উহার মধ্যে মধ্যে ভাবোদ্দীপক গান ও স্বরের খেলা এবং লোকরঞ্জনের জন্য তীব্র পরিহাস ও রসিকতা চলে। প্রাচীন কাল হইতে এ প্রদেশে বহু কথকের আবির্ভাব হইয়াছে; উহাদের কেহ কেহ কথকতার জন্য স্বতন্ত্র পুঁথিরচনা করিতেন। আধুনিক সময়ে বিভাগদি নিবাসী কথকচূড়ামণি ৺বিশ্বেশ্বর শিরোমণির নাম সমধিক বিখ্যাত। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যারত্ন নব্য প্রণালীর কথকতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

২ পাঁচালী॥ কবিতাকারে পুরাণের অনুবাদ হইতেই পাঁচালীর উৎপত্তি। অধিকাংশ পাঁচালীই কৃষ্ণকথা লইয়া রচিত। একদা বঙ্গে শৈবমতের বহুল

প্রচার হয়, তখন 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' চলিত, আধুনিক সময়ে সে ভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে দাশু রায় ও গোবিন্দ অধিকারী প্রধানতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনে দেশজয় করিয়াছিলেন, যশোহরেও উলসী-নিবাসী মধুবর্ষী মধুকা'ন (কিন্নর) তেমনই নূতন ধরণে নূতন সুরে কীর্ত্তন গাহিয়া দেশবিখ্যাত হইয়াছেন। কপোতাক্ষীকূলে দত্ত মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা'-বিরহের যে সুরভঙ্গি দিয়াছিলেন, বেত্রবতীকূলে কিন্নর মধুসূদনও তেমনই তাঁহার 'ঢপ'-সঙ্গীতের বিভিন্ন পালায় নূতন পদ্ধতির পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। রায়গ্রাম-নিবাসী রায়গুণাকর রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অমিয়ভাষিত বালকবৃন্দের সাহায্যে তাঁহার 'বালক-সঙ্গীত' নামক পাঁচালীর নূতন সংস্করণ প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণকথা নহে, বহু গ্রাম্য দেবতার নামেও পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। মনসার গল্প এদেশের বড় প্রিয় প্রসঙ্গ, তাঁহারও অনেক পাঁচালী এ দেশে রচিত ও বরিশাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। গানবাদ্যসহযোগে উহাই যাত্রাভিনয়ের মত 'মনসার ভাসানে' পরিণত হয়; এখনও 'ভাসানের দল' আছে, তাহার গান ও কবিতায় এদেশীয় বহু অজ্ঞাতনামা কবির হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পভয়ের সঙ্গে যেমন মনসার সম্পর্ক, বসন্তরোগের সঙ্গে তেমনিই শীতলাদেবীর পূজা পদ্ধতি প্রচারিত হয়। শীতলাদেবীর করুণাকাহিনী প্রচারের জন্য বহু পাঁচালী রচিত হয়; শীতলাকে বৌদ্ধদেবতা বলিয়া সন্দেহ হইবার কারণ আছে; এদেশে যোগি-জাতীয় লোকেই বসন্তের চিকিৎসা করিতেন এবং শীতলার পাঁচালী গাহিতেন। যশোহরের নিকটবর্ত্তী আম্‌দাবাজ-নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত একখানি বিরাট 'শীতলা মঙ্গল' পুঁথি যশোহর-খুল্‌নার কয়েক স্থানে দেখিয়াছি। উহা ১৬৮৫ শকে রচিত।[১] মুসলমানেরা পীরের উদ্দেশে সির্ণী দিতেন দেখিয়া হিন্দুরাও সত্যনারায়ণকে 'সত্যপীর' করিয়া তাঁহার নামে সির্ণী মানসা করিতেন, এবং সত্যনারায়ণের বহু পাঁচালী রচিত

১ পুস্তকের শেষ ভাগে সময়-জ্ঞাপক কবিতাটি এই :

'বাঁণ বসু রস ইন্দু শক পরিমিত।
হেনই সময়ে হৈল শীতলার গীত॥'

এই পুঁথি এখনও ছাপা হয় নাই। উহার একখানি পুঁথি চাঁচড়ার দশমহাবিদ্যার বাটীতে আছে। খুল্‌নার অন্তর্গত পীলজঙ্গের নিকটবর্ত্তী ষাটতলায় শীতলা কীর্ত্তনের দল ছিল, তথাকার যোগীরা দল লইয়া নানাস্থানে গান গাইয়া বেড়াইতেন।

হইয়া গৃহে গৃহে পঠিত হইতে থাকে। মুসলমানের পীর 'মুস্কিলের আসান' (উপশম) করেন, এজন্য এখনও হিন্দুর গৃহে 'আসান নারায়ণ' ও সত্যপীরের সির্ণী দেওয়া হয়। সত্যনারায়ণের পাঁচালী যে কতজনে লিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সিঙ্গা-শোলপুরের রঘুনাথ সার্ব্বভৌম, খরনিয়া-নিবাসী ৺তারিণীশঙ্কর ঘোষ ও পাঁজিয়ার ৺নন্দরাম মিত্রের পাঁচালী উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহারা ত্রিনাথ। পূর্ব্ববঙ্গে এই ত্রিনাথের মেলা বা পূজা হয়। সন্ধ্যার সময় তাম্বূল, সুপারি ও গাঁজা লইয়া দলবল জুটিয়া পূজা ও গান হয়; সঙ্গে সঙ্গে 'ত্রিনাথের পাঁচালী' পাঠ করা হয়। বরিশাল হইতে খুল্‌নায়ও এই উৎসব সংক্রামিত হয় এবং কতজনের রচিত 'ত্রিনাথের পাঁচালী' আছে। বর্ত্তমান সময়ে স্বনামধন্য মতিরায়ের অনুকরণে অনেকে যাত্রাভিনয়ের পালা রচনা করিতেছেন, তন্মধ্যে মল্লিকপুর-নিবাসী অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য ও মাগুরা (খুল্‌না)-নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

৩ সারিগীত ও ভাটিয়াল গান॥ গ্রাম্যগানের মধ্যে সারিগীত প্রধান। নদীবক্ষে জলযাত্রায় এই গান গাওয়া হয়। সুতরাং নদীমাতৃক যশোহর-খুল্‌নার উহা একটি বিশেষত্ব। বর্ষাকালে ইহার অধিক প্রচলন; ধান্যোৎপাদনে হর্ষোৎফুল্ল কৃষক ও মৎস্যজীবী নাবিকেরা ইহার প্রধান গাথক। আষাঢ়মাসে রথযাত্রায়, শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপূজায়, ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্‌করম (বিশ্বকর্ম্মা) পূজায় এবং বিজয়া দশমীর ভাসানে নৌকার বাইচ দিবার সময় এই গানের অধিক প্রচলন ছিল। 'ছিল'ই বলিতে হয়, কারণ কি জানি কি দুর্ভাগ্যের ফলে, দুর্ভিক্ষাদির তাড়নায় নির্ম্মল আনন্দ যেন কৃষকপল্লী হইতে পলায়ন করিয়াছে, এখন আর এ সব উৎসবে তেমন আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত হয় না। নৌকার উপর সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া এই গান গীত হয় বলিয়া ইহার নাম 'সারি গান'। শুনা যায়, নড়াইলের বিখ্যাত কালীশঙ্কর রায় রাজা সীতারামের ভাগ্য-বিগ্রহ আনিয়া নাম ভাঁড়াইয়া ৺গোবিন্দরায় নামে একদা শ্রাবণী পূর্ণিমায় নড়াইলে প্রতিষ্ঠিত করেন; তৎপৌত্র স্বনামখ্যাত রতন বাবু ঐ তিথিতে এক জলযাত্রার বাৎসরিক উৎসব করিতেন, তদুপলক্ষে তাঁহার চেষ্টায় সারিগানের পাল্লা চলিত। আজকাল নদীবক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে স্বর-তরঙ্গ মিলাইয়া নাবিকেরা যে সব গীত গাহিয়া থাকেন, তাহারই

সাধারণ নাম সারিগীত। খুল্‌নার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ ভাটি প্রদেশে ঐ জাতীয় গানের স্বরকম্পন-সম্বলিত স্থর-বিশেষকে 'ভাটিয়াল' স্থর বলে। ঐ স্থরে এ দেশীয় অনেক নিরক্ষর লোকও দেহতত্ত্ব এবং ভগবানে আত্মনিবেদন সম্বন্ধীয় ভাবময় গান রচনা করিয়াছেন; উহার কত গান শুনিয়াছি, কিন্তু সে সব গান ও রচয়িতার নামের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিলে ধন্য হইতাম। এই সব ভাটিয়াল গানে মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইয়া দেয়। নিস্তব্ধ সন্ধ্যালোকে গৃহপানে ধাবিত শ্রান্তক্লান্ত নিরক্ষর নাবিক যখন নদীবক্ষে শ্লথহস্তে বৈঠা টানিতে টানিতে উদাস প্রাণে গাহিতে থাকে :

"হরি! বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, জেনে বার্ত্তা, ডাকি হে তোমারে॥"—

তখন তাহার অসামান্য স্বরলহরী পল্লীপবন বিকম্পিত করিয়া লোকের চিত্তে যে চরম-চিন্তা জাগাইয়া দেয়, শিক্ষিত কবির জটিল ভাবময়ী মার্জ্জিত ভাষায় তাহার প্রান্তস্পর্শও করিতে পারে না।

৪ 'গুরুসত্য'-গীত॥ বঙ্গে কত সম্প্রদায় আছেন, তাহার শেষ নাই। কর্ত্তাভজা বা বাউলের মত 'গুরুসত্য'ও একটি সম্প্রদায়। প্রায়ই নিম্ন-শ্রেণীর সংসার-বিরাগী অকৃতদার লোকে এই সম্প্রদায় রক্ষা করেন এবং মুসলমানের মত 'জিগীর' দিয়া (উচ্চ কীর্ত্তন করিয়া) ধর্ম্ম প্রচার করেন। যে সব লোকে এই মতের গান রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যশোহরের লালন ফকির ও ঈশান ফকির প্রধান। শুনা যায়, খুল্‌নার দক্ষিণে জল্‌মা নামক স্থানের এক পোদজাতীয় ফকির প্রথমে এই 'গুরুসত্য' গান সুন্দরবনের কাঠুরিয়া যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ করেন।

৫ 'বার'-সঙ্গীত, অষ্টক ও চড়ক সঙ্গীত॥ স্থানে স্থানে স্ত্রী-পুরুষের 'বার' হয়, অর্থাৎ তাঁহারা দৈবানুপ্রাণিত হইয়া ভাবোচ্ছ্বাসে নানা কথা বলেন। কেহ বা উৎসব অনুষ্ঠানে ধূয়া ধরিয়া গান করিয়া পয়সা রোজগার করেন। বাগেরহাটের খাঞ্জালির 'বার' ও মাগুরা মহকুমার শিমাখালির 'বার' উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর ঐসব স্থানে গাহিবার জন্য অনেক গান রচিত হইত এবং তাহা দেশমধ্যে প্রচলিত আছে। হিন্দুদের চড়ক পূজার সময়ে

পৌরাণিক প্রসঙ্গ লইয়া অষ্টকের গান হয়। নিরক্ষর লোকে অষ্টকের দল করিয়া বাহির হন ; তাঁহারা শিবদুর্গা প্রভৃতি নানা সাজে সাজিয়া বেহালাদারের অগ্রে অগ্রে, ঢাকের তালে তালে, সাঁওতালী ধরণে নাচিয়া নাচিয়া গান করেন। এই গীতগুলি প্রায়শঃ আট চরণে সমাপ্ত, এজন্য উহাকে অষ্টক বলে। চড়ক পূজার 'গাজন' যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ উৎসব তাহা প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি (৩য় সং, ৪৫১ পৃ)। ঐ উপলক্ষ্যে যোগীরা দেউল পাটের সম্মুখে নূপুর পায়ে নাচিয়া নাচিয়া 'বালাকি' পাঁচালী পড়েন। ঐ জাতীয় বহুলোকে 'বালার গান' রচনা করিতে গিয়া যথেষ্ট কবিত্বের প্রকাশ করিয়াছেন।

৬ গা জী র গী ত ও মা ণি ক পী রে র ছ ড়া॥ যিনি পৌত্তলিকতার বিনাশ করিয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচার করেন তিনিই গাজী। সুন্দরবনে বাঘ মারিলেও গাজী উপাধি হয়, কিন্তু তাহা নকল মাত্র। পাঠান আমলে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বহুসংখ্যক গাজী এদেশে আসেন এবং তাঁহাদের সহিত হিন্দুদিগের বিবাদসূত্রে বহু সত্য মিথ্যা গল্প গুজব পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। সুদীর্ঘ 'গাজীর পটে' এই সকল ঘটনার চিত্র দেখান হইত এবং সুদীর্ঘ 'গাজীর গীতালাপে' উহার কথা রঞ্জিত ভাষায় লোকসমাজে বিবৃত হইত। গাজীর আগমন ও আক্রমণের বিশেষ বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ডে দিয়াছি (৩য় সং, ৪১৮-২৩ পৃ)। কিছুকাল পরে গাজীর অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হইয়া লোকে উঁহাদের অদ্ভুত শক্তির (বুজুরগী) কথা আলোচনা করিতেন এবং হিন্দু-মুসলমানে অভেদে গাজীর সির্ণী দিতেন ও গাজীর গীতের দুই-এক পালা মানসা করিতেন। মুসলমান ও নমঃশূদ্রেরা গাজীর গীতের দল করিয়া নানা স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। একজন মূল গাইন (গায়ক), কয়েকটি নৃত্যতৎপর সুকণ্ঠ বালক, বেহালাদার ও মৃদঙ্গবাদক গাজীর দলে থাকেন। মূল গাইনকে 'খেড়ো' বলে ; তিনি চাপ্‌কান গায়ে, মাথায় লম্বা চুল ও গলায় পুঁথির মালা ঝুলাইয়া, হাতে কালো চামর ঢুলাইয়া গাজী কালুর কথা-প্রসঙ্গে কীর্ত্তনের পদাবলীর মত একঘেয়ে সুরে, প্রায়শঃ ঠুংরি-তালে, গান গাহিতেন। বিষয় ছিল, গাজীর চরিত্র বা অন্য কেচ্ছা এবং কল্পিত বাদশাহ বা ওমরাহের কাহিনী। গাজীর গীতের যে কত 'কারিকর' (কারুকর) বা রচয়িতা হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। মাগুরার অন্তর্গত ধনেশ্বরগাতির জয়চাঁদ মণ্ডল নামক একজন নমশূদ্র প্রসিদ্ধ

'গাইন' ছিলেন, তিনি আবার তালখড়ির নিকটবর্ত্তী উজগ্রামের তরিবুল্যা 'কারিকরে'র শিষ্য। তরিবুল্যার পুত্র হাচিম বিশ্বাস বিখ্যাত ওস্তাদ। জয়চাঁদ গাজীর গীতের অনেক সংস্কার করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ভেদবুদ্ধি রহিত করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৩০৭ সালে ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তৎপুত্র প্রসন্ন বিশ্বাস গানের দল চালাইতেছেন।

মুসলমানদিগের অন্য একজন পীরের নাম মাণিক পীর; তিনি গোরু বাছুর সুস্থ রাখেন, ক্ষেত্রকে শস্যপূর্ণ ও গৃহস্থালী শান্তিপূর্ণ করেন। এদেশীয় হিন্দু-মুসলমান উভয়ে, অন্ততঃ গোরুর কল্যাণ-কামনায়, উহার সির্ণী দেন এবং পীরের নাম করিয়া ভিক্ষার্থী ফকিরকে অকাতরে ভিক্ষা দেন। ফকির গৃহস্থের অন্দরদ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহলক্ষ্মীদিগকে সতীধর্ম্ম ও গৃহকর্ম্মের সুন্দর উপদেশমালা সুরসংযোগে শুনাইয়া যান। গ্রাম্য কবিরা এই সব নীতিকথা কবিতাকারে রচনা করিয়া নিজশক্তির পরিচয় দিবার সুযোগ পান। যশোহরের উত্তরাংশে এই মাণিক-পীরের গীত অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়।

৭ কবি ও বাউল সঙ্গীত॥ কবিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় হয় বলিয়া এক জাতীয় গানের নামই 'কবির গীত' এবং যে গায়, তাহাকে 'কবিদার' বা কবিওয়ালা বলে। কে কেমন গান বাঁধিতে (রচিতে) এবং অনর্গল 'উপস্থিত বোল' আওড়াইতে পারেন, তাহাই পরীক্ষার জন্য কবির পাল্লা বা তর্জ্জা হয়। পৌরাণিক কথা বা রহস্যের মীমাংসা উপলক্ষ্য মাত্র, অবিরাম পয়ার ত্রিপদীতে কবিতা রচিয়া 'ছড়া কাটিয়া' যাওয়াই কৃতিত্বের পরিচায়ক। স্বল্পশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোককে এত দ্রুতবেগে উপস্থিত মাত্র শুদ্ধভাষায় কবিতা রচিয়া বলিয়া যাইতে শুনিয়াছি, যে তাঁহার শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। সাধারণতঃ কোন পৌরাণিক কাহিনী তুলিয়া একটি প্রশ্ন বা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া একদল অন্যদলকে 'বেড়িয়া' ফেলেন বা আক্রমণ করেন; অপর পক্ষের কবিদার বা সরকারকে সুকৌশলে উহার জবাব দিতে হয়। এই উত্তর প্রত্যুত্তর কালে অনেক সময়ে বিষম ঝগড়া, এমন কি, অশ্লীল বা 'মোটা' ভাষায় গালাগালি চলে; নিম্নশ্রেণীর শ্রোতৃবর্গ উহাই ভালবাসেন এবং বাহবা দেন। এজন্য এ সব গান গৃহস্থ বাড়ীতে না হইয়া অধিকাংশ সময়ে হাটে বাজারে বারোয়ারী পূজা উপলক্ষ্যে হইয়া থাকে; বহুদূর হইতে কৃষকগণ উহা শুনিতে আসিয়া

হল্লা করেন এবং সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে গানের বান্ধুটি (রচনা) বা ভাষার কস্‌রতের প্রশংসা করেন। প্রারম্ভে এবং মধ্যে মধ্যে অবশ্য শ্রোতার নেত্র অশ্রুসিক্ত করিয়া দেহতত্ত্ব বা ধর্ম্মভক্তি বিষয়ক উচ্চাঙ্গের গানও হয় এবং উহার ভাব ও রচনা-চাতুর্য্য উচ্চ সমাজে প্রশংসিত হইবার যোগ্য। তারক কাঁড়াল, পাঁচু দত্ত, গোবিন্দ তাঁতি, রূপে পাঠা, হারাণ ঠাকুর, হরমোহন ও মথুর সরকার প্রভৃতি কবিদারেরা যশোহর-খুল্‌নার অধিবাসী ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

খুল্‌নার নিকটবর্ত্তী জাপ্‌সা গ্রামের "ক'বেল (কবিওয়ালা) কামিনী" নামক একজন নিরক্ষরা পোদ-রমণী তাঁহার ভাগিনীপুত্র তারাচাঁদ বা অন্যের গীতের দলের জন্য অসংখ্য কবিত্বপূর্ণ গান ও শ্লোক রচনা করিয়া দিতেন; তজ্জন্য তাঁহার বংশীয়গণ "ক'বেল বংশ" বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহার গানের সুরমাত্রা গাজীর গীতের মত বা ভাটিয়াল জাতীয়, বিষয় কিন্তু হিন্দু-সাধনার উচ্চাঙ্গের অনুরূপ। এই কামিনী কালী মায়ের ভক্ত; প্রবাদ এই, বিরাট গ্রামে খালে জল আনিবার কালে কালী তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তিনি কালীরূপ সর্ব্বত্র দর্শন করিতেন। নমুনাস্বরূপ একটি গানের চারিটি চরণ দিতেছি:

"কালো বেটি কত খাঁটি সে যে ফুলের মাথার পরে,
চরণ দু'টি কত কোটি চাঁদসুরযে আলো করে॥
কত শলক, কত রশ্মি কালী মায়ের পায়
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়॥"

কাঙ্গাল হরিনাথ বা ফিকিরচাঁদ ফকিরের মত এদেশেও 'বাউল কবির' আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই সকল বাউল বা বাতুল প্রেমিকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতায় ভোগাসক্ত লোককে পারাপার বা পরপারের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। গৈরিক আল্‌খেল্লা পরা ফকির যখন গোপীযন্ত্রের তালে নাচিয়া বাউলের সুর গান, তখন নিরক্ষর কবির গানে আমীরকেও আত্মহারা করিয়া থাকে। মাগুরার নিকটবর্ত্তী শিবরামপুর-নিবাসী রাধারমণ ও শ্যাম বাউলের অনেক কালোয়াতী গান আছে, আর শ্যাম বাউলের খোলে হরিনামের বোল উঠিত।

৮ জারী গীত॥ কোন বিষয় প্রকাশ্যে প্রচার বা জাহির করিবার নাম জাহিরী বা জাহ্‌রী। সাধারণ কথায় জারী বলে। এইরূপে বিচারকের ডিক্রী বা হুকুমের জারী হয়। সমাজের নিম্নস্তরে ধর্ম্ম বা নৈতিকতত্ত্ব প্রচারের জন্য জারী গানের সৃষ্টি। উহার প্রধান গায়কের নাম বয়াতি অর্থাৎ 'বয়েৎ' বা শ্লোকের রচয়িতা। এই গীতের অধিকাংশ কোরাণের সূক্ত বা আরবিক কাহিনী ঘটিত। ইহাতে ধুয়া, আরেব, ফেরতা, মুখড়া, বাহির, চিতেন প্রভৃতি অংশ থাকে। খুঞ্জরী নামক বাদ্যযন্ত্র এই গানের প্রধান সাধন। অদ্ভুত কৌশলে দুইটি খুঞ্জরী বাজাইতে বাজাইতে, বয়াতি প্রথম 'ঝুমুর' ধরিয়া পাকশাট দিয়া ঘুরিতে থাকেন, পরে গান ধরেন। কয়েকটি বালক, বালকণ্ঠবিশিষ্ট কয়েকজন কৃষক গায়ক, দুই একজন বাদক এবং সর্ব্বোপরি মূল গাইন বা বয়াতি জারীর দলের প্রধান অঙ্গ। বেশী বক্তৃতা নাই, বাহাদুরী শুধু গীতের মধ্যে। কবির তর্জ্জার মত দুই দলে পাল্লা দিয়া জারী হয়। নানামতে সিদ্ধান্ত করা যায়, প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া যশোহর জেলায় জারী চলিতেছে—এই গানের উৎপত্তিস্থান বলিয়া যশোহর যশস্বী। যদিও সনাতন ও রামচাঁদ প্রভৃতি দুই চারি জন হিন্দু বয়াতির নাম শুনিতে পারি, তবুও বলিতে পারি সাধারণতঃ মুসলমানগণই এই গীতের পালক, গায়ক, রচক ও প্রচারক। জারী গীতের প্রধান প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে পাগলা কানাই প্রথম এবং ইদু বিশ্বাস দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। যশোহরের উত্তরাংশ অর্থাৎ ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুমা জারীগানের পীঠস্থান। পাগলা কানাইএর শিক্ষাগুরু ছিলেন কেশবপুরের নিকটবর্ত্তী রসুলপুরের নয়ান ফকির। নিম্নলিখিত গানে পাগলা কানাইয়ের সমকালবর্ত্তী ও প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকজন বয়াতির নাম পাওয়া যায় :

"নামটি আমার মেহের চাঁদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী
আমি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী।
শুনি, আকাশে এক মেলা হ'য়েছে ভারি
তা'তে বায়না নিয়ে পাগলা কানাই গাইতে গিয়াছে জারী।
গিয়াছে ঘুণির জাহের, পাগলা তাহের, আর আরজান্ মোল্লা,
আসান উল্লা, সোণা সেদু, তরিবুল্যা, কোরবান মোল্লা
গেছে রোশন খাঁ, নৈমদ্দী মুন্সী আর সুলতান মোল্লা,—

এরা কয়জনেতে পাগলা কানাইর সাথে দিয়াছে পাল্লা ;
এরা সব চালাক চতুর, কানাই বড় কল্লা।”[১]

কিন্তু পাগলা কানাই ও ইদু বিশ্বাসই সকলের শ্রেষ্ঠ। শিক্ষিত সমাজে বড় বড় কবির মত কৃষক সমাজে ইঁহারা এক ডাকে পরিচিত। তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি, ইঁহাদের উৎকৃষ্ট গানগুলি বাছিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিলে, তাহা যে কোন সমাজে আদর পাইবার যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সব ধনীর গৃহে বার্ন্সের কবিতাদি পঠিত হয়, তাহাদের অর্থ এজাতীয় অর্থসাপেক্ষ ব্যাপারে প্রযুক্ত হয় না। কানাই ও ইদুর জারী বঙ্গীয় নিম্নস্তরের ধর্ম্মপ্রাণতা ও দেহাত্মবাদের সাক্ষী, এজন্য উহার অনুবাদ পাশ্চাত্য মুল্লুকেও অবজ্ঞাত না হইতে পারে। ঝিনাইদহের অন্তর্গত গয়েশপুরের সন্নিকটে বেড়বাড়ীতে পাগলা কানাই এবং ঐ মহকুমার ঘোড়ামারা গ্রামে ইদু বিশ্বাসের জন্ম। কানাই এক প্রকার নিরক্ষর, কিন্তু ইদু বেশ লেখাপড়া জানিতেন। কানাইএর গান সরল ও স্বাভাবিক, ইদুর গান কিছু জটিল ও দীর্ঘ। কুড়ন সেখের পুত্র কানাই বাল্যে দুরন্ত ও যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে পাগলা বলিতেন। কানাই প্রথম জীবনে আঠারখাদার চক্রবর্ত্তীদিগের বেড়বাড়ীস্থিত নীলকুঠিতে দুইটাকা বেতনে খালাসী ছিলেন ; তাঁহার বংশ বা অন্য গৌরব ছিল না, থাকিবার মধ্যে ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্ট কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার সুর আর চরিত্রে অপূর্ব্ব বিনয়শীলতা। তাঁহার হিন্দু-মুসলমানে ভেদবুদ্ধি ছিল না, সর্ব্বত্র প্রশংসিত সমদৃষ্টি ছিল। কানাই দেহতত্ত্ব-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। মরণ-রহস্য ও আত্মতত্ত্ব তাঁহার বেশ পরিজ্ঞাত ছিল। সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় উহার অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কানাইয়ের পরবর্ত্তী বয়াতিগণ জারীগানের ভাবভঙ্গির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় যাত্রায় পরিণত

১ ইঁহাদের মধ্যে তরিবুল্যার বাড়ী ঘোড়ামারার কাছে লক্ষ্মীপুরে, কোরবান্ মোল্লার বাড়ী দিঘলিয়া গ্রামে, রোশন খাঁ, পাঁচুরিয়ার, নৈমদ্দি মুন্সী পোড়াহাটির নিকটবর্ত্তী আড়িয়া গ্রামের এবং সুলতান মোল্লা পবহাটির নিকটবর্ত্তী আড়ুয়াডাঙ্গার অধিবাসী। ইহা ব্যতীত আবাইপুরের কোরেশ, আড়ংঘাটার নেওয়াজ, পুটের আজিম, বাকালির একব্বর ও নানাস্থানের তারা খাঁ, মধু, বালকচাঁদ, মদন, বদন, তিলক, হাচিম, ওমেদালি, এনাতুল্যা, এরাজতুল্যা আসানউল্যা প্রভৃতি অসংখ্য বয়াতিগণের নাম পাওয়া যায়।

করিয়াছেন। এই সকল সংস্কারকদিগের মধ্যে নহাটার নিকটবর্ত্তী দীঘলকান্দি-নিবাসী হাকিম চাঁদ, পূর্ব্বোক্ত মেহের চাঁদ, কলম বিশ্বাস, হাকিম বিশ্বাস, হাগ্‌ড়া-নিবাসী বিনোদ বয়াতি ও আরজার সেখের নাম উল্লেখযোগ্য। শৈলকুপা থানার অন্তর্গত পদম্‌দি-নিবাসী আর্‌সাদ্‌ বিশ্বাস, চৌগাছা-নেয়ামতপুর-নিবাসী পাঁচু বিশ্বাস, মেহেরচাঁদের পুত্র জয়লাল এবং ইদু বিশ্বাসের ভাগিনেয় মেহের বিশ্বাস বর্ত্তমান জীবিত বয়াতিদিগের মধ্যে বিখ্যাত।

প রি শি ষ্ট

প রি শি ষ্ট ॥ ক

এক

প্রতাপাদিত্যের পতন[১]

১ নূতন ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কার

আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদ যে, মুঘল রাজপ্রতিনিধি রাজা মানসিংহ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লোহার খাঁচায় পুরিয়া দিল্লী লইয়া যান, পথে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। (Westland's *Jessore*, 2nd ed., p. 24)

মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত ওই পদে থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইবার পর তাঁহাকে (১৪ অক্টোবর, ১৬০৫) ওই কর্মে বহাল রাখিয়া রাজধানী হইতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে) তাঁহাকে সরাইয়া নুরজাহানকে হস্তগত করিবার জন্য কুতবুদ্দীন খাঁকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করেন। (ইক্‌বলনামা, ২ ও ১৯ পৃ)। সুতরাং মানসিংহ প্রতাপকে বিনাশ করিলে তাহা ১৬০৬এর মধ্যেই ঘটিত। একখানা 'অদ্বিতীয়' পুরাতন ফার্সী হস্তলিপি হইতে গত ১৩২৬ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি যে এই প্রচলিত কথা সত্য নহে, এবং প্রতাপাদিত্য সশরীরে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রিল বাঙ্গলার নূতন সুবাদার ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েক দিন পরে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পান।

তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের শেষ পরাভব ও মৃত্যু কোন্ বৎসরে এবং কোন্ সুবাদারের হাতে ঘটে? তিনি মানসিংহ হইতে পারেন না। তবে কে?

সুখের বিষয়, এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যায়। বিলাতে একখান ফার্সী

১ [বহারিস্তানের প্রথম পাঠোদ্ধারান্তে অধ্যাপক স্যর যদুনাথ সরকার প্রথম এই প্রবন্ধ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশ করেন। নূতন পাঠোদ্ধারান্তে উক্ত প্রবন্ধ সংশোধিত করিয়া পুনরায় 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। স্যর যদুনাথের উপদেশানুযায়ী এবং 'শনিবারের চিঠি'র সদয় অনুমতি লাভান্তে উক্ত সংশোধিত প্রবন্ধ এবং পরবর্তী দুইটি প্রবন্ধ পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল। —শি মি]

হস্তলিপি আছে, যাহার দ্বিতীয় পুঁথী পৃথিবীর অন্য কোথায়ও নাই। ইহার নাম বহারি-স্তান-ই-ঘাইবী ; রচয়িতার নাম আলাউদ্দীন ইস্‌ফাহানী শিতাব খাঁ (ছদ্মনাম ঘাইবী, ডাকনাম মির্জা নথন্)। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫৬, প্রতি পৃষ্ঠায় ২০ লাইন। ইহার একমাত্র বিষয় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬২৪ পর্যন্ত বাঙ্গলার অতি বিস্তৃত ইতিহাস। ইতিহাস বলিতে অবশ্য বুঝায় শুধু সুবাদারের দরবারের ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি, ওম্‌রাগণের কার্যকলাপ, এবং বাদশাহের সভার সংবাদ। দেশের কথা, প্রজার অবস্থা, ইচ্ছা করিয়া বর্ণিত হয় নাই ; তবে স্থানে স্থানে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

এই পুঁথীখানি গ্রন্থকারের স্বহস্তে অথবা জবানীতে লিখিত, কারণ দুই পাশে সমালোচনা ও টিপ্পনী আছে, এবং মোহরগুলি হইতে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অধিকারীগণের নাম পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম যাঁহাকে গ্রন্থকার পুঁথীখানি উপহার দেন তাঁহার নামও আছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের পক্ষে ইহা অমূল্য। আমি ইহার ফটো আনিয়াছি। গৌহাটী হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ, অধ্যাপক Borah কৃত, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, দুই খণ্ডে।

এই ফার্সী গ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারদের সহিত মুঘলরাজের সংঘর্ষের এবং আমাদের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ের' বিস্তৃত, সঠিক ও প্রাচীনতম সমসাময়িক বিবরণ আছে—অবশ্য বিজেতার পক্ষ হইতে লেখা। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে নূতন সংবাদ পাওয়া যায় তাহা নীচে ফারসী হইতে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

২ প্রতাপাদিত্যের সহিত বিবাদ

এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর নাই। তাঁহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা, বিশহাজার পাইক এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে। (আবদুল লতীফের ভ্রমণ)।

প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী ঐ রাজার কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া [রাজমহলে] নবাব ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে)। কিছুদিন পরে বালককে বাড়িতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

যখন ইস্‌লাম খাঁ নৌযানে চড়িয়া রাজমহল হইতে গোয়াশ এবং গোয়াশ

হইতে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শাহপুর থানার সামনে আত্রেয়ী নদীর পারে পৌঁছিলেন, তখন শেখ বদীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্য আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। [এই সাক্ষাতের স্থান বজ্রপুর, নাটোর শহর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে।] প্রতাপ ৬টা হাতী, নানা মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপঢৌকন দিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৬০৯। (আবদুল লতীফের ভ্রমণ)।

ইস্‌লাম খাঁ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট কথাবার্তা করিতে থাকিলেন। তাহাব পর এই শর্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন যে, দেশে ফিরিয়া তাঁহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন, এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটী প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদ্‌শাহী সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ষা শেষে স্বয়ং আরও এক শত নৌকা (একুনে পাঁচ শত), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দলখাঁ নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটীর জমিদার মুসা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন ; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অতএব ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপের পূর্ব সম্পত্তি বহাল রাখিয়া তাঁহাকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুর ইনাম দান করিলেন। (এ দুটি পরগণা তখনও জয় করা হয় নাই! প্রতাপ এবং বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার ইহা একটি মহা সুযোগ, **divide and rule**।) সুবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে খেলাৎ, রত্ন-খচিত ছোরা, তিনটি হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদ্‌শাহের পক্ষ হইতে নক্কাড়া উপহার দিলেন।

তাহার পর ভাটীর মুসা খাঁ ও বারো ভুঁইয়ারা বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল ; উস্‌মান পরাস্ত হইয়া বকাইনগর দুর্গ ছাড়িয়া শ্রীহট্টের জঙ্গলে পলাইয়া গেল। ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ তো আগেই মুঘল পক্ষে আসিয়া জুটিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই, এই সব যুদ্ধে সুবাদারকে সাহায্য করেন নাই। [তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে বারো ভুঁইয়া ও উস্‌মানকে জয় করিবার পর মুঘল সৈন্য তাঁহার উপর পড়িবে, সুতরাং উহাদের ধ্বংসে

সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা হইবে।] ইস্‌লাম খাঁর এই-সব বিজয়ের পর প্রতাপের চৈতন্য হইল। তিনি পূর্ব অপকর্মের জন্য অনুতাপ করিয়া নিজ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে ৮০খানা রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং ক্ষমা চাহিলেন। ইস্‌লাম খাঁ রাগে আজ্ঞা দিলেন যে, মীর ইমারত (গৃহনির্মাণের অধ্যক্ষ) ওই ৮০খানা নৌকায় কাঠ, খড়, ইঁট, পাথর বহিয়া বহিয়া ওইগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলুক। তাহার পর ইনাএৎ খাঁর অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল, অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক্‌-আন্দাজ, ৩০০ রণপোত এবং অনেকগুলি তোপ দিয়া তাঁহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিতে পাঠাইলেন। মুসা খাঁ ও অন্যান্য বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্য সহ বাদ্‌শাহী অভিযানে যোগ দিল। ঠিক সেই সময়ে অপর একদল বাদ্‌শাহী সৈন্য বগ্‌লার জমিদার (কন্দর্পের পুত্র) রামচন্দ্রকে জয় করিবার জন্য সৈয়দ হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। আর ২০০০ বর্ক্‌-আন্দাজ ও ৪০০ নৌকা অনেকগুলি ওম্‌রা সহ উস্‌মান খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য 'বার সিন্দুর' নামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান। ইস্‌লাম খাঁ স্বয়ং ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকা গেলেন।

৩ যশোহর অভিযান

প্রথমে ইনাএৎ খাঁ কুচ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার কিছুদিন পরে মির্জা নথন্ [অর্থাৎ এই ফারসী গ্রন্থের লেখক] তোপ লইয়া পিছু পিছু রওনা হইলেন। মির্জা ভাতুড়িয়া-বাজূ পর্‌গনার চীলা-জোয়ার নামক স্থানে পৌছিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিতে চাহিলেন। উক্ত জোয়ারের জমিদার পীতাম্বর ও অনন্ত বিদ্রোহী হইয়া মুঘল শিকৃদারগণকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। এখন বাদ্‌শাহী সৈন্য নিকটে আসায় তাহারা ভয়ে পলাইয়া আলাইপুরের জমিদার বর্‌খুর্দারের পুত্র আলাবখ্‌শের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। মির্জা নথন্ তখন সৈন্য লইয়া গিয়া আলাবখ্‌শের দুর্গগুলি দখল করিলেন।

এদিকে ইনাএৎ খাঁ মহদপুর বাঘোয়ান্[১] পৌছিয়া দেরি করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ তখনও তাঁহার অধীনস্থ কয়েকজন ওম্‌রা আসিয়া যোগদান

---

১ বর্তমান কৃষ্ণনগর শহরের ২০ মাইল উত্তরে, ভৈরব নদীর তীরে বাঘোয়ান বলিয়া একটি স্থান আছে। মহদপুর কৃষ্ণনগরের ৬ মাইল উত্তরে Mohatpur। (রেনেল ১ নং ম্যাপ।)

করেন নাই। তাঁহার প্রেরিত একদল সৈন্য—১৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক—গিয়া বাঘা[১] গ্রাম লুট করিয়া পুড়াইয়া দিল এবং তথায় দুর্গ নির্মাণ করিয়া থানা স্থাপন করিল। এখানে ৪০০ অশ্বারোহী রহিল। বিজয়ী মুঘল সেনাপতি এই স্থান হইতে অনেকগুলি সুন্দরী স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়া বাঁদীতে পরিণত করিল।

মহদপুর বাঘোয়ানে মির্জা নথন্ তোপ ও নৌকা সহ আসিয়া ইনাএৎ খাঁর সহিত যোগ দিলেন। তাহার পর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দিকে সকলে অগ্রসর হইলেন। আর পথে শিকার চলিতে লাগিল। [মুঘলেরা ভৈরব হইতে ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া ক্রমাগত দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে যাইতে লাগিল।]

মুঘল সৈন্য যশোহর-রাজ্যের সীমানায় পৌছিয়া দেখিল যে প্রতাপাদিত্য সালকা[২] নামক স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়-আদিত্যকে খোজা কমলের অধীনে ৫০০ রণপোত এবং কৎলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁর অধীনে এক হাজার অশ্বারোহী ও ৪০টা হাতী দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। এখানে উদয় একটি উঁচু দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে জল দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল;—এক পাশে নদী, অপর পাশে একটি নালা, আর দুই পাশে গভীর পরিখা কাটিয়া তাহা ওই নদী ও খালের সঙ্গে যোগ করিয়া জলে পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রতাপের সৈন্য দুর্গে ও নৌকাগুলি নদীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

৪ প্রথম যুদ্ধ

এইরূপ স্থির হইল যে, মুঘল সৈন্য নদীর দুই পাড় দিয়া কুচ করিয়া শত্রুদুর্গের দিকে অগ্রসর হইবে, মধ্যে নদী বহিয়া নওয়ারা চলিবে, এবং তীরের বন্দুক ও তোপ হইতে সাহায্য পাইবে। প্রথম দল এই পাড়ে প্রধান সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর অধীনে রহিল। দ্বিতীয় দল মির্জা নথনের অধীনে রাতারাতি অপর পাড়ে (অর্থাৎ দুর্গের দিকে) পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের সহিত—

১ বাঘা একটি স্নিগ্ধ সমৃদ্ধ মুসলমান কেন্দ্র ছিল। (১৩২৬ আশ্বিনের 'প্রবাসী' দেখুন।)

২ বাঘোয়ানের ১৭ মাইল পূর্বে সোলোগা নামক একটি স্থান আছে। ফার্সী পুঁথীর এক স্থানে নামটা 'সোলকপা' পড়া যাইতে পারে; কিন্তু বিখ্যাত 'শোলকুপা' এই স্থান হওয়া সম্ভব নহে। যশোহর জেলার মধ্যভাগে 'সালকিয়া' আছে, কিন্তু তাহা মুঘলদের পথের অনেকটা পূর্বদিকে পড়ে।

অর্থাৎ তাহার নিকটবর্তী পাড় ঘেঁষিয়া—নওয়ারার এক এক অংশও চলিতে থাকিবে।

পরদিন কুচ আরম্ভ হইল। কিন্তু উদয়-আদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন না। মুঘল সেনাপতিদ্বয় প্রত্যেকে দশখানা নৌকা পাহারার জন্যে অগ্রে রাখিয়া, অপর নৌকাগুলির মাল্লাদিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহারা নামিয়া শত্রুদুর্গের পাশে দুটি দুর্গ নির্মাণ করুক।

এই কাজ অর্ধেক হইয়াছে এমন সময় উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আক্রমণ করিলেন। খোজা কমল তাঁহার অগ্রবর্তী বিভাগের সেনাপতি, এবং ওই খোজার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোসা, ভলিয়া, পাল, ঘুরাব্ (floating battery, gun-boat), মাচোয়া, পশ্‌তা ও জলিয়া (galliot) জাতীয় নৌকা ছিল। অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে চলিল। জমাল খাঁ পদাতিক ও হাতী লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে থাকিল। মহাশব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপর মুঘল নৌকাগুলি সাজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধ্যে সমস্ত শত্রু-আক্রমণের চাপ ওই বিশখানি বাদ্‌শাহী নৌকার উপর পড়িল, কিন্তু তাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুঝিল, মুখ ফিরাইল না।

খোজা কমলের ঘুরাব্‌গুলি এবং ২ খানা 'পিয়ারা' নৌকা মিলিয়া দশখানা বাদ্‌শাহী নৌকাকে ঘিরিয়া ইনাএৎ খাঁর দিকে যে দুর্গ তৈয়ারি হইতেছিল তাহার পাড়ের নীচে তাড়াইয়া লইয়া গেল। তীরস্থ মুঘল সৈন্য ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শত্রুকে দুর্বল করিয়া একখানা ঘুরাব্ ও একখানা 'পিয়ারা' কাড়িয়া লইল।

যুবরাজের সৈন্য ও মাল্লাগণ নিজ ঘুরাব্‌গুলি নঙ্গর করিয়াছিল; এজন্য তাহাদের লইয়া পলাইতে পারিল না। এখন মুঘল তীরন্দাজগণের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল। (অর্থাৎ এই জলযুদ্ধ স্থলসৈন্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হইল।)

নদীর অপর পাশে মির্জা নথনের দশখানি অগ্রগামী নৌকাও শত্রুরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু তীর হইতে মির্জা, লক্ষ্মী রাজপুত, শাহ বেগ এবং অপর নেতারা নিজ নিজ অনুচর সহ তীর চালাইয়া শত্রু মাল্লাদিগকে বাধা দিতে এবং পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অগ্রসর হইয়া মির্জা নথন্ এরূপ স্থলে আসিয়া পৌছিলেন যে

খোজা কমলের নৌ-বল তাঁহার পিছনে এবং উদয়াদিত্যের নৌ-বল তাঁহার অগ্রে এবং পাশে রহিল; স্থতরাং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়ারা বিশৃঙ্খল এবং মাল্লাগণ হতভম্ব হইয়া পড়িল।

[অর্থাৎ সালামিসের যুদ্ধে পারসীক নৌ-বলের মত যশোহরের নৌবাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই তাহার বিশৃঙ্খলা এবং পরাজয়ের কারণ হইল। দ্বিতীয়ত, এই ছোট নদীর মধ্যে নৌকাগুলির লোক তীরবর্তী সবল দ্রুতগামী ও স্থলযুদ্ধে পরিপক্ক মুঘল সৈন্যের তীর ও বন্দুকের আক্রমণ নানা দিক হইতে পাইয়া একেবারে অসহায় ভাবে হতাহত হইতে লাগিল। তীরভূমি উঁচু, সেখান হইতে দু পাশ দিয়া যে তীর ও গুলি আসিতে লাগিল, তাহা হইতে যশোহরের মাল্লা ও সৈন্যগণের না ছিল রক্ষার স্থান, না ছিল পলাইবার পথ। অর্থাৎ স্থলসৈন্য জলসৈন্যকে পরাজিত করিল। মির্জা নথন্ তীর বহিয়া দ্রুত অগ্রসর হওয়ায় নদীস্থ যশোহরের নৌকার লম্বা শ্রেণী মাঝে কাটা পড়িল; পশ্চাৎও বন্ধ, শুধু সর্ব-সম্মুখের কয়েকখানি নৌকার পলাইবার পথ খোলা রহিল। অপর সব নৌকা এত ভিড় করিল যে তাহাদের গতিরোধ হইয়া গেল, এবং তীর হইতে মুঘল সৈন্যগণ তাহাদের উপর অব্যর্থ সন্ধান করিতে লাগিল।]

যখন উদয়াদিত্যের নৌবাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শত্রুকে আক্রমণ করিবার এমন কি আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের গুলিতে খোজা মারা গেল। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস কাহারও রহিল না। জমাল খাঁ তীর হইতে নিকটবর্তী মুঘলদের উপর তীর ও কামান চালাইতে লাগিল বটে, কিন্তু উদয় পলাইল।

৫ উদয়াদিত্যের পলায়ন

শত্রু-নৌবলের পরাজয়ের পর সমস্ত বাদশাহী এবং বাধ্য জমিদারদের নওয়ারা যশোহর নওয়ারা লুট করিতে লাগিয়া গেল। আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই; সেনাপতির কথা কেহ শুনে না।

শুধু চারিখানি কোসা ও দুখানি অপর জাতীয় নৌকা উদয়ের পিছনে তাড়া করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল এমন একখানা 'পিয়ারা' নৌকা, চারিখানা ঘুরাব্ এবং ফিরিঙ্গী-পূর্ণ একখানা মাচোয়া,—এই ছয়খানি নৌকা প্রভুভক্তি দেখাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং বাদশাহী নৌকার পথ

বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে কিছু সময় পাওয়া গেল। পরে যখন পাড় দিয়া মির্জা নথন্ ও অন্যান্য সৈন্য নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং এই শত্রু-নৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া পরাস্ত করিল, তখন বাদ্‌শাহী পশ্চাদ্ধাবনকারী নৌকার মধ্যে চারিখানি উহাদের লুট করিতে ব্যস্ত হইল। দুইখানি মাত্র কোসা—(মির্জা নথনের নিজস্ব নৌকা, তাহার একখানিতে মহমুদ খাঁ পানী, অপরখানিতে মির মুহম্মদ লোদী মির-বহর নেতা)—মির্জাকে দেখিয়া লজ্জারখাতিরে উদয়ের নৌকার পিছু পিছু চলিতে লাগিল। নদীকূল দিয়া মির্জা ও তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য উদয়কে ধরিবার আশায় দৌড়াইতে লাগিলেন। শত্রু-নৌকা সকলও পিছনে গুলি চালাইতে চালাইতে পলাইতে লাগিল।

ক্রমে তাহারা নদীর এক অতি সংকীর্ণ অংশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সামনে নৌকার ভিড়ে পথ বন্ধ। মুঘল কোসা দুখানি উদয়াদিত্য যে 'মহলগিরি'[১] শ্রেণীর নৌকায় চড়িয়াছিলেন, তাহার দুপাশে আসিয়া পৌঁছিল। তীরে মির্জা আসিলেই উদয় বন্দী হন আর কি।

এ মহাবিপদে উদয়ের অগ্রবর্তী দ্রুত পলায়মান কোসার মাল্লারা পলায়ন বন্ধ করিয়া দাঁড় ছাড়িয়া বৈঠা হাতে লইয়া কোসাকে দ্রুত পিছাইয়া আনিয়া উহার পশ্চাৎভাগ উদয়ের মহলগিরির সামনের গলুই-এর সঙ্গে ভিড়াইয়া দিল। এ সময় মির্জার কোসা দুটির মাথা উদয়ের মহলগিরির হাল ছুঁইয়াছিল এবং মুঘলেরা ওই মহলগিরিতে চড়িতে চেষ্টা করিতেছিল এবং উহার মাল্লা ও সৈন্যগণ কেহ তীরে কেহ জলে লাফাইয়া পড়িল। মহা সঙ্কট! এইবার উদয়াদিত্যের রক্ষা নাই।

কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে উদয় দুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া মহলগিরি হইতে নিজ কোসার উপর লাফাইয়া পড়িলেন, আর তৎক্ষণাৎ প্রভুভক্ত কোসার মাল্লাগণ প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া এই নৌকাকে অপর সমস্ত পলাতক নৌকার আগে পৌঁছাইয়া দিয়া বায়ুবেগে চলিতে লাগিল। যুবরাজের সম্পত্তি-ভরা 'মহল-গিরি' লুট করিবার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারিল না, মুঘল কোসা সেখানেই থামিয়া গেল। উদয় বাঁচিলেন।

১ যে নৌকায় 'মহল' অর্থাৎ রাণীরা চড়েন। আবৃত বড় নৌকা।

মির্জা নথন্ দুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে পাড় বহিয়া আরও কিছু দূর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাঁহার কোসা নাই, কোনই ফল হইল না।

যশোহরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২খানি নৌকামাত্র পলাইয়া গেল, অপর সবগুলি (তোপ সহ) ধরা পড়িল।

উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমাল খাঁ হাতীগুলি সঙ্গে লইয়া দুর্গ হইতে পলাইয়া গেল। মির্জা নথন্ পরিখা পার হইয়া দুর্গে ঢুকিয়া বিজয়ের ভেরী বাজাইলেন। মুঘলগণ সেখানেই রাত কাটাইল।

৬ মুঘলদের কার্যকলাপ

যুদ্ধের পরদিন ইনাএৎ খাঁ কুচ করিয়া বুঢ়ন্[১] দুর্গে পৌছাইয়া থামিলেন। মির্জা নথন্ রণশ্রমের জন্য নৌকায়ই শুইয়া রহিলেন। এই অবসরে তাঁহার স্থলসৈন্যগণ বুঢ়নে গিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চারি হাজার কৃষক-স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের দাসী করিল।

মির্জা সেখানে পৌছিয়া এ কথা জানিতে পারিয়া এই হতভাগিনীদিগকে নিজ সেনানিবাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মুক্তি দিলেন, এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রের সাহায্য করিয়া নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে সৈয়দ হকিম কন্দর্পপুত্র রামচন্দ্র[২] রাজার দেশ বগলা আক্রমণ করিয়াছিল। তাঁহার সীমান্তের দুর্গ মুঘলেরা জয় করিয়া যখন দেশমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা পুত্রকে বলিলেন, 'যদি তুই সন্ধি না করিস, আমি বিষ খাইয়া মরিব।' তখন রামচন্দ্র মুঘল সেনানীর সহিত দেখা করিয়া বশ্যতা

১ ইহা 'বুঢ়ান' হইবে। 'এখনও সাতক্ষীরা শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে যমুনা ইচ্ছামতী হইতে কপোতাক্ষী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড বুঢ়ান পরগণা।' (সতীশ মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃ [৩য় সং, ১৪৩ পৃ—শি মি]।) এই দুর্গ সাতক্ষীরা সব্ডিভিসনের পশ্চিম প্রান্তে ইচ্ছামতী নদীর তীরে ছিল, রেনেল ১ নং ম্যাপে Burronhutty আছে. কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের ৩৮ মাইল পূর্বে স্থিত। ইহার পূর্ব দিক দিয়া ইচ্ছামতী প্রবাহিত, নিকটে মোত্তারপুর, টাকী প্রভৃতি স্থান। এই বুঢ়ন-হাটীর একটু দক্ষিণে ইচ্ছামতী তিন চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং এটা যুদ্ধের পক্ষে কাজের স্থান (strategic point)।

২ ইনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা, রাজধানী মাধবপাশায়। (সতীশ মিত্রের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৪২ পৃ [২য় সং, ৪৪ ও ৩২১ পৃ—শি মি]।)

স্বীকার করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ এই জয়সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্রকে ঢাকা লইয়া গিয়া নজরবন্দ করিয়া রাখিলেন এবং সৈয়দ হকিমকে হুকুম দিলেন যে, দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনাএৎ খাঁর সাহায্য করুক। শত্রুজিৎ[১] রামচন্দ্রকে ঢাকা পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া যশোহর-অভিযানে যোগ দিলেন।

৭ দ্বিতীয় যুদ্ধ

জ্যেষ্ঠপুত্রের পরাজয়ে এবং দুই দিক হইতে দুই মুঘল সৈন্য কর্তৃক নিজদেশ আক্রমণের সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্য মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার নৌ-বল অর্দ্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। তিনি ঠিক কবিলেন যে, মুঘল সেনানীকে মিথ্যা সন্ধির কথাবার্তায় ভুলাইয়া কিছু সময় লাভ করিয়া যশোহর হইতে দূরে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে আশ্রয় লইবেন। যশোহরের নদী হইতে একটি খাল দিয়া বাহির হইয়া তিনি বুঢ়নে পৌছিলেন এবং মির্জা নথনের কাছে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন, 'আপনার পিতা (ইহ্‌তমাম খাঁ) আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন; আপনি আমার ভাই। অতএব আমার মধ্যস্থ হইয়া আমাকে ইনাএৎ খাঁর নিকট লইয়া যান।' এই সংবাদ পাইয়া ইনাএৎ খাঁ নিজ দূত পাঠাইয়া উত্তর দিলেন, 'যদি তোমার সত্য সত্যই এইরূপ মনের ইচ্ছা হয়, তবে কল্যই আসিয়া আমার সহিত দেখা কর। নচেৎ পরশু দিন আমি কুচ আরম্ভ করিয়া যশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি হইব। সেখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।'

পরদিন খাঁর দূত ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, প্রতাপের কথা মিথ্যা ও তাঁহার অভিসন্ধি কপটতা মাত্র। অতএব তৃতীয় দিবসে মুঘল সৈন্য অগ্রসর হইল এবং তাহার তিন দিন পরে খরাওন্‌ঘাট পৌছিল।

প্রতাপের দুর্গের এক পাশ দিয়া কাগরঘাটা[২] খাল এবং অপর পাশ দিয়া ভাগীরথী নদী বহিতেছিল। নদীতে তাঁহার অসংখ্য নৌকা; দুর্গমধ্যে হাতী,

১ এই শত্রুজিৎ কি যশোহরের শত্রুজিৎ-নগরের প্রতিষ্ঠাতা? (Westland, map.)

২ রেনেলের ১ নং ম্যাপে Cogregot এবং ২০ নং ম্যাপে Cogreeghat; যশোহর জেলার মির্জানগর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে। ইহার নিকটে নদী তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; একটি দিয়া উত্তর-পূর্বে প্রতাপনগর ও গড়কমলপুর যাওয়া যায়; অপরটি দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপের রাজধানী 'প্রাচীন দুর্গ' ও ধুমঘাট অতি নিকট। আর, মধ্যে কদমতলীর প্রবাহ।

পদাতিক সৈন্য ও বড় বড় তোপ। এই সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইয়া তিনি শত্রুর অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ইনাএৎ খাঁ নদীর বাম পাড়ে রহিলেন, আর মির্জা নথন্ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপতন অগ্রাহ্য করিয়া নদী পার হইয়া দক্ষিণ কূলে পৌছিলেন। পরদিন প্রাতে দুই দল শত্রু দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল, মধ্যে বাদ্শাহী নওয়ারা চলিতে লাগিল। ভাগীরথীর যে শাখা যশোহরের পাশ দিয়া যায় তাহার মোহানায় প্রতাপের নৌ-বল খাড়া ছিল, তাহারা বাদ্শাহী নওয়ারা এবং ডাঙ্গার সৈন্যদলের গোলাগুলি সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। বাদ্শাহী নওয়ারা মোহানা পর্যন্ত পৌছিয়া আর আগাইতে পারিল না, কারণ দুর্গ হইতে অজস্র অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল। বাম দিকে, নদী সম্মুখে পড়ায় ইনায়েৎ খাঁ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না ; কিন্তু মির্জা নথন্, লক্ষ্মী রাজপুত এবং অন্যান্য সেনানী দক্ষিণ পাড় বহিয়া কাগরঘাটার খালের ধার পর্যন্ত পৌছিয়া ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে শুধু ৪০ জন অশ্বারোহী এবং দশটি হাতী। দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, অনেক মুঘল সৈন্য মরিল। কিন্তু মির্জা নথন্ জনকতক অতি সাহসী ও ভক্ত অনুচর সহ হাতীকে খালের মধ্যে নামাইয়া দিলেন। দুর্গরক্ষকগণ তাঁহার দিকে কামান ফিরাইল, আর সেই অবসরে, মির্জা সহনের (*sic*, নথন্ হইবে—শি মি) পূর্ব আদেশ মত, বাদ্শাহী নওয়ারাও অবাধে বা অল্প বাধায় জোর করিয়া মোহানা পার হইয়া নদীতে ঢুকিল এবং দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। শত্রুপক্ষ দুই দিকে মন দিতে পারিল না। প্রতাপের নওয়ারাও বাদ্শাহী নৌকাগুলির কাছে পরাস্ত হইল, এবং মির্জা নথন্‌ও খাল পার হইয়া শক্ত জমিতে পৌছিয়া হাতী ছুটাইয়া দুর্গদ্বারের দিকে গেলেন। বাদ্শাহী নৌ-বলের মধ্যভাগও সেখানে আসিয়া পৌছিল। মহাযুদ্ধ চলিল ; হতাহতে স্তূপ গঠিত হইতে লাগিল।

অবশেষে প্রতাপ রণভঙ্গ দিয়া পলাইলেন। মির্জা নথন্ দুর্গ জয় করিয়া নাকাড়া ও ভেরী বাজাইলেন।

৮ প্রতাপাদিত্যের শেষ দশা

· যশোহরে পৌছিয়া পরাজিত পিতাপুত্র মিলিত হইলেন। দুঃসময় বুঝিয়া জমাল খাঁ প্রতাপকে ছাড়িয়া কাগরঘাটায় মুঘলদলে যোগ দিলেন ; এদিকে

বগলা হইতে অপর মুঘল সৈন্যদলও কাছে আসিয়া পৌছিল। তখন প্রতাপ আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিলেন, নচেৎ বৃথা সৈন্যবধ হইবে এবং সমস্ত রাজ্য লুট, হত্যা এবং অত্যাচারে ছারখার হইবে।

যেদিন বাদ্‌শাহী সৈন্য কাগরঘাটায় প্রথম শিবির করিল, প্রতাপ একা একখানি কোসায় চড়িয়া তথায় পৌছিলেন, সঙ্গে দুই জন মন্ত্রী। তিনি বিনীতভাবে ইনাএৎ খাঁর তাম্বুর বাহিরে দাঁড়াইয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। খাঁ তাঁহাকে মান্য করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা করিলেন।

স্থির হইল যে, বাদশাহী সৈন্য কাগরঘাটায় থাকিবে, এবং ইনাএৎ প্রতাপকে ঢাকায় সুবাদারের নিকট লইয়া যাইবেন, পরে তাঁহার যেরূপ আজ্ঞা তাহাই করা যাইবে। চতুর্থ দিবসে ৪০খানা নৌকা লইয়া ইনাএৎ ও প্রতাপ ঢাকা রওনা হইলেন। মুঘল সেনাপতিগণ কাগরঘাটায় সুন্দর সুন্দর কাঁচা ঘর (বাঙ্গলা) নির্ম্মাণ করিয়া কয়েক মাস বাস করিতে লাগিল। এক-একখানার খরচ দেড় হাজার টাকা। বাঙ্কুড়া[১] গ্রামে প্রতাপের ব্রাহ্মণ কটকী (দূত) বা মন্ত্রগুরুর অতি মনোরম বাঙ্গলা ছিল।

ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং যশোহর প্রদেশ বাদ্‌শাহী রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইনাএৎ খাঁ ইহার প্রথম শাসনকর্তা হইলেন, এবং বাদ্‌শাহী দেওয়ান পাঠাইয়া অনুসন্ধান করা হইল যে, প্রজাদের কষ্ট না দিয়া যশোহর হইতে কত খাজনা আদায় করা যাইতে পারে।

[প্রতাপকে কি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ? অসম্ভব নয়, কারণ ঠিক এই সময় ঢাকা দুর্গের দুইজন বন্দী পাঠান জমিদার রক্ষীকে ধুতুরা-মিশ্রিত রুটি ও হালুয়া খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া, কারাদ্বার খুলিয়া রাত্রে বাহির হইয়া, নদীতে প্রস্তুত নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া যায়। তাহার পর ইস্‌লাম খাঁ নিশ্চয়ই কারাগারের বন্ধন কঠিনতর করেন।

১ 'কালীগঞ্জের নিকট, কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে, বাঁকড়া নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বাঁকড়ার পূর্বপারে ডামরেলীর বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির দণ্ডায়মান আছে।' (সতীশ মিত্র, ইতিহাস, ৭০ ও ৭১ পৃ [১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৭৫ পৃ—শি মি]।)

মির্জানগরের ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে, কপোতাক্ষীর পশ্চিম পারে স্থিত বাঁকড়া গ্রাম (Rennell, map) এ স্থান নহে।

এইসব ঘটনার চারি বৎসর পরে ইস্‌লাম খাঁর পুত্র হুশঙ্গ পরাজিত আফ্‌গান (উস্‌মান খাঁ), বঙ্গীয় জমিদারগণ ও মগরাজা হইতে গৃহীত মূল্যবান লুটের সামগ্রী, হাতী এবং কয়েকজন মগ সঙ্গে লইয়া আগ্রা গিয়া (১৬১৩ মার্চ মাসে) পিতার এইসব বিজয় উপঢৌকন বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে স্থাপন করেন। প্রতাপ তাহাদের মধ্যে ছিলেন না (ইকবলনামা, ৬৯ পৃ)। সুতরাং তিনি আগ্রার পথে বন্দী দশায় কাশীতে পৌছিয়া যে মারা যান, এ প্রবাদ সত্য হইতেও পারে। বাঙ্গলায় তাঁহার স্থান ছিল না।][1]

৯ প্রতাপাদিত্য কি হত্যাকারী ?

জেস্যুইট্ পাদ্‌রীগণের বিবরণ অবলম্বনে লিখিত দ্যু জারিকের ইতিহাসে লেখা আছে যে, ফিরিঙ্গী নৌ-সেনাপতি ডোমিঙ্গো কার্ভালোকে চণ্ডিকানের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। বেভ্‌রিজ সাহেব তাঁহার বাখরগঞ্জ গ্রন্থে বলেন যে, এই রাজা প্রতাপাদিত্য। কিন্তু বহারিস্তানের পুঁথীর ১৬৮ খ পৃষ্ঠা স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে, এই অপবাদ মিথ্যা। ওই স্থলে লেখা আছে যে, ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাসিম খাঁর সুবাদারির প্রায় শেষাংশে মুঘলেরা যখন চাটগাঁয়ের মগরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভালুয়া হইতে অগ্রসর হয়, তখন ওই মগরাজা সমস্ত ফিরিঙ্গীদিগকে বন্দী ও হত করিতে চেষ্টা করেন, এবং কাপ্তান ডোর-ম-শ কার্ভালোর অধীনে ফিরিঙ্গীগণ মগপক্ষ ত্যাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডোরমশ শব্দকে[2] ডো-আমোশ পড়া যাইতে পারে, ইহা কি ডোমিঙ্গো (Portuguese, *Domingos*) শব্দের ফার্সী অপভ্রংশ ?

১০ উদয়াদিত্যের কথা

যখন ইনাএৎ খাঁ পরাজিত প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা চলিলেন এবং মুঘল সৈন্য কাগরঘাটায় ছাউনী করিয়া রহিল, সেই সময় উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জন্য মির্জা নথনের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন মির্জা নথন্

১ *Baharistan*, 5a, 9a and b, 49a—57b, 61b.

২ আমার এখন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মনে হইতেছে যে, ডোরমশ শব্দটা Rodrigues শব্দের ভুল।

তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মির্জা মকীকে থলিয়া থলিয়া টাকা মোহর এবং রত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঁঠালের ডালি দিয়াও পুছ না! আমি কি কেহ নই? তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে। সেই দিনই দুপুর রাতে মির্জা সহন্ [*sic*, নথন্ হইবে—শি মি] নিজ সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে এরূপ লুট ও স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম হইতে এ পর্যন্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই। (বহারিস্তান, ৫৭ ক।)

সম্ভবতঃ, এই ভীষণ অত্যাচারের ফলে উদয়াদিত্য নিজের ও প্রজাদিগের প্রাণ ও মান বাঁচাইবার জন্য আবার অস্ত্র ধরিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিতেছেন, 'তৃতীয় দিবসে ইনাএৎ কুচ আরম্ভ করেন। পথে তাঁহাকে কুশলীক্ষেত্রেও মধ্যে দিয়া যাইতে হয়। [প্রতাপের রাজধানী-দুর্গ হইতে ৮।১০ মাইল উত্তরে এবং যমুনা নদীর পূর্ব দিকে কুশলী-ক্ষেত্র।] এ দেশে প্রবাদ আছে যে এই কুশলীক্ষেত্রে মুঘল সৈন্যের সহিত প্রতাপ-পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের কয়েকদিবসব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে উদয়াদিত্য কুশলীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রাজবংশীয় কেহ কেহ উক্ত কুশলীক্ষেত্রে উদয়াদিত্যের নামে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক আছেন।'

এই প্রবন্ধে 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস'-রচয়িতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত টীকা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন :

(১) রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খৃঃ প্রকাশিত) অনেক স্থলে বহারিস্তানের বৃত্তান্তের অনুগামী ; যথা,

"কতক কাল পরে [মান] সিংহ রাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে—আপনে ওজির এছলাম খাঁ চিস্তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গলায় সাজনি করিয়া হেন্দোস্থানের তিন হিসা ফৌজ সাতে লইয়া থানাবথানা মারিপিট করিয়া সর-বসর আসিয়া সালিখার থানায় পৌছিলে রাজার (অর্থাৎ প্রতাপের) প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কমল খোজার মরণের খবর পৌছিয়াছে, ইহাতে রাজা ব্যস্ত ছিলেন। * * *"

"এককালিন সসৈন্য যাইয়া ওজির (অর্থাৎ ইস্‌লাম খাঁর) সহিত দেখা করিলে ওজির তাহাকে সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি তোমার কর্ত্তব্য, লড়াই কি কয়েদ?' রাজা

কহিলেন, 'না আমারা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব।' এই মত তাহাকে পিঞ্জিরায় কয়েদ করিয়া" ইত্যাদি।

(২) ইনাএৎপুর—বর্তমান যশোহর শহর হইতে ৫।৬ মাইল দূরে এই নামের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। উহা নদীর নিকট নহে এবং তথায় মুঘল সৈন্যের যাইবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। সুতরাং উহা সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর নামানুসারে হইতে পারে না। কাকশিয়ালী খালের দক্ষিণে এবং প্রতাপের দুর্গের ৯ মাইল উত্তরে অপর এক ইনাএৎপুর আছে।

(৩) পীতাম্বর—পুঁটিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ভাতুড়িয়ার অধিকাংশ তাঁহার হস্তগত ছিল।

(৪) বাঘাগ্রাম—এই বাঘাগ্রাম বাঘোয়ানের সন্নিকটে নহে। হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর অপর পারে যমুনার মোহানায় একটি দ্বীপ ছিল, উহা এক্ষণে একটি গ্রাম হইয়াছে, এই গ্রামকে বাঘার গ্রাম বা বাঘের গ্রাম বলে। 'নদীয়া-কাহিনী', ৩৫১ পৃ দেখুন। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানই যশোহরের সীমান্ত, এবং প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গঙ্গা হইতে তাহার পথও এই বাঘার পার্শ্ব দিয়া। সুতরাং ইনাএৎ খাঁর সৈন্যদল যে এইরূপ স্থলে পথের মুখে থানা স্থাপন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

[কিন্তু আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনীতে যে বাঘার বর্ণনা আছে তাহা এই হুগলী জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী বাঘের গ্রাম হইতে পারে না।—যদুনাথ সরকার।]

(৫) সাল্‌কা—সালকার স্থান নির্দেশ করা কঠিন। প্রতাপাদিত্যের অধস্তন রাজবংশীয়দিগের বংশগত প্রবাদ হইতে জানা যায়, সালখিয়া নামক স্থানে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে সালখিয়া আছে, সেখানেই প্রতাপের দুর্গ ছিল। অর্থাৎ শত্রু যমুনার মোহানা হইতে দক্ষিণ দিকে আসিলে, প্রথমে জগদ্দল দুর্গ, পরে সালখিয়া দুর্গে তাহাদিগকে বাধা দিত। প্রাচীন ম্যাপে সালখিয়া (Salica বা Salkhia) খুব বড় করিয়া লেখা আছে। কিন্তু মোগল সৈন্য উক্ত সালখিয়ার দিকে গিয়াছিল কি না সন্দেহ হয়।

ইচ্ছামতী-কালিন্দীর মোহানায় দমদমার নিকট শালিখা দুর্গ ছিল, ইহাই আমার নিকট বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধের বর্ণনা হইতেও তাহাই অনুমিত হয়।

(৬) খরাওন ঘাট—যশোহর দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে ইচ্ছামতীর কূলে কোন তাৎকালিক ঘাটের নাম 'খরাওন ঘাট' হইতে পারে , এখন তাহার কোন চিহ্ন বা সে নামে কোন গ্রাম নাই।

(৭) কাগরঘাটা—পুরাতন যশোহর নগরীর পূর্বদিকে ইচ্ছামতী নদীর পরপারে খাগড়াঘাট বলিয়া একটি স্থান আছে। সম্ভবতঃ ঐখানে আসিয়া মোগল সৈন্য নদী পার হইয়া পূর্ব দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। এই খাগড়াঘাটকেই রেনেল সাহেব Cogregot করিয়াছেন। পুরাতন যশোহর দুর্গের পশ্চিমদিকে যমুনাকূলে কুকড়াঘাটা আছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এটি যুদ্ধের স্থান নহে।

(৮) ভাগীরথী—এখানে যশোহর দুর্গের পশ্চিমবাহিনী যমুনা নদীকেই ভাগীরথী বলা

হইয়াছে কারণ উহা ভাগীরথীরই একাংশ। যশোহরের সন্নিকটে যমুনাও তীর্থনদীর মত ব্যবহৃত হয়।

(৯) বাঙ্কুড়া বা বাঁকড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। উহা অনেক দূরে অর্থাৎ কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার উত্তরে বাঙ্গালপাড়া নামক একটি স্থান আছে, সেখানে অনেক বাঙ্গলা গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হয়তঃ মোগল সৈন্য সেইস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বহুদিন বাস করিয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য কটক হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনিয়া যমুনাকূলে গোপালপুরের মন্দিরে স্থাপিত করেন। ওই বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি কটকী ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। তাঁহারা দুধলীর উত্তরাংশে রায়পুরে বাস করিতেছেন। উঁহাদের নিকট চাঁদরায়েব প্রদত্ত ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের একটি সনন্দ আছে।

জয়পুর রাজ্যের আম্বের দুর্গে মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে যে দেবীমূর্তি লইয়া গিয়া স্থাপন করেন তাহার নাম 'শিলাদেবী'—এটি 'যশোরেশ্বরী কালী' নহে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

দুই

প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্রী[১]

১ ভূমিকা

এশিয়া খণ্ডে, বিশেষত চীন ও ভারতবর্ষে, প্রথম প্রথম কাথলিক পাদ্রীগণ তাঁহাদের উপরিতন কর্মচারীদিগকে যে-সব পত্র লিখিতেন তাহা অবলম্বন করিয়া ফাদার পিয়ার্ দ্যু জারিক নামক দক্ষিণ-ফ্রান্সবাসী একজন জেসুইট্ পাদ্রী এশিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখেন। ইহার তৃতীয় খণ্ড ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে বর্দো নগরে প্রকাশিত হয়; নাম *L' Histoire des Choses plus memorables advenues tant ez Indes Orientales &c.* ইহাতে ১৬০০ হইতে ১৬১০ পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৬৮+৪৮।

১ [স্যর যদুনাথ সরকারের এই প্রবন্ধ প্রথমে 'প্রবাসী', ১৩২৮, আষাঢ় সংখ্যায় এবং পুনরায় 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। —শি মি]

এই গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া গেল। অবশ্য প্রতাপাদিত্যের নাম নাই, তাঁহাকে চাঁদেকানের রাজা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু এই রাজা যে প্রতাপ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কারণ বাক্‌লার রাজা [রামচন্দ্র] ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আট বৎসরের শিশু এবং চাঁদেকানের রাজার জামাতা বলিয়া বর্ণিত, এবং বাক্‌লা হইতে চাঁদেকান আসিবার পথের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শেষোক্ত রাজ্য সুন্দরবন ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

গ্রন্থকার বলিতেছেন (৮২৬ পৃ), সমস্ত পাঠান ও দেশের আদিমবাসী বাঙ্গালীগণ বারো ভুঁইয়াদিগকে মানিয়া চলে ; ইহাদের মধ্যে তিন জন হিন্দু, যথা চাঁদেকান, শ্রীপুর এবং বাক্‌লার রাজা, অপর নয় জন মুসলমান। আরাকানের রাজা 'মগ-রাজ' নামে পরিচিত, ইনি ভিন্ন, অপর এক পক্ষ।

ভারতে জেসুইট্ ধর্মসম্প্রদায়ের পরিদর্শক (*Visiteur*) নিকোলস্ পিমেণ্টা ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রঁাসোয়া ফার্নাঁদেজ্ এবং ডোমিনিক্ সোসা নামক দুইজন পাদ্রীকে, এবং তাহার পর-বৎসর মেলকিয়র দি ফন্‌সেকা ও জাঁ আঁদ্রে বুএজ্ নামক অপর দুজন ফাদারকে পাঠাইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, তাহারা প্রথমে [বঙ্গে] যেখানে উপযুক্ত বোধ হয় এরূপ কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিজদিগকে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং দুইজন সেই আড্ডায় স্থায়িভাবে বাস করিবে, আর তখন অপর দুইজন ভ্রমণ করিয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে থাকিবে। [৮২৭ পৃ]।

২ প্রথম পাদ্রীগণের আগমন

২২শে ডিসেম্বর ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ফাদার ফ্রঁাসোয়া ফার্নাঁদেজ চাটগাঁর নিকটবর্তী ডিয়াঙ্গা বন্দর হইতে পরিদর্শককে এই পত্র লেখেন :

চাটগাঁ হইতে শ্রীপুর গিয়া আমি প্রতি রবি ও শুক্রবার ধর্মপ্রচার করিতাম। মে মাসে (১৫৯৯ ?) ফাদার ডোমিনিক্ সোসা হুগলী যাইবার জন্য [আমার সঙ্গ] ছাড়িলেন। * * * অক্টোবর মাসে ফাদার ডোমিনিক আমাকে লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কার্য সম্বন্ধে রাজার সহিত একটা বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্য আমার চাঁদেকান যাওয়া আবশ্যক, কারণ রাজার (মত) পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তাহাই করিলাম। যখন রাজা জানিলেন যে,

আমি পৌঁছিয়াছি, তিনি তাঁহার একজন প্রধান ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার আগমনে তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। পরদিন ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন (*fit beaucoup de caresses*) এবং নিজ পরিত্রাণ (*salut*) সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা কহিলেন। * * * তথা হইতে আমি শ্রীপুরে ফিরিলাম। [৮২৮-৮২৯ পৃ]

৩ পাদ্‌রীগণের দ্বিতীয় আগমন

২০এ জানুয়ারি ১৬০০, ফাদার মেলকিয়র দি ফন্‌সেকা চাঁদেকান হইতে পরিদর্শককে এই পত্র লেখেন :

গত নভেম্বর মাসে চাটগাঁ হইতে রওনা হইয়া, স্থানীয় পোর্তুগীজদের অনুরোধে বাক্‌লা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাজার সহিত দেখা করিলাম এবং তাঁহার রাজ্যে গীর্জা নির্মাণ করিতে, খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে, এবং লোকের স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে অনুমতিসম্বলিত এক ফর্মান তাঁহার নিকট হইতে পাইলাম। [এই ফর্মান ৮৩০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।] তাহার পর বিদায় লইয়া আমি চাঁদেকানের দিকে চলিলাম।

বাক্‌লা হইতে চাঁদেকানের পথের মত সুন্দর ও সুখকর পথ আমি আর কখন দেখি নাই। অনেক বড় এবং মিষ্টজলযুক্ত নদী—যাহাকে এ দেশে গঙ্গা বলে—তাহার মধ্য দিয়া নৌকা করিয়া চলিতে লাগিলাম। তীরগুলি সুন্দর সবুজ গাছে আচ্ছন্ন ; এক পারে হরিণের বড় বড় দল এবং গরুর পাল ঘাস খাইতেছে ; অপর পারে অতি বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। অসংখ্য খাল ; তাহাতে ঢুকিলে দেখা যায় দুদিকে গাছ এমন করিয়া ঢাকিয়াছে যে, সূর্যের আলো মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কোথায়ও বা গাছ হইতে মৌমাছির ঝাঁক ঝুলিতেছে, কোথায়ও বা বাঁদর এক ডাল হইতে অপর ডালে লাফাইতেছে। জমি অনেক স্থলে সুন্দর ও উর্বরা। কোথায়ও বা ইক্ষুদণ্ডের ঝোপ। এই বনে অনেক গণ্ডার ও অন্যান্য বন্য জন্তু থাকে।

২০-এ নভেম্বর ১৫৯৯ চাঁদেকান পৌঁছিলাম এবং ফাদার সোসাকে দর্শন করিয়া পরস্পর অত্যন্ত সুখী হইলাম। স্থানীয় পোর্তুগীজেরাও আমাকে খুব

অভ্যর্থনা করিল। পরদিন আমি রাজাকে সম্মান করিতে গেলাম এবং তাঁহাকে বেরিঙ্গান্ জাতীয় কমলালেবু [*oranges de la race de Beringan*] উপহার দিলাম। এগুলি অতি সুন্দর এবং এ দেশে পাওয়া যায় না। তিনি ইহা পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন।

তিনি আমাদিগকে এত মান্য করিলেন যে, আমাদের দেখিবামাত্র নিজ সিংহাসন [*siege*, চেয়ার] ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া মাথা নত করিলেন [*nous fait une grand reverence*]। ইহার কারণ এই যে, এ দেশের লোকেরা ব্রহ্মচর্যকে [*chastete*] অত্যন্ত ভক্তি করে, এবং আমরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করি শুনিয়া ইনি আমাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চমত পোষণ করিয়াছেন।

আমাদের বাসার কাছে একটা বড় জায়গা আছে। আমারা রাজার কাছে সেটি চাহিলাম, যে, যাহাদিগকে আমরা খৃষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস করাইলে তাহাদিগকে অতি সহজে সাহায্য কবিতে এবং ধর্মপথে রাখিতে পারিব। তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এ সম্বন্ধে একখান ফর্মান শীঘ্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন, এবং আজ্ঞা দিলেন যে, ওই বাড়িতে যে-সব হিন্দু [অর্থাৎ নূতন খৃষ্টানেরা] বাস করিবে তাহারা তাঁহাকে যে [কর] দিত তাহা আমাদিগকে দিবে। পরে আমরা বিদায় লইলাম। * * *

বঙ্গদেশে জেসুইটদের সর্বপ্রথম গীর্জা এইখানে প্রস্তুত হয় এবং ইহাকে যীশুর গীর্জা নাম দেওয়া হইল। * * * পোর্তুগীজদের সাহায্যে এই গীর্জা খুব জাঁকজমক সহকারে সাজানো হইল এবং ১লা জানুয়ারিতে খুব ধুমধামের সহিত উপাসনা করা হইল। চারিদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল। * * * এই গীর্জা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজা সভাসদ্দের এক প্রকাণ্ড দল লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জার সাজসজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। খুব ভক্তির সহিত গীর্জা-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং যখন প্রধান চ্যাপেলটির[১] নিকট আসিলেন, তখন জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জন্য একখান চেয়ার আগে হইতে প্রস্তুত রাখা ছিল। কিন্তু আমরা কিছুতেই তাঁহাকে তাহাতে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি কার্পেটেও নহে। তিনি

১ La maistresse Chappelle, এটা কি Holy of holies ?

শুধু সিঁড়ির উপর একখান ছোট মাদুরে বসিলেন, এবং সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। গীর্জার বেদীর উপর যে-সব দুর্লভ দ্রব্য ছিল এবং অন্যান্য জিনিস যাহা দেখিলেন তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীর্জা নির্মাণ করিতে অনুমতি দিলেন, যাহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে। [এই গীর্জা প্রস্তুত হয় নাই।]

পরদিন রাজপুত্র গীর্জার সাজসজ্জা দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটবর্তী স্থানে যত হিন্দু, ছোট হউক বড় হউক, গীর্জা দেখিয়া গেল, কারণ ইহার জাঁকজমকের খ্যাতি সর্বত্র প্রচার হইয়াছিল। প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হইত। পনের দিনেরও বেশি ধরিয়া এইরূপ হইতে লাগিল। [৮৩২-৮৩৪ পৃ]

৪ যশোর-রাজ-দরবারে পাদ্রীদের প্রতিপত্তি

যীশুর জীবনের একটি ঘটনার তিথিতে ওই গীর্জা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সাজান হইল (১৬০১ খ্রীঃ?), কারণ প্রথম বৎসরে ওই তিথিতেই গীর্জাটি উৎসর্গ করা হয়। রাজার আজ্ঞায় জ্যেষ্ঠ কুমার, যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার এক ছোট ভাই [এ দুজন বোধ হয় উদয়াদিত্য এবং সংগ্রামাদিত্য] গীর্জা দেখিতে আসিলেন। রাজাও নিজে অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ সঙ্গে লইয়া এটি দর্শন করিলেন এবং এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া, পাথরের গীর্জা নির্মাণ করিবার জন্য আমাদের যে অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ফলত রাজা পাদ্রীদের প্রতি এত স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে-কোন প্রার্থনা পূরণে তাঁহার অতিমাত্র সুখ হইবে এরূপ বোধ হইতে লাগিল।

পাদ্রীরা তাঁহার কাছে অন্য কিছুই চাহিল না। শুধু একজন পোর্তুগীজের জালিয়া (*galiot*) নৌকা দেনার জন্য তিনি আটক করিয়াছিলেন, এবং অন্য সভাসদের অনুরোধে তাহা ছাড়িয়া দেন নাই, কিন্তু এখন পাদ্রীদের প্রার্থনায় তাহা মালিককে ফেরত দিলেন। আর রাজার নিকট একজন হিন্দু অনেক টাকা ধারিত, ফাদারদের অনুরোধে রাজা তাহাকেও দেনা হইতে অব্যাহতি দিলেন। [৮৩৫ পৃ]

৫ কার্ভালো-হত্যা (?) ও পাদ্‌রীদের দেশত্যাগ

ইহার পর সোনদ্বীপ লইয়া কি একটা বিষম গোলমাল বাধিল। মগের রাজা এই দ্বীপ অধিকার করিয়া উহাকে দক্ষিণ বঙ্গ বিজয়ের আড্ডা (base of operations) স্বরূপ ব্যবহার করিবার ফন্দী করিলেন। পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা ভাবিল যে, মগদেশে ও বাংলায় রাজার অধীনে বাস করা তাহাদের পক্ষে সব সময় নিরাপদ ও সুবিধাজনক নহে, কিন্তু যদি তাহারা সোনদ্বীপ অধিকার করিয়া তথায় নিজ উপনিবেশ স্থাপন করে তবে স্বাধীন ও নিরাপদ হইবে। আর, মুঘলেরাও বঙ্গ বিজয় করিয়া সোনদ্বীপের উপর হাত দিল।

সোনদ্বীপ শ্রীপুরের সামনাসামনি, এবং বঙ্গদেশ হইতে ৬ লীগ্ অর্থাৎ ১৩॥ ক্রোশ দূরে। ইহার উৎপন্ন লবণে সমস্ত বঙ্গদেশের অভাব পূরণ হইত, এবং রাজার প্রচুর রাজস্ব লাভ হইত। শ্রীপুরের রাজা কেদার রায় ইহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, কিন্তু ইহার পূর্বে অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি উহা ভোগ করেন নাই, কারণ মুঘলেরা এই দ্বীপ জোরে দখল করিয়াছিল। এখন পোর্তুগীজেরা ওই দ্বীপ কাড়িয়া লওয়ায় তিনি তাঁহার সমস্ত স্বত্ব উহাদিগকে দান করিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ডোমিনিক কার্ভালো নামক একজন প্রসিদ্ধ বীর কাপ্তেন, কেদার রায়ের চাকরি করিবার সময় কেদার রায়ের সাহায্যে, ওই দ্বীপ মুঘলদের হাত হইতে দখল করে। তারপর মগরাজা তাহাদিগকে আক্রমণ করায়, যদিও পোর্তুগীজেরা জয়লাভ করে, কিন্তু তাহাদের এত সৈন্য ও নৌকা ধ্বংস হয় যে, তাহারা নিজ হইতেই ওই দ্বীপ ছাড়িয়া দেয়। কার্ভালো জাহাজ মেরামত ও নূতন সৈন্য ভর্তি করিবার জন্য প্রথমে শ্রীপুরে, পরে হুগলী বন্দরে যায়।' [৮৪৭-৮৪৯, ৮৬১ পৃ]

এদিকে মগরাজা সোনদ্বীপ অধিকার করিবার পর বাক্‌লা রাজ্যের কিছু [বোধ হয় বাখরগঞ্জের তীরবর্তী স্থানগুলি] দখল করিয়া, চাঁদেকান রাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। চাঁদেকানের রাজা [অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য] দেখিলেন যে এত প্রবল শত্রুকে তিনি একলা বাধা দিতে পারিবেন না, এবং তজ্জন্য কুটিল নীতি দ্বারা নিজ বন্ধুদের (অর্থাৎ পোর্তুগীজ) ধ্বংস করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার পথ বাহির করিলেন। তিনি জানিতেন যে, আরাকানের রাজা কার্ভালোর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিনি (অর্থাৎ প্রতাপ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং কার্ভালোকে বন্দী করিয়া

তাহার মস্তক পাঠাইয়া মগরাজাকে তুষ্ট করার এবং এই উপায়ে নিজরাজ্য রক্ষা করিবার ফন্দি করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ভালোর নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, তাঁহার নিকট আসিয়া মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিলে তিনি তাহার অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন।

কার্ভালো চাঁদেকানের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিল যে, এইরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞ রাজা তাহাকে সৈন্যবল দিয়া সোনদ্বীপ উদ্ধারে সহায়তা করিবেন। রণসজ্জায় পূর্ণ তিনখান বড় জাহাজ, ছয়খান কাটার এবং ৫০ খান জালিয়া এবং একদল সাহসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া সে চাঁদেকানে আসিল।

রাজা তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া, একটা জরির পোশাক ও বহুমূল্য ঘোড়া উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে মগরাজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য আবশ্যক সব [দ্রব্য, সৈন্য ও নৌকা] দিবেন। কিন্তু ১৫ দিন পর্যন্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে মগরাজের সহিত সন্ধি করিলেন যে, তিনি কার্ভালোর মাথা পাঠাইয়া দিবেন আর মগরাজ চাঁদেকান আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন।

অপর পোর্তুগীজগণ, বিশেষত পাদ্রীগণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া কার্ভালোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিল, যেখান হইতে সে রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে, এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা রাজার সহিত কথা চালাইতে পারিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল জনরব উঠিল যে রাজা কার্ভালোকে হত্যা করিবেন। কিন্তু কার্ভালো এরূপ করিতে সম্মত না হইয়া, নিজের কয়েকজন কাপ্তেনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজাকে দেখিবার জন্য[১] গেল। তথায় তিন দিন পর্যন্ত রাজদর্শনের উপায় হইল না, এবং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল। তিন দিন পরে, রাজার চক্রান্ত কার্যে পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ভালোকে কয়েকজন পোর্তুগীজ সহ রাজবাড়িতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে শেষ দরজা দিয়া ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার অনুবর্তী লোকদিগকে বাহিরে রাখা হইল। তাহাদের বন্দী করিয়া অস্ত্র ও পরিচ্ছদ

১ এখানে মূলগ্রন্থে আছে *a lasor.* ইহার অর্থ কি *a Jasor* (অর্থাৎ যশোহরে) না *a loisor* (অবসরক্রমে) ?

কাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অপমানের সহিত তাহাদের ঘুষি মারিয়া, পায়ে লোহার বেড়ি পরানো হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ভালোকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইল ; সঙ্গে রাজার একজন সেনানী ও চার জন রক্ষী সৈন্য। তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে কার্ভালো ও অপর কয়েকজন পোর্তুগীজকে লইয়া চলিয়া গেল। এই বন্দীগণ মৃত্যুর পূর্বে কি কি [অত্যাচার ও যন্ত্রণা] সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং কতদিন বন্দীভাবে কাটাইয়াছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদের হত্যা করা হয় [*il est asseure qu'ils furent tuez*]। [৮৬৩-৮৬৪ পৃ]

তাহার পর, চাঁদেকানের অপব পোর্তুগীজগণ এই সংবাদ পাইয়া কি প্রতিকার করিবে স্থির করিতে পারিল না ; ভাবিল, রাজা কার্ভালোর উপর চটিয়া আছেন, আমরা তো নির্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না। কিন্তু স্থানীয় পোর্তুগীজ উপনিবেশের [সাধারণ নাম 'বান্দেল্' অর্থাৎ বন্দর] নিকটবাসী মুসলমানগণ ফিরিঙ্গীগণের মহাশত্রু ছিল ; তাহারা ওই সংবাদ আসিবার রাত্রেই পোর্তুগীজদিগের বাড়ি ও সম্পত্তি লুঠ ও দগ্ধ করিতে লাগিল। * * * পরদিন রাজা কার্ভালো এবং অন্যান্য পোর্তুগীজদের জাহাজগুলি অধিকার করিলেন, এবং তাহাদের কারাগারে ফেলিলেন, সেখানে তাহারা অশেষ দারিদ্র্য ও কষ্ট ভোগ করিল। তাহাদের ধরিবার পরই দুজনের মাথা কাটিয়া ফেলা হইল এবং আর দুজনকে বর্শার আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল।

ফাদারদিগকে বন্দী করা হইল না বটে, কিন্তু তাঁহারাও কষ্ট ভোগ করিলেন। রাজা সন্দেহ করিলেন যে, কন্‌ফেশনের সময় তাঁহারা বন্দী পোর্তুগীজদিগকে গোপনে উপদেশ দিতেন যে তাহারা যেন রাজাকে তাহাদের খালাস্ করিবার জন্য অর্থ (ransom) না দেয়। এজন্য গুপ্ত ধন ও অস্ত্র অন্বেষণ করিতে আসিয়া পাদ্রীদের বাড়ি উলট্‌পালট্ করা হইল। অবশেষে রাজা রাগে বলিলেন যে, পাদ্রীরা সকলে [তখন চাঁদেকানে চারজন ফাদার ছিলেন] তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ যেন সেখানে না আসে।

এইরূপে এক মাস কাটিল। অবশেষে বন্দী পোর্তুগীজগণ তিন সহস্র পার্দো

(এগার হাজার টাকা) দণ্ড দিয়া খালাস পাইল। ফাদারেরা একেবারে বাংলা ত্যাগ করিয়া[১] চীন-জাপানে গেলেন, এবং এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রায় লোপ পাইল। [৮৬৫-৮৬৬ পৃ]

শ্রীযদুনাথ সরকার

তিন

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ[২]

১৩২৫ সালে দিল্লীভ্রমণের সময় আমার বন্ধু অধ্যাপক আবদুর্ রহমানের সাহায্যে একখান পুরাতন ফার্সী হস্তলিপি পাই। ইহাতে বঙ্গের নূতন দেওয়ানের অনুচর ও সঙ্গী আবদুল লতীফ্ গুজরাতের আহমদাবাদ শহর হইতে বঙ্গের ঘোড়াঘাট পর্যন্ত নিজ ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন। যতদূর জানা যায় এই পুস্তক পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে, শেখ আলাউদ্দীন চিশ্‌তী, ওরফে ইসলাম খাঁ (আকবরের পীর শেখ সলীম চিশ্‌তীর পৌত্র), বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। আবদুল লতীফ্, আবদুল্লা আব্বাসীর পুত্র ও আহমদাবাদের অধিবাসী। তাঁহার প্রভু আবুল হসন্ (পরে আসফ খাঁ উপাধিতে ভূষিত, এবং শাহজহানের শ্বশুর ও সাম্রাজ্যের উজীর) ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া, আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসেন। লতীফ্ তাঁহার অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন।

নওয়ারায় (বাদশাহী যুদ্ধ-নৌকায়) চড়িয়া আমরা গঙ্গা বহিয়া আকবরনগর (—রাজমহল) হইতে নৌরাঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত গোয়াশ্ পরগণা পর্যন্ত

১ সুতরাং তাঁহারা কার্ভালোর শেষ দশা সম্বন্ধে কোনই সাক্ষ্য দিতে পারেন না।

২ [স্যর যদুনাথ সরকারের এই প্রবন্ধ প্রথমে 'প্রবাসী', ১৩২৬, আশ্বিন সংখ্যায় এবং কিছু সংস্কারান্তে পুনরায় 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। —শি মি]

গেলাম। [মুর্শীদাবাদ ও জলঙ্গী এই দুটি শহরের মাঝামাঝি গোয়াশ্ এক্ষণে পদ্মা হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ প্রকাশিত রেনেলের 'বেঙ্গল অ্যাটলাস্' গ্রন্থের ১০ নং ম্যাপে দেখা যায় যে, গঙ্গার প্রাচীন পথ গোয়াশের অতি অল্প উত্তরে ছিল।] গৌড়, তাঁড়া, মালদা ও পাণ্ডুয়া শহর বামে রহিল ; আমরা তথায় নামিলাম না।

২রা জানুয়ারি ১৬০৯ খৃঃ নবাব ইস্‌লাম খাঁর দূত মির্জা আলীর সহিত উস্‌মান্ আফ্‌ঘানের দূত আসিয়া সুবাদারের সাক্ষাৎ করিল। উস্‌মান্ বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া এবং নিজ ভ্রাতার সহিত বাদশাহের জন্য উপহার পাঠাইবেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

[স্থানীয়] কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির হইল যে, নবাব গোয়াশের কাছে গঙ্গানদীর তীরে নামিবেন এবং তাহার পর হয় ভাটী প্রদেশের দিকে, না হয় উস্‌মান্ আফ্‌ঘানের দেশে যাইবার পথের প্রারম্ভ ঘোড়াঘাটে—মন্ত্রীরা যেদিকে ভাল মনে করেন,—সৈন্য সহ রওনা হইবেন। নদী পার হইবার সময়, মহমুদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভূষণার জমিদার রাজা শত্রুজিৎ ওরফে শাহজাদা রায়ের ভ্রাতা, কয়েকটি হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত দেখা করিলেন, এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিতের দরখাস্তও পেশ করিলেন। এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাঁহার যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে। তাঁহার পুত্র কয়েকটি হাতী ও অন্যান্য উপহার লইয়া রাজমহলে নবাবের সহিত দেখা করিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে অভয়বাণী পাইয়া [দেশে] ফিরিয়া যায়। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, 'আমি কি নিজে আসিব ?'

মুহম্মদ ইয়ার নামক দূত কোঁচ-রাজা মুকুটনারায়ণের পক্ষ হইতে ৩টি হাতী ও ৮০টি টাঙ্গন ঘোড়া উপহার লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত দেখা করিল। এই টাঙ্গনগুলি পার্বত্য টাট্টু, মহিষের মত রঙের, জঙ্গল ও জনহীন স্থানে চরে, কিন্তু বড় শক্ত, পরিশ্রমসহিষ্ণু এবং সুন্দর পথ চলে।

শাহজাদা রায় এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের আগমনের অপেক্ষায় আমরা দুই এক মাস নৌরঙ্গাবাদ জেলার আলাইপুর গ্রামে রহিলাম। [পদ্মার তীরে রাজশাহী জেলার শরদহের অপর পারে আলাইপুর নামক একটি গ্রামে এখন

ষ্টীমার থামে। কিন্তু পদ্মার গতি তিন শত বৎসরে এত বদলাইয়াছে যে ঠিক এইখানে নবাব বাস করিয়াছিলেন অথবা পদ্মার পাড় ভাঙিয়া যাওয়ায় নিকটের কোন গ্রামকে আলাইপুর নাম দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহা বলা কঠিন।]

আলাইপুরের এক যোজন (ফর্‌সখ=৩ মাইল) দূরে দুই গ্রাম আছে,—তাহার একটির নাম বাঘা, ইহা পরগণা চন্দনাবাজুর অন্তর্গত; অপরটির নাম মূল্‌ক [? বা বল্‌ক], আলাইপুর পরগণার অন্তর্গত।[১]

হাওয়াদ্‌হা (?) মিয়াঁ নামক একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ বাঘাতে বাস করিতেছেন। তাঁহার বয়স প্রায় এক শত বৎসর। এই গ্রামের মধ্যে একটি সুমিষ্ট জলের পুষ্করিণী আছে। তাহার চারিপাড়ে ইহার পুত্র ও অনুচরগণ চক্‌বন্দী করিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। ৯৩০ হিজরীতে সুলতান হুসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদ্ এই গ্রামে আছে।[২] হাওয়াদ্‌হা মিয়াঁর বাড়িতে একটি মাদরাসার মত আছে; চালগুলি খড়ের, দেওয়াল মাটি দিয়া লেপা [অর্থাৎ চেরা বাঁশের বা চাটাইয়ের]। তাঁহার অনেক অনুচর (? প্রজা) ও অন্য বিদ্যার্থী এখানে শিক্ষালাভে নিযুক্ত। পুকুরের পাড়ে আম-কাঁঠালের গাছ, সবুজ সজল ও ছায়াপ্রদ। গ্রামের চতুঃপার্শ্বের জমি ইহাকে ব্রহ্মোত্র (মদদ্-ই-মাশ) স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে—সব সবুজ ও মনোরঞ্জক। বঙ্গদেশে এই গ্রাম ভিন্ন

১ বাঘা—এই স্থানটি রাজশাহী জেলার মধ্যভাগের দক্ষিণ সীমায়, সরদহ হইতে সাত মাইল সোজা দক্ষিণে। ১৮৩৬ খ্রীঃ প্রকাশিত এডাম সাহেব-এর *Second Report on Education in Bengal* (pp. 37-42)-তে ইহার মাদ্রাসার বর্ণনা আছে। সে সময়কার মালিক এক বাদশাহী সনদ দেখান, যাহাতে 'মৌলানা…'-কে আট হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের জমি 'মদদ্-ই-মাশ' (লাখরাজ) দেওয়া হইয়াছে (বোধ হয় শাহজহান কর্তৃক); ঐ জমি ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্যন্তও মাদ্রাসার কর্তার দখলে ছিল, এবং ইংরেজ সরকার ঐ স্বত্ব মানিয়া লইয়াছেন। এডাম সাহেবের মন্তব্য—'This institution has no organisation or discipline, and the course of instruction is exceedingly meagre... The students leave [the Madrasa] sooner or later according to their own caprice. Their attendance from day to day is equally uncontrolled and unregulated.'

২ ৯৩০ লিপিকরের ভ্রম; ঠিক তারিখ ৯০৩ অথবা ৯২০ হইবে, কারণ হুসেন শাহের ৯২৫এ মৃত্যু হয়।

এমন একটি স্থান দেখিলাম না, যেখানে ইস্‌লামের গন্ধ নাকে পৌঁছে। আহা! এই নিরাবিলি কোণের অধিবাসীদের কি সুখেই দিন কাটে! ইহারা পৃথিবীর অন্য লোকের খবর রাখে না। আর অন্য কোন লোকও ইহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ করে না। আশা করি সকল পরমসত্যানুসন্ধানীরই কপালে যেন এইরূপ নির্জন আরামের কুঞ্জ জুটে!

আলাইপুরে নবাব বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা ও তোপখানার মহলা (review) দর্শন করিলেন। ২রা মার্চ ১৬০৯ খৃঃ আলাইপুর ছাড়িয়া নাজিরপুরের দিকে কুচ আরম্ভ হইল। পথে ফতেপুরে থামিয়া ইদ্-ই-কুর্বান ও নৌরোজ উৎসব নির্বাহ করা হইল। এখানে ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ আসিয়া দেখা করিলেন; ১৮টা হাতী উপহার দিলেন। আমরা প্রায় এক মাস ফতেপুরে কাটাইলাম।

ফতেপুর হইতে ৩০এ মার্চ কুচ করিয়া রাণা তাণ্ডাপুর পৌঁছিলাম। এখানে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলীম খাঁ, পাচেটের রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্যপুত্র, [একুনে] ১০৯টি ছোট বড় হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত দেখা করিলেন। নবাবের বিশ্বাসী প্রিয় কর্ম্মচারী শেখ কমাল্ তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিল।

'বাজু-ই-রাস্ত'এর অন্তর্গত বজ্রপুর নামক গ্রামে, ২৬এ এপ্রিল রাজা প্রতাপাদিত্য আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। [নাটোর শহরের ১৫ মাইল উত্তরে এবং শুক্‌টিগাছার ৪ মাইল দক্ষিণে বজ্রপুর; রেনেল ৬নং ম্যাপ। জ্যারেটের আইন্-ই-আক্‌বরী, ২-১৩২ পৃ একটা বাজু-ই-রাস্ত আছে; কিন্তু তাহা এ স্থান নহে।] তিনি ৬টা হাতী, মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু, প্রায় পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা ও অন্যান্য উপঢৌকন দিলেন। কয়েকদিন নবাবের দর্‌বারে উপস্থিত থাকিবার পর বিদায় লইলেন।

৩০এ এপ্রিল বজ্রপুর হইতে কুচ করিয়া শাহপুর পৌঁছা গেল। যমুনার ধারে বাস হইল। নবাব তথায় সৈন্যনিবাস রাখিয়া নাজিরপুরে গিয়া নয় দিন তথাকার জঙ্গলে থাকিয়া ৩২টা হাতী ধরিলেন। তাহার পর যমুনার উপর পুল বাঁধিয়া পার হইয়া ঘোড়াঘাটে ২রা জুন উপস্থিত হইলাম। তথায় চালা (ছাপর) বাঁধিয়া সকলে বর্ষা-যাপন করিল। [শাহপুর, ঘোড়াঘাটের ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইহার পাশের নদীর নাম জবুনা=যমুনা, রেনেলের ৫নং ম্যাপ।]

যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা শ্রীহরি কাশীতে একটি অতি উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন, তাহা মানসিংহের মন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। জহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হুকুম দেন, কিন্তু মানসিংহের মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়।

শ্রীযদুনাথ সরকার

প রি শি ষ্ট ॥ খ

সতীশচন্দ্র মিত্র

যে সৃষ্টির পশ্চাতে জীবনব্যাপী সাধনা থাকে, তাহা রচয়িতার জীবন-দর্শনও ঘোষণা করে অনিবার্য্যরূপে। 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসে'ও তাহা অব্যক্ত থাকে নাই। পুণ্যশ্লোক সতীশচন্দ্র ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। কাব্য অনুগামী বর্ণনায় এবং ছোট ছোট গল্পে ইতিহাসকে সজীব করিয়া তুলিবার ধরণই ছিল তাঁহার একান্ত। ১৯২৯ অব্দে একদিন সতীশচন্দ্র অনুরূপ অধ্যাপনায় মগ্ন। ইতিহাস পাঠের কক্ষটি ছিল প্রতাপসিংহ, শিবাজী, নানাসাহেব প্রভৃতির তৈলচিত্রে সুসজ্জিত। গল্পও বলিতেছিলেন মহারাষ্ট্রের নায়কদের। সেই গল্পেরই অনুবর্ত্তনে পবাধীনতার গ্লানিকে বিকটিত করিয়া যেন সংগ্রামী আহ্বানের ধ্বনিতে ধীরলয়ে ঘোষণা করিলেন, 'আমি মসী ধরিয়াছি, পারিলে তোমরা অসি ধরিও।'—শতাধিক ছাত্রের সে কক্ষ নিস্তব্ধ হইয়া ছিল অনেকক্ষণ।

এই দৃপ্ত ঘোষণার পশ্চাতে যে জীবনদর্শনেব ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহাই ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্রের জীবনেব মর্ম্মবাণী। তাঁহার আজীবন অধ্যবসায় ও তন্নিষ্ঠ সাধনালব্ধ 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসে'রও মর্ম্মবাণী।

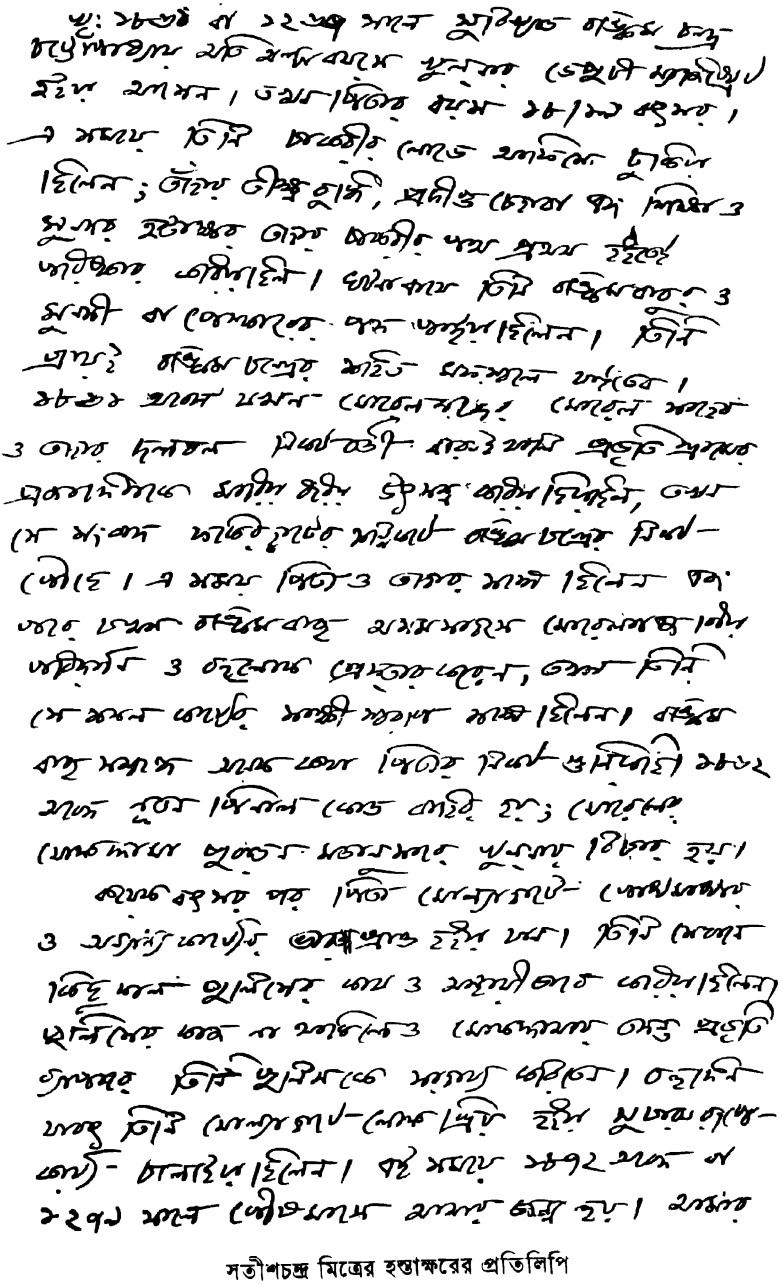
বাঙলার মানস জগৎ তখন 'নবজাগরণের যুগ' অতিক্রম করিয়া সংগ্রামী যুগে অগ্রসর হইতেছে। রামমোহন হইতে বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষা, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও রাজনীতির নবোন্মেষের পটভূমি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। ব্যর্থ বিক্ষোভে বঙ্গদেশ তখন নানা মঞ্চে উদ্বেলিত—প্রকাশন ও সংবাদপত্র-স্বাধীনতার আন্দোলন, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয়, ভূমি-ব্যবস্থায় অসন্তোষ, ওয়াহবী ও তিতুমিরের আন্দোলন, নীল-বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ, শিক্ষা-সংস্কার আলোড়ন, হিন্দুমেলার জন্ম। বঙ্গভূমি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র যুগের জন্য প্রতীক্ষমাণ। এমনি যুগ-সন্ধিক্ষণে ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ (১লা পৌষ, শনিবার পূর্ণিমা, ১২৭৯ সাল), সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 'মিত্রবংশমঙ্গল' নামক পাণ্ডুলিপির আপন পিতৃ-পরিচয় অধ্যায়ে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :

'খৃঃ ১৮৬১ বা ১২৬৭ সালে সুবিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি অল্প বয়সে খুল্‌নার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। তখন পিতার বয়স ১৮।১৯ বৎসর। এ সময়ে তিনি চাকরীর লোভে আফিসে ঢুকিয়াছিলেন, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রদীপ্ত চেহারা এবং শিক্ষা ও সুন্দর হস্তাক্ষর তাঁহার চাকরীর পথ প্রথম হইতেই পরিষ্কার করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে তিনি বঙ্কিমবাবুরও মুন্সী বা পেশকারের পদ পাইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মফস্বলে যাইতেন। ১৮৬১ অব্দে যখন মোরেলগঞ্জের মোরেল সাহেব ও তাহার দলবল নিকটবর্ত্তী বারুইখালি প্রভৃতি গ্রামের প্রজাদিগকে মারিয়া ধরিয়া উৎসন্ন করিয়া দিয়াছিল, তখন সে সংবাদ ফকিরহাটের সন্নিকটে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পৌঁছে। এ সময় পিতাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং পরে যখন বঙ্কিমবাবু অসম-সাহসে মোরেলগঞ্জ গিয়া পরিদর্শন ও বহুলোক গ্রেপ্তাব করেন, তখন তিনি সে সকল কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ সঙ্গে ছিলেন। বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা পিতার নিকট শুনিয়াছি। ১৮৬২ অব্দে নূতন পিনাল কোড বাহির হয়; মোরেলের মোকদ্দামা পুরাতন মতানুসারে খুলনায় বিচার হয়।

'কয়েক বৎসর পর পিতা মোল্যাহাটে পোষ্টমাষ্টার ও অন্যান্য কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া যান। তিনি সেখানে কিছুকাল পুলিসের কাযও অস্থায়ীভাবে করিয়াছিলেন। পুলিশের কায না থাকিলেও মোকদ্দমায় তদন্ত প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি পুলিসকে সাহায্য করিতেন। বহুদিন যাবৎ তিনি মোল্যাহাটে লোকপ্রিয় হইয়া সুচারুরূপে কার্য্য চালাইয়াছিলেন। এই সময় ১৮৭২ অব্দে বা ১২৭৯ সালে পৌষ মাসে আমার জন্ম হয়। জন্মকালে মাতা পিত্রালয়ে [পাইকপাড়া, খুলনা] ছিলেন। জন্মের পর ৩।৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি পিতা-মাতার সঙ্গে মোল্যাহাটে ছিলাম। শিশুকাল আমার পরম সুখে কাটিয়াছিল।'

পরবর্ত্তীকালে সতীশচন্দ্রের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের যে অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার সূত্রপাত তাঁহার পিতা প্যারীমোহনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই যোগাযোগ হইতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয় খুল্‌নাতেই, এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' খুল্‌না বসিয়াই রচিত।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্যারীমোহন উক্ত সরকারী চাকুরী ইস্তাফা দেন; এবং তখন হইতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের সূত্রপাত। এই অবস্থায়


খৃঃ ১৮৬৭ এর ১২৭৪ সনে সুবিখ্যাত বঙ্কিম চন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় এই সবডিবিসনে খুলনায় (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)
হইয়া আসেন। তখন পিতার বয়স ১৮/১৯ বৎসর।
এ সময়ে তিনি কালেক্টরীর [illegible] [illegible] [illegible]
ছিলেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রতিভা [illegible] ও শিক্ষা ও
সুন্দর হস্তাক্ষর তাঁহার কাজের পক্ষ প্রথম হইতে
[illegible] করিয়াছিল। এইরূপে তিনি বঙ্কিমবাবুর ও
[illegible] এর [illegible] পদ [illegible] ছিলেন। তিনি
প্রায়ই বঙ্কিম চন্দ্রের বাটীতে [illegible] যাইতেন।
১৮৭২ সালে যখন [illegible] [illegible]
ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তখন
সে বাংলা সাহিত্যের [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible]
[illegible]। এ সময় পিতা ও [illegible] [illegible] ছিলেন এবং
[illegible] তখন বঙ্কিমবাবু [illegible] [illegible]
[illegible] ও [illegible] [illegible], তখন তিনি
সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন। বঙ্কিম
বাবু [illegible] [illegible] [illegible] পিতার [illegible] [illegible] ১৮৭২
সালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়; [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।
[illegible] বৎসর পর পিতা [illegible] [illegible]
ও [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া যান। তিনি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ছিলেন
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রভৃতি
[illegible] তিনি [illegible] [illegible] করিতেন। [illegible]
[illegible] তিনি [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] চালাইয়াছিলেন। এই সময়ে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বা
১২৭৯ সনে [illegible] [illegible] জন্ম হয়। [illegible]

সতীশচন্দ্র মিত্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

['বংশমঙ্গল' হইতে]

সতীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। আশেপাশের এ-গ্রাম সে-গ্রামে থাকিয়া তিনি একে একে বৃত্তিসহ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরগুলি উত্তীর্ণ হইতে থাকেন। মুছর্ব্বরপুর হইতে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় (১৮৮৪) মাসিক ২৲, নন্দনপুর হইতে উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় (১৮৮৬) মাসিক ৩৲, সেনহাটি স্কুল হইতে মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (১৮৮৮) মাসিক ৪৲, এবং খুল্না জিলা-স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় (১৮৯২) মাসিক ১০৲ বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হন।

পরবর্ত্তীকালে সতীশচন্দ্রের কর্ম্মময় ও সাহিত্যিক জীবনের সম্ভাবনা কৈশোরেই সূচিত হইয়াছিল। মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে জেলার মধ্যে বাঙলা রচনায় প্রথম হইয়া শ্রীপুর-হিতসাধনী সভা হইতে রৌপাপদক লাভ করেন। মননশীল রচনার প্রতি তাঁহার পাঠানুরাগ কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে গল্প করিতে গিয়া তিনি বলিতেন যে, স্কুল জীবনেই তাঁহার Abbot's *Life of Napoleon* আদ্যোপান্ত পাঠ হইয়া গিয়াছিল। অন্যদিকে ১৮৯৩ অব্দে 'বেলফুলিয়া দরিদ্র লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাত্রজীবনেই কর্ম্মক্ষমতারও পরিচয় দেন।

১৮৯২ হইতে ১৮৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সাতবৎসর কাল কলিকাতায় কখনও মেসে, কখনও বা কাহারও গৃহে আশ্রিত হইয়া একদিকে যেমন কলেজে অধ্যয়ন চালাইয়া যান, তেমনি অন্যদিকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। ছাত্র পড়াইয়া শুধু থাকা ও পড়ার সঙ্গতি করিলে হইত না, এই সময়ে তাঁহাকে সংসার খরচও পাঠাইতে হইত। মেট্রপলিটান কলেজ হইতে ১৮৯৪ অব্দে এফ্, এ, এবং সিটি কলেজ হইতে ১৮৯৭ অব্দে বি, এ, পাশ করেন এবং ইহার পর একবৎসর কাল একই সঙ্গে আইন পড়িতে ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু 'রাইডিং সার্টিফিকেটে'র অভাবে সে পরীক্ষা দেওয়া হইল না। ১৮৯৮ অব্দের এম, এ, পরীক্ষা সমীপবর্ত্তী। সেই সুযোগ লইবার চেষ্টায় মাত্র চারমাস পড়িয়া পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ছাত্রজীবনের এইখানেই সমাপ্তি। 'বংশ-মঙ্গলে' লিখিয়াছেন, 'তখন সাংসারিক অবস্থা এত খারাপ যে চাকরী না করিয়া আর চলে না। তাই বাহির হইলাম।'

বাহির হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের নিয়ামকের দুটি সূত্রে গ্রথিত হইয়া গেলেন। প্রথমতঃ, এফ, এ, পড়িবার সময়ে যে মেসে ছিলেন, সেখানে তখন পরবর্ত্তীকালে হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ব্রজলাল শাস্ত্রী

মহাশয়ও থাকিতেন। 'বংশমঙ্গলে' উল্লেখিত আছে : 'এই সময় হইতে ভবিষ্যত কার্য্যক্ষেত্রে ব্রজবাবুর সহিত সহযোগিতার সূচনা হয়।' শাস্ত্রী মহাশয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯০২ অব্দে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই আহ্বানে সতীশচন্দ্র ১৯০৪ অব্দে এই কলেজে ইতিহাস, অঙ্ক, এবং বাঙলা ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমুন্নত করিবার সর্ব্ব দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রাণপাত করেন। সতীশচন্দ্র এই শিক্ষায়তনের প্রাণ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই বিদ্যামন্দিরে কার্য্যরত অবস্থায় এবং ইহারই এক প্রাঙ্গণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কলেজের অপর এক প্রান্তে ভৈরবকূলে সতীশচন্দ্রের স্মৃতিফলক অদ্যাবধি বিরাজমান।

দ্বিতীয়তঃ, ১৮৯৮ অব্দে যখন মেট্রপলিটান কলেজে ইংরাজিতে এম, এ, পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ইতিহাস-সম্রাট স্যর যদুনাথ সরকার। সতীশচন্দ্রের নিজের কথায়—'এই সময় হইতে যদুবাবু আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।' এই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উত্তরজীবনে শুধু অক্ষুণ্ণ ছিল না, প্রগাঢ় হইয়াছিল। যদুনাথের উপদেশ মত সতীশচন্দ্র তাঁহার 'প্রতাপসিংহ' নামক পুস্তকের আমূল সংস্কার করেন। এই গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ যদুনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত। প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত এই পুস্তকখানি বহুভাবে দেশবিদেশে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। ইহার হিন্দী ও ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়; ইংরাজি সংস্করণের ভূমিকা লর্ড রোনাল্ড্‌সে (জেট্‌ল্যাণ্ড) স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া লিখিয়া দেন। পরবর্ত্তীকালে 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', বিশেষতঃ ইহার দ্বিতীয় খণ্ড রচনাকালে যদুনাথের সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিসীম। অন্যদিকে 'প্রতাপাদিত্য' সম্পর্কে যদুনাথের যে প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে বাহির হয়, তাহার টিপ্পনী সতীশচন্দ্রের লেখা। এই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ও সহযোগিতা কতদূর প্রগাঢ় ছিল, তাহা 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষা হইতে অনুমিত হইবে : 'সর্ব্বাগ্রে আমার ঐতিহাসিক গুরুদেব বিশ্ববিশ্রুত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয়ের চরণে প্রণাম করিতেছি।'

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ছাত্রজীবনে সতীশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও গবেষণার কেন্দ্রস্থল ছিল চৈতন্য লাইব্রেরী এবং ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী।

ছাত্রজীবন পশ্চাতে রাখিয়া ১৮৯৯ অব্দে সতীশচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। হেডমাষ্টার বা প্রধান-শিক্ষকরূপেই এই জীবন আরম্ভ। একে একে অনেকগুলি স্কুলেরই হেডমাষ্টার হইলেন এবং হেডমাষ্টারি জীবনে সর্ব্বত্র এমন অশেষ স্থনাম ও লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন যে, এই সময়ে সকলের নিকট তিনি সাধারণভাবে 'হেডমাষ্টার'রূপেই পরিচিত ছিলেন। এমনকি, বিশ বছর পরেও ঐতিহাসিক মহামতি বিভারিজ সাহেব 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসে'র পরিচয় দিতে গিয়া সতীশচন্দ্রকে 'হেডমাষ্টার' রূপেই বর্ণনা করিয়া বসেন।

ইহার পর ১৯০৪ অব্দে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে অধ্যাপক পদে বৃত হন এবং তখন হইতে আজীবন এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলকামনায় ও উন্নতির প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অগ্রগতির দায়িত্ব ব্যতিরেকে ইহার যে দুইটি বিভাগ তিনি স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হইল ইহার গ্রন্থাগার। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহার লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তখনকার দিনে মফস্বল কলেজ-গুলির মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার বলিলে অত্যুক্তি হয় না, বিশেষতঃ ইহার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসম্ভার অতুলনীয়। এই গ্রন্থাগার লইয়া পক্ষপাতিত্ব এবং অযথা অর্থব্যয়ের নিন্দাবাদ তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা তাঁহার 'বংশমঙ্গলে' লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখন মারকুইস্ অফ্ জেটল্যাণ্ড বাঙলার ছোটলাট। দৌলতপুর কলেজের স্থনামে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ইহা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। নিবিষ্টমনে এই গ্রন্থাগার দেখিতে দেখিতে লাট সাহেব একখানি ছোট বই হস্তগত করেন। অবশেষে বিদায় লইবার প্রাক্কালে সতীশচন্দ্রের ডাক পড়িল। তাঁহাকে লাটসাহেব বলিলেন,—দেখুন, আপনার অমূল্য গ্রন্থাগার হইতে একখানি বই পড়িবার লোভ সামলাইতে পারি নাই। কাহাকেও না বলিয়াই লইয়া আসিয়াছি, ইহার শাস্তিস্বরূপ গ্রন্থাগারের জন্য ৫০০৲ টাকার এই চেক গ্রহণ করিয়া বাধিত করুন।

দ্বিতীয়টি হইল, এই প্রতিষ্ঠানের একটি ছোট যাদুঘর। যশোহর-খুল্‌নার ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদগুলির প্রতি তাঁহার মমতা ছিল অপরিসীম। ইহা নষ্ট বা অবহেলিত হইতে দেখিলে তিনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন এবং কার্য্যকারককে প্রকাশ্যে ও সংবাদপত্রে নিদারুণ নিন্দাবাদ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। যে-সব সাহেবেরা এই সময় জেলার শাসনে উচ্চপদে কাজ করিতে

আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গৃহ সজ্জিত করিবার লোভে এইসব সম্পদ বিলাতে লইয়া যাইতেন। প্রকাশ্যে নিন্দাবাদের দ্বারা ইহা রোধ করিবার জন্য সতীশচন্দ্র অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। একবার খুল্‌নার কালেক্টর জে, সি, ফ্রেঞ্চ সাহেব কষ্টিপাথরের একটি ছোট বিষ্ণুমূর্ত্তি লইয়া যান। পত্রাঘাতের পর পত্রাঘাত করিয়া সতীশচন্দ্র এই সম্পদ খুল্‌না জেলায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন।

যে-সম্পদ যেখানে বা যে-গ্রামে উদ্ধার হইত, সেখানেই তাহা সযত্নে রাখিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। উহা স্থানচ্যুত করার একান্ত বিরোধী ছিলেন। এমনকি, কোন গ্রামে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইলে, সেই স্থানেই উহার পুনঃপ্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন। সেখহাটির অপূর্ব্ব ভুবনেশ্বরী-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইলে তিনি নিজে সর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়া উহা পুনরায় উক্তস্থানেই প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎসূত্রে অতীতের ন্যায় পুনরায় বাৎসরিক মেলা আরব্ধ করাইয়া দেন। তবে যে-সব সম্পদের স্বস্থানে সযত্নে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, সেগুলি কলেজের এই যাদুঘরে স্থান পাইত। এখানে বহু প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরমূর্ত্তি, মৃৎ-ফলক, দারুমূর্ত্তি এবং বঙ্গদেশে মনুষ্য-বিক্রয়ের একখানি শেষ দলিল সংগৃহীত ছিল।

সতীশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় বলিতে গেলে ছাত্র অবস্থা হইতেই। ১৮৯৪ অব্দে 'শিক্ষা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রে 'আর কি সেদিন আসিবে?' শিরোনামায় তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বি, এ, ক্লাসে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ইহার পর ক্রমান্বয়ে কবিতা এবং সাহিত্য, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্ম্ম ও ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হয়। এতৎসংলগ্ন রচনা-পঞ্জী অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে দুইটি ধারা বর্ত্তমান—কাব্য ও ইতিহাস।

কবিতা প্রথম হইতেই লিখিতেন। উহার অনেকগুলি 'সমুত্থান', 'শিল্প ও সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি উচ্চাঙ্গের না হইলেও আবেগময় বর্ণনাত্মক ও শব্দ-ঝঙ্কার সম্বলিত। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা 'মা' উচ্ছ্বাসময় কবিতার সমষ্টি। পদ্যানুবাদও কতকগুলি প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ১৯০৫ অব্দে প্রকাশিত 'জননীর চিত্রদর্শনে' (*'On Receipt of My Mother's Picture,'* by William Cowper) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাব্যের এই ধারা তাঁহার মানসজগতে শেষ অবধি ছিল। পরিণত বয়সে বহু গান রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে নাই। উহার পাণ্ডুলিপি দেশ-বিভাগ জনিত ঘূর্ণাবর্ত্তে লুপ্ত হইয়াছে এবং উদ্ধারের আর আশা নাই বলিলেই চলে।

অন্য ধারা এবং অত্যন্ত প্রবল ধারা ছিল, ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসা। একস্থানে আত্মপরিচয়সূত্রে লিখিয়াছেন—'বংশকাহিনী সংগ্রহের প্রবৃত্তি বর্ত্তমান গ্রন্থকারের বংশগত সম্পত্তি' (২য় খণ্ড, ৮২৯ পৃ)। বংশগত হউক বা না হউক, ছাত্রজীবনের অব্যবহিত পর হইতে রচিত প্রায় সকল প্রবন্ধগুলিই ইতিহাসমূলক। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ইতিহাস না হইলেও, তাঁহার সকল বক্তব্যই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই উপস্থাপিত হইয়াছে। দেখা যায়, তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম প্রসূত প্রকৃত ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসামূলক প্রবন্ধ—'সেনাপতি কালী'। উহা 'ভারতী' নামক পত্রে ১৯০৩ অব্দে (১৩১০, পৌষ) বাহির হয়। এই মাসিক পত্রে এই সময় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বহু লেখা প্রকাশিত হইত। সতীশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই, অর্থাৎ ১৯০০ অব্দের পূর্ব্বেই যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, এবং ইহার পর হইতে কয়েক বৎসর 'ভারতী', 'শিল্প ও সাহিত্য', 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রভৃতি পত্রে যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহাও লক্ষ্য করা যায়, ১৯০৪-০৫ এই দুই বৎসর যখন 'শিল্প ও সাহিত্য' মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক, তখন তাঁহার লেখনী হইতে এই পত্রে দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচিত হইতে থাকে। 'বন্দেমাতরম', 'রাখী-বন্ধন', 'স্বদেশী-আন্দোলন' প্রভৃতি রচনাতে দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ তদানীন্তন গণ-আন্দোলনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আকর্ষণ ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়।

সমভাবে আবেগধর্ম্মী প্রবন্ধ ও অন্য রচনাও বাহির হইতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে 'সত্যানন্দ' ছদ্মনাম ধরিয়া অনেকগুলি এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অবশেষে তাঁহার জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইল। ১৯০৮ অব্দে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কতকগুলি আবেগময় রচনার সহিত নূতন কয়েকটি সমগোত্রীয় প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া 'উচ্ছ্বাস' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৯১০ অব্দে ইহার এক কপি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে উপহার দেন। তাহার উত্তরে আচার্য্যদেব 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস' লিখিবার জন্য অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা ও ভাষায়

যে অমোঘ বাণী প্রেরণ করেন, তাহা তাঁহার মত ঋষিকল্প সিদ্ধপুরুষোপম। এই বাণীর আহ্বানে সতীশচন্দ্র কিভাবে উদ্বোধিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি ইহার জন্য কি কঠোর সাধনায় লিপ্ত হইলেন, তাহা তিনি নিজস্ব অনুপম ভাষা ও বর্ণনায় 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসে'র ভূমিকাগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সতীশচন্দ্রের মানসজগতের দুই ধারা—কাব্য ও ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসা, এইবার একত্রিত হইয়া এইরূপ দুর্লভ ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব করিল। তাঁহার ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসার পশ্চাতে ছিল মানব-প্রীতি ও দেশাত্মবোধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব। স্বদেশী-আন্দোলনের সমকালে তাঁহার লেখা-গুলিতে দেশাত্মবোধের পরিচয় যে স্পষ্ট তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে আত্মবিশ্লেষণচ্ছলে তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই ; নহিলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব……'—বঙ্কিমের এই আহ্বান তাঁহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিহাসের দর্শন তিনি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কি বা কাহাদের লইয়া ইতিহাস, অথবা কিসের বা কাহাদের জন্য ইতিহাস—এ সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি তদানীন্তন ইতিহাস-বিদ্‌দের হইতে যথেষ্ট ভিন্নমুখী ছিল। প্রবাদপুঞ্জ হইতে সার সত্য সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও, সকল প্রবাদ হইতেই মূল সত্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং রাশীকৃত ইতিকথা হইতে সত্যের নির্য্যাস নির্গত করিয়া লওয়া যে সম্ভবপর, সে কথা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই, লিখিত ইতিহাস কয়জনের পাওয়া যায়? এবং যাহা আছে, তাহাই যে রঞ্জিত বা পক্ষপাতদুষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কি? দেশের মধ্যে কয়জনের কার্য্যকলাপের দৈনন্দিন লিপি প্রস্তুত হইত? শিলালিপি বা স্মারক-লেখমালা হইতে দুই চারিজন রাজা ব্যতীত কয়জন প্রাচীন কৃতীপুরুষের জীবনী সংগ্রহ করা যায়? আর সেই ইতিহাস পাইলেই কি দেশের ইতিহাস হইল? দেশ কি শুধু কতিপয় রাজা বা রাজপুরুষের সমষ্টি লইয়া গঠিত? রাজা শুধু দেশের রক্ষক মাত্র ; রাজার ইতিহাস শুধু দেশ-শাসনের ইতিহাস—দেশের বাহ্যাবরণের ইতিহাস। প্রজাই দেশের প্রাণ ; সে প্রাণের স্পন্দন বা অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস। আমরা যে সমস্ত ইতিহাস পড়ি, তাহার

অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত মাত্র। প্রজার কাহিনী বা দেশের প্রকৃত চিত্র তাহাতে নাই। যুগের পর যুগ ধরিয়া জনশ্রুতি, প্রবাদ বা গল্পকথার মধ্যে সে চিত্র ক্রমে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে।' (২য় খণ্ড, ৫২ পৃ)—জনগণের এই লুক্কায়িত প্রাণস্পন্দনের উপর আলোকপাত করিবার জন্যই সতীশচন্দ্রের সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল তাঁহার প্রাণপাতী সাধনা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্দের প্রবণতা ছিল একমাত্র রাজবংশের নীলরক্ত অনুসরণ করিয়া ইতিবৃত্ত রচনা করা, তখন এ কথা বলা দুঃসাহসিক বৈকি—'সমাজের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় চরিত্রের অভিনয় সামাজিক চিত্রেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল সমাজ ; সমাজই সভ্যতার আশ্রয়স্থল।' (২য় খণ্ড, ৮০৮ পৃ)

স্বাভাবিকভাবেই এই ইতিহাসে অগণিত জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, বংশ ও মানুষের কাহিনী ভীড় করিয়া গ্রন্থের কলেবরকে দীর্ঘায়ত করিয়াছে। নামকরা অনেক ঐতিহাসিক ইতিহাসকে এমনভাবে ভারাক্রান্ত করা ইতিবৃত্ত-বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে বলিয়া সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার প্রত্যুত্তরে সতীশচন্দ্র বলিয়াছেন যে, তেমন সঙ্কুচিত করিলে তাঁহার ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হইয়া যায়! একটি উদ্ধৃতিতে বোধহয় এ বিষয়ে তাঁহার মূল কথা ধরা দিবে। যশোহর-খুলনার নিরক্ষর কবিদের সম্পর্কে এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বলিয়াছেন : 'মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি যাঁহারা আমার দেশের মুখোজ্জ্বলকারী, তাঁহাদের গুণগ্রামের কথা স্থগিত রাখিয়াও আমি এই সকল স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর কবির নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী চিরস্থায়িনী করিতে প্রয়াসী।' (২য় খণ্ড, ৮৭৩ পৃ)

অন্যদিকে, ইতিহাস কিসের বা কাহাদের জন্য—সে বিষয়েও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক ছিল না। ইতিহাসচর্চ্চা তাঁহার কাছে নিতান্ত শাস্ত্রানুশীলন বা পণ্ডিতী চর্চ্চার বিষয়বস্তু ছিল না। দেশের ইতিহাসের সঙ্গে দেশবাসীর 'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন' করাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল (২য় খণ্ড, ভূমিকা)। অতীতের দেশ, কাল ও পাত্রের আলোচনাকে কখনও বর্ত্তমান হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। আধুনিক সমতটবাসিগণের সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি দুর্ব্বলতা ও সবলতার পশ্চাতে অতীতের পদধ্বনি শোনাইবার ব্যগ্রতার অন্ত ছিল না। দেশের ইতিহাসের সহিত দেশবাসীর এই আত্মীয়তা স্থাপনের প্রেরণায় শেষ দিকে তিনি 'শিশুপাঠ্য যশোহরের ইতিহাস' এবং

'শিশুপাঠ্য খুল্‌নার ইতিহাস' অতি সহজবোধ্য ভাষায় রচনা করেন। এবং এই পুস্তিকাদ্বয়ের শেষে জেলার সমগ্র ইতিহাসকে কিশোর মনের উপযোগী ছড়ার ছন্দে গ্রথিত করার অভিনব পন্থা গ্রহণ করেন :

'জলদান পুণ্য, আর পরহিত প্রাণ।
ধন্য করি রাখিয়াছে খাঞ্জালির নাম॥
তুমি মা খুল্‌না কি বা তুলনা তোমার।
স্বাধীনতা বীজমন্ত্র করিলে প্রচার॥
বঙ্গজ কায়স্থ বীর প্রতাপ আদিত্য।
ভুবনে ঘোষিছে যার অতুল বীরত্ব॥'

* * *

—'শিশুপাঠ্য খুল্‌নার ইতিহাস', ১৪২ পৃ

যশোহর-খুল্‌নার অধিবাসীদের শৈশব হইতেই ইতিহাসের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করাইবার গ্রন্থকারের ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা উপরোক্ত পংক্তি ও পদ্ধতি হইতেই অনুমেয়। তিনি বলিতেন, 'মাতৃভাষা যেরূপ সকল ভাষায় প্রবেশলাভের প্রথম সোপান, নিজের দেশের কথাও সেইরূপ সকল দেশের ইতিহাস আলোচনার দ্বারস্বরূপ।' একই উদ্দেশ্যে উদীয়মান লেখককে নিজ নিজ গ্রামের ইতিহাস প্রণয়নে উৎসাহ দিবার আনন্দে তিনি অধীর হইতেন। এইভাবে 'মহেশ্বরপাশা পরিচয়', 'সেনহাটির ইতিহাস', প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহারই প্রেরণায়, কখনও বা তাঁহারই ভূমিকা সম্বলিত হইয়া রচিত হয়। কলেজের ছাত্রদের ইতিহাসের আকর্ষণকে অনুরাগে পর্য্যবসিত করার পদ্ধতিও ছিল তাঁহার অভিনব। আপন আপন গ্রামের ইতিহাস যে যতটুকু জানে বা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা লিখিয়া ছাত্রদের প্রথমেই তাঁহাকে দেখাইতে হইত—ইতিহাসের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের এই পন্থাই ছিল তাঁহার অন্যতম দীক্ষা। সতীশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাগুলি যে সামগ্রিক রূপ নিয়াছিল, তাহাতে বলা যায়—যশোহর-খুল্‌নায় সতীশচন্দ্র ও ইতিহাস একাকার হইয়া গিয়াছিল।

কাহাদের লইয়া বা কাহাদের জন্য ইতিহাস, সে প্রশ্ন ছাড়াও ইতিহাস রচনা উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার একটি দৃঢ়মত ছিল। কোন অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সর্ব্বভাবে পরিচিত না হইয়া, সম্পূর্ণরূপে একাত্ম না হইয়া, সে দেশের ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টাকে মূঢ়তা বলিয়া বারম্বার

ধিক্কার দিয়াছেন। এই মাটি ও মানুষের সহিত পরিচিতির বলে এবং চাক্ষুষ প্রমাণের সাহায্যে সতীশচন্দ্র কত গণ্যমান্য ইতিহাসবিদ্‌দের 'শহরের ত্রিতল গৃহে বসিয়া' শুধুমাত্র পুঁথিপত্রের উপর নির্ভর করিয়া উপস্থাপিত সিদ্ধান্তগুলিকে অপসিদ্ধান্ত প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহার স্বাক্ষর যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের প্রতি পরিচ্ছেদে। এই ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য সমগ্র সমতটে চট্টগ্রাম হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত এমন কোনও ইতিবৃত্ত-সংশ্লিষ্ট স্থান ছিল না যেখানে গ্রন্থকার চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহার্থে উপস্থিত হন নাই। যশোহর-খুল্‌নার তো কথাই নাই, এমন কোনও গ্রাম নাই, যেখানে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান নাই, এমন কোন বংশ নাই যাহার নিকট ইতিহাসের ইঙ্গিত পাইবার জন্য বা 'কারিকা' সংগ্রহের জন্য দ্বারস্থ হন নাই। খুল্‌না জেলার অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া দুর্গম সুন্দরবন। আর এই বনের ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি ততোধিক দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। কেননা, গভীর বনাঞ্চলে ভগ্নমন্দির ও গৃহগুলি যেমন দূরতিক্রম্য বনাকীর্ণ হয়, তেমনি সর্ব্বপ্রকার বন্য ও হিংস্র জন্তুর দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধ্যুষিত হয়। প্রাণ হাতে করিয়া দুর্ব্বার ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় সতীশচন্দ্র এ হেন স্থানগুলিতেও পদচারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই বা দ্বিধা করেন নাই।

মাটি ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের এই প্রচেষ্টায় পদে পদে তাঁহার প্রাণ বিপন্ন হইয়াছে। সুন্দরবনে পথহারা হইয়া রাত্রের অন্ধকারে একবার সমূহ বিপদে পড়িবার বিবরণ নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহম্মদপুরে সীতারামের ইতিহাস সংগ্রহ কার্য্যে একবার দুর্গম বনাকীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে বন্যশূকর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। সাতক্ষীরায় একবার মহামারী অধ্যুষিত অঞ্চলে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিতে গিয়া অতি ভীষণ বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় জীবনাবসানের অবস্থা হয়। তবু এই ঐতিহাসিকের মাটি ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয় নাই।

ইতিহাসকে উপলব্ধি করিবার তাঁহার বিশেষ পদ্ধতি একটি উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টতর হইবে। মানসিংহের যশোর-রাজ্য আক্রমণের কত তথ্যই তো আছে, কত প্রামাণ্য বিবরণও তো আছে—তাহা নিঃশেষ করিয়াও সতীশচন্দ্র ক্ষান্ত নহেন। নবগঠিত 'গৌড়বঙ্গের রাস্তা' ধরিয়া যখন মানসিংহ সদলবলে যশোররাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—'অজানা অচেনা নিম্ন-বঙ্গে ত্বরিত

গতিতে পথ রচনা করিতে করিতে বিরাট মোগলবাহিনী কেমন করিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল, সেইসব পুরাতন কাহিনীর চিন্তা লইয়া আমি মানসিংহের এই রাস্তায় বহু মাইল পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি।' (২য় খণ্ড, ৩৫১ পৃ)

এই সূত্রে সতীশচন্দ্রের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। বিশেষত বাংলা সাহিত্যে অধুনা ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির পটভূমিতে ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার মতে—"উপন্যাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। অবিকৃত, অকৃত্রিম, কঠোর সত্য লইয়াই ইতিহাস গঠিত, আর সামান্য অস্থি-মজ্জার উপব কল্পনার উন্মেষে কৃত্রিম ঘটনাবলীর ঘনসন্নিবেশে উপন্যাস রচিত হয়। কঙ্করময় কঠোরই হউক, বা কোমল শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি, সে পথ আছে, তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে। উপন্যাসের পথ বহুসংখ্যক, লেখক ও পাঠকের রুচি অনুসারে, সে পথ ইচ্ছামত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়; ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প। উপন্যাসের লেখক ও পাঠক অসংখ্য, পয়সা ও পসার উভয়ই ঔপন্যাসিকের একায়ত্ত। ইতিহাসকে অতি সহজেই উপন্যাস করা যায়, ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা রক্ষা না করিলেই উপন্যাস হইয়া পড়ে। কিন্তু উপন্যাসকে কোন মতেই ইতিহাস করা চলে না। আজকাল আমাদের দেশে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে এক-জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। উহাদের নায়ক-নায়িকা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, দুই একটি প্রধান ঘটনাও সত্যানুগত হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্রালঙ্কার ও পত্র-পল্লব অধিকাংশই ঔপন্যাসিক ও কাল্পনিক। এ জাতীয় গ্রন্থ দ্বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। সুখপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্যাসের আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উপন্যাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্ত্তাও কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে" (২য় খণ্ড, ৫২১-২ পৃ)। বলা বাহুল্য উপরোক্ত কঠিন মানদণ্ডে সতীশচন্দ্র সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও সমালোচনা করিতে দ্বিধা করেন নাই। (২য় খণ্ড, ৩২৪, ৫২২ ও ৫৯৮ পৃ)

কিন্তু শুধুমাত্র কাব্য ও ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসা এবং প্রগতিশীল ইতিহাস-চেতনা হইতেই এমন দুর্লভ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন,—'আপনার ইতিহাসে আমাদের দেশের পাঠকেরা সত্য-সন্ধানের কঠিন সাধনা উপলব্ধি করিতে

পারিবে, ইহাই আমি আশা করি।' কি পরিমাণ কঠিন সাধনায় যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় এই ইতিহাসের প্রতি ছত্রে। কি অসাধারণ মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন, কতবার যে জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু ইতিহাস নহে, যে কোন বিষয়ে এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বিফল যাইবার নহে। 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস' পুনর্মুদ্রণের বিষয় লইয়া এইবার অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইলে প্রসঙ্গত তিনি বলিতে থাকেন—'তোমরা তো তখন ছেলেমানুষ, তোমরা তো জান না! আমরা তখন কি উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকতাম সতীশচন্দ্রের লেখার জন্য। ভাবতেও আমাদের গা শিউরে উঠতো—একক একটি মানুষ দুর্গম বনে জঙ্গলে নদনদী উপেক্ষা করে, সমস্ত বিপদ আপদ অবহেলা করে পায়ে হেঁটে হেঁটে গোটা দুটি জেলার ইতিহাস তৈরি করছেন, আর এক একবার ছুটে আসছেন কলকাতার গ্রন্থাগারগুলিতে তাঁর লব্ধ তথ্যকে মিলিয়ে নেবার জন্য।'

এই কঠোর সাধনা চরিতার্থ করিতে চরিত্রের যে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও আদর্শ-নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক, তাহাও তাঁহার ছিল অপরিমেয়। এ সম্পর্কে তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রচিত 'অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র' নামে পুস্তিকায় আছে : 'একাধারে তাঁহার গুণসম্পদসমূহ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি শিষ্টালাপী, উচিতবক্তা, তেজস্বী, বিদ্বান ও ভক্তিনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ছাত্রগণকে তিনি সন্তানের মত ভালবাসিতেন। গম্ভীরাকৃতি পুরুষ, হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে যাইয়া আলাপ করা কঠিন ছিল, কিন্তু সেই গম্ভীরাকৃতির ভিতর যে স্নেহ-কোমল হৃদয় ছিল, যে একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছে, সে কখনই সে স্নেহের কথা ভুলিতে পারিবে না। আমরণ নির্লোভ চিত্তে, ঐহিক সম্পদের কথা ভুলিয়া তিনি এই দরিদ্র দেশে জ্ঞান-বিতরণরূপ মহান্ কার্য্যে আপনাকে ব্রতী করিয়াছিলেন। সম্মানের দিকে তাহার দৃষ্টি অধিক ছিল না—কিন্তু সম্মান যথেষ্টই তাঁহার আসিয়াছিল। প্রথিতনামা ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি এবং বঙ্গের পূর্ব্বতন গভর্নর বাহাদুর লর্ড রোণাল্ডশে তাঁহার বিদ্যাবত্তায় এবং চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করার পরেও তাঁহার নিকট পত্রাদি দিতেন। তাঁহার মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিভারিজ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রয়েল এসিয়াটিক

সোসাইটির মেম্বর [M. R. A. S.] নির্ব্বাচিত হন। এবং তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার জন্য ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন। যশ তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল, কিন্তু সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।'

সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা তাঁহার চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠার এক মর্ম্মান্তিক চরম সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। ১৯৩১ অব্দে বঙ্গদেশ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে উদ্বেলিত। যাঁহার আহ্বান ছিল, 'পারিলে তোমরা অসি ধরিও', তিনি এই আন্দোলনের কথা উঠিলে বলিতেন, সময় এখনও আসে নাই, দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এই সময়ে গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া সতীশচন্দ্র মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় তাঁহার পুত্র কারারুদ্ধ থাকাকালে পুলিশ বেষ্টিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় দেখা করিতে আসিলে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ প্রস্তাব করিল, মুচ্‌লেকা দিলেই তখনই মুক্তি দেওয়া হইবে। এই মুচ্‌লেকা দিতে অনুরোধ করাইবার জন্য কলেজের অধ্যাপক সহকর্ম্মিগণ সকলে মিলিয়া তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত যন্ত্রণা-কাতর সতীশচন্দ্রের নিকট আবেদন করিলেন। এই দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকের আদর্শনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তাঁহারা পরিমাপ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে সতীশচন্দ্র অতি ধীরে এবং ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—'কাহাকেও তাহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে বলিতে পারিব না······না, তাহা হয় না।' কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

পরদিন সতীশচন্দ্র শেষবারের মত জ্ঞানহারা হইলেন, এবং সেই অবস্থায় দুইদিন কাটাইয়া ১৯৩১ অব্দে ৭ই জুন অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সতীশচন্দ্রের বংশ-পরিচয়

দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্র-বংশ : বড়িষা সমাজ : কনিষ্ঠ সত্যবান মিত্রের সন্তান : গুয়াতলীর মিত্র : 'মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র'-কুলীন। বংশ-ধারা এইরূপ—

১ কালিদাস মিত্র (আদিশূরের সময় আগত পঞ্চ কায়স্থের অন্যতম)— ২ শ্রীধর— ৩ শুক্তি —৪ সোভরি— ৫ হরি— ৬ সোম— ৭ কেশব— ৮ মৃত্যুঞ্জয়— ৯ ধুই মিত্র (বড়িষা সমাজ)— ১০ চক্রপাণি— ১১ বিভাকর— ১২ কুবের (ছোট)— ১৩ লক্ষ্মীপতি— ১৪ রাম— ১৫ সত্যবান (কনিষ্ঠ কুলীন)— ১৬ রাজীব (মধ্যাংশ ২য় পুত্র)— ১৭ বিষ্ণুদাস— ১৮ অভিরাম (গুয়াতলী)— ১৯ প্রাণবল্লভ (পাগলা)— ২০ আনন্দিরাম— ২১ রামকৃষ্ণ— ২২ রামজয় (নন্দনপুর)— ২৩ গৌরমোহন— ২৪ প্যারীমোহন (আইচগাতি)— ২৫ সতীশচন্দ্র মিত্র (দেয়াড়া)— ২৬ শিবশঙ্কর।

রচনাপঞ্জী

[সতীশচন্দ্রের সকল পুস্তকই এই তালিকাব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; তারকা (*) চিহ্নিত পুস্তক বা সংস্করণগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলিও প্রায় সম্পূর্ণরূপে তালিকাভুক্ত হইয়াছে ; ইহা ছাড়া দুই-একটি রচনা হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।— শি মি]

মৌলিক গ্রন্থ

মা* ॥ কলিকাতা, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৬ ; ১৮ সেমি (কবিতা সঙ্কলন)

প্র তা প সিং হ ॥ কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ১৯০৪ ; ।৶, ৮২ পৃ ; সম্মুখচিত্র, ১৮ সেমি (ভারত-প্রতিভা গ্রন্থাবলী-১)

২য় সংস্করণ। ১৯০৬ ; ॥০, ৮২ পৃ (অন্য তথ্যাদি অনুরূপ)

৩য় সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ; কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ১৯১৭ ; ১।৶০, ১৭৫ পৃ ; সম্মুখচিত্র, ৫ পট, ১ মানচিত্র ১ নক্শা ১৮·৫ সেমি (স্যর যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা)

৪র্থ সংস্করণ ; ১৯২৮ ; ১॥০, ১৭৫ পৃ (অন্য তথ্যাদি অনুরূপ)

হিন্দী সংস্করণ* ; ১৯০৬

ইংরাজি সংস্করণ ; ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অনূদিত ; কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি, ১৯২৮ ; ৸০, ২০০ পৃ , সম্মুখচিত্র, ৫ পট, ১ মানচিত্র, ১ নক্শা; ১৮·৫ সেমি (Foreword by Rt. Hon. The Earl of Ronaldshay)

উ চ্ছ্বা স ॥ কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ১৯০৮ ; ।৶০, ১০৬ পৃ ; ১৮ সেমি

য শো হ র - খু ল্ না র ই তি হা স, ১ম খণ্ড ॥ কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জী, ১৯১৪ ; ১।০, ৪৩৫ পৃ , সম্মুখচিত্র (রঙীন), ৩৫ পট (২ রঙীন), ৪ মানচিত্র (২ রঙীন), ৫ নক্শা (১ রঙীন), ২১ সেমি

২য় সংস্করণ, পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ; কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৮ ; ১৷৹০, ৪৬৪ পৃ ; সম্মুখচিত্র (রঙীন), ৩৬ পট (২ রঙীন) ৪ মানচিত্র (২ রঙীন), ৫ নক্শা (১ রঙীন), ২১ সেমি

৩য় সংস্করণ, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত ; কলিকাতা, শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৩ ; ২।০, ৪৯৫ পৃ ; সম্মুখচিত্র, ৩৭ পট (৩ রঙীন), ৪ মানচিত্র, (১ রঙীন), ৩ প্রতিলিপি, ৫ নক্শা, ২১·৫ সেমি

য শো হ র - খু ল্ না র ই তি হা স, ২য় খণ্ড ॥ কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯২২ ; ১।৶০, ৮৮৫ পৃ ; সম্মুখচিত্র, ১০ চিত্র, ৫৮ পট, ৩ মানচিত্র (১ রঙীন), ১ প্রতিলিপি, ২ নক্শা, ২১ সেমি

২য় সংস্করণ, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত; কলিকাতা, শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৫; ২৲, ৯৬৩ পৃ; সম্মুখচিত্র, ৬ চিত্র, ৬৯ পট, ৪ মানচিত্র (১ রঙীন), ৩ প্রতিলিপি, ২ নক্‌শা, ২১.৫ সেমি

হ রি দা স ঠা কু র॥ কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২৫; ৸৵০, ১১৭ পৃ+৵০, ৪০ পৃ; সম্মুখচিত্র (রঙীন), ৩ পট, ১৮ সেমি (ভক্ত-প্রসঙ্গ-১) [পরিশিষ্ট: শ্রীগোসাঁই গোরাচাঁদ রচিত 'শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন-বন্দনা]

স প্ত গো স্বা মী॥ কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২৭; ১৲, ৩৫৯ পৃ; ৭ পট, ১৮ সেমি (ভক্ত-প্রসঙ্গ-২)

শি শু পা ঠ্য খু ল্‌ না র ইতিহাস॥ কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯২৭; ।৵০, ১৪৪ পৃ; চিত্র, ১৮ সেমি

২য় সং; ১৯২৯ (অন্য তথ্যাদি অনুরূপ)

৩য় সং; ১৯৩২ „ „

শি শু পা ঠ্য য শো হ রে র ই তি হা স॥ কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯২৮; ।০, ১৩৯ পৃ; চিত্র, ১৮ সেমি

শি শু পা ঠ্য খু ল না র ভূ গো ল॥ কলিকাতা, সুভাষ লাইব্রেরী, ১৯২৯; ।০, ৪৮ পৃ; মানচিত্র, ১৮ সেমি

২য় সংস্করণ; ১৯৩১ (অন্য তথ্যাদি অনুরূপ)

৩য় সংস্করণ, ১৯৩৩ „ „

শি শু পা ঠ্য য শো হ রে র ভূ গো ল॥ কলিকাতা, সুভাষ লাইব্রেরী, ১৯২৯; ৶০, ৬৪ পৃ; মানচিত্র, ১৮ সেমি

২য় সংস্করণ; ১৯৩২ (অন্য তথ্যাদি অনুরূপ)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

ধ ম্ম প দ॥ অনূদিত; কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯০৫; ২৲, ১৩৭ পৃ; ১২.৫ সেমি (পালি হইতে পদ্যে অনূদিত)

শ্রী অ দ্বৈ ত - প্র কা শ (ঈশান নাগর প্রণীত)॥ সম্পাদিত; কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২৭; ১৶০, ২৮৩ পৃ; ১৮ সেমি

শি ল্প ও সা হি ত্য (মাসিক পত্রিকা)॥ সম্পাদনা; কলিকাতা, ১৩১২-১৪ (১৩১২ আষাঢ় হইতে) দুই বৎসর কাল মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী এবং সতীশচন্দ্র মিত্র যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

পাঠ্যপুস্তক

প্রা থ মি ক বা ঙ্গ লা র ই তি হা স॥* কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ১৯০২

ভা র ত ব র্ষে র ই তি হা স ॥ কলিকাতা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ১৯০৩
অষ্টম (শেষ) সংস্করণ ; ১৯২২

শি শু র ঞ্জ ন ভা র ত ব র্ষে র ই তি হা স ॥* কলিকাতা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ১৯১৬

চতুর্থ (শেষ) সংস্করণ ; ১৯১৯

প্রা থ মি ক ভা র ত ব র্ষে র ই তি হা স ॥ কলিকাতা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ১৯২২

ঐ তি হা সি ক পা ঠ, ১ম ও ২য় ॥ কলিকাতা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ১৯৩০

প্রবন্ধাদি

পত্রিকার নাম	প্রবন্ধ ও তারিখ
'শিক্ষা', সাপ্তাহিক, কলিকাতা	'আর কি সেদিন আসিবে ?' ১৫ই পৌষ, ১৩০১ [গ্রন্থকারের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ] ; 'বাঙ্গালা সাহিত্যের এ অবস্থা কেন', ২৮শে মাঘ, ১৩০১
'সময়', কলিকাতা	'পল্লীগ্রামের লাইব্রেরী', *১৪ই বৈশাখ, ১৩০৩
'হিন্দুরক্ষিকা', রাজসাহী	'নির্ঝরণী', (কবিতা), ২৫শে আষাঢ়, ১৩০৩
'Indian Mirror', Calcutta.	*Maharani Swarnamayee*, Sept. 1, 1897.
? ?	'ভারতে দুর্গোৎসব', *১৩০৪ ['বংশ-মঙ্গলে' উল্লেখিত কিন্তু নির্দ্দিষ্ট করা যায় নাই]
'সমুত্থান', কলিকাতা	'ওপার ও এপার', (কবিতা), ১লা মাঘ, ১৩০৫
'ভারতী', কলিকাতা	'সেনাপতি কালী', পৌষ, ১৩১০ ; 'প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য', ফাল্গুন, ১৩১০ [প্রতিবাদ প্রবন্ধ—'দুমুখো', 'নবনূর' পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩১১] ;

	'ভারতে য়ুরোপীয়', চৈত্র, ১৩১০ ; 'ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন', শ্রাবণ, ১৩১১, 'কালিকট্ট', বৈশাখ, ১৩১২
'ঐতিহাসিক চিত্র', কলিকাতা	'ভাস্কো ডা গামা', ভাদ্র, ১৩১১; 'সীতারামের ধর্ম্মপ্রাণতা', কার্ত্তিক, ১৩১১ , 'মুতাক্ষরীণ ও মুস্তাফা', ফাল্গুন, ১৩১১ ; 'সমসাময়িক ইতিবৃত্তে শিবাজী', চৈত্র, ১৩১১ ; 'হাফেজ', বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪
'শিল্প ও সাহিত্য', কলিকাতা	'নবাবপুত্র', চৈত্র, ১৩১০ [নবাব সুজাউদ্দৌল্লা সম্পর্কে ছোট গল্প] ; 'শিল্প ও সাহিত্য', (কবিতা), বৈশাখ, ১৩১১ ; 'রাজা সীতারাম রায়', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ ; 'পৃথ্বীরাজের পত্র', (পদ্যানুবাদ), আষাঢ়, ১৩১১ ; 'নূতন ও পুরাতন', বৈশাখ, ১৩১২ ; 'মানব জীবন', (কবিতা), জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ; যমুনাকূলে', (কবিতা), আষাঢ়, ১৩১২ ; 'স্বদেশী আন্দোলন', ভাদ্র, ১৩১২ ; 'বন্দে মাতরম্', আশ্বিন, ১৩১২ ; 'রাখী বন্ধন', কার্ত্তিক, ১৩১২ ; 'জননীর চিত্রদর্শনে', (পদ্যানুবাদ, উইলিয়াম কাউপার), পৌষ, ১৩১২ ; 'স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়', বৈশাখ, ১৩১৩ [স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ছাত্রনেতা] ; 'মা ! তুমি কোথায় ?' শ্রাবণ, ১৩১৩ ['উচ্ছ্বাস' পুস্তকে সন্নিবিষ্ট] ; 'মা !' [গান], মাঘ, ১৩১৩ ['বংশ-মঙ্গলে'র পাণ্ডুলিপিতে নিজস্ব রচনা সম্পর্কিত অধ্যায়ে সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন : "১৩১২ সালের

	পূর্ব্বের 'শিল্প ও সাহিত্যে' 'স্বত্বের মোকদ্দামা', 'মানহানির মোকদ্দামা', 'আমি অন্ধ!' প্রভৃতি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।"—পত্রিকার অভাবে এইগুলি নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই।—শি মি]
'উপাসনা', কলিকাতা	'বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টি', আশ্বিন, ১৩১৩; 'কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার', আষাঢ়, ১৩১৪, 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'* [?]
'The Student'	*Pratapaditya, the cause he fought for,** Sept., 1915
'Indian Historical Quarterly'	*Bengal School of Arts*, p. 76, 1925
'মানসী ও মর্ম্মবাণী', কলিকাতা	'গুণানন্দের মন্দির', বৈশাখ, ১৩৩৩ [বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের মন্দির]; 'গ্রন্থ-সমালোচনা'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মোগল যুগে স্ত্রী-শিক্ষা', ভাদ্র, ১৩২৬
'দেবায়তন', দৌলতপুর কলেজ, খুলনা	'হরিদাসের জন্মস্থান',* ১৯২৫ (?); 'নৈমিষারণ্য', অক্টোবর, ১৯৩০; 'দেবর্ষি নারদ', জানুয়ারি, ১৯৩১
'ভারতবর্ষ', কলিকাতা	'সমতটে প্রাচীনত্বের নিদর্শন', আশ্বিন, ১৩৩০ [বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে চতুর্দ্দশ অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় পঠিত এই প্রবন্ধ সংস্কারান্তে প্রকাশিত হয়।—শি মি]

[ইহা ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশনে (যশোহর, বৈশাখ, ১৩২৩) পঠিত প্রবন্ধ 'যশোহরের পরিচয়' নামে এবং সেখহাটিতে পুরাতন মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে '৺ভুবনেশ্বরী দেবী' (১৯২৫-৬ ?) নামে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।—শি মি]

নির্ঘণ্ট

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫২২, ৫২৪, ৫৫৭, ৫৬১-২, ৫৭৯, ৫৯৬, ৬০৪, ৮৫১-২

অতুলবিহারী মল্লিক ৮৪৩

অধিকারী বংশ (ঈশ্বরীপুর) ৪৪৯-৫৩

অনন্ত রায় ১০৮, ১১০-১

'অন্নদামঙ্গল' ৩৪৩, ৩৪৬

অবিলম্ব সরস্বতী ২৪৭-৫২, ৩৯৫, ৬৪৮, ৮৬৬

অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯৯

অভয়ানগর ৫০১-২, ৫০৮-৯, ৮৬১

অভিরাম কবীন্দ্রশেখর ৫৭৬-৭, ৮১৭

অমৃতলাল রায় ৬৮১

অমৃতলাল রাহা, রায় বাহাদুর ৮৩১

অযোধ্যার মঠ ৮৬৬

অষ্টক সঙ্গীত ৮৭৬-৭

অষ্টকোণ মন্দির, ৮৬৬

অস্ত্রশস্ত্র (প্রতাপাদিত্য) ২৩৭-৪০

অস্ত্রশস্ত্র (সীতারাম) ৫৬২

আউলিয়া ৩

আঁধারমাণিক ৮৯-৯০, ৯২, ২৮২, ৪৩৬, ৪৩৮-৯, ৪৪৭, ৪৫৫

আকবর ৯, ১২-৪, ২১, ৪৯, ৬২, ৬৬-৭, ৭০, ১২৫-৮, ১৬৬, ৩৬৪-৫

ও স্থলেমান ১৪

পদ রচনা ১০৪

প্রতাপাদিত্য সাক্ষাৎ ১২৩

সনন্দ প্রদান ১২৭-৮

উড়িষ্যাভিযান ২৫৬-৬২

"আকবরনামা ১৬, ৪৯, ৫৫, ৭৯, ৮০, ২৫৬-৭, ২৫৯, ২৬০

আক্‌মহলের যুদ্ধ ৭১

আখণ্ডল, নাম বা উপাধি ৪৭০

আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য ৪৭০

আগা মুতাহার ৫১২

আজম্ খাঁ ২৫৩-৫৬, ৪৮৮

আজিজল্ হক ৮৪৯

আজিম উশ্বান ৪৬৮, ৫৮৭-৮, ৫৯০-২

আড়াইবাকীর দুর্গ ২০৪-৫

আনন্দচন্দ্র চৌধুরী ৬৮৩, ৮৩৭

আনন্দনাথ রায় ৫২৮

আন্নলিয়ার সিংহ ৬৪০, ৮৩০

আনোয়ারল কাদের ৮৪৯

আব্দুল সমাজ ৬৪০

আফগান বসতি ২৬১

আবজার সেখ বয়াতি ৮৮২

আবদার রহিম স্থর ৫১৯

আবদুল লতীফ ৫৬-৭, ৩৬০, ৩৭৩

আবদুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনী ৩৭৩, ৩৭৫-৬, ৪০৪

আবদুল হামিদ ৮৪৮

আবদুস সালাম ৪৬০, ৮৪৮

আবরাম খাঁ ২৫৫

আবু তোরাপ ৫৯০-৬

আবুল ফজল ৭৬৭, ৮৩২

আমল বেগ, 'হামলা বাঘা' ৫৩৮

আমীন-উল ইসলাম ৫১৯

আমীরাবাদ পরগণা ৪৪৩

আর্‌সাদ্ বিশ্বাস বয়াতি ৮৮২

আরাকাণ ১৩২, ১৭২-৩, ১৭৬-৭, ১৮৩-৬, ২৯০-২, ৩১৭, ৩২৭, ৫৩৫

আলম্‌গীর নগর ৫২৯

আলিবর্দ্দী খাঁ, নবাব ৪৯৯, ৫০১-০২

আশ্‌গুহ ৫৯, ১০৯, ১১৪
আশুতোষ গাঙ্গুলী, নীলবিদ্রোহ ৭৯৫
'আসল তুমার জমা' ৮৪-৫
'আসল তুমার জমা,' বঙ্গে আয় ৮৪
আসানউল্যা, খাঁ বাহাদুর ৮৪৯
'আসান নারায়ণ' ৮৭৫

ইউয়ার্ট সাহেব ৬৯৭-৮
ইছাপুর ১৪২-৩, ৩৩৯, ৪২৩, ৮১৪
নবরত্ন মন্দির ১৪৩, ৮৬২
ইজারাদার ৭১৭
ইডেন্ (Hon'ble Ashley) ৭৮৪-৫
ইণ্ডিগো কমিশন ৭৯১-২
ইতনার রায়বংশ ৬৪৪-৬
মঠ ৬৪৫, ৮৬৪
ইতিহাস ও উপন্যাস ৫২১-৩, ৫৯৫, ৫৯৮
'ইতিহাস রাজস্থান' ৩৩৩, ৩৬৯
ইদু বিশ্বাস, বয়াতি ৮৮১-২
ইনায়েৎ খাঁ ১৬৫, ৩৭৮-৮০, ৩৮৫, ৩৯০-৯, ৪৫৪-৫
ইনায়েতপুর ৪৫৫
ইবন্ বতুতা ৫৩,
ইব্রাহিম খাঁ, নবাব ৪৬৬-৮
ইব্রাহিম খাঁ চিস্তি ২৫৫
ইব্রাহিম খাঁ স্থর ১১, ১৩
ইমাদুল্ হক, কাজি ৮৪৯
ইমামবারা ৮৬৭
হুগলী ৫১৫-৮, ৫২০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ৬৯৩-৪
ইস্‌লাম খাঁ, নবাব ৫৬-৭, ৩৫৮, ৩৭১-৩৮১, ৩৯৮, ৪০৩-৪
ইস্‌লাম শাহ ১০
ইস্তাফা-গেলা দাস-বংশ ৪৭৮-৯
ইহ্‌তামাম্ খাঁ ৩৭৩-৪, ৩৭৬, ৩৯৩

ঈশপপুর পরগণা ৪২১, ৪৯৩, ৪৯৬-৯, ৫০৪, ৬৮২, ৭০২, ৭৩৯
ঈশা খাঁ, কর্ত্তাভু ২৬-৭, ৩০, ৩২, ৩৭, ৩৮-৩৯, ২৫৭, ৩৩৩
ঈশা খাঁ লোহানী ২৭, ৩০, ৩৫-৭, ১৩৩, ২৩৩, ২৫৮, ২৭৯, ২৮৩-৫
ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৮৭০
ঈশ্বরী পট্টনায়ক ২৭, ২৮৭
ঈশ্বরীপুর ১৩৭-৮, ১৪৮-৫১, ১৫৬, ২৯৯, ৩০১, ৩৩৬, ৩৯৩, ৪৪৯, ৮১৩, ৮৫৮, ৮৬৩

উইলফোর্ড ২৫
উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ২৭০-৩
উৎকুল গ্রাম ৯৫, ৪৩৬, ৪৪৬, ৮২১
উত্তরপাড়া নিয়োগী-বংশ ৬৭৩
উদয়চন্দ্র ১১৩
উদয়নারায়ণ, রাজসাহী ৫৯০
উদয়াদিত্য ১০৮, ১১১, ১১৩, ১১৫, ২০১, ২২৯, ২৪১, ৩০১, ৩৯৭, ৩৯৮-৪০১
জন্ম ২৪১
সালখার যুদ্ধ ৩৮৩-৯
কুশলীমাঠের যুদ্ধ ৪০০-০১
রামচন্দ্র বিবাহ-দুর্ঘটনা ৩২৩
উদ্ধারণ দত্ত ৮৩৭
'উদ্ভট-সমুদ্র' ২৪৯
উপবীত আন্দোলন, বৈশ্য-কায়স্থ ৮৩২, ৮৩৩
উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৮১৮, ৮২১, ৮৭০
উলসী ৮৪৪

ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ৮১৪

একডালা দুর্গ ৩৯
এক-বাঙ্গালা মন্দির ৮৬৩

একযায়ী (একজাই) ৮২৬
একোয়াভিবা ২৫, ২৯৪
এগারসিন্ধু দুর্গ ৩৯

ঐতিহাসিক উপন্যাস, দ্র. ইতিহাস

ওয়াইজ, ডক্টর ২৫-৬
ওয়াক্‌ফ বা ট্রাষ্ট সম্পত্তি ৭১৮
ওয়েষ্টল্যাণ্ড ৪৬২, ৭০৭
ওসমান খাঁ ৩০, ৩৫-৭, ২৫৯, ৩৩৩, ৩৭৮, ৩৯৭, ৪০৫
ওহ্‌দেদার ৪৪০-১

কংসনারায়ণ, বোধখানা ৬৮০-১
কংসনারায়ণ, রাজা ৩০, ৩৩
কঙ্কণ দীঘি ২০৬
কচু রায় (রাঘব রায়, যশোহরজিৎ) ১১৫, ১১৭, ১৩০, ২৭৯-৮০, ২৮৩, ৩৪২-৩, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৭, ৪৩৭-৯, ৪৪৩
কঞ্চিকার খাল ২০৪
কতলু খাঁ ১৫, ৩০, ৩৫, ৬৬, ২৬১-২
কথকতা ৮৭৩
কন্দর্প রায়, চাঁচড়া ৪৯০-৩
কন্দর্পনারায়ণ ২৬, ৩০, ৩৮, ৪৩-৪, ২৮৯-৯১
কপালী জাতি ৮৪৩-৪
কবিকঙ্কণ ২১-৩, ২১৩-৪, ৮৫৪
কবিদারগণ ৮৭৯
'কবিরাজের তালুক' ৫৭৭
কবি-সঙ্গীত ৮৭৮-৯
ক'বেল কামিনী ৮৭৯
কমল খোজা ১৩৫, ২২৯, ৩৫৭, ৩৮৫-৩৮৮, ৩৯২
•কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন ৮৮-৯১, ১৩৮, ২৪৭, ৮১৪
কমলনারায়ণ অধিকারী ২৬৬, ২৬৮
কমলনারায়ণ, রাজা ৬৭৬-৮
কমলপুর দুর্গ ১৯৫-৭
কমলা রাণী, সীতারাম ৫৪৬
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৩৬৮
কমলাকান্ত রায় (মহম্মদপুর) ৬০২
কয়ড়া কালীবাড়ী, ফরিদপুর ৫৪৫
কয়লাঘাট, খুলনা ৬৯৫
কররাণী বংশ ১৬
'করাতিয়া' ব্যাস ৪৮৭
করিম খাঁ, সা-তৈর ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৬৬
করুণাময়ীর ঘাট ১৯৪
কর্জ্জন, লর্ড ৮৫৭
কর্ত্তাভজা ৮৪৪
কলম বিশ্বাস, বয়াতি ৮৮২
কলাবিদ্যা ৮৫১
কলিকাতা, কিসমত ৪৯৩, ৪৯৮, ৫০০
কলিকাতার দুর্গ, প্রতাপাদিত্য ২১১
কল্কীশ দত্ত-বংশ ৪২০-৫
কল্পতরু যজ্ঞ (প্রতাপাদিত্য) ২৪৬-৭, ৩৩৪, ৩৩৮
কাঁকশাল জাতি ১২৭-৮
কাঁকশিয়ালীর খাল ১২৭
কাঁচড়াপাড়া ৩৩৮
কাগজ, ভূষনাই ৫৪৩
কাগরাঘাট, দ্র. খাগড়াঘাট
কাচিকাটা কুঠি ৭৮৪
কাটগড়া কুঠি ৭৭১, ৭৮৬
কাটুনিয়া রাজবংশ ২৬৭-৭১, ৪৪৫
কাড়াপাড়া ১০৭, ৩৩৮, ৬৫৬-৬২
কাড়াপাড়ার কারিকা ১০৮-১৬
কাড়াপাড়ার রাজবংশ ৬৫৬-৬২
কানাইনগর মন্দির ৫৬০ ৫৭৮-৮১
কান্দী ৪৮৭-৮, ৫২৫
কাপড় কারখানা ৬৯৯-৭০০, দ্র. তুলা

কামদেব (পীরালি) ৮৫০
কামদেব, ঠাকুরবর ৩১৮, ৬৭৭
কামদেব, তার্কিক ৫৪৩-৪
কামদেব, ব্রহ্মচারী ৩৪৩, ৩৫৩, ৪১৪-৫
কামান, প্রতাপাদিত্য ২৩৭-৯
কামান, মীর্জানগর ৪৬২
কামান, সীতারাম ৫৬৩
কামারথালি ১৩৫, ১৫৯-৬০, ৩৯৩, ৪০২
কায়স্থ সমাজ ৮২২-৩৩
দক্ষিণরাঢ়ীয় ৮২৫-৩৩
বঙ্গজ ৮২২-৫
কার্ত্তুস্ রণতরী ৩০৪, ৩০৭
কার্ভালো ২৯১, ৩০৩-২০
কার্ভালো ও পাদরীগণ ৩০৩-২০
কার্ষাপণ ৭৪-৬, চিত্রসূচী দ্র.
কালনীর দত্ত ২২৮
কালাপাহাড় দ্বিতীয় ১৩, ১৫, ২১, ৬৩
কালি ৬৮১
কালিকাপুর মঠ ৪৭৪, ৪৮৪-৬
দুর্গ, সীতারাম ৫৬৭
কালিদাস, মহাকবি ৮৪০
কালিদাস রায় (ঢালী) ২৩০, ৩৫৭, ৪১৯-২৫
কালিন্দী নদী ৯৭, ১৩১, ৩৫৪-৫, ৩৯৩
কালিয়া ৮২০
কালীকান্ত রায় ৬৮২-৪
কালীকিঙ্কর অধিকারী ৪৫০
কালীগঞ্জ, নামের উৎপত্তি ১৯৫
কালীঘাট ১০৫, ৪৩৬
কালীঘাট হালদার বংশ ৮৯-৯০
কালীঘাটের মন্দির ৮৭, ৮৯-৯০, ১৯৩
কালীনাথ মুন্সী ৯৪, ৮০১
কালীপদ বসু (শ্রীপুর), ১৫৬, (হরিশঙ্করপুর) ৮২৮
কালীপোদ্দারের রাস্তা ৮৩৭
কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ৮২০, ৮৭০
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৭৫১
কালীপ্রসন্ন রায় ৭৩০
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৭৯৩
কালীপ্রসাদ রায় ৮৩৭
কালীশঙ্কর, ভূকৈলাসের রাজা ৭৪০-১
কালীশঙ্কর রায় ৬১৯-২০, ৬৯৬, ৭২০-৭২৮, ৮৭৫
কালে খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ ৫৬৩
কালেক্টর, প্রথম ৬৯৪ ৭০০, ৭০২
কাশিম খাঁ ৫২৮-৩০
কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী ৭৪২-৫
কাশীনাথ, রাজা সমর সিংহ ৩৩৯
কাশীনাথ দীক্ষিত ৩৩৬, ৮৫৩
কাশীপুর, কলিকাতা ৭৩১
কিঙ্কর সেন (ভুঞা) ২৮, ৩৩৭, ৬৪৭-৮
কিঙ্কর সেন, হুগলী ৩৩৭, ৬৪৭
কিন্নর জাতি ৮৪৩-৪, ৮৭৪
'কিমাৎ খিশ্‌তকার' ৮৫৭
কিরণচন্দ্র রায়, রায়বাহাদুর ৭১৩, ৭২২
কিল্‌মক্ ৩৪৪
কিল্লাবাড়ী ৪৬২
কীর্ত্তিনারায়ণ ৩২৪, ৩৩০
কীর্ত্তিপাশা ৪৭৯, ৬৫০
কুকী সৈন্য ২৩২, ২৩৭, (ছবি) ৩৫৯
কুমারকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী ৭৪৫
কুমিরা ৪২৩
কুমুদবিহারী মল্লিক ৮৪৩
কুশদ্বীপ ১৪২-৩, ৩৩৯
কুশলীর মাঠ ৩৯৩, ৪০০-০১
কৃষ্ণ পাণ্ডে ২৭, ২৮৭
কৃষ্ণকান্ত সেন (দেওয়ান) ৪৪৭
কৃষ্ণচন্দ্র ওহদেদার ৪৪০
কৃষ্ণচন্দ্র দাস, ইস্তাফা-গেলা ৪৭৭-৯

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ৮২০, ৮৬৯
কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা ৪১১-৩
কৃষ্ণজী মন্দির, মহম্মদপুর ৫৭৮
কৃষ্ণদাস গুহ, বিদ্যাধর রায় ১১২, ১১৫
কৃষ্ণনগর রাজবংশ ৪১০-৩
কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী ৫৪৫, ৫৮০, ৬২৬-৬৩০
কৃষ্ণমন্দির, ধুলগ্রাম ৫১০, ৮৬৩
কৃষ্ণরাম দাস ২০৭
কৃষ্ণরাম সেন ৪৭৮-৯, ৬৫০
কৃষ্ণরায় দত্ত ১১৭
কৃষ্ণলাল দত্ত ৭২০, ৮৩০
কৃষ্ণসাগর ৫৬০,৫৮১
কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ৮১৪, ৮৬৯
কৃষ্ণানন্দ মজুমদার কবিরাজ ৯৬, ৮২১
কেদার রায় ২৬, ৩০, ৩৭-৪১ ২৯১-২, ৩০৩-১১, ৩৩৪, ৩৬৫, ৩৬৮-৩৭০, ৪০৫
কেদারনাথ ঘোষ, নীলবিদ্রোহ ৭৯৫
কেদারনাথ, সাংখ্য বেদান্ততীর্থ ২৫২
কেরলকাতা ৯৬
কেরী সাহেব ৮৭১-২
কেশব ঘোষ, রাজা ৪২০-১
কেশব ভট্ট ৩৫৭
কেশব ভারতী ২৪৯-৫১
কেশবপুর ৭৭, ২৫৪-৫, ৪৬৯, ৬৯৫, ৭৬১-২, ৮৮০
কেশবলাল রায়চৌধুরী ৪২৪, ৮৩০
কৈবর্ত্ত জাতি ৮৩৯-৪১
কৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৮১১
কোটচাঁদপুর ৪৭৩, ৭৬২-৩
কোড়কদি ৫৩১, ৫৬৫
কোদলার মঠ ৬৪৯, ৮৬৪, ৮৬৬
কোন্নগর ৮২৫
কোরবান মোল্লা, বয়াতি ৮৮১
কোশা নৌকা ২১৪-৫, ৩০৬, ৩২৪, ৩৮৫, ৩৮৮-৯, ৬০৩
ক্যানিং, লর্ড ৭৯০
ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ ৭৩৮-৯
'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত' ৩৪২, ৩৪৫-৩৪৬, ৩৫০, ৩৫৮
ক্ষীরোদপ্রসাদ ১১৯, ৩২১
ক্ষীরোদবিহারী মল্লিক ৮৪৩
ক্ষৌণীশচন্দ্র, মহারাজ ৪১১

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৫১১, ৮৭০
খড়গড়া কুঠি ৭৭২
খড়রিয়া পরগণা ২২৮, ৬৬৬-৭, ৭৪২-৫
খরাত্তন ঘাট ৩৯৩-৪
খর্পর পুষ্করিণী ১৪২
খলসিয়ানী ২৫০
খাঁ জাহান (হুসেনকুলি খাঁ) ৭১-২, ৭৮
খাঁ জাহান আলি ৬৭, ১৬৩, ১৭৪, ২৩৫, ২৬৩, ৪৯১, ৫৬৩, ৫৭৪, ৭৩৪, ৮০৮, ৮৪৭ ৮৫৫
খাঁ জাহান আলি সমাধি ৮৬৭
খাঁ-সমাজ ৮৫০
খাগড়াঘাট ১৬৫, ৩৯৩-৪, ৩৯৬-৮
খাজা আব্বাচ ২৩১
খাজাবাড়িয়া ২৩১
খাড়াসম্বলের মল্লিকগণ ৮৩৬, ৮৭৩
'খাদা' ও গ্রামের নাম ৬৩০-১
খানখানান্‌পুর ৪২
খানপুর ৪৪৩, ৪৪৬-৭
খারিজা ও বাজেয়াপ্তী ৭১৫
খালিফাতাবাদ ৫, ২৬০-১, ৬৫৭, ৭১১
খালিসপুর ৫১৯, ৫০৭
নীলকুঠি ৭৭৫
খিলান ৮৫৮, ৮৫৯-৬০

খুল্‌না
খুল্লনেশ্বরী ও লহনেশ্বরী ৭০৫
জেলাগঠন ৭০৩
নয়াবাদ ও ধরমপুর থানা ৬৯৫
নিমকচৌকি ৬৯৫, ৬৯৭
পুরাতন অট্টালিকা ৭০৭
মহকুমা (বঙ্গে প্রথম) ৭০২
সদর ষ্টেশন ৭০৫-০৬
হাট (সাহেবের হাট) ৭০৭
খৃষ্টান পাদ্‌রীগণ ২৯৩-৩০২
খেলারাম (দাতা) ৫৮৩
খেলারাম মুখোপাধ্যায় ৭৫১
খোঁড়গাছি ৮৮, ৯২, ২৩৮-৯, ৩৩৫, ৪৪২, ৪৪৭-৮, ৮২৪
'খোদা-পাদারবিন্দদ্বয়...' ৪৬৪

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ৬১৩
গঙ্গাজল (অস্ত্র) ২৭৭-৮
গঙ্গানন্দপুর ৬৮০-১
গঙ্গামূর্ত্তি ১৪০-১
গঞ্জেলিস্‌, সিবাষ্টিন ১৮৬, ৪৫৬-৮
গড় ১৯৪-৭
গড়ের হাট ১৯৬
গণপতি নরেন্দ্র ৩৫৭, ৩৬০
গণেশ মূর্ত্তি ৮৫৩
গণেশ, রাজা ৫২৫
গণ্ডার ১১৯, ২৩৫
গন্ধখালি ৬০০
গরিবশাহ মস্‌জিদ্‌ ৮৬৭
গাজী ৮৭৭
গাজীর গীত ৮৭৭-৮
গাজীগণ (ভুঞা, ভাওয়াল) ৩২
গাজ্রি ৮১২
গাদিগুমা ১৯৭
'গালিম গোপাল' ৪৭৪
গিরীন্দ্রনাথ রায়, রাজা ৪৪৮
গীর্জ্জা (বঙ্গে প্রথম) ১৪২, ১৬৪, ২২১, ২৯৬-৩০২, ৩১৪, ৩১৭
গুঁদি বা ডক্‌ ২২২-৩
গুঞ্জানাথ মন্দির ৪৮০, ৪৮৩, ৮৬১
গুড় বা চিনির ব্যবসায় ৭৫৭, ৭৬২-৫
প্রস্তুত প্রণালী ৭৫৮-৬১
গুণানন্দ ১৫, ৬০, ৬৭, ১০৮, ১১২, ১১৪-৫
গুপ্তজয় ৪০৩
গুয়াতলীর মিত্র ৭২২-৩, ৮২৮-৯
গুরুসত্য গীত ৮৭৬
গেরিলাযুদ্ধ ৩৯২, ৫৯২-৩
গোকুল ঘোষাল ৬৫০
গোপাল ঘোষ ১০৮, ১১০, ১১৪-৫
গোপালদাস বসু ১১০, ১১৫
গোপালপুর ৮৭, ১০৬, ২৬২-৫
দরগা ৮৬৭
গোপীমোহন ঠাকুর ২৬৫
গোবরডাঙ্গা ৭৭, ৩১৮, ৩৩৯, ৭৫১
গোবরডাঙ্গা জমিদারী ৭৫১
গোবিন্দ অধিকারী ৮৭৪
গোবিন্দ তাঁতি, কবিদার ৮৭৯
গোবিন্দ রায় ১০৩, ১১৭, ১৩০, ২৭৪, ২৭৬-৭, ২৭৯-৮০, ৪৩৭
গোবিন্দদাস ৮৩, ১০২-০৬
গোবিন্দদেব ৮৭, ১০৩, ২৬০, ২৬২-২৭০, ৩৫০, ৪৩৯
গোয়াস্‌ সহর ৩৭৫
গোলাগুলি (প্রতাপাদিত্য) ২৩৮-৯
গোসাঁই গোরাচাঁদ ৫৪৩-৫, ৫৮৫-৬
গৌড় ৭, ১৩, ৭১, ৭৩, ১৫৪, ৬২৩
গৌড়বঙ্গের রাস্তা ৩১৯, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৭৫
গৌড়ের কীর্ত্তি ধ্বংস ৮৫৭

গ্রাণ্টসাহেব ৭০৮-৯, ৭৮৫, ৭৯০-১, ৭৯৪

ঘলঘলিয়া ৯৬
ঘাইবী ৩৭৩
ঘাটভোগ ৪৭০
ঘুরাব রণতরী ২১৫, ২১৮-৯, ৩৮৪-৬
ঘুল্লিয়া-গ্রাম ৫৪৬
ঘোড়াঘাট ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮২
ঘোড়াদীঘি ২৬৩
ঘোড়ানাল ফকির ১৯৫
ঘোষদুহিতা ও মঠ ৬৪৫-৬
ঘোষবংশ ৮২৬-৭

চকশ্রী বা চাকশিরি ২০৮-১০, ২২৯, ২৩১, ২৭৬, ৩৩৫, ৫৮৩
মস্‌জিদ্‌ ২০৯
চট্টগ্রাম ১৭২, ১৭৫-৮, ১৮২, ১৮৬, ১৮৯, ২৯৫, ৩০৭, ৩১৬-৭
চড়ক সঙ্গীত ৮৭৬-৭
চণ্ডভৈরব ৭৫, ১৪০-১, ৮৬১
চণ্ডীচরণ ঘোষ ৪২৩, ৮২৭
চণ্ডীদাস গুহ (জগদানন্দ) ১১২, ১৩০
চণ্ডীপুর ১৫৬, ২৩৭
চণ্ডীবর তপস্বী ৮৮-৯, ৯১
চণ্ডীবর বসু ৭৪৬-৮
চণ্ডীবরপুর ৬৮১
চতুরঙ্গ ভদ্র ৭৫৬, ৭৫৮
চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি ৮৫৩
চন্দননগর, হুগলী ৩৩৭, ৬৪৭
চন্দনপীড়ি মন্দির ১৫৪
চন্দনীমহল ৮১৬, ৮১৮
চন্দ্র দত্ত ৭৯৯
চন্দ্রকোণা মেদেনীপুর ৬১৬
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৭৯১
চব্বিশ-পরগণা ৩৩৯, ৪৫১, ৪৯৮, ৫০০, ৭০৩
চাঁচড়া, রাজধানী ৪৯১
শিবমন্দির ৬৪১, ৮৬০
চাঁচড়া রাজবংশ ২৮, ২৫৪, ৪৮৭-৫১১
চাঁচড়া রাজ্য ৪৯৭, ৫০৩-৫
প্রতাপ-পরবর্ত্তী যশোহররাজ ২৫২, ৪৮৯
ভিত্তি ৪৮৯
যশোহর-জেলাভুক্ত ৭০২
চাঁদ খাঁ মছন্দরী ৬৭-৮, ৭৪
চাঁদরায় (চন্দ্রশেখর) ১০৯, ১১৫, ১১৭, ১৩০, ১৬১, ২৩০, ২৬৪, ২৮৩, ৪৩৭-৪১
চাঁদরায় (ঢাকা) ২৬, ৩০, ৪০
'চাঁদরায়ের দীঘি', ধুমঘাট ১৬১, ৪৩৯
চাঁদরায়ের সনন্দ ২৬৪-৫
চাকরান সম্পত্তি ৭১৮
'চাকলা' সৃষ্টি ৪৪২
চাকশিরি, দ্র. চকশ্রী,
চাপড়া ৩৪৫, ৩৫১
চামুণ্ডা মূর্ত্তি, আমাদি ৮৫৩
চারঘাট ৩১৮-২০, ৩৫১, ৩৮৩, ৬৭৭
চারুচন্দ্র ঘোষ (জজ্‌) ৮২৭
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৫৩, ৮৪০
চিংড়াখালি রাজবংশ ৬৫৩, ৬৫৫
চিনি, দ্র. গুড়,
চিরঞ্জীব সেন (শ্রীখণ্ড) ১০২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮৫, ৪৫০, ৪৮১, ৭০৮-১৪
কুফল ৭১৩-৪
চাঁচড়া রাজ্য ৫০৩-০৫
নাটোর রাজ্য ৭২৬
যশোর রাজ্য ৮৫, ৪৫০
সুফল ৭১২-৩

চিরুলিয়া ৫৭১, ৭৫১,
চেতুয়া-বর্দ্ধার পরগণা ৪৬৭
চেরাগী সম্পত্তি ৭১৮
চৈতন্যদেব ৬, ১০২-৩, ২৪৯-৫০, ৬২৬
চোলেট সাহেব (স্যালেট) ৭০৭
চৌখণ্ডী ৬৭০-১
চৌগাছা, নীলবিদ্রোহ ৭৮৬-৭
চিনি-কারখানা ৭৬২
চৌধুরী-সমাজ, মুসলমান ৮৫০
চৌবেড়িয়া ৩৩৯, ৭৮৮, ৭৯২, ৮২৮
চৌষট্টি-যোগিনীঘাট, কাশী ১৪৫, ৪০৪
চ্যাণ্ডিকান ২৫-৬, ৩০, ৩৭, ৬৭, ১৪৯-৫৩, ২৯৪-৫, ৩০০, ৩০৮-৯, ৩১১-৫, ৩১৮, ৩২৭

'ছায়াপতি তালুক' ৭৩৫
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৪৮০, ৬৯৪
ছুটি খাঁ, (মহাভারত) ৫

জগৎ, রায় ৪১০
জগৎসহায় দত্ত ১৯৯, ২২৮, ২৩৬
জগৎসিংহ ৩৬, ২৫৬, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৬৫
জগদিন্দ্রনাথ (মহারাজ) ৬২২, ৬২৪-৫
জগদেকনাথ মূর্ত্তি ৫৭১,৬৬৫
জগদ্দল ১৯৯-২০০, ২০২, ২২৮, ২৮৫, ৩৩৮
জগদ্বন্ধু ভদ্র ১০৩, ১০৫
জগন্নাথ মূর্ত্তি ৬৩
জঙ্গ, ২১৭-৮
জঙ্গল বাধাল ৪২৫, ৮১৫, ৮২৮
জটার দেউল ২০৬-০৭, ৮৬৪-৫
জবরদস্ত খাঁ ৪৬৮
'জমা কামেল তুমারি' বঙ্গে আয় ৮৪
জমাল বা জামাল খাঁ ৩৫, ২২৯, ২৫৯, ২৬১-২, ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৭
জমিদার ও ডাকাইতি ৬৯৫
জমিদার ও মালগুজারি ৪৯৫-৬, ৬৮৫
জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (ঈশ্বরীপুর) ৪৪৯-৫২
জয়চাঁদ মণ্ডল, গাইন ৮৭৭
জয়দেব (পীরালি) ৮৫০
জয়নগর ২০৬
জয়রাম রায় ১৫৭
জয়রাম হাতীর গড় ২০৬
জয়লাল বিশ্বাস, বয়াতি ৮৮২
জয়সিংহ (জয়পুর) ৩৫৮
জয়ানন্দ মজুমদার ৩৭০, ৪১৩
জর্দ্দাল বন্দুক ২৪০
জলিয়া, জালিয়া বা জল্‌বা ২১৪-৬, ৩১০, ৩১৩, ৩৮৫
জলেশ্বর, উড়িষ্যা ২৫৮-৯
জসিমুদ্দিন বিশ্বাস ৫০৫
জাঙ্গাল ১৯৪-৫
জানকীবল্লভ, বসন্তরায় ৬০, ৬৩, ৬৫, ১০৮, ১১২, ১১৫, দ্র. বসন্ত রায়
জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ৬৬৬
জানকীবল্লভ মজুমদার ৯৬, ৩৩৮, ৫৭০-৫৭১, ৬৬২-৮
জানকীবল্লভ, মূলঘর, তিন ৬৬৬
জামালপুর, মুর্শিদাবাদ ৬১৬
জারীগীত ৮৮০-২
জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ ৩৭১ ২২০-৩, ৮৫৫
জাহাজ-নির্ম্মাণ ২১২
'জাহান কোষা' ৫৬২
জিতামিত্র নাগ (কবিশ্চন্দ্র) ১০৮, ১১১, ১২১
জুম্মা মস্‌জিদ, যশোর ১৬৩-৪, ৮৬৭
জীবজন্তু, মৃৎফলক ৫১০

জেমো-কান্দী, মুর্শিদাবাদ ৪৮৭-৮
জেলা, বঙ্গদেশে প্রথম ৭০০, ৭০২
জেসুইট সম্প্রদায়, দ্র. পাদ্রীগণ
জোড়-বাঙ্গালা ৪৯২, ৫১০, ৫৭৮, ৬৩১, ৬৬৪-৫, ৮৬৩-৪
জোড়াদহ কুঠি ৭৭২, ৭৯০
জ্ঞানদাকণ্ঠ রায় ২৫৪
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ৮৩০
জ্বালামুটা ২৭, ২৮৭

ঝালকাটি ৫২৯-৩০
ঝিঙ্গারগাছা ৭৬২
ঝিনাইদহ ৬৯৬, ৭০৩, ৮৮০

টাঁকশাল, প্রতাপাদিত্য ২০৭, ৩৩৫
টাকী ৯৪-৫, ২২৮, ২৩০, ২৬৭, ২৭১, ৩৫৩, ৪২৮, ৪৪১
টাকীর মুন্সীবংশ ৯৪-৫, ১৫৪, ২৬৭, ৪৪৭, ৮০১
"টা'কোয় আড়…" ৭৫৪
টিবির মোহনা ২০১-২, ৩৮২-৩, ৩৯৩
টুকার সাহেব ৫০৪-০৫
টেকা সমাজ ৮২৯
টেঙ্গা মস্‌জিদ ১৬৩-৪, ৩৪৩, ৮৬৭
টোডর মল্ল ৩৪, ৪৭, ৬৭, ৭০, ৭৮-৮০, ৮৪, ১২১, ১২৩, ১২৭-৮, ১৬৭, ২৫৩, ২৬০, ৩৩২
    বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ৭৯-৮০
ট্যাভারিস্‌ ১৭৫

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৮৬৯
ঠাকুরবর (কামদেব) ৩১৮-৯, ৬৭৭

ডম্বল সাহেব ৬২২, ৭৯৫
ডাকাইত, দ্র. দস্যু
ডাকাইতি ও জমিদার, সারকিউলার ৬৯৫-৬
ডামরেলী ৮৭, ৯৭-১০১, ১৫৮, ৮৬২
    সমাজমন্দির ৯৮, ৮৬২
ডিঙ্গা (নৌকা) ২১৩-৪
ডিঙ্গি ২১৭
ডিম্‌ডিম্‌ সরস্বতী ২৪৮, ২৫০, ২৫২
ডিয়াঙ্গা (চট্টগ্রাম) ১৭৮, ১৮৪, ২৯৫-৬ ৩০৭
ডু-জারিক ২৫, ২৯৪, ২৯৬, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১১-৪, ৩১৮, ৩২৭
ডুড্‌লী, এফ ২১৯, ২২১, ২৩১, ২৩৬
ডোলার কন্যা, ১২৬, ৬৬৪-৫

ঢাকা, ৭৬৮
ঢাল ও সড়কী, ২৫৫
ঢালীসৈন্য, ২৩৪-৬, ৩৮৩, ৩৫৯

তরিবুল্যা 'কারিকর', ৮৭৮
তবিবুল্যা, বয়াতি ৮৮০-১
তর্কপঞ্চানন ৮৮-৯১, ১৩৮, ২৪৭, ৮১৪
তর্জ্জা ৮৭৮-৯
তাঁতিয়া তোপে ৭৮৯
তাজ খাঁ ১০, ১২
তাণ্ডা (টাঁড়া) ৬৩
তামাক প্রবর্ত্তন ১৯০
তারক কাঁড়াল, কবিদার ৮৭৯
তারকচন্দ্র রায়, (রায় সাহেব) ২২৮
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮১৪, ৮৭০
তারপুর চিনির কারবার, ৭৬৪
তারাদেবী (রাণী ভবানী-কন্যা) ৫৫৭
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ৪১০, ৮১৪
তারালি ১৯৬
'তারিখ-বাঙ্গালা', ৫৯২, ৬০৫
তারিণীশঙ্কর ঘোষ, পাচালী ৮৭৫

তালীশের গ্রন্থ ১৮২, ৪৫৭
তালুক ৭১১, ৭১৫
তিতুমীর বিদ্রোহ (১৮৩১), ৪৬৫
'তিন-মজুমদারের বঙ্গ ভাগ', ৩৭০, ৪১৩
তুকরাই যুদ্ধ, ৭০-১
তুলার বাণিজ্য ৬৯৯-৭০০, ৭৫৩-৭
তুলার বাণিজ্য, ভূষণা ৫৪৩
তেতুলিয়া ৮৪৮-৯
মস্‌জিদ্‌ ৮৬৮
তেরকাটি ১৪৯, ১৫৪-৬
তোরণদ্বার ৫০৭, ৫০৯, ৮৬৭
ত্রিকোণ মন্দির ১৪১-২, ৮৬১
ত্রিকোণ মুদ্রা ৫৫, ১৪২, ৩৩৪-৭
ত্রিগুণাচরণ সেন ৮১৯
ত্রিনাথের পাঁচালী, মেলা ৮৭৫
ত্রিমোহানী ১৬৩, ২৩৭, ৪৫৯, ৪৬১-৪, ৪৬৯, ৪৯১, ৫০৩, ৭৬২
ত্রিশূল বা 'খুন্তী', মন্দির ৮৫৯

দনুজমর্দ্দন ৪৩, ১৭৪
মুদ্রা ৫৫
দম্‌দম্‌ ১৫৮
দম্‌দমা ১৫৮ ১৯৭, ২০২
দয়ারাম রায় ৫৯৮-৬০৪, ৬০৬
দয়ারামপুর ৬০০
দরগা ৮৬৭
দশভুজা দুর্গা-মন্দির ৫৭৮, ৮৬৩
দশমহাবিদ্যা ৫০৬-০৮, ৮৬৩
দশানিগ্রাম ৭১১ (নাম), ৮৩৫
দস্যু, ডাকাইত ১৮৭, ৫৩৫-৬, ৫৩৮-৪০, ৬৯৬, ৭০০
দাঁতিয়া পরগণা ৪২৩
দামোদর (কবি) ১০৩
দায়ুদ শাহ ১৫-৮, ২১, ৬৩, ৬৫-৭, ৭৩, ৭৮-৯, ১৬৮
আক্‌মহলের যুদ্ধ ও মৃত্যু ৭১-২
তাণ্ডায় আগমন ৭০
পরাজয় ও পলায়ন ৬৯
দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তি ৮৫৩
দাশু রায় ৮৭৪
'দাস' ও 'দাশ' ৮১৬
দাস-পলশা, বীরভূম ৫৪৬
দিকপতিবাবু, নীলবিদ্রোহ ৭৯০
দিগম্বর বিশ্বাস, নীল-বিদ্রোহ ৭৮৬
'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' ৭৫-৬, ২৫৪
দিঘলিয়া, ৫৯৫, ৮২৭-৮
দিদার খাঁ মস্‌জিদ ৮৬৮
'দিন যায় বউএর…' ৭৫৪
দিব্বোক কৈবর্ত্ত ৮৩৯
দিলাওয়ার, সন্দীপ ৪৫৭-৮
দীঘির বিল ১৬১
দীননাথ সিংহ ৭৯৮, ৮০০, ৮৩০
দীনবন্ধু মিত্র ৩৩৯, ৭৮৮, ৭৯২-৪, ৮২৮, ৮৬৯, ৮৭৩
দুধ্‌লি (ডক্‌) ২২১-৩
দুয়েম কানুন ৭১৪, ৭১৭
দুর্গাচরণ লাহা (মহারাজ) ৮০৬-৭
দুর্গাদাস সমাদ্দার ২২৭
দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তন ৩৩
দুর্গাপ্রসাদ রায় ৭৩৮
'দুর্গেশ-নন্দিনী' ৩৬, ৮০৪
দুর্জ্জন সিংহ ৩৩৩, ৩৬৫-৬
'দে' বা 'দেব' ৬৭২
দেউল, দ্র. মঠ
দেওয়ান ও নাজিম পদ ৫৮৭
দেগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গা ২৮, ৩৩৭, ৬৪৭-৮, ৬৭০, ৮৫৫
দেবনাথ রায় চৌধুরী ৭৩৩-৪
দেব-বংশ ৬৬৮-৭৪
'দেবায়তন' ৫৪৩

দেবিদাস বসু ১১০-১
দেবিবর ঘটক ৪৭১, ৮১২
দেবীবাজার ৭৪৩
দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (রায়বাহাদুর) ৮২৭
দেবোত্তর সম্পত্তি ৭১৭
দোলমঞ্চ ৮৬৭
দৌলত খাঁ ৫৬৬
দৌলতপুর ৫১৯
কলেজ ২৭২, ৮১৪, ৮৩৫, ৮৪৩
নীলকুঠি ৭৬৮, ৭৭৫
দ্বারকানাথ সেন ৫৭৭
দ্বারির জাঙ্গাল ১৯৪
'দ্বিগঙ্গার সেন' ৬৪৬-৭, ৬৭০, দ্র. দেগঙ্গা

ধন্য পীতাম্বর ৬৭০, ৬৭৩-৪, ৬৭৬-৮
ধর্ম্মদাস, মগ জায়গীরদার ৫৩৫
ধুমঘাট ১৩২-৩, ১৩৭, ১৪৯-৫১, ১৫৫-৬, ১৫৯-৬৫, ১৯২-৩, ২৩৯, ২৪১, ৩৯৪-৭, ৪০২-৩, ৪৩৯, ৪৪৯
দুর্গ ১৫৯-৬৫, ১৯২
দুর্গপতন ৩৯৫-৪০৭
ধুমঘাট-নদী ১৫০
ধুলগ্রাম ৫০১-০২, ৫০৯-১১
মন্দির ৫১০, ৮৬১
ধুলিয়ান বেগ ২৩১

নওয়াপাড়া ৬৮১-৪
নকীপুর ১৫০, ২৬৩, ৩৫৭
নড়াইল কলেজ ৭২৯
জমিদারবংশ ৭১৯-৩১, ৮৭৫
নীলকুঠি ৭৭৪
মহকুমা ৭০৩-০৪
নথন, দ্র. মীর্জা নথন
নদীয়া, অবদান ৪০২-০৩
নন্দরাম মিত্র, পাঁচালী ৮৭৫
নবরঙ্গ কুল ৮২৬
নবরত্ন মন্দির ৮৮, ৯৭-৮, ১৪৩, ৮৬২-৩
নবশাখ ৮৩৩-৪
নবাব-বাড়ী ৪৫৯-৬০, ৪৬২-৩
নমশূদ্র ৮৪১-৩
নয়ান ফকির ৮৮০
নয়াবাদ ৬৯৫-৬, ৭০৫, ৮০০
ন'র মোহানা ২০৭
নরোত্তম ঠাকুর ৬২
নলডাঙ্গা, নাম ও রাজ্য উৎপত্তি ৪৭২-৩
রাজবংশ ৩৫২, ৪৭০-৮৬, ৬৭৯
রাজ্য ৪৯৭
নল্‌তা ৪২৬-৮
নল্‌দী ২০৮, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪২, ৫৭০, ৬০৮, ৬১০, ৬১৩, ৬২০-১, ৬৩০, ৭০৩, ৮৩৫
পরগণা ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪২, ৭০২, ৮৪৪
নলিনীকান্ত ব্রহ্ম ৮৩১
নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী ৬৮৭-৯
নলিনীনাথ রায় (M. L. C.) ৭৩১
নসরৎ শাহ ৫৭
নসিব খাঁ ২৫৯, (সাতৈর) ৫৬৬
নসীবশাহী ও নসরৎশাহী পরগণা ৫৬৬-৭
নহাটা কুঠি ৭৭৩
নহাটা সম্পত্তি, নলডাঙ্গা ৪৮৩
'নাইট্', পাশ্চাত্য ৫৩৯
'নাগ-ঝি' ১১১
নাজিম ও দেওয়ান পদ ৫৮৭
একীকরণ ৫৮৯
নাটোর রাজবংশ ৬১৬-২২, ৭২৬

নানাসাহেব ৭৮৯
নান্দুয়ালী শিবমন্দির ৪৭৯, ৮৬১
'নাব্য-ব্যাপার' ২১৩
নারায়ণ ভট্ট ৯৬
নারায়ণ-খালি ৭৯৯
নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪১৮-৯
নারায়ণপুর ৫৫৬, ৬৩৬
নারিকেলবাড়িয়া ৭৭৪
নিকুঞ্জবিহারী রায় ৬৬১-২
নিখিলনাথ রায় ৫৬, ৫৮, ৯৪-৫, ১০০, ১১০-১, ১১৩, ১২৪, ১৫১, ১৫৪, ২৫৫, ২৭৯, ৩০৩, ৩০৫-৭, ৩০৯, ৩২১, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৬৬, ৪৪৮, ৪৬৫ (বংশ)
নিজামৎ সেরেস্তা, পাটনা ৫৯১
নিমক-মহল ৬৫৮, ৬৬০
নিয়োগী বংশ ৬৭২-৫
নিশানাথ ঠাকুর ৫৪০-১, ৭২০
নিষ্কর জমিস্বত্ব ৭১৭-৮
নীরদবিহারী মল্লিক ৮৪৩
নীল
অত্যাচার ৭৮২-৪, ৭৯৪
কুঠি ও কান্‌সরণ ৪৩৮, ৪৮৩, ৭০৭, ৭৭১-৫
চাষ ও প্রস্তুত-প্রণালী ৭৭৫-৯
প্রথম নীলকর ৭৬৭
প্রাচীনত্ব ৭৬৬-৮
বিদ্রোহ, প্রথম ৭৭৯-৯৫
বিদ্রোহ, দ্বিতীয় ৭৯৫-৭
ব্যবসায় ৭৭৫
নীলকণ্ঠ রায় ৪৯৪-৫, ৪৯৯-৫০৩
'নীল-দর্পণ' ৭৮৮, ৭৯২-৩
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ৮১৪
নীলাম্বর, রাজা ৩০, ৩৪
নূরউল্যা খাঁ, ফৌজদার ২৩০, ৪৪২, ৪৪৯, ৪৬১-৯, ৪৯৫
বংশধরগণ ৪৬৮-৯
নূরউল্লা, প্রতাপ সেনাপতি ২৩০
নূরনগর ৮৫, ২৩০, ২৬৭-৮, ৪৪৩, ৪৬১-২, ৪৯০
নেপালচন্দ্র রায় ৬৬৬
নৈমদ্দি মুন্সী, বয়াতি ৮৮১
নৌ-বাহিনী, প্রতাপাদিত্য ২১২-২৩
নৌ-বিদ্যা ২১২-৩

পঞ্চনাথ কমিটি ৭৩৪
পঞ্চরত্ন মন্দির, কানাইনগর ৬২৪
পত্তনী তালুক ৭১৪
পয়োগ্রাম ৮১৬, ৮৪৮
পরবাজপুর ৮৬, ১৫৮, ৩৫৫, ৮৬৭
মস্‌জিদ ৮৬
পরমানন্দ বসু ৫৯, ১১০
পরমানন্দ রায় (ভবানী-পরমানন্দ) ৯৪, ১০৭, ১১২, ৩৩৮, ৬৫৬-৬৫৭, ৬৫৯
পরমানন্দ রায় (রাজা) ৬৪৪-৬
পরমানন্দকাঠি ৯৪, ৯৬, ২৬৫, ৩৩৮, ৬৫৬, ৮৬৩
পরমেশ্বর, কবীন্দ্র ৫
পরেশনাথ (রাজা) ১১৩, ৮২৮
পর্টুগীজ ১৭৩-৯১, ৩০১-২০, দ্র. ফিরিঙ্গি
পর্টুগীজ প্রভাব ১৮৯-৯১
পর্টুগীজ সেনানী, প্রতাপাদিত্য ২৩৬
পলওয়ার নৌকা ২১৫, ৫৭০, ৬০৩
পলাশীর যুদ্ধ ৫০০
পশ্‌তা ২১৫, ৩৮৫
পাইমেণ্টা ২৪-৫, ৩৭, ২৯৩-৪,
পাংসা ৫৬৭

পাঁচপীর ২৩
পাঁচালী ৮৭৩-৫
পাঁচু দত্ত, কবিদার ৮৭৯
পাঁচু বিশ্বাস, বয়াতি ৮৮২
পাঁজিয়া ১১৩, ৮২৮, ৮৩১, ৮৭৫
পাঁজিয়ার মিত্রবংশ ৮২৮-৯
পাকৃসিয়া ৫৬৫
'পাগড়ী-বদল ভাই' ১৩৩, ৪৮০
পাগলা কানাই ৮৮০-১
পাটনী জাতি ৮৪০-১
পাটুয়া, পাতিল নৌকা ২১৭-৮
পাটুলি ৩৫৩
পাণিঘাটের অষ্টাদশভুজামূর্তি ৮৫৩
পাদ্রীগণ ২৯৩-৩০২
পানসী ২১৭
পাবনা ৫৬৫, ৫৭২
পারকাস, পিলগ্রাইমস্ ২৫, ৪১, ৩০৪, ৩০৭, ৩২৭
পাহাড় খাঁ ২৫৯
পিয়ারা ২১৬, ৩৮৫
পীতাম্বর সেন, ৮১৭
পীযূষবর্ষী ৮৪৪
পীর খাঁ ৫৯৪
পীর পয়গম্বর ৪
পীরালি ৮১৪, ৮৪৭, ৮৫০
পীরাল্যা গ্রাম ৬
পীরোত্তর সম্পত্তি ৭১৮
পীলজঙ্গের বসুচৌধুরি ৭৩৭-৮
মন্দির ৭৩৮, ৮৬১
পুঁটিয়া ৩০, ৩৪, ৫৯৯
পুঁড়া ৯৫, ৪৪৭-৮, ৪৬৫, ৮২৪, ৮৪১
তিতুমীর বিদ্রোহ ৪৬৫
পুঁথি ও যোগিজাতি ৮৩৮, ৮৭৪
পুঁথি, কবিকঙ্কণ ৫০৮
পুঁথি, শীতলা মঙ্গল ৫০৮, ৮৭৪
পুরাণ, মুদ্রা ৭৪-৭৬, চিত্রসূচী দ্র.
পুরুষোত্তম দত্ত ১১৭, ৭১৯-২০
পুরুষোত্তম রায়চৌধুরী, দুর্গাধ্যক্ষ ২২৯
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীলবিদ্রোহ ৭৯৫, ৭৯৭
পূর্ণচন্দ্র দে (উদ্ভট সাগর) ২৪৯
পৃথ্বীরাজ ১২৫
পেড্রো ২৩১, ২৩৬
পোদ ২৩৭, ৮৪১-২
পোদ্দার ৮৩৬ (অর্থ)
প্যারীমোহন মিত্র ৭২২, ৮০৫
প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত ৮৬৯
প্রতাপকাটি ২৫২
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ১৯৪
প্রতাপনগর ১৯৭
প্রতাপনারায়ণ ৩৩১
প্রতাপপুর ১৪২, ৩৩৯
প্রতাপসিংহ ১২৫-৬
প্রতাপসিংহ দত্ত ২৩০, ৩৫৭
প্রতাপাদিত্য ২৬, ৩০, ৩৭-৮, ৪৫-৪৫৩, ৫৫২, ৬০৮, ৬৪৭, ৭৩৩, ৮০৮-০৯, ৮৬৬
অস্ত্রশস্ত্র ২৩৭-৪০
আগ্রা গমন ও অবস্থান ১২৩-৮
'আসমুদ্রকরগ্রাহী' ২৯২, ৩৩৭
ইতিহাস উপাদান ৪৮-৫৮
ইনাএৎ খাঁ সাক্ষাৎ ৩৯৭
ইসলাম খাঁ সাক্ষাৎ ৩১৬, ৩৯৮
ইসলাম খাঁর সঙ্গে সন্ধি ৩১৬-৭
উড়িষ্যাভিযান ২৫৭-৯, ৩৬০
কন্দর্পের সাহায্য ২৮৯-৯১
কল্পতরু যজ্ঞ ২৪৬-৭, ৩৩৪, ৩৩৮
কারাগার ব্যবস্থা ২০৭-৮
কার্ভালো ৩০৩-২০

প্রতাপাদিত্য
কাশী চৌষট্টি-যোগিনী ঘাট ও ভদ্রকালী মন্দির ১৪৫, ৪০৪
গঞ্জেলিস ৪৫৮
গোবিন্দদাস-ভণিতায় ১০৫
চতুর্দ্দশ পরগণা দখল ৩৩৭-৮
চরিত্র ১৬৬-৭১, ৪০৫-০৭
জগন্নাথ দর্শন ২৬০
জন্মকোষ্ঠি, পিতৃদ্রোহিতা ১১৬, ২৭৪, ২৭৮
জন্মাব্দ ৬৪-৫, ৪০৮
জলদান পুণ্য ২৬৩
টাঁকশাল ২০৭, ৩৩৫
ঢাকা গমন ৩৯৮
ত্রিকোণ মন্দির, পুষ্করিণী ও মুদ্রা ১৪১-২
দয়াদাক্ষিণ্য ২৪৩-৯
দীক্ষা, শক্তিমন্ত্রে ১৩৯
দুর্গ-সংস্থান ১৯২-২১১
নৌবাহিনী, ২১২-২৩, ২৮৮
পর্টুগীজ-দস্যুতা দমন ১৭০
পান-দোষ ১৪১, ২৭৭, ৩৬২-৩
পুত্রগণ ১১২-৩
পূর্ব্বনাম, গোপীনাথ ১১২
প্রতাপ-পরবর্ত্তী যশোর-রাজ্য
চাঁচড়া রাজ্য ৪৮৯-৯০
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮৫, ৪৫০
নয়-আনী, সাত-আনী ৪৩৬-৪৩৮, ৪৪২-৮
প্রতাপময়তা ৪৬, ৫১
প্রতাপসিংহ-প্রতাপাদিত্য ১২৪-৬
'প্রতাপাদিত্য' নাম ৬৬, ১১২
বংশ-কথা ১০৭-১৫, ৪৩৫-৪৯
বংশ-লতিকা ১১৪-৫, ৪৪৩-৬
বংশে নাম-উপাধি বদল ১১২-৩

প্রতাপাদিত্য
বন্দী ৩৫৮, ৩৬১, ৩৯৯, ৪০৩
বসন্ত রায় হত্যা ২৭৪-৮১
বাল্যজীবন ১১৬-২২
বিদ্যা শিক্ষা ১১৭-৮
বিন্দুমতীর বিবাহ ৩২১-৩১
বিবাহ ১২০-১
বৈষ্ণব ও শাক্ত মত ১৩৯
ভুঞাদের প্রাধান্য বিচার ৩৭-৮, ৪৫-৬, ৩৩৪, ৪০৫
মগ-ফিরিঙ্গি দমন ২৮৮-৯২, ৪৫৮
মহারাণী শরৎকুমারী
কল্পতরু দানের গল্প ২৪৬-৭
জীবনাঞ্জলী ৪০২
বিন্দুমতী-ঘটনা ৩২৩-৫
মাতা মহারাণী ১১৭, ২৮০-১
মানসিংহ
আক্রমণ ৩৪০-৫৪
গতিপথ ৩৪৪-৬, ৩৫১-৪
ডোলার কন্যা ৩৬৪-৫
যশোরেশ্বরী ৩৬৬-৯
যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৫-৭০
সন্ধিসর্ত্ত ৩৬৪
সৈন্যসংখ্যা ৩৬০
মীর্জা নথন ১৬৫, ৩৭৩-৪, ৩৭৯, ৩৮৫-৪০০
মুদ্রা ৫৫, ১৪২, ৩৩৪-৭
পোড়ামাটি মুদ্রা ৩৩৬-৭
মৃগয়া ১১৯-২০
মৃত্যু, কাশীতে ৪০৪
যশোরেশ্বরী অন্তর্দ্ধান ৩৬৩
আবির্ভাব ১৫৫-৭
পশ্চিমবাহিনী ১৪৩-৭
যুদ্ধ
ধূমঘাট ৩৯৫-৭

প্রতাপাদিত্য
ফিরিঙ্গি, খণ্ড-যুদ্ধ ২৮৮
বনপুর, উড়িষ্যা ২৫৮-৯
বসন্তপুর-শীতলপুর ৩৫৭
মগ, খণ্ড-যুদ্ধ ২৯০
মামুদপুর ৩৬১
লস্করপুর ৩৫৩-৪
শের খাঁর সহিত ৩৪১
শ্রীপুর ২৯২
সংগ্রামপুর ২৫৫-৬
সপ্তগ্রাম ফৌজদারের সঙ্গে ৩৪০
সালখা ২০০, ৩৮৩-৯
সেরপুর ৩৪২-৩
হিজলী ২৮৪-৫
হোসেনপুর ২৯০
যুদ্ধ-প্রস্তুতি, কারণ ১৬৭-৭১
রাজত্ব, ২৪১-৫২
রাজধানী, নূতন (ধুমঘাট) ১৩১-২
রাজ্যবিস্তার ৩৩৭-৯
রাজ্যভাগ ১৩১
রাজ্য-সীমানা ৭৭, ১৩১, ২৫৪ (উত্তর), ৩৩৭-৮ (দক্ষিণ, পূর্ব্ব), ৩৩৮ (পঃ, উঃ)
রাজ্যাভিষেক ১৩৩
লোক-নির্ব্বাচন ২২৪-৩২
লৌহপিঞ্জরে আগ্রা প্রেরণ ৪০৪
শিলালিপি ২৭১
শৃঙ্খলাবদ্ধ, ঢাকা ৩৯৯, ৪০৩
শেখ বদী ৩৭৪, ৩৭৬
সনন্দলাভ ১২৬-৮
সময় নির্ঘণ্ট ৪০৮-০৯
সমস্যাপূরণ, আকবর-সভা ১২৩-৪
সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর ১২০, ১২২
সৈন্য-গঠন ২৩৩-৪০
সৈন্য সংখ্যা ২৩৪-৫, ৩৫৯-৬১
প্রতাপাদিত্য
স্তনকর্ত্তন-প্রবাদ ৩৬২-৩
স্বাধীনতা সঙ্কল্প, ঘোষণা ১৩৩-৪, ২৪৬, ৩৩৪, ৩৪০
হস্তি-সৈন্য ৩৫৯
হামামখানা ১৬২-৩, ৪৫৪
প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩১
প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (Ph. D.) ৮২৯
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য্য ৬৬২, ৬৮৭-৯০, ৮২৯, ৮৭০
প্রবাদ, মূল্যায়ন ৫২
প্রমথভূষণ দেব রায় (রাজা) ৪৮২-৩
প্রমদাচরণ সেন ৮২০
প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ ৮৫৬-৮
প্রাণনাথ রায় চৌধুরী ৭৩২-৪
প্রাণসায়র, সাতক্ষীরা ৭৩৩
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, নীলবিদ্রোহ ৭৯৫

ফকনার, পি ১৫০, ২৯৯, ৩০১, ৪০৭
ফজল গাজী ২৬, ৩০, ৩২
ফজলুর রহমান ৮৪৯
ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ৮১৫, ৮৬৯
ফণীভূষণ বসু ২৭১
ফতুল্যাপুর ৪৪৬-৭
ফতে খাঁ, সন্দ্বীপ ৪৫৬
ফতেসিংহ পরগণা ৪৮৭-৮, ৫২৪, ৫৪৬
ফতেহাবাদ ৪১, ৩০৬
ফন্সেকা ২৪, ২৯৩, ২৯৬-৭
ফার্ণাণ্ডেজ ২৯৩-৬, ৩০৭
ফিরিঙ্গি ১৭০, ১৭৯, ১৮২-৯১, ৪৭৪
ফিরিঙ্গি আনীত ফলমূল ১৯০-১
ফিরিঙ্গি ও বঙ্গভাষা ১৯০-১
ফিরিঙ্গি দুর্গ বা আড়াইবাঁকীর দুর্গ ২০৪
ফিরিঙ্গি দোয়ানিয়া ১৮৫, ২০৩

ফিরিঙ্গি নামের উৎপত্তি ১৭৯
ফিরিঙ্গি প্রভাব ১৮৯-৯১
ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি ১৮৫, ২০৪, ২৩১, ২৮৮
ফিরঙ্গি ব্যাধি ১৯০
ফৈজউল্যা, হাজি ৫১৩
ফৌজদার প্রথা ৪৫৪

বংশীপুর লাট (ধূমঘাট) ৮৫
বক্‌স আলি খাঁ ৫৯৬, ৫৯৮-৯, ৬০৩-০৫
বগ্‌চর ৫০৩, ৮৩৭, ৮৫৪-৫
বঙ্কিমচন্দ্র ৩৬, ৪২১, ৫২২-৩, ৫৪৬, ৫৯৫, ৫৯৭-৮, ৬০৪, ৭৯৩-৪, ৮০৪-০৬, ৮৪১
বঙ্কুবিহারী মল্লিক ৮২৯
বঙ্গদেশ, স্বাধীন-শাসন যুগ ১৯
বঙ্গভাষা, ফিরিঙ্গি প্রভাব ১৯০-১
'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' ১৯৪, ২৮০, ৪০৫
বজ্‌বজ্‌ ২৮৫
বজলুর রহমান, ৮৪৯
বজ্রপুর ৩৭৬
বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীবংশ ৪১৩-৬
বদী, সেখ ৩৭৪, ৩৭৬
বনগ্রাম রাজবংশ ৬৫২
বনপুর বা বানপুর ২৫৮-৯
বন্দুক (প্রতাপাদিত্য) ২৩৯-৪০
বম্বেটে ১৭৬
বয়াজিৎ হাজারী ২২৮
বয়াতিগণ ৮৮০-১
বরা, এম, আই ৩৭৩
বরীশাট ৬০০
বর্গীহাঙ্গামা ৪৮০, ৪৯৯, ৫০১, ৬৭৯, ৮০৯, ৮৩৭
বর্দ্ধমান ৩৪৫, ৪৬১, ৪৬৭-৮, ৪৮০, ৫০১, ৫৪৬, ৬৪৪, ৭২০, ৮০৯, ৮৩৭
বর্শা, সড়কী ২৩৫
বলবস্ত ২৮৩-৪
বলরাম দাস ৬০৮, ৬৩৭-৯
বলরাম রায় চৌধুরী ৬৭৮
বলিয়া বা ভলিয়া নৌকা ২১৫, ৩৮৫-৬, ৬০৩
বল্লভাচার্য্য ২৬২, ২৬৪, ২
বসতি ও সমাজ, উত্থান-প ৮০৮-০৯
বসতি ও সমাজ, ত্রিধারা ৮০৯
বসন্ত রায় ১৭, ৬৬, ৬৮, ৭৪, ৭৬-৮১, ১০৭, ১২৭, ১২৯-৩০, ১৩২, ১৬৮, ২৪১-৩, ২৭০
আত্মগোপন ৭৮
'আসল তুমার জমা' ৮৪
ঈশা খাঁ ১৩৩, ২৫৮
উড়িষ্যা শ্রীবিগ্রহ ২৫৮
উপাধি, 'বসন্তরায়' ৬৫
কবি ১০৩-০৫
কাঁকশাল জাতি ১২৭
কালীঘাট মন্দির ৮৭, ১০৫, ১৯৩
কীর্ত্তি ৮২-৮
গোবিন্দদাস ১০৩-০৫
গোবিন্দদেব ১০৬
চাকশিরি ৩৩৭
টোডরমল্ল ৭৯-৮০, ৮৪
ঠাকুর বসন্ত ১০৫
পদ রচনা, তর্জ্জা লড়াই ১০৩-০৪
পুত্র, বংশ ১১১, ১১৪-৫, ৪৩৬-৪৮
বালক প্রতাপ ১১৬-২৩
বিবাহ ১০৮-০৯, ১১৭
মন্দির প্রতিষ্ঠা ৮৭
মহারাণী সহমরণ ২৮১
যশোর-সমাজ ৯৩-১০১
রাজধানী সরগুনা ১৯৩
রাজস্ব-হিসাব, বঙ্গদেশের ৮৩-৫

রাজ্য-বিভাগ ১৩১
শিলালিপি ২৭১
হত্যা ২৭৪-৮১
বসন্তপুর, ৭৭, ৮৫, ১৫৫, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৫২, ৩৫৪-৫, ৩৯৩
বসুর বাজার, ঢাকা ১১০
বসিরহাট ১১০
বহ্‌রাম খাঁ দরগা ৮৫৫
'বহারিস্তান' ৩৭, ৫৭, ১১২, ১৬৪, ২০০, ২১৪, ২২৪, ২২৯, ২৬২, ৩১৬, ৩৫৮, ৩৭৩-৪ (বিবরণ), ৩৭৬-৪০০
বহুবেগম ৭১১
'বাইশী লস্কর' ৩৪২-৩
বাউয়েস্ ২৪, ২৯৩, ৩০৮
বাউল সঙ্গীত ৮৭৮-৯
বাঁকুড়া ১৫৮
'বাকলা' ৩২১-৩০
বাকলা সমাজ ৫৯, ৯৩
বাকসা সমাজ ৪৪৭
বাকির খাঁ ২৬১
বাখর, আগা ৬৪৯-৫০
বাখরগঞ্জ, নামের উৎপত্তি ৬৪৯
বাগ্‌ড়ী ৬৪৭
বাগাণ্ডা সমাজ ৮২৭
বাগেরহাট ৯৪, ১০৭, ২৬১, ৩৩৮, ৪৩৬, ৫৬৩, ৫৭০, ৭০২-৩ (নাম), ৭১১, ৮৩৫, ৮৪৮, ৮৫৪, ৮৬১, ৮৬৮
বাগেরহাট কলেজ ৬৬০, ৮৩৫
বাগোয়ান ৩৭৯-৮০
বাঘুটিয়া ৪২৩, ৮২৭, ৮৬১
বাঙ্গালপাড়া ৯৭, ১৫৮
বাঙ্গালা-মন্দির ৮৫৯, ৮৬৩-৪
বাছাড়ী ২১৭
বাজিতপুর পরগণা ১৯৫, ২২৮, ২৬৫, ৪৩৬, ৪৪২, ৭৩৩
বাণেশ্বর বিদ্যারত্ন ৮৭৩
বাবর ৫, ২১
বাবুই মানক্লী ২৫৮-৯
বাবুখালি কুঠি ৭৭৩
বায়াজিদ্ বা বয়াজিদ্ ১৫-৭, ৬৩
বার ওমরার কবর ১৬৪
'বার'-সঙ্গীত ৮৭৬-৭
বারকপুর ১৫৮, ৩৫৫
বারদুয়ারী বা বারদ্বারী ১৬১-২
বারবাজার ৬৭৫, ৮৩৩, ৮৫৪, ৮৬৭
বারভুঞা ১৯-৪৭, ৮৩২
'বারভাটি বাঙ্গালা' ২৩
বারাকপুর ১৫৮
বারাসিয়া ৫৯৪, ৬০০
বারাসিয়া-যুদ্ধ (সীতারাম) ৫৯৪
বারুইখালি ৮০১-০৭
বারুজীবী, বৈশ্য ৮৩৪-৬
বারোয়ারী ২৪
বার্ণিয়ার ১৮১
বালাম নৌকা ২১৭-৮
'বালার গান' ৮৭৭
বালীর দত্ত ৭১৯, ৭৪১, ৮২৯
বালীসমাজ ৮২৫-৬
বাসাবাটী (বাগেরহাট) ৬৫৭, ৮৩১
বাসুদেব মূর্ত্তি, যশোহর ৮৫৫
বাসুদেবপুর, হিজলী ২৮৬
বাস্তু-বিদ্যা ৮৫১
বিক্রমাদিত্য ১৭, ৬৩-৪, ৬৬, ৭৭, ৮১, ৮৯, ১১৬, ১১৮-২১, ১২৯, ১৪৮-৯, ২৫৮, ২৭৪
আত্মগোপন ৭৮
উপাধি ও নাম ৬০, ৬৫
গৌড়ের ধনরত্ন ৬৯-৭০, ৭৩, ১৬৮

চরিত্র ১১৮-৯
জগন্নাথ মূর্ত্তিরক্ষা ৬৩
টোডরমল্ল ৭৯-৮০
নবরত্নমন্দির ৮৮
বংশাবলী ১০৮-১৫, ৪৩৫-৬
মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ১৩২
রাজ্যবিভাগ ১৩১
যশোর-রাজ্য প্রাপ্তি ৬৮
যশোহর-সমাজ ৯৩-১০১
সনন্দ প্রাপ্তি (সামন্তরাজ) ৮০
সমাজপতি ৯৭
সিংহাসনারোহণ ৮০
বিজয়কৃষ্ণ মিত্র (চেয়ারম্যান) ৮২৯
বিজয়রত্ন সেন, মহামহোপাধ্যায় ৮১৭
বিজয়াদিত্য ১০৮, ১১১, ১১৫, ৪৩৫, ৬৪৬
বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী ২৩২, ৪২৫-৮, ৭৪৩
বিজলিয়া কুঠি ৭৯৫
বিদ্যাধর রায় ৭৩৫-৬
বিদ্যানন্দকাঠি ৮২৭-৮
বিদ্রোহ ও বিপ্লব ৭
বিধানচন্দ্র রায় (ডাক্তার) ৮২৪
বিধুভূষণ বসু ৮৭০
বিনোদ বয়াতি ৮৮২
বিন্দুমতী (বিমলা) ১১১, ৩২১, ৩২৮-৩৩০, ৩৭৯
'বিবির-আস্তানা', ধুমঘাট ১৬৪
বিভারিজ, হেন্‌রী ২৫, ২৭, ৪৪, ১৪৯, ২৯৪-৬, ৩০০, ৩১৫, ৩১৮, ৩২৭, ৩২৯
বিভাগদি ৪২২, ৪২৪, ৮২৮, ৮৩০
বিরাজমোহন মজুমদার ৮২৫
বিরাট গুহ ৫৯, ১০৯, ১১৪
বিশালাক্ষীর মন্দির ১৫৪
'বিশ্বকোষ' ১৪৬, ২৩৪
বিশ্বনাথাত্মজ ৮৬৫
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নীলবিদ্রোহ ৭৯৬
বিশ্বেশ্বর শিরোমণি ৮৭৩
বিষ্ণুচরণ দত্ত (রায় বাহাদুর) ২২৮
বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, নীল-বিদ্রোহ ৭৮৬
বিষ্ণুদাস হাজরা, ৪৭১-৩, ৮১৪
বিষ্ণুপুর ২৩৮, ২৫৬
বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী ৭৩২-৩
বীরেন্দ্রকুমার বসু, I. C. S. ৮২৮
বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, ২৭
বীরেশ্বর পাঁড়ে ৩৭০, ৮১৫, ৮৬৯
বুধই বিশ্বাস ৪৮০-১
বুড়ন দুর্গ ২০০-০১, ৩৫৩-৪, ৩৯০-৩, ৩৯৫
বুড়ন পরগণা ৮১০
বুড়বুড়ীর তট ১৫৪
বুড়াশিব মন্দির, রতনপুর ৮৭
বুরুজখানা ১৫৯, ১৯৫, ২৩৭, ৩৯৫-৬
বৃটিশ এম্‌ব্লেম, প্রাক্‌-ইংরাজ আমল ৮৬৪
বেদকাশী ৮৭, ১৯৭-৮, ২৩৯,
মন্দির ২৭০-৩
শিলালিপি ২৭১-২
বেন্দা ৮২০-১
বেলদার সৈন্য ৫৭৪
বেলফুলিয়া পরগণা ২২৮, ৩৩৮, ৭৩৬, ৭৪৬-৫০
'বৈকুণ্ঠ'-বাস শান্তি ৪৭৬, ৫৯০
বৈদিক সমাজ ৮১০-১১
বৈদ্য-কায়স্থ বিবাদ ৮৩২
বৈদ্যবংশ ৮১৫-২২
কাশ্যপ গোত্র ৮২১-২
মৌদ্গল্য গোত্র ৮২০-১
শক্তি গোত্র ৮১৬-২০

বৈশ্য-বারুজীবী ৮৩৪-৬
বৈষ্ণব ধর্ম্ম, মূলকথা ৬-৭
বোধখানা ২২৮, ৬৬৮-৯, ৬৭৩, ৬৭৬-৮, ৮৫৪
বোধখানা চৌধুরী-বংশ ৬৬৮-৮৪
'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ৭৬, ৮৩, ৩২৪, ৩২৯
ব্যাঙ্ নদী বা বেগবতী ৪৭২
ব্যাণ্ডেল ১৭৫-৬, ২৯৫, ৩০০-০১
দুর্গ ১৭৬, ৩১০
ব্রজলাল শাস্ত্রী ৮১৪
ব্রহ্মাণ্ডগিরি ৪৭৪, ৪৮৪-৫, ৬৫৪
ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ৬৯৭, ৭১৭
ব্রাড্লি-বার্ট ২৬৯
ব্রাহ্মণ সমাজ ৮১০-১৫
ব্রাহ্মণরাঙ্গদিয়া ২৫১
ব্লকম্যান ২৫

ভগবানগোলা ৪৬৮
ভগবানিয়া ৮৪৩-৫
ভঙ্গকুলীন ৮১১
ভট্টপল্লী ৯৬, ২০০
ভদ্রকালী, কাশী ১৪৫, ৪০৪
ভবানন্দ ১৫, ৬০-৩, ৬৭-৮, ১০৮, ১১৪
ভবানন্দ মজুমদার ২২৭, ৩৪৫-৫১, ৩৭০, ৩৭৯-৮০, ৪১০-২
ভবানী দাস (কালীঘাট) ৯০
ভবানীদাস রায় ৯৪
ভবানীদেবী ১১২, ৩৩৮, ৬৫৬-৭
ভবানী-পরমানন্দ ১১২, দ্র. পরমানন্দ
ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, M. L. C. ৭৩০, ৭৪২
ভবেশ্বর রায় ২৮, ২৫৪-৫, ৪৮৮-৯
ভরত মল্লিক ৫৩১
'ভরতভায়না ৮৪৪, ৮৫৬
ভাট কবি, প্রতাপাদিত্য ২৪৭
ভাটপাড়া ৯৬, ২০০
ভাটিয়াল গান ৮৭৫-৬
ভারতচন্দ্র ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫৮, ৪১৩, ৪১৯-২০
ভারতী-বংশ ২৪৯-৫২
ভাসান, মনসার ৮৭৪
ভাস্কর পণ্ডিত ৫০১
ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ ৫৭৬
ভাস্কর্য্য ৮৫১
যশোহর-খুলনা ৮৫২-৬
ভুঞা ১৯-৪৭, ২২ (অর্থ), ৮৩২
ভুঞা কিঙ্কর ২৮, ৩৩৭, ৬৪৭-৮
ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী ৮৯-৯০, ১৯৩
ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি ৮৫৩
ভুলুয়া বাবা ৫৪৪
ভূপতি রায় ১০৯-১০
ভূষণা ৪১-৩, ৫২৮, ৫৩২-৩, ৫৩৬, ৫৩৯, ৫৪২-৩, ৫৪৯,-৫৯১, ৫৯৪-৬, ৬০২, ৬৯৪-৫, ৬৯৭, ৭০২, ৭০৫
ভূষণা নামের উৎপত্তি ৪২
ভূষণা রাজ্য ৪৯৭, ৫৩২
উৎপত্তি ৪১-৩
নাটোর রাজবংশ ৬১৬-২০
নিলাম ও পরিণাম ৬২০-১
যশোহর জেলা-ভুক্ত ৬২০, ৭০২
ভূষণা সমাজ ৫৪৩, ৬৪৪
ভূষণাই কাগজ ৫৪৩
ভূষণাই খাসা বস্ত্র ৫৪৩
ভূষণাই থাক্ ৫৪৩
ভোগোত্তর সম্পত্তি ৭১৭

মগ ও আরাকান রাজ্য ১৭২
'মগ-জায়গীর', ধর্ম্মদাস ৫৩৫
মগপল্লী ১৮৯

মগ-ফিরিঙ্গি ১৭০-৯১, ৪৫৬-৮, ৫৩৫, ৬৮৫, ৮০৯
মগ-ফিরিঙ্গি জাত সঙ্করজাতি ১৮৯
মগ-ফিরিঙ্গি দমন ১৭০, ২৮৮-৯২, ৪৫৬-৪৫৭, ৪৯৩, ৫৩২, ৬৫৩-৪
মগিয়া খাল ৬৫৪
মগের মুল্লুক ১৮৫
মগোপরীবাদ ১৮৮
মঘিয়া রাজবংশ ৬৫৩-৬
মছন্দরী (অর্থ) ৩৫
মঠ ও দেউল ৮৬৪-৬
মণি বা মণির টাট্ দুর্গ ২০৬-৭
মণীন্দ্রচন্দ্র, মহারাজ ৭৬৫
মতিঝিল ৪৬২
মথুর সরকার, কবিদার ৮৭৯
মথুরানাথ আচার্য্য, নীলবিদ্রোহ ৭৯০
মথুরাপুর ৫৩০
মদনধারী কুঠি ৭৭৪
মদনমল্ল সেনাপতি ২৩০, ৩৫৭, ৩৬১
মদনমুন্সী ৮৬৭
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৬৮২
মদনমোহন সেন ২৮, ৩৩৭, ৬৪৭-৮
মধুদিয়া ৫৭১, ৭৫১
মধুসূদন আগমবাগীশ ৮১৪
মধুসূদন কিন্নর (কা'ন) ৮৪৪, ৮৭৪
মধুসূদন দত্ত (মাইকেল) ২৫১, ৭৯৩, ৮৩০, ৮৬৯-৭০, ৮৭৩-৪
মধুসূদন বসু (মীর বহর) ২২৯
মধ্যাকূল ৭৫৫-৬
মধ্যাল্য, বঙ্গজ মৌলিক ৯৫
মনোমোহন পাঁড়ে ৮১৫
মনোহর রায় ৪৯৩-৮, ৫৬৭-৯, ৫৮৩, ৬৮৫
মন্দির, স্থাপত্য ৮৬১-৭
মন্ত্র জান ৫১২-৬, ৫১৯
মফিজউদ্দীন, হাজি ৮৫০
মরেল সাহেব ৭১৬, ৮০১-০৭
মরেলগঞ্জ ৮০১-০২
মলই পরগণা ৪৯৩, ৬৭৪, ৬৮৫
মল্লিক বংশ ৬৭২-৫
মস্‌জিদ্ [১ম খণ্ডও দ্র.]
এক গুম্বজ ২০৯, ২২১
তিন গুম্বজ ৪৬০
চারি গুম্বজ ৮৬
পঞ্চ গুম্বজ ১৬৩-৪, ৮৬৭-৮
যড় গুম্বজ ৮৬৮
নব গুম্বজ ৮৬৮
৭৭ গুম্বজ ৮৬৮
মসজিদ, ইমামবারা, দরগা ৮৬৭-৮
মস্‌জিদকুড়ের মস্‌জিদ্ ৮৬৮
মসিদপুর ২৫১
মসিয়ারহাটি ৮৪৩
মহকুমা, বঙ্গদেশে প্রথম ৭০২
মহতাবরাম রায় (মুকুট) ২৮, ২৫৫, ৩৪৯, ৩৫২, ৪৮৯-৯০, ৪৯২, ৪৯৪
মহব্বৎপুর গড় ১৯৫, ৩৯৩
মহম্মদ ইউসফ ৮৪৯
মহম্মদ মহসীন ৫০১, ৫১৩-২০
তৌলতনামা ৫১৫-৬
মহসীন ফণ্ড ৫১৭-২০
মহম্মদপুর ৫৫০-৬১
নামকরণ ৫৫১-২
পরিণাম ৬২৩-৫
মহম্মদাবাদ ৫
মহলগিরি নৌকা ২১৫-৬, ৩৮৯
মহসীন ফণ্ড ও স্কুদ ৫২০
মহাত্রাণ সম্পত্তি ৭১৭
মহাভারত ৫
মহামারী, মহম্মদপুর ৬২৩

মহাসিংহ ৩৩৩
মহিমশাহী পরগণা ৫৬৬
মহীপতিপুর, কাটোয়া ৫৩২
মহেন্দ্র ওহদেদার ৪৪০-১
মহেন্দ্রদেব রায় ৪৮১, ৬৭৯
মহেন্দ্রনাথ করণ ৮৪১
মহেন্দ্রনাথ সরকার ৮৩৫
মহেশপুর, ৮১৪, ৮৪০
মহেশ্বরপাশা ৫১৯, ৮৩৫-৬, ৮৬৩
জোড়-বাঙ্গালা ৮৬৩-৪
মাইচাম্পা দরগা ৮৬৭
মাইহাটি পরগণা ২৩০
মাগুরা ৫৩৫, ৫৬৪, ৬০০, ৭০২, ৭৭১, ৭৭৩-৪, ৭৯৬, ৮৬৫, ৮৭৬, ৮৭৯-৮০
মাঘুরালি ১৯৬
মাচোয়া নৌকা ২১৪-৬, ৩৮৫
মাজ্নামুটা ২৭, ২৮৭
মাণিকপীরের ছড়া ৮৭৭-৮
মাটীয়ারি ৩৭৯-৮০
মাটোস্, ডি ৩০৪, ৩০৭
মাতলা দুর্গ ২০৩-০৪
মাতোয়ালী, সৈদপুর ষ্টেট ৫১৬-৭
মাদ্না ষ্টেট, হিজলী ২৮৬
মাদুলী ৫৪৩
মাধবপাশা ২৮৯-৯০, ৩২১, ৬৪৬
মানকুমারী বসু ৮৬৯
মানরাজগিরি ৩০৫, ৩০৭, ৩১২
মানসিংহ ৩৬, ৩১২, ৩৩২-৭১, ৮১৫
উড়িষ্যাভিযান ২৫৬-৬১
উত্তর-বঙ্গ বিজয় ৩৩৩
কচুরায় ১৩০, ৩৪২-৪, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৪
কেদার রায় ৪১, ৩৭০
ডোলার কন্যা, প্রতাপ ৩৬৪-৫
তিন মজুমদার, বঙ্গভাগ ৩৭০
দাক্ষিণাত্যবিজয় ৩৩২, ৩৪০, ৩৪২
ধুমঘাটের যুদ্ধ ৩৬১
নলডাঙ্গা রাজ্য ৪৭৩-৪
প্রতাপাদিত্য বন্দী ৫৭, ৩৫৮, ৩৬১
বঙ্গ-সুবাদার কাল ৩৩২-৩
বসন্তপুর-যুদ্ধ (যশোর) ৩৫৭
বিবাহিত স্ত্রী-সংখ্যা ৩৫৬
ভবানন্দ মজুমদার ৩৪৬-৭
যশোর যাত্রা ও গতিপথ ৩৪৪-৬, ৩৫১-৪
যশোররাজ্য আক্রমণ ৩৪০-৫৪
যশোরেশ্বরী না শিলাদেবী ৩৬৬-৭০
যুদ্ধায়োজন (যশোর) ৩৪৪
লস্করপুর ৩৫৩-৪
সন্ধি (প্রতাপ) ৩৬১
সন্ধিসর্ত্ত ৩৬৪
সাতহাজারী মনসবদারী ৩৪৩
সেরপুর যুদ্ধ ৩৪২-৩
সৈন্য সংখ্যা ৩৬০
মানোয়েল সাহেব ১৫৩-৪
মামুদপুর ৩৬১
মামুদশাহী-পরগণা ৪৭৪-৭, ৪৮২, ৫৬৪, ৭০২
মার্কোপোলো ৫৩
মালগুজারি ৪৯৫-৬, ৬৮৫
মালিকানা ৬৬০
মাহিনগর বসুবংশ ৮২৭
মাহিন্দার ৬৯৮
মাহিষ্য ৮৩৯, ৮৪১
মাহীউদ্দীন ২৩০
মীর্জানগর ৮৫, ৪৫৯-৬৩, ৬৯৪-৫, ৮৫৭
মসজিদ ৪৬০
মীর্জা নথন ১৬৫, ৩৭৩-৪, ৩৭৯, ৩৮৫-৪০০, ‘বহারিস্তান’ও দ্র.

মীর্জা সহন ৩৭৩, দ্র. মীর্জা নথন,
মীর্জা সাফ্‌সিকান ৪৫৯
মুকুটমণি ১১০, ৪৪৬
মুকুন্দপুর ৭৭, ৮৭, ১৫৭-৯, ১৯২, ২৫০, ৩৬১
মুকুন্দপুর গড় ৭৭, ৩৫৫
মুকুন্দবিহারী মল্লিক ৮৪৩
মুকুন্দরাম রায় ২৬, ৩০, ৩৮, ৪১-৩, ১৩৩, ৩৩৪, ৩৯১, ৫৪৩, ৬৪০, ৬৪৩-৪
মুকুন্দরাম সরস্বতী ২৫০
মুড়লী ৭৬, ২১১, ৪৯১, ৫০৩, ৫১৭, ৫১৯, ৬৯৪-৭, ৭০২, ৭০৪
মুড়লী কস্‌বা ৭৬
মুড়লী সৈন্যাবাস, প্রতাপাদিত্য ২১১
মুণ্ডারায় (মন্দারায়) ৪০-১, ৩০৯, ৩৪৪
মুতাহার, আগা ৫১২-৩
মুদ্রা, প্রতাপাদিত্য ৫৪-৫, ১৪২, ৩৩৪-৭
পোড়ামাটি ৩৩৬-৭
মুদ্রা, প্রাচীন ৭৪-৬, দ্র. চিত্রসূচী
মুনিরাম রায় ৫৩৩, ৫৩৬, ৫৪৮, ৫৮৪, ৫৯১, ৫৯৩, ৬৩৩-৬
মুনেম খাঁ ১৪, ৬৬, ৭০-১
মুন্সেফ নিয়োগ ৬৯৭
মুয়াজিম বেগ ২৩১
মুর্শিদকুলি খাঁ ৪৪২, ৫৮৭-৯১, ৫৯৩, ৫৯৬-৭, ৬০৫, ৬১৬, ৭৩৫
চাকলা সৃষ্টি ৪৪২
জমিদার পীড়ন ৪৮৯-৯০
নাজিম নিযুক্ত ৫৮৯
মুর্শিদাবাদ সহর ও গৌড় ৮৫৭
মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচার ৩-৪
মুসলমান সমাজ ৮৪৫-৫০
আত্‌রাফ্‌ ৮৪৬, ৮৪৯-৫০
আর্‌জাল্‌ ৮৪৬
আশ্‌রাফ্‌ ৮৪৬-৯
পীরালি ৮৪৭, ৮৫০
মুসলমান সম্ভ্রান্ত বংশ ৮৪৮-৯
মূসা খাঁ ২৭
মূলগ্রাম ২৫৫, ৪৮৯
মূলঘর ৫৭০-১, ৬৬২-৬, ৮৬৩
মূলঘর-পরগণা ৬৭৫
মূলঘরের বৈদ্যচৌধুরী জমিদার ৬৬২-৮
মূলাজোড় ৫০১
মূলাজোড় দুর্গ ২১১
মেদম্মল ২৮৫
মেনাহাতী (রামরূপ ঘোষ) ৫৩৬-৮, ৫৫৮-৯, ৫৬৪, ৬০০-০৩ (হত্যা), ৬৩১-৩৩
মেন্নাতুল্যা খাঁ, কাজি ৮৪৯
মেল-বন্ধন ৮১২
মেহের চাঁদ, বয়াতি ৮৮২
মেহেরপুর দরগা ৮৬৭
মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য ৪৩৩
মোগল বাহিনী, শক্তি ও দুর্ব্বলতা ১৭০-১, ৩৮৭
মোগল রাজনীতি, আকবর-জাহাঙ্গীর ৩৭২
মোতাহেরল হক্‌ ৮৪৯
মোলঙ্গী ৬৯৮
মোল্লাহাটি ৭৭১, ৭৮০, ৭৮৩-৪, ৭৮৭, ৭৯২
মোতলা দুর্গ ২১১
মস্‌জিদ ২২১, ৮৬৭
মৌভোগের দত্তচৌধুরী ৭৪৯-৫০
মৌরসী মোকর্‌ররী ৭১৬
মৌলিক, বঙ্গজ ৯৫
ম্যালেরিয়া, যশোহর ৫৩৮, ৬২৩

যজ্ঞেশ্বর, দ্র. রত্নেশ্বর

যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (রায়) ৯৫, ২৬৭, ৪২৮
যতীন্দ্রমোহন রায় (রাজা) ২০০, ২৩০, ২৬৮-৭১, ৪৪৫, ৪৪৮
যদুনাথ বিশ্বাস (রায় সাহেব) ৮৩৫
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ৫২৩-৪, ৫২৬, ৫৩৪, ৫৪৬, ৫৪৮, ৫৫৩, ৫৫৫, ৫৬৯, ৫৭৬, ৫৯৪-৫, ৫৯৮, ৬০০, ৬০৭
যদুনাথ মজুমদার (দেওয়ান) ৫৪৮, ৫৫৬, ৫৬৮, ৬৩৬-৭
যদুনাথ মজুমদার (রায় বাহাদুর) ৬২৫, ৭৯৬, ৮৩৪-৫, ৮৬৯
যদুনাথ সরকার ৫৬, ১১২, ১৮২, ২১৪, ২৯৫, ২৯৭-৮, ৩০২, ৩১১, ৩১৪, ৩১৬, ৩৭৩-৪০০, ৪০৪, ৪৫৮, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট দ্র.
যমুনা ৬৮, ৩৫২, ৩৫৫
যশোর (যশোহর)
গীর্জ্জা ১৬৪, ২৯৬-৩০২
টেঙ্গা মসজিদ ১৬৩-৪
দুর্গ ১৫৯-৬৫, ১৯২
ধনরত্নের মূল ৬৯-৭০, ৭৩
পীঠস্থান ১৩৭-৮
প্রতাপ-পরবর্ত্তী
নয়-আনী, সাত-আনী ৪৩৬-৮, ৪৪২-৩, ৪৪৮
চাঁচড়া রাজ্য ৪৮৯-৯০
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮৫, ৪৫০
বাজিতপুর পরগণা ৭৩৩
প্রাচীনত্ব ৭৪-৬
যশোহর নাম ৭৬, ৮৫
শহর ৭৬, ৮৫৪-৫৫
সমাজ ৯৩-১০১, ৪৪৭-৮, ৮০৮, ৮২২-৩
রাজধানী ১৪৮-৬৫
রাজবংশ ৪৩৫-৪৮
রাজ্য ও চাঁচড়া রাজ ২৫২, ৪৮৯
রাজ্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮৫, ৪৫০
রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৬৮-৮১
রাজ্য ভাগ ১৩১
রাজ্যসীমানা ৭৭, ১৩১, ২৫৪, ৩৩৮
'যশোর নগর ধাম···' ৩৪১
যশোরেশ্বরী ১৩৫-৪৭, ৩৬৩, ৩৬৬-৯
আবির্ভাব ১৩৫-৭
পশ্চিমবাহিনী ১৪৩-৭, ৩৬৩
প্রতাপ-পরবর্ত্তীকাল ৪৪৮-৫৩
মন্দির ১৬২, ৮৬৩
যশোহর কালীবাড়ী ৫০৩
যশোহর জেলা, সপ্তদশ শতাব্দী ৪৯৭
বঙ্গদেশে ১ম জেলা ৭০০, ৭০২
যশোহর-ফৌজদার ও ইংরাজ-আমল ৮৫, ৪৬৮-৯
যশোহর-খুলনা লোকসংখ্যা (১৯২১) ৭০৪, ৮৩১, ৮৩৪, ৮৩৬, ৮৩৯, ৮৪১, ৮৪৬
'যশোহরজিৎ' ৩৬৪, দ্র. কচুরায়
যাত্রাপুর ৮৬৫
যাদবেন্দ্র ভঞ্জ ৪২৬
'যানপাত্র', যান্‌ক জহাজ ২১৪
যামিনীভূষণ রায় (কবিরাজ) ৬৬৬-৮
যোগিজাতি ৮৩৮-৯, ৮৭৪
যোগীন্দ্রনাথ বসু ৪০৬
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ৮৩৫, ৮৭০
যোগেন্দ্রকুমার সিংহ ৮০০, ৮৩০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩০৪, ৩০৭
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৩৪৯

রঘু (সেনাপতি) ২১১, ২৩২, ২৩৬, ৩৫৭, ৪২৮-৩১, ৮২২

রঘুনন্দন ৩৪, ৫৯৯, ৬১৬-৮
"রঘুনন্দনী বা'ড়" ৫৯৯, ৬২৫
রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ৪১০
সার্ব্বভৌম ৮৭৫
রজব আলি খাঁ ৫১৬
রডা বা রুডা ২০৬, ২৩১, ২৩৬, ২৮৫, ৩৫১, ৩৬১
রণতরী (প্রতাপাদিত্য) ২১৩-২৩
সংখ্যা ২১৯
রণবীর খাঁ ৩৫২, ৪৭৪, ৪৮৫
রণরঙ্গিণী মন্দির ৫৪৩-৪
রণরঙ্গিণী, সীতারাম ভগ্নী ৫৪০-১, ৫৪৩
রত্নেশ্বর রায় (যজ্ঞেশ্বর) ২৩২, ২৪৫, ৪৮৮-৯, ৪৯২, ৪৯৪
রবীন্দ্রনাথ ৭৬, ৮৩, ৩২১, ৩২৪, ৩৩০
রমাকান্ত রায় ৪৪৩, ৪৪৬-৭
রমেশচন্দ্র দত্ত ৩৩৯
রমেশচন্দ্র রায় (রাজা) ৪৪৫, ৪৪৮
প্রতাপ-শিলালিপি ঘটনা ২৭১
রহিমূল্যা ৮০৩-০৫
রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৮৭৪
রহিম খাঁ ৪৬৭-৮, ৫৮৭
রাইরঙ্গিনী ৫৪৬
রাংদিয়া ৯৫, ৭৫১
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০, ৮১৫, ৮৭০
রাঘব রায়, দ্র. কচু রায়
রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ১৪২-৩, ৩৩৯, ৩৫২, ৮১৪
'রাজনামা' ৫৬
রাজবল্লভ রায় ১১১
রাজমহল ২৮, ৩৪০-১, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৭৪-৫, ৩৭৮
রাজস্ব, মোগল-বঙ্গ ৮৪
রাজারাম রায় ৪৪১-২
রাজারাম সরকার ৪৬৬
রাজেন্দ্রনাথ রায় (রাজা) ৮৮, ৩৩৫
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৮১৫, ৮৬৯
রাড়ুলি রায়চৌধুরী-বংশ ৬৮৪-৯০
রাণাঘাট ৩৩৯, ৩৫১
রাণী কৃষ্ণমণি ৬১৭, ৬২১-২
রাণী ভবানী ৫২৮, ৬১৭-৯, ৬২১-২
কন্যা তারা ৫৫৭, ৬১৮
সীতারাম-কীর্ত্তিরক্ষা ৬২১-২
রাণী রাসমণি ও ভূষণা রাজ্য ৬২০-১
রাণীয়ান বৃত্তি ৩৪৮-৯
রাধাকান্তদেব (রাজা স্যর) ৬৭৩-৪
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ২১৩, ২১৬, ৩০৭
রাধারমণ বাউল ৮৭৯
রাধিকা মূর্ত্তি ২৭০, ৩৫০, ৮৫৩
রাম গোস্বামী ১৯৬
রামকান্ত কবিকণ্ঠহার ৫৩১, ৮২০
রামকান্ত, নাটোর রাজা ৫২৮, ৬১৮
রামকান্ত মুন্সী ৯৪, ৪৪৭
রামকৃষ্ণ (সাতৈর) ৩০, ৩৩-৪
রামকৃষ্ণ, নাটোর মহারাজ ৬১৮-২০
রামগোপাল রায় ৫৬
রামচন্দ্র (খুরদা রাজা) ২৬০
রামচন্দ্র (বাকলা) ৩০, ৪৪-৫, ২৯১, ৩১১, ৩১৫, ৩২১-৩১, ৩৩৪, ৩৭৮-৯, ৩৯১, ৪৫৬, ৪৫৮
রামচন্দ্র নিয়োগী ৫৯-৬০, ১০৮-৯, ১১২, ১১৪
রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটী ৫৫৬, ৮৬৩
রামজীবনপুর ২৬৫-৬, ৪৪২, ৪৪৫
রামদাস সেন, প্রত্নতাত্ত্বিক ৯৫, ৪৪৭
রামদাস খাঁ গজদানী ৫২৫, ৫২৭, ৬১৪, ৬১৬
রামদাস স্বামী ৪০৬-০৭
রামদেব, নলডাঙ্গা ৪৭৫-৬, ৫৯৭

রামনগর কুঠি ৭৭৪
রামনগর ঘোষচৌধুরী ৭৩৯-৪০
রামনাথ বারেট ৩৩৩, ৩৬৯
রামপদ চট্টোপাধ্যায় (কাঁথি) ২৮৬
রামপাল ৫৭০-১
রামপ্রসাদ ৫৪৩
রামভদ্র রায়, দেওয়ান ৯৫, ৪৪৭, ৪৬৫
রামভদ্র ভট্টাচার্য্য ৯৬, ২০০
রামমোহন মল্ল ৩২২
রামরতন রায় ৭২১-২, ৭২৭-৩০, ৮৭৫
রামরাম বসু ৫৫-৭, ৬৭, ১২৪, ২৫৫, ২৮৩, ২৯২, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৮১, ৮৭১-২
রামরূপ (সেনাপতি), দ্র. মেনাহাতী
রামসাগর ২৬৩, ৫৫৮-৬০
রামাই ঢুঙ্গি, ভাঁড় ৩২২-৩, ৩২৫
রামা-শ্যামা ৫৩৯, ৫৪৫
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৪৮৮, ৫২৫
রামেশ্বর ঘোষ, শীতলা-মঙ্গল ৮৭৪
রামেশ্বরী মন্দির ৪৭৫
রায়গড়-দুর্গ ১৯২-৫, ২৭৭, ২৮০, ২৮৪-৫
রায়গ্রাম মন্দির ৬৩১, ৮৬১, ৮৬৩-৪
রায়দীঘি ১৯৩-৪, ২০৬
রায়নগর মঠ, মাগুরা ৬৪৫, ৮৬৪-৫
রায়পাশা ৮৩১
রায়পুর ২৬৬
'রায়মঙ্গল' দুর্গ ২০৭-০৮
রায়েরকাটি ২৫১, ৬৪৮
রায়েরকাটির রাজবংশ ৬৪৬-৫৬, ৮৩০
রাসবিহারী বসু ৮২৮
রাসমঞ্চ ৮৪২, ৮৬৭
রাস্তা ৩৪৪-৬, ৩৫১, ৮৩৭, ৮৫৭
রুক্মিনীকান্ত মিত্র (দেওয়ান) ৪২৩, ৪৯১, ৮২৯
রুদ্রাঘরার হালদার ৮২৯
রুদ্রনারায়ণ, রাজা ২৫১, ৩৩৭, ৬৪৮-৯
রূপচাঁদ ঢালী ৫৩৮
রূপদিয়া ৪৯৩
রূপরাম বসু ২২৭, ২৮২-৪, ৩৪২, ৩৪৪
রূপে পাঠা, কবিদার ৮৭৯
রেণী সাহেব ৭০৬-০৭, ৭৩৭, ৭৪০-২, ৭৯৮-৮০১
রেনেলের ম্যাপ ৩৮২, ৩৯০, ৩৯৪, ৫২৯
রোশন খাঁ, বয়াতি ৮৮১
রোহিণীকুমার সেন ১১০, ২৮৯, ৩২১, ৩২৬, ৪৭৯, ৫৩০, ৬৫০

লক্ষ্মণ ঘোষ ৩৩৮
লক্ষ্মণ সেন ৭৫
লক্ষ্মণচন্দ্র রায় ১৫৭, ৭৩৪
লক্ষ্মণমাণিক্য ২৬, ৩০, ৪৪-৫, ৩১৫, ৩২৮
লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (দেওয়ান) ২২৬-৭, ৩৪৩, ৩৫৩, ৩৭০, ৪১৩-৬, ৪৩৬
লক্ষ্মীনারায়ণ (রাজা, কুচবিহার) ৩৩৩, ৩৬৫, ৩৮৬, ৩৯৬
লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দির ৬৬৪-৫, ৮৬৩, ৮৬৬
লখ্‌পুরের চৌধুরী ৭০৫, ৭৩৪-৭
লঙ্‌ সাহেব ১৮৭, ৭৯৩
লতীফ, দ্র. আবদুল লতীফ
লবণ ব্যবসা ৬৫৮, ৬৯৭-৯
লস্করপুর ৩৫৩
লাখেরাজ ৭১৭-৮
লাটুবাবু ৬৭২
লাঠি ৪২১
লাড্ডিমোহন ঠাকুর ২৬৫
লাল খাঁ ৪৬৫-৬
লারমুর সাহেব ৭৭১, ৭৭৯-৮০, ৭৮৩-৪
লালন ও ঈশান ফকির ৮৭৬

লাহা রাজগণ ৮০৬-০৭
লিন্‌সটেন ১৭৬
লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ৮১৪
লোক-সাহিত্য ৮৭২-৮২
'লোনা দীঘি' ২৭৩
লোহাগড়া ৮৬৩-৪
লোহাগড়া বাঙ্গালা মন্দির ৮৬৩-৪

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ১২০, ১২২, ২২৫-৭, ২৪২, ৩৪০-১, ৩৫০, ৩৬১, ৩৬৪, ৪১৭-৯
'শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে খেলো বাঘে' ৩৪১
শঙ্কর সেন (কবিরাজ) ৮১৭
শচীপতি (রাজা) ৫৬৪-৫
'শব্দকল্পদ্রুম' ৬৭০, ৬৭৩
শরৎকুমারী (পাটরাণী) ১২১, ২৪৩-৪, ৪০২, ৪৩৫
শরৎখানার দহ ১৬০, ৪০২
শশিভূষণ পাল ৮৩৫-৬
শাহউজিয়াল পরগণা ৬৭৪-৫
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ৫৪৫
শিবদাস চৌখণ্ডী (দেব-বংশ) ৬৭০-৪
শিবনগর ৪৭৬
শিবনাথ ঘোষ ৭৯৯-৮০১
শিবনিবাস ৫০১
শিববাড়ীর বৌদ্ধমূর্ত্তি ৮৫২-৩
শিবমন্দির, সেনহাটি ৪৩২
শিবরাম ভঞ্জ ৭৪২-৪
শিবসা দুর্গ ১৯৮-৯, ৮৬১
শিবাজী ৪০৬, ৫৯৩
শিবানন্দ ১৫, ৬০-১, ৬৩, ৬৭-৮, ১০৮, ১০৯, ১১৩-৪ (বংশ)
শিয়া শ্রেণী ৮৪৫
শিলাময়ী, সল্লাদেবী ৪১, ১৪৪, ৩৬৬-৭০
শিশিরকুমার ঘোষ ৭৮৮-৯০, ৮২৭,৮৭০
৮৭৪
শুকদাড়ার হাট ৪৯৯
শুকদেব রায় ৪৯৪,৪৯৮-৯,৫০২, ৫০৭
শূদ্রমণি (রাজা) ৩৫৩
শেখ বদী ৩৭৪
শের খাঁ, রাজমহল ৩৪০-১
শৈলজানাথ রায় (M. L. C.) ৭৩৮-৪
শোভাবাজার রাজবংশ ৬৭০
শোর, স্যর জন ৭০৯
শ্যাম বাউল ৮৭৯
শ্যামগঞ্জ, মহম্মদপুর ৬১০
'শ্যামচাঁদ' লগুড় ৭৮৩
শ্যামনগর ৫০১, ৫৩৩
শ্যামরায় মন্দির ১০৫, ৪৮৯, ৪৯২, ৮৬৩
শ্যামসুন্দর রায়, চাঁচ্‌ড়া ৪৯৪, ৪৯৮/৯ ৫০৭
শ্যামসুন্দর রায়, বসন্তরায়-বংশ ৪৪১-৪৪৩, ৪৪৫
শ্যামসুন্দর রায়, সীতারাম পুত্র ৫৪৬-৭, ৬১৩-৪
শ্রীকণ্ঠ রায় ৪৯৫, ৫০২-০৪
শ্রীকান্ত ঘোষ ৬০
শ্রীকোল-নহাটা কুঠি ৭৭৩-৪
শ্রীখণ্ডী কুঠি ৭৭৪
শ্রীনাথ দাস (উকীল) ৮৩১
শ্রীনিবাস ১০২-০৩, ৬২৬-৮
শ্রীপতি গুহ ২২৮
শ্রীপুর (টাকী) ৯৪-৫, ১১৭, ২৩০, ২৬৯, ৪৪১, ৫৩৭, ৮২৪-৫, ৮৩০
শ্রীপুর (ঢাকা) ২৫-৬, ৩০, ৩৯-৪১, ২৯১-২, ২৯৬, ৩৬২, ৩৬৯-৩৭০, ৩৭৬-৭
শ্রীরাম খাঁ (রাজা) ৬৭৪-৭
শ্রীরামদাস (খাস বিশ্বাস) ৫২৬-৭
শ্রীরামপুর মিশন ৮৭২

শ্রীশচন্দ্র অধিকারী ২৩৮, ৩০১, ৪৫১-৩
শ্রীশচন্দ্র, মহারাজ ৪১১
'শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন বন্দনা' ৫৪৩
শ্রীহরি ১৫, ৬০,৬৫-৬, ৬৮-৯, ১০৮, ১১৪, ১১৬, ৪০৪
শ্রীহরি রায়, নীলবিদ্রোহ ৭৯০
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ৮১১-৫

ষাট গুম্বজ ৮৬৮, দ্র. ১ম খণ্ড

'সংকীর্ত্তন বন্দনা' ৫৪৩
সংগ্রাম সাহা ৫২৮-৩২, ৫৯৮-৯, ৮৬৫
সংগ্রাম সিংহ ৫২৮-৩২
সংগ্রাম সিংহ (নবাব সেনানী) ৫৯৮-৯
সংগ্রামগড় ৫২৯
সংগ্রামপুর যুদ্ধ ২৫৫-৬, ৪৮৮-৯
সংগ্রামাদিত্য ১০৮, ১১২-৩, ১১৫, ৩০২, ৩৭৪-৬, ৩৮২, ৪৩৫
'সকল ধান ২২ পাহারী', ৬৯৪
সগর দুর্গ ২০৫-০৬
সগরদ্বীপ ১৪১, ১৪৯, ১৫১-৪, ২০৫-২০৬, ২২৩, ২৮৪, ২২৮-৯
সতীশ (রাজা) ৩৩৯
সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপুর ২৬৯, ৮২৪
সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২৯
সতীশচন্দ্র মিত্র, বংশ ৭২২, ৯২৬
জীবনী ৯১৩
রচনা-পঞ্জী ৯২৭
সতীশচন্দ্র রায় ('বঙ্গীয় সমাজ') ৩৪৮
সত্যচরণ শাস্ত্রী, ১৩৩, ১৪৫, ২৭০, ২৮৩, ২৯২, ৩১৭, ৩২১, ৩৩৫, ৩৪৯, ৩৫৮, ৪১৭-৮
সত্যপীর ৮৭৪-৫
সত্রাজিৎ রায় ৪৩, ১৩৩, ৩৭৫-৬, ৩৯১, ৫২৮-৯, ৫৬৪, ৬৪০-১, ৬৪৩, ৮৩০
সত্রাজিৎপুর ৫৬৪
মন্দির ৬৪১, ৮৬১
সিংহ-বংশ ৬৪০-৩, ৮৩০-১
'সদ্বৈদ্যকুল পঞ্জিকা' ৫৩১
সন্দ্বীপ ১৩২, ১৭৬-৭, ২১৭, ৩০৩-০৯, ৩১২, ৩১৭, ৩২৭, ৪৫৬-৮, ৪৭৪
দিলাওয়ার ৪৫৭
মস্‌জিদ ৪৫৮
সপ্তগ্রাম ৫৯-৬১, ৭৮, ১০২, ১০৯, ২১৩, ৩৪০, ৫১২
সবাই বাড়ুয্যে ২৩০, ২৪৪-৫, ৪৩১-২
সবিতা রায় ৪৮৭-৮
সভা সিংহ ৪১০, ৪৬৭, ৪৯৫, ৫৮৭
সমর সিংহ, রাজা (কাশীনাথ) ৩৩৯
সমাজ ও আভিজাত্য ৮০৮-৫০
সরকার-ঝি ৪৬৬
সরণগড় দুর্গ, উড়িষ্যা ২৬০
সরফ্‌রাজ খাঁ ৪৫৫-৯
সরফরাজপুর ৪৩৭, ৪৪২, ৪৫৫, ৪৫৯
সরল খাঁ ঘোষ ৫৪৬, ৮২২
সরগুনা ১৯৩, ৭৭৪
সরিফাবাদ সরকার ৪৮৭
সর্দ্দার উমাচরণ ও তারাচরণ ৮১৫
সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির, নড়াইল ৭৩০
সলিমুল্যা চৌধুরি ৪৮১
সল্লাদেবী, দ্র. শিলাময়ী
সহন, মীর্জা, দ্র. মীর্জা নথন
সাঁকনাট ৮৫৪
সাঁড়াপোল ৪৯৩
সাকের আলি খাঁ ৫১৬
সাগরদাঁড়ী ২৫০-১, ৮৩০
সাতক্ষীরা জমিদার বংশ ৭৩২-৪
সাতক্ষীরা, মহকুমা ৭০৩-০৪
সাতি বা সাদী সৈন্য ২৩

সাতুবাবু ও লাটুবাবু ৬৭২
সাতুরাম মজুমদার ৬৯৭
সাতৈর ৩০ ৩৩-৪, ৫৬৬, ৬২০
সাদেক মোল্যা ৭৯৯
সাফ্‌সিকান্‌, মীর্জা ৪৫৯-৬৩
সাম্‌টা ৮৪৪
সামিলাৎ ও পাট্টাই ৭১৪
সায়েস্তা খাঁ ১৮৬, ২১২, ৪৬১, ৪৯৩, ৪৯৫ ৫৩২, ৫৩৫, ৫৪৮
'সারতত্ত্বতরঙ্গিনী' ৫৬
সারদাচরণ কাণ্ডারি ১০৯
সারল গ্রাম ৪১০
সারিগীত ৮৭৫-৬
সালখা ২০১-০২, ৩৮৩, ৩৯৩
সালখা-যুদ্ধ ২০০, ৩৮৩-৯
সালখিয়া ২০০, ২৫২, ৩৩৮
সালাহ্‌-উদ্দীন ৫০০-০১, ৫১২-৪
সালিখা দুর্গ ২০০-০৩
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ৪৭৪-৫, ৪৮৪-৫
সিনাবাদী ৩০৭
সিন্দুরিয়া কুঠি ৭৭২, ৭৯০
সিপাহীবিদ্রোহ ৭৮৯
সিবাষ্টিন্‌ গঞ্জালিস্‌ ৩৭৮
সীটন-কার সাহেব ৭৯১, ৭৯৩
সীতানাথ সাংখ্যবেদান্তশাস্ত্রী ৮১১
সীতারামী সুখ ৫৪১, ৫৮৩, ৫৮৫
'সীতারামের গড়' ৫৬৭
সীতারাম ৪৭৬-৭ ৪৯৭, ৫২১-৬৩৯, ৬৪১-২
অস্ত্রশস্ত্র ৫৬১-৩
ইতিহাস উপাদান ৫২৩-৪
করিম খাঁ দমন ৫৩৫
কীর্ত্তিলোপ ৬২২-৫
গুপ্ত-বাটী, দিঘলিয়া ৫৯৫
গুরু-বংশ ৬২৬-৩০
গেরিলা-যুদ্ধনীতি ৫৯২-৩
চতুষ্পাঠী ও মক্তব ৫৭৬-৭
চাঁচড়া-রাজ্য ৪৯৭-৮, ৫৬৭-৯
ছবি, ইষ্টক ৫৭৮
জন্ম ৫২৪
জলদানপুণ্য ৫২৫, ৫৫৮-৬১, ৫৭৪-৫
জায়গীর প্রাপ্তি ৫৩৬
দস্যুদলন ৫৩৮-৪২
দীক্ষা ৫৪২, ৫৪৫-৬,
দুর্গ নির্ম্মাণ ৫৫২-৮
ধর্ম্মপ্রাণতা ৫৭৭-৮৬
নলডাঙ্গা-রাজ্য ৪৭৫-৬, ৪৯৭, ৫৬৪, ৫৯৭
পরিবারবর্গ ৬১০-৬
বংশ ৫২৪-৩৩, ৬১০-৬
বংশ-লতিকা ৫২৭, ৬১৪-৫
বন্দী ও মৃত্যু ৬০৪-০৮
বলরাম দাস মুন্সী ৬০৮, ৬৩৭-৯
বিদ্যোৎসাহীতা ৫৭৬-৭
বিবাহ ৫৪৬-৭
বিলাসিতা প্রবাদ ৫৮২-৬, ৫৯৮
বেলদার সৈন্য ৫৭৪
ভূষণা দখল ৫৯৪-৫
ভূষণারাজ্য খারিজ ৬১৮
মন্দির নির্ম্মাণ ৫৭৭-৮২
মহম্মদপুর নামকরণ ৫৫১-২
মুনিরাম, দ্র. মুনিরাম
মূল্যায়ণ, চরিত্র ও কর্ম্ম ৬০৮-০৯
মেনাহাতী, দ্র. মেনাহাতী
মোগল-পরওয়ানা ও হিন্দুরাজত্ব ৫৯৭
মোগল সংঘর্ষ ৫৯১-৬০৯
যুদ্ধ
কালিকাপুর ৫৬৭
খণ্ড-যুদ্ধ ৫৯২-৪

গড়ের মাঠ ৫৬৮-৯
নসীবশাহী ৫৬৭
বারাসিয়া ৫৯৪
মহম্মদপুর, শেষ যুদ্ধ ৬০২-০৪
রামপুরা, ৫৭১
সত্রাজিৎপুর, ৪৭৫-৬, ৫৬৪
সাঁতের, ৫৩৫
যুদ্ধনীতি, ৫৯২-৩
রাজস্ব ৫৭২
'রাজা' উপাধি ৫৪৮
রাজ্য-জয় ৫৬৩-৭২
রাজ্য-সীমানা ৫৭১-২
রাজ্য ও রাজধানী ৪৪৮-৭২
শিক্ষা ৫৩৪
'বর্গী-বৃত্তি' বা গেরিলাযুদ্ধ ৫৯৩
সত্রাজিৎপুর রাজ্য ৫৬৪, ৬৪১-২
সনন্দ, আবাদী ৫৪৯, ৫৬৪, ৫৬৯-৭১
সহকারী ও সেনানীগণ ৫৩৬-৪০
সায়েস্তা খাঁ ৫৪৮
সৈন্যসংগ্রহ ৫৬১
স্বাধীন রাজ্যগঠন, কর-বন্ধ ৫৯১-৬
সীতারাম-সম্পর্কিত বংশ ৬২৬-৩৯
সির্ণী ৩-৪, ৮৭৪
সুখসাগর ৫৬০-১
সুখা (সেনাপতি) ২৩১, ২৩৬
সুজাউদ্দিন ও যশোহর ফৌজদারী ৪৬৮
সুতলিয়া-সমাজ ৮৫০
সুদ ও মহসীন ফণ্ড ৫২০
সুন্দর মল্ল ২৩১ ২৪৪, ২৮৫, ৪৩১-২
সুন্দরবন ২০৫, ২৩৫, ৩৫৭, ৫৬৯-৭২, ৭০০-০১, ৭০৩-০৪
বিলিবন্দোবস্ত ৬৬০, ৭১৬
লাট-বিভাগ ৭১৬, ৮০১
'সুন্দরবনের বাঘ' ৩৩৭
সুন্দরী-কাঠ ২১৮
সুন্নি শ্রে
সুবর্ণবণি
সুবাদার
সুরনারায়ণ ৫৪৬-৭
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কবি ৮৬
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অধ্যাপক ৫৬৫
সুরেশচন্দ্র রায় ১১৭
সুলতান মোল্লা, বয়াতি ৮৮১
সুলতানপুর-খড়রিয়া পরগণা ৫৭০-১, ৭৪২-৫
সুলেমান কর্‌রাণী ১০-১৭, ৬২
সূর্য্যকান্ত (সেনাপতি) ১২০, ১২২, ২২৫-৬, ২৮৫, ৩৫৭, ৩৬১
সূর্য্যদেব বসু (রাজা) ৮২৮
সূর্য্য মাঝি ৮৪০
সেখ বদী, দ্র. শেখ বদী
সেখ শ্রেণী ৮৪৬-৯
সেখহাটি ৪২০-১, ৮৫৩
'সেখের টেক' ১৯৮
সেন-পাহাড়ী ২৩৮
সেনহাটি ৪৩২, ৪৬৬, ৮১৪, ৮১৬-২০, ৮৩০
সিদ্ধান্তপাড়া ৪৩২-৩
সেনাপতি কালী ৩৬৭, ৪১৯
সেনাপতিগণ (প্রতাপাদিত্যের) ৩৫৭
সের খাঁ ৮-৯, ৫০
সেলবী সাহেব ৪৮৩
সেলিম চিস্তি ৩৭১-২
সেলিম শা ৩০৫
সেলিমাবাদ ২৮, ৩৩৮, ৬৪৮
সৈদপুর জমিদারী ও ষ্টেট ৪৮৯, ৪৯৯-৫০১, ৫১২-২০, ৭০২
সৈফ্‌উদ্দিন, কাজি ৮৪৯
সৈয়দ আমজফ্‌ আলি ৮৪৯

সাতুবাবু ও লাটুবাবু ৬৭২
সাতুরাম মজুমদার ৬৯৭
সাতৈর ৩০ ৩৩-৪, ৫৬৬
সাদেক মোল্যা ৭২৯ স্যার ৫১৯
সাফসিকান খাঁ আলি ৮৪৯
সামটা হাকিম ৩৭৮-৯, ৩৯১, ৩৯৭
সোণামণি (চাঁদরায়-কন্যা) ৩৯
সোনাবাড়িয়া ৬৯৯, ৮৬২,
সোম চৌধুরী ৮৩৮
সোসা, পাদরী ২৪, ২৯৩, ২৯৫-৬
স্তনকর্ত্তন (প্রতাপাদিত্য) ৩৬২-৩
স্থাপত্য ৮৫১-২, ৮৫৮-৬৮

হরনাথ রায়, রায় বাহাদুর ৭২৯
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫৪, ১৪০, ৮২৬
হরমোহন সরকার, কবিদার ৮৭৯
হরিখালি ২০৮
হরিচরণ চৌধুরী, রায় বাহাদুর ১৫০
হরিঢালী ৬৭৫, ৬৭৭, ৬৮৫, ৬৮৯
হরিণঘাটা ২০৮
হরিদাস ঠাকুর, ব্রহ্ম ৫৪৩, ৮১৫, ৮৫০
হরিদাস, দ্বিজ ৬২৬, ৬২৮
হরিনাথ বেদান্তবাগীশ ৪৩২, ৪৩৪, ৮১৪
হরিনাথ, রাজা ৫৭১, ৬৬৩-৪, ৬৬৮
হরিরাম মিত্র ৫০১
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৮৮-৯, ৭৯৩-৪
হরিশচন্দ্র রায়, বাবু ৬৮৬-৯০
হরি শৌণ্ডিক, হ'রে শুঁড়ি ৩১৯-২০, ৩৫১
হরিহরনগর ৫০৩, ৫৩৩, ৫৪২, ৫৪৭, ৫৫৯, ৫৯৪, ৬১৫
হরেকৃষ্ণ মন্দির ৫৭৯, ৮৬২
হলদহ-পরগণা ৬৭৫
হাওয়ালা ৭১৯
হাকিম চাঁদ, বয়াতি ৮৮২
হাকিম বিশ্বাস, বয়াতি ৮৮২
হাকিমপুর ৮৫০
হাজরাপুর কুঠি ৭৭১
হাজিপুরের যুদ্ধ ৬৮-৯
হাজিরালি ৬৭৩-৪
হাটখোলার দত্ত চৌধুরী ৭৪৪-৫
হাতিয়াগড় ২৮৫
'হাতী', উপাধি ২০১
হানরখালি ১৩৫, ১৫৯
হানিফী মতাবলম্বী ৮৪৫
হাবড়া ৩৫১
হাবসিখানা ১৬২-৩, ৪৬২
হাবেলী-পরগণা ১০৭, ৩৩৮. ৬৫৬-৬৬২
'হাম বৈদ্য' ৫৩০-১, ৮১৯
'হামলা বাঘা', আমল বেগ ৫৩৮
হামামখানা ১৬২-৩, ৪৫৪, ৪৬৩
হাম্বির মল্ল ৩০-৩, ২৫৬-৮
হায়দর গড় ২০৪
হায়দর মনঙ্কী ২০৪, ২২৯
হারমাদ ১৮৫
হারাণ ঠাকুর, কবিদার ৮৭৯
হারাধন দত্ত, ভক্তনিধি ১০৫
হালিসহর ৩৩৮
হাসনাবাদ ৬৮, ৩৫৩, ৩৯৩, ৮৭১-২
হিজলী ২৬-৭, ৩০, ৩৫-৭, ২৫৮, ২৬০, ২৭৯, ২৮৪-৮, ৩৩৮, ৪৬১
প্রাচীন ইতিহাস ২৮৬-৮
হিন্দুস্থানী সৈন্যসামন্ত, মানসিংহ ৩৭০
হিমু বা হেমচন্দ্র ১১, ৬২
হিম্মৎ সিংহ ৩৬৫
হীরা সর্দার ৬৯৬
হীরালাল সিংহ ৬৪৩